প্রদীপ।

সচিত্র মাসিক পত্র।

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

(পৌষ, ১৩০৮ হইতে—অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ পর্য্যন্ত)

কলিকাতা

৯২।৪ নং জানবাজার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস,
শ্রীশম্ভুনাথ মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

সূচী।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অবস্থার ব্যবস্থা (লেখকের প্রতিকৃতি সহ)	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত	৪৫
অভিভাবকতা	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এ (কেম্ব্রিজ)	৬৩
আগ্রার তাজমহল	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলমোহন বসু	৩১৯
আমার কৈফিয়ত	... ...	৩২৭
আলোকবার্ত্তা বা তারাবিহীন টেলিফোন (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	৭৭
আরতি (সমালোচনা)		৩২৬
আবাহন	শ্রীযুক্তা হিরন্ময়ী সেন	২৩২
ইংরেজের বঙ্গাধিকার (১ম ২য় ও ৩য় প্রস্তাব)	শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত	২৯৩
একটী কথা (সচিত্র কবিতা)	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন বি, এ	১
কংগ্রেস (শেষ প্রবন্ধ লেখকের প্রতিকৃতি সহ)	শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৯
কঙ্কণচোর (গল্প)	শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৩১,৯৬,১৬৬
কলিকাতায় শিল্প প্রদর্শনী	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	৩৬
কবিস্মৃতি	শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সন্ন্যাল	৩২০
কবীর	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী	২৩১
কাশীনাথ (গল্প)	শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত	৩০৫
কি দিয়ে পূজিব তোমা	শ্রীযুক্ত অসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩১৯
ক্লিয়োপেট্রা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	১৩৭
কুকিজাতির বিবরণ (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত	৫,৮৪,১৯২
কুহক চতুরস্র	শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়চৌধুরী	১৪৫
খেদা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ	৯২,১৯৫,২২৯
৺গঙ্গাধর কবিরাজ (সচিত্র)		১৭৪
গাজিমিয়ার বস্তানি (সচিত্র সমালোচনা)	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	৩৯
গুলবাহারের উদ্দেশে (লেখকের প্রতিকৃতি সহ)	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	২২৩
চির সঙ্গিনী		১৮৪
ছাই (কবিতা)	শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬
ছোটবউ (গল্প)	শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার	২৩৮
জড় ও চৈতন্য	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ	৪১
জন্মাষ্টমী (গল্প)	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৬
জব্বলপুরের পথে (সচিত্র)		২৯
জাতীয় বর্ণ	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়	২
জাজরেল কাশীপ্রসাদ	শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী	২৮০
টেলিগ্রাফে ছবি তোলা (সচিত্র)	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	১৩২
দক্ষিণা	শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল	২১৪

প্রদীপ

পঞ্চম ভাগ। } পৌষ, ১৩০৮। { ১ম সংখ্যা।

একটি কথা।

তখন ফিরিতেছিনু সোনার সন্ধ্যায়
শান্ত নদী-তীর-পথে ; অস্ত ভানু ভায়
লঘু শুভ্র মেঘগুলি—অনুরাগে যেন—
ধরিছে বিচিত্র শোভা; স্নেহমূর্ত্তি হেন
পল্লীবধূ ভরি'ঘট ফিরিছে আলয়ে ;
একটি নিঃসঙ্গ পাখী উৎকণ্ঠ হৃদয়ে
শ্যামল কুলায় খানি মরিছে খুঁজিয়া,
শঙ্কায় কাতর কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া।

বহু—বহুদূর তীরে, মহানভ পারে :
তারকা-প্রদীপ হস্তে ত্রিদিব-দুয়ারে
দাঁড়া'ল সন্ধ্যার লক্ষ্মী ; গ্রামের সুন্দরী
শঙ্খ বাজাইয়া তারে গৃহে নিল বরি'।
মন্ত্র-মোহে মুগ্ধ প্রায়, নদী-তট ধরি'
তখনও চলিতেছিনু ; শূন্য চিত্ত ভরি'
জন্ম জন্মান্তের ব্যথা, দুঃস্বপ্নের মত,
চাপিয়া ধরিতেছিল বক্ষ অবিরত।

সহসা ফিরায়ে দিল সম্মুখের গতি
নির্ব্বাক প্রহরী সম মহা বনস্পতি।
চকিতে চেতনা লভি' দেখিনু চাহিয়া,
অজ্ঞাত প্রান্তর মাঝে একা দাঁড়াইয়া
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়!

পার্শ্বে "মর-মর" ধ্বনি
শুনিয়া ফিরানু চক্ষু বামেতে যেমনি,
হেরিনু ফুলের বনে একটি বালিকা ;
সুকুমার করে শিশু কুসুম-কলিকা
চয়নে নিরত ছিল। বিদেশী এ পান্থে
সহসা সম্মুখে হেরি', একান্ত বিস্ময়ে
থমকি' দাঁড়াল শুধু ; পরক্ষণে ভয়ে
অবচিত পুষ্পগুলি ফেলি' পদ-প্রান্তে
যেমনি পলাতে যাবে, ক্রোড়ে তারে তুলি'
অভয়-আশ্বাস দিয়া ক্ষুদ্র ফুলগুলি
আপনি কুড়ায়ে দিনু।

নামটি তাহার
সুধাইতেছিনু যবে স্নেহে বার বার,
করুণা-কম্পিত কণ্ঠে কে কহিল. "হাসি"!

সে বাণী বিদ্যুৎসম মর্ম্মস্থলে আসি'
মুহূর্ত্তে চেতনা সুখ সব দিল নাশি'—
সে-ই সুর!—হায় প্রেম!—সে-ই "ভালবাসি"!

নয়নের জল—বক্ষ-শোণিতের রেখা
লিখিল কি আজিও হা অদৃষ্টের লেখা
সুশুভ্র কপোলে তার?—

মোহ-অন্তে চাহি'
জগৎ হেরিনু শূন্য!—আর তারা নাহি!
শুধু দূরে গেল দেখা,—যায় চলি' ধীরে
চির জীবনের আশা। আজ তার শিরে,
পর-হস্তে আঁকা দীপ্ত সিঁদূরের টিপ!
করে, অন্য গৃহস্থের সন্ধ্যার প্রদীপ!

শ্রীমন্মথ নাথ সেন।

জাতীয় বর্ণ।

জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ নিরূপণ আধুনিক মানব-তত্ত্ববিদ্‌গণের (anthropologists) নিকট একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানবজাতির অন্তর ও বাহ্য প্রকৃতির অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ক্রমে আবিষ্কৃত করিয়া, আধুনিক পণ্ডিতগণ অল্পদিন মধ্যে মানব-তত্ত্বকে একটা পরিণত শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন সত্য,—কিন্তু বর্ণ বৈচিত্র্যের ন্যায় একটা বৃহৎ ব্যাপারের প্রকৃত কারণ যে কি, তাহা অদ্যাপি কেহ ঠিক্ করিতে পারেন না। আজকাল মতবাদের অভাব নাই, একটা নূতন বিষয় দৃষ্ট হইলেই, সহস্র পণ্ডিতের সহস্র সিদ্ধান্ত অযাচিতভাবে অনুসন্ধিৎসুর দ্বারস্থ হইয়া, বেচারার মাথা ঘুরাইয়া দেয়। জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্য-প্রসঙ্গেও তদ্রূপ অনেক সিদ্ধান্ত এপর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন্‌টী যে সমীচীন, প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে তাহা এপর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে নানা মতবাদের মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত ন্যায়সিদ্ধ বলিয়া অধিকাংশ স্থলে গৃহীত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের কথা উঠিলেই, প্রাথমিক মানব-জাতির বর্ণ কি ছিল, স্বতঃই এই প্রশ্ন আমাদের মনে উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রাচীন মানবজাতির ইতিহাস এতই অসম্পূর্ণ যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহই এই প্রশ্নের নিঃসন্দিগ্ধ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ভূপঞ্জরে প্রোথিত প্রাথমিক মানবের কঙ্কাল উদ্ধার করিয়া, তাহা হইতে বর্ণসম্বন্ধে তথ্য আবিষ্কার এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই ভূতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটেও আমরা এ সমস্যার একটা শেষ মীমাংসা আশা করিতে পারি না। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ওয়ালেস্ বহু অনুসন্ধান ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ আদিম মনুষ্য আধুনিক মোগল জাতির ন্যায় নাতিকৃষ্ণ ও নাতিশ্বেত এতদুভয়ের মাঝামাঝি একটা বর্ণের ছিল, তা'র পর বংশবৃদ্ধির সহিত তাহারাই শীতপ্রধান ও উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, জাতীয় বর্ণ যথাক্রমে শ্বেত ও কৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তার ওয়ালেসের এই সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করিয়া, কয়েক-জন আধুনিক পণ্ডিত বলিতেছেন, য়ুরোপবাসীর তুষারধবল বর্ণই আদিম মনুষ্যের জাতীয় বর্ণ। কিন্তু এই শেষোক্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাদের উক্তির পোষক বিশেষ কোন যুক্তি দেখাইতে পারেন না। কাজেই উভয় মতবাদের মধ্যে ডাক্তার ওয়ালেসের অনুমানই আজকাল সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতেছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আদিম মনুষ্যের বর্ণ মসীমলিন কি তুষার-ধবল ছিল, তাহা যখন আমাদের অজ্ঞাত তখন তাহাদিগকে ডাক্তার ওয়ালেসের মতানুযায়ী মাঝামাঝি বর্ণের বলিয়া স্থির করা, স্থূলদৃষ্টিতে আমাদিগের নিকটেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

মানব শরীরস্থ যে মৌলিক বর্ণ দ্বারা জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি হয়, মৃতশরীর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পণ্ডিতগণ তাহা বহুকাল হইল আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যবচ্ছেদ-লব্ধ বর্ণই যে জাতীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ, তাহাতে আর এখন কোন মত-দ্বৈধ নাই;—কিন্তু উক্তবর্ণ জীবশরীরে কিপ্রকারে উৎপন্ন হয় এবং জাতিভেদে তাহার পরিমাণই বা কিপ্রকারে অল্পাধিক হইয়া মানবশরীরে বিভিন্ন বর্ণের বিকাশ করে, তৎসম্বন্ধে নানা বিরোধী মতবাদের কথা শুনা যায়।

এই সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলির কথা বুঝিবার পূর্ব্বে উল্লিখিত মৌলিক-বর্ণের উৎপত্তিস্থান চর্ম্মের অবস্থান ও গঠনাদির বিষয়টা মোটামুটি জানা আবশ্যক। শরীরবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—মানবচর্ম্ম বাহির হইতে যেমন এক অভিন্ন স্তর-নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়, উহার গঠন বাস্তবিক তদ্রূপ নয়,—ইহাতে স্পষ্ট দুইটী পৃথক্ স্তর দেখা গিয়া থাকে। শারীরশাস্ত্রে ইহাদিগকে বহিশ্চর্ম্ম ও অন্তশ্চর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। বহিশ্চর্ম্ম রক্তপ্রবাহ রহিত নীরসকোষময় স্বচ্ছসামগ্রী দ্বারা নির্ম্মিত। জীবশরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গভেদে ইহার স্থূলতার ন্যূনাধিক্য দেখা যায়। কিন্তু অন্তশ্চর্ম্মের প্রকৃতি তদ্রূপ নয়, ইহাতে শরীরের অপরাংশের ন্যায় স্নায়বিক বিন্যাস ও রক্তকোষ সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত বহিশ্চর্ম্মের প্রান্তে এবং অন্তশ্চর্ম্মের ঠিক্ উপরে কতকগুলি কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি বহিশ্চর্ম্মের নিম্নপ্রান্ত অতিক্রম করিয়া, উপরের দিকে থাকে, তাহাদিগকে চর্ম্মের গঠনোপাদানের ন্যায় সর্ব্বদাই নীরস অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বনিম্ন কোষ সকল পরীক্ষা করিলে সর্ব্বদাই সেগুলিকে এক প্রকার বর্ণ-রসপূর্ণ দেখা যায়।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—কোষ-মধ্যস্থিত উক্ত রসই জাতীয় বর্ণোৎপাদনের মূল সামগ্রী।

আফ্রিকাবাসীদের মসীকৃষ্ণ চর্ম্মের পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়টা বেশ বুঝা যায়,—ইহাদের বহিশ্চর্ম্মের নিম্নপ্রান্তে ও অন্তশ্চর্ম্মের উপরে বর্ণ-রসপূর্ণ বহু কোষ উপর্য্যুপরি স্পষ্ট সজ্জিত দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু কোষ-গুলির অবস্থান যতই বহিশ্চর্ম্মের উপরের দিকে উঠিতে থাকে, তাহাদের রসের পরিমাণ ততই হ্রাস হইতে আরম্ভ করে, কাযেই বহিশ্চর্ম্মের উপরিভাগটাকে সম্পূর্ণ নীরস ও স্বচ্ছ কোষময় উপাদানে গঠিত দেখা যায়।

পূর্ব্বোক্ত কোষরস কি কি উপাদানে গঠিত তাহা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুদিন হইল স্থির করিয়াছেন। পদার্থটার রাসায়নিক গঠন কিঞ্চিৎ জটিল বলিয়া, ইহার বিশ্লেষ করিতে প্রথমে পণ্ডিতগণ বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছিলেন, এজন্য তৎকালে নানা বিশ্লেষণ-লব্ধ ফলের মধ্যে প্রায়ই একতা দেখা যাইত না। এই কারণে উহার রসায়নিক গঠন সম্বন্ধেও নানা মতবাদের উৎপত্তি হইয়া-ছিল। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন হইল, অধ্যাপক সবি (sorby) নামক জনৈক পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত বর্ণরসকে অভ্রান্তরূপে বিশ্লিষ্ট করিয়া, বিবদমান রসায়নবিদ্‌গণের তর্কদ্বন্দ্বের অবসান করিয়াছেন।

অধ্যাপক সবি প্রথমেই চর্ম্মের বর্ণ লইয়া পরীক্ষা করেন নাই। কেশের বর্ণোৎপাদক পদার্থ এবং চর্ম্মের বর্ণবৈচিত্র্য-সাধক রস মূলতঃ একই পদার্থ ইহা দেখিয়া তিনি প্রথমে কেশমূলস্থ কোষের বর্ণ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পরীক্ষান্তে, তাহাতে পাটল, পীত ও কৃষ্ণ এই তিনটী মৌলিক বর্ণ আবিষ্কার করিয়া তাহাই যে চর্ম্মেরও বৈচিত্র-সাধক, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল দেখাইয়াছিলেন।

পণ্ডিতগণ বলেন, বর্ণকোষে উক্ত বর্ণত্রয়ের সমসংমিশ্রণ দেখা যায় না। এই জন্য আমরা জাতিবিশেষে কেশচর্ম্মের নানা বর্ণ দেখিতে পাই। য়ুরোপবাসিগণের বহিশ্চর্ম্মের সেই নিম্নস্থ কোষগুলিতে কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা পাটল ও পীতের আধিক্য দেখা যায়, এজন্য তাহাদের কেশ ও চর্ম্ম প্রায়ই তাম্র ও কাঞ্চন বর্ণের হইয়া পড়ে। আবার আফ্রিকা ও আসিয়াবাসিগণের বর্ণ-কোষে সর্ব্বদাই প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ সঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহাদের বর্ণ অল্পাধিক পরিমাণে কৃষ্ণ হইয়া যায়।

এখন দেখা যাউক, উক্ত বর্ণরসগুলির উৎপত্তি কোথায়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিয়াছি, কোন তথ্য অবলম্বন করিয়া একাধিক পণ্ডিত গবেষণায় নিযুক্ত হইলে গবেষণালব্ধ ফলের মধ্যে প্রায়ই একতা দেখা যায় না, তারপর কোন এক নিরপেক্ষ পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়া, পর-স্পরবিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তিতর্কের জঞ্জাল হইতে সত্যের উদ্ধার না করিলে প্রায়ই সেই বিরোধের আর অব-সান হয় না। বর্ণরসের উৎপত্তির আবিষ্কার প্রসঙ্গেও গবেষণাপরায়ণ পণ্ডিতগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারের মত-দ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত সেই বিরোধের মীমাংসা হয় নাই।

বর্ণরসোৎপত্তি সম্বন্ধে একদল পণ্ডিত বলেন,—বহি-শ্চর্ম্মস্থ সেই সর্ব্বনিম্ন বর্ণকোষগুলিই রসোৎপত্তির যন্ত্র। কোন এক অপরিজ্ঞাত পদ্ধতিক্রমে, সেই কোষগুলিতেই বর্ণরস সঞ্চিত হইয়া, তাহাই অপেক্ষাকৃত উপরিস্থ বর্ণকোষে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আর এক পণ্ডিত-সম্প্রদায় বলেন, —পূর্ব্বোক্ত অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; বর্ণরসটা জীবশরীরের সর্ব্বাংশেই নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে,—বর্ণ কোষগুলির কার্য্য সেই সর্ব্বদেহব্যাপ্ত রসকে একীভূত করা মাত্র। কিন্তু কি উপায়ে কোষে বা জীবদেহের সর্ব্বাংশে সেই বর্ণগুলির উৎপত্তি হয় জিজ্ঞাসা করিলে, প্রত্যেক পণ্ডিতসম্প্রদায়কেই একপ্রকার নীরব থাকিতে দেখা যায়।

স্বীয় স্বীয় মতবাদের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন জন্য, উভয় পক্ষ এতাবৎ কাল যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া, কোন্ মতবাদিগণ অভ্রান্ত তাহা নিঃ-সন্দেহে স্থির করা বড় দুরূহ। কিন্তু শেষোক্ত মতের প্রামাণ্য যুক্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির যৌক্তিকতার কথা ভাবিলে, সেই মতবাদটাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—অস্ত্র-বিদ্যার উন্নতির সহিত আধুনিক চিকিৎসকগণ দুষ্ট ক্ষত আরোগ্য করিবার একটী নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে সুস্থ ব্যক্তির গাত্রচর্ম্ম উঠাইয়া পীড়িতের ক্ষতস্থানে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং পরে ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে সেই চর্ম্ম স্থায়িরূপে গাত্রস্থ হইয়া

পড়ে। উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে কৃষ্ণকায় আফ্রিকাবাসীর চর্ম্ম শ্বেতকায় য়ুরোপবাসীর গাত্রে সংযুক্ত করিলে দেখা যায়,— উভয় চর্ম্ম যোড় লাগিলে, কালক্রমে সেই কৃষ্ণচর্ম্ম খণ্ড শ্বেত হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শেষোক্ত মতবাদিগণ বলেন,—বিরোধী মতবাদিগণের কথা সত্য হইলে, শ্বেতকায় য়ুরোপবাসীর গাত্রসংলগ্ন কৃষ্ণচর্ম্ম কোনক্রমে শুভ্রতা প্রাপ্ত হইত না। কারণ তখন কৃষ্ণচর্ম্মস্থিত বর্ণকোষ হইতে কেবল কৃষ্ণবর্ণই উৎপন্ন হইয়া গাত্রের যুক্তস্থানটীকে চিরদিনের জন্য কৃষ্ণ করিয়া রাখিত, কিন্তু এই পরীক্ষায় তাহার বিপরীত ফলই দেখা গিয়া থাকে। —কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, বর্ণরস শরীরের অপরাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া পরে কোষে সঞ্চিত হওয়াই সম্ভব, এবং সেই জন্যই শ্বেতকায় ব্যক্তির সর্ব্বশরীরে উৎপন্ন শুভ্রবর্ণোৎপাদক রসদ্বারা নব সংযুক্ত কৃষ্ণচর্ম্মস্থ কোষগুলি ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষ্ণচর্ম্ম শ্বেতত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের পোষক আর একটা সুন্দর প্রমাণ আছে,—কেশমূলস্থ বর্ণকোষ পরীক্ষা করিলে অনেক সময়েই কোষের চারিদিকে প্রচুর বর্ণরস সঞ্চিত দেখা যায় এবং সেই বর্ণরসই যে পরে কোষস্থ হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়া থাকে। সুতরাং বর্ণরস যে শরীরের অপরাংশ হইতে সঞ্চিত হইয়া পরে কোষস্থ হয়, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

সজীব প্রাণিদেহে শারীরিক ক্রিয়ার বিরাম নাই, পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বয়ের মধ্যে যে'টীই সত্য হউক না কেন, উভয়েরই মতে যে বর্ণরস বহিশ্চর্ম্মের নিম্নস্থ কোষে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান বর্ণরস কোথায় যায়? শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে চর্ম্মস্থকোষ একস্থানে স্থির থাকে না; যে কোষ কিছুকাল পূর্ব্বে চর্ম্মের সর্ব্বনিম্নস্তরে সন্নিবেশিত ছিল, তাহাই ক্রমে চর্ম্মের উপরে আসিয়া, শেষে মৃতচর্ম্মরূপে শরীরচ্যুত হইয়া পড়ে—ইহা ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা। তবে বর্ণরসপূর্ণ কোষগুলি চর্ম্মের উপরে আসিবার সময়. তাহাদের সেই রস কোথায় রাখিয়া আসে,—চর্ম্মের উপরিস্থ হইলেইত তাহাদিগকে নীরস ও স্বচ্ছ দেখায়। কোনপক্ষই এপর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ আজকাল বলিতেছেন, যে সময় বর্ণকোষগুলি চর্ম্মের ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, সম্ভবতঃ তখন কোষস্থরস তাহার মৌলিক উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বর্ণরসের ন্যায় একটী স্থায়ী (Stable) এবং জটিল যৌগিক পদার্থ সহজে বিশ্লিষ্ট হওয়ার কথা, সহসা বিশ্বাস হয় না।

লজ্জা ও ভয়াদি প্রযুক্ত আকস্মিক মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা গৌরাঙ্গ বা শ্বেতকায় ব্যক্তির যে বর্ণের রূপান্তর দেখা যায়, শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহারও কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—এই শ্রেণীর লোকের চর্ম্মকোষে কৃষ্ণবর্ণের অভাব থাকায় সমগ্র বহিশ্চর্ম্মটা একপ্রকার স্বচ্ছ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়; তার'পর পূর্ব্বোক্ত মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু অন্তশ্চর্ম্মকোষে রক্ত সঞ্চিত হইলেই, স্বচ্ছ বহিশ্চর্ম্মের মধ্য দিয়া সেই রক্তের দীপ্তি প্রতিভাত হইয়া, বর্ণের রূপান্তর সাধন করে।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জাতিবিশেষে পূর্ব্বোক্ত মৌলিক বর্ণরসত্রয়ের অল্পাধিক্য দেখা যায় কেন? শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্যাপি এ প্রশ্নেরও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। জাতীয় বর্ণোৎপাদনে স্থানীয় শীতাতপ, দেশের ভৌগলিক অবস্থান, জাতীয় খাদ্য ইত্যাদির প্রভাব আমরা যেমন স্থূলবুদ্ধিতে অনুমান করিয়া থাকি, তাঁহারাও সেইরূপ মোটামুটি অনুমানের অধিক এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন,—আমরা যে আদিম আফ্রিকাবাসিগণকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত দেখি, তাহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলমাত্র। ইহাদের চর্ম্ম-স্থিত কৃষ্ণ-রস-বহুল কোষগুলি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি স্থানীয় রোগের প্রতিষেধক। তাই আসৃষ্টি ঐ সকল ব্যাধির সহিত যুঝিয়া তাহারা কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ডাক্তার টম্‌সন-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, শ্বেতকায় জাতির তুলনায় কৃষ্ণকায় জাতির যকৃতের আকার ও গুরুত্ব প্রায়ই অধিক দেখা যায়; সম্ভবতঃ যকৃতের এই গুরুত্বাধিক্যের সহিত জাতীয় বর্ণবৈচিত্রেরও কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুকাল হইতে বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত কয়েকটী তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,—আজও তথ্যের সংগ্রহ ও গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়; পণ্ডিতগণের এই ঐকান্তিক চেষ্টা যে

অচিরে সাফল্য লাভ করিবে, এ প্রকার লক্ষণ অদ্যাপি কিছুই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কুকিজাতির বিবরণ।

(৩)

কুকিজাতির মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। এবার তদ্বিষয়ক কয়েকটি কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

সমগ্র কুকিজাতি এক সময়ে ত্রিপুর নৃপতিবৃন্দের শাসনাধীন ছিল। মুসলমান ও মগদিগের পুনঃ পুনঃ আহবে লিপ্ত হওয়ায় এবং ভারতের পতনের মূলসূত্র আত্মকলহের জন্য ত্রিপুর রাজ্যের বলবীর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে হীনপ্রভ হয়। এই সুযোগে, (খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) কুকিগণ মস্তক উত্তোলন করিবার সুবিধা পাইয়াছিল এবং তদবধি সময় সময়ে ইহাদের দ্বারা নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে, ইহাদের মধ্যে অনেকে ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের শাসনাধীন রহিয়াছে, কতকগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের করতলগত হইয়াছে; আর কেহ কেহ আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া আসিতেছে।

ত্রৈপুরী ১১৪৭ সালে (১৭৩৭খ্রীঃ) সুবারুদ্রমণি ঠাকুর* তদানীন্তন ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য বাহাদুর ও মুসলমান ফৌজদার হাজি মুলসমকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, "জয় মাণিক্য" নাম গ্রহণে ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে দুর্দ্দম্য কুকিগণ জয়মাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল, এই ঘটনাস্রোতে ত্রিপুর-রাজ্যে দীর্ঘকাল আত্মকলহ চলিয়াছিল এবং কুকিদিগকে বারংবার আহবে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তদবধি কুকি সম্প্রদায় বিশেষ পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। ক্রমে ইহারা এমন দুর্দ্দম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহাদের বিপুল বিক্রমে এক সময় ত্রিপুর-সিংহাসনকেও কম্পিত করিয়াছিল!

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর সিংহাসনের ১৩২ সংখ্যক ভূপতি। তিনি ১১৭০ হইতে ১১৯৩ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে বঙ্গদেশ ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লবে নিমজ্জিত ছিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরলোক গমন করার পর তাহার অপরিণতবয়স্ক ও অপরিণামদর্শী দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনারূঢ় হইলেন। অল্পকাল পরেই আবার তাঁহাকে পদদলিত করিয়া, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর সিংহাসন অধিকার করেন! এবম্বিধ ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে যখন বঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মী মুহুর্মুহু-কম্পিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে ত্রিপুরার সমশের গাজি নামক জনৈক মুসলমান প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এমন কি, সে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বাহাদুরকে, বারংবার সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিল। *

এই সময়ে কুকিগণ মহারাজ বাহাদুরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বহুবার সমশের গাজির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই সকল কারণে এবং বিদ্রোহী দলের প্ররোচনায় কুকিগণ উত্তরোত্তর এরূপ পরাক্রান্ত ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অতঃপর ত্রিপুররাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও তাহারা কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হয় নাই।

১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খ্রীঃ) মহারাজ রাজধর মাণিক্য বাহাদুর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র (স্বীয় জ্ঞাতি ভ্রাতষ্পুত্র) কুমার দুর্গামণিকে যৌবরাজ্য এবং আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রামগঙ্গাকে বড়ঠাকুরপদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারিত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে ভীষণ-আত্ম-কলহ উপস্থিত হইল। কর্ম্মচারিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, উভয়ের পক্ষ অবলম্বন করিল। অতঃপর কুমার রামগঙ্গা, "মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য" নাম গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কুমার দুর্গামণি, কতিপয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে বাধ্য করিয়া, মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন (১৮০৫ খ্রীঃ)। এই সময়ে কুকিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মহারাজ বাহাদুরের পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল!

---

* স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রাচীনকালে সেনাপতিকে "সুবা" উপাধি প্রদান করা হইত।

* হস্ত লিখিত বহু পুরাতন একখানা পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা সমশের গাজির জীবনী। আমরা তদবলম্বনে সময়ান্তরে সমশের গাজির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

কিছুদিন পরে কুমার দুর্গামণি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া, মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যকে কিয়ৎকাল শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল (১২১৯ ত্রিপুরাব্দ)। এই সময় কুমার দুর্গামণি "দুর্গামাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনবৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া মহারাজ দুর্গামাণিক্য কালকবলিত হইলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় আবার দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য বাহাদুরের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর দাবী উপস্থিত করিলেন, মহারাজ দুর্গামাণিক্য কর্ত্তৃক তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সুতরাং সিংহাসন প্রাপ্তিপক্ষে তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার এই দাবী কার্য্যকর না হওয়ায়, তিনি বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কুকিদিগকে হস্তগত করিয়া, মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১২৩৪ হইতে ১২৩৬ ত্রিপুরাব্দ (১৮২৪—২৬খ্রীঃ) পর্য্যন্ত তিনবৎসর কাল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া, শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় শম্ভুচন্দ্র দীর্ঘকাল পার্ব্বত্য জাতির সহিত একত্রে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮২৪খ্রীষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামের এলাকাস্থ পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু পার্ব্বত্য জাতিসমূহ শম্ভুচন্দ্রের এরূপ বাধ্য ছিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত পুরস্কারের লালসায় তাহারা কেহই শম্ভুচন্দ্রকে ধৃত করিতে ইচ্ছুক হইল না।*

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুরের পরলোক গমনের পর, তৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত যুবরাজ (মহারাজ রামগঙ্গার কনিষ্ঠ সহোদর) কাশীচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাজদণ্ড ধারণ করিলেন (১২৩৭ ত্রিং—১৮২৬ খ্রীঃ) এই সময়ে আবার শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করেন। মহারাজ বুঝিলেন, এবম্বিধ আত্মকলহের দরুণ রাজ্যের বিবিধ প্রকারের অনিষ্ট সাধিত হইবার আশঙ্কা আছে। এজন্য তিনি শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে বাধ্য করিয়া, তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০০ পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। অতঃপর শম্ভুচন্দ্র কর্ত্তৃক আর কোনরূপ উৎপাত উপদ্রব উপস্থাপিত হয় নাই।

মহারাজ কাশীচন্দ্র রাজ্যের উত্তর সীমান্ত প্রদেশ দৃঢ় করিবার পক্ষে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, কাছাড়ের অন্তর্গত হালিয়া-কান্দি ও মণিপুরের অন্তঃপাতী থাঙ্গম্ নামক কুকিপল্লী ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া দাবি করিলেন, (১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে)। এই সূত্রে মণিপুর রাজ্যের সহিত ত্রিপুরার সঙ্ঘর্ষণের আশঙ্কা হওয়ায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া, তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন। এতদুপলক্ষে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, "থাঙ্গম্ খচাক" কুকিগণের পুরাতন বাসস্থান; ইহা ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে পূর্ব্বউত্তর কোণে, ১৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান মণিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও পূর্ব্বে তাহা ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ মণিপুরের পক্ষ হইতে তথায় একটি থানা সংস্থাপিত হইয়াছে। এজন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, মণিপুরের দখল বজায় রাখিয়া, ত্রিপুরাধি-পতিকে তথায় সৈন্য প্রেরণে পক্ষে প্রতিনিবৃত্ত করেন।† হালিয়াকান্দি প্রভৃতি স্থান লইয়া, খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কাছাড়ের অধিপতির সহিত ত্রিপুররাজের বিবাদ চলিতেছিল।* হালিয়া কান্দির দক্ষিণ-দিক্‌স্থ স্থান-গুলি ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্বীকার করা হইয়াছে।‡

পাইতু সম্প্রদায়ের কুকিগণই অধিকতর দুর্ব্বৃত্ত ও হিংস্র স্বভাবাপন্ন। কুকিজাতি দ্বারা যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এই সম্প্রদায়ের কুকিগণই তাহার অধি-কাংশ ঘটনার নায়ক। স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত স্থানে ইহারা বসবাস করিয়া আসিতেছে। কৈলাস বাবু এই শ্রেণীর একটি শাখার বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন কোন নামের গোলমাল ঘটিয়াছে। আমরা সেই শাখার যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

* Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. P. 276.

* Mackenzie's North East Frontier of Bengal P. 277.

† Wilson's Burmese war appendix P. XXVII.

‡ Pemberton's Report 1835.

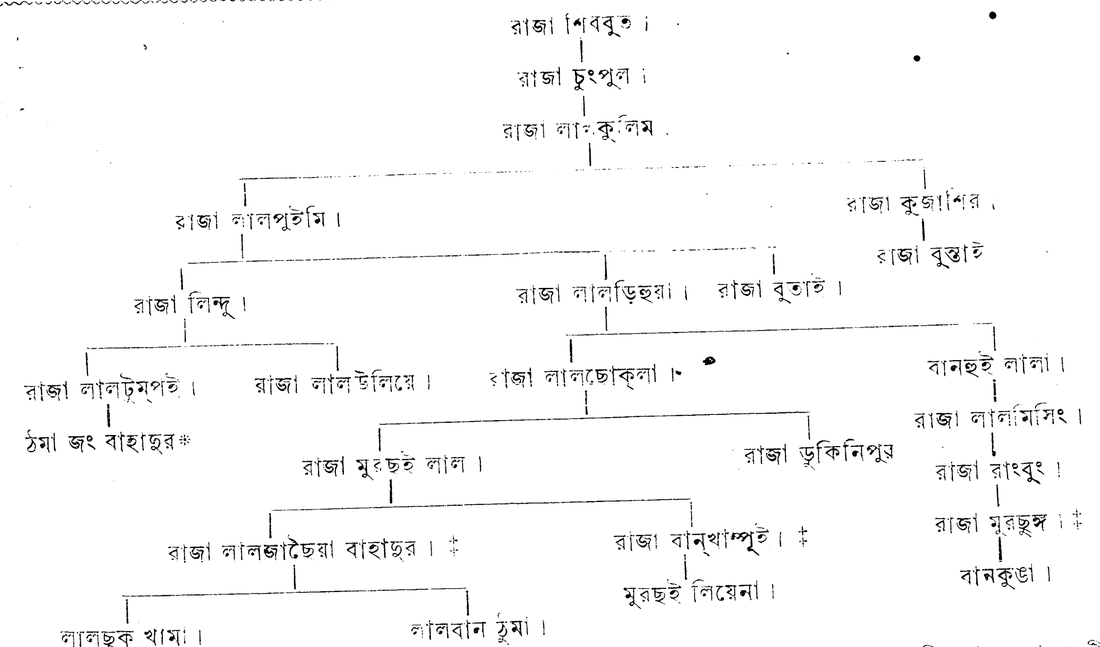

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত লালবুংঠমা বাহাদুর নামক একজন কুকি সরদার ত্রিপুর রাজ্যের অধীনে আছেন। এই ব্যক্তি ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে "বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। ইনি রাজবংশসংসৃষ্ট নহেন বলিয়া তাঁহার বংশা-বলী এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

উপরে যে বংশাবলী দেওয়া হইল, তাহার শীর্ষ স্থানীয় রাজা শিববুত স্বাধীন ত্রিপুরার সামন্ত নরপতি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে—মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বাহা দুরের শাসনকালে, রাজা শিববুত পঁচিশ হাজার কুকি সৈন্য লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পরবর্ত্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে এবং কেহ কেহ ত্রিপুর সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পায়, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩৬ ত্রিপুরাব্দ হইতে) কুকি-গণের উপদ্রব আরম্ভ হয়। এই সনে কুজাশিরের পুত্র রাজা বুন্তাই শ্রীহট্ট জিলার কতকগুলি কাঠুরিয়াকে অরণ্য মধ্যে বধ করিয়াছিলেন।

রামকানু ঠাকুর নামক ত্রিপুরার রাজবংশীয় এক ব্যক্তি রাজ পরিবার হইতে বাহির হইয়া গিয়া, কুকিদিগের সহিত মিলিত হন। এবং বিস্তর কুকি প্রজা লইয়া, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, বৃটিশ রাজ্যান্তর্গত খণ্ডল পরণার মেরকু চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির বাড়ী আক্রমণ ও ভস্মীভূত করিয়া, এবং ১৫ জন লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া, পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনার নায়কদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ত্রিপুরার দরবারে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা উত্তর দিলেন যে,—"ইহারা ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা নহে।" *

১২৪৩ ত্রিপুরাব্দে (১৮৪৩ খ্রীঃ) রাজা লাল ড়িহুয়া† পর-লোক গমন করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় পুত্র রাজা লাল ছোক্‌লা, নরমুণ্ড ও দাস দাসী উৎসর্গ করা সঙ্গত মনে করিলেন। এজন্য তিনি ১৮৪৪ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রেল তারিখে শ্রীহট্ট জিলার অন্তঃপাতী প্রতাপগড় পরণার মধ্যগত কচু-বাড়ী গ্রাম আক্রমণ করিয়া, ২০টি নরমুণ্ড ও ৬টী দাসদাসী সংগ্রহ করিলেন। এই লোমহর্ষণ ঘটনার নায়কদিগকে

☞ ‡ চিহ্নিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুর রাজ্যের সামন্ত নরপতি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহাদের অবস্থাদি পরে লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহার বিশেষ মূল্যবান ১ খণ্ড বাইনেলা প্রস্তর ত্রিপুরার রাজ সরকারে আমানত আছে। এই প্রস্তর ওয়ারিশীভুক্ত পাওয়ার নিমিত্ত বান্‌খাম্পুই একবার দাবি করিয়া ছিলেন।

* Mackenzie's North-East Frontier. P. 280.

† কৈলাস বাবু ইহাকে 'রাজালারু' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ধৃত কবিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে ত্রিপুরার দরবারে চিঠি প্রেরিত হইল। কিন্তু এবম্বিধ বীর পুরুষকে ধৃত করিয়া দেওয়া বোধ হয় দরবারের অভিপ্রেত ছিল না। অথচ গবর্ণমেণ্টের চিঠির মর্য্যাদা রক্ষা করাও আবশ্যক ছিল। এজন্য এক জন দারোগাকে ১০ জন বরকন্দাজ সহ, লালছোক্‌লাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পাঠান হইল। * বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়ায়, প্রথমতঃ চারি জন কুকি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, লাল ছোক্‌লাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত একদল পদাতি সৈন্য সহ কাপ্তেন ব্লেক্ উড্‌কে ত্রিপুর রাজ্যে প্রেরণ করেন। এই সময় ত্রিপুর রাজ্যের কেলি ফেরিঙ্গি নামক জনৈক সেনাপতি লালছুক্‌লাকে ধৃত করিয়া কাপ্তেন ব্লেক্ উডের হস্তে অর্পণকরেন (১৮৪৩ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর)। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচারে লাল ছোক্‌লা দ্বীপান্তরিত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, ত্রিপুরার রাজবংশীয় কোনও ব্যক্তির ক্ষোভের কারণ ঘটিলে, তিনি কুকিদিগকে হস্তগত করিয়া, নানাবিধ অশান্তিজনক কার্য্যানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতেন। ভগবান চন্দ্র ঠাকুর নামক রাজবংশের এক ব্যক্তি ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কতকগুলি কুকি সংগ্রহ করিয়া, খণ্ডলের অন্তর্গত একখানি গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ সমবেত হইয়া, ত্রিপুরা রাজ্য ও শ্রীহট্ট জিলার সীমান্ত দেশে প্রায় দেড় শত লোকের প্রাণ বিনাশ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। এই ঘটনার প্রতিবিধান জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ত্রিপুর রাজ্যের পক্ষ হইতে গবর্ণমেণ্টকে জানান হইল যে, এই হত্যাকাণ্ড ত্রিপুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ঘটিয়াছে, সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহেন। এই কথা লইয়া কিছুকাল তর্ক বিতর্কের পর, লেপ্টেনেণ্ট ফিসারের কৃত মানচিত্র অবলম্বনে ঘটনাস্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হইল এবং গবর্ণমেণ্ট স্বীয় সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বহু সংখ্যক কুকি সমবেত হইয়া, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলস্থিত বৃটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, অনেকগুলি লোকের জীবন বিনাশ ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময়ে কতকগুলি লোককে কুকিগণ গ্রেপ্তার করিয়া আপনাদের আবাস স্থানে লইয়া যায়।

কুকিগণ উপর্য্যুপরি অত্যাচার করায় তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কর্ণেল লেষ্টার কাছাড় হইতে সসৈন্যে কুকিদিগের আবাস ভূমির দিকে যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বদিকে বৃহৎ একদল কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে, এবং আর এক দল কুকি শ্রীহট্টের লাতু থানার অন্তর্গত স্থানে প্রবেশ করিয়া, নরহত্যা, গৃহ দাহ ও লুণ্ঠনাদি দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারকারী ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল।

যথা সময়ে কর্ণেল লেষ্টার কুকিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এ যাত্রায় তিনি খ্যাতনামা কুকি সরদার সুকপই লালকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রায় দশবৎসর কাল কুকিগণ কোন প্রকার অশান্তিজনক ঘটনার সংঘটন করে নাই। তথাপিও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইহার পর সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে সেনানিবাস-সংস্থাপন ও চট্টগ্রাম-পার্ব্বত্য জেলা (Chittagong Hill Tract) স্থাপন করিয়া, তথায় এক জন ইংরেজ সুপারিটেণ্ডেণ্টের নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা কুকিগণ কিয়ৎপরিমাণে দমিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

* কৈলাস বাবুর রাজমালা—৩য় ভাঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৩৫৭ পৃঃ।

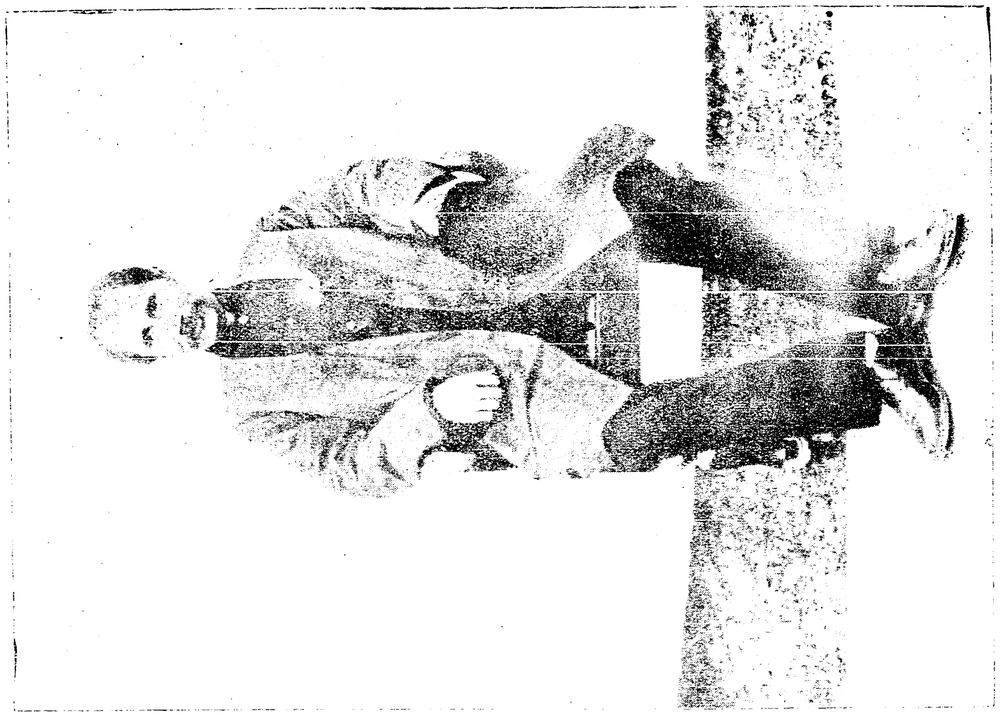

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত মৌলবী মীর মশরফ্ হোসেন।

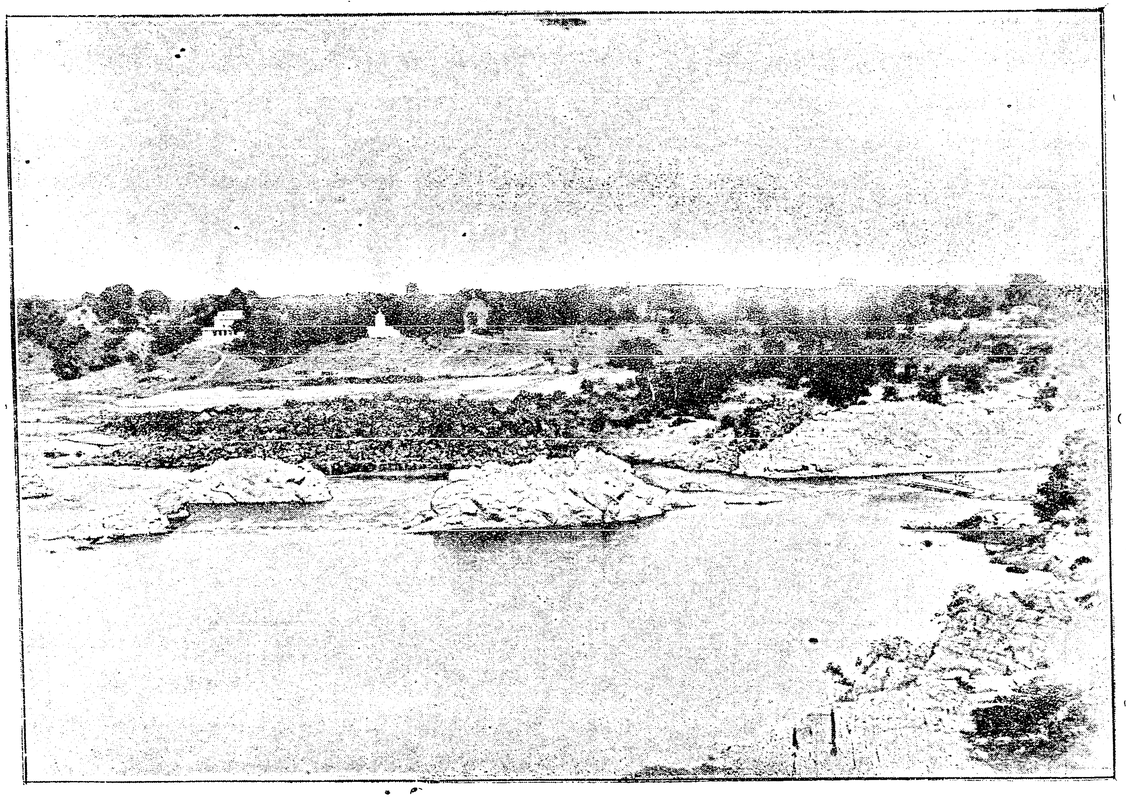

পঞ্চবটী পাহাড়।

কংগ্রেস।

অট্টালিকার ভূগর্ভস্থ 'বনিয়াদ'—দেশের বিপুলকায় 'কৃষিবল' এবং তদনুরূপ ও তদানুষঙ্গিক, অতি বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড শক্তি-সঞ্জাত নিম্নতর ও নিম্নতম সমাজ,—জীবের জীবন ধারণোপযোগী ও বাণিজ্যের বিনিময়োপযোগী দ্রব্য-জাতের জনয়িতা শারীরিক শ্রম, তাহার উপর, যে একমাত্র সর্ব্বাদ্য বনিয়াদের উপর, যন্ত্র-শক্তি ও শিল্পবল-বিরহিত এই বিরাট ভারতভূমি, তাঁহার ত্রিশ কোটী অন্নক্লিষ্ট প্রাণী সহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ও আনুষঙ্গিক ধারণাবলম্বনের অভাবে নিয়ত থর থর কাঁপিতেছেন ;—সেই নিম্নতর নিম্নতম অথচ দেশের একমাত্র নির্ভর ভিত্তি—অসীম লোক পারাবার, চির অজ্ঞানান্ধকারের যথাবৎ গাঢ় তামসাভ্যন্তরে রাখিয়া, তাহার কোনও এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ভগ্নাংশ মধ্যেও এক বিন্দু আলোক-রশ্মি প্রবিষ্ট বা প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া, স্বায়ত্ত শাসনাধিকার বা দাসত্ব-বিরহিত আত্মদর্শী মানবাধিকারের একটী অক্ষরও তাহাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত বা নিক্ষিপ্ত করার উপায় উপলক্ষ চিন্তা না করিয়া, এক কথায় প্রকৃত দেশ—দেশের বিশাল দেহ, সাফ্ পশ্চাতে ফেলিয়া ; পরন্তু, ঐ সকল স্তরের অব্যবহিত উর্দ্ধ, উর্দ্ধতন স্তরনিচয় ও তদুপরি অবস্থিত শিক্ষালোকস্থবিবর্জ্জিত বা কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষালোক-প্রাপ্ত মধ্য বা নিম্ন-মধ্য সমাজের অসংখ্য লোকপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া, তাহাদের অস্তিত্বই উপেক্ষা করিয়া, ইংরেজী অনভিজ্ঞ অথচ দেশীয় বহু বিদ্যায় বিশারদ, ভারত সমাজের সনাতন ব্যবস্থাপক শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রেণী গণনার মধ্যে না আনিয়া, উচ্চাদপি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত কতকগুলি লোক এবং বিত্তবৈভবশালী কতকগুলি লোকের সমষ্টিতে কংগ্রেস গঠিত হইলেন। এবং কখনও সমগ্র দেশের প্রতিনিধি এবং কখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া আত্ম পরিচয় দিলেন ও সেই পরিচয়ে, রাজদ্বারে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ও নানা বিভাগে শাসন-সংস্কার প্রার্থনা করিলেন। গত ষোল বৎসর কাল এই প্রার্থনা উক্ত পুনরুক্ত করিয়া আসিতেছেন; উপস্থিত সপ্তদশ অধিবেশনে তাহাই করিলেন। ইহার ফল যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বিদ্যমানই আছে ; এবং তদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, ফল ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।

কঙ্গ্রেস উহার উপস্থিত গঠনে, প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রতিনিধিত্ব কি পরিমাণে বহন করে, আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে, কঙ্গ্রেসকে, যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রচলিত নিম্ন লিখিত প্রাচীন শ্লোকার্দ্ধটীতে প্রকাশিত হইবে ;—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো নচ খণ্ড ন অংশ চ"

গবর্ণমেণ্টের ধারণা, যেমন কংগ্রেসের প্রতি ব্যবহার করেন, তদ্রূপ কংগ্রেসের কথায় কর্ণপাত করেন। অতি শক্তিশালী যথেচ্ছাচারী রাজশাসনের পক্ষে, প্রজাশক্তির পূর্ণ প্রতিধ্বনিই যখন প্রায় "কিছুই নয়" তখন উহার ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি, একেবারেই কিছু নয়, অতএব অগ্রাহ্য ইহা আর আশ্চর্য্য কি! কামান সঙ্গীনের সটান শাসন-প্রথা সত্ত্বেও, যে নিম্নতর শ্রেণী-নিচয়ের চঞ্চলতা সংঘটন স্বভাবতঃ গবর্ণমেণ্টের তবুও কিঞ্চিৎ চিন্তার উদ্রেক করে, তাহা কঙ্গ্রেসের মধ্যে, নিম্নে, মূলে নাই, গবর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস। কঙ্গ্রেসের নিম্নতলে কিছুই নাই, কঙ্গ্রেস আকাশের উপর গঠিত, গবর্ণমেণ্টের ইহা দৃঢ় ধারণা। এ ধারণা অমূলকও নহে। প্রত্যুত, এসম্বন্ধে যাহা অমূলক গবর্ণমেণ্টের তাহাতেও কোন্ আস্থা না আছে? এখনকার সুদক্ষ ও সহৃদয় রাজপ্রতিনিধি স্বয়ং লর্ড কুর্জ্জন নাকি বলেন "Oh! the congress-men! they are not in a position to speak for the masses, they have no sympathy for them. They know them very little.

পরন্তু, ষ্টেট সেক্রেটারির নাকি ধারণা যে, কংগ্রেসওয়ালারা কুসীদজীবী এবং রায়ত সাধারণের শোণিতশোষক। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের দিক দিয়া, সহজে স্বায়ত্ত শাসনাগম,—প্রতিনিধি প্রথার বা প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের প্রাপ্তি কত দূর সম্ভব, তাহার প্রত্যাশা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা দেশের সর্ব্বোচ্চ চিন্তাশীল ও সুমহৎ মস্তিষ্কনিচয়ের সমষ্টি কংগ্রেস অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। তথাচ যে স্বায়ত্ত শাসনের ছায়া-শরীরের এক আধ কণা—ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ও নির্ব্বাচন প্রণালীর যৎসামান্য অংশ দেশীয়-দিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহাই হউক, কংগ্রেসেরই সাধনাসঞ্জাত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক দিকে অবস্থা এই। গবর্ণমেণ্ট স্বভাবতই স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দিতে অসম্মত; যৎসামান্য যেটুকু দিয়াছেন তাহাও অল্পাধিক খর্ব্ব করিয়াছেন ও দিন দিন সে দিকেই প্রবলতা দেখাইতেছেন। কিন্তু অপর দিকে, এ সম্বন্ধে দেশের অবস্থা কি? আপামর সাধারণ এই "স্বায়ত্ত শাসনরূপ" "দিল্লীকা লাড্ডু" আসলেই কি "চিজ্" একেবারেই চিনে না; চৌকিদারি পঞ্চায়েতের ব্যাপারে বাধিয়া বেচারীরা বিপদেই পড়িয়াছে। কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্স কোনও দিন, "ঐ চিজ্"টা তাহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য চেষ্টাও করেন নাই। পঞ্চায়েতি প্রপঞ্চেও কখনও তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়ান নাই। কাযেই, অশিক্ষিত জন সাধারণ ও গ্রাম্য "পঞ্চ"গণ স্বায়ত্ত-শাসন-শিশু-শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণ বোধ-হীন। যে ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য হৃদয়ে এবৃত্তির বিকাশ হয় ও বন্ধন হয় তাহা হইতে আপামর সাধারণ খুবই দূরে রহিয়াছে। কিন্তু, কংগ্রেস যে শিক্ষিত সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ, যে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য স্বায়ত্ত শাসনের কামনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই যে বিষয়টী বুঝেননা বা বিপরীত বুঝেন; তাঁহাদের অনেকেই যে স্বায়ত্ত শাসন নির্ব্বাচনাধিকারের বিরোধী; কংগ্রেস তাহার কি বলিবেন? এমনও এক শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহাদের বিবেচনায় স্বায়ত্ত শাসন "অনাহারী" ব্যাপার, উহা কেবল ঘরের খাইয়া বেগার খাটা; বিনা বেতনে ফাঁকি দিয়া কাজ লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত শাসনের ফন্দী করিয়াছেন। পরন্তু, স্বায়ত্ত শাসন ও নির্ব্বাচন-প্রথা জাতিনাশা কল, উঁচু নিচু, বামুন মুচি সব একাকার করিবার সৃষ্টি, এরূপ অভিমত নেহাত অশিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হয় নাই; উহাও শিক্ষিত শ্রেণী বিশেষের মত বটে। পুনশ্চ, ইহাও আমরা বহু শিক্ষিত জনের মুখেই শুনিয়া থাকি এবং ইহা দেশের বহুব্যাপ্ত সংবাদপত্রে, সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রকটিত হইয়া, সহস্র সহস্র শিক্ষিত অশিক্ষিত পঠনক্ষম লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকে যে, স্বায়ত্ত শাসন ও নির্ব্বাচন রাজনীতি দ্বারা, দেশে কেবল অনিষ্ট ও অমঙ্গলেরই সৃষ্টি হইয়াছে। বিসম্বাদ বাড়িয়াছে, আত্ম-কলহের সৃষ্টি হইয়াছে, চাতুরী প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, তোষামোদ, উৎকোচের আদান প্রদান ও আরও অনেক দুর্নীতি-স্রোত দেশ মধ্যে খর প্রবাহিত হইয়া ঐ প্রথার অনিষ্টকারিতার পরিচয় দিতেছে ইত্যাদি।

এখন দেখুন, যে দেশে স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে, শিক্ষিতেরও ঐরূপ ভ্রম এবং অসংখ্য অশিক্ষিত সম্প্রদায় উহা অপেক্ষাও অধিকতর ভ্রান্ত সংস্কার পোষণ করে; পরন্তু, শিক্ষিত বা অশিক্ষিতই হউক অব্যবহিত ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধ বই "সাধারণ" বলিয়া একটা ব্যাপার, ও তাহা সম্পাদনার্থে স্ব স্ব কর্ত্তব্যাংশ প্রায়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না; হয়ত উহা হইতে একেবারেই দূরে থাকে, সহজে উহাতে লিপ্ত হইতে চাহে না, অথবা কেবল স্ব স্ব ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদ্দেশেই লিপ্ত হয়, এবং লিপ্ত হইয়া তাহারই অনুসরণে সাধারণের স্বার্থ সঙ্কোচ বা লোপ করিয়া, স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার উপর কলঙ্ক আরোপ করিবার নানা কারণ সংঘটন করে;—যে দেশে সাধারণতঃ অবস্থা এই, সে দেশ স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত হইয়াছে এবং ঐ মহা ইষ্টকর মনুষ্যোচিত অধিকার লাভের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষী হইয়াছে, কিরূপে বলিব? যাহা ঘটনা, তাহা উপেক্ষা করা উচিত হয় না। ঘটনা ঘটনাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রতিকারের উপায় বিধান করাই কর্ত্তব্য। সাধারণ অভিমত যতই ভ্রান্ত, যতই অসার হউক না, তাহা দ্বারা যখন জন সাধারণের চিত্ত আন্দোলিত ও বিচলিত হইতে থাকে ও তাহাতে করিয়া দেশের প্রকৃত হিতকর অনুষ্ঠানে লোকের অনাস্থা ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন তাহাতে কর্ণপাত না করা, তাহা আদৌ উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা করা, এবং অবস্থানুসারে অতি ধীর ভাবে তাহার কোনও না কোনও প্রতিকারের চেষ্টা না করা, সাধারণ স্বার্থের স্বনিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক, স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণের উপযুক্ত হয় না। দেশেরই দুর্ভাগ্য যে, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স নিচয়, বিশেষতঃ শেষোক্ত স্থানীয় সমিতি সকল অনবধানতা, ঔদাসীন্য বা অন্য যে কোনও কারণ পরম্পরাতেই হউক, এই সকল এবং এবম্বিধ বিষয় নিচয়ে আদৌ লক্ষ্য করিতেছেন না। অনেক সময়ে আমরা ভ্রান্তি বশতঃই কনফারেন্সের করণীয় কার্য্যের ত্রুটির জন্য কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়া থাকি। সেটা কেবল অন্যায় নয়, বিলক্ষণ অনিষ্টকর। কনফারেন্স নিচয়েরই অনিবার্য্য কর্ত্তব্য স্ব স্ব অধিকার, অল্পে অল্পে, আত্মশাসনের উপযোগী করিয়া তুলা, উহার সারত্ব ফলোপদায়কতা, ইষ্টকারিতা, একান্ত আবশ্যকতা ও বিশুদ্ধি-প্রয়োজনিয়তাদির বিষয়, নানা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, জন সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া। তদ্বারা অজ্ঞতার ঘন অন্ধকার ক্রমে ক্রমে, কতকটা শাফ হইয়া, লোক সাধারণের চিত্তে, যথা সম্ভব সমষ্টিত "সাধারণ" স্বার্থের প্রকৃত অনুভূতি ও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমবেত বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত চেষ্টায়, তাহার সাধনের একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে, অল্পাধিক একটা জ্ঞান ও সাধারণ কার্য্য উদ্ধারের একটা অকৃত্রিম উৎসাহ জন্মিয়া, দেশ যথা সম্ভব স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগী না হইলে এবং স্বায়ত্ত শাসনাধিকার কেবল অতীব ইষ্টকর নয়, সবিশেষ সম্ভ্রমকর, সাধারণ্যে এই ধারণা না জন্মিলে, বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেস ও কনফারেন্সের প্রায় কোন উদ্যমই ফলপ্রদ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবার খুব কমই আশা করা যাইতে পারে। কাজটা যতই জটিল, কঠিন ও সুসাধন অসম্ভাব্য বলিয়াই প্রথমতঃ অনুভূত হউক, প্রকৃত পক্ষে, ততটা অসাধ্য হইবে না। কার্য্যক্ষেত্রে "হাতে হেতেরে" উপস্থিত হইলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। এই ষোল বৎসর কাল এ বিষয়ে কিছু কিছু কার্য্য হইয়া থাকিলেও, মনে করুন, ঐ কার্য্য আজ কত দূর অগ্রসর হইত। একমাত্র ইংরাজী ভাষা ভিন্ন দেশীয় ভাষা সকলের সহিত কংগ্রেস কনফারেন্সের একেবারেই সংস্রব নাই বলিলেই চলে, ইহা অপেক্ষা অভাগ্য ও অকার্য্য-নীতি আর কিছুই হইতে পারে না। দেশীয় ভাষার আশ্রয় অবিচলিত ও অবিশ্রান্ত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে; তদ্বারা নিয়তই কংগ্রেস-নীতি কংগ্রেসের শিক্ষা প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে প্রেরিত ও প্রচারিত করিতে হইবে। রাজনীতি ও প্রজানীতি, স্বায়ত্ত শাসন, নির্ব্বাচন, গ্রাম্যপঞ্চ, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট ও মিউসিপাল-বোর্ড, ক্রমে ক্রমে স্থানীয় ও সুপ্রিম কৌন্সিলাদির কথা, সাধারণ কার্য্য পরিচালন-প্রথা-প্রণালী বিষয়ক শিক্ষা,—মূল সূত্র,—"কখ" হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। অতি সহজ ও সরল, এমন কি গ্রাম্য ভাষায় চিত্তাকর্ষক করিয়া ও নিত্য পরিদৃষ্ট বিষয় ও লোকব্যবহার হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া, শিক্ষা বিধান করা চাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, বক্তৃতা কথোপকথন লিপি, ইত্যাদি দ্বারা নিয়মিত ভাবে, ও বিষয়ের একই অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থিত, ক্রমবর্দ্ধনশীলতার পর্য্যায়ে, শিক্ষা সঞ্চালিত করিতে হইবে। গ্রাম্য পাঠশালা, স্কুল, টোল, হাট, নিমন্ত্রণ সভা, দেবালয় মশজিদ প্রভৃতি লোক সাধারণের সমাগমের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ও বৈঠকে বক্তৃতা, কথোপকথন, পাঠ, আলাপ ও আলোচনার ব্যবস্থা দ্বারা এ শিক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে, মফঃস্বলের অতি অপরিচিত পল্লী সকল মধ্যেও প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে। প্রত্যেক কনফারেন্সের অধীনস্থ এলাকা মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক, প্রথমতঃ পরীক্ষা স্বরূপ না হয়, অল্প সংখ্যক প্রচারক, শিক্ষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া ও স্থানে স্থানে অবকাশ-যুক্ত ও অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিত ও সাধারণ-হিত-রত, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও সহৃদয় ব্যক্তি সকলকে অবৈতনিক এজেণ্ট বা সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা অল্পে অল্পে, কার্য্য পরিচালনা করা যাইতে পারে। পরন্তু ইঁহাদের দ্বারা কঙ্গ্রেস ও কনফারেন্স দেশের আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা উপযুক্ত সময়ে আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কার্য্যে ব্যবহার ও প্রয়োগ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, এই সূত্রে, স্থানীয় অনেকানেক অভাব অভিযোগেরও প্রতিকার হইয়া ও নিত্য নৈমিত্তিক বহুব্যাপারে, স্থানীয় লোক সাধারণ সুমন্ত্রণা ও সৎপরামর্শাদি দ্বারা উপকৃত হইয়া, প্রকৃত পক্ষে ও প্রভূত পরিমাণে কঙ্গ্রেস ও কনফারেন্সের পক্ষপাতী হইয়া উঠে ও শত শত সহস্র সহস্র লোক, গ্রাম কি গ্রাম, মহকুমা—কি-মহকুমা স্থানীয় কনফারেন্স নিচয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই রূপে ক্রমে প্রত্যেক জেলায়, কনফারেন্সের নিজের অসংখ্য "পল্লী পঞ্চায়েত" গ্রাম্য সমিতি বা "ভিলেজ ইয়ুনিয়ন" ও তাহাদের উর্দ্ধতন পরিচালক ও পরিদর্শক সভা, মহকুমার ও জিলার ভিন্ন ভিন্ন সদর ও কেন্দ্র স্থলে সৃষ্ট ও গঠিত হইয়া প্রাদেশিক কনফারেন্সপুঞ্জও মূল কঙ্গ্রেসকে প্রকৃত বলে, বলীয়ান ও সংশয়মাত্র বিরহিত সুদৃঢ় ভিত্তি-স্থিত এমন এক সজীব, সক্ষম ও সমর্থ মহা-শক্তি-সমন্বিত করিতে পারে যাহাকে পৃথিবীর কোনও সভ্য রাজশক্তিই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এইরূপ হইলেই প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব, সম্যক ও অখণ্ড একতা ও স্বায়ত্ত শাসনের যথার্থ ভিত্তি স্থাপিত হয়, সে অধিকার অবশ্যম্ভাবী হইয়া তাহা প্রাপ্তির অধিক অবশিষ্ট থাকে না। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সসম্ভ্রমে সে অধিকার অর্পণ করিতে বাধ্য হইতে পারেন।

শিক্ষা প্রদান-স্থলের সর্ব্বাদ্য মূল গ্রাম ও পল্লী-হইতে, এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের সর্ব্বাদ্য অক্ষর,—কঙ্গ্রেস কথার

"ক, খ" হইতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। অন্যথা, আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা হয় না। আজ ১৬ বৎসর কঙ্গ্রেস হইয়াছে; কিন্তু এ যাবৎ কালের মধ্যে কঙ্গ্রেসের মূলতত্ত্ব বিষয়ক জন সাধারণের বোধ্য, শিক্ষিতব্য ও জ্ঞানগম্য কোনও পুস্তক পুস্তিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করেন নাই! স্বদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কঙ্গ্রেস বিষয়ক মূল তত্ত্ব বা কোনও বিবরণই সুচারু রূপে ও চিত্তাকর্ষক ভাবে লিখনক্ষম একটী শক্তিমান সুলেখক দেখা দেন নাই। কঙ্গ্রেস কনফারেন্স দেশীয় ভাষা হইতে, আপনাদিগকে একেবারেই দূরে রাখিয়াছেন; কাযেই ঐ দুয়ের একটীরও উৎপত্তি হয় নাই। যাহাহউক অতঃপর অবিলম্বেই "কংগ্রেস-শিক্ষা-প্রথম পাঠ্য পুস্তকাবলী" প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় প্রস্তুত হইয়া প্রদেশে প্রদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্ম কর্ম্ম বা লোক-নীতি সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিতব্য যে বিষয়ই হউক, প্রথম কল্পে, তাহার মূল তত্ত্ব বিজ্ঞাপক-সর্ব্বাদ্য সাহিত্য সর্ব্বলোক-বোধ্য জনসাধারণের ভাষায় সৃষ্ট হইয়া অবাধ প্রচারিত না হইলে, সে বিষয় কোনও কালে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয় না, পৃথিবীর সাধারণ অনুষ্ঠান মাত্রেরই ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, কঙ্গ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ গণের এ বিষয়টী ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখা বিধেয় হয়। কঙ্গ্রেস সম্বন্ধে অত্যুৎকৃষ্ট ইংরেজী রচনা বিস্তর দেখা যায়; কিন্তু, দেশীয় ভাষায় তাহার অতি ক্ষীণ অনুকরণও অদ্যাবধি একটীও দেখি নাই।

শুনিয়াছি কঙ্গ্রেসের বহু ও বিবিধ বিষয় সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, অবশ্য ইংরেজীতেই, উন্নত অঙ্গের মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য এবার বিশেষ বিশেষ সুলেখকগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে, কঙ্গ্রেসের ইষ্ট কল্পে, ইহা অতীব প্রশস্ত পন্থা। প্রবন্ধ রচনার্থে, যে সকল বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কঙ্গ্রেসের মূল তত্ত্ব শিক্ষার সোপান স্বরূপ প্রথম পাঠ্য পুস্তকাবলী প্রথম ইংরাজীতেই প্রস্তুত করিবার জন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হউক না; তাহা কঙ্গ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হইতে পারে। ইহা ভিন্ন প্রতি প্রদেশে, সেই প্রদেশের ভাষায় লিখিত ও চালিত কঙ্গ্রেসের নিজস্ব এক এক খানি সাপ্তাহিক, না হয়, অন্ততঃ মাসিক সংবাদ-পত্র থাকাএকান্ত প্রয়োজন। এ পক্ষেও এতাবৎকালের মধ্যে কোন চেষ্টা হয় নাই। ইদানীং এদেশে অসংখ্য সংবাদ পত্রের প্রচার সত্ত্বেও জন সাধারণের শিক্ষোপযোগী, বিশেষতঃ কঙ্গ্রেস ও রাজনীতির মৌলিক তত্ত্ব শিক্ষোপযোগী সারবান এবং যুগপৎ উপদেশ ও আমোদ-প্রদ সংবাদ-পত্র একটীও নাই। কঙ্গ্রেস পক্ষ হইতে অত্যল্প মূল্যে ঐ রূপ সাময়িক পত্র সকলের সৃষ্টি হইয়া অল্প মূল্যে ও স্থল বিশেষে বিনা মূল্যে ভূরি পরিমাণ প্রচারিত হইলে, কঙ্গ্রেস বিষয়ক জ্ঞান ও কঙ্গ্রেসের স্থানীয় প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই অতি বেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পুস্তক পুস্তিকা প্রথমতঃ বিনা মূল্যে বা অত্যল্প "মিশনরী" মূল্যে লক্ষ লক্ষ বিতরিত হওয়া বিধেয়।

এই সকল বিষয়ের যে ব্যয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে কঙ্গ্রেসের যথার্থ ও ন্যায্য করণীয় কার্য্যের খাঁটী ব্যয়; পরন্তু, উহা উৎপন্নক্ষম, আয়জনক ও সর্ব্বোতোভাবে ইষ্টকর ব্যয়। এ ব্যয়ের দন্তি ক্রান্তি মাত্রও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইবার নহে। পুনশ্চ, এ ব্যয়ও যে একেবারে পাহাড় পর্ব্বত পরিমাণ ব্যয় তাহাও নয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য দশ হাজার টাকা, অন্ততঃ পাঁচ ছয় হাজার করিয়া টাকা বরাদ্দ করিয়া, পরীক্ষাস্বরূপ দেখাই হউক না ফল কিরূপ হয়।

কিন্তু হায়! সপ্তদশ কঙ্গ্রেসাধিবেশনে এ পক্ষে, কার্য্যতঃ কি হইল!! এই প্রবন্ধ লিখিয়া প্রেসে পাঠাইবার পর উক্ত অধিবেশনে কি ব্যাপার—কি বিষম বিসদৃশ ব্যবস্থা লোকে দেখিল এবং দেখিয়া বিবেকী মাত্রেই-অসীম বিস্মিত ও নিরতিশয় নিরাশ হইল! কঙ্গ্রেসের দুই তিনটী মাত্র কর্ত্তাব্যক্তির ব্যক্তিগত উপরোধে ও জিদে, কঙ্গ্রেস বিষয়ে বিলাতবাসীর শিক্ষা বিস্তার ও "ইণ্ডিয়া" নামক বিলাতী ইংরেজী, সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের একবৎসরের ব্যয়ার্থে প্রায় একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইল। কিন্তু, সে বিষয়ে এদেশে এ দেশীয় লোকের যৎসামান্য শিক্ষাদি উপলক্ষে একটী পয়সা ব্যয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। সে কথাটাই একেবারে উঠিল না। এ ব্যাপারকে—এ ব্যবস্থাকে কি বলিবেন বলুন দেখি! বড়লোকের বড় কথায় আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর কোন কথা কহা হয়ত বেআদবি বা বাতুলতা বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু, উহা কি যথার্থই আত্মঘাতী কার্য্য নয়? উহা দেখিয়া, উহা ভাবিয়া, আন্তরিক ভাবে কঙ্গ্রেসানুরাগী লোকের বুকের রক্ত শুকাইয়া যায় না

ও চিত্তে একটা অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না? আর ঐ কথাটা কি সমগ্র কঙ্গ্রেসের বা কঙ্গ্রেসের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক প্রতিনিধি ও কর্ত্তৃত্ব স্থানীয় বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছার অভিমতে ও অনুমোদনে করা হইয়াছে? না তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কয়েকটী মাত্র লোকের ব্যক্তিগত শক্তি ও সুবিধার সুযোগ লইয়া করা হইয়াছে? পরন্তু, অপরাপর আরও কয়েকটী অন্যায় ও অল্প সংখ্যকের আত্মস্বার্থ-পোষক এবং বহুসংখ্যক বিশিষ্ট প্রতিনিধির প্রতিকূল প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠান পন্থার প্রতিকূল কার্য্যের ন্যায়, ঐ কার্য্যেও কি কঙ্গ্রেস মণ্ডলীর মধ্যে একটা মহা মনোমালিন্য, মনোবাদ ও বিচ্ছেদ সংঘটন ও পরিবর্দ্ধন করে নাই। এবারের কঙ্গ্রেসঅধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের বিবাদের উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের প্রথমাংশের আরম্ভেই আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য সবিশেষ সতর্কতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহারের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়া কঙ্গ্রেস মণ্ডলীতে বিবাদ ও বিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছে। ঐ কয় ছত্র লিখিবার সময়ে আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমাদের লিপি-অঙ্কিত মসি শুষ্ক হইতে না হইতেই, সপ্তাহ মধ্যে ঐরূপ সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিবে। বস্তুতই এ দুর্ভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভাবিলে, এবং দেশের আশা ভরসা স্থল বড়লোকদের মতি গতি ও কার্য্য রীতি চিন্তিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

যাহা হউক, ঐ সকল অত্যাবশ্যকীয় জীবন-মরণ অনুষ্ঠানের কিছুই না করিয়া, একমাত্র ইংরেজী ভাষা বুকে ও ইংরেজী "স্পিচ" মুখে করিয়া এবং কেবলমাত্র বিলাতি আন্দোলন বিলাতি রোদন বিলাতে বিলাতি লোকের "কাঙ্গ্রেসিক শিক্ষা" সাধন এবং বিলাতে সংবাদপত্র প্রচারকরণ দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে অবধারিত ভাবিয়া, দেশের লোকের নিকট না ঘেঁসিয়া, তাহাদের শিক্ষার্থে কপদ্দক ব্যয় না করিয়া ও সংগৃহীত অর্থের প্রত্যেক পাই বিলাতের ব্যবহারার্থে বৎসর বৎসর বিলাতে পাঠাইয়া দিয়া ও বিলাতমাত্র সার বুঝিয়া, কঙ্গ্রেস ও কনফারেন্স যদি হিমাচলবৎ অনড়ভাবে হজরৎ মহম্মদের ন্যায়, পর্ব্বতাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন, মহম্মদ নিজে পর্ব্বতের নিকটে না যান, তবে অন্ততঃ প্রথমতঃ পর্ব্বত নিজে পা চালাইয়া কখনই মহম্মদের মসজীদে আসিয়া কুর্ণিশ্ করিবে না; ইহা নিশ্চয়। কাযেই "যথা পূর্ব্ব তথা পর"। কঙ্গ্রেস কনফারেন্স লোক সাধারণের কাছে যেমন অজ্ঞাত ও অপরিচিত আছেন, তেমনি চিরকাল থাকিবেন, একান্তই যদি আরও কতক কাল মধ্যে আত্ম-ক্লান্ত হইয়া, ভবলীলা বা ভারতলীলা সম্বরণ না করেন!

উপস্থিত সপ্তদশ অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেসের অভিনব এক আনুষঙ্গিক অঙ্গ "শিল্প প্রদর্শনীর" অনুষ্ঠান হইয়াছে, ইহা অতীব উপযুক্ত। এবং কাংগ্রেসিক লোকনীতির যথার্থই এক অতি বিশিষ্ট, পরিপক্ক ও সমীচিন অভিব্যক্তির পরিচায়ক। ইহাতে দূরদর্শন ও সূক্ষ্মদর্শন উভয়ই যুগপৎ বিদ্যমান আমরা দেখিতে পাইতেছি। এবং এরূপ রাজনীতিনিরপেক্ষ উচ্চস্তর ও সমাজের নিম্নস্তর আকর্ষক অনুষ্ঠান এতাবৎ কেন হয় নাই বলিয়া বিস্মিত এবং আদৌ হয় নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। এই শিল্প প্রদর্শনী কেবল "শিল্প প্রদর্শনী" বলিয়া আমরা ইহার এত পক্ষপাত প্রকাশ ও প্রশংসা ঘোষণা করিতেছি না। শিল্পপ্রদর্শনীর যতটা উপকার তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক উপকারের গুরুভার ইহার আছে। "শিল্প প্রদর্শনীর ন্যায় 'কৃষিপ্রদর্শনী" কংগ্রেসের অঙ্গ ও প্রত্যেক কনফারেন্সের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানাধীন করিয়া দিলে, আরও অধিক উপকার হইবে। এতদ্দ্বারা ত্রিবিধ মহৎ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর দ্বারা প্রথমতঃ দেশের মৃতপ্রায় ও উৎসাহ উদ্দীপনামাত্রবঞ্চিত শিল্প, অত্যাবশ্যকীয় বা জীবন ধারণের অনিবার্য্য ও নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুজাত উৎপাদক শিল্প ও অল্পাধিক জীবনীশক্তি উত্তেজনা লাভ করিয়াও য়ুরোপীয় উদ্ভাবনের অভিনব উপায় ও কার্য্যকৌশলাদি শিক্ষা করিয়া, পুনঃ সজীব ও জাগ্রত হইতে পারে, এবং কার্য্যকারিতায় অপেক্ষাকৃত একটু অধিক ক্ষিপ্রতাযুক্ত হইয়া যন্ত্রজাত দ্রব্যের সহিত, সম্যক না হউক, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও প্রতিযোগিতা করিয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। পরন্তু চিরাবনত ও কার্য্য-বিধানের একই সঙ্কীর্ণ কারাগারে স্মরণাতীত কাল আবদ্ধ, দেশের জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল কৃষি বল, অল্পাধিক উত্তেজনা উদ্দীপনা প্রাপ্ত হইয়া, কিছু না কিছু পুষ্ট হওয়া খুব সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এই দুই

(এখন এক) অনুষ্ঠান কংগ্রেসের এই বিশেষ বিভাগে, বিদেশীয় ও স্বদেশীয় এমন সব কৃতী উচ্চপদস্থ, অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী বিশেষবিদ্‌ব্যক্তিদিগকে—শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর য়ুরোপীয় ধনবান্ ও প্রভূত বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগকে, আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সৎপরামর্শ ও সহায়তা পাইয়া সবিশেষ উপকৃত হইতে পারে, যাঁহারা কংগ্রেস রাজনীতির প্রতিকূল বা কার্য্যগতিকে তাহার সহিত আত্ম-একত্ব স্থাপিত করিতে অপারগ। তৃতীয়তঃ ও সর্ব্বোপরি এই ও এবম্বিধ অনুষ্ঠান, কংগ্রেসের যাহা মজ্জাগত উদ্দেশ্য, মর্ম্মস্থলের প্রধান উত্তেজনা তাহার সাফল্য কল্পে সবিশেষ সহায় ও সমর্থক হওয়ার সম্ভাবনা। কেন না ইহাতেও বৎসরে একবার করিয়া, নিম্নতর ও অশিক্ষিত স্তরের লোক—কারিকর ও কৃষক শ্রেণীর লোক সকল কংগ্রেসের সংস্পর্শে, সংস্রবে ও সংসর্গে আসিবে কংগ্রেসকে চিনিবে, কংগ্রেস মূলতঃ কি বস্তু, তাহা বুঝিবে, এবং ক্রমে কংগ্রেসের আশ্রয় পাইয়া ও কংগ্রেসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া আপনাদের নিজের ও স্ব স্ব শ্রেণীর ও সম্প্রদায়স্থ লোকের উপকার করিতে পারিবে ও তাহাদিগকে একে একে আকৃষ্ট করিবে। কঙ্গ্রেসও এইরূপে তাহাদিগকে চিনিবেন এবং তাহাদের প্রকৃত অভাব অভিযোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুঝিবেন; পরন্তু উভয়ের পরস্পরের অত্যুন্নত নিম্ন চিত্তের চিন্তা রাশির আদান প্রদানে উভয় পক্ষেই লাভবান হইবেন। এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে তখন, আমরা প্রকৃত কারিকর প্রতিনিধি ও যথার্থ কৃষক প্রতিনিধি, কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত দেখিলেও দেখিতে পারি।

প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ বিভাগ সৃষ্ট ও বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়া, তৎপরতার সহিত সম্বৎসর কাল ব্যাপিয়া কার্য্য হওয়া আবশ্যক।

আমরা উপরে একরূপ উল্লেখ করিয়াছি, কংগ্রেসের ২য় উদ্দেশ্য "স্বায়ত্তশাসনাধিকার" সাধনার পথে কংগ্রেস কি পরিমাণ কার্য্য করিয়াছেন, কি পরিমাণ সফলতা লাভ করিয়াছেন! তাঁহার সফলতা ব্যবস্থাপক সভানিচয়ের পূর্ব্বসংহিতা সকলের সংস্কার, এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নির্ব্বাচিত সদস্যের আহ্বান; পরন্তু, গবর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত বিধিব্যবস্থাদির সম্বন্ধে আলোচনা করা ও অভিমত দেওয়ার অধিকার সেওয়ায়, সাধারণতঃ শাসন কার্য্য ও বজেটের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্নাধিকার। অপিচ, কোনও নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন কল্পে, বা পুরাতন আইনের সংস্কার কল্পে পাণ্ডুলেখ্য উপেক্ষিত করার অধিকারও নির্ব্বাচিত সদস্যগণের আছে। গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া জয়ী হইবার সম্ভাবনা ইহাদের কোনও কালে নাই, সরকার পক্ষকে ভোটসংখ্যায় অন্ততঃ সংখ্যা দ্বারাও অতিক্রম করিবার অবসরও ইহাদের খুব কম ঘটে, প্রায়ই ঘটে না। তথায় বিধিব্যবস্থার কোন ধারা উপধারা "রদ্" করিবার বা "বহাল" রাখিবার ক্ষমতাও ইহাদের অতিনির্দ্দিষ্ট শক্তির অতীত, পরন্তু তাহার সংস্কার সংশোধন কল্পে ইহাদের কৃত প্রস্তাব ও প্রার্থনাও খুব কমই রক্ষিত হয় বা হয়ই না; তথাচ ইহাদের স্বাধীন বাদ প্রতিবাদ আলোচনা অভিমতাদি কৌন্সিল গৃহের বায়ু অনেকটা স্বাস্থ্যকর ও সংস্কৃত রাখে এবং সময়ে সময়ে ইহাদের প্রস্তাবে প্রতিবাদে, বা সমর্থন সমন্বয়ে, আইন কানুনের এক আধ কণার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হইয়া, যাহা হউক কিছু না কিছু উপকার হয় ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

এই অধিকারের সূত্রপাত লর্ড ডাফ্‌রিন করেন, মৃত মহাত্মা মিঃ ব্রাডলর সবিশেষ সহায়তায় ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। যে দিক দিয়াই যাহা হউক উহা, যে কংগ্রেসেরই কার্য্যকারিতার ফল তাহাতে সন্দেহ নাই। সদস্য ও সভাপতি নির্ব্বাচনক্ষম মফস্বল ম্যুন্‌সিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কংগ্রেসের সহগামী বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থা। স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লর্ড রিপন ও লর্ড ডাফারিনের সময়েই যাহা কিঞ্চিত উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পর হইতে উহার উন্নতি মাত্র নাই; অবনতিই হইয়া চলিয়াছে।

এখন আমরা জন সাধারণ, ইহা অবশ্য স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এবং মুক্ত কণ্ঠে বলিতে বাধ্য যে, উহার অধিকাংশ কার্য্য এখনও অকৃত অসম্পাদিত ও অবাদ্ধ থাকিলেও কংগ্রেস তাহার দুই বিশাল উদ্দেশ্যের অন্ততঃ অনুপরমাণু, অন্ততঃ ক্রান্তি দন্তিও "আদায় দিয়াছেন"। যাহা দিয়াছেন এবং কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতি, পরিমাণ এবং মূল্য ও কংগ্রেসের অত্যল্প জীবন কাল ও নানা প্রতিকূল অবস্থার তুলনায়, উপেক্ষণায়ও নহে, অল্পও নহে। প্রত্যুত তাহা,—এপতিত নিদ্রিত জাতির পুনঃ জাগরণের

ও পুনরুত্থানের যদি এখনও কিছু আশা থাকে, তাহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। কংগ্রেস যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যে বিরাট ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় ষোল বৎসর কাল কিছুই নয়, অপার মহাসাগরে জল বুদ্বুদ মাত্র। পরন্তু, ঐ স্বল্প কালে যতটুকুই হউক সে মহৎ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাহার তুলনায় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা অতি তুচ্ছ যৎসামান্য মাত্র। আজ যে ঐ বাঁডন উদ্যানে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মধ্যদেশ, উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, বিহার, উৎকল এবং বঙ্গদেশ—আর্য্যাবর্ত্ত দক্ষিণাপথের, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভ্রাতৃগণ একত্রিত হইয়া আলিঙ্গন ও হস্ত মর্দ্দন করিতেছন, উহার জন্য—কেবল উহার জন্য লক্ষ স্বর্ণ ব্যয়িত হইলেও সে অতি সামান্য,—কারণ এই সংঘটন, এই সংমিলন শত শত লক্ষ স্বর্ণ-প্রসূ!

সমাপ্ত

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

ভূমণ্ডলের ভবিষ্যৎ।

(জ্যোতির্ব্বিদের দিবাস্বপ্ন।)

ক্যামিলে ফ্ল্যামেরিয়ন ফরাসিরাজ্যের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি জন্মিয়াছেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে; ১৮৫৮ অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া এখন চরমে উঠিয়াছে। গ্রন্থ তাঁহার অনেক। সকল গ্রন্থই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পরিপূর্ণ; তাঁহার গ্রন্থের আদরও সর্ব্বত্র। এই অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয়ও কিন্তু মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিভোর হইয়া স্বপ্ন দেখেন। পণ্ডিতের স্বপ্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিকের স্বপ্নে বিজ্ঞানের লীলা খেলা; স্বপ্নে সামঞ্জস্য আছে, বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণসম্বন্ধ ঠিক আছে, ব্যাপ্তি অব্যাপ্তির ভেদ আছে; বিজ্ঞানে যাহা ঘটিতে পারে, তাহাই আছে; যাহা না ঘটিতে পারে, তাহা নাই। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানময় স্বপ্নও সুতরাং অগ্রাহ্য নহে। আর আমাদের মত অবোধের পক্ষেত পণ্ডিতের প্রলাপও বেদ-বাক্য। অতএব, ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্যাসাগর ফ্ল্যামেরিয়নের ভবিষ্যদ্বাণী পাঠককে শোনাইতে বসিয়াছি। ১৮৯৩ সালের—জুলাই মাসে—"কস্‌মোপলিটান" নামক প্রসিদ্ধ সাময়িকে তিনি "আমাদের কি হইবে?" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই আভাস দিতেছি।

যাঁহারা মূল পড়িয়াছেন, এ আভাস তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত, যাঁহারা নাড়ী না ধরিয়া বড়ী না মাড়িয়া চিকিৎসক, যাঁহারা স্বভাবতই সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহারা না লিখিয়া লেখক, যাঁহারা সমাজের সব্-জান্‌তা সমালোচক, আমাদের এ আভাস তাঁহাদের জন্যও নহে। আমাদের আভাস আমাদের জন্য—যাঁহারা আমাদের মত তাঁহাদের জন্য। যাঁহারা জানিয়াও জানিতে কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে কাতর নহেন, সেই সকল মহাশয় পাঠকের জন্যই আমাদের প্রবন্ধ; আভাসে আয়াস তাঁহাদিগের জন্য।

মানবের ভবিষ্যৎ।

জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ন বিনা গণনায় কোন তথ্যে উপনীত হন নাই। ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় পৃথিবীর লোক-বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে অনুপাত দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই অনুপাতে নির্ভর করিয়াই ভবিষ্যৎ লোকবৃদ্ধিরও নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতেছেন, যখন ত্রিংশ শতাব্দী চলিতে আরম্ভ করিবে, তখন এই পৃথিবীতে মানবের সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। ফ্ল্যামেরিয়ন বলিতেছেন, "৩০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ২০১ কোটি লোকই ইংরেজিনবীশ হইবে। উহারা সকলেই ইংরেজি ভাষায় লিখিবে পড়িবে কথা কহিবে। কিন্তু তখনকার ইংরেজি ভাষায় গ্রীকমূলে উৎপন্ন শব্দেরই আধিক্য ও বাহুল্য হইবে।" পৃথিবীর লোকসংখ্যা এখন ১৫০ কোটি; দ্বৈগুণ্যে সেই হারে ৩০০০ খৃষ্টাব্দে ৩০০ কোটির কম হইবে না। ইহার ২০০ কোটি ইংরাজিনবীশ হইবে। ইহাই ফ্ল্যামেরিয়নের সিদ্ধান্ত।

শান্তির সাম্রাজ্য।

বিজ্ঞানমত্ত জ্যোতির্ব্বিশারদ জ্ঞানমুগ্ধ ফ্ল্যামেরিয়ন যুদ্ধ বিগ্রহাদি আসুরিক রাক্ষসিক ব্যাপারের বড় বিরোধী। জ্ঞানী

বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি সকল মহাপুরুষই যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোর বৈদ্বেষী। বিলাতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বুর-যুদ্ধের বিষম বিদ্বেষী। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ লকীয়ারও দার্শনিক স্পেন্সারের সহযোগী। ফ্ল্যামেরিয়ন হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বলিতেছেন :—

"অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না ; খৃষ্টীয় পঞ্চ-বিংশ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ তিরোহিত হইয়া যাইবে। অশান্তির পরাজয়ে শান্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

কিন্তু অশান্তির পরাজয় এবং শান্তির জয় কিরূপে হইবে? কোন্ জাতির বা কোন্ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় এ অসাধ্য সিদ্ধ হইবে? কোন্ কৃপাময় বা কৃপাময়ী এই পৃথিবীতে করুণার স্রোত প্রবাহিত করিবেন? দেব না দেবীর মাহাত্ম্যে এই মহাব্রতের প্রতিষ্ঠা হইবে?

দেবীর মাহাত্ম্যে।

মুশোফ্ল্যামেরীয়ন বলিতেছেন, রমণীরাই পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কার্য্যপ্রণালীরও তিনি আভাস দিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় বলিয়াছেন ;—

"যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-জনিত ধ্বংস কার্য্য এখন ক্রমাগত চলিবে। এ আসুরিক পৈশাচিক ব্যাপার কিছুদিন বরং অধিকতর প্রবল হইবে। সংখ্যাতত্ত্ব বিশারদেরা দেখিবেন, প্রতি শতাব্দীতে ৪ কোটি লোক যুদ্ধে মরিতেছে। হিসাব করিয়া দেখিবেন, প্রত্যহ ১১০০ লোক অবিরত যুদ্ধে প্রাণ দিতেছে। চতুর্ব্বিংশ শতাব্দীর মধ্যসময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৩৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিবে। ২৩৫০ খৃষ্টাব্দে পরি-বর্ত্তনের সূত্রপাত হইবে। চারিদিকেই সর্ব্বনাশ হইতেছে, যা পুত্র পৌত্রাদি অকালে অপঘাতে মরিতেছে, দেখিয়া, ইউ-রোপের যত জননীই একপ্রাণ হইয়া এক সভা করিবেন, একট দল বাঁধিবেন। সকলেই স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে যুদ্ধবিরাগে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করিবেন। যুদ্ধের ভীষণতা নিষ্ঠুরতা মহাপাপতা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া, সকল জননীই স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে— প্রধানতঃ স্বীয় কন্যাদিগকে—যুদ্ধ বিগ্র-হের ঘোর বিরোধিনী করিয়া তুলিবেন। শিক্ষার গুণে, এক পুরুষ যাইতে না যাইতে ইউরোপের যত যুবতী যুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকরা হইবেন। যুদ্ধের আসুরি-কতা এবং পৈশাচিকতা দেখিয়া সকল যুবতীই ভয়বিহ্বলা হইবেন। আপনারা ভয়বিহ্বলা হইয়া আর সকলকে ক্রমশঃ ভয়বিহ্বল করিতে থাকিবেন। এই বর্ব্বরতার তিরোভাব করিবার জন্য সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইবেন। যতদিন সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে বিরত না হইবেন, সৈন্যভঙ্গ এবং রণপোত ধ্বংস না করিবেন, তত দিন ইউরোপের রমণীরা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। রাজপুরুষ ও রাজ-মন্ত্রীরা—মহাসভার সভ্যেরা—কোন রাজ্যেই যুদ্ধত্যাগে সম্মত হইতেছেন না, দেখিয়া ইউরোপের যত যুবতীই প্রতিজ্ঞা করিবেন "যে পুরুষ অস্ত্র স্পর্শ করিবে, তাহাকে বিবাহ করিব না।"

থুবড়ো সৈনিক।

ইউরোপের যত যুবতীই প্রতিজ্ঞা করিবেন, সৈনিককে বিবাহ করিব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সকলেই দল বাঁধিবেন। দল ক্রমেই প্রবল হইবে। প্রতিজ্ঞাপালন উপলক্ষে প্রথমে অনেক যুবতীকে কষ্ট পাইতে হইবে ; সুরূপ সগুণ সৈনিক সেনানীকে ভাল বাসিয়াও অনেক যুবতী বিবাহে বঞ্চিত হইবেন ; কেহ কেহ প্রেমের টানে পড়িয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গও করিবেন। কিন্তু সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে—সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে—ক্রমে সকল যুবতীকেই প্রতিজ্ঞা পালনে কৃতসংকল্প থাকিতে হইবে। মনের টান, প্রাণের আকর্ষণ —অগ্রাহ্য করিয়া, সহস্র ক্লেশেও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সৈনিক পুরুষদিগের কিন্তু ক্লেশের অবধি থাকিবে না। সংসার তাঁহাদিগের পক্ষে অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে। জীবন তাঁহাদিগের বিড়ম্বনাময় হইবে। ক্রমে সৈনিক পুরুষদিগের ভিতরও যুদ্ধবিরাগও প্রবল হইয়া উঠিবে ; ক্রমে সার্ব্বজনিক যুদ্ধ বিদ্বেষই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবিবাহে পঞ্চবর্ষ।

রমণীদিগের প্রতিজ্ঞার পর প্রথম পাঁচ বৎসর বিবাহ বিভ্রাট ঘটিবে। সৈনিক-বিবাহ সংসার হইতে উঠিয়া যাইবে। সৈনিক-বিবাহের ব্যতিক্রমে এক প্রকার বিবাহেরই ব্যতিক্রম ঘটিবে। কেন না, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি সকল দেশের সকল পুরুষ পল্টনে নাম লেখাইতে বাধ্য। প্রয়োজনের সময়ে সকলেই যুদ্ধ করিতে বাধ্য। অর্থাৎ সকল সমর্থ পুরুষই সৈনিক পুরুষ। সৈনিক পুরু-

ষের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিলেই, সকল পুরুষেরই বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিবে। সুতরাং ইউরোপের সর্ব্বত্রই বিবাহ-বিভ্রাট ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। কিছু দিন রেষারেষি চলিবে ; পুরুষেরা প্রথম প্রথম কিছুতেই অস্ত্রত্যাগে বা যুদ্ধত্যাগে সম্মত হইতে চাহিবে না। কিন্তু রমণীরাও আপনাদের অটল নির্ব্বন্ধ আরও অটল করিয়া রাখিবেন। অগত্যা শেষে পুরুষদিগকেই গড়াইয়া পড়িতে হইবে। প্রেমের ফাঁশে—পরিণয়ের আশে—সকল পুরুষকেই রমণীদিগের পদানত হইতে হইবে ; সকলকেই যুদ্ধে বিরত হইতে হইবে। সুতরাং সকল রাজ্যেই যুদ্ধবিদ্বেষী পুরুষের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিবে। যুদ্ধবিরাগী পুরুষদিগেরও দল হইবে, সমিতি সভা হইবে। দল ক্রমে প্রবল হইবে, সমিতি সভাও ক্রমে বলবতী হইয়া উঠিবে। চারিদিকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা চলিবে। ইউরোপের যত সংবাদপত্রেই যুদ্ধের প্রতিকূলতা হইবে। সর্ব্বত্র সকল পার্লেমেণ্টেই ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের প্রতিবাদ চলিতে থাকিবে। সর্ব্বত্রই মহাসভার সভ্যদিগকে যুদ্ধদ্বেষী হইয়া উঠিতে হইবে। পাঁচ বৎসরেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে ; যুবতীদিগকে পাঁচ বৎসরের অধিক কাল প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। ২৩৫৫ খৃষ্টাব্দেই ইউ-রোপ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাইবে। আর, ইউরোপে উঠিলেই সর্ব্বত্র উঠিবে।

আমেরিকায়।

ফ্ল্যামেরীয়ন ১৮৯৩ অব্দে বলিয়াছিলেন ;—

"মার্কিণ রাজ্যে অনেক পূর্ব্বেই যুদ্ধ লোপ হইয়া যাইবে ; ২৩৫৩ অব্দের অনেক পূর্ব্বেই মার্কিণ রাজ্য যুদ্ধ বিগ্রহ একে-বারেই ভুলিয়া যাইবে। ২৩৫০ অব্দে যখন ইউরোপের রমণীরা সৈনিক-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন, সে সময়ে তাঁহারা পুরুষদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিতে পারিবেন,—

'আমরা সকলেই ইউরোপ ছাড়িয়া আমেরিকায় যাইব। সেখানে সৈনিক নাই, সেনানী নাই ; আমরা মার্কিণ পুরুষদিগের পাণিগ্রহণ করিব।'

কাজেই ইউরোপীয় পুরুষদিগকে, থুবড়ো থাকিবার ভয়ে, একান্তই নারীহীন হইয়া থাকিবার আশঙ্কায়, অন্ধকার দেখিতে হইবে ; অগত্যা যুদ্ধ বিগ্রহের বিরোধী হইতে হইবে।"

ফ্ল্যামেরীয়ন ১৮৯৩ সালে যখন ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তখন মার্কিণজাতি শান্তিরই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তখন স্পেনের সহিত মার্কিণের যুদ্ধ হয় নাই, তখন স্পেনের রাজ্য মার্কিণ কাড়িয়া লন নাই ; তখন মার্কিণের রাজ্যবৃদ্ধি-লালসা বলবতী হয় নাই ; তখন মার্কিণ পোত পল্টন বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণে বোধ হয় ফ্ল্যামেরীয়নকে মতান্তর করিতে হইবে। হয়ত মার্কিণ রাজ্যকেও ইউরোপের সহিত মিশাইয়া মার্কিণ যুবতী-দিগকেও সৈনিক-বিবাহে বিরত রাখিতে হইবে।

মার্কিণের ভাবান্তর।

কিন্তু অনেক সময়েই মনে হয়, মার্কিণের এই উপস্থিত যুদ্ধানুরাগ—এই রাজ্যবৃদ্ধিলালসা—শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে ; শান্তিসেবক মার্কিণ আবার শীঘ্রই শান্তিসেবক হইবেন। সুতরাং ২৩৫০ অব্দের অনেক পূর্ব্বেই মার্কিণ রাজ্য, শান্তির একান্ত সেবক হইয়া, যুদ্ধ বিগ্রহাদির শত্রু হইয়া থাকিবেন। তাহা হইলে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইবে ; ২৩৫০ অব্দের ইউরোপীয় যুবতীরা অনায়াসেই মার্কিণ রাজ্যে যাইবার কথা, কহিতে পারিবেন। আর যুবতীদিগের মার্কিণযাত্রার সঙ্কল্প দেখিয়া, ইউরোপীয় পুরুষ-দিগকেও ভয়বিহ্বল হইয়া যুদ্ধবিরাগী হইতে হইবে। তাহা হইলেই সকল দিক বজায় থাকিবে। আর, ইউরোপ আমেরিকায় যুদ্ধবিরাগ প্রবল হইলেই, সমগ্র ভূমণ্ডলই শান্তিময় হইবে। ইউরোপের জন্যই এশিয়ায় যুদ্ধ ; ইউরোপের চৈতন্য হইলেই সর্ব্বত্র মঙ্গলের আধিপত্য হইবে।

ইউরোপের সর্ব্বত্র।

পাঁচ বৎসর প্রতিজ্ঞা অটল রাখিয়া, ইউরোপীয় মহিলারা যখন পুরুষদিগকে পরাস্ত করিবেন ; যখন জর্ম্মণী, ইতালি, অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতির পুরুষেরা স্ব স্ব মহাসভায় যুদ্ধ-বিরাগের বক্তৃতা করিতে থাকিবেন ; যখন সকল সভা—সকল গভর্ণমেণ্ট—সকল মন্ত্রী যুদ্ধদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন ; তখন এক সপ্তাহের মধ্যেই ইউরোপের সর্ব্বত্র সৈন্যভঙ্গ এবং রণপোতভঙ্গ হইয়া যাইবে। সৈনিক সেনা-নীরাও সর্ব্বত্র তরোয়াল বন্দুক কামান ম্যাক্সিম ছাড়িয়া শান্তিপথের পথিক হইবেন। তরোয়াল সঙ্গীনের ইস্পাত শিল্পযন্ত্রে পরিণত হইবে, কামান রণপোতের লৌহ কৃষিযন্ত্রে

পরিণত হইবে। ২৩৫৬ অব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ সার্ব্বদেশিক শান্তিসপ্তাহ বলিয়া পরগণিত হইবে। ২৩৫৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি যেরূপ নববর্ষোৎসব হইবে, তেমন উৎসব পৃথিবীতে কোন কালে হয় নাই।

বিবাহের ধূম।

২৩৫৬ অব্দের ঐ জানুয়ারি মাস ইউরোপের সর্ব্বত্রই সুখের মাস বলিয়া পরিগণিত এবং অভিহিত হইবে। সুখের মাস হইবে শান্তির মাস, আর প্রণয় ও পরিণয়ের জন্য হইবে মকরধ্বজের মাস। পাঁচ বৎসর বিনা বিবাহে—বিনা রমণী-সঙ্গে—থাকিতে বাধ্য হইয়া, পুরুষেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিবেন। সুতরাং শান্তির প্রথম সপ্তাহেই চারি দিকে বিবাহ-সম্বন্ধের ধূম লাগিয়া যাইবে। ২৩৫৬ অব্দের জানুয়ারি মাসে ইউরোপ বিবাহোৎসবে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে। গির্জ্জায় স্থান হইবে না; এক এক গির্জ্জায় এক এক দিনে শতাধিক পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। নানাস্থানে বিবাহের জন্য স্বতন্ত্র গির্জ্জা বসাইতে হইবে। যত সভাগৃহেই গির্জ্জার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইউরোপের বিবাহকার্য্য দিবালোকে সম্পন্ন হয়। সুতরাং যত থিয়েটারেও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে—যত রঙ্গালয়ও গির্জ্জার আসনে বসিবে। কিন্তু তথাপি কুলাইবে না। মাঠে ঘাটে তাঁবু পড়িবে। তাঁবুতেই গির্জ্জার কাজ হইবে। একটিন্ পাদরির সংখ্যা দিন কতক খুবই বাড়িয়া উঠিবে। বৈবাহিক পরিচ্ছদের দর একবারেই চড়িয়া উঠিবে। বৈবাহিক নাচভোজে ইউরোপ জমজম করিতে থাকিবে। খাদ্যপোয়াদির মূল্যবৃদ্ধি হইবে। ফলতঃ ২৩৫৬ অব্দের জানুয়ারি মাসটা ইউরোপের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বিলাত ও রুষিয়া।

বিলাত এবং রুষিয়া প্রথমে দল হইতে দূরে থাকিবে। বিলাতের কোন পুরুষকে পল্টনের কার্য্যে বাধ্য হইতে হয় না। বিলাতে অসৈনিক পুরুষ অনেক। আর বিলাতের রমণীরাও প্রথম প্রথম ইউরোপীয় রমণীদিগের সহিত মিশিবেন না। বিলাত যে দিকে, রুষিয়াও সেই দিকে। বিলাতের যে নীতি, রুষিয়ারও সেই নীতি। কিন্তু ইউরোপের আর সকল রাজ্যই যখন, একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, একটী বিরাট বিশাল সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে, যখন সেই বিরাট সাধারণতন্ত্রের সকল নর নারীই যুদ্ধে বিরত হইবেন, তখন বিলাত ও রুষের নর নারীদিগকেও অগত্যা যুদ্ধদেবে আক্রান্ত হইতে হইবে। তখন বিলাত ও রুষিয়াকেও দলে মিশিতে হইবে। মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের আহ্বানে অনুরোধে তখন ইউরোপের সেই নব বিরাট সাধারণতন্ত্র, মার্কিণ সাধারণতন্ত্রের সহিত যোগ দিয়া, শান্তির পতাকা উড়াইয়া দিবেন। তখন বিলাত এবং রুষিয়া আর উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। ইঁহাদিগকেও ক্রমে শান্তির পতাকা উড়াইতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্রই তখন শান্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সুখ সর্ব্বত্র।

শান্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই, সকল রাজ্যের খরচপত্র কমিয়া যাইবে। যুদ্ধের জন্যই ত খরচ! রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্বই ত এখন পোত পল্টনেই খাইয়া ফেলে। সৈনিক সেনানী অস্ত্র শস্ত্র রণপোত টর্পেডোর জন্যই যে, রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্ব খরচ হইয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। ইউরোপ এখন এক মহাশিবির। সমগ্র ইউরোপের সৈন্য সামন্ত একত্র করিলে, কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকেও লজ্জা পাইতে হয়। এক রুষের সম্রাটই যখন তখন ৫০।৬০ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ ফরাসী জর্ম্মণও অনায়াসে সাজাইতে পারেন। ২০।২৫ লক্ষ ইতালি অস্ট্রিয়ারও আছে। ইংলণ্ডেরও ৬ লক্ষের কম নহে। আবশ্যক হইলে, রুষ, ফরাসী ও জর্ম্মণ সৈন্যসংখ্যা যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন; এক রুষই এককোটীর যোগাড় করিতে পারেন। ৫০।৬০ লক্ষের জন্য জর্ম্মণ ফরাসীকেও ভাবিতে হয় না। রণপোতও কম নাই! ইংলণ্ডের অধিক দেখিয়া রুষ, জর্ম্মণ, ফরাসী, সকলেই রণপোতের ক্রমাগত আধিক্য করিয়া আসিতেছেন। পোত পল্টনে ইংরেজ প্রতি বৎসর ৬০।৭০ কোটী টাকা ফেলিয়া দিতেও কাতর নহেন। ৩০।৪০ কোটির জন্য কেহইত কাতর নহেন। রুষ যেখানে যাহা পাইতেছেন, সমস্তই পল্টনে ফেলিতেছেন। পোত পল্টনের জন্যই খরচপত্র ভয়ঙ্কর বাড়িয়াছে বলিয়া, ইউরোপের সকল প্রবল নরপতিকে প্রজাপেষণে বাধ্য হইতে হইয়াছে। প্রজার করভার বাড়িলেই পীড়ন বাড়িয়া থাকে; করভার সর্ব্বত্র বাড়িয়াছে। ২৩৫৬ অব্দে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া

যাইবে, যুদ্ধের পোত পল্টন উড়িয়া যাইবে, রাজ্যের ব্যয় কমিয়া যাইবে; করভারও সুতরাং কমিয়া যাইবে। রণপোত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র দুর্গ কেল্লা প্রভৃতি উঠিয়া গেলেই, রাজ্যের খরচ একেবারেই কমিয়া যাইবে; প্রজাদের করভারও একেবারেই হাল্কা হইয়া পড়িবে। প্রজারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। সকল রাজ্যেই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইবে। শিল্প বাণিজ্যাদি চরমে উঠিবে। প্রকৃত সভ্যতা-বিস্তারের তখনই আরম্ভ হইবে। ২৩৫৬ খৃষ্টাব্দের পরেই পৃথিবীতে সুখ শান্তির প্রকৃত সূত্রপাত হইবে।

আর কি হইবে?

ফ্ল্যামেরীয়ন নিজেই বলিতেছেন; "পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক মাপ, এক ওজন প্রচলিত হইবে; একরূপ মুদ্রাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে। সময়-নির্দ্ধারণে ও মানচিত্রাঙ্কণে এক দ্রাঘিমা—গ্রীণউইচের মধ্যন্দিনদ্রাঘিমা—সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইবে। ক্রমেই কিন্তু পৃথিবীতে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই, ফ্রান্সের লোপ হইবে। ২৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইতালির লোপ হইবে। ৩২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মণীর তিরোভাব হইবে। তখন ইংরেজকেও ভূমি ছাড়িয়া সাগর মহাসাগরে রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে;—জাহাজী রাজ্যেই ইংরেজকে রাজত্ব করিতে হইবে। ফরাসীর জ্যোতির্ব্বিৎকেও মানিতে হইয়াছে, পোতবলে এখনও বহুকাল—৩২০০ খৃষ্টাব্দের পরেও—ইংরেজ একাধিপত্য করিবেন।

আরও কি হইবে?

হইবে কত কি! বসবাসাদির জন্য পৃথিবীর বন জঙ্গল সমস্তই উড়িয়া যাইবে; ভূমণ্ডলকে একেবারেই বনশূন্য হইতে হইবে। আর্ত্তববিজ্ঞানের চূড়ান্তরূপ উন্নতি হইবে। আকাশ মেঘাদির অবস্থা তখন বৈজ্ঞানিকদিগের কল্যাণে লোকে পূর্ব্বাহ্নেই নিশ্চিত অভ্রান্তরূপে জানিতে পারিবে। তখন খপোতেরই প্রাধান্য হইবে; মানুষ নানাবিধ ব্যোমযানে চড়িয়া আকাশের চারিদিকে ইচ্ছামত বিচরণ করিবেন। ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যোমযানে চলিবে। কুত্রাপি আর সমুদ্র-তীরে বা নদীতটে কষ্টম-হাউস দেখিতে পাওয়া যাইবে না; জাহাজী মালের উপর মাশুল লইবার জন্য তখন আর কোন কষ্টম-হাউসেই কাহাকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যাইবে না। বাষ্পের ব্যবহার রহিত হইয়া যাইবে। সকল কল বলই তাড়িতে চলিবে। বিজ্ঞানের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, জ্যোতির্ব্বিদ্যারও চূড়ান্ত হইবে।

তার পর?

উন্নতি যে, কত দিকে কতরূপ হইবে, তাহা এখন ভাবিয়া পাওয়া যায় না! অর্থ খুবই সচ্ছল হইবে; শতকরা আট আনা বার্ষিক সুদে টাকা ধার দিবার জন্য ধনপতিরা লালায়িত হইবেন। জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়নকে এখন নিশ্চিতই উত্তমর্ণদিগের জ্বালায় জ্বালাতন হইতে হইতেছে; টাকা ধার তাঁহাকে নিশ্চিত প্রায়ই করিতে হয়; সুদের দায়ে তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হয়! তাই তখন সুদ শতকরা ॥০ আনা হইবে, দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিৎ মহাশয় বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু হায়! যখন এই সুখের স্রোত প্রবাহিত হইবে, তখন ত জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ণ এ ভূমণ্ডলে থাকিবেন না; অন্ততঃ এখনকার আকারে ত তখন কিছুতেই থাকিতে পাইবেন না!

পান ভোজনের কি হইবে?

২৩৫৬ অব্দের পর খাদ্যের জন্য আর এখনকার মত জীবহত্যা হইবে না। জল বায়ু এবং উদ্ভিজ্জ হইতেই রসায়নবিৎ ব্যবসায়ীরা নানাবিধ খাদ্য পেয় প্রস্তুত করিবেন। উদরপূর্ত্তির জন্য কাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। নানাবিধ অমৃতসমান পানীয়, নানাবিধ অমৃত-ফল, নানাবিধ দেবভোগ্য পিষ্টক এবং দেবদুর্ল্লভ মোদক, রসায়নাগারে প্রস্তুত হইয়া, লোকের তৃপ্তি এবং উদরপূর্ত্তি করিবে।

আবার?

আবার কৃষিকার্য্যও কেবল তাড়িতসাহায্যে সম্পন্ন হইবে। শস্যাদি তাড়িতেই উৎপন্ন হইবে। সমুদ্রজল হইতে হাইড্রোজেন প্রস্তুত হইবে। নায়াগ্রাপ্রভৃতি যত জলপ্রপাতে এবং যত নদীস্রোতে তাড়িত উৎপন্ন হইবে। সেই তাড়িতেই আলোকসংস্থান হইবে। তাড়িতস্রোত একস্থান হইতে—বহুদূরে বহুস্থানে—নীত হইবে। সুতরাং আলোকও বহুদূরে বিস্তৃত হইবে। সূর্য্যকিরণ গ্রীষ্মকালে কলে পড়িয়া ধৃত ও সঞ্চিত হইয়া থাকিবে, শীতকালে বিতরিত হইবে। রৌদ্রেরও সুতরাং তখন বাণিজ্য চলিবে। পৃথিবীপৃষ্ঠে গভীর নলকূপ প্রোথিত হইবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপ সেই কূপে উত্থিত

হইয়া, যত নগর গ্রামকেই তাপ দিবে। যন্ত্র-সাহায্যে সেই তাপের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, লোকে ঘর বাড়ীর তাপ আপনাদের মনোমত করিয়া লইবে; শরৎ বসন্তে অল্প লইবে, গ্রীষ্মে আদৌ লইবে না, কিংবা নামমাত্র লইবে। তাহা হইলেই, কার্য্যতঃ পৃথিবীতে আর ঋতুভেদ থাকিবে না। তাপের তারতম্যই ত ঋতুভেদের হেতু। যখন সে তারতম্য থাকিবে না, তখন ঋতুভেদই থাকিবে না।

মানব-দেহ।

মানবদেহে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইবে। নর নারী উভয়েরই মাথা আরও বড় হইবে, দেহ আরও ছোট হইবে। বিলাতের বিজ্ঞানকম্ম ঔপন্যাসিক ওয়েলস্ সাহেব বলেন, "মানুষের মস্তিষ্ক যত বাড়িবে, তাহার মাথাও তত বাড়িবে, আর দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ততই ছোট হইতে থাকিবে। শেষে চরম উন্নতির সময়ে মানুষের মাথাটাই হইবে সর্ব্বস্ব। তখন মানুষকে কলে বসিয়া গতিবিধি করিতে হইবে। হাত পার কার্য্য নানাবিধ যন্ত্রে সম্পন্ন হইবে। মানুষ যন্ত্র পরিয়াই যাওয়া আসা করিবে। মঙ্গলগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে ভূমণ্ডলের অনেক পূর্ব্বে, সেখানকার মানব উন্নতির চরমে উঠিয়াছে। সেখানকার মানবের মাথাই সব, সে যন্ত্র সাহায্যেই চলা বিলা করিয়া থাকে। মঙ্গলের যোদ্ধারা যখন এই পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, তখন কলে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে; কল-পরা বড় বড় মাথা-গুলা চারি দিকে ছুটিবে। আর নানারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রে পার্থিব যোদ্ধাদিগের ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।"

মস্তকের ভবিষ্যৎ প্রকাণ্ডত্ব অনেক বৈজ্ঞানিকেরই অনুমোদিত। এ পক্ষে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ণ একক বা অদ্বিতীয়ক নহেন।

২৩৫৬ অব্দের পর পৃথিবীতে জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ থাকিবে না। সকল জাতিই একজাতিরূপে পরিণত হইবে; সকল বংশ একবংশে পর্য্যবসিত হইবে; সকল লোকেই এক ধর্ম্মের উপাসক হইবে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সমন্বিত জ্ঞানধর্ম্মই হইবে তখনকার সেই একধর্ম্ম। ধর্ম্মভেদ থাকিবে না, জাতিভেদ থাকিবে না; রীতিভেদও থাকিবে না। তখন শাসনপ্রণালীর ভেদ থাকিবে না, পৃথিবীর সকল রাজ্যই এক শাসনপ্রণালীর অধীন হইবে। যখন সকল রাজ্যই এক বিরাট সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে, তখন আর শাসনপ্রণালীর তারতম্য থাকিবে কিরূপে? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানবের বসতি হইবে, সর্ব্বত্রই মানবের আধিপত্য হইবে। বনের লোপ হইবে; সুতরাং বন্য জন্তুরও লোপ হইবে। সাগর মহাসাগরেও মানবের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ হইবে। আর হোয়েল শীল প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবের যেরূপ ধ্বংস হইতেছে, তাহাতে ২৩৫৬ অব্দের পর যে, সাগর তিমিহীন ও শীলশূন্য হইয়া যাইবে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।

মানসিক উন্নতি।

তখন আর এখনকার ইন্দ্রিয় কয়টীতে কাজ চলিবে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পেশীবলের ন্যায় সপ্তম অষ্টম, দুইটী নূতন ইন্দ্রিয় মানুষকে পূর্ণ করিবে। দেহস্থ তাড়িত-শক্তি এখন মানুষ নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, কেননা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গ্রামে সে অনুভূতি হয় না। ঐ তাড়িত-জ্ঞানের এক নূতন ইন্দ্রিয় মানবে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে। আবার যোগশক্তিরও একটা নূতন ইন্দ্রিয় আবির্ভূত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। এই যোগেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব দূরস্থ লোক জনের সহিতও সংবাদের আদান প্রদান করিতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রেরও ক্রমেই উন্নতি হইবে। নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবনা এবং আবিষ্কার হইবে। "টেলিফনোস্কোপ" বা "দূরশ্রবণ-দর্শন" যন্ত্র নামে এক নবযন্ত্র উদ্ভাবিত হইবে। তাহার সাহায্যে লোকে বহুদূরস্থ শব্দ শুনিতে এবং বহুদূরস্থ বস্তু দেখিতে পাইবে। শ্রবণ-দর্শন-কার্য্য একই সময়ে সম্পন্ন হইবে। আমেরিকার এডিসন এইরূপ যন্ত্রের পথ অনেকটা মুক্ত এবং প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমেরিকার নিকোলা তেস্‌লাও উদাসীন নহেন। বস্তুতঃ আল্‌ভা এডিসন এবং নিকোলা তেস্‌লা এই ১৯০২ অব্দে যাহা করিয়া তুলিয়াছেন, ইংলণ্ডের লর্ড কেল্‌ভিন প্রভৃতি যাহা করিয়াছেন, ফ্রান্সের ফ্ল্যামেরিয়ন নিজে যাহা করিয়াছেন, ইতালির মার্চ্চোনি এখনই যাহা করিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসেই বুঝা যায়, এই হারে ২৩৫৬ অব্দে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের তখন যাহা হইবে, এখন তাহার অনুমানও করা যায় না। এখনকার অদৃশ্য তখন দৃশ্য হইবে, এখনকার অশ্রাব্য তখন শ্রাব্য হইবে, এখনকার অস্পৃশ্য তখন স্পৃশ্য হইবে। এখনকার সমস্ত অজ্ঞেয়ই তখন

জ্ঞেয় হইবে। যোগবিদ্যার বিস্তার হইবে। আত্মার যে সকল ক্রিয়াকলাপ রীতিপ্রকৃতি এখন অজ্ঞাত অজ্ঞেয়, আধ্যাত্মিক বিদ্যা অর্থাৎ যোগবিদ্যা তখন তৎসমস্তই মানবের জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া দিবে। এক মনের উপর তখন অন্য মন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে। দূরস্থ মনের সহিতও মন অনায়াসে সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে। এই পৃথিবীর ত কথাই নাই, অন্যান্য গ্রহের সহিতও তখন মানব সহজেই সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন। মঙ্গলের সহিতই যে, প্রথমে সংবাদের আদান প্রদান হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে শুক্রের সহিত; শেষে বৃহস্পতির সহিত সম্বন্ধ ঘটিবে। ঐ সকল গ্রহের মানব বা মানবসম জীবগণের সহিত অত্রত্য মানব-জীব সংবাদের আদান প্রদান করিয়া, ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিবেন। চিকিৎসাবিদ্যার বকাল মকাল ঔষধ পত্র সব উড়িয়া যাইবে। এখন যাহাকে তোমরা হিপ্‌নোটিজম বা মোহিনী শক্তি বল, যাহাকে এনিমল ম্যাগনেটিজম বা জৈব চুম্বকশক্তি বল, যাহাকে সাইচিক বা আধ্যাত্মিক যোগশক্তি বল, ঐ সব শক্তির ২৩৫৬ সালে পরিণতি বিষয়ে পরাকাষ্ঠা হইবে। তখন ঐ সকল শক্তির সাহায্যেই চিকিৎসকেরা মানবের সকল রোগ ব্যাধি দূর করিয়া দিবেন। আর রোগ ব্যাধি তখন হইবেও কম। যে টেলিপ্যাথি বা যোগ-শক্তি-সমুৎপন্ন-সংবাদ-সঞ্চারণ এখন কোন কোন লোকের বিশ্বাস্য হইলেও অনেকেরই অবিশ্বাস্য; যোগী মহাযোগীরা যে টেলিপ্যাথি বা দূরজ্ঞানশক্তির সাহায্যে সমগ্র জগতের খবর রাখিতে পারেন, শুনিয়া অনেকেই এখন উপহাসরসিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন; সেই টেলিপ্যাথি, সেই দূরজ্ঞান শক্তি—২৩৫৬ অব্দে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া অনেকেরই আয়ত্ত হইবে। তখন মানবের মানসিক শক্তি ক্ষমতাও চরমে উঠিবে।

পৃথিবীর অবস্থা।

২৩৫৬ খৃষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্য জগতে রাজ্য থাকিবে একটি; কেন না যত রাজ্যই সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হইয়া, ক্রমে মিলিয়া যাইবে। ক্রমে সমস্ত রাজ্যই এক রাজ্যে পরিণত হইবে। সেই মহারাজ্যের রাজধানী আমেরিকায় মিচিগান হ্রদের তীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন সাগর-গর্ভে নিহিত থাকিবে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ, ইতালির রোম, নেপল্‌স এবং ফ্লোরেন্সের কিছুই থাকিবে না, থাকিবে কেবল ধ্বংসাবশেষ। ফরাসীর প্যারিসেরও সেই দশা ঘটিবে। চীনের বর্ত্তমান ৫০।৬০ কোটি মানুষ তখন ১০০ কোটিরও উপর দাঁড়াইবে। ২৩৫৬ অব্দের পর ১০০ কোটী চীন পশ্চিম ইউরোপে বসবাস করিবে। পূর্ব্বে ইংরেজিনবীশ ২০০ কোটী মানবের কথা কথিত হইয়াছে, চীনদিগের কথা কথিত হয় নাই। শিল্প-বিজ্ঞানাদিসম্বন্ধেও ইংরেজিনবীশদিগের কথাই কথিত হইয়াছে; মিচিগান হ্রদের তীরে তাহাদিগেরই রাজধানী বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। শতকোটী চীনের রাজধানী হইবে কিন্তু ইউরোপে। ইউরোপ যাইবে আমেরিকায়, চীন আসিবে ইউরোপে। ফ্রান্সের প্যারিস বিলুপ্ত হইবে, সকল নগর বিলুপ্ত হইবে না। শতকোটী চীনের দীর্ঘ রাজধানী ফ্রান্সের বোর্দ্দো হইতে তুলুস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। তখন এইরূপ দীর্ঘ রাজধানীই আবশ্যক হইবে। হলণ্ডের এমষ্টারডম এবং রটারডম, ফ্রান্সের রুয়ে এবং ভার্শেল নগর সাগরগর্ভে ডুবিয়া থাকিবে। ঐ সকল নগরের উপর গভীর জলরাশি বিরাজ করিবে।

ক্রমশঃ।

ক্রমেই সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত হইতে থাকিবে। পঞ্চাশীতি শতাব্দীর মধ্যেই—৮৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই—প্যারিসের উপর এত জল হইবে যে, সচূড় নতর্দ্দমও ডুবিয়া থাই পাইবে না। তখন চীনও সাগরমগ্ন হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে আটলাণ্টিকের গভীর তল উচ্চে উঠিতে থাকিবে। এখন যেখানে জলের আরম্ভ, তখন সেখানে উঠিবে তল। কিন্তু আটলাণ্টিকের জলও তখন শততাল ছাড়াইয়া উঠিবে এবং চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া দিবে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটের পূর্ব্ব দিকটা—আটলাণ্টিকের দিকটা—একেবারেই অদৃশ্য হইবে, একেবারেই অতলস্পর্শে যাইবে। ওদিকে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থিত সামুদ্রিকার ছোট বড় যত দ্বীপই সংযুক্ত লিপ্ত হইয়া এক বিরাট বিশাল মহাদেশে পরিণত হইবে।

যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

মানুষের আয়ু ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। বিজ্ঞান ও জ্ঞান মানুষকে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি করিবার নানাবিধ উপায় পন্থা

দেখাইয়া দিবে। কিন্তু চরমে উঠিয়াও মানুষ ১৫০ বৎসরের অধিক বাঁচিতে পাইবে না। তবে এখন যাহারা ১৫০।১৬০ বৎসর বাঁচে, তখন তাহারা ২০০ বৎসরেরও অধিক বাঁচিবে। সাধারণতঃ মানুষ ১৫০ বৎসর বাঁচিবে। জীবন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-বৃদ্ধিও না হইবে এরূপ নহে। মানুষ বাঁচিবে ১৫০ বৎসর, তাহার যৌবন থাকিবে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত। ১০১ বৎসরে পড়িলে নর নারী যৌবন পার হইবে। ক্রমে সকল দিকেই সুবিধা হইবে। উন্নতির সত্য সত্য পরাকাষ্ঠা হইবে। উন্নতিকে "নযযৌ নতস্থৌ" হইয়া স্থিরভাবে থাকিতে হইবে। তখন উন্নতি হইবে না, কিন্তু অবনতিও হইবে না। এই ত্রিশঙ্কুভাব থাকিবে পৃথিবীতে "এক লক্ষ বৎসর।" এক লক্ষ বর্ষের পর অবনতির সূত্রপাত হইবে।

পৃথিবীর ধ্বংস।

ঐ লক্ষ বর্ষের পর ক্রমেই পৃথিবীর জলভাগ সংকুচিত হইতে থাকিবে, পার্থিব জলের পরিমাণ ক্রমেই কমিতে থাকিবে। ক্রমে মহাসাগরগুলি উপিয়া যাইবে, মহাসাগরের সমস্ত জল শুখাইয়া যাইবে। উষ্ণকটিবন্ধে সাগর অতি-বিলম্বে নির্জ্জল হইবে। কিন্তু সর্ব্বশেষে উষ্ণকটি-বন্ধের সাগরকেও শুখাইয়া যাইতে হইবে। পাহাড় পর্ব্বত সবই অদৃশ্য হইবে। পাহাড় পর্ব্বত অদৃশ্য হইলেই তুষারপাত রহিত হইবে। সুতরাং নদ নদী বহিবে না। বন জঙ্গলের ত কথাই নাই, কোনরূপ গাছ পালাও তিষ্ঠিতে পারিবে না। ক্রমেই পৃথিবীর গতি-বেগও কমিতে থাকিবে। এখন ভূমণ্ডল স্বীয় অক্ষে যে বেগে ঘুরিতেছে, সে বেগ থাকিবে না। ক্রমে ক্রমে বেগ একেবারেই নির্ব্বেগ হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমেই মন্দীভূত হইতে থাকিবে, সুতরাং দিবসের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে। আহ্নিক গতি মন্দীভূত হওয়ায়, দিন এত বড় হইবে যে, এখনকার ঘণ্টার ১১০ ঘণ্টায় তখনকার দিন অতিবাহিত হইবে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে দেশ কাল পাত্র তিনেরই লোপ হইয়া থাকে। খণ্ডপ্রলয়ে লোপ হয় না, ভাবান্তর হয়।

ভয় নাই।

প্রলয়ই বল, খণ্ডপ্রলয়ই বল, আর ভূপ্রলয়ই বল, প্রলয়ে এখনও বিলম্ব আছে। ২৩৫৬ অব্দের পর উন্নতির যুগ; ক্রমে বহুকাল উন্নতি। অনন্তর বহুকাল পরে স্থিরতা। সেই স্থিরতা ১ লক্ষ বৎসর। তাহার পর অবনতির আরম্ভ। অবনতি হইবে অনেক দিন। সর্ব্বশেষে ধ্বংস বা প্রলয়। বিলম্ব অনেক। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ ফ্ল্যামেরীয়ন গণিয়া বলিতেছেন, সেই প্রলয়ে এখনও "১ কোটি বৎসর" বিলম্ব আছে। অতএব, "নভেতব্যং নভেতব্যম্।"

পাঠক নিশ্চিন্ত থাকুন; কোটি বৎসর নিতান্ত স্বল্পকাল নহে। আবার এই কোটি বর্ষের শেষভাগে দিন যাইবে ১১০ ঘণ্টায়। আমাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া সকলেই সচ্ছন্দে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে থাকুন। এখন হইতে নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িয়া থাকাত যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

লাক্ষা প্রসঙ্গ।

লাক্ষার সহিত ভারতবাসী মাত্রেরই বিশেষ পরিচয় আছে। লাক্ষা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে নানা-রূপ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতে ইহার ব্যবসাও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, কাব্য, নাটক ইত্যাদিতে ইহার যেরূপ ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রাচীন আর্য্যগণ লাক্ষার ব্যবহার জানিতেন। রঞ্জনক্রিয়াতেই লাক্ষার অথবা লাক্ষারসের অর্থাৎ অলক্তকের প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। তৎকালে সুন্দরীগণ অলক্তক রাগে স্বীয় স্বীয় কোমল চরণ-তল রঞ্জিত করিয়া তাহার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেন। পুরসুন্দরীগণের চরণ-রঞ্জন ভিন্ন যে লাক্ষার অন্য কোন কার্য্য ছিল না তাহা নহে; লাক্ষায় বস্ত্র রঞ্জিত হইত, চিত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইত, নানা প্রকার কাষ্ঠ ও ধাতু দ্রব্যে পালিশ ও বার্ণিশ করিতে লাগিত, এক প্রকার দাহ মশাল প্রস্তুত হইত, পুত্তলিকাদি নির্ম্মিত হইত ইত্যাদি।

মহাভারতের যুগে যে লাক্ষার ব্যবহার জানা ছিল, তাহা জতুগৃহ ব্যাপারেই বেশ জানিতে পারা যায়। রামায়ণের যুগেও ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে লাক্ষার ব্যবহার জানা ছিল কি না, বেদে ইহার উল্লেখ

আছে কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না। বেদ-বিশারদ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা জানাইলে বাধিত হইব। যাহা হউক লাক্ষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে রামায়ণ মহাভারতই আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ। তারপর লাক্ষা প্রাচীন হউক বা নূতন হউক, সে বিষয় লইয়া তত দূর বাক্‌বিতণ্ডা করিবারও কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই; কারণ তাহাতে সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের বা দেশীয় জন সাধারণের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ঋগ্‌বেদে লাক্ষার উল্লেখ থাকুক আর নাই থাকুক, বায়ু বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন তত্ত্ব প্রকটিত হউক বা না হউক, জৈমিনী সংহিতায় লাক্ষার দৈব্যুতিক শক্তির কোন পরিচয় প্রকটিত হউক বা না হউক, লাক্ষা যে একটী ব্যবসায়ের বস্তু এবং বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ বা মতদ্বৈধ নাই।

ভারতের লাক্ষা বহু দিন হইতে ইয়ুরোপে বাণিজ্যার্থ রপ্তানি হইতেছে, ইয়ুরোপে ইহার রঙের বিশেষ আদর ছিল, আজ কাল অন্যান্য রঙের আমদানিতে ইহার প্রভা কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি কোন কোন রঙের কার্য্যে ইহার আদর এখনও বেশ আছে। তারপর লাক্ষা হইতে যে জতু পাওয়া যায় তদ্দ্বারা নানা প্রকার পুত্তলিকা ও সখের জিনিস, নানারূপ গহনা, মোহর করিবার জন্য গালা ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বার্ণিশের কাজেও লাক্ষার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও আদর আছে।

সুতরাং ইহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচিত হওয়া মন্দ নহে, এইরূপ মনে করিয়াই আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। কয়েক খানি সাপ্তাহিক পত্রে ইতঃ-পূর্ব্বে এ বিষয় কিছু আলোচিত হইয়া ছিল, কিন্তু ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে কিছু বলা হয় নাই। এজন্য আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া এবং নানা পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে উদ্যুক্ত হইলাম।

প্রাচীন কালে কি কি উপায়ে লাক্ষার রঙ বাহির করা হইত, কিরূপে জতু সাহায্যে অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করা হইত ও বার্ণিশ প্রস্তুত করা হইত, কিরূপেই বা ইহার চাঁচ হইত, তাহার জানিবার সুবিধা আমাদের নাই; তবে অভিধানে উহার নামভেদ দেখিয়া এ বিষয় কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা লাক্ষার প্রাচীনতত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টায় আছি; সুযোগ হইলে পুনরায় তাহা জানাইব। ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম, মালাবার উপকূল, মধ্য প্রদেশ, মালদহ, বহরমপুর, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশ, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি স্থানে লাক্ষার চাষ প্রচলিত আছে। বোধ হয় প্রায় সকল স্থানেই একই প্রকারে ইহার চাষ আবাদ হইয়া থাকে; আমরা ময়ূরভঞ্জের এবং ছোটনাগ-পুরের লাক্ষার চাষ অবলম্বন করিয়াই অদ্য বলিতেছি; আমি যতদূর জানিয়াছি, শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি তাহাতে ময়ূর ভঞ্জের লাক্ষা কীটের পালন, লাক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের সহিত প্রায় তুল্য, সুতরাং আমরা সাধারণ ভাবেই বর্ণনা করিয়া যাইতেছি।

আমরা সাধারণ মোহর করা বাতি গালা, বা পাতগালা বা চাঁচগালার আকারেই লাক্ষা দেখিয়া থাকি। বঙ্গের কোন কোন স্থানে মোহর করা গালাকে লা, আর পাত গালাকে চাঁচ বলে। এই চাঁচ সাধারণতঃ স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারাদির ছাঁচ তুলিতে অথবা ফাঁপা স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে পূর্ণ করিবার জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বর্ণাল-ঙ্কারের মধ্যে পুরিবার জন্য স্বর্ণকারেরা গালাকে অগ্নিসংযোগে গলাইয়া তাহা হইতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেগুলি ঔজ্জ্বল্য এবং সৌন্দর্য্য-প্রভায় স্বর্ণহারকে যেন নিন্দা করে, অথবা স্বর্ণ বর্ণ রেশম ঃ—তন্তুকেও যেন লজ্জা দেয়, এই সূত্র অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ এবং অতীব কোমল। এতদ্ব্যতীত চুড়ীওয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত বেদিয়াগণ এই সব গালার সহিত মৃত্তিকা চূর্ণ এবং আরও কি কি বস্তু জাত এবং রং মিশ্রিত করিয়া নানাপ্রকার চূড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা নানাপ্রকার রং দ্বারা রঞ্জিত করে এবং নিম্ন শ্রেণীর কৃষক সম্প্রদায়মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। কৃষক রমণীগণের নিকট এই সব গালার অলঙ্কার বড়ই মনোরম। দরিদ্র, অল্পসন্তুষ্ট কৃষক বালিকা ও যুবতীগণ এই সব অলঙ্কার পরিধান করিয়া যেমন আনন্দিতা হয়, আমাদের ভদ্রঘরের সুশিক্ষিতা বিদুষী সভ্যাভব্যা অনেক রমণী সোণার চূড় গড়াইয়া পরিলেও তত আনন্দ পান কিনা সন্দেহ! বার্ণিশে গালার ব্যবহার বিষয় পরে বলা যাইবে।

যাহা হউক আমরা বাজারে লাক্ষাকে বাতি অবস্থায় বা পাত অবস্থায় দেখিতে পাই বটে, কিন্তু ইহার উৎপত্তি

যে কিরূপে হইয়া থাকে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। রেশম এবং তসর যেমন গুটী পোকা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, লাক্ষার জন্যও আমরা সেইরূপ একপ্রকার কীটের নিকট কৃতজ্ঞ। ইহাদিগকে লাক্ষা কীটই বলা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে মৌ কীটও বলে।

এই সব কীট বন্য বৃক্ষের শাখায় স্বীয় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; এই বাসাই লাক্ষা। এই সব কীট অনেক বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা পল্লবে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কুসুমগাছ, পলাশ গাছ, বদরী বা কুল গাছ এই গুলিই প্রধান। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রধানতঃ কুসুম গাছই লাক্ষার আবাদ জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কুসুম গাছ বলিতে যেন কেহ কুসুম ফুলের ছোট ছোট একরূপ গাছ যে বাঙ্গলা দেশে আবাদ করা হয় তাহা না বুঝেন। কুসুম গাছ একরূপ বন্য বৃক্ষ। ইহা বেশ বড় বড় হইয়া থাকে, এবং শাখা পল্লব পত্রাদিতে বিভূষিত হইয়া অনেক খানি স্থান ব্যাপিয়া থাকে; ইহারা যেন কতকটা পিটুলী গাছের মত। ময়ূরভঞ্জে অসভ্য কৃষকগণ, যাহারা লাক্ষার আবাদ করে, তাহাদের জন্য প্রত্যেক কুসুম বৃক্ষের উপর একটা রাজকর নির্দ্দিষ্ট আছে। করের পরিমাণ খুব সামান্য। প্রজাগণ গুপ্তভাবে লাক্ষা বিক্রয় করিতে না পারে এজন্য বনবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে প্রধান প্রধান ঘাটিতে লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। একবার বন বিভাগের কর্ত্তা এই কর আদায় সম্বন্ধে একটু অধিক তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করায় লাক্ষার চাষ ভাল হয় নাই; সুতরাং রাজস্বও কম হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম প্রজারঞ্জক মহারাজ শেষে প্রজাগণের সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

কুসুমবৃক্ষ জাত লাক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কারণ বাজারে ইহা হইতে জাত জতুর আদর অধিক। পলাশাদি জাত লাক্ষা হইতে অলক্ত ভাল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জতু ভাল পাওয়া যায় না। লাক্ষার শতকরা ৬০, ৭০, কি ৭৫ ভাগ ধূনা বা রজন, আর ১০।১২ ভাগ অলক্ত থাকে। এই অলক্ত ভাগ লাক্ষা কীটের বাসার অভ্যন্তর ভাগে থাকে, এবং ইহা ঐ জাতীয় স্ত্রী কীটের দেহের অংশবিশেষ। লাক্ষা কীটেরা দুইবার আপনাদের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। একবার বসন্তকালের শেষ ভাগে, আর একবার বর্ষা কালের শেষ ভাগে। ইহারা কতকটা রেশম কীটের জাতীয়। কীট শাস্ত্রে ইহাদিগকে coccus lacca বলে এবং coccus cactii এর সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইহাদের পুং জাতির কেবল পক্ষোদ্গম হইয়া থাকে; সেও প্রথমে হয় না, বাসার মধ্যে থাকিয়া কেহ সম্পূর্ণ রূপ পুষ্ট হইলে বাহির হইবার সময় পক্ষোদ্ভেদ হইয়া থাকে। ইহাদের মত বহু বিবাহকারী জীব আর জগতে আছে কি না সন্দেহ; কারণ ইহাদের প্রত্যেক পুং জাতীয়ের হিসাবে প্রায় ৫০০০ স্ত্রী কীট পড়ে; সুতরাং প্রাচীন হিন্দু রাজগণ বা বাদশাহগণ ইহাদের নিকট লজ্জায় অধোবদন হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। পক্ষযুক্ত পুংজাতীয় কীটের আয়তন স্ত্রীকীটের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ হইবে।

ইহারা কোন বৃক্ষে আশ্রয় লইবার সময় দুই চারিটি পুরুষ এবং কতকতকগুলি স্ত্রী একত্র হইয়া আইসে। তার পর বৃক্ষের কোমল শাখা পল্লবের ত্বক্ স্বীয় শুণ্ড দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া তদভ্যন্তরস্থ রস গ্রহণ করিয়া দেহের পুষ্টিসম্পাদন করে এবং এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ স্বীয় দেহ হইতে বাহির করিয়া ডালে মাখাইয়া দেয়; এই আঠাবৎ পদার্থে ক্রমে তাহাদের সর্ব্ব শরীর আবৃত হইয়া যায়; তখন তাহারা রেশমকীটের ন্যায় স্বীয় দেহ-নিঃসৃত রসে গঠিত আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া কূটস্থ জীবের ন্যায় অথবা ধ্যানমগ্ন বল্মীক সাধুর ন্যায় অবস্থান করিতে থাকে। এই আঠাবৎ পদার্থ তাহারা স্বীয় দেহ রক্ষার জন্যই বাহির করিয়া থাকে। এতদ্বারা তাহারা একটা নিরাপদ আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া লয়। কিন্তু এই আশ্রয় স্থানই তাহাদের জীবন-নাশের মূল হইয়া উঠে। এই আঠা নির্ম্মিত আবরণ ডালের উপরে ও চতুর্দ্দিকে বেশ করিয়া আঁটিয়া বসে; এ গুলি মধু চক্রের ন্যায় ছিদ্রবিশিষ্ট। এই জীবিত সমাধি হইতে পুং কীট গুলি শেষে উদ্ধার পায়, কিন্তু স্ত্রী কীট গুলির আর উদ্ধার নাই। তাহারা ঐ সমাধির মধ্যেই স্বীয় গর্ভস্থ অসংখ্য সন্তানের প্রসব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করে। গর্ভ গ্রহণের সময় হইতে একমাস মধ্যেই স্ত্রী কীট গুলির আকৃতি একটা কিম্ভূত কিমাকার মত হইয়া পড়ে; তাহাতে প্রধানতঃ একটা উজ্জ্বল মসৃণ লাল রঙের জরায়ু স্থালী মাত্র দেখা যায়, শুণ্ড বৃক্ষত্বকে প্রবিষ্ট থাকে, আর বাহিরে জতুর আবরণের উপরিভাগে ছোট ছোট কয়েকটি স্ফোটকের মত দৃষ্ট হয়।

এই লালবর্ণ জরায়ু স্থালীই লাক্ষার রঙের অর্থাৎ অলক্তকের উপাদান। ইহার পরই জরায়ু বিদীর্ণ হইয়া অসংখ্য লাক্ষা-কীটশিশু উদ্ভূত হয় এবং তাহারা স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান-প্রভাবে জতুকাবরণ ভেদ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া আশ্রয় বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে এবং আহার কার্য্যে মত্ত হইয়া যায়। এইরূপ লাক্ষা শিশু দ্বারা আবিষ্ট বৃক্ষ গুলির দিকে তাকাইলে যেন বোধ হয় যে, তরুগুলি লালবর্ণ ধূলায় সপত্র পল্লব আচ্ছাদিত হইয়া আছে। এই কীটেরা বড় ঔদরিক! বৃক্ষ শাখার রস শোষণে বিশেষ ক্ষিপ্রতা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়া থাকে এবং তাহা দেখিতে অতি সুন্দর।

লাক্ষাকীট একবৃক্ষে বংশানুক্রমে বাস করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই সব ক্ষুদ্র কীটের অধিকাংশই স্ত্রী জাতীয়। লাক্ষা রমণীগণ বড় কন্যা-জননী; ভাগ্যে ইহাদের মধ্যে বিবাহে ঘড়ি চৈন ও হাজার হাজার দান পণের দাবী নাই তাই রক্ষা, নতুবা তাহাদের দশা কি হইত?

এই সব কীট আবার আহার কার্য্য করিতে করিতে পুং যোগে গর্ভিনী হইয়া পুনরায় লাক্ষাবরণে আচ্ছাদিত হয়। এইরূপে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, শেষে একই বৃক্ষে বহুদিন বাস করিতে করিতে যখন বৃক্ষের ছালের সকল অংশই কঠিন লাক্ষার আবরণে পুরু হইয়া উঠে, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে এই পুরুষানুক্রমিক বাস-স্থান ত্যাগ করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লাক্ষা কীট বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলে শূন্য বাসা পড়িয়া থাকে; এই বাসা গুলির অভ্যন্তরভাগ মধুচক্রের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট। এই সব ছিদ্রে অলক্তক সঞ্চিত থাকে, কিন্তু কীট বাহির হইয়া গেলে ঐ সব শূন্য বাসায় অলক্তকের ভাগ প্রায় কিছুই থাকে না। এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রজন এবং অলক্তক পাইতে হইলে সুপুষ্ট কীটযুক্ত বাসা আহরণ করাই প্রয়োজন এবং তাহাই সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে। শূন্য বাসা গুলিকে ফুঁকি বলে; ইহা বোধ হয় ফাঁকা অর্থাৎ শূন্যের তুল্যার্থ বোধক। ফুঁকির জতু বেশ ভাল, তবে অলক্তক শূন্য। যে সব বৃক্ষে লাক্ষা কীটের বাস তাহাদের তলদেশেও অনেক সময় অনেক বায়ু বিতাড়িত লাক্ষার শূন্য বাসা পাওয়া যায়, এগুলিও সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আশ্বিন কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত, আর বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত কীটযুক্ত বাসা সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষার রঙ নানা প্রকারের আছে. কোন গুলি কমলা লেবুর রঙ, কতক গর্ণেটের রঙ, কতক ঘোরাল কাল মত, কোন কোন লাক্ষার পীতাভ রঙ ইত্যাদি। ইহাদের রঙকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শ্বেতাভ করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তৎপর অন্য রঙ দ্বারা স্বর্ণবর্ণ করিয়া এতদ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়।

লাক্ষার আবাদ করিতে হইলে ভাল কুসুম, পলাশ কি কুলের গাছ কতগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া স্ত্রী ও পুং জাতীয় কীট ঐ সব বৃক্ষে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং কিছুদিন কীট গুলিকে পক্ষী প্রভৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয়।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের মধ্যে অনেক স্থানেই লাক্ষার আবাদ আছে। এইসব লাক্ষা বা মৌ প্রায়ই পুরুলিয়া, রাঁচি, প্রভৃতি স্থানে বিক্রীত হয়; অনেক সময় মহাজনদিগের লোক গ্রামে আসিয়া প্রতি বাড়ী হইতে জতু সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ময়ূরভঞ্জে গিয়া একটু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এইরূপ জতু সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান করিতে পারিলে বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। আমরা দুই একজনের বিষয় অবগত আছি, তাঁহারা এইরূপ উপায়ে এবং তসর-কোয়া খরিদ বিক্রয় দ্বারা বেশ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

কোন ভদ্র লোক এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে উদার হৃদয় মহারাজের নিকট যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি! তবে এ কথা জানা আবশ্যক যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বাবুগিরি করিতে গেলে চলি-বেনা; সুধু লোক জন দ্বারা ব্যবস্থা করিয়া নিজে সুখাসনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আলবোলা চুম্বনে কাটাইলে লাভ হইবে না; নিজে একটু খাটিয়া খুটিয়া উপযুক্ত স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া সুবিধা বুঝিয়া মাল খরিদ করিতে পারিলে বেশ সুবিধা হইবে। অসভ্য প্রজাগণ ধূর্ত্ত মহাজন-চর কর্ত্তৃক অনেক প্রকারে প্রতারিত হইয়া থাকে; বল পূর্ব্বক অধিক গ্রহণ, ওজনে বঞ্চনা, মূল্য কম প্রদান ইত্যাদি নানা রূপে স্বার্থপর অনেক নীচাশয় ব্যক্তি সরল স্বভাব কৃষক-দিগকে প্রবঞ্চনা করে। আমাদের বিশ্বাস, কোন ভদ্র ব্যক্তি যদি সৎপথে থাকিয়া ইহাদের সঙ্গে ন্যায্য ব্যবহার

করেন, তবে তাঁহার প্রভাব ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপ বিস্তৃত হইবে এবং শীঘ্রই তাঁহার কারবারের উন্নতি দেখা যাইবে। অল্প মূলধনে ব্যবসায়ের একটি পথ প্রসঙ্গক্রমে আমরা দেখাইয়া দিলাম, এই ব্যবসায়ে উদ্যোগী পুরুষ মাত্রেই প্রচুর উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।

লাক্ষার মূল্যও নিতান্ত কম নহে, কুসুমজাত লাক্ষার মণ ১০।১২৲ হইতে ২০।২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বদরী প্রভৃতি জাত লাক্ষার মনও ৮।১০৲ হইতে ১৫।১৬৲ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সময় সময় কিছু ন্যূনাধিক্যও হইতে পারে। ছোট নাগপুর ও রাঁচিই ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থান; এবং লাক্ষা প্রধানতঃ রাঁচি হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলা হইতে বিক্রয়ার্থ রাঁচিতেই লওয়া হয়। পুরুলিয়াতেও ইহার কারবার চলিয়া থাকে।

লাক্ষার চাষে বিশেষ কোন কষ্ট বা ব্যয় নাই। আমাদের দেশে পলাশ এবং কুল গাছে এই কীটের বেশ আবাদ হইতে পারে। ইহার বীজকীট বহরমপুর, মালদহ প্রভৃতি স্থানে চেষ্টা করিলে মিলিতে পারে; ময়ূরভঞ্জ, রাঁচি, রাইপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানেও মিলিতে পারে। বেশ একটু দেখিয়া শুনিয়া চাষ করিতে পারিলে সমস্ত খরচাদি বাদ বিঘা প্রতি ৩০।৪০৲ বা ততোধিক লাভ হইতে পারে।

যে সমস্ত বৃক্ষে লাক্ষার চাষ করা হয়, সেই সমস্ত বৃক্ষে কীটেরা বাসা নির্ম্মাণ করিলে পর বাসাগুলি বেশ পুষ্ট হইলে তাহা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। যে সমুদয় ক্ষুদ্র পল্লবে এইরূপ বাসা থাকে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়; বড় বড় শাখায় বাসা হইলে ডাল হইতে উহা চাঁচিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রায়শঃই ছোট ডালেই বাস করা হয়।

এইরূপে অনেক বাসা সংগৃহীত হইলে পর শেষে সে গুলি ডাল হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা করা হয়। এই কার্য্যে কোন কোন স্থানে চরকীর মত একরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়; এই চরকী দুইটি স্ত্রীলোকে ঘুরাইতে থাকে; কোন কোন স্থানে ঢেঁকি বা উদূখলের ন্যায় একরূপ যন্ত্রের সাহায্যেও এই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এইরূপে বাসাগুলি ডাল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং কিয়ৎ পরিমাণে পিষ্ট হইলে পর, হাতে বাছিয়া এবং কুলার দ্বারা ঝাড়িয়া কাষ্ঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ধূলা মাটি প্রভৃতি হইতে ইহাদিগকে মুক্ত করা হয়। তারপর পুনরায় ইহাদিগকে পিষ্ট করিয়া এবং সূক্ষ্ম চালুনী দ্বারা চালিয়া লওয়া হয়। এইরূপ করাতে লাক্ষাগুলি ঘোর কমলালেবুর রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয়। ইহাদিগকে 'রংদার চৌরি' বলে। ইহাদের সঙ্গে অলক্তক মিশ্রিত থাকে। এই গুলিকে কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বড় বড় মাটির গামলার মধ্যে ফেলিয়া রমণীগণ পদ দ্বারা দলিত করিতে থাকে। এক একটি রমণী একটী একটী গামলার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পদদ্বারা লাক্ষাখণ্ড গুলিকে চাপিয়া ধরে এবং হস্ত দ্বারা কোন স্তম্ভ বা দেওয়াল আশ্রয় পূর্ব্বক একবার বামে একবার দক্ষিণে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া লাক্ষা খণ্ডগুলিকে অবিরত পদদ্বয় দ্বারা আধারের গাত্রে ঘর্ষিত করিতে থাকে। কঠিনাঙ্গী অসভ্য রমণীগণের চরণ-সন্তাড়নে অপমানিত হইয়াই যেন লাক্ষা ক্ষোভে, লজ্জায় রক্ত বর্ণ হইয়া উঠে! তাহার অন্তর্নিহিত অলক্তক রাগ বাহিরে স্ফুটিত হইয়া পড়ে, অমনি উপর হইতে উদ্ভাসিত অলক্তক ছাঁকিয়া লইয়া আবার তাহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং লাক্ষার জতু অংশ নিম্নে পড়িয়া যায়। এইরূপে যতক্ষণ লাক্ষার বিন্দুমাত্র রস অবিশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে এই রমণীর চরণ-তাড়ণ সহ্য করিতে হয়; জল ঢালিয়া সে রাগ-অপনোদনও চলিতে থাকে। পরে যখন লাক্ষার স্বীয় রাগ-গৌরব লুপ্ত হইয়া যায়, আর শত চরণ প্রহারেও রাগের বিশেষ চিহ্ন দেখা যায় না, তখন রমণীগণ বিজয়িনী হইয়া এই রণরঙ্গে ভঙ্গ দেয়। এইরূপ সারাদিনের শ্রমে একমণ দেড়মণ লাক্ষা হইলে অলক্তক বাহির করা হইয়া থাকে এবং ইহার মজুরীস্বরূপ রমণীগণ দেড় আনা কি দুই আনা করিয়া পাইয়া থাকে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে (আমার যতদূর জানা আছে) প্রজাগণ লাক্ষা হইতে বড় একটা অলক্তক ও জতু পৃথক করার অনুষ্ঠান করে না; তাহারা স্বীয় স্বীয় লাক্ষাক্ষেত্র হইতে লাক্ষা আহারণ পূর্ব্বক একেবারে মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। ময়ূরভঞ্জে লাক্ষা হইতে অলক্তক ও জতু বাহির করিবার কোন বিস্তৃত কারখানাও নাই। কেহ এখানে সুবিধা মত স্থান নির্ব্বাচণ করিয়া এইরূপ একটা কারখানা স্থাপন করিলেও লাভবান হইতে পারেন।

জতুকে পাত গালায় পরিণত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হয়। রাঁচির গালার কারখানায় যে ভাল গালা প্রস্তুত হয় তাহা ৪৮৲ আটচল্লিশ টাকা মণ হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। অলক্তকের মূল্য বাজার অনুসারে এত তারতম্য হইয়া থাকে যে সে বিষয় ঠিক বলা অসম্ভব।

এইরূপ পৃথককৃত অলক্তক মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ছাঁকিয়া লওয়াতে পূর্ব্বে গামলা হইতে উঠাইবার সময় রঙের সহিত যে কিছু কাষ্ঠখণ্ডাদি, লাক্ষার গুঁড়া কি ময়লা মাটী মিশ্রিত হইয়া থাকিবার সম্ভব, তাহা কাপড়ের মধ্যে থাকিয়া যায়। এগুলিকে 'পাঁক' বলে এবং ইহাও ৩৲৪৲ টাকা মণ হিসাবে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ছাঁকা রঙ্গের জল কাপড় হইতে একটা ঢালু স্থানের উপর দিয়া তারের চালুনীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কতকগুলি ক্রমনিম্ন বক্রনালির ভিতরে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে একটা কূপের মধ্যে পতিত হয়। এই কূপের মুখ আরও সূক্ষ্মতর তারনির্ম্মিত চালুনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এইরূপে এই রঙের জল মধ্যে এখনও যা কিছু ময়লা অবশিষ্ট থাকে তাহার নালার মধ্যেও শেষোক্ত চালুনীর মুখে সঞ্চিত হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত উক্ত কূপের তলদেশেও অবশিষ্ট ময়লা জমিয়া যায়।

এইরূপে জলকূপের মধ্যে সঞ্চিত হইলে তাহা ক্রমে যন্ত্রযোগে উদ্ধৃত করিয়া বড় একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ঢালা হয়, এবং তাহার সঙ্গে চূণের জল মিশ্রিত করা হয়। এইরূপ করায় রঙটা জল হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং চৌবাচ্চার তলায় জমিয়া থাকে। পরদিন ঐ রঙ চৌবাচ্চা হইতে উঠাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত অভ্যন্তর ভাগে বস্ত্রমণ্ডিত বাক্সের মধ্যে রাখা হয়, এইরূপে রঙগুলি শুষ্ক হয়। তারপর ইহা হইতে রঙগুলি বাহির করিয়া চাপসহ একপ্রকার ফরমার মধ্যে ফেলিয়া চাপ যন্ত্রের দ্বারা লম্বা ৪ ইঞ্চি কি ঐরূপ পুরুখণ্ডে পরিণত করা হয়। তারপর সে গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া গুদামজাত করা হয়। এইরূপে অলক্তক রঙ প্রস্তুত হয়।

আমরা বাজারে যে আলতার চাকৃতি দেখিতে পাই, সেগুলি তুলা প্রভৃতির পাত, এই অলক্তক রঙের জলে ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত হয়; এবং আমাদের কুললক্ষ্মীগণের চরণরাগ সম্পাদনার্থে ব্যবহৃত হইয়া স্বীয় ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য মনে করে। তবে অনেক চতুর দোকানদার খুনখারাপী বা মেজেণ্টার রঙেও পাত ডুবাইয়া আলতাপাত প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অলক্তক পৃথক করিয়া লইবার পর যে জতু অবশিষ্ট থাকে তাহা অন্য গুদামে লইয়া গিয়া বেশ করিয়া শুষ্ক করা হয়, তারপর ইহা হইতে "মলম্মা" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি সাবধানতার সহিত বাছিয়া বাহির করা হয়, কারণ এই 'মলম্মা' গালা প্রস্তুত করিবার কালে, জতুতে মিশ্রিত থাকিলে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। মলম্মা শেষে ৯।১০ টাকা মণ হিসাবে গালাওয়ালাদের কাছে বিক্রয় করা হয়; তাহারা তাহা দ্বারা নানাপ্রকার বলয়াদি আভরণ প্রস্তুত করিয়া নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের স্বাভাবিক অলঙ্কারতৃষ্ণা নিবারণের উপায় করে। এই সব গালার অলঙ্কার কলিকাতার পাঠিকাগণ দেখিয়াছেন কি না জানি না, পল্লীগ্রামের পাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন।

এইরূপ পৃথক্‌কৃত জতু সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত দুই ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট থলির মধ্যে একটা লম্বাঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে অনেকগুলি চুল্লী আছে। এই চুল্লীর সমীপেই একটা পিতলের বড় চোঙ্গের মত পাত্রে বালি কি এইরূপ কোন তাপশোষক পদার্থ পূর্ণ করিয়া মাটির দিকে একটু হেলাইয়া রাখা হয়। চুল্লীর নিকটে কোন একটা কিছু বসাইয়া তার উপর ঐ থলিগুলি বসাইয়া তলায় ঘৃতকুমারীপত্র-নির্ম্মিত বা অন্যরূপ একটা বিস্তৃত আধার রাখা হয়। এই সময় দুইব্যক্তি দুইদিকে বসিয়া লাক্ষার থলিয়াটী বেশ করিয়া ঘুরাইতে থাকে, যেন সব দিকে সমান তাপ লাগিতে পারে। এইরূপ উত্তাপে লাক্ষা গলিয়া থলির ছিদ্র পথে বহির্নিসৃত হয় এবং পূর্ব্বস্থাপিত পাত্রে পতিত হইতে থাকে; এই সময় ঘূর্ণনকারীদের একজন একহাতে থলি ঘুরাইতে থাকে এবং অন্য হস্তে একখানি তাড়ু দ্বারা গলিত লাক্ষাকে বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া দিতে থাকে। ভালরূপ মিশ্রণের পর সে ঐ গলিত লাক্ষা এক তাড়ু লইয়া পিতলের চোঙ্গটার উপরের দিকে মাখাইয়া দেয়, সেখানে আর এক জন স্ত্রীলোক ঐরূপ পত্রহস্তে দাঁড়াইয়া থাকে, দর্বী হইতে গলিত লাক্ষা পিতল পাত্রে গালাইয়া দিবা মাত্রই সে হস্তস্থিত পত্রদ্বারা বেশ সমান ভাবে পাত্রের গায়ে গালা মাখাইয়া দেয়। ইহার পর এই পাতের উপরও নীচের

মোটা কঠিন অংশ কাঁচি দ্বারা কাটিয়া লইয়া আবার থলির মধ্যে ফেলিয়া গালান হয়। এদিকে রমণী ঐ পাত গরম থাকিতে থাকিতে চোঙ্গ হইতে খুলিয়া লইয়া অগ্নির সমীপেই বেশ করিয়া বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। অগ্নির সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখায় পাতগুলি বেশ পাতলা হয়, আর পত্রাবমর্ষণ জনিত কোন দাগ পাতের গায় থাকিতে পারে না। এইরূপ প্রস্তুত পাতগুলিকেই পাতগালা বলে। এগুলিকে শেষে গুদামে লইয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া বাক্সবন্দী করিয়া যত বাণিজ্য স্থানে চালান করা হইয়া থাকে।

ভাল লাক্ষা বাহির করিয়া লইবার পর থলিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেগুলিকে আবার গলাইয়া ছোট ছোট আকারে টিকের মত করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

আমরা বাজারে যে পাতগালা বা চাঁচগালা দেখিতে পাই, তাহার উৎপত্তি ও প্রস্তুতের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সাধারণ গালা, মোহরের জন্য যে লাল গালা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে লাক্ষার সহিত অন্যান্য বস্তু মিশাইয়া সিন্দুরাদির দ্বারা রং করা হয়; তারপিন ও কর্পূরের সহিত গালা মিশাইয়া রং করিয়াও একপ্রকার মোহর করা গালা প্রস্তুত হয়। ডাকঘরে যে সব মোহর করার গালা ব্যবহার হয় তাহা রজন, গালা ও ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

লাক্ষা রং বা অলক্তক রং রেশম পশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিতে যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার ব্যবহার জানে।

জতু বা গালার অলঙ্কার নির্ম্মাণ, মোহর করা, স্বর্ণকারের কার্য্য প্রভৃতি ব্যতীত বার্ণিশের কার্য্যে খুব অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই জন্যই ইহার আদর এত অধিক। ভারতবর্ষে অনেক প্রকার বার্ণিশই এই জতুর সাহায্যে করা হইয়া থাকে। বাক্স, ডেক্স, আলমারি চেয়ার প্রভৃতি অসংখ্য কাষ্টের বস্তুর বার্ণিশের ত কথাই নাই, প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ইহা পিত্তলাদি ধাতুর উপরের পালিশের কার্য্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গালার বার্ণিশে জিনিসের ঔজ্জ্বল্যও যেমন বৃদ্ধি পায়, উহার স্থায়িত্বও তেমনি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনেক রকম বার্ণিশের ও পালিশের সূক্ষ্ম কাজ পর্য্যন্ত এই গালার দ্বারা হইয়া থাকে।

সাধারণ বার্ণিশ করিতে লাক্ষার সহিত সিরকা বা ভিনিগার কি সুরাসার মিশাইয়া বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, আর তাহার সহিত ইচ্ছামত রঙ আদি মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

কোনও কোনও সিমেণ্টের কাজেও গালার ব্যবহার হয়। ইংরাজি (Lacquer) বার্ণিশের প্রধান উপকরণ গালা; গালার নাম হইতেই এই বার্ণিশের নামকরণ হইয়াছে; এই লাক্ষার সাহায্যে যে নানা প্রকারের বার্ণিশ প্রস্তুত হয়, তাহাদের মধ্যে একটী বার্ণিশের প্রস্তুত প্রক্রিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অনেক পিত্তলের জিনিসেই এই বার্ণিশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাতগালা	... ৮ আউন্স;	একত্রে এক গ্যালন পরিশ্রুত সুরাসারে (Rectified Spirit) মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।
হরিদ্রা	... ৮ „	
সাণ্ডারাক্ (Sandarach)	২ „	
ড্রাগনের রক্ত (Dragon's blood)	... ½ „	
আর্ণটেস্ (Arnotes)	২ „	

শেষোক্ত জিনিস কয়টির বাঙ্গলা কোন নাম জানি না, তবে ড্রাগনের রক্ত দেখিয়া যেন পাঠকপাঠিকাগণের কেহ ডাইনিদের আশ্রয় গ্রহণের আবশ্যতা বোধ না করেন; উহা এক প্রকার বৃক্ষের রক্তবর্ণ রস। উহা সকল ইংরাজি বণিক দোকানে পাওয়া যাইবে। বার্ণিশের কার্য্যে জাপানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাপানীগণ বার্ণিশের কার্য্যে লাক্ষা ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্ব্যতীত উহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ণিশ তদ্দেশীয় উশী নামক বৃক্ষের রস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপে জাপানী বার্ণিসের খুব আদর আছে।

যাহা হউক আমাদের লাক্ষার বার্ণিশও কম নহে; বার্ণিশ-রাজ্যে লাক্ষাও প্রথম শ্রেণীর আসন অধিকার করিয়া আছে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

জব্বলপুরের পথে।

আবার প্রবাস জীবনের, এক নূতন যবনিকা উত্তোলিত হইল। এলাহাবাদ গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি—এমন সময়ে দেখি মিঃ পিংর লগেজ লইয়া কুলীগুলা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেকেণ্ড ক্লাসের দরজার সম্মুখে নামাইতেছে। আমাকেও তিনি সেখানে দেখিতে পাইবেন, এরূপ আশা করিয়াই আসিয়াছিলেন। আমার আর এখন সে মূর্ত্তি নাই। মাথায় নাইট্ ক্যাপ আঁটিয়া, অলষ্টার চড়াইয়া, বুট পায়ে দিয়া আমিও এখন তাঁহার মত সাহেব। ধোঁয়া বাহির না করিলেও মুখে একটা চুরট ধরিয়াছিলাম। খালি ছিল না—আমার চসমা। মিঃ পিং আমায় দেখিয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন, একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ আমি বুঝিলাম—তিনি যেন বলিতেছেন "বেশ মানাইয়াছে—সাবধান! চাল চলনে ধরা পড়িও না।"

দুইজনেই গাড়িতে উঠিলাম। মনে একটু আনন্দ হইল। এই কয় দিনের বিচ্ছেদে বড় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। সবে মাত্র বলিতে যাইতেছি—"পিং—তুমি কেমন ছিলে" এমন সময়ে এক বাধা পড়িল। বাধা আর কিছু নহে—এক শ্বেতাঙ্গ আসিয়া সস্ত্রীক সেই কক্ষে উঠিলেন। বুঝিলাম, একটু বাঙলায় কথা কহিবার সুযোগ লোপ হইল। মিঃ পিংর চেহারাটীও বেশ গৌরবর্ণ ছিল—মেজাজটাও গম্ভীর—চাল চলনও কেতা দুরস্ত। তিনি যে খাঁটি সাহেব তাহাতে সহসা কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু আমার অনভ্যাসের ফোঁ, কাজেই একটু সাবধানে থাকিতে হইল।

সাহেবরা উঠিয়া একখানি বেঞ্চ দখল করিলেন। আমরাও একখানি করিয়াছিলাম। তাঁহারা আপনা আপনি কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। মেম সাহেব সাহেবকে বলিতেছেন—"John Dear, our journey will end in 3 hours and we will stop with Mr. Lecgre for a day or two—He is so anxious." কথায় বুঝিলাম তিন ঘণ্টা বাদে সাহেব নামিয়া যাইবেন। সট্‌না পর্য্যন্ত তাঁহারা যাইবেন এই বুঝিলাম। অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। কথা কহিতে না পাই, দুই ঘণ্টা একখানা বই পড়িলে, কাটিয়া যাইবে।

সাহেবের বেঞ্চের নীচে, একটী ক্ষুদ্র বাস্‌কেট ছিল। তিনি সেটীর ডালা খুলিলেন। একটা Tumbler বাহির হইল। একটা পিলসেলার বিয়ারের মুখ খুলিয়া, সেই বাক্সের মধ্যে একটা কাচের পাত্র হইতে খানিকটা বরফ লইয়া সাহেব বিয়ার ঢালিয়া মেমের সম্মুখে ধরিলেন। মেম্‌সাহেব হাসিয়া বলিলেন—Oh! thank you John. মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সেই ঈষদুষ্ণময় আসবপূর্ণ পাত্র শূন্য হইয়া পড়িল। মেম সাহেব শয্যায় আড় হইলেন। "জন" ও তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া একখানি পাইওনীয়ারের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষু দুটিকে আমাদের নেত্রপথের অতীত করিয়া দিলেন।

মিঃ পি, হ্যাগার্দের Solomons mine খুলিয়া নিমগ্নচিত্ত ছিলেন। আমিও উপায়ান্তর না দেখিয়া একখানা পুরাতন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বারত্রয় পঠিত পুরাতন সংবাদ পাঠে মন দিলাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। এলাহাবাদ হইতে নৈনির পথে, আবার গঙ্গা যমুনার দূর দৃশ্য দেখিলাম। পার্শ্বে নৈনি জেলখানা। নিম্নে এলাহাবাদ সহরের ঘুটিঙ্গ মণ্ডিত রাস্তার উপর এক্কা ও বিবিধ শকটাদির ঘর্ঘর নিনাদিত গতি। দূরে আকবর সার "দরিয়াপারী কেল্লা" একখানি চিত্র পটের ন্যায় পরিদৃশ্যমান। পোলের উপর দিয়া গাড়ি ছুটিতেছে। ধন্য ব্রাড্‌ফোর্ড লেসলি! ভারতের বুকে কি কীর্ত্তিস্তম্ভই না রাখিয়া গিয়াছ।

বারগড় পার হইলাম। রাস্তার বন্ধুর অবস্থা, পার্শ্ববর্ত্তী পরিবর্ত্তণীয় অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, পাহাড়ে দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ক্রমশঃ রেলের গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিন্ধ্যাচলের সমশ্রেণীভুক্ত বন্ধুরগাত্র পর্ব্বতগুলির সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। দুইদিকে মাঠ, মাঠের প্রান্ত সীমায় খুব দূরে বড় বড় পাহাড়। তাহার উপর কত বড় বড় গাছ, ঝোপ, জঙ্গল। মাঠের মধ্যে মধ্যে এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। কয়েকখানি জীর্ণ দুরাবস্থাময় কুটীর সমাবেশেই এই গ্রামের সূচনা।

সটনায়।

গাড়ী যখন সট্‌নায় আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। আজ কাল সট্‌নায় পৌঁছিতে রাত্রি হয় না। বেঙ্গল নাগপুরের সহিত প্রতিযোগীতায় ই, আই রেলওয়ে কোম্পানী সময়ের ও ট্রেণের গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মোটের উপর সট্‌না একটী খুব বড় ষ্টেশন। এখানে সাহেবদের ডিনারের বন্দোবস্ত আছে। গাড়ী অনেকক্ষণ থামে। এঞ্জিন বদল হয়। সাহেবরা যাহাকে বড় বলেন—আমরাও তাহাকে বড় বলিতে বাধ্য।

সট্‌না মধ্য ভারতের সামন্ত রাজ্য রেওয়ার সীমামধ্যে। সট্‌নায় রেওয়া রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বাস করেন। ষ্টেসন হইতে সহরটি অর্দ্ধ ক্রোশ। এ দেশের সহর যেমন হয় সেইরূপ। হাট বাজার আছে, ছোট ছোট লাল সুরকীর রাস্তা আছে, ছোট বড় মাঝারি রকমের অনেকগুলি বাড়ী আছে। সাহেবদের মধ্যে অনেকে এই সহরে থাকেন। জলহাওয়া খুব ভাল। মহারাজারও সহরের মধ্যে কয়েকটী প্রাসাদ আছে। অনেক সাহেব বাহির হইতে রেওয়ার জঙ্গলে শিকারের লোভে এই সটনায় মহারাজের ও ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতের রাজ রাজড়া হইতে সামান্য কুটিরবাসীর সাধারণ ধর্ম্ম—আতিথ্য পরায়ণতা। কাজেই কলির দেবতা সাহেব অতিথির পরিচর্য্যার কোন রূপই ত্রুটি হয় না।

আমার এক সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু রেলওয়ে এঞ্জিনের নাম দিয়াছিলেন "অগ্নিময় অশ্ব", কথাটা আগে পছন্দ হয় নাই। কিন্তু সটনায় আসিয়া বুঝিতে পারিলাম আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ পি এই 'অগ্নিময় অশ্বের' মৃদঙ্গার রূপ খাদ্য গ্রহণ দেখিয়া ক্ষুধার সংক্রামকতা গ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেননা সটনায় পৌঁছিয়া তিনি সটান Refreshment Room এর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; গাড়ী প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা থামিবে। আমি ও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। সেখানে সাহেবী খানা খাইবার প্রবৃত্তি না থাকিলেও, মিঃ পিংর সাহেবী ধরণে জঠরাগ্নির সন্তোষ সাধন ব্যাপারটা দেখিবার একটা কৌতূহল হইয়াছিল।

পরিষ্কার পোষাক পরা খানসামা, শুভ্রবস্ত্র মণ্ডিত টেবিলের উপর একটি প্লেটে কয়েক স্লাইস্ টোষ্ট করা রুটি, দুই খানি কেক, চারি খানি জিঞ্জার বিস্কুট, ও এক পেয়ালা গরম চা, দুদ, চিনি রাখিয়া গেল। বুঝিলাম লাইট টিফিনের ব্যাপার। মিঃ পি আমায় চা খাইবার জন্য, বাঙ্গালা দেশের সীমার বাহিরে কুসংস্কার টা পরিত্যাগ করিবার জন্য, ইঙ্গিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি এমনি দুর্ব্বলচিত্ত যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। মিঃ পি ইচ্ছামত দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রণে চা টাকে সুপেয় করিয়া লইয়া "সিপ" করিতে লাগিলেন—আমি কামরায় ফিরিয়া আসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া খানকয়েক লুচী ও একটু মিষ্টান্ন দ্বারা উদর তৃপ্তি করিলাম।

সটনার গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল। শেষ ঘণ্টা দিল। মিঃ পি সহাস্য মুখে একটা চুরট টানিতে টানিতে কামরায় আসিয়া বলিলেন—"দেখ সাহেবী পোষাক পরিলেই সাহেব হয় না। অনেক কাজে সাহস চাই। ঐ শুক্‌না লুচী গুলা চিবাইয়া কেন কষ্ট পাইলে? আমার সঙ্গে খাইলেই ত হইত।" গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মিঃ পিংর—কথার কোন উত্তর করিলাম না। উত্তর করিলেই বিতণ্ডার সৃষ্টি হইবে। সট্‌নার গাড়ি ছাড়িবার পর মেদিনী অন্ধকারনিমজ্জিতা হইল। সে রাত্রে

চন্দ্রালোক ছিল না। প্রকৃতির নয়নমোহন দৃশ্য দর্শনের সাধটা সেই অন্ধকারেই বিসর্জ্জন দিলাম। ক্রমশঃ দেখি শীত বাড়িতেছে। গাড়ে শীতের সূচনা বুঝিয়া গায়ে আবার কাপড় দিলাম।

সটনা হইতে, দিওড়ি পর্য্যন্ত কেবল টাইমটেবল খুলিয়াছি। জব্বলপুর পৌঁছিতে পারিলেই যেন বাঁচি। যেখানে আমাদের নামিবার কথা ছিল—তাহারা আমার পরমাত্মীয়। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ টেলিগ্রাম করা, বা কোনরূপে সংবাদ পাঠান হয় নাই। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। তাহা হইলে হয়তঃ আমাদের মনের কথা বুঝিয়া ষ্টেসনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেন। জব্বলপুরে পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইবে। সে রাত্রে, অপরিচিত স্থানে কে আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভরসা মিঃ পি সঙ্গে। আমার ত এই প্রথম বিদেশ যাত্রা।

জব্বলপুর।

ভরসাটা নিতান্ত অপাত্রে করি নাই। বোধ হয় সে রাত্রে মিঃ পি না থাকিলে আমাদের বড় কষ্টই পাইতে হইত। গাড়ী খানি যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি অনেক। ষ্টেসনে যে দুই চারি খানি শিগ্রাম ছিল, তাহা অন্য যাত্রীদের আত্মীয়েরা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর গাড়ী (যাহা এ দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর মত) তাহার এক খানি ছিল, কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব সেখানি লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। কেননা আমাকেই গাড়ীর চেষ্টায় বাহির হইতে হইয়াছিল। মিঃ পি এত দুর্দ্দশায়ও তাঁহার সাহেবী কেতা ছাড়েন নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখি একটী প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর গৃহে এক খানি কৌচের উপর মিঃ পি সানন্দিত মনে চুরট টানিতেছেন। দুই তিনটা কুলী তাঁহার জিনিস পত্র একটা টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছে। আমার লগেজগুলাও সেই সঙ্গে ছিল। একজন কেলনারী খানসামা, সেই খানে পি—সাহেবের আদেশ অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। ঘটনাটা দেখিয়া বুঝিলাম পি সাহেব আমার আগেই সন্ধান পাইয়াছেন, ষ্টেসনে একখ নিও গাড়ী নাই। সাহেবী পরিচ্ছদের চালচলনের একটা যে বাহাদুরি আছে তাহা সেই দিন বুঝিলাম। মিঃ পি ইংরাজীতে বলিলেন—"ভায়া, আজ বাকী কয়েক ঘণ্টা রাত্রি এই ষ্টেসনেই কাটাইতে হইবে। ঘরটী যখন পাইয়াছি, তখন আর ভাবনা নাই।"

যাহা হউক সে রাত্রিটা নিদ্রায় অনিদ্রায়, সুখে দুঃখে এক রকম কাটিল। আমার adventure করিবার বাসনাটা ছেলে বেলা হইতেই। সে দিন একটী ছোট খাট রকমের হইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া আমরা ষ্টেসনের টয়লেটরুমে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া লইলাম। ষ্টেসনের চাকরেই দেখি দুই খানি শিগ্রাম লইয়া উপস্থিত। কুলীরা একখানি গাড়ীতে মাল উঠাইয়া দিল, আমরা অপর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

আমার থাকিবার স্থান হইয়াছিল জব্বলপুরের ভূতপূর্ব্ব Extra Assistant Commissioner স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে। মিঃ পিকেও সেইখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু স্বাধীন ভাবের উপর আদব কায়দায় একটা বাঁধাবাধি পড়িবে বলিয়া তিনি তাঁহার সমবয়স্ক এক বন্ধুর বাটিতেই চলিয়া গেলেন।

জব্বলপুর সহর।

জব্বলপুরের আত্মীয়েরা আমায় দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আসিবার কোন কথা বার্ত্তাই ছিল না। কাজেই সহসা আমায় সশরীরে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা বড়ই প্রফুল্ল হইলেন। সে দিনটা বিশ্রামেই কাটিল। অপরাহ্নে মিঃ পির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও তাঁহার সেই উকীল বাবুটি, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, কাজেই সহর ভ্রমণে যাইতে হইল।

জব্বলপুর সহর, আধুনিক। আধুনিক অর্থাৎ ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে ইহা বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জিঃ আইঃ পি রেল এখানে হইতে আরম্ভ হইয়া, বোম্বাই পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইঃ আইঃ আর, এই জব্বলপুরে আসিয়া জিঃ আইঃ পির সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার রাজা গোকুল দাস স্বাধীন ব্যবসায় ও আত্ম নির্ভরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাহার সেপাহী শান্তিওয়ালা বিস্তৃত প্রাসাদ, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপর দিকে অসংখ্য স্বর্ণ রৌপ্য পাত্রের অধিকারী হইয়াও ভূপৃষ্ঠে পত্রের উপর একাহার যেন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত উদাহরণ। জব্বলপুরে অনেক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী বাস করেন। কয়েক জন সিভিল জজ, মুনসেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর আছেন। বাঙ্গালী উকীলও অনেক। এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহৃদয়তা ও সরল ভাব দেশের বড়ই দুর্ল্লভ জিনিস। এখানে অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও বাঙ্গালীকে অতিথিরূপে পাইলে, স্বদেশের লোক দেখিতে পাইলে, বড়ই আদর অভ্যর্থনা করেন।

জব্বলপুর সহরটী যে খুব বড় তা নয়। চারি দিকে পরিষ্কার প্রশস্ত রাজ পথ। সহরের বাহিরেই পাহাড়। অবশ্য সকল দিকে এ পাহাড় নাই। পথ ঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন। চকটী অতি বিস্তৃত। সর্ব্বদাই জনপূর্ণ। ক্রেতা বিক্রেতার সমাবেশ দেখিলে এক এক সময়ে কলিকাতার বড়বাজারের পথ বলিয়া বোধ হয়।—জব্বলপুরের মধ্যেই ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সেনানিবাস। সেনানিবাসের আশে পাশে বড় বড় "বাঙ্গলো", এখানে সাহেবেরা বাস করেন। জব্বলপুরের চিফকোর্টটী অতি সুন্দর। হায়! এ সব দেশেও আমাদের হতভাগ্য দেশের ন্যায় অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে মহাসংগ্রাম! বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ঠগীজেল

জব্বলপুরের একটী প্রধান দর্শনীয়। কর্ণেল লিমানের কার্য্যক্ষেত্রই ছিল মধ্যভারবর্ষ। যে ঠকের নামে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে লোকে কাঁপিয়া উঠিত, একাকী দূরদেশে সহসা যাইতে সাহস করিত না—এই ভদ্রবেশী, সঙ্কেত ভাষী, ফাস্থড়ে দিগের হাতে প্রাণ নাশের ভয়ে দলবদ্ধ না হইয়া পথ চলিত না, আজ তাহাদের বংশধরেরা ঠগীজেলের মধ্যে বংশানুক্রমে বন্দীভাবে থাকিয়া শিল্প শিক্ষায় বা নানাবিধ ব্যবহারিক বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া পূর্ব্ব স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

ঠগের উৎপাত এক সময়ে বড়ই বেশী হইয়াছিল। ডাকাত অপেক্ষা লোকে ঠককে বেশী ভয় করিত। ডাকাত প্রকাশ্যে আসে, আসিবার আগে লোকে জানিতে পারে, কিন্তু ঠক কখন সঙ্গ লইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া বলা ঐ সব সময়ে বড় দুষ্কর ছিল। পথিক হয়তঃ স্থানান্তরে যাইতেছে। পথিমধ্যে দেখিল তাহার অপেক্ষা আরও একদল সম্ভ্রান্তলোক সেই পথে চলিয়াছে। সে তাহাদের সঙ্গ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল। আলাপ পরিচয়ে বড়ই সুখী হইয়া তাহাদের দলে গিয়া মিশিল। সহসা কোথা হইতে সঙ্কেত শব্দ বাহির হইল—"চিলিয়া মাজনা" বা "হুক্কা ভরলেও" অমনি সেই হতভাগ্য বিশ্বস্ত চিত্ত পান্থের গলদেশে পশ্চাৎ হইতে তড়িদ্বেগে রেশমী ফাঁস লাগাইয়া তাহার জীবনলীলার শেষ করিয়া দিল।

কর্ণেল লিমান লর্ড বেণ্টিকের আমলে এই ঠকের সমস্ত প্রধান দলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। লিমানের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উদ্যমে ঠগেরা ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়। লিমান যে কয়টী বিশিষ্ট দলপতিকে এই সময়ে ধরিয়া ছিলেন, তাহাদের কয়েক জনকে এই জেলে আবদ্ধ রাখেন। তাহারা জেলের মধ্যেই—বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রইয়া বংশ বৃদ্ধি করে। এখন জব্বলপুরের ঠগী জেলে যে সব ঠক বাস করি-

তেছে, তাহারা অপরাধিদিগের বংশীয়। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস—নর শোণিতলোলুপ শার্দ্দূল যেমন কখনও শোণিতস্বাদ ভুলিতে পারে না—ঠগদের বংশাবলীর মধ্যে জাতীয় বৃত্তি পরিহার কল্পনাও সেইরূপ অসম্ভব। ইহারা জেলে থাকিয়া কার্পেট বস্ত্রাদি বয়নে, নানারূপ শিল্পকার্য্যে শিক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। জব্বলপুরে আসিলে একবার ঠগী জেল দেখা উচিত।*

নবরাত্রি।

আমাদের দেশে দুর্গোৎসবের যে আনন্দ, এ দেশে পূজার সময়ে সাধারণ লোকে নব রাত্রিতে সেইরূপ আনন্দই উপভোগ করে। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা পূজার সময়েই জব্বলপুরে আসিয়াছিলাম। সপ্তমীর প্রাতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। এখানকার পদস্থ বাঙ্গালীরা চাঁদা করিয়া প্রতি-বৎসর শারদীয়া পূজা করেন। যত বড় বড় উচ্চ পদস্থ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট তহশীলদার প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীরা, উকীল ও অধ্যাপকেরা, ও অন্যান্য প্রবাসীরা একত্রিত হইয়া মহামায়া পূজার দিবসত্রয় মহানন্দে অতিবাহিত করেন। অনেক হিন্দুস্থানীও এই পূজায় যোগ দেন। প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা চাঁদা উঠে। প্রথমদিনে আমরা যাই নাই, অষ্টমীর দিন পূজার মন্দিরে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল যেন বাঙ্গলা দেশে কোন আত্মীয়ের বাটীতে পূজার নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। পূজার দালানের সম্মুখেই একটী বৃহৎ মণ্ডপ। মণ্ডপটী ঝাড় লণ্ঠন, ছবি, আয়না, ধ্বজা পতাকা ও ফুলের মালা বেশ সুন্দররূপে সুরুচির সহিত সাজান। স্থানীয় সিবিল জজ ও আর দুইজন পদস্থ বাঙ্গালী সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। তাহারা আমাদের গলায় ফুলের মালা দিলেন; আতর ও গোলাপফুলের একটী তোড়া দিলেন। সে দিন জনতাও খুব ছিল। মধ্য প্রদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা চিফ কমিশনার সাহেব হইতে অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, মিলিটারিগণ, কালেজের ইংরাজ অধ্যাপক, ডিষ্ট্রিক্ট পুলীস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সকলেই সে ক্ষেত্রে উপস্থিত। ব্যাপারটা ফ্যান্সি বল নয়, লেভি নয়, বা ড্রয়িং রুম নয়—হিন্দুর সাদৃশ্য-সরিক—আবহমান কাল প্রচলিত—একটী আনন্দোৎসব। এ ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত রাজকর্ম্মচারিগণ—দেশীয়দের সহিত যেরূপ ভাবে প্রাণ খুলিয়া মেশামিশি করিতেছেন—এ দৃশ্যটা দেখিবার জিনিশ বই কি? বাঙ্গলা দেশে—রাজধানী কলিকাতায়—আমরা এরূপ প্রীতি সম্মিলন বড় একটা দেখিতে পাই না। কি কমিশনার, কি জজ, কি ম্যাজিষ্ট্রেট,—সকলেরই গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের তোড়া, মুখে একটা স্বাভাবিক প্রীতির ভাব—। সেই আগ্রহপূর্ণ করমর্দ্দন প্রীতিজনক গ্রীবা-সঞ্চালনে—সেই স্বেতকৃষ্ণের প্রভেদ জ্ঞান বিরহিত সরলতা মণ্ডিত সংমিশ্রণ আলাপন সম্ভাষণ আমার দেখে বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর একটা কথায় বড় হাসি আসিতেছিল। মিঃ পিও এ ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি সাদা সাহেব, খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া তিনি ফুলের মালা গলায় দিবার সময় যেন একটু চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইলেন। সাহেবী পোষাকে এক ছড়া মালা গলায় দেওয়া যেন অসভ্যতা বিবেচনা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে সাদা সাহেবেরা আনন্দের সহিত মালা পরিতেছেন—অঙ্গুলি ডুবাইয়া আতর দান হইতে আতর লইতেছেন, তখন মিঃ পির, ন্যায় দাঁড়কাক বেশী সাহেবকে মনে মনে একটু লজ্জিত হইতে হইয়া ছিল বই কি? তিনি প্রথমে যে মালা ছড়াটি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সাহেবদের দেখাদেখি আবার গলায় দিলেন। আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না।

যাক্ সেসব কথা, মুজরা আরম্ভ হইল। বেনারস হইতে আনীত বাইজীরা যখন মিঠা ভৈরবীতে মিঠাসুরে "ভাউবাৎলাইয়া" গান আরম্ভ করিল তখন সকলেরই মনোযোগ সেইদিকে আকর্ষিত হইল। অনেক ইংরাজ মহিলা গানের অর্থবোধ করিতে না পারিলেও সংগীতের সুন্দর সুর লহরীতে—বংশীধ্বনি মোহিতা কুরঙ্গীর ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি ১টার সময় নাচ ভাঙ্গিল। আমরা বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম। পরদিন প্রাতে আমাদের নর্ম্মদা পাহাড় ও মর্ম্মর পাহাড় দেখিবার বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছিল। কাজেই সরাসর গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

বিজয়ার আনন্দ।

বিজয়ার কথা এই সময়ে বলিয়া রাখি। দশমীর দিন বিজয়োৎসব এখানকার অতি লোভনীয় দৃশ্য। রাজা গোকুলদাসের ২৫।৩০ খানি ফীটন গাড়ি এই সময়ে বাহির হয়। রামলীলারও ইহা শেষ দিন। এই দিনে রাজা গোকুলদাসের সাত মহলওয়ালা বাড়ীর সুমুখের সরোবর তীরে মহাসমারোহ। একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বাঙ্গালীদের দেখাদেখি হিন্দুস্থানীরাও দুর্গোৎসব করে। সকলেই যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তাহা নহে। ইহাদের অধিকাংশই পটের মত চিত্র করিয়া মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করে। পূজার ধুমধাম নাই। রাস্তার ধারে অস্থায়ী কুটীরে পূজার ব্যবহার। তারপর বিসর্জ্জন জাঁকজমক। অনেকে বিসর্জ্জন করে—আবার অনেকে পুষ্করিণির চতুঃপার্শ্বস্থ রাজপথে প্রতিমা লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার উপর রামলীলার আনন্দ। রামের বানর কটক, রাবণ বধান্তে ফিরিয়া আসিতেছে। নানাবিধ মুখোস্ পরা বানর মূর্ত্তি সেই বড় বড় ফিটনে চড়িয়া পুষ্করিণীর চারি পাশের রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। জনতাও খুব।

পরদিন প্রভাতে আমরা নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে যাত্রা করিলাম। ভোর ছয়টার সময় বাহির হইয়া বেলা নয়ঘটিকায় আমরা ভৃগুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই পঞ্চবটী পাহাড়। গাড়ী হইতে নামিয়াই পর্ব্বতের বিরাট দৃশ্যে মোহিত হইয়া পড়িলাম। যেন এক অজানিত রাজ্যে আসিয়াছি। এখানে যেন জরামরণ নাই, শোকতাপ নাই, হিংসা দ্বেষ নাই—এই বোধহইল। প্রকৃতির ন্যায় উদার হৃদয়া মাতা যেন বাৎসল্যস্নেহে পরিপ্লুত হইয়া সুন্দরবেশে মাতৃমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্বর্দ্ধনার্থে দেখা দিলেন।—

ক্রমশঃ—

---

* ঠগদিগের নিয়মিত দল ছিল। প্রত্যেক দলের একজন দলপতি থাকিত। পথিকের সঙ্গ লইবার সময়, প্রয়োজন মত তাহারা ভদ্র অভদ্র নানাবিধ বেশ ধারণ করিত। কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ তাহাদের ঘৃণিত কার্য্যের পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ ছিল। 'চিলিয়া মাজনা' অর্থাৎ পাত্র মজিয়া আন ইত্যাদি বাক্যে হতভাগ্য পথিকের কোন সন্দেহই হইত না—অতি সহজেই শিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিত।—

কঙ্কণ চোর।

(গল্প)

মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে আজ মহা হুলস্থূল। রাজা সরগরম, রাজা সরগরম, রাজপথে হুলস্থূল। রাজ-অন্তঃপুরে মহা গণ্ডগোল। সকলেরই মনে আতঙ্ক। সকলেরই মনে ভয়। দাসী মহলে একটা মহা ত্রাশ।

না জানি কার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে! রাজবাড়ীর চাকরী—কথায় কথায় মাথা যায়।

সহর কোতোয়াল পূর্ব্ব রাত্রিতে বিনিদ্র নেত্রে কাটাইয়াছে। রাজপুরীর প্রধান রক্ষক গজাধরলাল, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা মানিয়া ঘূর্ণিত নেত্রে, পুরীর প্রহরীদের উপর মহা তম্বি করিতেছে। রাজপথে পথিকেরা কাণে কাণে কথাটী আন্দোলন করিতেছে, নগরীর অন্দরমহলে যুবতীরা চোক্ ঠারিয়া, বৃদ্ধারা মুখ বাঁকাইয়া, কথাটা নানা ছন্দে আলোচনা যে করে নাই এরূপ নহে। পুরুষেরা একটু চাপা। কথাটা তাহাদের মনের মধ্যেই লুকাইয়া লুকাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজ সঞ্চয় করিতেছিল।

ব্যাপারটা কি খুলিয়াই বলি না কেন? না বলিলে কেন এত হুলস্থূল তাহা ত বুঝা যাইবে না! রাজার প্রধানা মহিষী মুরলার হাতের রত্নখচিত সুবর্ণ কঙ্কণ চুরী গিয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রে রাণী কঙ্কণ হাতে দিয়া সোণার পালঙ্কে শুইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রিতাবস্থাতে কেমন করিয়া অমন সুরক্ষিত, প্রহরী বেষ্টিত পুরীর অন্দরের নিভৃত কক্ষ হইতে, রাণী মার গা হইতে, অলঙ্কার চুরী গেল—কেহই ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

যে রাত্রে কঙ্কণ চুরি যায়, সে রাত্রে রাণীর কক্ষে সোহাগী বলিয়া এক দাসী শয়ন করিয়াছিল। রাজা সে দিন নগর প্রান্তে "বিলাসকাননে" ছিলেন; সেখানে একটা রাজকার্য্যের গোলযোগে রাত্রি অনেক হইয়া যায়। রাজা মহলে ফিরিতে পারেন নাই।

অতি প্রভাতে মহারাজা মহানন্দে বিলাস কানন হইতে ফিরিয়া পাটরাণী মুরলার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাণী তখনও নিদ্রিতা। সেই সোণার পালঙ্কে রূপভরা দেহখানি রত্নখচিত বহুমূল্য নীল কৌষেয় বসনে আবরিত করিয়া মগধের রাজরাজেশ্বরী নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। সেই সুকৃষ্ণ কেশজাল উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। কবরী খুলিয়া গিয়াছে। কবরী-প্রোথিত রত্নময় ফুলগুলি শয্যার দুই পার্শ্বে খুলিয়া পড়িয়াছে, সেই সান্ধ্য তাম্বুলরাগরেখাময় ফুল্লাধরে তখনও হাসির ক্ষীণ রেখা মুছে নাই। সেই সূক্ষ্ম কজ্জল রেখাঙ্কিত চক্ষু তখনও নিদ্রার মোহময় মন্ত্র শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কি সুন্দর! মগধের পাটরাণী মুরলা সুন্দরী কি সুন্দর! রাজা এরূপ ত অনেক বার দেখিয়াছেন—কই! কখনও ত ইহাকে অত সুন্দর দেখেন নাই।

প্রমোদ কাননে বসন্ত-মুখরিত, পিক কুহরিত, মুকুল বিলম্বিত, প্রসূনবিকশিত কুঞ্জে যখন চাঁদের আলোয় মর্ম্মরের বেদিতে বসিয়া মহারাজ মহারাণীর মাথায় পুষ্প স্তবক গুজিয়া দিয়াছিলেন, সেদিনও মুরলা রাণীকে এত সুন্দর দেখায় নাই। আর এক দিন দুর্গের উন্নত প্রকোষ্ঠে বসিয়া—আর এক চাঁদিনী রাত্রে, অঞ্জলি ভরা ফুল লইয়া দুই জনে নীচে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতেছিলেন। রাজার ফুলগুলা স্রোতের সঙ্গে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। রাণীর ফুলগুলি তটের নিকট এদিক ওদিক ভাসিতে ছিল। রাজা রহস্য করিয়া বলিলেন—মুরলা, তোমার ফুল ভাসিয়া যাইতেছে না কেন? রাণী বলিলেন—পুরুষের প্রেম অতি লঘু! আমাদের প্রেম মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভারি। যাহা লঘু তাহা ভাসিয়া যায়—যাহা ভারি তাহা চিরকালই গুরুত্বে পূর্ণ। রাজা সেই প্রকোষ্ঠের উপর বসিয়া—চন্দ্রালোকিত রাত্রে—রাণীর কথায় প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে কোকিল ডাকিয়াছিল, চাঁদ সেই সময়ে মেঘের ভিতর ঢুকিয়াছিল। রাণী বলিলেন, "ছি, মহারাজ! আপনার কি লজ্জা করে না? এই বসন্ত দূত কোকিল—অই আকাশের চাঁদ—এই চুম্বন রেখা দেখিয়া আমায় কত লজ্জা দিতেছে।"

তখনকার সেই লজ্জারাগরঞ্জিত মুখের জ্যোৎস্না ভাসিত সৌন্দর্য্যও রাজার মনে জাগিয়া উঠিল। সে অনেক দিনের স্মৃতি! দিন পুরাতন হয়—স্মৃতি পুরাতন হয় না। রাজা মনে মনে ভাবিলেন—সেদিনও, সেই যৌবনের প্রথম বিকাশে তাহার মুরলাকে এত সুন্দর দেখায় নাই।—

মোহ এমনই জিনিষ বটে! মায়ার দূতী ছলনায় পরিপূর্ণ। কখন মানবের মন অধিকার করিয়া বসে বলা যায় না। তা রাজাই কি, আর দরিদ্রই কি।

রাজা দেখিলেন—রাণী জাগিয়া উঠিতেছেন। বন্দীরা নহবৎখানায় ভৈরবীর সুর জাগাইয়া রাণীর স্বপ্ন রাজ্যটা ছারখার করিয়া দিয়াছে। রাণী জাগিয়াছেন।

সেই পদ্মনেত্র উন্মিলিত হইল। রাণী দেখিলেন সম্মুখে

দাঁড়াইয়া রাজ্যেশ্বর! একটু যেন অভিমান হইল। একটু যেন রাগ হইল। কাল রাত্রে কোথায় ছিলেন; সেই জন্য অভিমান! রাজকার্য্য কি এতই বড়!

রাজা হাসিয়া ডাকিলেন—"মুরলা!" মান, মেঘের মত ভাসিয়া গেল। অস্তগামী সূর্য্যের চঞ্চল কিরণরেখার মত সরিয়া গেল। মুরলা বলিল—"কেন মহারাজ!" রাজা বলিলেন—"রাগ করিও না। আর আমি বিলাস কাননে যাইব না। তুমি অত সুন্দর! আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে।"

মুরলা উঠিয়া গেল। পার্শ্বের ঘরে কর্পূরবাসিত সুশীতল জল, স্বর্ণ-ভিঙ্গারে পুরিয়া দাসী দাঁড়াইয়াছিল। মুরলা মুখ প্রক্ষালন করিয়া, কবরী বাঁধিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মহারাজের সম্মুখে আসিল।

সৌন্দর্য্যের মোহ শীঘ্র যায় না। কারই বা গিয়াছে! লোকে আজীবন হয়ত তাহার চোখে লাগা একই সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া চিতায় শুইয়াছে—তবু তাহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই! সংসারে তাহার হয়তঃ স্ত্রী পুত্র সবই ছিল, সবই হইয়াছিল, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার গুপ্ত চিন্তায় সে প্রাণের নিভৃতকন্দরে যেন একটা স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়া আসিয়াছে।

মহারাজ মহানন্দ হাসি মুখে ডাকিলেন—'মুরলা!'

মুরলা বলিল—'কেন মহারাজ!' মহারাজা বলিলেন 'মুরলা! তুমি কত সুন্দর'! মুরলা বলিল—'যিনি সমগ্র মগধের অধীশ্বর, শত সহস্র সুন্দরী যাঁহার চরণতলে লুটাইবার জন্য লোলুপ, তাঁহার সৌন্দর্য্য-ভোগ-লিপ্সার এত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কেন?'

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল—যদি জগতে সুন্দর কিছু থাকে—তবে সে মুরলা! যদি জগতে দেখিবার কিছু থাকে—তবে সে মুরলা। যদি জগতের আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকে—তবে সে মুরলা! যদি জগতে ভোগের কিছু থাকে—তবে সে তাঁহার বিবাহিত মহিষী মুরলা।

দীপ নিভিবার আগে জ্বলিয়া উঠে। মহারাজের প্রেম-বহ্নিতে মুরলার রূপ আজ শেষ আহুতি হইল। আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মহারাজ দেখিলেন—মুরলা বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। প্রকৃতি-পটে মুরলার সুন্দর মূর্ত্তির সারাংশ অঙ্কিত। কোকিল-কূজনে মুরলার কণ্ঠস্বর অনুকৃত। নদীর কলকলনাদী তরঙ্গে, মুরলার প্রেমোচ্ছ্বাস প্রবাহিত। পর্ব্বতের উচ্চতার ও মহৎ ভাবের সঙ্গে মুরলার প্রেমের শ্রেষ্ঠভাব যেন বিজড়িত। অতবড় মগধেশ্বর মুরলার সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া—চিত্ত বিকারের উন্মাদিনীশক্তিতে ভাবিলেন—জগৎ মুরলাময়! বাহ্য প্রকৃতি মুরলাময়! তাঁহার হৃদয় মুরলাময়! হায়, মগধের সিংহাসন! ছার রাজ্য! আর ছার সেই পিশাচী মুরলার কাছে সে?

কে সে পিশাচী—কে সে মুরলার তুলনায় অত নীচে নামিয়া পড়িল, তাহারা পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন।

কিন্তু এ পোড়া জগতে কিছুই যেন চিরস্থায়ী নয়! চিরস্থায়িত্বের সম্বন্ধে, মর জগতের সকল জিনিসে যেন একটা অভিশাপ লাগিয়া আছে! ফুলরূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া চিরস্থায়ী হয় না। কোরক বিকশিত হয়—সুবাস বিলায়, প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু ঝরিয়া পড়ে। মানুষ, সেত আরও বিনশ্বর। আজ যাহাকে দেখিতেছি—সে কাল আর নাই, চিতাভস্মে তাহার পরিসমাপ্তি; প্রবল তরঙ্গে নদীর দুকূল ভাঙ্গে, কতশত নগরীর সৌন্দর্য্য লোপ করে। তাহার শীতল গর্ভে কত লোক ডুবিয়া মরে। কিন্তু সেই নদী যখন ক্ষীণকায়া হইয়া মজিয়া যায় এবং যদি তাহার বুকের উপর কালের রেখাপাত হয়, চর পড়ে, তখন কত শোভাময়ী নগরী তাহার লুপ্ত-সলিলগর্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।—এ জগতে তবে থাকে কি? কিছুই নয়! হায় রে দুর্ব্বোধ্য নশ্বর প্রহেলিকা!

মহারাজ মহানন্দ, সৌন্দর্য্যভরা চখে—সেই বিমল প্রভাতে—প্রাণ ভরিয়া মহারাণীকে আলিঙ্গন করিলেন, ছি! ছি! আমাদের বলিতেও যে লজ্জা হয়! সে আলিঙ্গনে যেন প্রেমের স্থির নিথর সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। কত আদরের সম্বোধন, সম্ভাষণ, আলাপন, আপ্যায়ন—মধুর কথা যেন—সেই স্নেহবিপ্লুতকণ্ঠে বাহিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজা মুরলার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া আদরের সহিত বলিলেন—'মুরলা! আমি তোমারই! এ মুকুট—এ রাজদর্প, এ অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্মান, প্রতাপ সবই আজ তোমার চরণে বিক্রয় করিলাম, এতদিন তোমায় চিনি নাই, তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই—আজ তোমায় চিনিয়াছি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব।'

দক্ষিণ হস্তের কোমল স্পর্শে যেন আশা মিটিল না।

মগধেশ্বর সানন্দে মুরলার বাম হস্তখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাম হস্তের উপর পড়িল। কি ভাবিয়া—সেই সমাদরে-চুম্বিত হস্ত সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষেপ-ভঙ্গিতে যেন কত অবজ্ঞা, কত অনাদর, মুখ ভঙ্গী প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

মহারাজা—শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল! অত আদরের সম্বোধন! অত উদ্ভ্রান্ত রূপোন্মাদ, অত প্রেমালাপ, যেন কোথায় মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাসিয়া গেল। রাজা কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন, "মহারাণি!" মুরলা—আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন।—মহারাজের কণ্ঠস্বর—সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। তাহা হইতে যেন—স্নেহ ঝরিয়া গিয়াছে—প্রেম শুকাইয়াছে—আদর লোপ হইয়াছে—সোহাগ ভস্মীভূত হইয়াছে, মহারাণী মুরলা বিস্ময়ান্বিত চিত্তে—মগধেশ্বররের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেন মহারাজ!"

রাজা—বিজড়িত স্বরে উত্তর করিলেন—'তোমার বাম হস্তের স্বর্ণ কঙ্কণ কোথায়?' মুরলা রাণী সচকিতে—বাম হস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কঙ্কণ স্থানচ্যুত; তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস—তিনি হাত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া রাখেন নাই।—কি সর্ব্বনাশ! বাম হাত হইতে কঙ্কণ খুলিয়া লইল কে?

রাজা বলিলেন "মুরলা! কঙ্কণের সম্বন্ধে আমি তোমায় বরাবরই সাবধান করিয়া দিয়াছি। তোমায় যে দিন পত্নীরূপে অগ্নিসাক্ষী করিয়া গ্রহণ করি—সে দিনই তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম।—কিন্তু তুমি আজ অসাবধানতায় কেবল আমার নয়—তোমারও সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

মুরলার মুখ মলিন হইল। মুরলা কাতর ভাবে অশ্রু প্লাবিত নেত্রে করযোড়ে বলিল—'সাবধানই করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যেশ্বর! কই কখনও ত সাবধানতার কারণ বলিয়া দেন নাই।"

রাজা বলিলেন—'শুন মুরলা! তোমায় বিবাহ করিবার সময়—আমায় গুরুদেব গণনা করিয়া বলেন, এই নারীর সহিত তোমার সম্মিলন শুভকর নহে। সুলক্ষণা হইলেও ইহা হইতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি তখন—নবীন যৌবনে তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত! তুমি রাজকন্যা, পরমা সুন্দরী। চিত্রে তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হই। গুরুদেবের কথায় সংকল্প পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই।"

"গুরুদেব আমায় বলিয়াছিলেন—মন্ত্রপূতঃ সুবর্ণে মুরলার বাম হস্তের কঙ্কণ প্রস্তুত করিয়া দিব। সেই কঙ্কণ নিজ হস্তে পরাইয়া দিও। সাবধান—এই কঙ্কণ যেন কখনও না হারায়—বা চুরী না যায়।'

"আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "গুরুদেব! যদি ঘটনাবশে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার পরিণাম কি? "গুরুদেব বলিয়াছিলেন—"মহারাজ! এ ঘটনার পরিণাম বড় ভাল নয়। ইহাতে তোমার রাজত্বলোপ—মৃত্যু।—কেবল তোমার অনিষ্ট নয়—মুরলাও এ ঘটনায় মরিবে।"

"মুরলা—সেই মন্ত্রপূত কঙ্কণ আজ তুমি হারাইয়াছ। এখন বুঝিলে ইহার পরিণাম কি? যে অলক্ষ্য শক্তি ভবিষ্যতে এই সব ভীষণ ঘটনা নিচয়ের সৃষ্টি করিবে—তাহার কার্য্যপথ আমরা অবগত নহি। কিন্তু আমার গুরুদেব স্বয়ং সিদ্ধ, প্রজ্ঞাবান্! তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শনে আমার অবিশ্বাস নাই। বরঞ্চ বিশ্বাসের অনেক কারণ আছে। আজ তুমি আমার, তোমার ও এই বিশাল রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিলে।"

মুরলা কাঁপিতে কাঁপিতে মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে পদতল ধরিয়া বলিল—"মহারাজ! এ বিঘ্ন-প্রতিকারের উপায় কি? কে আমার এ সর্ব্বনাশ করিল?"

মগধেশ্বর মুরলার এ কাতর প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না। জ্যোতিষের ভবিষ্যৎ মীমাংসায়, গুরু-কথিত আদেশবাণীতে তাঁহার মন তখন আন্দোলিত। তিনি তখন আত্ম-অনিষ্ট চিন্তায় উন্মাদ্!

রাজা বিদ্যুৎবেগে মহারাণী মুরলাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া—দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

অন্তঃপুরে রত্নময় প্রকোষ্ঠে সেই রত্নগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাণী মুরলা—তাঁহার চক্ষে ডুবিয়া গেল। সেই সৌন্দর্য্যমোহ—যেন ছায়াবাজির চিত্রের ন্যায় উড়িয়া গেল।

মহারাজ মনে মনে বলিলেন—"মুরলা, সর্ব্বনাশী সে নিজে মরিল—আমাকেও মারিল।"

মহারাজ মহানন্দ তৎক্ষণাৎ গুপ্তপ্রকোষ্ঠে এক ক্ষুদ্র

সভা আহ্বান করিলেন। সভায় রহিলেন—পক্ককেশ বৃদ্ধ মন্ত্রী—সহরের প্রধান কোতয়াল—প্রধান প্রাড়্বিবাক—প্রধান ধর্ম্মাধিকার ও রাজপুরীর প্রধান প্রহরী। সকলেই উচ্চপদস্থ, সম্মানিত, উচ্চ বেতনভোগী। কিন্তু মহারাজের মুখ দেখিয়া—মুখের বিকৃত ভাব দেখিয়া—তাহাদের প্রাণ উড়িল। যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাজ্যের আশু অনিষ্টকারক কোন ঘটনার আবির্ভাবে গুপ্তকক্ষে এই রাজসভা আহূত হইত।

প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্যে চুল পাকাইয়াছে। তিনি অনেক দিন রাজ সংসারের নিমকভোজী। রাজার যৌবনেও তিনি বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে মহারাজ?"

রাজা বিকৃতকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মহারাণী মুরলার হাত হইতে কে কঙ্কণ অপহরণ করিয়া লইয়াছে! মন্ত্রী তুমি জান—এ কঙ্কণ সম্বন্ধে গুরুদেব কি আদেশ করিয়াছিলেন? রাজপুরীতে মহারাণীর কক্ষের অত পাহারার মধ্যে চুরি হইল, আমার ভবিষ্যৎ-সর্ব্বনাশ সূচিত হইল। এমন অকর্ম্মণ্য বিশ্বাতঘাতক পুরীরক্ষকদের আমি শূলে চড়াইতে চাই।"

রাজার কথায় সকলেই কাঁপিয়া উঠিলেন। রাজার প্রকৃতি সকলেই জানিতেন। তাঁহার আদেশ কখনও ব্যর্থ হয় নাই। মগধের সমস্ত প্রজা তাঁহার ভীষণ ভ্রূকুটিতে ভয় পাইত। মহারাজ মহানন্দের ক্রোধের মুখে কাহারও ত পরিত্রাণ নাই।

মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! আমাদের সময় দিন—কোতয়ালের উপর আদেশ প্রচার করুন। আমরা অপহৃত কঙ্কণের সন্ধান করিয়া দিব! মহারাজা মহানন্দ বলিলেন, "আমি পূর্ণ এক দিন সময় দিলাম। গতরাত্রে কঙ্কণ চুরি গিয়াছে।—আজ সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়;—ইহার মধ্যে যদি আমি অপহৃত কঙ্কণ ফিরিয়া না পাই—তবে সকলেরই পরিণাম আমার ন্যায় অশুভ।" তখন সভাভঙ্গ হইল।

সেই অশুভ দিনে যেন আকাশের উজ্জ্বল দেবতা লোকলোচন— দিবাকর অতিশীঘ্র আকাশ হইতে সরিয়া পড়িলেন। সমস্ত দিনের অনুসন্ধানেও কোন ফল হইল না। প্রণিধিনিয়োগেও কোন সন্ধান হইল না।

তাই সে দিন নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত করিয়াছি—তাহার কারণ এই যে, সেদিনে চোরের কোন অনুসন্ধান হয় নাই।—

রজনী গভীরা। চিন্তান্বিত চিত্তে রাজ্যের প্রধান প্রাড়্বিবাক নিজের ও সকলের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছেন, রাজ্যের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের অনুমান করিতেছেন, এমন সময়ে এক গুপ্ত প্রণিধি তাঁহাকে একখানি পত্র দিয়া গেল। তিনি পত্রোন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন; তাহাতে লেখা আছে—"কঙ্কণ চুরির সন্ধান করা আপনাদের কর্ম্ম নহে। আপনারা প্রাণের চিন্তায় কাতর। চোর কাল নিজে রাজসভায় উপস্থিত হইবে।"

প্রাড়্বিবাক মহাশয়—আসন ত্যাগ করিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যে প্রণিধি এই পত্র আনিয়াছিল তাহাকে বলিলেন—"এ পত্র—তুমি কোথায় পাইলে? কে তোমায় দিল?"

প্রণিধি বলিল—"মহাভাগ! মহাকালের মন্দিরবাসিনী শৈব সন্ন্যাসিনী আমায় এই পত্র দিয়াছেন। তিনি কোথায় এ পত্র পাইলেন—এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অমি যুক্তিযুক্ত ভাবিনাই। তিনি খালি বলিয়া দিয়াছিলেন "এ পত্র তোমাদের প্রধান প্রাড়্বিবাক মহাশয়কে দিও।"

প্রাড়্বিবাক মহাশয় রাজকার্য্যে চুলগুলি শুক্ল করিয়াছেন। হঠিবার পাত্র নহেন। তিনি এই পত্রের রহস্য-ভেদে কৃতসংকল্প হইলেন! প্রণিধিকে বলিলেন—"এ পত্র যে দিয়াছে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। তোমাকে আমার সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর কাছে যাইতে হইবে।"

সেই গভীর রাত্রে প্রধান ধর্ম্মাধিকার ও প্রণিধি দুই জনে পাটলীপুত্রের রাজপথ অতিক্রম করিয়া মহাকালের মন্দিরে পৌঁছিলেন। মন্দিরদ্বার তখনও রুদ্ধ হয় নাই। সেই শৃঙ্খলবিত কাংস্য দীপাধারে তখনও ঘৃতসিক্ত বর্ত্তিকা সেই প্রস্তর মন্দিরকে আলোকিত করিতেছিল। মন্দির-বাসিনী সন্ন্যাসিনী সে সময় অজিন বিস্তৃত করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে ভজন গাহিতেছিলেন।

প্রাড়্বিবাকের সহিত সন্ন্যাসিনীর পরিচয় ছিল। সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি ধর্ম্মাধিকার! কেন এ রাত্রে আসিয়াছ? সেই পত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে, কেমন?"

প্রাড়্বিবাক বলিলেন—"মা! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী। এই পাটলিপুত্রের বিঘ্নবিনাশক মহাকালের সেবিকা। রাজ্যের বড় বিপদ উপস্থিত। মহারাজ উন্মাদপ্রায়। মহারাণী দিন রাত কাঁদিতেছেন। কাল প্রাতে সভা আহূত হইবে। যদি চোর ধরা না পড়ে, তাহা হইলে আমাদের রাজকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে না। সকলেরই মাথা যাইবে।"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"মহারাণী মুরলার কঙ্কণচুরির কথা আমি শুনিয়াছি। তাহাতে যে অনিষ্ট-সম্ভাবনা তাহাও জানি। যে ব্যক্তি আমায় পত্র দিয়া গিয়াছে, তাহার নাম জানিলেও করিব না। বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না।"

প্রাড়্বিবাক মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া সন্ন্যাসিনীর পদপ্রান্তে রাখিলেন—বলিলেন "মা! চোর নিজে উপস্থিত হইবে বলিয়াছে। কথাটায় বিশ্বাস অবিশ্বাস দুইই হয়। চোর যে কেবল লোভে পড়িয়া চুরি করিয়াছে তাহা নহে! ইহার মধ্যে আরও কোন রহস্য নিহিত আছে। তাহা না হইলে সে ইচ্ছা করিয়া ধরা দিবে কেন? আপনি তাহার নাম বলিয়া দিন্। তাহাকে ধরিতে পারিলে বাহাদুরী আছে। সে নিজে ধরা দিলে আমাদের অকৃতিত্ব প্রমাণিত হইবে। জন্মের মত রাজার কাছে, রাজ্যের কাছে, সুনাম ডুবিবে! বলেন কি? মহারাণীর অন্তঃপুরের মধ্য হইতে, তাঁহার গাত্র হইতে অলঙ্কার চুরি! তাও পুরুষ চোর!!"

সন্ন্যাসিনী কি ভাবিয়া বলিলেন—"তা সত্য! কিন্তু তোমাদের মানরক্ষার জন্য আমি বিশ্বাসঘাতিনী হই কেন? তোমাদের সাধ্য থাকে—তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতায় স্বদেশীয় শিল্প প্রদর্শনী।

এবার কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত একটী পরম শুভকর নব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে;—সে'টি ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী। এই মহামেলায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট শিল্পের সমাবেশ হইয়াছিল; অতি অল্প দিনের ঘোষণায় ইহাতে যেরূপ ভূরি পরিমাণ দ্রব্যের আমদানী হইয়াছিল, উপযুক্ত সময়ের উদ্যোগ যে ইহার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতার সহায়তা করিত, তাহাতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যে দিন মেলায় প্রথম যাই, সেদিনও কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছিল। দূর হইতে সঘন করতালিধ্বনি ও অবিশ্রান্ত হর্ষনিনাদ, মহাসভার আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহিয়া আনিতেছিল; এদিকে মেলার দর্শকবৃন্দের বিস্ময়সঞ্জাত অস্ফুট আনন্দোচ্ছ্বাস বহিঃস্থ জনতার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতেছিল। যেমনই শিল্পমণ্ডপে প্রবেশ করিলাম—যেমনই চিরহাস্যময়ী শিল্পলক্ষ্মীর চরণতলে উপস্থিত হইলাম, অমনই সমস্ত চাঞ্চল্য ও সকল কোলাহল ভুলাইয়া তাঁহার সেই নব আশাদৃপ্ত নব গৌরবোদ্ভাসিত রমণীয় কমনীয় মূর্ত্তিখানি মানস পটে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই বিস্ময়-বিগলিত আনন্দ, পুলকিত ভক্ত-দর্শকের হৃদয় উচ্ছ্বাসিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল,—"জয় জয়, তব জয় হে"।

উৎসাহ উল্লাসে প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ করিলাম। এত বিভিন্ন বিচিত্র মনোরম স্বদেশী দ্রব্যের এরূপ সুবৃহৎ একত্রীকরণ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানি না। যে দিকে যাই, কেবল শৃঙ্খলা ও শোভা। দেশীয় শিল্পীর গুণপনা দেখিয়া সকলকেই অবাক্ হইতে হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে বিলাসের বিবিধ উপকরণ ত ছিলই, তা ছাড়া নিত্য ব্যবহার্য্য বহুবিধ জিনিশ প্রদর্শিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে অনেক দ্রব্য এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, অতিবড় বিলাসী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র গৃহস্থকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল—বাহ্যিক চাক্‌চিক্য অথবা কার্য্যকারীতার হিসাবে বিলাতি দ্রব্য অপেক্ষা সে গুলি কোনও অংশেই ন্যূন নহে; তবে যাঁহারা "ইস্তক বিলাতি জুতা, লাগায়েদ্ বিলাতি কুকুর" ভাল বাসিয়া থাকেন এবং উহাদিগকেই রুচির সিংহাসনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কথা অবশ্যই স্বতন্ত্র। এই নূতন সভ্যতাগর্ব্বিত বিলাসপ্লাবিত দেশে যে বাহ্যিক চাক্‌চিক্য ঘটার খাতিরে দ্রব্যাদির গঠন প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে—হালের অনেক চতুর শিল্পী একথাটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, এবারের মেলার প্রদর্শিত পণ্যগুলিই তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি পর্য্যন্তও এ দেশে এমন নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তুত হইতে পারে, এই মেলা দেখার পূর্ব্বে, অন্ততঃ আমার ত সে ধারণা

ছিল না। পরের বিষয় লইয়া আমরা এতই ব্যাপৃত যে, ঘরের সংবাদ রাখিবার অবকাশ আমাদের কম। একটা বিলাতি জিনিস দেখিয়া তাহার সমস্ত ইতিবৃত্ত ফস্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে আওড়াইয়া দিতে পারি। এমন কি দ্রব্য বিশেষটীর জন্মভূমিতে ক'টা পাহাড়, ক'টা নদী, সেখানকার আবহাওয়া, চালচলন কিরূপ, তাহার খুঁটিনাটি খবরটি পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতার অপ্রশংসা করা যায় না!

এবার আমরা কেবলমাত্র স্বদেশী জিনিসের ধূলিমাটি ঝাড়িয়া উহাকে ভদ্রবেশ পরাইয়া শিল্পমণ্ডপে ছাড়িয়া দিয়াছি। এটি আমাদের উদ্যোগ-পর্ব্ব, এখনও আমাদের এ সম্পর্কিত অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যই অনারব্ধ রহিয়াছে। এবার আমরা স্বদেশী জিনিসের কতকগুলি মাজা-ঘষা নমুনা প্রদর্শন করিয়া দেশীয় কলা-কৌশলের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ও বিস্ময় আকর্ষণ করিয়াছি মাত্র; যাহাতে এই শ্রদ্ধার ভাবটি সাধারণের মনে দৃঢ় মুদ্রিত হয় ও চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে বাকী আছে। আর করিবার আছে—জিনিস গুলি যাহাতে সহজ ও সুলভে প্রাপ্য হয়, তাহার আদর্শগুলি অবলম্বনে ঐ সকল জিনিস বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করাইয়া দেশময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে; তাই বলি, কার্য্যের গুরুতর ভাগ এখনও অসমাপ্ত পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে সাময়িক উত্তেজনার পরেও কর্ম্মপথটিকে সর্ব্বদা সচঞ্চল রাখিতে হইবে; অনেক ঝঞ্ঝা, বজ্র, কড়কাপাত মস্তকে আশীর্ব্বাদের ন্যায় ধারণ করিতে হইবে; অনেক আবর্জ্জনা জঞ্জাল ঝাটাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া যাইতে হইবে। স্বীকার করি, উহা সময়সাপেক্ষ, তদপেক্ষাও আমাদের সমবেত যত্ন-সাপেক্ষ। দুই চারিটা উত্তেজক প্রবন্ধ রচনা বা উদ্দীপক বক্তৃতা দানে উহার একাংশের মাত্র সহায়তা করিতে পারে। চাই প্রচুর অর্থবল, বিপুল জনবল, কার্য্যে এক-নিষ্ঠতা ও অটুট অধ্যবসায় এবং সর্ব্বোপরি অসাধারণ স্বার্থত্যাগ। নহিলে যদি আমরা শুদ্ধ কয়েকটী বিদেশী বণিককে চমকাইবার জন্য ঢাক ঢোল বাজাইয়া এই নব অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়া থাকি, তবে উহার বিসর্জ্জনেরই সূচনা করিয়াছি বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা বিজ্ঞোচিত ভ্রূকুঞ্চন সহকারে নব অনুষ্ঠান মাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত নহি, তবে উৎসাহদৃপ্ত শুভ ব্যাপার গুলিকে অহেতুক উদ্বেগের দীর্ঘ নিশ্বাসে নিষ্প্রভ বা নির্ব্বাপিত করিতে ইচ্ছুক নই। বরং আশাপরায়ণ ও বিশ্বাসবান্ হইয়া অর্ব্বাচীন বলিয়া পরিচিত হইতে কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত নহি। এই তরুণ অনুষ্ঠানে একদিন সুপরিণতি ও সমৃদ্ধির বলে আপনার মহৎ লক্ষ্যকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে আপনি কৃতার্থ হইব, এ ভরসা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। সেই "একদিন" দূরে বা বহুদূরে থাকুক, উহার অস্তিত্ব বিশ্বাস কল্পনায় জাগাইয়া রাখা ভাল। স্বীকার করি, সেই দূর দিনকে নিকটে আনয়ন করা বহু কালের ধৈর্য্য ও তপস্যার আবশ্যক; উহা আলস্যের মত সহজ অথবা পরনিন্দার মত মুখরোচক নহে, তথাপি উহা আমাদিগেরই কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয়। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতে কোঽত্র দোষঃ"—এই কবিবাক্য মানিতে হইবে। নহিলে ভবিষ্যতের ইতিহাসে এ যুগের ভারতবাসীর নামে কলঙ্কের কালিমাময় দাগ চিরমুদ্রিত হইয়া যাইবে।

এখন আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, অতীত গৌরবের জন্য কাঁদিয়া আমাদের অনেকটা সময় বাজে খরচ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ তাহার বর্ত্তমানটিকে বেশ গুছাইয়া তুলিতেছে, তাই প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে আমরা দিন দিন হঠিতেছি। শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে এ কথাটা খুব বেশী খাটে। আমাদের অনেক ছিল, কে তাহা অস্বীকার করে? কিন্তু এবার যে প্রমাণ হইয়া গেল, আমাদের এখনও অনেক আছে, কেবল বর্ত্তমানের অযত্ন ও উপেক্ষায় তাহা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতিকারে যথোপযুক্ত আয়োজন হইলে বুঝিব যে, আমরা কল্পনা ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছি।

ইচ্ছা ছিল, প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলির উল্লেখ করি, কিন্তু মাসিক পত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থানাভাব। যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ চান—তাঁহারা সাময়িক পত্র খুঁজিলেই তাহা পাইবেন। কেবল একটি জিনিসের উল্লেখ করিতেছি। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত কেলকার মহাশয়ের নবোদ্ভাবিত তাঁতযন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহা অনেকেই জানেন। সেই যন্ত্রটির আদর্শ এই মহামেলাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল! সে দিন ইহার কার্য্যকারীতারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই একটি মাত্র যন্ত্র দেশে চলিয়া

গেলে বস্ত্র বয়নের অনেকটা 'মজুরী' বাঁচিবে ; সুতরাং সেই অনুপাতে ব্যয়ও হ্রাস হইবে। এইরূপে এ দেশে বস্ত্র ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হইয়া বিদেশী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় টিকিয়া যাইবে। এখন এই আদর্শ অবলম্বনে রীতিমত কাজে খাটাইবার উপযোগী যন্ত্র তৈরি করা আবশ্যক। উহা ব্যয়সাধ্য। আশা হয়, কেলকার মহাশয়ের কার্য্যকরী প্রতিভার পুরস্কার কেবল গোটাকতক ফাঁকা অভিনন্দনেই পর্য্যবসিত হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তহস্ততারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রদর্শনীর ভবিষ্যৎ সাফল্যের একটি শুভ লক্ষণ, ধনী সম্প্রদায় স্বদেশের এই চরম ও পরমশুভকর অনুষ্ঠানে আগ্রহের সহিত যোগ দান করিয়াছেন। এবার তাঁহারা শুধু দূর হইতে বিন্দু বিন্দু অনুকম্পা বৃষ্টি করেন নাই। মাতৃভূমি সন্তানের সেবাই চাহেন—অনুগ্রহকে কৃপার চক্ষে দেখেন।

এ দেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এক দিকে যেমন উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং অক্লান্ত কর্ম্মিষ্ঠতার প্রয়োজন, অন্য দিকে ধনবলের তেমনি আবশ্যক। দেশের ধনিগণ হস্ত প্রসারণ করিলে স্বদেশী মৃতপ্রায় শিল্পের পুনর্জীবন সঞ্চার সহজসাধ্য হইয়া উঠে। তাই এবার তাঁহারা স্বদেশী শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের আশা-আনন্দ শ্রদ্ধামিশ্রিত কৃতজ্ঞতার জয়মাল্যে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আর একটী অনুরোধ, তাঁহারা যেন স্বদেশী পাইতে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করেন। এ কথা বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবার কারণ এই যে, মূল্যের তারতম্যজনিত অসুবিধা তাঁহারা অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসাধারণের নিকটেও আমাদের এই প্রার্থনা। অবস্থাভেদে অনেকে হয়ত কোন কোন স্বদেশী ও বিদেশী দ্রব্যের মূল্য তুলনা করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে পারেন ; কিন্তু যথাসম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিব, এই বৃহৎ লক্ষ্য ও মহৎ সঙ্কল্প তাঁহাদিগকে স্বার্থত্যাগে উৎসাহিত করিবে, এরূপ আশা করা যায়। আশু ত্যাগস্বীকারে আমরা পরিণামে লাভবানই হইব, এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

আর একটা কথা বলিলেই এ প্রবন্ধের শেষ হয়। এই শিল্প প্রদর্শনী ব্যাপারে রাজপুরুষগণের সংমিশ্রণ না দেখিয়া অনেকে হয় ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু এজন্য রাজপুরুষগণের প্রতি অভিমান করা চলে না ; রাজ-নীতি-চর্চ্চা-বিরহিত অনুষ্ঠান মাত্রেই যে গবর্ণমেণ্ট যোগ দিবেন এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নাই। আমরা কথায় কথায় যখন তখন গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়া আবেদন ও নিবেদনের বাহুল্যে রাজপুরুষদিগকে যেরূপ বিব্রত করিয়া তুলি, তাহাতে অনেক সময় অনেক আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুতর অনুষ্ঠানগুলি, তাঁহাদের নিকট শুধু 'হুজুগ' বলিয়া পরিগণিত হওয়া বিচিত্র নহে। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য আপাততঃ গভর্ণমেণ্টকে তেমন ভাবে জোর করিয়া ধরিবার দাবী আমাদের এখনও জন্মে নাই। কারণ, এখনও আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া যায় নাই। আমাদিগকে আত্মবলেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি আপাততঃ আমাদিগের নিজের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে। আমাদের কার্য্যতায় যদি গভর্ণমেণ্টের প্রতীতি জন্মাইতে পারি যে, আমরা কায়মনোবাক্যে ও স্থির সঙ্কল্পে দুষ্প্রাপ্য রাজনৈতিক অধিকারের আকাঙ্ক্ষা এবং শাসননীতির বিরোধীভাবমাত্র বর্দ্ধিত এই আত্মোন্নতির পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইলে কোন না কোনও দিন অবশ্যই প্রজাহিত-ব্রত চালিত গবর্ণমেণ্টের প্রীতি-আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইব। নহিলে ইংরাজের ন্যায় আত্মনির্ভর পরায়ণ, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন জাতির গবর্ণমেণ্টকে বালকোচিত ক্ষুদ্র আবদারে ভুলাইতে যাওয়া অথবা আপনাদিগের লজ্জাকর অসহায় অবস্থার কথা জলদগর্জ্জনে শুনাইয়া দিয়া বিচলিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ও ধৃষ্টতার কার্য্য। এরূপ করিয়া আমরা দিন দিন ঘরে পরে সকলের বিদ্রূপ ও অশ্রদ্ধার প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র।

সর্ব্বশেষ বক্তব্য, এই মহানগরে যাঁহাদিগের উদ্যোগে এই সুবৃহৎ শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, তাঁহারা আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন, যাহাতে বর্ষে বর্ষে অধিকতম প্রসার ও ব্যাপ্তির সহিত এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, যথা সময়ে যেন তাঁহারা সে পক্ষে উদ্যোগী হয়েন। বর্ত্তমানের অবসাদে ম্রিয়মাণ কলিকাতা দেখিয়া মনে হয় না, এখানেই কিছু

দিন পূর্ব্বে বিপুল সমারোহে ঐ মহামেলা বসিয়াছিল। সেই হর্ষমুখর শত সহস্র দর্শকের চিত্তমুগ্ধকর শিল্প-মণ্ডপ এখন সকল শোভা ও সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সেই অদূর অতীতের স্মৃতি এখনও প্রাণে প্রাণে জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। মনে হয়, বিগত ইংরাজিবর্ষের শেষে ভারতবর্ষের যে নব ভাগ্য সূচনা হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সগৌরবে রাজত্ব করিবে। তাই বলিতে হয়, ইংরাজি ১৯০১ সাল সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে স্মরণীয় ও বরণীয় বৎসর।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

গাজি মিয়ার বস্তানি।*

গাজি মিঁয়ার বস্তানি একখানি বিচিত্র, সমাজচিত্র সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই, এমন রস দুর্ল্লভ! কটু, তিক্ত, কষায়,—অম্ল, অম্লমধুর,—মধুর, অতি মধুর,—যাহা চাও, তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর করুণরস উছলিয়া পড়িতেছে।

গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটুদোষ পরিহার করিতে পারেন না; স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। সুতরাং গাজি মিঁয়ার কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাসপ্ আঘাতধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাতরক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ছুটিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে! সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক! হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ যাই নাই! এরূপ গ্রন্থের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

বড় দপ্তরের নাম বস্তা ; ছোট দপ্তরের নাম বস্তানি। ভাগ্যে গাজি মিঁয়া একটি ছোট খাট বস্তানির সৃষ্টি করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। এই বস্তানি নাকি ২৪ নখীতে সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে ২০ নখী আপাততঃ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হইয়াছে,—তাহাই যথেষ্ট! ঘটনাগুলি উপন্যাসের ন্যায় বিস্ময়জনক হইলেও, সত্যের ন্যায় সরল; লিপি-কৌশলগুণে পাত্র পাত্রীগণের চরিত্র এমন পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে,—যেন চিনি চিনি করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশের ক্ষমতা জন্মিতে পারে।

চৌকিদার, কনেষ্টবল, দারোগা, ইন্সপেকটার বাবু,—সব রেজিষ্ট্রার, সব্‌ডেপুটী, ডেপুটী, মুন্সেফ,—শিক্ষক, গোপন শিক্ষক,—উকিল, মোক্তার জেলখানার ওয়ারডার, ও সরকারী ডাক্তার বাবু,—ইঁহাদিগকে না চিনেন মফঃস্বলে এমন বাঙ্গালী দুর্ল্লভ! সুদখোর মহাজন, কলহলিপ্ত জমিদার, ফিকিরবাজ নায়েব গোমস্তা, ধড়িবাজ অমাত্যবর্গ,—ইহাদিগের সহিত পরিচয় নাই, মফঃস্বলে এমন কে আছেন? ইঁহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য পিতামাতাও বিদ্যালয় যথেষ্ট করিয়াছে ; তথাপি এখনও ইঁহাদের মধ্যে মানুষের মত মানুষ দুর্ল্লভ,—শতকরা মেকির প্রভাবই বুঝি বেশী। রাজধানীতে বা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে নানা কারণে ইঁহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইতে পারে না ; মফঃস্বলে ইঁহারাই কৃষ্ণবিষ্ণু, সুখ দুঃখের নিয়ামক, দেশের দশজন, দশজনের মধ্যে এক জন, গণ্য মান্য বদান্য লোকে দুই হাত তুলিয়া ধন্য ধন্য করে! কিন্তু ইঁহারা কি চরিত্রের লোক, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। আইন আদালত আছে, মানহানি ও ঘানিগাছ আছে, অন্ধকার পল্লীপথের তরুবল্লী সমাচ্ছন্ন নিভৃত সঙ্কেতভূমি হইতে অকস্মাৎ মাথার উপর লাঠিয়ালের লাঠি পড়িবার সম্ভাবনা আছে! গাজি মিঁয়া ফকির—বস্তানিটি গঙ্গাযমুনার সংযোগক্ষেত্র মহাতীর্থ প্রয়াগের অতল সলিলে বিসর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া নিরুদ্দেশ হইবার পর, প্রকাশক আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ইহাকে জনসমাজে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ভাল কাগজ, ভাল ছাপা এবং ভাল বান্ধা, কাপড়ের মলাটে স্বর্ণাক্ষর—এখন গ্রন্থগৌরবের পরিচয় স্থল। সুতরাং দরিদ্রের পক্ষে বাঙ্গালায় গ্রন্থ প্রকাশ করা, আর প্রয়াগসলিলে পাণ্ডুলিপি বিসর্জ্জন করা, প্রায় এক কথা বলিলেও চলে।

উপন্যাসের নায়ক নায়িকা কিছুতেই মরে না, মরিলেও নিস্তার পায় না ; একজনের কলমে যে মরিয়া যায়, আর একজন তাহাকে বাঁচাইয়া আবার উপন্যাস জুড়িয়া বসে। ইহা এক শ্রেণীর উপন্যাস। আর এক শ্রেণীর উপন্যাস আছে, যাহার নায়ক নায়িকা আগাগোড়া কেবল মরিবার জন্যই পাগল, ঐ মরিল, ঐ ডুবিল, ঐ বুকে ছুরি বসাইল, ঐ বুঝি গলায় দড়ি ঝুলাইল, হায়! হায়! ঐ বুঝি ফুরাইল,—সকলই ফুরাইল! কেহ ইহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। ইহারা মরে—কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মরে না। মরিবার সময়েও মনে হয়,—উপন্যাসের খাতিরে দায়ে ঠেকিয়া মরিতেছে! গাজি মিঁয়ার নায়ক নায়িকা ইহার কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাহারা রক্তমাংসের মানুষ ; খায় শোয় ঘুমায় ; সময়ে স্বাভাবিক ভাবে কেহ কেহ মরিয়াছে, কেহ বা মরিবার জন্য ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে বার্দ্ধক্যলাভ করিতেছে ; আজি হউক কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক,—সকলেই মরিবে, কেহ থাকিবে না! কেবল থাকিবে, তাহাদের সুকীর্ত্তি এবং কুকীর্ত্তি ; তাহা লইয়াই গাজি মিঁয়া উপন্যাস সুসজ্জিত করিয়াছেন।

অধিকাংশ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা লেখকের কল্পনাসম্ভূত সদ্‌গুণ গরিমাযুক্ত আদর্শ নর নারী ; নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রেমের প্রভাবে আত্মত্যাগ, এবং কোন স্থলে বিরহ, কোন স্থলে মিলন,—ইহাই বর্ণনার বিষয়। গাজিমিঁয়ার নায়িকা সুন্দরী—বড়ই সুন্দরী—কিন্তু নিছরীর ছুরী ; মিষ্ট অথচ প্রাণনাশক! তাঁহার মন্ত্র—স্বার্থসিদ্ধি, অর্থাৎ কার্য্যোদ্ধার। তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য কি না করিয়াছেন ; কি না করিতে পারেন তাহাতে ধর্ম্মের ভাণ আছে, ধর্ম্মভাব নাই ; প্রেমের ভাণ আছে, প্রেম নাই ; সর্ব্বাঙ্গে সভ্যতার আবরণ আছে, অথচ চরিত্র নিতান্তই উলঙ্গ,—বীভৎস ;—চাহিবামাত্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হয় ; কেবল দেশের খাতিরে, ভদ্রতার অনুরোধে, পদগৌরব-মাহাত্ম্যে সম্মুখে সেলাম না করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই!

গাজি মিঁয়া যেমন কল্পিত নাম, গ্রন্থবর্ণিত সমস্ত পাত্র পাত্রীর নামও সেইরূপ কল্পিত। কল্পনা বাছিয়া বাছিয়া ভাল নাম বাহির করে নাই ; খুঁজিয়া খুঁজিয়া অদ্ভুত নামের তালিকা তৈয়ারি করিয়াছে। তাহাতে যে একটু বাহাদুরী নাই, এমন নহে। যে নিতান্ত ভাল মানুষ, তাহার নাম ভেড়াকান্ত। শান্ত, শিষ্ট, ধর্ম্মভীরু, অথচ স্পষ্টবাদী ; ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে গিয়া কখন কখন শৃঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত ;—দরিদ্র অথচ তেজস্বী। এমন মানুষ সংসারের হিসাবে ভেড়াকান্ত বলিয়াই পরিচিত, কেন না,—যে পরকালের প্রলোভনে ইহকালের সুখ পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যায়, সে মহামূর্খ ভেড়াকান্ত! তাহার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ হইলেও, সে ভেড়াকান্ত। গাজি মিঁয়ার উপন্যাসে যাঁহার নাম ভেড়াকান্ত, তিনিও এই শ্রেণীর লোক। ভেড়াকান্ত শান্ত, সুবোধ, সুশীল বালকের ন্যায় একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া জীবন কাটাই-

---

* মূল্য ১৷৷০ টাকা। কুষ্টিয়া—লাহেনীপাড়া শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেনের নিকট প্রাপ্তব্য।

বার পাত্র নহে। সে পথের ফকীর—অথচ রাজা বাদশাহকে শিক্ষা দিবার জন্য সংবাদ পত্রে সমালোচনা লিখিয়া থাকে; হাকিমের হুকুমের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিতে চাহে; দেশের দশজনকে ডাকিয়া গোপনে সভা বসাইয়া মন্ত্রণা আঁটিয়া প্রয়োজন মতে "মূর্খস্য লাঠৌষধের" ব্যবস্থা করে। তাহার জ্বালায় মহকুমা, অর্থাৎ মহকুমার মালিক;—হাকিম ও জমিদার, পুলিশ ও পাষণ্ডদল ব্যতিব্যস্ত! কে একাদশীর দিনে ডুব দিয়া জল খাইল, ভেড়াকান্ত তাহারও সন্ধান রাখে। বড় উকীল বাবু গোপনে মক্কেলগৃহে পসার প্রতিপত্তির খাতিরে নিশাকালে একটু অখাদ্য গলাধকরণ করিবার সময়ে সুধারসে গলা ভিজাইয়া লইলে, পরদিন কাছারীতে তাহা লইয়া ঢি ঢি পড়িয়া যায়;—কে দেখিল, কে রটাইল, কেহ সহসা জানিতেও পারে না!

ভেড়াকান্তকে অনেকে ভাল বাসে, অল্প লোকেই দেখিতে পারে না। কিন্তু যাহারা ভাল বাসে তাহারা নগণ্য দরিদ্র,—স্কুলের বালক, অথবা বাজারের দোকানদার। আর তাহাকে দেখিতে পারেন না—দেশের জমিদার ও জমিদারের কর্ম্মচারী, মহমকুমার হাকিম ও হাকিমের অনুচরবর্গ। ভেড়াকান্তকে শিক্ষা দিবার জন্য গণ্য মান্য লোকে কত ষড়যন্ত্র করিয়া জেলে পাঠাইয়াছিল, সেই কাহিনী পরিস্ফুট করিবার জন্যই উপন্যাসের অবতারণা। ইহা উপন্যাস হইলেও মফঃস্বলের অনেক সত্য ঘটনা এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। লেখকের লিপিকৌশল এই উপন্যাসকেও একটি সত্য ঘটনা মূলক মোকদ্দমার নথীর আকারে গুছাইয়া তুলিয়াছে।

জেলার নাম নিশ্চিন্তপুর, মহকুমার নাম অরাজকপুর, ব্যোম ভোলানাথ সেখানকার দণ্ডমুণ্ডের নিয়ামক ডেপুটী সাহেব অর্থাৎ সব ডিভিসনেল অফিসর। তিনি স্থানীয় জমিদার-রমণী বেগম ঠাকুরাণীর হাত-ধরা। বেগম ঠাকুরাণী নামটী দেবী চৌধুরাণীর মত মিষ্ট নহে, হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনের কিম্ভূত কিমাকার বস্তু। হট্টু নট্টু নামক দুই মুসলমান ভ্রাতা শিক্ষার আলোক পাইয়া তাঁহাদের বিধবা ধনশালিনী ভগিনীকে কলিকাতায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া পর্দ্দার বাহির করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী করিয়াছেন; তাঁহার সংসারে নির্ব্বিবাদে নেশাটা আসৃটা চালাইয়া আটচালার কোণে কোনরূপে দিনচালাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন;—আর ভগিনী বেগম ঠাকুরাণী অন্দরকে বৈঠকখানায় পরিণত করিয়া দেশের হাকিম উকীল মাষ্টার ডাক্তারের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অভিনব শিক্ষার পরীক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়াছেন। বেগম ঠাকুরাণীর চাহনী বিশ্ববিজয়িনী। কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে চাহনি ব্যোম্ ভোলানাথের উপর ঘন ঘন নিপতিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে যাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল। উত্তর সাধক পদে মুন্সেফ ঋতুরাজ বাবু সহাস্যে আরোহণ করিলেন, নবাগত সরকারী ডাক্তার বাবুও বেগম ঠাকুরাণীর সহায়তা করিবার জন্য সম্মত হইলেন। কথাবার্ত্তা কল কৌশল সমস্তই স্থির হইয়া গেল, ঠিক সেই সময়ে পুলিশের লোকেও ভেড়াকান্তকে জড়াইয়া মোকদ্দমা জুড়িয়া দিল, সোণায় সোহাগা হইল। বিচার বিভ্রাটে ভেড়াকান্তের দুই বৎসরের জেল হইল, উৎকোচ মহিমায় জেলে বসিয়া গৃহিণী-প্রেরিত সুখাদ্য ভোজন করিতে করিতে জজ সাহেবের আদেশে প্রথমে জামিন, পরে একেবারে খালাস পাইয়া ভেড়াকান্ত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন!

মফঃস্বলের কথা মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজি মিঁয়া প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; তন্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকেরই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে! কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, বিনতাধিনা, তেনাচেরা, দাগাদারী, তুড়ুক পাহাড় ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহা কিছু রক্ষা! বস্তানির পল্লী-চিত্র ইংরাজরাজ্যের লজ্জার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজরাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্ণিস, ভিতরে টিনের পাত; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপর আপীল আছে, কিন্তু বিচার নাই! ছোট লোকের সঙ্গে ছোট লোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে না; কিন্তু ছোট বড় ধনী দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বহুব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে, কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্ম্মচারীর; গাজী মিঁয়া সেই কথা বুঝাইবার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমরা উপন্যাসের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া রসভঙ্গ করিব না। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ!

গাজি মিঁয়া কে? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে থাকিয়া এরূপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের কার্য্য কলাপের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন? পুস্তক পড়িয়া এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজি মিঁয়ার আত্মগোপনচেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক। মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প, তন্মধ্যে "বিষাদসিন্ধু রচয়িতা" শ্রীযুক্ত মীর মসারফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গলা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী হইতে "বিষাদ সিন্ধু" প্রসূত হইয়াছে, "গাজি মিঁয়ার বস্তানিও" যে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন কাহিনীবিন্যাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্য সেবকাদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্তও কেবল "বিষাদসিন্ধুর রচয়িতাতেই" লক্ষিত হইয়াছে।

মীর সাহেবের পূর্ব্বে মুসলমানলিখিত বঙ্গ সাহিত্যে কবিতা ছিল, পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখপাঠ্য গদ্য গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, মুসলমান গদ্য লেখক বর্গের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও মীর সাহেব সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্য সেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইঁহার সাহিত্য-গুরু; প্রথমে "গ্রামবার্ত্তায়" পরে "প্রভাকরে" লিখিয়া লিখিয়া লেখা শিখিয়া, মীর সাহেব "আজিজন্ নেহার" নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন। মুসলমানসম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্ব্ব প্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখক বর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টীয়া একদা নীল বিগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী মীর সাহেব "উদাসীন পথিকের মনের কথা" নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতূহল পূর্ণ। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রা যন্ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা দুই একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, দুই চারিখানি কলেজ এবং দুই দশ খানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশারফ হোসেন যে সাহিত্য-শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* মীর সাহেবের একখানি প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল।

২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রদীপ

পঞ্চম ভাগ। } মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৮ { ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

জড় ও চৈতন্য।

জড় ও চৈতন্য এই দ্বিবিধ পদার্থ আমাদের উপলব্ধির বিষয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আমরা নিত্য অনুভব করিতেছি। বলা বাহুল্য জড়শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি। আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে উহার অর্থ অন্যরূপ।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, জড় পদার্থ আমাদের বাহিরে, এবং চিৎ পদার্থ আমাদের অন্তরে। যেমন ইট কাঠ হাতী ঘোড়া এমন কি আমার নিজের শরীর পর্য্যন্ত আমার বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়। আর আমার সুখ দুঃখ শোক তাপ আমার অন্তরের প্রত্যক্ষ বিষয়। প্রত্যক্ষ বলিলে হয়ত ভুল হয়,—আমার উপলব্ধির বা অনুভবের বিষয় বলিলে বোধ করি ভুল হইবে না। আর একটা কথা, জড় পদার্থ দেশব্যাপী;—ইট, কাঠ হাতী ঘোড়া সমস্তই খানিকটা জায়গা লইয়া থাকে। কিন্তু সুখ দুঃখ শোক তাপের জন্য বাক্স বা সিন্ধুকের দরকার হয় না। উহাদের দেশব্যাপিতা নাই।

আরও একটা কথা। আমার চৈতন্য স্পষ্টতঃ আমার অনুভবগম্য; আমার সুখ দুঃখ শোক তাপ আমি স্বয়ং অনুভব করি। কিন্তু তোমার চৈতন্য, তোমার সুখ দুঃখ শোক তাপের অস্তিত্ব আমার অনুমান মাত্র। তোমার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া আমি উহাদের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র করিয়া লই, উহা আমার নিজের উপলব্ধির বা প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না।

এই জড়ের সহিত এই চৈতন্যের সম্বন্ধ কিরূপ? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন—জড় আছে, চৈতন্য নাই বা চৈতন্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; ইহা নির্জ্জলা জড়বাদ; ইংরাজিতে বলে materialism। কেহ বলেন চৈতন্য আছে, কিন্তু জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদ—ইংরাজি নাম idealism বা এইরূপ একটা কিছু। অপরে বলেন, উভয়েই স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত। জড়ও আছে, চৈতন্যও আছে; উভয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

প্রথম দুই মতকে আমরা অদ্বয়বাদ—ইংরাজি monism বলিব, কেন না উহাতে এক ভিন্ন দুই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই:—অদ্বয় জড়বাদ অথবা অদ্বয় চৈতন্যবাদ। তৃতীয় মতকে দ্বয়বাদ—ইংরাজি dualism—বলিব; কেননা এইমতে উভয়ই স্বাধীন সত্তাবান্।

আবার প্রথম ও তৃতীয় এই দুইকে জড়বাদের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। প্রথম মত বিশুদ্ধ জড়বাদ; তৃতীয় মত অর্থাৎ যে মতে জড় ও চৈতন্য উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, উহা বিশিষ্ট জড়বাদ—কেন না ইহাতেও ত জড়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

আজি কালি অথবা কিছুদিন পূর্ব্বে, এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রথম মতের বা নির্জ্জলা জড়বাদের কিছু প্রাদুর্ভাব ছিল। বুকনারের মত জর্ম্মাণ পণ্ডিত এইমত লইয়া কোলাহল করিতেন। ইহার অর্থ, জড়ই স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন। চৈতন্য জড়ের ধর্ম্ম মাত্র, প্রক্রিয়াগুণে চিনিতে যেমন মাদকত্ব উৎপন্ন হয়, প্রক্রিয়াগুণে সেইরূপ জড়ে চৈতন্য জন্মে। অধ্যাপক টিণ্ডাল ও অধ্যাপক হেকেল সময়ে সময়ে এমন কথা কহিতেন, যাহাতে তাঁহাদিগকেও এই মতাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ জন্মিত। আমাদের দেশে

প্রাচীন কালে বৃহস্পতি চার্ব্বাক প্রভৃতি হয় ত এই মতাবলম্বী ছিলেন ; হয় ত,—কেন না তাঁহাদের নামে প্রচারিত যে দুই চারিটা বচন প্রচারিত আছে, তাহা হইতে এই কূটতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা কঠিন। ফলে এই বিশুদ্ধ জড়বাদের কোনকালে বিশেষ প্রতিপত্তি ঘটে নাই ; সে কালেও ছিল না,—একালেও নাই। আর আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র একরকম বিদ্রোহী হইয়া এই মতকে অবজ্ঞা সহকারে ত্যাগ করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

সেকালের ও বোধ করি একালের অধিকাংশ পণ্ডিতই দ্বয়বাদী ; অর্থাৎ তাঁহারা জড় ও চৈতন্যের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন। তবে উভয়ের স্বরূপ কি, ও সম্বন্ধ কি, ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বর্ত্তমান আছে।

প্রথম স্বরূপের কথা। আমরা জড়ের যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখি, উহাই কি উহার স্বরূপ? বলা কঠিন। কেন না আমাদেরই মানসিক অবস্থা ভেদে, জড়ের মূর্ত্তি বিভিন্ন হয়। জাগরণে যে মূর্ত্তি থাকে, তন্দ্রার অবস্থায় সে মূর্ত্তি দেখি না ; আমি যে রঙ্ দেখি, রঙ্কাণা লোকে সে মূর্ত্তি দেখে না। সুস্থ অবস্থায় যে মূর্ত্তি দেখি, রোগে বা নেশায় সে মূর্ত্তি দেখি না। সম্ভবতঃ আমি পূর্ণ স্বাস্থ্যে যে মূর্ত্তি দেখি, তুমি পূর্ণ স্বাস্থ্যে ঠিক্ সেই মূর্ত্তি দেখ না। আবার জড়জগৎ আমাদেরও প্রত্যক্ষ, কীট পতঙ্গেরও সেইরূপ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ঘ্রাণ, শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মানুষে ও কীটে এত তফাত, যে উভয় প্রাণীর নিকটে জগতের মূর্ত্তি এক রকম হওয়া সম্ভব নহে। আমার দুইটা চোখ, কোন কোন কীটের হাজার চোখ। আমার নিকট জড়জগতের যেরূপ মূর্ত্তি, সহস্রলোচন কীটের নিকট সে মূর্ত্তি হইতেই পারে না। কোন্ মূর্ত্তি, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ?

কেহ হয়ত বলিবেন, পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মনুষ্যে যে মূর্ত্তি দেখে, তাহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ। আপত্তি উঠিবে—কেন? মানুষের অপেক্ষা উন্নত পর্য্যায়ের কোন প্রাণী যদি থাকে বা কালে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট জড়ের মূর্ত্তি অন্যরূপ হইতে পারে ; সে তোমার আমার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিকে প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিবে কেন? আবার মানুষের মধ্যেই পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি কে? তুমি? আমি মানি না। আমি? তুমি মানিবে না।

ফলে জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার উপায় নাই, এই জন্য শেষ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা হতাশ হইয়া স্বীকার করেন, জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানি না, বা জানিবার উপায়ও নাই। তবে একটা স্বরূপ আছে, উহা অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞেয়, উহা noumenon ; আর যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও জ্ঞাত, উহা phenomenon. প্রত্যক্ষের পশ্চাতে, অন্তরালে, অভ্যন্তরে, এই অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ আছে, ইহাই জড়ের প্রকৃত স্বরূপ উহাই, substance আসল জড়। আমরা যাহা দেখি তাহা আসল নহে—আসলের বিকৃতি মাত্র।

চৈতন্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও সেইরূপ দ্বন্দ্ব উঠে, আমরা চৈতন্যের যে মূর্ত্তি দেখি, উহাই কি চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ? না উহার ভিতরে কোন অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয় প্রকৃত স্বরূপ—substance আছে—যাহা বাহিরে সুখদুঃখময় শোকতাপময় মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়? অনেকেই বলেন চৈতন্যেরও স্বরূপ অজ্ঞেয়, উহারও ভিতর একটা অনির্দ্দেশ্য substance আছে, তাহাই noumenon, খাঁটি জিনিষ; যাহা আমরা দেখি তাহা phenomenon মাত্র।

এই গেল স্বরূপ লইয়া কথা। তারপর দ্বিতীয় কথা, সম্বন্ধ লইয়া। জড়ের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ আছে। অনেকেই স্বীকার করেন—আছে। প্রমাণ—আফিম। আফিম খাইলেই যখন জগতের মূর্ত্তিটা বদলাইয়া যায়, তখন আর প্রমাণান্তরে দরকার কি? আফিম ঘোরতর জড় পদার্থ—উহা যখন মানসিক বিকার উৎপন্ন করিয়া চেতনাকে বিকৃত করে, এমন কি চেতনাকে লুপ্ত পর্য্যন্ত করে, তখন জড় পদার্থ চৈতন্যকে বিকৃত করিতে পারে, ইহাতে সংশয় কি? আবার আমরা যখন ইচ্ছা-প্রয়োগে খাই, শুই, নাচি, গাই, তখন আমাদের চৈতন্যও যে জড়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাও স্বীকার্য্য।

স্বীকার্য্য হইলেও সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে, উহা কেবল সমবায়সম্বন্ধ মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে বলে association ;—অর্থাৎ জড়ে যখন এই এই বিকার উপস্থিত হয়, চৈতন্যে তখন এই এই বিকার উপস্থিত হয়। সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বটে, কিন্তু কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নহে। জড়ে কেবল জড়কেই বিকৃত করিতে পারে, চৈতন্যে কেবল চৈতন্যকেই বিকৃত করে। আফিমে মস্তিষ্কের বিকার হয়, মস্তিষ্ক জড় পদার্থ। চৈতন্যের বিকার

মস্তিষ্কের বিকারের আনুষঙ্গিক মাত্র। উহা মস্তিষ্কের বিকারের ফল বা কার্য্য নহে।

যাক্, সে সকল তর্ক এখানে তুলিয়া প্রয়োজন নাই। জড় ও চৈতন্য উভয়ই স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীন ভাবে অস্তিত্ববান্ ; উহাদের স্বরূপ ও সম্বন্ধ যাহাই হউক না কেন। এই মতকে দ্বয়বাদ বলিয়াছি, অথবা ইহাকে বিশিষ্ট জড়বাদ বলা যাইতে পারে, কেন না জড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত। জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, বলিলে এই মতের আচার্য্যেরা লাঠি লইয়া আসেন।

প্রাচীনের মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যেরা এইরূপ দ্বয়বাদী ছিলেন। তাহারা জড় ও চৈতন্য উভয়েরই স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তবে বলিতেন, উহাদের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য। চৈতন্যের substance আছে ; উহা অজ্ঞেয় পুরুষ। জড়েরও substance আছে ; উহা অজ্ঞেয় প্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতির সম্মুখীন হইলে প্রত্যক্ষ phenomenonএর বিকাশ হয়।

এই পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব আধুনিক প্রচলিত সাম্প্রদায়িক হিন্দু ধর্ম্মের অস্থিমজ্জায় মিশিয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও শাক্তশাস্ত্র পুরুষ ও প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া পিটিয়া তাঁহাদের উপাস্য দেব দেবীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও কখনও বৈদান্তিকের ভাষায় কথা কহিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেখানে বৈদান্তিকের ভাষার আড়াল হইতে সাংখ্যভাব উঁকি মারিতে থাকে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে এই দ্বয়বাদীর সংখ্যা কম নহে, বোধ হয় অধিকাংশই এই দলভুক্ত। বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধেও সেইকথা। জড় ও চৈতন্য উভয়ই বর্ত্তমান; উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা হয় ত জানিনা। উভয়ের সম্বন্ধ কি বলা কঠিন। কিন্তু উভয়ই স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান্।

বলা বাহুল্য খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এই দ্বয়বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়জগৎ সত্তাবান্ ; নতুবা জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যকতা থাকে না। জড়-জগৎ আছে ; এমন দিন ছিল—তখন জড়জগৎ ছিল না, একদিন সহসা ইহার সৃষ্টি হইল ; যিনি সৃষ্টি করিলেন, তিনি জড় জগতের বহিঃস্থিত এক **ব্যক্তি ; তিনি খোদা।**

ইংরাজি God ও আমাদের 'ঈশ্বর' অভিধানের প্রমাণ সত্ত্বেও সমানার্থক নহে। সেই জন্য এস্থলে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার না করিয়া গড়ের বাঙ্গলায় খোদা শব্দ ব্যবহার করিলাম।

জড়জগৎ নিয়মবদ্ধ—সেই ব্যক্তি এই নিয়মের বিধান কর্ত্তা বা বিধাতা।

জড়জগতের যন্ত্রে একটা ব্যবস্থা দেখা যায়। ঘটিকা যন্ত্রে একটা যেমন বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারী একটা বিশেষ নির্ম্মাণের প্রণালী আছে, জগৎ-যন্ত্রেও সেইরূপ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটা বিশেষ গঠন প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। ইহাই জগৎ যন্ত্রের design, এই প্রণালী যাঁহার মন হইতে উদ্ভূত, তিনিই designer নির্ম্মাপক বা ব্যবস্থাপক—তিনি খোদা।

গঠন প্রণালী হইল design ; আর সেই design এর একটা উদ্দেশ্য আছে ; কি উদ্দেশ্য বলা কঠিন, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে—উহা purpose, একটা Great Purpose—বড় হাতের G ও বড় হাতের P যুক্ত ;—যাঁহার এই উদ্দেশ্য, তিনি খোদা।

এই উদ্দেশ্যের সহিত মানবের নৈতিক জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জড়জগতের অস্তিত্বের বোধ করি প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবস্থার—moral orderএর—প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতা খোদা, তিনিই মনুষ্যের পাপপুণ্যের বিচারক ও দণ্ডপুরস্কারের বিধাতা।

জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়মবিধাতারও অস্তিত্বে টান পড়ে। সেই জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম্ম জড়জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকারে বাধ্য। খ্রীষ্টানেরা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কাজেই ইঁহারা জড়বাদী, materialist.

আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে এক সম্প্রদায় খৃষ্টানদের নিকট হইতে এই খোদাকে ধার করিয়া আনিয়াছেন ; এবং বৈদিক মন্ত্রে তাঁহার শুদ্ধি বিধান করিয়া চৈতন্যবাচী ব্রহ্ম নামটী উপনিষৎ ও বেদান্ত হইতে আ—হরণ করিয়া সেই বিজাতীয় ম্লেচ্ছটির নূতন নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু নামে বর্ণ বদলায় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও এই দ্বয়-বাদেরই বোধ করি প্রাধান্য। তবে একালে জড়পদার্থের সহিত গতির সম্বন্ধ লইয়া কতকটা আলোচনা হইয়াছে। বহুদিন

হইল লর্ড কেলবিন্ একটা অনুমান বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সকলকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। জড়পরমাণু আকাশে আবর্ত্ত মাত্র। আবর্ত্ত একরূপ গতির প্রকারভেদ; কাজেই জড়ের সমুদয় ধর্ম্ম কেবল আবর্ত্তের ধর্ম্ম অর্থাৎ গতিবিশেষের ধর্ম্ম মাত্র। ইহা সেই বিখ্যাত vortex theory; সোণারূপা কয়লা গন্ধক ইত্যাদি স্থূল জড়ের পরমাণু আকাশের আবর্ত্ত মাত্র। কিন্তু সেই আকাশও ত আবার জড়—না হয়—সূক্ষ্ম জড়—কিন্তু জড়। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, আকাশ কোন সূক্ষ্মতর জড়ের কোনরূপ গতি বিশেষে উৎপন্ন—হয় হউক—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা জড়ের ভিত্তি পাওয়া যাইতেছে, সেই জড়ের স্বরূপ কি?

যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা বলেন, স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? আমাদের সম্বন্ধ গতির সহিত। ইন্দ্রিয় যোগে যাহা মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা জড় নহে, তাহা গতি; কোন রূপ ধাক্কা, কোনরূপ ঢেউ, কোনরূপ ক্রিয়া। সুতরাং যাহা আমরা মুখ্যভাবে অনুভব করি, তাহা জড় নহে, তাহা গতিমাত্র। গতি কাহার, গতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে এ প্রশ্ন নাই বা তুলিলাম। আর নিরবলম্ব নিরাশ্রয় গতিই কি একবারে অসম্ভব ব্যাপার? বিখ্যাত বস্‌কোবিচ্ ত জড়পরমাণুকে ক্ষেত্র-তত্ত্বের স্বীকৃত অংশহীন ও পরিমাণহীন বিন্দুতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! অধ্যাপক ক্লিফোর্ড ত একবার জড়কে জড়ত্ববর্জ্জিত শূন্য দেশের (spaceএর) বিকৃতিমাত্র কল্পনায় সাহসী হইয়া নূতন জড়বিজ্ঞান নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ইহারা kinesis, এই একটি শব্দ তৈয়ার করিয়াছেন, উহার অর্থ গতিবস্তু। এই গতিবস্তুসকলের সমবায়ে ও পরম্পরায় জড়জগৎ নির্ম্মিত। আর একটি শব্দ psychosis অর্থাৎ চিদ্বস্তু—এই চিদ্বস্তু সকলের সমবায় ও পরম্পরায় চৈতন্যের কলেবর গঠিত। গতিবস্তু ও চিদ্বস্তুর মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য অথচ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যখন এই এই গতিবস্তু থাকে, তখনই এই এই চিদ্বস্তুর আবির্ভাব হয়। উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান। বস্তু দ্বিবিধ—গতিবস্তু ও চিৎবস্তু—যাঁহারা এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা লয়েড্ মর্গান প্রণীত *Animal Life and Intelligence* পুস্তক দেখিবেন।

এই দ্বয়বাদকে একটু রূপান্তরিত করিয়া অদ্বয়বাদে পরিণত করা না যায়, তাহা নহে। তাহা হইলে কতকটা হার্ব্বার্ট স্পেনসারের মত আইসে। বস্তু একটা, তাহা দুই বিভিন্ন রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে উপনীত হয়—এক দিক্ হইতে দেখিলে জড় বা গতি (kineses); অন্য দিক্ হইতে দেখিলে চিৎ (psychoses);—হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ভাষায় ক ও খ;—উভয়েরই স্বরূপ অজ্ঞেয়।

অধ্যাপক ক্লিফোর্ড এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। জড়ই বল আর গতিই বল, উহার স্বাধীন সত্তা নাই; উহাদের প্রতীতি মাত্র আছে; কিন্তু এই প্রতীতিটাই চিদ্বস্তু। সুতরাং ক্লিফোর্ড অদ্বয়বাদী—তাঁহার মতে চিদ্বস্তুময় চৈতন্য ছাড়া আর কিছু বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ নাই। এই চিদ্বস্তুর তিনি ইংরাজিতে নাম দিয়াছিলেন mind-stuff.

পাশ্চাত্য অদ্বয়চৈতন্যবাদীদের মধ্যে বার্কলি ফিক্‌তে প্রভৃতির নাম করিতে হয়। বার্কলি যে যুক্তিবলে জড়-পদার্থকে প্রতীতিমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, সে যুক্তির বোধ করি উত্তর নাই। যাঁহারা সঙ্গত উত্তর দিয়াছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে সেই প্রসাদ লাভে বঞ্চিত করিবার পক্ষে কোন আইন নাই। কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদের নাম আত্মপ্রতারণা।

যে আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত, তাহাও ধীরে ধীরে এই চৈতন্যবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বোধ করি অচিরেই এই অদ্বয় চৈতন্য-বাদ ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। কেন না, জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে কেহই এপর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই।

ফলে জগৎ যে চৈতন্যরূপা, কেবল চৈতন্যমাত্রই স্বাধীন অস্তিত্বযুক্ত, ইহাতে বিসংবাদের তত কারণ নাই, অথবা কিছুদিন পরে থাকিবে না। কিন্তু এই চৈতন্যের স্বরূপ লইয়া গণ্ডগোল চলিতে পারে।

চৈতন্য, কি না আমার চৈতন্য। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, অপরের চৈতন্য আমার কল্পনা মাত্র; সুতরাং উহার অস্তিত্ব জড়ের অস্তিত্বের মতই অমূলক। বেদান্তের ভাষায় উহাকে

চিৎ না বলিয়া চিদাভাস বলাই সঙ্গত। আমার চৈতন্য স্পষ্ট অস্তিত্বযুক্ত পদার্থ; কিন্তু ইহার স্বরূপ কি?

হিউম হয় ত বলিতেন, যে সকল প্রতীতি, শব্দস্পর্শগন্ধ, সুখদুঃখশোকতাপ ভয়ক্রোধ প্রভৃতি স্পষ্টতঃ অনুভব করিতেছি, তাহার সমষ্টিই চৈতন্য। এই গুলিই ত প্রতীত পদার্থ, এই গুলিই সত্য, চৈতন্য এই সকলের সমষ্টিমাত্র। ইহার অভ্যন্তরে, ইহার অন্তরালে, কোন অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য substance এর কল্পনা অনাবশ্যক। প্রতীতিগুলি phenomenon মাত্র, কিন্তু এই phenomenonই সত্য; উহার অন্তরালে noumenon এর কল্পনা নিরর্থক ও অযুক্ত। হক্সলীও কতকটা এই পথে গিয়াছেন। যাঁহারা হক্সলীকে জড়বাদী বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বৌদ্ধেরাও কতকটা এই রূপ কথা বলিতেন। নাভি, নেমি, অর প্রভৃতি চক্রাঙ্গের সমবায়ে গাড়ীর চাকার উৎপত্তি। চাকা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছু নাই; নাভি, নেমি, অর যদি না থাকে, চাকা থাকিবে না। চৈতন্যের অন্তরালে কোন খাঁটি বস্তু নাই, যদি কিছু থাকে—বৌদ্ধমতে তাহা শূন্য। যিনি ইহা বুঝিয়াছেন, তিনিই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত।

যাহারা substance এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, নাভি, নেমি, অর না থাকিয়াও কাঠ ত থাকিতে পারে, সেই কাঠের বিকারে চাকা। সেইরূপ প্রতীয়মান চৈতন্য যাহার বিকার, তাহাই substance, তাহাই চৈতন্যের স্বরূপ।

এইমত বেদান্তের। বেদান্ত এইরূপ substance বা noumenon স্বীকার করেন। তাহার নাম দেন আত্মা বা আমি। তাহার স্বরূপ কি? তাহা অনির্দ্দেশ্য—উপনিষদের ভাষায় ইহা নহে, ইহা নহে, বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, আমি আছি অর্থাৎ আমি সৎ—আর আমি চিৎ—অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ। বেদান্তি সময়ে সময়ে আর একটা বিশেষণ যোগ করেন—আমি আনন্দস্বরূপ, কেননা—আমি আছি ও থাকাই আমার আনন্দ, সেই আনন্দের উদ্দেশ্যেই আমি আছি। সেই আত্মা 'পরানন্দ' ও 'পরপ্রেমাস্পদ'।

স্বরূপ যাহাই হউক, বেদান্ত বলেন, সেই আমিই ঈশ্বর—সেই আমিই এই জগৎ রচনা করিয়াছি—সূর্য্যচন্দ্র হইতে অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সকলই আমার প্রতীত, আমারই কল্পিত, আমারই সৃষ্ট। কেন এরূপ রচনা করিয়াছি, কেন এরূপ কল্পনা করিয়াছি, ইহার উত্তরে বলা হয়, উহা আমার মায়া, আমার লীলা কেবল্য, আমার খেয়াল; তদপেক্ষা সদুত্তর নাই। অন্ততঃ এইরূপ একটা বাহ্য জগৎ কল্পনা করিয়া আমাকেই আবার 'জীব' রূপে সেই জগতের মধ্যে স্থাপিত যদি না করিতাম, তাহা হইলেও জগৎ ও থাকিত না, আমিও হয়ত থাকিতাম না অথবা আমি থাকিলেও প্রত্যয় সিদ্ধ হইতাম না; বৌদ্ধদের মতানুরূপ সমস্তই অকল্প্য মহাশূন্যে পরিণত হইত।

উপনিষৎ সমূহ এই 'আমার' একটা নামকরণ করিয়াছিলেন 'ব্রহ্ম', এবং অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমিই সেই ব্রহ্ম। উপনিষদের ভাষা অনেক সময় দুরূহ ও কবিত্বময়; কিন্তু পরবর্ত্তী বেদান্ত গ্রন্থসমূহ ভাষার কোনরূপ অস্পষ্টতা রাখিয়াছেন, বোধ হয় না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন—যদি কিছু থাকে, 'সোঽহম' সে আমি। ব্রহ্ম বলিয়া যদি তাহার নামকরণে ইচ্ছা হয় তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই ব্রহ্ম শব্দে 'আমি' ভিন্ন আর কিছু বুঝিওনা। যতক্ষণ বুঝিবে, ততক্ষণ তোমাকে অবিদ্যাচ্ছন্ন অর্থাৎ অজ্ঞ বলিব। যাঁহারা আপনাদিগকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত করিতে চাহেন, তাহাদের অবিদ্যার ঘোর যায় নাই। যিনি বুঝিয়াছেন আমিই আছি, আর সমস্ত আমার কল্পনা, তিনিই মুক্ত।

এই ভাষা অতি স্পষ্ট, অথচ অবিদ্যার এমনই মোহ, যে কেহ বলেন বেদান্ত শাস্ত্র একটা pantheism; কেহ বা বলেন বেদান্তশাস্ত্র একটা theism. বেদান্ত হাসিয়া বলিবেন, এই সকল উক্তি অবিদ্যার আস্ফালন মাত্র।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অবস্থায় ব্যবস্থা।

অবস্থার মতই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আজ যে ফকীর হইয়া ভিক্ষান্নে উদরপূর্ত্তি করিতেছে, কাল সেই আমীর হইয়া, ভিক্ষা দিয়া শত শত লোকের উদরপূর্ত্তি করিয়া দিবে। আজ যে ভৃত্যভাবে তোমার পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হইতেছে, দশ দিন পরে সেই আবার ভাগ্যবলে তোমার প্রভু হইয়া, তোমাকেই নিজের পরিচর্য্যায় বাধ্য করিয়া, স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবে। সংসারে এরূপ বিপর্য্যয়

সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। প্রভু ভৃত্য হইতেছেন, ভৃত্য প্রভু হইতেছে; রাজা প্রজা হইতেছেন, প্রজা রাজা হইতেছে; জমিদার রাইয়ত হইতেছেন, রাইয়ত জমিদার হইতেছে; কোচম্যান সহিস হইতেছেন, সহিস কোচম্যান হইতেছে; রাণী চাকরাণী হইতেছেন, চাকরাণী রাণী হইতেছে; বেগম বাঁদী হইতেছেন, বাঁদী বেগম হইতেছে।

যখন যেমন তখন তেমন।

যে যে অবস্থায় পড়িতেছে, সে সেই অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতেছে। ভৃত্য প্রভু হইয়া প্রভুর উপর প্রভুত্ব করিবার সময়ে, স্বীয় প্রভুত্বযোগ্যতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না; প্রজা রাজা হইয়া রাজাসনে বসিয়া বেশই রাজত্ব করিতে পারে; চাকরাণীও রাণী হইয়া রাজার সাহচর্য্য করিবার সময়ে বেশইত যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে।

"কল্পনা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।" কিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকিলেই মানুষ অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারে। প্রবাদ আছে, যে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসিত, সেই বিক্রমাদিত্য হইত। জগতের যত সিংহাসনেইত এই সত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। যিনি রাজা হইতেছেন, তিনিই রাজত্ব করিতেছেন, তিনিই রাজ্যশাসন করিতেছেন। যিনি বিচারক হইতেছেন, তিনিই শত শত লোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসই বা মুক্তিলাভে প্রভু হইয়া প্রভুত্ব করিতে না পারিবে কেন? জগতে চিরদিন দেখা যাইতেছে, বিজিত বশীভূত জাতি সময়ে বিজেতা হইতেছে, আপনারাই বিজেতাকে বিজিত করিয়া নিজের বশীভূত করিতেছে। "নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।"

জগতে দাস-রাজার দর্শন দুর্লভ নহে। ভারতের চন্দ্রগুপ্তকে যদি নন্দবংশের দাসীপুত্র বলিতে সম্মত না হও, তাহা হইলেও ত মুসলমান নরপতিবংশের কুতব-উদ্দীনকে দাস-রাজা বলিয়া মানিতে হইবে।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে যাও; সেখানকার লাইবিরীয়া রাজ্যে দাসের রাজত্ব দেখিতে পাইবে। যাহা এক স্থানে চলিতেছে, অবস্থার মত ব্যবস্থা হইলে, তাহা সকল স্থানেই চলিতে পারে। আমরিকায় পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকদিগকে কেবল শ্বেত-প্রভুগণের দাসত্ব করিতেই দেখিয়াছিলে। এখন সেই আমরিকায় বুকার ওয়াশিংটনের মত দাসীতনয়কে সমাজপতি হইয়া প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টেরও একাসনে বসিয়া পানভোজন করিতে দেখিতেছ। কিছু দিন পরে যে, কোন দাসবংশজকে প্রেসিডেণ্ট-পদে অভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে দেখিবে না, তাহাই বা কিরূপে মনে করিব? ৩৫ বৎসরের ভিতর আমরিকায় লক্ষ লক্ষ দাস স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রার নির্ব্বাহ করিতেছে; অনেকে ব্যবসায় বাণিজ্যে ধনপতি হইয়া, অনেক লোকের উপর প্রভুত্ব করিতেছে; অনেকে শিল্প বিজ্ঞানে অধিকারী হইয়া, ধনে মানে শ্বেতপুরুষদিগের সমকক্ষতা করিতেছে, কেহ কেহ আবার শ্বেতপুরুষদিগকেও অধীনে রাখিয়া কারবার চালাইতেছে,—দাস প্রভু হইয়া প্রভুকে ভৃত্য করিয়াছে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়াও যাঁহারা বলেন, "অমুক দেশের লোকে দাসত্ব করিতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অমুক জাতি কোন কালেই নিজের দেশে নিজে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না"—যাঁহারা বলেন, "বিজিত কখনই বিজেতার সমাসনে বসিতে পারে না, প্রতিপাল্য কখনই প্রতিপালক হইতে পারে না;" তাঁহারা প্রকৃতের অপলাপ করেন, ইতিহাসের মর্য্যাদাভঙ্গ করেন; তাঁহারা মানব-প্রকৃতিরই ব্যতিক্রম ঘটাইতে চাহেন।

এক সময়ে বড় বড় দার্শনিক ও পণ্ডিতদিগেরও ধারণা ছিল, "মানবসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ প্রভুত্ব করিতে সৃষ্ট, অন্য ভাগ দাসত্ব করিতে অবতীর্ণ।" গ্রীসের সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত এরিষ্টটলও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন; এই বিশ্বাস ধারণাই চিরদিন নিজের হৃদয়ে বিরাজমান রাখিয়া লক্ষ লক্ষ শিষ্য অনুশিষ্যের হৃদয়েও বিরাজমান করিয়া গিয়াছিলেন!

বিলাতে উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন, জ্যাকারি-মেকলে প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জন্য যখন দাসব্যবসায় রহিত হয়, তখনও অনেক এরিষ্টটল-শিষ্য, এরিষ্টটলের মতকেই নজীর ধরিয়া, দাসব্যবসায় বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমসময়ে যখন বিলাতে দাসব্যবসায়ের প্রতিবাদে সূত্রপাত হয়, যখন ডাক্তার জন্‌সনের মত মহাপণ্ডিতেরা দাসব্যবসায়ের প্রতিকূলতা করেন, তখনও জন্‌সনের অনুগত ভক্ত শিষ্য বসোয়েল দাসব্যবসায়ের

পক্ষসমর্থন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন; দাস-ব্যবসায়কে ধর্ম্মের অনুমোদিত, খৃষ্টধর্ম্মের আদিষ্ট বলিয়া, দাসব্যবসায়ের প্রতিপক্ষদিগকে অধার্ম্মিকসম্প্রদায়ে ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে যখন মার্কিণ রাজ্যে দাস-মুক্তি উপলক্ষে ঘোর গৃহযুদ্ধ হয়, যখন মার্কিণ আর্য্যাবর্ত্তের দাসত্বমোচকদিগের সহিত মার্কিণ দাক্ষিণাত্যের দাসত্বপোষকেরা যুদ্ধ করিয়া দেশটাকে শ্বেত-শোণিতে প্লাবিত করেন, তখনও মার্কিণ দাক্ষিণাত্যের অনেক পণ্ডিত এরিষ্টটলের নজীর ধরিয়া দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লিখিত প্রচারিত শত শত গ্রন্থে এবং সহস্র সহস্র প্রবন্ধে সভ্য জগৎ কলঙ্কিত হইয়াছিল। কেবল আমরিকার নহে, ইউরোপেরও কোন কোন মহাপ্রভু দাসত্ব বজায় রাখিবার জন্য পাণ্ডিত্য-প্রকাশের একশেষ করিয়াছিলেন।

সেই সময়েই এক দল পণ্ডিত, মানবদেহের রহস্যজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া, শারীরতত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, "ইউরোপ এশিয়া আমরিকা প্রভৃতি দেশের সভ্য মানবের মেরুদণ্ডে যে কয়খানা গ্রন্থি আছে, আফ্রিকার নিগ্রো-প্রভৃতি জাতীয় নর নারীর মেরুদণ্ডে সে কয়খানা নাই, নিগ্রোর মেরুদণ্ডে একখানা গ্রন্থি কম আছে; সেই গ্রন্থিই বুদ্ধি-শক্তির আধার; নিগ্রো প্রভৃতি কাফ্রিদিগের ঐ বুদ্ধিগ্রন্থি নাই, তাই তাহারা স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ। সুতরাং তাহারা অজগবাদি পশুর ন্যায় সভ্য মানবের দাসত্ব করিতেই সৃষ্ট। দাসত্ব রহিত হইলে ভগবানের সৃষ্টিতে ব্যতিক্রম ঘটিবে।"

তখন এই আজগবী কথায় অনেকে বিশ্বাসও করিয়াছিলেন। আমাদের ভারতেও দুই একটী মহাপুরুষকে এই আজগবী মতের পক্ষপাতী হইতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ফলে সত্যেরই জয় হইয়াছে। আমরিকার মুক্তদাসেরা এখন সকল কার্য্যে—সকল বিদ্যায়—সকল জ্ঞানে—শ্বেতপুরুষদিগের সমকক্ষতা করিতেছেন। রাজ্যশাসনের উপযুক্ত রাজনীতি-জ্ঞানেও অনেকে ন্যায়সম্মত অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতা দেখিয়া বড় বড় শ্বেতপুরুষ-দিগকেও বিস্মিত হইতে হইয়াছে। পুরাতন বিদ্বেষ এখনও অনেক শ্বেতহৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে বটে, আমরিকার সকল প্রদেশে এখনও মুক্ত দাস বা দাসবংশজেরা রাজনীতিকাদি অধিকারে শ্বেতপুরুষদিগের সমকক্ষতা করিতে পাইতেছে না বটে, অধিকারলাভে এখনও বঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে বটে, কিন্তু এভাব আর অধিক দিন থাকিবে না।

দাসবংশজ পণ্ডিত ও পরার্থপর বুকার্ ওয়াশিংটন নবপ্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টের সহিত একাসনে বসিয়া পান ভোজন করিয়াছেন, অভ্যাগতরূপে তাঁহার কাছে আদর পাইতেছেন, দেখিয়া আমারকার দাক্ষিণাত্য মহাশয়েরা তুমুল প্রতিবাদের সুর ধরিয়াছিলেন; প্রেসিডেণ্টের উপর মনের সাধে ঝাল ঝাড়িয়াছিলেন; কোন কোন দুরাশ আবার প্রেসিডেণ্টকে সমাজচ্যুত করিবারও ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু সরলহৃদয় প্রেসিডেণ্ট মহাশয় কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি অটল অচল। দাসবংশজ মহাপুরুষ বুকার ওয়াশিংটনকে তিনি মিত্র বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। মিত্রকে মিত্রের আসনেই বসাইয়া রাখিতেছেন। প্রতিবাদের সুরও ক্রমেই কমিয়া কমিয়া এখন একপ্রকার মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেবল বুকার ওয়াশিংটনের সম্মান-বৃদ্ধি করিয়াই, প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি দুইটী পণ্ডিত দাসীপুত্রকে রাজ্যের উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। দাসীপুত্র ক্রস-লীনকে লাইবিরীয়ার দূত করিয়াছেন; দাসীপুত্র ড্যানসিকে স্বরাজ্যের রেজিষ্টার-জেনারেল করিয়াছেন।

অবস্থায় ব্যবস্থা হয়। পৃথিবীর কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়েরই চিরদিনের মত হতাশ হইয়া থাকা উচিত নহে। জাতীয় উন্নতিই জাতীয় অধিকারের পথ সহজ করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত যোগ্যতা বিস্তৃত হইলেই সমাজগত যোগ্যতা বিস্তৃত হইয়া থাকে। আফ্রিকার লাইবিরীয়া প্রদেশে দাসরাজ্য কিরূপ চলিতেছে, তাহা দেখিয়াই পাঠক অবস্থা ব্যবস্থা ভূত ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু লাইবিরীয়ার কথা কহিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দাসকথার আভাস দিতে হইবে; বিচিত্র দাসবৃত্তান্তে পাঠকেরও তুষ্টি হইবে।

দাসত্ব প্রাচীন।

দাসত্ব পৃথিবীতে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমাদের আর্য্যভূমি ভারতেও দাসের অভাব ছিল না। আমাদের সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতেও দ্বিবিধ দাসের পরিচয়

সর্ব্বদা পাওয়া যায়। পঞ্চদশ দাসের মধ্যে দুই দাসই অভিনয়ে প্রধান। এক কৃতদাস, আর এক ক্রীতদাস। যাহাকে মূল্য দিয়া কিনিয়া চিরদিনের জন্য দাস করা হইত, সেই ক্রীতদাস-পর্য্যায়ে পরিচিত হইত। যে অন্যরূপে দাস হইত, সেই কৃতদাস বলিয়া পরিচিত হইত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন, আর্য্যেরা ভারতের বিজয়ী প্রবাসী; শৌর্য্যবীর্য্য এবং বুদ্ধিকৌশলে ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আদিম বর্ব্বরদিগকে দাস করিয়াছিলেন। দাসেরাই শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এখনকার সিদ্ধান্তই হইতেছে, "পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল জাতিই যুদ্ধে পরাস্ত শত্রুদিগকে দাস করিতেন। এখনও আফ্রিকা অষ্ট্রেলেশীয়া প্রভৃতি দেশের কোন কোন বর্ব্বরজাতি পলায়িত শত্রুদিগের ভিতর সকলকে প্রাণে না মারিয়া কতকগুলাকে দাস করিয়া রাখে; শত্রুমহিলাদিগকে দাসী করিয়া রাখে। এই দৃষ্টান্তে এবং প্রাচীন ইতিবৃত্তে ও প্রবাদে নির্ভর করিয়াই, ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, অতিপূর্ব্বে সকল দেশের সভ্য অসভ্য সকল বিজয়ীই বিজিত শত্রু পুরুষদিগকে দাস করিত, শত্রু মহিলাদিগকে দাসী করিত।

আবার, অনেক লোকে দৈন্যদারিদ্র্য-নিবন্ধন পুত্র কন্যাদিগকে বেচিয়া ফেলিত। দুরবস্থা অধিক হইলে, আপনাদিগকেও বিক্রয় করিত। কখনও কখনও লোকে পরের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে কাড়িয়া লইয়া বা চুরি করিয়া বেচিয়া ফেলিত। এইরূপেই দাসবংশের বৃদ্ধি হইত। অপিচ, দাসবংশের যত পুত্র কন্যাকেও দাস দাসী হইতে হইত।

দাস দাসী সুতরাং চিরদিন প্রধানতঃ দুই প্রকার। যাহারা মূল্য দিয়া ক্রীত হইত, তাহারাই হইত ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী, যাহারা বিনা মূল্যে দাসত্বে আবদ্ধ হইত, তাহারা হইত কৃতদাস বা কৃতদাসী। ভারতের কথা কহিবার পূর্ব্বে আমরা দুই এক কথায় অন্যান্য দেশে ইঙ্গিত করিব। সকল কথা সবিস্তর কহিতে গেলে বৃহদ্‌গ্রন্থেরই রচনা করিয়া বসিব! কিন্তু একখানা দাসায়ন বা দাসপুরাণ লেখা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, অতি সংক্ষেপে পূর্ব্ব কথার আমেজ দিয়া আধুনিক মার্কিণ দাসবংশের, দাসত্বমুক্তদাস-বংশজদিগের, বিদ্যা বুদ্ধি এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া এবং একটু ইঙ্গিত করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। অবস্থান্তরে যে ব্যবস্থান্তর হয়, ইহা দেখাইয়া, রাজা প্রজা সকলকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়াই, আমাদের অভিপ্রেত।

য়িহুদির দাসত্ব।

আমাদের রাজা খৃষ্টান, বাইবেল তাঁহার বেদ। বাইবেলের প্রাচীন পর্ব্ব—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট য়িহুদি মহাপুরুষদিগের সংকলিত, য়িহুদি ভাষায় লিখিত—য়িহুদীর ন্যায় খৃষ্টানদিগেরও পূজিত; তাই য়িহুদি দাসকথাই আমাদিগের প্রথম উল্লেখ্য। য়িহুদি দেশে ও—য়িহুদি যুগে—কৃতদাস কৃত-দাসীর ন্যায় ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর অস্তিত্ব ছিল। যাহাদিগকে মূল্য দিয়া কেনা হইত, তাহারাই ক্রীতদাস ক্রীতদাসী হইত। যাহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দাস দাসী হইত, কিংবা বিনা মূল্যে অন্যরূপে দাসত্বে আবদ্ধ হইত, তাহারা কৃতদাস কৃতদাসী হইত। দ্বিবিধ দাস দাসীর বংশজ বংশজাদিগকেই দাস দাসী হইতে হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর বংশজ বংশজাদিগকে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী হইতে হইত না, তাহারা কৃতদাস কৃতদাসী হইত।

য়িহুদি সমাজেও স্বদেশীয় বিদেশীয় দ্বিবিধ দাস দাসীই দেখিতে পাওয়া যাইত। বিদেশীয় দাস দাসীদিগের ভিতর যুদ্ধে পরাস্ত শত্রু এবং তাঁহাদিগের পুত্রকলত্রাদিদিগেরই সংখ্যা অধিক ছিল। অপহৃত, লুণ্ঠিত এবং পরে বিক্রীত বৈদেশিক দাস দাসীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। স্বদেশের দাস-দাসী-পর্য্যায়ে কৃত অপেক্ষা ক্রীতেরই সংখ্যা অধিক ছিল। দৈন্যনিবন্ধন পিতা মাতা কর্ত্তৃক বিক্রীত, স্বেচ্ছায় স্ববিক্রীত হইয়া স্বদেশের অনেকে দাস দাসী হইত; আর অধমর্ণ ঋণশোধে অসমর্থ হইয়া উত্তমর্ণের আরও বশীভূত হইলেও ক্রীতদাসত্বেই আবদ্ধ হইত। কেন না, ঋণশোধে অক্ষম হইলে অধমর্ণকে একপ্রকার আত্মবিক্রয়ই করিতে হইত।

আর এক প্রকার ক্রীতদাস হইত, যত দস্যুতস্কর, য়িহুদি সমাজে দস্যুতস্করদিগকে ধরা পড়িলে অপহৃত ধন সম্পত্তির প্রত্যর্পণ করিতে হইত; তাহা ছাড়া কিছু কিছু জরিমানাও দিতে হইত। যাহারা প্রত্যর্পণে ও অর্থদণ্ডে অসমর্থ হইত, তাহাদিগকেও দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইত।

এইরূপ দাস দাসীরাও ক্রীত-পর্য্যায়েই পরিগণিত হইত। যেখানে দাসত্বে অর্থসম্বন্ধ, সেই খানেই ক্রীতদাসত্ব।

য়িহুদিসমাজে কিন্তু দুই পথে সুব্যবস্থা ছিল। ক্রীত দাস দাসীরাও, প্রভুদিগকে উচিতরূপ মূল্য দিতে পারিলে, স্বাধীন হইত; আবার মূল্য দিতে না পারিলেও, ৭ বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিত। সাত বৎসর ভোগদখল করিলেই প্রভুর স্বত্ব ফুরাইয়া যাইত। এ ব্যবস্থা কিন্তু কেবল স্বদেশের দাস দাসীর উপরই বর্ত্তিত। দাস দাসীর মূল্য স্থির করা কঠিন হইত না; যথোচিত মূল্যের সংগ্রহ করাও অনেকের পক্ষে সহজ হইত। সুতরাং স্বদেশের ক্রীতদাস ক্রীত দাসীর ন্যায় স্বদেশের কৃতদাস কৃতদাসীরাও মূল্য দিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিত। আবার সাত বৎসরের পর সকলেই বিনা মূল্যেও স্বাধীন হইত। কিন্তু বৈদেশিক দাস দাসীরা এরূপে মুক্তিলাভ করিতে পাইত না। তবে রাজ্যের ব্যবস্থা অনুসারে ৫০ বৎসর অন্তর যখন সার্ব্বজনিক দাসত্বমুক্তির আদেশ হইত, তখন সকলেই মুক্তিলাভ করিবার অধিকার পাইত।

গ্রীসের দাসত্ব।

গ্রীসেও স্বদেশীয় বিদেশীয় এবং ক্রীত ও কৃত দাস দাসী অনেক ছিল। যে যে কারণে য়িহুদিসমাজে দাসত্ব ঘটিত, গ্রীক সমাজেও সেই সেই কারণেই দাসত্ব ঘটিত। গ্রীসের সকল রাজ্যেই ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ন্যায় কৃতদাস কৃতদাসী ছিল। দাস দাসীর ক্রয় বিক্রয় উপলক্ষে একটা রীতিমত দাসবাণিজ্যই চলিত। আর দাসব্যবসায়ের জন্যই মানুষ-চুরীর ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রীসের বিখ্যাত জ্ঞানী—গ্রীসের বৃহস্পতি—ইউলিসীসকেই একবার আর একটু হইলে অপহৃত হইয়া দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল! গ্রীসের স্বদেশীয় দাসবংশজেরা কিন্তু ক্রমে কতকটা মুক্তসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। ইহারা কৃষক ও শ্রমজীবীর কার্য্য করিয়া কিছু কিছু অর্থার্জ্জনও করিতে পারিত। দাসত্বসম্বন্ধে গ্রীসের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বৃহস্পতি-কল্প এরিষ্টটল যে মতের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকের পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছে। তিনি মানবজাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; অসভ্য বর্ব্বর নির্ব্বোধ ভাগকে তিনি দাসপর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলেন, সভ্য বুদ্ধিমানের ভাগকে প্রভু-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো বলিতেন, নিজ গ্রীসের কোন ব্যক্তিই দাসত্ব বন্ধনের বাধ্য নহে। গ্রীসের যে স্বল্প-স্বাধীন দাস-বংশজদিগের কথা কহিয়াছি, তাহারা প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত। স্পার্টায় তাহারা ছিল হেলট, থেসেলি-প্রদেশে ছিল পেনেস্তী, বাইজান্তিয়মে হইয়াছিল বিথিনীয়ান। ইহারাই শেষে মধ্যযুগের খৃষ্টান ইউরোপে সার্ফ-পর্য্যায়ে পরিণত হইয়াছিল। এই সকল স্বল্পস্বাধীন দাস ও দাসবংশজ স্বদেশেই থাকিত। কোন প্রভুই নিজের এরূপ দাস দাসীকে বিদেশে চালান দিতে পাইতেন না। বৈদেশিক দাস-বাণিজ্যে এরূপ দাস দাসী পণ্য হইতে পারিত না। এরূপ কোন দাস বা দাসীকে কেহই পরিবারচ্যুত করিতে পাইত না, কোন দাস বা দাসীই স্বপরিবার হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইত না।

এইরূপ দাস দাসীদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল, অর্থে লব্ধ ক্রীত দাস দাসীদিগের অবস্থা সেরূপ ছিল না। অর্থ-লব্ধ দাস দাসীরা প্রভুর গো-মহিষাদির ন্যায় সম্পত্তিমধ্যেই পরিগণিত ছিল; ইহাদিগকে প্রভু যদৃচ্ছ দান বিক্রয় করিতে পারিতেন। এথেন্স এবং করিন্থ প্রভৃতি কোন কোন বাণিজ্যপ্রধান রাজ্যে দাস দাসীর বাণিজ্যটা খুবই চলিত। অসভ্য বর্ব্বর ভিন্নজাতীয় ভিন্নদেশীয় লোকেই এইরূপ ক্রীতদাসত্বের অধীন ছিল; সংখ্যাও তাহাদের কম ছিল না। দাসবাণিজ্যের জন্য নানা স্থানে স্বতন্ত্র হাট বাজার প্রতিষ্ঠিত ছিল। করীন্থের দাসহট্টে দাসবাণিজ্যের ধূম লাগিয়া যাইত। এই সকল দাস দাসীকে গৃহস্থ প্রভুর সকল কার্য্যই করিতে হইত। ছোকরা গোছের দাস দাসীরা প্রভুর পুত্র কন্যাদিকে স্কুলে লইয়া যাইত। বয়ঃস্থ ও বয়ঃস্থাদিগকে তুন্দুলে রুটি করিতে হইত, পাকশালায় পাককার্য্য করিতে হইত, দরজির কাজ করিতে হইত, খনির কাজ করিতে হইত, শিল্পশালায় শিল্পের কাজ করিতে হইত, আর খেত খোলায় কৃষাণের কাজও করিতে হইত, আবার নাবিক হইয়া নৌকা জাহাজেও খাটিতে যইত। দাস দাসীরা গতর খাটাইয়া যাহা রোজগার করিত, তাহা প্রভুর হস্তে পড়িত। ক্রীত দাস দাসীদের ত কথাই নাই, তাহাদের বংশজ বংশজাদিগকেও এই দলে পড়িতে হইত। এথেন্সরাজ্যের পুলীসে, পল্টনে, জেলে, সরকারী নীলামে এবং অন্যান্য

সরকারী কার্য্যেও এইরূপ দাসদিগকে নিযুক্ত করা হইত। এশিয়ামাইনরের যত গ্রীক উপনিবেশেই দাসব্যবসায়ের বড় ধূম ছিল। চারিদিকের বর্ব্বরদিগকেই এইরূপ দাস-বাণিজ্যের পণ্য হইতে হইত। থ্রেস প্রভৃতি স্থানের পিতা মাতারাও পুত্রকন্যাদিগকে বেচিয়া ফেলিত। কিন্তু সমগ্র গ্রীকরাজ্যে—বিশেষতঃ এথেন্স-রাজ্যে—সর্ব্ববিধ দাস দাসীদিগের প্রতিই প্রভুদিগকে অনেকটা সদ্ব্যবহার করিতে হইত। বিখ্যাত বাগ্মী ডিমস্থিনীশ বলিতেন, "অন্য স্থানের স্বাধীন অপেক্ষা এথেন্সের দাস দাসীরও সুখ স্বচ্ছন্দ অধিক"। দাসমুক্তিও গ্রীসে সর্ব্বদা হইত। কাহারও দাস দাসীর প্রতি যদি অন্য কেহ দুর্ব্ব্যবহার করিত, তাহা হইলে উক্ত দাস দাসীর অধিকারী এই ব্যক্তির কাছে যথোচিত খেসারত লইতে পারিতেন। এই জন্যও দাস দাসীর অবস্থা গ্রীসে অনেকটা ভাল ছিল। দাস কিন্তু স্বাধীন পুরুষের ন্যায় লম্বা চুল রাখিতে পাইত না, কোন সমিতি সভায় বা সাধারণ উৎসবগৃহে বা ক্রীড়াগারে প্রবেশ করিতে পাইত না; তবে ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই ছিল। দক্ষিণ আফরিকার নেটাল রাজ্যে ভারতসন্তানেরাও ত শ্বেতপুরুষদিগের সমিতিসভায় যাইতে পারে না; পথে ঘাটেও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়া যাওয়া আসা করিতে হয়। গ্রীসে দাস দাসী ছিল অসংখ্য। ক্রীত দাস দাসী এক এথেন্স রাজ্যেই ছিল এক সময়ে ২ লক্ষ; স্বাধীন নর নারীর প্রায় তিন গুণ!

রোমের দাসত্ব।

রোমরাজ্যের আইনে অনেকটা আধুনিক ঔদার্য্য বিরাজ করিত; কিন্তু দাস দাসী রোমরাজ্যেও ছিল। সুতরাং ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ উকিল কৌঁসুলিরা স্থির করিয়াছিলেন, "দাসত্ব ভাগবত আইনে নিষিদ্ধ হইলেও, লৌকিক বা জাতীয় আইনে নিষিদ্ধ নহে। আর যুদ্ধে বিজিত বন্দীভূত শত্রুকে প্রাণে না মারিয়া, দাসত্বে আবদ্ধ করা ধর্ম্মসঙ্গত। অপিচ, যে ব্যক্তি স্বয়ং বিক্রীত হয়, তাহাকে দাসত্বে বাধ্য করাও নীতিবিরুদ্ধ নহে।"

প্রথমে কিন্তু রোমরাজ্যেও দাস দাসীর প্রতি বড়ই উৎপীড়ন অত্যাচার হইত; প্রভু নিজের দাস দাসীকে ক্রুসে চড়াইয়া মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। শেষে এতটা অত্যাচার ছিল না বটে, কিন্তু দাস দাসীর প্রতি কঠোর ব্যবহার রোম রাজ্যের সর্ব্বত্রই চলিত। রোমরাজ্যের যে সকল দাসকে সম্ভ্রান্তসমাজের নিষ্ঠুর আমোদ চরিতার্থ করিবার জন্য, ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যান্য দাস বা সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া, প্রাণ দিতে হইত, তাহারাইত গ্লাডিয়েটর বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। গ্রীসেও এইরূপ নিষ্ঠুরতা ছিল; রোম গ্রীসের কাছেই শিক্ষা করিয়াছিল। রোমের ছোট বড় সকলেই এই নিষ্ঠুর আমোদের পক্ষপাতী ছিলেন; রাজা ও সম্রাটেরা ইহাতে উৎসাহ দিতেন। জগদ্বিখ্যাত জুলীয়স সীজরও উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সম্রাটদিগের ভিতর কনষ্টাণ্টাইনই প্রথমে এই পৈশাচিক উৎসবে বাধা দেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই;

"২৬৪ খৃঃ পূর্ব্বে মার্কস ব্রুটস এবং ডিশস ব্রুটস পিতৃশ্রাদ্ধে এই আমোদের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সাধারণতন্ত্রের শেষাবস্থায় এই প্রথার খুবই পসার বাড়িয়া উঠে। মাজিষ্টর কলেক্টর প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীদিগেরত কথাই ছিল না, যাঁহারা মহাসভায় নির্ব্বাচিত হইবার জন্য উমেদার হইতেন, তাঁহারাও এই নিষ্ঠুর ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিয়া ভোট-সংগ্রহের পথ মুক্ত করিতেন। সাধারণতন্ত্রের অবসানে সম্রাটদিগের আমলেই নিষ্ঠুর অমোদের ভয়ঙ্কর স্রোত বহিতে থাকে। জুলীয়স সীজরই ৩২০ যোড়া দাসকে নিষ্ঠুর আমোদে বাধ্য করেন। সম্রাট টাইটস একবার শত দিবস ধরিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদির সহিত দাসদিগের প্রাণান্তক যুদ্ধ করাইয়াছিলেন। সম্রাট ত্রেজানের আদেশে ১২৩ দিন নিষ্ঠুরতা চলিয়াছিল। তাহাতে ১০ হাজার দাসকে, হয় পরস্পর কাটাকাটি না হয় সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ, করিতে হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথায় অনেক মহাত্মা বরাবরই আপত্তি করিতেন, কিন্তু প্রথা একেবারে রহিত করা সহজ ছিলনা। বিখ্যাত রাজনীতিক ও বাগ্মী কাইকেরো বলিয়াছিলেন, "সরকারী কার্য্যে উমেদার হইবার পূর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে কেহই এই আমোদের আয়োজন করিতে পারিবেন না।" কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত নববিধান বাহাল হয় নাই। করুণাময় সম্রাট অগষ্টস ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "যাহার চারিলক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি নাই, সে এরূপ আমোদের আয়োজন করিতে পাইবে না। আর, কোন ব্যক্তিই বৎসরে দুই বারের অধিক আয়োজন করিতে পাইবে না।" অব-

শেষে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনষ্টাণ্টাইনই এই আমোদ রহিত করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাজকীয় নিষেধেও চিরন্তন আমোদের একেবারে তিরোভাব হয় নাই। শেষে যখন এশিয়ার সন্ন্যাসী টেলিমেকস রোমরাজ্যে গিয়া এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করিয়া লোকের মনে বিরাগ বিদ্বেষ উৎপাদিত করেন, তখনই—৪০৪ খৃষ্টাব্দে—নির্দ্দয়তার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীও কেবল কথার প্রতিবাদে নিষ্ঠুরতার নিবৃত্তি করিতে পান নাই। একদা এক ক্রীড়াক্ষেত্রে দুইটা দাস, সম্ভ্রান্ত দর্শক দর্শিকাদিগের সন্তোষের জন্য, প্রাণাদান করিতে উদ্যত হইয়াছে, দেখিয়া টেলিমেকস ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু দর্শকদিগের লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাঁহাকেই হত হইতে হইল। এই ঘটনার পরেই সম্রাট অনোরীয়স নিষ্ঠুর আমোদ একেবারেই রহিত করিয়া দেন। এই সৎকার্য্যের জন্যই তাঁহার অনোরীয়স নাম সার্থক। প্রথম প্রথম যুদ্ধের বন্দী এবং দস্যু দিগকেই গ্লাডিয়েটর হইয়া আত্মবলি দিতে হইত। শেষে যখন আমোদের স্রোত প্রবল হইয়াছিল, তখন সকল দাসকেই বধ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে হইত। সম্রাটেরা উৎসাহ দিতেন। কমোডসের মত অধম সম্রাটেরা ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক স্বহস্তে দাসহত্যা করিয়া গর্ব্ব করিতেন। যে সকল দাসকে গ্লাডিয়েটর করা হইত, তাহাদিগের কাটাকাটি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে কোন কোন গ্লাডিয়েটর-দাসও আত্মবলিদানে বা সহদাসহত্যায় অসম্মত হইয়া গোলযোগ ঘটাইত। গ্লাডিয়েটর স্পার্টাকস নিজে প্রতিকূল হইয়া, আর সকল দাসকেই প্রতিকূল করিয়াছিলেন। রোমরাজ্যে এই জন্য ঘোরতর দাস-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যৎ নিষ্ঠুরতানিবৃত্তি পক্ষে এটা একটা হেতু হইয়াছিল।"

কিন্তু যখন গ্লাডিয়েটরদিগকে কষাইখানার বধ্য-পর্য্যায়ে পরিণত হইতে হইত, তখনই রোম সভ্যতার চরমে উঠিয়াছিল!

রোমের দাস দাসীরা যে মিলনে আবদ্ধ হইত, তাহা দাস্যবিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ বিবাহও আইনের চক্ষে অগ্রাহ্য ছিল না। দাসীর সন্তানদিগকে কিন্তু মাতার সঙ্গেই থাকিতে হইত, মাতার প্রভুকেই প্রভু বলিয়া মানিতে হইত। বাছুরও ত ষাঁড়ের হয় না, গাইয়ের হয়। গ্রীসের মত রোমেও দাসমুক্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কাহারও দাস দাসীকে কেহ আশ্রয় দিতে পারিত না। আমেরিকার দাস-পোষক শ্বেতপুরুষেরা ঐ নজীর শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। রোম রাজ্যেও দাস দাসীর সংখ্যা করা সহজ ছিল না। এক এক ধনপতি দুইশত দাস দাসী লইয়া সংসার করিতেন। শ্রমের কার্য্যে গ্রীসের দাস দাসীদিগের যেরূপ অবস্থা ব্যবস্থা ছিল, রোমেরও সেইরূপ হইয়াছিল।

খৃষ্টান ইউরোপে।

ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরও দাসত্ব কলঙ্কে মুক্ত হয় নাই; দাস-পীড়নের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু দাসত্ব-প্রথা সহজে তিরোহিত হয় নাই। রোমক সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন, গ্লাডিয়েটর-হত্যায় বাধা দিয়া স্বীয় দয়াল নাম সার্থক করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই আবার দয়া-প্রণোদিত হইয়াই, দীনহীন পিতামাতাকে সন্তানবিক্রয়ে অধিকার দিয়াছিলেন। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে জষ্টিনীয়ান দাসমুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে দাস-মুক্তির ব্যবস্থা তিনিও করিতে পান নাই। খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ও পাদরি মহাশয়েরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "যে প্রভু আদালতের আদেশ বিনা নিজের দাস দাসীর বধ করিবে, সেই সমাজচ্যুত এবং পতিত হইবে।" এ ব্যবস্থায় নিষ্ঠুরতা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল, কিন্তু দাসত্ব তিরোহিত হয় নাই। অখৃষ্টান রোম-রাজ্যে দাস দাসীদিগের যে বিবাহ আইনের গ্রাহ্য ছিল, খৃষ্টান রোমরাজ্যে সেই বিবাহ সহজে ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত হইতে পায় নাই। সম্রাট বেশিল ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ৮৮৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দাস দাসীর বিবাহ তাঁহারই সময়ে এবং তাঁহারই চেষ্টায় ধর্ম্মসঙ্গত হইয়া ধর্ম্মযাজকদিগের গ্রাহ্য হয়। খৃষ্টান রোমক-রাজ্যেও যুদ্ধে বন্দীভূত বর্ব্বরদিগকেই দাস দাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল; নবাধিকৃত অসভ্য রাজ্যের অনেক নর নারীকেই দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

সুদূর ব্রিটেনেও।

সুদূর ব্রিটেন-দ্বীপেও দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। বিজেতা এংলোসেক্সন জাতি বিজিত আইরিষ নরনারীদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দাস দাসীর ব্যবসায় বাণিজ্যেও তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না। সুন্দর সুন্দরী আইরিষ নর নারীদিগের, দাস-বাজারে দর বড় চড়া ছিল।

ইউরোপের অনেক লোকেই ইংলণ্ডের হাট হইতে আইরিষ দাস দাসী কিনিয়া আনিতেন। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরেই সর্ব্ব-প্রধান দাসহট্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। আইরিষদিগের প্রতি অত্যাচার খুবই অধিক ছিল। কিন্তু শেষে বিজেতা এংলোসেক্সন-দিগকেও নর্ম্মাণ বিজেতা উইলিয়ম এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের হস্তে বিজিত হইতে হইয়াছিল। তখন তাহাদিগকেও আইরিষদিগের সমান আসনে বসিতে হইয়াছিল।

নর্ম্মাণদিগের আধিপত্যকালে অনেক এংলোসেক্সনকে দাসত্বের অধীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন অন্যান্য ইউরোপীয় প্রদেশের ন্যায় ব্রিটেন দ্বীপেও স্লেভ-সম্প্রদায় সার্ফ-সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল; পূর্ব্বতন পণ্য দাস দাসীদিগকে নর্ম্মাণদিগের ভৌম দাস দাসী হইতে হইয়াছিল। মধ্যযুগে খৃষ্টান ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই সার্ফ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। নিজ ইউরোপের দাস-ব্যবসায় মধ্যযুগে প্রশমিত হইয়াছিল, সার্ফদিগকে স্বদেশে ও স্বপরিবারে থাকিয়াই প্রভুদিগের দাসত্ব করিতে হইত। ক্রমে সার্ফ সম্প্রদায়েরও তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু সে কথা এখন কহিব না; এখন মুসলমান রাজ্য ও মুসলমান জাতির কথাই কহিব।

দাসত্বে মুসলমান।

দাস দাসীর প্রতি মুসলমানদিগের চিরন্তন অনুরাগ। মুসলমান দাস-ব্যবসায়ীরা ইউরোপ হইতে খৃষ্টান নর নারীদিগকে আনিয়া দাস্যে আবদ্ধ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। খৃষ্টান দাস দাসীর বাণিজ্যে এশিয়া এবং উত্তর আফরিকার মুসলমানেরা কুবের হইয়া উঠিতেন। শেষে আফরিকার নর নারীই খৃষ্টান আমরিকার প্রধান পণ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল বটে, প্রথমে কিন্তু ইউরোপের খৃষ্টানই আফরিকার পণ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। ভিনীশের বণিকদিগের দাসবাণিজ্য ছিল মুখ্য বাণিজ্য, দ্রব্য সামগ্রীর বাণিজ্য ছিল গৌণ বাণিজ্য। উত্তর আফরিকার বার্ব্বরি রাজ্য পাঠকের পরিচিত। বার্ব্বরির কর্সেয়ার বা জলদস্যুদিগের সহিতও কবিবর বায়রণ প্রভৃতির কল্যাণে পাঠকের পরিচয় হইয়াছে।

বার্ব্বরির মুসলমান জলদস্যু কর্সেয়ারদিগের জ্বালায় ইউরোপকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। ডন্‌কুইক্‌সোর লেখক সার্ভেণ্টীশকে পর্য্যন্ত স্বদেশ স্পেন হইতে নীত হইয়া উত্তর আফরিকার অলজীয়র্স নগরের দাসাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। দাসাগারে তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল পঁচিশ হাজার দাস দাসীর ভিতর, পাঁচ বৎসর অবশেষে তাঁহার আত্মীয়েরা ১৫০০ টাকা জানখালাসী দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। দাস দাসীর বাজারদর ছিল তখন ৪৫০ হইতে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু বড় লোকের মূল্য অধিক ছিল। তাই সার্ভেণ্টীশকে ১৫০০ টাকায় মুক্তিলাভ করিতে হইয়াছিল। দাসব্যবসায়ী মুসলমানেরা উচিত মূল্য পাইলেই দাস দাসীকে মুক্তি দিত। এজন্য ইউরোপের খৃষ্টানেরা নানা স্থানে দাসমুক্তির ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টান নর নারীর দাসত্বমুক্তির জন্য চারিদিকের মঠে অর্থ সংগৃহীত হইত। বিলাতের মঠে মন্দিরে গির্জ্জা চাপেলেও অর্থ সংগ্রহের ত্রুটি হইত না। কর্সেয়ার বা সাগরিক দস্যুদিগের উৎপাত ভূমধ্য সাগরে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সাগর-ভাগে অনেক দিন ছিল; শেষে ইংরেজ ফরাসী ও মার্কিণের চেষ্টায় সেই অত্যাচার নিবৃত্ত হয়। এপক্ষে মার্কিণই অধিক প্রশংসনীয়।

ইউরোপের সার্ফ।

ইউরোপের সর্ব্ববিধ দাস দাসীই ক্রমে সার্ফ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। বিজিত অধিবাসীদিগকে প্রায়ই এইরূপ দাসত্বে আবদ্ধ হইতে হইত। আবার দুর্ভিক্ষাদি মহাব্যসনে অনেক স্বাধীন দীন হীনও আত্মবিক্রয় করিয়া পরাধীন হইত। অনেক দীন ভক্ত আবার মঠ মন্দিরের কৃত-দাস হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করিত। পাদরিরা ভজনা দ্বারা ইহাদিগের মুক্তিপথ প্রশস্ত করিতেন, ইহারাও তাঁহাদিগের দাসত্ব করিয়া শান্তিলাভ করিত। এরূপ ধর্ম্মদাস না থাকিলেও ত ভারতে নবযুগে এরূপ ধর্ম্মদাসীর অভাব ছিল না। মাদ্রাজের দেবনর্ত্তকীরা যে, পুরাতন ধর্ম্মদাসীদিগেরই স্থান পূর্ণ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সার্ফ বা মাধ্যযুগীন দাস দাসীদিগের অবস্থা পূর্ব্বতন দাস দাসীদিগের অপেক্ষা কিছু ভাল ছিল। অনেক প্রদেশেরই সার্ফেরা বিনা পীড়নে কালযাপন করিতে পাইত। ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন দাস দাসীদিগের ন্যায় অনেক এংলোসেক্সনকেও

যে, নর্ম্মাণ রাজাদের আমলে সার্ফ হইতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংলণ্ডের সার্ফ প্রকৃতই ভৌম দাস বলিয়াই পরিচিত ছিল; তাহাদিগকে স্বভূমিচ্যুত হইতে হইত না। কিন্তু শেষে সার্ফ সম্প্রদায়েও দুইটা উপসম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি নানারূপ অধিকারভোগ করিতে পাইত, কতকগুলি পাইত না। যাহারা পাইত না, তাহারা পূর্ব্বতন দাস্যভাবেই আবদ্ধ ছিল। ইহাদিগকে ভূমিচ্যুতও হইতে হইত। সুতরাং ইহারা ভৌমদাস বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য ছিল না। কিন্তু ভৌম অভৌম সকল সার্ফই প্রভুর অতি নিষ্ঠুরতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজার আশ্রয় লইতে পাইত, এই জন্যে প্রভুদের নিষ্ঠুরতা অনেকটা প্রশমিত থাকিত। ইংলণ্ডের সার্ফসন্তানকে পিতারই অধীন হইতে হইত। জারজ সার্ফসন্তানেরা সুতরাং স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতালাভ করিত। সার্ফ সম্প্রদায়ে এই জন্যই গুপ্ত প্রেম ও ব্যভিচারের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইতিহাসের ন্যায় কাব্য নাটক এবং নবন্যাসেও ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সার্ফসম্প্রদায়ের তিরোভাব।

তিরোভাব ক্রমে ক্রমে—অতিবিলম্বে হইয়াছিল। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময়েও সার্ফপ্রথার তিরোভাব হয় নাই; রাজা প্রথম চার্লসের সময়েও সার্ফসম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়াছিল। যে ভীষণ গৃহযুদ্ধে রাজা প্রথম চার্লসের হত্যা হয়, যাহার জন্য ইংলণ্ডে কিছুদিন সাধারণ-তন্ত্রের নাম করিয়া ক্রমোয়েল একাধিপত্য করেন, যাহার জন্য শেষে পার্লেমেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেই গৃহযুদ্ধ ইংলণ্ডের লৌকিক স্বাধীনতার পথ যে, বিলক্ষণ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ইতিহাসবিৎ পাঠকের অবিদিত নহে। সার্ফদিগের দাস্যভাবও সেই সূত্রেই তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু খনির ভিতর যাহাদিগকে মজুরী করিতে হইত, তাহাদের দাসত্ব অনেক দিন ছিল; রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময়েই তাহাদিগের দাসত্ব ঘুচাইবার আইন বাহাল হইয়াছিল। ফরাসিরাজ্যে সার্ফ-প্রথা বহুকাল বজায় থাকিয়া প্রথম বিপ্লবের স্বাধীনতা-পূজার সময়ে তিরোহিত হয়। যেখানে কৃষি-কার্য্যের আধিপত্য ছিল, সার্ফ বা ভৌম দাসদিগের সেইখানে উপযোগিতা ছিল। ইতালিরাজ্যে অতিপূর্ব্বেই বাণিজ্যের আধিপত্য হইয়াছিল। তাই পঞ্চদশশতাব্দীতেই ইতালির সার্ফ বা ভৌমদাসেরা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। জর্ম্মণীর প্রুষিয়া রাজ্যে সার্ফ প্রথার তিরোভাব হইয়াছিল উনবিংশশতাব্দীতে। মহাত্মা বন স্তীনের কল্যাণেই প্রুষিয়ার কলঙ্ক-মোচন হইয়াছে। রুষকে সর্ব্বশেষে কলঙ্কমুক্ত হইতে হইয়াছে; সম্রাট দ্বিতীয় এলেকজন্দরই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় সাম্রাজ্যের অসংখ্য সার্ফ বা ভূস্বামিগতপ্রাণ ভৌম দাসকে সপরিবারে মুক্তি দিয়া ধন্য ধন্য হইয়াছিলেন।

ভারতের কথা।

দাস ভারতে ছিল পনর প্রকার। নারদই বলিতেছেন,

"গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধোদায়াদুপাগতঃ।
অন্নাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণেজিতঃ।
তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
বিক্রেতাচাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ"॥

গৃহজাত অর্থাৎ দাসীতে উৎপন্ন, দায়াৎ উপাগতঃ অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় প্রাপ্ত, অন্নাকালভৃতঃ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে পোষিত, ঋণ-মুক্ত, যুদ্ধে জিত, পণে বা দ্যূতক্রীড়ায় নল শ্রীবৎস প্রভৃতির ন্যায় জিত, "আমি তোমার দাস হইলাম," এই বলিয়া স্বয়ং উপগত, প্রব্রজ্যাবসিত অর্থাৎ সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট এবং দাসরূপে পরিণত, কৃত অর্থাৎ এই কারণে এত কালের মিয়াদে আমি তোমার দাসত্ব করিব, এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ, ভক্ত দাস অর্থাৎ সুভিক্ষেও ভাতের জন্য দাসীভূত, বড়বাকৃত অর্থাৎ বড়বা বা দাসীর লোভে স্বেচ্ছায় দাসত্বে আবদ্ধ, এইরূপে দাস ভারতে ছিল, পঞ্চদশবিধ। কিন্তু বস্তুগত্যা—অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও এই পঞ্চদশবিধ দাসই দুই পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারিত। যে মূল্য সহযোগে ক্রীত হইত, সেই ছিল ক্রীত দাস, আর যাহারা এইরূপ ক্রীত না হইয়াও দাস হইত, তাহারা—সেই চৌদ্দ দাসই—কৃত দাস ছিল। দাস্যভেদে কর্ম্মভেদ ছিল। কোন কোন দাস দাসীকে নীচকর্ম্ম করিতে হইত; সকলকে করিতে হইত না।

দাসত্বপ্রথা মুসলমানদিগের সময়েও ভারতে প্রবল ছিল। মুসলমান নরপতিরা দাস দাসী—বান্দা বান্দী—রাখিবার

জন্য লালায়িত ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার খুব কমই হইত। কোন কোন বাঁদী বেগম হইত। প্রকৃত বেগমত্ব-লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটিত না, কিন্তু কার্য্যে বেগমত্ব অনেকেই করিতে পারিত। দাসদিগের ভাগ্যও সময়ে সময়ে সুপ্রসন্ন হইত; বাদশাহ নবাবের সংসারে থাকিলে ভাগ্যপ্রসাদ একান্ত দুর্ল্লভ হইত না। মুসলমান ধনপতিরাও দাস দাসীর পোষণে উদাসীন ছিলেন না। ধনপতি না হইয়াও অনেকে দাস দাসী রাখিতেন। ভারতের কোন কোন মুসলমান সংসারে এখনও গুপ্ত দাস্যপ্রথা প্রচলিত আছে কি না, আজ আমরা ঠিক করিয়া হলপ লইয়া বলিতে পারি না; কিন্তু বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান্ সংসারে বাঁদী ছিল, তাহা আমরা জানি। পূর্ব্ববঙ্গের কোন জেলার কোন প্রধান সহরের কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ধনপতির অন্দরের বাঁদী, কোন সুযোগে পলাইয়া আসিয়া, কোন কোন রাজপুরুষের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আমাদের ন্যায় আরও অনেকে জানেন। পঞ্চাশ বৎসরের খবর আমরা দিতে পারি, সে যময়ে ঢাকা অঞ্চলের কোন কোন হিন্দুসংসারেও কৃতদাসী রাখিবার নিয়ম ছিল। একটী সদ্গোপজাতীয়া যুবতী কোনরূপে কোন সংসারে ধৃত হইয়া, সেই সংসারেই প্রবীণা হইয়া, আবার কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়াছিল; কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে গিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিল; ইহা আমাদিগের শোনা নহে, দেখা। বাঁদীপুত্রকে নবাবপুত্র হইতে আমরাও দেখিয়াছি। হিন্দু সংসারের হিন্দু দাসবংশজদিগকে যে, এখনও নফরবংশজ বলিয়া পরিচিত হইতে হয়, ইহা বোধ হয় ঢাকা অঞ্চলের অনেক মহাশয়ই আমাদিগকে বলিয়া দিবেন।

দাসে কোম্পানি।

ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে, অন্যান্য অনেক দ্রব্যের ন্যায় এদেশে দাস দাসীর ব্যবসায়ও করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না, তাহা ইতিহাসবিৎ পাঠকের নিশ্চিতই বিদিত আছে। নোলানের ভারতীয় ইতিহাসে দেখিবেন, "১৬৮৩ অব্দের জুলাই মাসে এবং ১৬৮৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, বোম্বাই সুরাটের অধ্যক্ষ কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী, বিলাতের অধ্যক্ষসভা হইতে যে আদেশপত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে দাস ব্যবসায়ের কথাই কথিত হইয়াছিল: দেখা গিয়াছে, ঐ সময়ে অন্যান্য মালের ন্যায় সুরাটের কুঠী হইতে দাস দাসীরও রপ্তানি হইত। ঐ সময়েই সেণ্টহেলীনা দ্বীপটাও ইংলণ্ডেশ্বর ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়াছিলেন। সেই দ্বীপের জন্য দাস দাসী আবশ্যক হইত; আর সেই দ্বীপের জন্য কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সুরাটের কুঠীর অধ্যক্ষকে ক্রমাগত দাস দাসী পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আদেশপত্রে লেখা ছিল, সেণ্টহেলীনার আবাদের জন্য প্রচুর দাস আবশ্যক; কিন্তু দাসেরা দাসী না হইলে স্থির থাকে না, মধ্যে মধ্যে ক্ষেপিয়া উঠে। অতএব দাস দাসী দুই পাঠাইতে হইবে।" হুকুম যে, তামিল হইত না, তাহাত আর মনে করিবার হেতু নাই।

লম্পটশিরোমণি দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিয়া, ১৬৮৫ পর্য্যন্ত বিরাজ করিয়াছিলেন। ১৬৮৫ সালেই দ্বিতীয় জেমস রাজা হন। ১৬৮৩।৮৪ অব্দে দ্বিতীয় চার্লসই ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন; রাজা দ্বিতীয় চার্লস নিজে দাস দাসী ভাল বাসিতেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহারই সময়ে দাস ব্যবসায়ে মন দিয়াছিলেন। ১৬৮৩ অব্দের যে মাসে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের অনুরোধে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তারা সুরাটের কর্ত্তাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মে পাঠককে মুগ্ধ হইতে হইবে। পত্রখানির অবিকল অনুবাদ করিয়া দিই।

রাজার জন্য দাস দাসী।

কোম্পানির অধ্যক্ষেরা সুরাটের অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডেশ্বর আমাদিগকে ভারতে পত্র লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি তাঁহার জন্য একটী দাস ও দুইটী দাসী পাঠাইয়া দিবেন। দাস দাসীদিগের খর্ব্বাকৃতি হওয়া আবশ্যক। দাসের বয়স হইবে জোর ১৭ বৎসর, দাসী দুইটীর ১৪ বৎসর করিয়া। যাহারা খর্ব্বাকৃতি হইয়াও দেখিতে সুশ্রী, তাহাদিগকেই পাঠাইবেন। কোম্পানির নিজের জাহাজেই যেন উহাদিগকে পাঠান হয়। জাহাজের অধ্যক্ষকে বলিয়া দিবেন, যেন দাসটীকে ও দাসী দুইটীকে খুবই যত্নপূর্ব্বক লইয়া আসেন। অধ্যক্ষকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন, যেন সাগরপথে জাহাজের নাবিকগণ কোন দাসীর সহিত কোনরূপ কুব্যবহার না করিতে পায়; নাবিকদিগকে বিশ্বাস নাই। পথের আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যই আপনি জাহাজে তুলিয়া দিবেন। দাসী দুইটীর যেন কানে মাকড়ী কর্ণফুল প্রভৃতি থাকে, নাকেও যেন নথের অভাব না হয়, পায়েও যেন মলের অভাব না হয়; অলঙ্কার তাহাদিগকে জাহাজে পরিতে হইবে না, বিলাতে আসিয়া পরিতে হইবে।"

রাজার হুকুম অবশ্যই তামিল হইয়াছিল। কোম্পানির প্রথম আমলে ভারতে দাস দাসীর ধূম লাগিয়াছিল। কলিকাতার সাহেব বিবীরাও দাস দাসী রাখিতেন। অনেক দিন পরে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনেক পরেও, কলিকাতায় বালক যুবক দাস এবং বালিকা যুবতী দাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না; তখনও কলিকাতায় "কলিকতা-গেজেট ও দৈনিক বার্ত্তাবহ" নামে একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র চলিত। সেই পত্রে প্রায়ই দাস দাসীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। কোন দিন কোন সাহেব বা বিবী দাস বা দাসী কিনিবার জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন; কোন দিন বা কোন সাহেব কোন পলায়িত দাসীর সন্ধান পাইবার জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেন; কোন দিন বা কোন বিবী পলায়িত ছোকরা-দাসের পুনঃপ্রাপ্তি আশায় ঐরূপ বিজ্ঞাপনের প্রচার করিতেন। কোম্পানির ভারতেও দাস-ব্যবসায় অনেক দিন চলিয়াছিল। শেষে যখন নিজ বিলাতে ব্যবসায় রহিত হয়, তখনই ভারতেও রহিত হইয়াছিল। কিন্তু অগ্রে কৃষ্ণদাস নিগ্রোদিগের পূর্ব্বকথা কহিয়া পরে দাসমুক্তির কথা কহিব। কৃষ্ণদাসের কথা শীঘ্র সাঙ্গ হইবে না। দাসমুক্তির কথায়ও অনেক কথা আসিয়া পড়িবে। শেষে এখনকার অবস্থায়ও ইঙ্গিত করিতে হইবে। সুতরাং এ প্রবন্ধের এইখানেই উপসংহার করিয়া, অন্যান্য কথা আমরা অন্য প্রবন্ধের জন্য রাখিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

রায় রামানন্দ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব স্বকৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষাও অত্যন্ত নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু একান্ত অভিমানশূন্য অন্যকে সম্মান-দানে-তৎপর ব্যক্তি দ্বারাই হরিনাম কীর্ত্তনীয়।

মহাপ্রভু নিজের জীবনদ্বারা এই সকল ধর্ম্মের আচরণ করিয়া লোক-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

কাশীধামে প্রকাশানন্দ প্রমুখ বৈদিক পণ্ডিত মণ্ডলীর সমক্ষে আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ দেখাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমের মুখে বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ কালে তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, মধ্য ও অন্ত্যলীলার সমস্ত কার্য্যে আপনাকে অমানী দেখাইয়াছেন এবং নিত্যানন্দ, হরিদাস ও রূপসনাতন ও রামানন্দের প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়া আপনাকে মানদ দেখাইয়াছেন। নিত্যানন্দ অবধূত এবং স্বেচ্ছাবিহারী, তিনি বিধিমার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন নাই, তৎকালের সাধারণ লোকের চক্ষে তিনি আচারভ্রষ্ট বলিয়া নিন্দিত ছিলেন, হরিদাস যবন বলিয়াই পরিচিত, অন্ততঃ যবনগৃহে প্রতিপালিত ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত, মহাপ্রভু এই দুইজনকেই ধর্ম্মপ্রচারক করিলেন। রূপসনাতন যখন সংসর্গে সমাজের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট এবং নিন্দনীয় ছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাদের উপরেই ভক্তিগ্রন্থ এবং বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণয়নের ভার অর্পণ করিলেন; রায় রামানন্দ জাতিতে শূদ্র, গৃহী এবং রাজসেবক, মানদ দয়ার ঠাকুর তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইয়া তাঁহার মুখ হইতে অনুপম ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করিলেন, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য রামানন্দের মুখে যে সকল অপূর্ব্ব মধুময় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব।

মহাপ্রভু রামানন্দকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া শিক্ষার্থী শিষ্যের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন, রামানন্দ ভাবকণ্টকিত গাত্রে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইয়া দেবাবিষ্টের ন্যায় উত্তর দিতেছেন।

প্রভুকহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয়,
রায়কহে স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধ্য কি তাহা বল। রায় বলিলেন, স্বধর্ম্মাচরণই সাধ্য, উহাদ্বারাই কৃষ্ণভক্তি উৎপন্না হয়। মনুষ্য-জীবন গঠন করিবার জন্য প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় (Discipline) অর্থাৎ শৃঙ্খলা। যে ব্যক্তি প্রথম হইতে কোন বিধিমার্গে চলে না তাহার জীবন উশৃঙ্খল হয়,

সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। স্বেচ্ছাচারিতা মনুষ্য জীবনের পরম শত্রু, স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে সর্ব্ব-প্রকার সংযম হইতে দূরে রাখে, এই জন্য পুণ্যপ্রাসাদারোহণের প্রথম স্তর বিধিপালন। কোন বিধিই সর্ব্বতোভাবে কাহারও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বা মতের অনুকূল হয় না, কিন্তু তাহা ভাবিয়া বিধি-মার্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। নিয়ম যাহাই হউক এবং তাহার মধ্যে দোষ গুণ যাহা থাকুক, কিন্তু নিয়ম যে নিয়ম তাহার ত আর ভুল নাই; নিয়মান্তর্গত কার্য্যগুলির কোন কোনটী তোমার রুচিসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া একটা শাসনের মধ্যে থাকিয়া নিয়ম পালনের, আত্ম সংযমের, একটা শক্তি ত তোমার জন্মিবে। সে শক্তি নহে, বলিতে গেলে উহাই তোমার সমস্ত উন্নতির মূল। তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সদসৎ যে কার্য্য করিবে তাহাতেই তোমার স্বেচ্ছাচারীতা বাড়িবে বই কমিবে না। খামখেয়ালী কোনও নবাবপুত্র রাজ পথে পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া যদি দরিদ্র-পল্লীতে অগ্নিপ্রদান করিয়া সমস্ত পল্লী ভস্মীভূত করে, এবং পর মুহূর্ত্তেই যদি দরিদ্রদিগকে অযুত স্বর্ণমুদ্রা পথি-মধ্যে ছড়াইয়া দেয়, তবে এই সদসৎ উভয় কার্য্য দ্বারা তাহার উশৃঙ্খলতারই বৃদ্ধি হইবে। তুমি যদি কোন বিধি দ্বারা বদ্ধ না হও, কোন আইন দ্বারা শাসিত না হও, তোমার জীবন নিশ্চয়ই উশৃঙ্খল হইবে এবং তুমি কখনও চিত্তসংযম ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এই জন্য রামানন্দ বলিলেন, স্বধর্ম্মাচরণে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বিধিমার্গের অনুসরণে কৃষ্ণভক্তি হয়। পণ্ডিত হইতে হইলে প্রথমেই যেমন অ আ শিখিতে হয়, অ আ না শিখিলে কিছুতেই পণ্ডিত হওয়া যায় না, সেইরূপ স্বধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ যাহার জন্য সমাজে যে সকল বিধি প্রচলিত আছে তাহা পালন না করিলে নির্দ্দিষ্ট শাসনে শাসিত না হইলে, নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুগত না হইলে, কৃষ্ণভক্তি হয় না। তাদৃশ ব্যক্তির চিত্ত ভগবানে নিবিষ্ট হয় না, বাতবিক্ষোভিত সমুদ্র বক্ষে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। পরন্তু বিধি মার্গে না চলিলে আত্মাভিমান খর্ব্ব হয় না; অভিমান চিত্তকে সর্ব্বদাই বহির্মুখ করিয়া রাখে. বহির্মুখব্যক্তি কখনই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারে না। এই জন্য প্রথমে স্বধর্ম্মাচরণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু অ আ শিখিলেই যে পণ্ডিত হইলে তাহা নহে, এই জন্য

"এহ বাহ্য প্রভু কহে আগে কহ আর,"

মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা বাহিরের কথা, হইল, আরও কিছু অগ্রসর হইয়া বল,

"রায় কহে কৃষ্ণেকর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।"

বিধিমার্গে চলিয়া মানুষ যখন সংযম অভ্যাস করিল, কিছু অভিমানশূন্য হইল, আপনাকে ছোট বুঝিল, নিয়মের কাছে অবনত হইয়া আত্মনিবেদন করিতে শিখিল, বিধি-পালন দ্বারা তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইল, সৎকার্য্যে অভ্যাস জন্মিল, সে অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হইল, তখন তাহার ভগবানে কর্ম্মার্পণ করার অধিকার জন্মিল।

ভগবানকে কর্ম্মার্পণ করিতে হইলে অসৎকার্য্য করা যায় না এবং দিন দিন নির্ভয়ের ভাব প্রবল হইতে থাকে। সমস্ত সংসার মধুময় হইয়া যায়। প্রহ্লাদের বিষখণ্ড যেমন অমৃতখণ্ড হইয়াছিল, সেইরূপ শত্রুও মিত্র হইয়া উঠে। তখন আর সে ব্যক্তি কাহারও দ্বারা ব্যথিত হয় না, কাহাকেও ব্যথিত করে না। তখন অবৈধ কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য হইয়া পড়ে।

রায় রামানন্দের উত্তর শুনিয়া,

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর,"

প্রভু বলিলেন, ইহাও বাহিরের কথা হইল, আরও ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্য সার,"

প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।" তৃতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—"স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্যসার"। যাঁহারা কোনও প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করেন, এইরূপ স্থানে তাঁহাদের বড়ই ধাঁধা লাগিয়া যায়। হিন্দু শাস্ত্রের প্রণালী এই যে অধিকারী ভেদে এবং স্তরে স্তরে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে বালককে একাকী ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে গুটি গুটি পা ফেলিতে শিখাইতে হইবে, যখন হাটিতে শিখিল তখন হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। পূর্ব্বে তাহার হাত ছাড়িয়া দিলে বিপদ ঘটিত, এখন তাহার হাত ধরিয়া রাখা অবৈধ হইবে পূর্ব্বে ধরিয়া না রাখিলে সে পড়িয়া যাইত, এখন ধরিলে গেলে সে বিরক্ত হইবে। রামানন্দ রায় সেইরূপ প্রথমে

স্বধর্ম্মাচরণের দৃঢ়মুষ্টিতে শিশুধর্ম্মজীবনকে ধরিয়া রাখিলেন, তাহার পরে তাহাকে গুটি গুটি পা ফেলাইয়া কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ শিখাইলেন। এখন ত আর ভয় নাই, শিশু হাটিতে শিখিয়াছে, এখন তাহার জীবন বিধিময় এবং কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, এখন আর তাহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই, এখন আর তাহার পড়িয়া মরিবার ভয় নাই। এখন স্বতন্ত্রতায়ই তাহার উন্নতি, এখন তাহাকে ধরিয়া রাখিলে সে দুর্ব্বল হইবে; সুতরাং রায় বলিলেন, এতটা যখন হইয়াছে এখন ইহার পক্ষে "স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্য সার।" রামানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া,—

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর"

প্রভু বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, আরও ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।"

রামানন্দ কহিলেন, জ্ঞান মিশ্রাভক্তিই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা, নিত্যানিত্য বিবেক দ্বারা, জগতের সৃষ্টি কৌশল দ্বারা ভগবান্‌কে আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ জানিয়া তাঁহার প্রতি যে আশক্তি তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই ভক্তিতে স্তুতি থাকে, স্তব থাকে, আরাধনা উপাসনা প্রার্থনা থাকে। ইহাই ভক্তির প্রথম স্তর। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শুনিয়া

"প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর"

প্রভু বলিলেন ইহাও বাহিরের কথা, আরও ভিতরের কথা বল।

"রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।"

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন "জ্ঞান ও ভক্তি, স্বামী ও স্ত্রী। ইহারা উভয় মিলিয়া ভগবানের বাড়ী যায়, জ্ঞান পুরুষ মানুষ—বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া থাকে, ভক্তি স্ত্রীলোক সে অবাধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে।"

যতক্ষণ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ বিচার থাকে, ততক্ষণ স্বার্থ চিন্তা থাকে, ততক্ষণ উদ্দেশ্য থাকে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, আধা আমি আধা তুমি, জ্ঞান শূন্যা, অর্থাৎ বিশুদ্ধাভক্তি ষোল আনাই তুমি। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি কখন ভাবে, কখনও কাঁদে; বিশুদ্ধাভক্তি কেবলই কাঁদে, সে আর কিছুই ভাবিতে জানে না। জ্ঞান-ভক্তি, ধবলাগিরির শেখর সঞ্চিত তুষার-রাশির ন্যায়, সে কখনও গলে, কখনও জমাট বাঁধে; বিশুদ্ধাভক্তি গিরিগাত্রবাহিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, তাহার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে আর জমাট বাঁধিতে পারে না; তাহার প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, আর ফিরাইতে পারে না। কুলু কুলু কুলু অস্ফুট অব্যক্ত ভাষায় ব্যাকুলতাময়ী প্রেম গীতি গাহিয়া নির্জ্জন নগকন্দরের নিকুঞ্জ বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপল-খণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া, কত কাকুতি মিনতিতে সুবৃহৎ প্রস্তর স্তূপের পাশ কাটিয়া, বালুকা রাশি ভেদ করিয়া, কত আকুবাকু করিয়া এক স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নাই। আত্মসম্বরণের শক্তি নাই, সে তাহার ঢালা প্রাণকে আর ফিরাইতে পারে না। সে কেবল ছুটিয়াছে, আর কুলু কুলু রবে গাহিতেছে—"কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, আমার পিপাসার জল কোথায় তুমি? আমি তোমার রূপ জানি না, রস জানি না, গন্ধ জানি না, স্পর্শ জানি না। তুমি সুরূপ হও কুরূপ হও, সদয় হও নিদয় হও, তোমাতে আমার সুখ থাকুক বা দুঃখ থাকুক, শান্তি থাকুক কি অশান্তি থাকুক, তাহা আমি ভাবিতে চাহি না, ভাবিতে পারি না, এই দেখ গিরিবরের উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আমার প্রাণ গলিয়া তোমার দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কোন বাধাই মানিতেছে না। কোথায় তুমি, কোথায় তুমি তোমাতেই আমি মজিব।

ভক্তির যখন এই অবস্থা হয়, তখন সে জ্ঞানের বন্ধন সহ্য করিতে পারে না, সাগর তরঙ্গাকুলিত বালুকা স্তূপের মতন আপনা আপনি ধসিয়া পড়ে, কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে পারে না। অন্য মুখাপেক্ষণী হইলে ভক্তির বিশুদ্ধতা থাকে না।

বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র বলেন,

"অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

অন্য অভিলাষ শূন্য হইয়া জ্ঞান এবং কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত প্রেমভাবে ভগবদনুশীলনের নাম উত্তমাভক্তি।

অন্য অভিলাষ থাকিলে ভক্তি বিশুদ্ধা হইল না, জ্ঞান কিম্বা কর্ম্মের আনুগত্য থাকিলেও ভক্তি বিশুদ্ধা হইল না, কেবল প্রেমবিহ্বলা ভক্তিই বিশুদ্ধা ভক্তি। আমি যাহাকে ভালবাসি সে সৎ কি অসৎ যদি আমার এরূপ বিচার বুদ্ধি থাকে, অথবা কি কি কারণে তাহাকে আমি ভালবাসি,

আমার যদি সেই সকল সংস্কার থাকে তবে আমার ভালবাসা খাঁটি ভালবাসা নহে। ভাগবৎ বলেন,

"আত্মারামশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূত গুণোহরিঃ॥"

যাঁহারা আত্মারাম অর্থাৎ যাহাদের সমস্ত দুঃখের শান্তি হইয়া আত্মাতেই তৃপ্তি লাভ হয়, এবং যাঁহারা নির্গ্রন্থা অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হইয়াছে, পাপ-তাপের নিবৃত্তি হইয়াছে, হরির এমনই গুণ যে সেই সকল মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। সাধকের একটী অবস্থা আছে এবং শ্রীহরির একটি গুণ আছে, সাধক যখন সেই অবস্থায় উপস্থিত হন, হরির সেই গুণটী তখন আপনা হইতে তাঁহাকে টানিয়া লয়। দিক্‌যন্ত্রের কাঁটাটি যেমন উত্তর দিকেই ফিরিয়া থাকে, ভক্তের প্রাণটীও তেমনি ভগবানের দিকেই চাহিয়া থাকে, অন্য কার্য্যকারণের কিছু সম্বন্ধ থাকে না।

যদি কেহ মনে করেন যে, ভক্তি, জ্ঞানসঙ্গরহিতা হইলে বিপথগামিনী হইতে পারে, তাঁহাকে একটি কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি। বিশুদ্ধা ভক্তির উৎপত্তি হইলে সাধক বিধিকে পরিহার করিতে যত্ন করেন না এবং লঙ্ঘনও করিতে পারেন না। ধর্ম্ম তখন শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য হয়, উহার রক্ষার জন্য তাঁহাকে যত্ন করিতে হয় না; সুতরাং বিশুদ্ধা ভক্তি যেমন জ্ঞানবিরহিতা, তেমনি অনাবিলা। প্রিয়া সম্ভাষণে কেহ প্রহরী সঙ্গে লইয়া যায় না, সেইরূপ গেলে বড়ই রসভঙ্গ হয়। সেইরূপ ভক্তিদেবী ভগবৎ সমক্ষে জ্ঞান প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া যান না, যাঁহার কাছে যাইতেছেন তাঁহার প্রতি ষোল আনা বিশ্বাস, ষোল আনা নির্ভর, ষোল আনা টান। অন্যকে সঙ্গে লইলে সম্বন্ধ শিথিল হয় এবং রসভঙ্গ ঘটে। এই স্থান হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম আরম্ভ, রামানন্দ রায়ের এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া,—

"প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।"

ততক্ষণ কিন্তু "এহ বাহ্য" বলিতেছিলেন, এই বারে বলিলেন "এহ হয়", রসিক পাঠক এই শব্দ পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য নিজের মনে অনুভব করিবেন। অতঃপর মহাপ্রভুর প্রশ্ন এবং রামানন্দের প্রত্যুত্তর এত গভীর যে, তাহা বুঝা এবং বুঝান উভয়ই সুকঠিন; তথাপি ক্ষীর সমুদ্রের তীরস্থিত ক্ষুদ্রপ্রাণ পিপীলিকার মতন সে রসের যতটুকু পারি তাহাই গ্রহণ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

সেকালের অদ্ভুত কাহিনী।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক খানি প্রসিদ্ধ বিলাতী মাসিক পত্রে মিঃ ফ্রেমলে ষ্টীল ক্রফ্‌ট (Mr. Framley Stelcroft) বহু পরিশ্রম সহকারে ইউরোপের নানা স্থানের পুস্তকাগার হইতে অতি প্রাচীন কালের পর্য্যটকগণের অত্যাশ্চর্য্য ও অমূল্য ভ্রমণ বিবরণ হইতে গবেষণার দ্বারা কতকগুলি অদ্ভুত বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক একটী কৌতূহলোদ্দীপক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমরা অদ্য এই প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকখানি চিত্র লইয়া তাহাদের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি পাঠক পাঠিকার নিকট তাহা অপ্রীতিকর বোধ হইবে না।

এই সকল চিত্রের বিষয় ও বর্ণনাগুলি এত অদ্ভুত যে, কোন সময়ে এই পৃথিবীতে উহাদের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। সংগ্রহকারক বলিয়াছেন, তিনি যে সকল পুস্তক হইতে ঐ গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি প্রথম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বিদ্বজ্জন মণ্ডলী কর্ত্তৃক উহাদের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছিল।

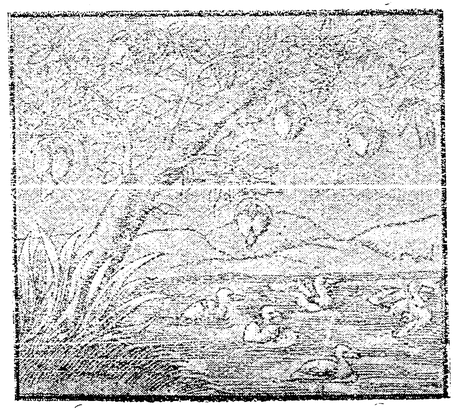

প্রথম চিত্রখানি "Munster's monumental Geography" নামক একখানি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত

ভূগোল হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রাচীন গ্রন্থ বিলাতের রয়েল সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। এই চিত্রে কোন নদী বা জলাশয়ের ধারে একটী বৃক্ষ রহিয়াছে; তাহার দুটী ফলের ভিতর হইতে যেন পক্ষীশাবকের ন্যায় কি বাহির হইতেছে মনে হয়। আর জলের উপরিভাগে কয়েকটী হংসশাবক যেন বিশেষ ব্যস্ততার সহিত সাঁতরিয়া যাইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র শাবকের আকার অবয়ব এবং ভাব ভঙ্গী দেখিয়া যেন মনে হয়, উহারা এইমাত্র পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের ফলের ভিতর হইতে পতিত হইয়াছে। এই বৃক্ষ ভূমণ্ডলের কোন্ অংশে জন্মগ্রহণ করিত প্রবন্ধ মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই।

জগতের যাবতীয় নবাবিষ্কৃত আশ্চর্য্য সামগ্রীর মধ্যে অধিকাংশই কোন না কোন ব্যক্তি বিশেষের ভ্রমণের ফলে মানবগোচরীভূত হইয়াছে। প্রবন্ধ মধ্যে আর একটী বৃক্ষের সচিত্র বর্ণনা আছে, তাহার নাম মেষোৎপাদক বৃক্ষ।

মধ্য এসিয়া ভ্রমণকালে কোন পরিব্রাজক টার্‌টারি প্রদেশে এই বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চিত্রখানিতে উহাই অঙ্কিত হইয়াছে। কোন রাজার হস্তে ঐ বৃক্ষের একটী ফল রহিয়াছে এবং উহার মধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র মেষশাবক বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছে। এই চিত্রের বামপার্শ্বে এক ব্যক্তি একটী বৃক্ষশাখা ধারণ করিয়াছেন, যে বৃক্ষ হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয় উহা তাহারাই একটী শাখা। লেখক মহোদয় এই চিত্রবর্ণিত বিষয়টী হিন্দুদিগের ইন্দ্রজাল অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক বলিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পুরাকালের বিস্তৃত মহারণ্যানী মধ্যে যেমন আশ্চর্য্য বৃক্ষাদির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ জীবরাজ্যেও অনেক আশ্চর্য্য প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে

পাওয়া যায়। তৃতীয় চিত্রখানিতে কয়েকটী অতি অদ্ভুত জাতীয় মানুষের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। এই ছবিখানি বড়ই ভীষণ, দেখিলে প্রথমেই অবিশ্বাসের সহিত প্রাণের ভিতর কৌতূহল ও ভয়ের সঞ্চার হয়। আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের কবিও রাক্ষসের বর্ণনায় এরূপ অবয়বের কল্পনা করিতে পারেন নাই, বা সুপ্রসিদ্ধ গলিভার সাহেব তাঁহার আজগুবি ভ্রমণ কাহিনীতেও এরূপ প্রাণীর কথা বলিতে পারেন নাই। এই চিত্রের বামপার্শ্বে চিত্রিত জীবটীর কেবল একটী মাত্র পদ এবং এই পদ এত বৃহদাকারের যে উহারা প্রয়োজন হইলে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া উহা ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন পূর্ব্বক বৃষ্টি-বারি, শীলা ও তুষারাদি হইতে নিজ দেহ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই জাতীয় নরনারী মাত্রেরই একটী করিয়া পদ। উহার ঠিক পার্শ্বের মূর্ত্তির কেবল মাত্র একটী চক্ষু, তাহাও কপালের ঠিক মধ্যভাগে বিরাজিত! তারপর একটী দুই আনন বিশিষ্ট বামনের ছবি। যাহা হউক এই যে তিনটী অদ্ভুত জীবের কথা বলা হইল, ইহাদিগকে মনুষ্য নামে অভিহিত করিলেও দক্ষিণ পার্শ্বের অত্যন্ত অদ্ভুতদৃশ্য প্রাণী দুটীকে মানুষ বলা যাইতে পারে কি না বিবেচ্য। যদ্যপি বনমানুষ এবং হনুমান মনুষ্যপদবাচ্য না হয়, তাহা হইলে, ইহারা কখনই মানুষ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। একটীকে যদি বা কেহ শৃগালমুখো

মানুষ বলেন, কিন্তু মস্তকহীন অপর জীবটীকে কি বলা উচিত জানি না। ইহার হস্ত পদ ঠিক মানুষের ন্যায়, কিন্তু মস্তক শূন্য মুখ, চোক, নাসিকা বক্ষঃস্থলে বিরাজিত। শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সেক্সপিয়রের ওথেলোতে এই আশ্চর্য্য জীবের উল্লেখ আছে। এক চক্ষু, দুই মস্তক এবং এক পদবিশিষ্ট মনুষ্য প্রকৃতির একরূপ কল্পনা করিয়া লইতে পারা যাইলেও মস্তকহীন জীবের কল্পনা করা সুকঠিন। লেখক বলেন, এই সকল অদ্ভুত জাতি সম্ভবতঃ আফ্রিকা দেশের কোন কোন স্থানে পূর্ব্বকালে দেখিতে পাওয়া যাইত।

পরবর্ত্তী চিত্রখানিতে আর একটী বিচিত্র জাতীয় দীর্ঘকর্ণ মনুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাদের কর্ণদ্বয় এরূপ দীর্ঘাকারের যে ইহারা শয়নকালে অন্য শয্যার ব্যবহার না করিয়া একটী কর্ণের উপর বিনা আয়াসে শয়ন করিয়া অপরটীর দ্বারা নিজদেহ আবৃত রাখিয়া শীতাতপ নিবারণ করিত। প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতবর্ষে এই জাতির অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

মধ্যযুগে আফ্রিকার এক প্রকার কুকুরমুখো মানুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে ইহারা এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, যদি কোন পর্য্যটক আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া ঐ জাতীয় মানুষ না দেখিয়া প্রত্যাগমনকরিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে লোকে বিদ্রূপ করিত। কথিত আছে, কোন সময়ে মহাবীর সেকেন্দর শার এক দল সৈন্য উক্ত জাতীয় কেবল একটী মাত্র প্রাণীর দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। ৫ম চিত্রে একটি কুকুর মুখো মানুষ এক গ্রীক বীরের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

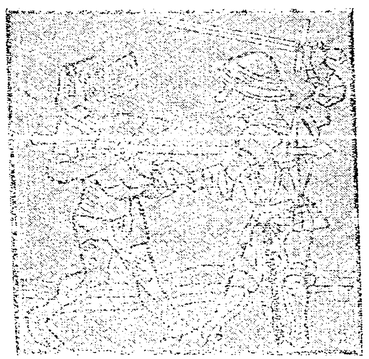

পূর্ব্বকালে যেমন পশুমুণ্ড বিশিষ্ট মানুষ জগতে বিরাজ করিত, ঐরূপ নরমুণ্ডবিশিষ্ট পশুর কথাও মিঃ ষ্টিলক্রফট তাঁহার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম আবিষ্কার হইবার অব্যবহিত পরেই যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, তাহার মধ্যে কোন একখানি পুস্তকে গ্রন্থকার তাঁহার রাক্ষস রাজ্যের ভয়াবহ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রখানি সেইগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। চিত্রিত জন্তুটীর মুখমণ্ডল কোনও গুম্ফ দাড়িযুক্ত মনুষ্যের মুখের মত হইলেও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনও লাঙ্গুলযুক্ত চতুষ্পদের ন্যায়। লেখক মহোদয় রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন, এই মুখখানিতে কোন খ্যাতনাম রাজনীতিক পুরুষের মুখের সাদৃশ্য আছে।

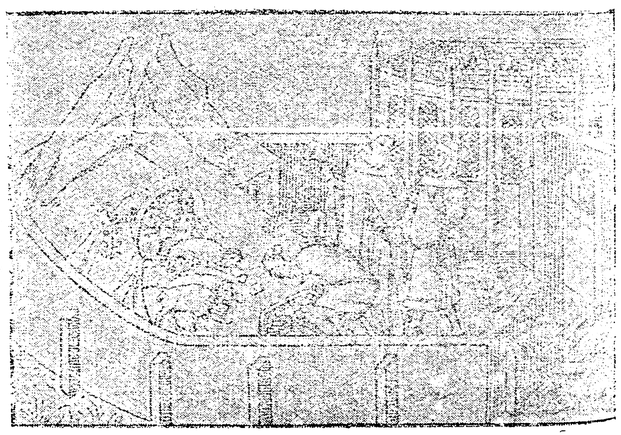

পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রখানিতে আরও কতিপয় নরমুণ্ড বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি চতুষ্পদের মূর্ত্তি আছে। অডেরিক্ (oderic) নামক এক উদাসীন সন্ন্যাসী চীনদেশে ভ্রমণ কালে কোন মঠে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে সেই মঠবাসী সন্ন্যাসীকে পাহাড়ের গহ্বর হইতে বহির্গত ছোট ছোট মনুষ্য-পশুগুলিকে আহার দিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই জীব গুলিকে পবিত্র মনুষ্য-পশু বলিয়াছিলেন।

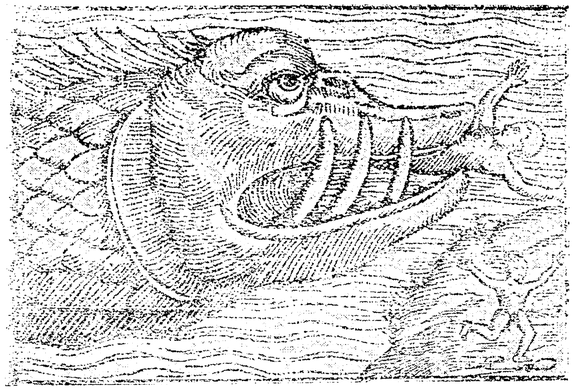

উল্লিখিত সন্ন্যাসী অডেরিক্ মধ্য এসিয়ায় ভ্রমণ কালে অকস্মাৎ কোন নির্জ্জন স্থানে পাতালের উপদেবতা বা দেহচ্যুত আত্মাদিগের যে আবাস স্থান নিজচক্ষে অবলোকন করিয়া ছিলেন, এই চিত্রখানির অঙ্কিত বিষয় তাহাই। বহুকাল পূর্ব্বে এই গুপ্ত স্থান হইতে অদ্ভুত শব্দ, অপার্থিব ক্রন্দনধ্বনি, এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের মর্ম্মস্পর্শী শব্দ প্রভৃতি সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থিত পথের পথিকবর্গের কর্ণগোচর হইত। এই কারণে কিম্বদন্তী ছিল যে, নিকটের কোন স্থানে পাপীদিগের দেহত্যাগান্তর পাপস্থালনের স্থান আছে। অডেরিক্ এই স্থান দর্শন করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার পর হইতে কাল্পনিক জনশ্রুতি সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে লাগিল।

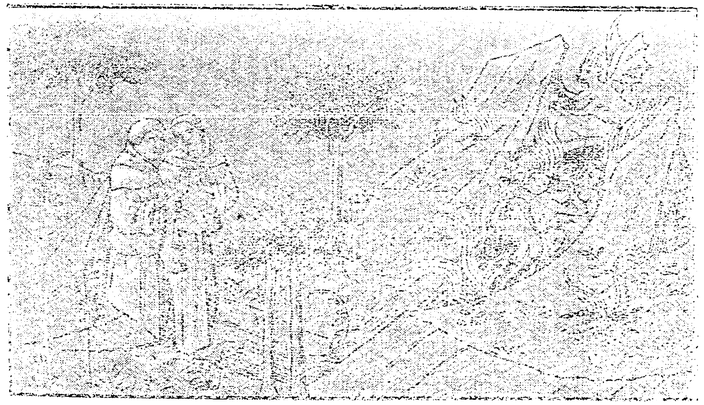

অতি প্রাচীনকালের মানচিত্রাদির চারিপার্শ্বে অনেক অদ্ভুত জীব জন্তুর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫০০ শতাব্দীতে ওলান্স ম্যাগনস (olans magnus) নামক এক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসী ভৌগলিক একখানি মানচিত্রের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎকায় সামুদ্রিক জন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই চিত্রের ভীষণ জন্তুটী পূর্ণ নরদেহ অক্লেশে উদরস্থ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

পুরাকালের কত শত ভীতিপ্রদ জীব জন্তুর বংশ যে একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। পৃথিবীর অতি পুরাতন ইতিহাস আলোচনা করিলে এমন অনেক আশ্চর্য্য জীব জন্তুর কথা জানিতে পারা যায়, যাহাদের জীবন কালে মনুষ্যের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানবজাতির বয়স অতি সামান্য। তাঁহারা ঐ সকল লুপ্ত জীবের কোন না কোন চিহ্ন দেখিয়া অনেক সময় অনুমান দ্বারা অবয়বাদি নির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্য জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জগৎ কিরূপ স্থান ছিল, তখন কোন্ ঋতুর প্রাবল্য অধিক ছিল, আর কোন্ কোন্ মহাকায় প্রাণীর ইহা ক্রীড়াভূমি ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যে সকল স্থান বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিগণিত, অধিক দিনের কথা নহে, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে উহাই অতি ভয়াবহ স্থান ছিল।

মুজিয়ম (muscum) সযত্নে রক্ষিত বৃহৎ অস্থি কঙ্কাল গুলিই তাহার প্রমাণ।

অধুনা বৎসরে কত ব্যক্তি প্রকৃতি দেবীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগবাসনায় ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্র, বিলাসীদিগের প্রিয়স্থান, সুইজারল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী আল্প পর্ব্বতে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এই পর্ব্বতের মধ্যে যে সকল পক্ষ বা নরমুণ্ড বিশিষ্ট ভয়ানক সর্পের (Dragon) আবাস ছিল তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। "Routes in the swiss Alps made in 1702-1" নামক একখানি পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা নিয় আল্প পর্ব্বতে যে ভীষণ দৃশ্য ড্রাগন দেখিয়াছিলেন এই চিত্র খানিতে তাহারই একখানি প্রতিচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অন্যান্য শত শত জন্তুর ন্যায় এই ভয়ঙ্কর জীবের অস্তিত্ব বোধ হয় একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

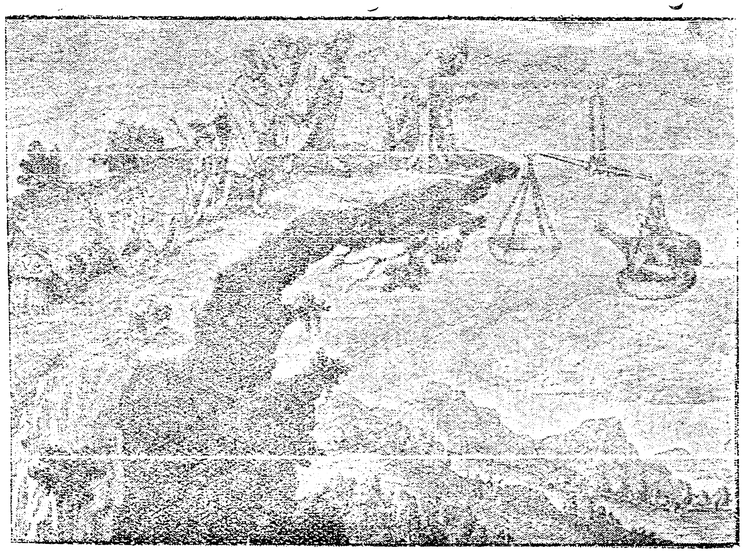

কালের নিয়ম, জগতের পরিবর্ত্তন সাধন করা। পূর্ব্বে যাহা ছিল এখন আর তাহা নাই, পূর্ব্বে যাহা সভ্যতা ছিল, এক্ষণে তাহা অসভ্যতায় পরিণত হইয়াছে, তখন যাহা অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এক্ষণে তাহা জলন্ত সত্য। তখনকার ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থাদিতে যেমন নানাবিধ, জীবজন্তু উদ্ভিদাদির বর্ণনা আছে, সেইরূপ তৎসময়ের অনেক অদ্ভুত প্রথা সকলেরও কোন কোন বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অপরাধী সন্দেহ করিয়া আসামীর অপরাধের কাহিনী বাহির করিবার জন্য অধুনা সময়ে সময়ে পুলিষের লোকেরা যেরূপ অমানুষী অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা মনে করিলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে জগতের কোন কোন অংশে উক্ত কার্য্যের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিত, তাহা অধিকতর রোমাঞ্চকারী। "De Boy's Travels" নামক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একখানি বহুমূল্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত সেই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার কৃতাপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার পাপ কাহিনী বাহির করিবার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করা হইত তাহার একখানি চিত্র আছে, নিম্নের ছবিখানি তাহার প্রতিলিপি। ইহা নিসদের সময়ের দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্থানের চিত্র, কোন স্পেন দেশীয় আবিষ্কারক ইহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন।

একে একে অনেকগুলি অদ্ভুত বিষয়ের কথা বলা হইল, এই বিচিত্র সংগ্রহ মধ্যে আরও কতকগুলি আশ্চর্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহাদের বিষয় বলিতে বিরত হইলাম।

শ্রীহরিহর শেঠ।

অভিভাবকতা।

আমি যখন ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলাম, সেই সময় শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তাৎকালিক জগন্নাথ স্কুলগৃহে "বাল্য বিবাহ নিবারিণী" সভার সূত্রপাত হয়। নবকান্ত বাবু ঐ সভার সভাপতি এবং আমি তাঁহার সহকারীরূপে বরিত হইয়াছিলাম। ঐ সভার একটীমাত্র অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং উহাই তাহার শেষ অধিবেশন ছিল। নবকান্ত বাবু কিয়ৎক্ষণ সভাতে থাকিয়া উঠিয়া গেলে পর আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করি। তখন একজন সভ্য এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, বালকদিগের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলে সেই আদেশ পালন করা বালকদিগের কর্ত্তব্য কিনা? কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর আমি সভাপতির আসন হইতে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, "যে কার্য্য অন্যায় বলিয়া ধারণা হইবে তাহা অভিভাবকের আদেশে করিতে বাধ্য হইবে না।" (স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর ছিল)।

যে শনিবারের অধিবেশনে আমি এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তাহার পর এক সপ্তাহের ভিতর ঢাকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ইহা প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, জগন্নাথ স্কুল গৃহে আমি এক নূতন সভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার নাম অভিভাবক নিবারিণী" সভা, এবং আমি ঐ সভার সভাপতি।

উপরোক্ত মতটি প্রকাশ করিবার সময় আমি যেমন অভিভাবকতা বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম, তেমন আবার ইহাও ভাবিবার অবসর পাই নাই যে, একটি বৃহৎ নগরীর ছাত্র মণ্ডলীর ভিতরে আমি এত সহজে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিব। আমি যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলাম, তাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য;—আমার সমকালে যাঁহারা ঢাকায় ছিলেন, তাঁহারা আমার খ্যাতি (বা অখ্যাতি) লাভের মূল ইতিহাস না জানিলেও আমার প্রসিদ্ধিলাভের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। এক্ষণে অভিভাবকতা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর হইয়াছে কিনা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার ছয় বৎসর পরে আমি ইংলণ্ড-প্রবাসে গমন করি এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করি। তথায় "'Littlego" নামক, আমাদের First artsএর অনুরূপ একটি পরীক্ষা দিতে হয়। "অনার" প্রার্থী ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। তাহাতে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন, Paley's Evidence of christianity তাহার অন্যতম, কিন্তু অখৃষ্টবিশ্বাসীদের জন্য তাহার পরিবর্ত্তে Logic বিষয়ে পরীক্ষা হইয়া থাকে। আমি অখৃষ্টবিশ্বাসী বলিয়া আমার প্রতি Logicএর ব্যবস্থা হইল। কিন্তু আমার কলেজে অপর কোন ছাত্র এ বিষয় না নেওয়াতে সে বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কোন ক্লাশ ছিল না।

আমি মনে করিয়াছিলাম অন্ততঃ একটী বিষয়ের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষকের অধীনতা হইতে নিস্তার পাওয়া গেল। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় জগৎ চলে না। আমার কলেজের 'টিউটর' মহাশয় আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "Logic শিক্ষার জন্য কোন ক্লাশ নাই; একারণ প্রতি শনিবার তোমাকে আসিয়া আমার কাছে দু ঘণ্টা করিয়া ঐ বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা দিতে হইবে!" কি সর্ব্বনাশ! কোথায় ক্লাশে পড়িতে যাইতে হইবে না বলিয়া আনন্দে নাচিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে কি না সাপ্তাহিক পরীক্ষা দিতে হইবে! আমি কত তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে Logic আমার বেশ জানা আছে, আমি অনায়াসে দুই মাস পর পরীক্ষা দিয়া পাশ হইতে পারিব। কিন্তু বৃথা বলা! তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন যে 'টিউটর' বলিতে 'অভিভাবক' বুঝায়। তাঁহার কর্ত্তব্য কেবল শিক্ষা দেওয়া নহে;—যাহাতে ছাত্রের কল্যাণ হয় তাহা চিন্তা করা, এবং ছাত্রকে কোন্ পথে চালাইতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করা তাঁহার কার্য্য। আমি কোন্ বিষয় কতখানি জানি এবং কিরূপ শিক্ষা আমার প্রয়োজন, সে সব ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি দায়ী। তিনি ইহাও আমাকে বুঝাইলেন যে, ক্লাশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 'শিক্ষক' নিযুক্ত আছেন; 'টিউটর' অর্থ 'শিক্ষক' নহে,—'টিউটর' বলিতে 'বেতনভোগী অভিভাবক' বুঝায়। আমার দৈনিক কার্য্যের হিসাব

রাখা, এবং আমি কোন দোকান হইতে জিনিস কিনিলে তাহার পর্য্যন্ত হিসাব নিকাশ করা 'টিউটরের' কার্য্য। (এই শেষোক্ত দায়িত্ব আমার সমকালেই কেম্ব্রিজ হইতে অনেকটা উঠিয়া যাইতেছিল। ইতি পূর্ব্বে দোকানের 'বিল' ছাত্রের বাড়ী না পাঠাইয়া 'টিউটরের' কাছে পাঠাইতে হইত।)

এইরূপ একটী দায়িত্বপূর্ণ বেতনভোগী টিউটরের বা অভিভাবকের হাতে পড়িয়া আমারও চক্ষু স্থির! তখন উপরোক্ত 'বাল্য বিবাহ নিবারিণী' সভার সভ্যের ন্যায় আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে "আমার যে কার্য্যে অনিচ্ছা জন্মাইবে তাহা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াও উক্ত 'বেতনভোগী অভিভাবকের' মতানুসারে আমি সেই কার্য্য করিতে বাধ্য কি না?" ভারতবর্ষে থাকিতে আজন্মকাল স্কুলকলেজে অর্থ দিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছি; কিন্তু ঘরের অর্থ দিয়া পরের অভিভাবকতার দায়িত্বে নিষ্পেষিত হওয়া এ আর্য্যসন্তানের পক্ষে কি অসহনীয় নহে? তখন আমার মনে হইল যে, কি কুক্ষণে আমি একটী সভা স্থলে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম যে নিজের ন্যায় বুদ্ধির অনভিমতে অভিভাবকের আদেশ পালনীয় নহে! এই সুদূর প্রবাসে আজ একজন বেতনভোগী অভিভাবক (যিনি আমার অমতে আমারই অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন,) আমাকে তাঁহার দায়িত্বের করালচক্রে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন!

আমার তখন Indian majority act জানা ছিল না, নতুবা টিউটর মহাশয়কে বলিতে পারিতাম যে, আমার অভিভাবকের অধীনতা স্বীকারের বয়স চলিয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত বশতঃ তাহা আর বলা হইল না; আমাকে নিজে কার্য্য দ্বারাই নিজের সগর্ব্বোক্তির প্রতিবাদ করিতে হইল। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, ইহা বয়সের ধর্ম্ম!

ইংরাজীতে একটা জনশ্রুতি আছে যে, দশ বৎসর বয়সে পুত্র মনে করে তাহার পিতা সর্ব্বজ্ঞ, যাহা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহারই উত্তর দিতে সক্ষম; পনর বৎসর বয়সে মনে করে তাহার পিতার জ্ঞান তাহার নিজের জ্ঞানাপেক্ষা অধিক নহে; বিশ বৎসর বয়সে মনে করে তাহার পিতা সেকালের লোক, বর্ত্তমানের উন্নত জ্ঞান বুদ্ধি তাঁহার আয়ত্ত নহে; অর্থাৎ এক কথায়, পিতা কিছু জানেন না; ত্রিশ বৎসর বয়সে মনে করে মাঝে মাঝে পিতার মত জানাতে কোন দোষ নাই, হাজার হউক পিতা পুত্রাপেক্ষা বেশী দিন পৃথিবীতে রহিয়াছেন, অতএব জগৎটা তাঁহার কিছু দেখা আছে; চল্লিশ বৎসর বয়সে মনে করে পিতার আর কিছু না থাকুক অভিজ্ঞতাটুকু যথেষ্ট আছে; পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মনে করে পিতার পরামর্শ নিয়া কাজ করাতে অনেক লাভ আছে; এবং ষাট বৎসর বয়সে মনে করে তাহার পিতার ন্যায় জ্ঞানী জগতে আর কেহ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ! এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহা অনেক পাঠকই আপন আপন জীবনের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

উপরোক্ত প্রবচনকে সত্য মানিয়া লইলে তদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় যে, মানুষের দশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে জ্ঞান বা অহঙ্কার জন্মাইতে আরম্ভ করে; এবং বিশ হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উপনীত হয়।

এই জ্ঞানান্ধতা বা অহঙ্কার বিদূরণ করিয়া মনুষ্যত্ব বিকশিত করা যাহার কার্য্য তাঁহাকে 'অভিভাবক' কহা যায়। যে প্রণালী দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকশিত করা হয় তাহাকে অভিভাবকতা কহে।

এস্থলে 'জ্ঞানান্ধতা' একটী নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইল। সাধারণ ভাষায় 'অজ্ঞানান্ধতা' শব্দেরই প্রচলন দেখা যায়, তাহার অর্থ জ্ঞানের অভাব জনিত অন্ধতা। কিন্তু আলোকের অভাবে যেমন চক্ষে দেখা যায় না, তেমন আবার অন্ধকার হইতে হঠাৎ প্রখর আলোকে আসিলেও ক্ষণিক অন্ধতা জন্মায়। জ্ঞানালোক সম্পর্কেও সেই কথা খাটে। জ্ঞানের অভাব জনিত অন্ধতাকে 'অজ্ঞানান্ধতা' বলা যায়। কিন্তু অজ্ঞান মানসে হঠাৎ জ্ঞানালোক ফুটিয়া উঠিলেও এক প্রকার গর্ব্বান্ধতা জন্মায়, তাহাকে এস্থলে 'জ্ঞানান্ধতা' বলা হইল। প্রখরালোক জনিত ক্ষণিক অন্ধতা আপনি সারিয়া যায়, প্রাকৃতিক নিয়মে চক্ষু আপনিই আলোক সহ্য হইয়া লয়, একারণ সেই অন্ধতা দূর করিবার জন্য কোন আয়াসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জ্ঞানালোক কোন প্রাকৃতিক নিয়মে আপনি আসে না; তাহা চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয়। একারণ জ্ঞানান্ধতা আপনি সারিতে পারে না, তাহার জন্য আয়াস প্রয়োজন হয়। নিজের অন্ধতা নিজে দূর করিতে পারা সহজ সাধ্য নহে;

তাহাতে আলোকবিভ্রম জন্মাইয়া উপছায়াকে সত্য বলিয়া ধারণা করাইতে পারে। এই হেতু জ্ঞানান্ধতা দূরকরিবার জন্য জ্ঞানীর সহায়তা প্রয়োজন। যাহার সাহায্যে জ্ঞানান্ধতা দূর করা যাইতে পারে, তিনিই 'অভিভাবক'।

অজ্ঞানান্ধতা দূর করিবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন, ও জ্ঞানান্ধতা দূর করিবার জন্য চালনা প্রয়োজন। যিনি অজ্ঞানন্ধতা দূর করিবার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'শিক্ষক' বলা যায়; এবং যিনি জ্ঞানান্ধতা দূর করিবার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'অভিভাবক' বলা যায়। শিক্ষকের কার্য্য, মনোবৃত্তি গুলিকে ফুটাইয়া দেওয়া; অভিভাবকের কার্য্য, সে গুলিকে কার্য্যে নিয়োজিত করা।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শিক্ষকতা এবং অভিভাবকতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যে স্থলে অভিভাবকতা বিদ্যমান নাই, সে স্থলে শিক্ষা সম্পূর্ণ অকার্য্যকারী প্রতিপন্ন হইবে। অভিভাবকতা না থাকিলে অর্থাৎ প্রদত্ত জ্ঞান সন্তানের জীবনে ও প্রত্যেক কার্য্যে ফুটাইতে না পারিলে, ঐ জ্ঞান ব্যর্থ হয়; তাহার ফল জ্ঞানান্ধতা অথবা অহঙ্কার ভিন্ন আর কিছু হয় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অভিভাবকতা একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। একারণ দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজে কেবল ইয়ুরোপীয় অথবা প্রাচীন আর্য্য মনীষীবর্গের চিন্তা সমুদ্ভূত গ্রন্থাবলীর এক একটা সজীব সংস্করণ মাত্র। বাস্তবিক তাহাদের ভিতরে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব। তাহাদের শিক্ষা তাহাদের জীবনে কি কার্য্য করিতেছে, তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষতা কি পরিমাণে সাধন করিতেছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন। ভারতে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজস্ব সচিব ফুলার সাহেব যখন জব্বলপুরের কমিশনর ছিলেন, তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত ভারতবাসীদের চরিত্রে তাহাদের বিলাতী শিক্ষা কি পরিমাণে কার্য্য করিতেছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলে যে আমাদের চরিত্রবিকাশে শিক্ষা কার্য্যকরী হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমি যতখানি বুঝি তাহাতে মনে হয় যে, ইহার একমাত্র কারণ,—অভিভাবকতার অভাব।

আমাদের দেশে নামতঃ অভিভাবক ঘরে ঘরে দেখা যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ অভিভাবক কয় জন আছেন জানি না; বালক দুবেলা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছে কিনা এবং নিয়মিত সময়ে আহার করিয়া স্কুলে গেল কিনা, এ সব দেখিলেই অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা হইল। তাহার উপর অর্থব্যয় করিতে পারিলে ঘরে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া প্রচুর কর্ত্তব্য সাধন করা হইল। কিন্তু বালকের শিক্ষার সহিত চরিত্রের সামঞ্জস্যসাধন কোথায় হইতেছে তাহা কেহই দেখিতে পান না। শিক্ষক আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত; কিন্তু স্বনামখ্যাত অভিভাবকের মনে বিশ্বাস বালকের চরিত্রের জন্য শিক্ষক দায়ী। শিক্ষকতা এবং অভিভাবকতার পার্থক্য কোথায় এবং চরিত্রের শিক্ষার ফল প্রকটিত করা কাহার কার্য্য,তাহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী বালকদিগের চরিত্র শোধনে কার্য্যকরী না হওয়ার প্রধান কারণ অভিভাবকদিগের ভিতরে অভিভাবকতার অভাব।

বালকদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান জ্ঞানান্ধতায় সমাচ্ছন্ন থাকে। একারণ তাহাদের উপর অভিভাবকতা নিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু অভিভাবকগণ অভিভাবকতা বিহীন হইলে উভয় পক্ষেই কর্ত্তব্যবোধ উপছায়াসমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বর্ত্তমান শিক্ষার চরিত্রহীনতা, যাহার জন্য আমি শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনে করি।

গত এপ্রিলের Twentieth centuryতে উপমন্যুর আখ্যান বিষয়ে লিখিতে গিয়া প্রবন্ধকার এক স্থলে বলিয়াছেন "In England, France and Germany students have to submit to school and college discipline for a certain number of hours, but for the rest of the day and night they are free &c..." অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মেনিতে ছাত্রগণ কেবল মাত্র দিবসের কয়েক ঘণ্টার জন্য স্কুল কিম্বা কলেজের শাসনাধীনে থাকে; কিন্তু দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ও রজনীতে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রবন্ধ-লেখক কখনও কোন Boarding school কিম্বা college দেখেন নাই। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল কলেজই Boarding college; তথায় কোন কলেজে, বোর্ডার ভিন্ন অন্য ছাত্র শিক্ষা পায় না। আমি সেইরূপ এক

কলেজে শিক্ষা পাইয়াছি। আমাকে-ডিনারের সময় নিয়মিত উপস্থিত না থাকিলে টিউটারের কাছে জবাব দিতে হইত; তিনজনের বেশী বন্ধুকে আমার ঘরে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে টিউটরের অনুমতি নিতে হইত; রাত্রি দশটার পর আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরের বাহিরে থাকিলে তাহার জন্য জরিমানা দিতে হইত; অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পর এবং রবিবার সমস্ত অহোরাত্র স্ব স্ব কলেজের নির্দ্দিষ্ট পোষাক না পরিয়া বাহিরে গেলে জরিমানা দিতে হইত; ঐ পোষাক পরিয়া চুরুট খাইলে জরিমানা দিতে হইত ইত্যাদি। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত প্রবন্ধকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতঃ ইউরোপীয় বোর্ডিং স্কুল ও কলেজে অভিভাবকতা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, একারণ আমাদের দেশীয় শিক্ষা হইতে বিলাতী শিক্ষার এত উৎকর্ষ।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'তবে বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদিগের মধ্যে, ফুলার সাহেবের মতন বিচক্ষণ ব্যক্তি শিক্ষা ও চরিত্রের সামঞ্জস্য দেখিতে পান না কেন?' তাহার একমাত্র উত্তর 'আমরা বিলাত গিয়া অভিভাবকতার বন্ধন হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে, এবং টিউটরের উপদেশে জীবন গঠন করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে একটা middlesome quantity মনে করিয়া তাঁহার শাসনকালে পতিত না হইবার জন্য, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকি।' আমরা বিদেশী বিজাতীয় বলিয়া টিউটরেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, ইহাই আমাদের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডে প্রত্যেক কলেজের ছাত্রেরা একত্রে 'ডিনার' করিতে বাধ্য। আমি একজন ভারতবাসী, আমি গিয়া টিউটরকে বলিলাম মহাশয়, আমি সকলকে ছুঁইয়া খাইব না,' কিম্বা 'আপনাদের খাদ্য আমার পোষায় না'। টিউটর মহাশয় আমাকে বিজাতীয় জানিয়া একত্র ভোজন হইতে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু ফল এই হইল যে, আমি ইউরোপীয় সামাজিকতার গণ্ডীর বাহিরে রহিয়া গেলাম। এই কারণে অনেক ভারতবাসী ইংলণ্ডে বহুদিন বাস করিয়াও ভাল ইংরাজি টুকু বলিতে শিখে না। এই কারণেই আমরা অনেকে বিলাত গিয়া বাঙ্গালা টুকু ভুলিয়া যাই, অথচ ইংরাজিটুকু শিখি না। এ সব বিষয়ে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা আমরা নিজেরাই নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করি। কখনও টিউটরের উপদেশ গ্রহণ করি না; এবং টিউটরও আমাদের রীতি নীতি না জানাতে আমাদিগকে চালাইতে পারেন না। এইরূপ অবস্থায় আমরা অভিভাবকতাবিহীন হইয়া বাস করিয়া থাকি।

বিলাত-প্রবাসীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া দেশীয় ছাত্রদিগকে দেখিতে গেলেও অভিভাবকতার নিদর্শন পাওয়া কঠিন। সমস্ত ভারতবর্ষ যুড়িয়া এই কলরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, আমাদের শিক্ষা প্রণালীর দোষে বালকগণ চরিত্রহীন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর কোন্ অঙ্গে দোষ লিপ্ত আছে তাহা কি কেহ বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন? আমাদের দেশে শিক্ষকতার অপর প্রত্যঙ্গ অভিভাবকতা কোথায়? শিক্ষক যদি আপন কর্ত্তব্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া অভিভাবকতার গণ্ডীতে পদার্পণ করেন, অমনি স্বনাম-খ্যাত স্বাভাবিক অভিভাবক বলিলেন 'ছেলেকে নষ্ট করিতেছে'। ছেলে শিক্ষকের কাছে শুনিল 'বাল্য বিবাহ দূষণীয়'। বাড়ীতে পিতা বলিলেন 'বাছা তোমাকে এবার বিবাহ করিতে হইবে।' ছেলে যদি পিতাকে বলে 'বাবা, বাল্যবিবাহ দূষণীয়', অমনি তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত নামক অবাধ্যতার মহৌষধি প্রয়োগ করা হইবে, ও সেই সঙ্গে শিক্ষকের অনধিকার চর্চ্চা করা অপরাধে মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হইবে। ছেলে যদি দুইদিক বজায় রেখে বলে 'বাবা, আমার এখন বিবাহে অনিচ্ছা' অমনি পিতা বলিলেন "বেটা, তোর চৌদ্দ পুরুষ বিবাহ করিতে পারিয়াছে, আর তুই পারিবি না? তোর আবার ইচ্ছা কি? আমি তোর অভিভাবক, আমার ইচ্ছাকেই তোর ইচ্ছা করিয়া লইতে হইবে।' এরূপ যে দেশে প্রতিদিন ঘটিতেছে, সে দেশে শিক্ষকতা ও অভিভাবকতার সীমা ঘটিতে পারে না, অথচ বালকগণ অভিভাবক বর্ত্তমানেও অভিভাবকতা প্রাপ্ত হয় না। এই দোষ শিক্ষা প্রণালীর নহে; ইহা সর্ব্বতোভাবে অভিভাবকদিগের দোষ।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, অন্য জাতির অভিভাবকেরা সকলেই কি কর্ত্তব্য পরায়ণ? তাহা নহে, তবে ইউরোপীয় দেশ সমূহে স্বাভাবিক অভিভাবক নিজে অভিভাবকতা করিতে না পারিলে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়া থাকেন। সেখানে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকতারও বন্দোবস্ত থাকে; একারণ আমাদের দেশের ন্যায় সে সব

দেশে শিক্ষা এত বিফল হয় না। আমাদের দেশে যেমন ঘরে অভিভাবকতা নাই, সেরূপ বোর্ডিং স্কুলও একেবারে নাই বলিলেই চলে। ইউরোপে প্রায় সর্ব্বত্রই বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত আছে।

চরিত্রের সামঞ্জস্যেই জাতীয় চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়। এই সামঞ্জস্য বোর্ডিং স্কুল ভিন্ন হইতে পারে না। এ কারণ বোর্ডিং স্কুলের অভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র জন্মাইতেছে না। মুসলমানদের ভিতরে যে কিঞ্চিৎ জাতীয় চরিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার বর্ত্তমান মূল আলিগড়ের কলেজ। যে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে সেইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর যতই সংস্কার হউক না কেন, আমাদের শিক্ষা চিরকাল চরিত্রবিহীন থাকিবে। ঘরে ঘরে অভিভাবকতা প্রচারের সময় ও উপায় নাই বলিয়াই এক্ষণে আমাদের দেশে বিলাতী Public schoolএর ছাঁচে গড়া বোর্ডিং স্কুলের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে এক্ষণে ভাল শিক্ষকের যত না অভাব, ভাল অভিভাবকের তাহাপেক্ষা শতগুণ অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

পাঠকগণের নিকট এক্ষণে এই বিচার প্রার্থনা করি যে, অভিভাবক নিবারিণী সভার প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের দেশে 'অভিভাবকতা সঞ্চারিণী' সভা প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে কি না? বয়স ধর্ম্মে সভার নাম পরিবর্ত্তন হইল মাত্র।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

হাস্য রসের রচনা।

১ম প্রবন্ধ।

১। 'হাসির গান। (Comic Songs) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।
২। ছাইভস্ম। (পরিহাস কবিতাদি) শ্রীরসময় লাহা প্রণীত।
৩। পিচুড়ী। শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত।
৪। Poems Grave and Gay, By Tom Hood
৫। Legends of Marth and Marvels. By Thomas Ingoldsby, Esq.
৬। An Evening with "Punch" (Selections from "punch" of the first fifty years 1841—1891)
৭। ভারত উদ্ধার। শ্রীরামদাস শর্ম্মণ বিরচিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন আমলে নিছক হাস্য রসের রচনা, পৃথক ভাবে লইয়া একমাত্র ইন্দ্রনাথ বাবু ভিন্ন সর্ব্ব প্রথম বোধ হয়, মিষ্টার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই উপস্থিত। ইঁহার পশ্চাতে বা সঙ্গে সঙ্গে আরও কেহ কেহও উপস্থিত। ইঁহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে, আমাদের 'ইঙ্গবঙ্গ' সাহিত্যের অভিব্যক্তির ঐ অভিনব অধ্যায়েই, ঠিক এরূপ রচনা না হউক, এই রসের রচনা অবশ্যই ছিল। ছিল না, কে বলিতে পারে? হাসি তামাসা, কষ্ট-নষ্ট নহিলে মানুষ কখন বাঁচে,—কতক্ষণ থাকিতে পারে? কাব্য কবিতা ও কোমল সাহিত্যের রচয়িতা মাত্রেই,—নূতন পুরাতন যে যুগেই, তাদের যিনি জন্মান, স্থল বিশেষে ও সময়-শিরে' রঙতামাসার তুফান তুলিতে, প্রায় কেহই কখনও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। 'রসিকতা বৃত্তিখানা' কিঞ্চিৎ রসাল ও রোসনিদার হইলে ত রক্ষাই নাই,—রঙতামাসার তুবড়ি চরকি-হাউই, ছুটিয়াই চলিয়াছে;—রস-সিন্ধুর উপর্য্যুপরি উত্তাল তরঙ্গে তুমি 'তোল পাড়'। পক্ষান্তরে, সে পদার্থটী কিনা রচকের রসিকতাটী, নীরস, রুক্ষ, রশ্মিহীন ও নেহাত ভোঁতা হইলেও, সেটীকে রগড়ারগড়ি করিয়া, ছানিয়া চটকাইয়া, ধুনিয়া ভানিয়া, নিঙড়াইয়া, দু' চারি বুদ্ 'রস'?—না হয় কস-ক্লেদ-কলতানি বা তরৎ কোনও তরল বা তরলাতরল সদৃশ বা বিসদৃশ বস্তু বাহির করিয়া, বাহাদুরী বাজারে ছাড়িয়া দেন। হাসি নিজে যেমন আসল ও 'জাল' নানা জাতীয়ই হয়, হাসি ফোটাইবার কিকির-ফন্দি, মন্ত্রতন্ত্র-যন্ত্র,—উপায়-উপাদান, ঔষধ ও মুষ্টিযোগ, ভিন্ন ভিন্ন ভেয়ানের ও রকম রকম ছাঁচের ছন্দের, কৌশলের ও "বকালের" হয়। উহা যেমন—এক দিকে সহজ স্বাভাবিক সঙ্গত, অতএব উপাদেয়ও ভোগ্য হয়; আবার তেমনি কৃত্রিম, ক্লিষ্ট, কষ্ট-কল্পিত, পিয়াদা মৌশিল দিয়া আনীত,—হরেক হেকমতেরও হইতে দেখা যায়,—হইয়া যাহা হয়, তাহা হয়ই। রস হউক বা না হউক, রস থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা চালোয়া চালিয়া দিবার ইচ্ছা; অন্তত উহা একটু ছিটাইবার সাধ প্রায় সকলেরই হয়। রসিকতার ভাণ্ডটী নেহাত শুষ্ক ও শূন্য হইলেও, চাই কি, সে ভাণ্ডটী একেবারে না থাকিলেও চাহিয়া চিন্তিয়া ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া, বা লুকাইয়া চোরাইয়া, কাহারও পুরাণ বা নূতন রসভাণ্ড হইতে পচা, সড়া, নোংরা বা আধ পচা বা অত্যন্ত তাজা,

তপ্ত, আনকোরা, যেমনই হউক,—সাবধানে গোপন-সম্ভাব্য বা হাতে-হাতে গ্রেপ্তারযোগ্যই হউক,—অল্প বিস্তর ঐ জলীয় জিনিসটা, ঢালিয়া, নিঙড়াইয়া ছাকিয়া লইয়া, "খোদ সরবরাহকার" বা "মুদ্দাফতি মারফতদার" স্বরূপ যে হিস্যা বা হিসাবেই হউক, যৎকিঞ্চিৎ "রসিক" হইবার বাসনা অনেকেরই মনে অল্প বিস্তর বলিষ্ঠ। হাসি আসে না, তবুও যেমন তোমাকে আমাকে খাতিরে পড়িয়া বা দায়ে ঠেকিয়া কত সময়ে, কত স্থলে 'কাষ্ঠ হাসি' হাসিতেই হয়, তেমনি কত লোকে ও লেখকে হাসাইতে পারেন না, তবুও তাহার প্রাণপণ তদ্বির করিতেও ছাড়েন না। ফলতঃ নিরসতাতেও রসোদ্গার এবং রসিকতার অত্যন্তাভাব সত্ত্বেও তাহার পুনঃ পুনঃ প্রচার, লোকের, বিশেষতঃ রসহীন রসরচয়িতাদের কেমন একটা রোগেরই মধ্যে। রসিকতা-রোগটা নিজে হাস্যোদ্দীপক বটে, কিন্তু রোগীর রোগ ভোগ দেখিয়া হাস্য করা নিষ্ঠুরতা।

হাল ও সাবেক সাহিত্যে, হাস্য-রস-রচয়িতা অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়। হাল সাহিত্যে বঙ্কিম বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া, হাত নাগাত নলীন্, পুলীন, অলীন্ বাবু অনেকেই পদ্য ও গদ্য ছন্দে হাস্য রস রচিয়াছেন। তাহা ভিন্ন, সাহিত্য-ক্ষেত্রের নাতিদূরে, নাট্য মঞ্চে হাস্য রসের হুড়াহুড়ি,—নিছক হাস্য রসের হাউই ছুটাইবার জন্যেই প্রহসন; হাল সাহিত্যে প্রহসন পণে-কাহনে জন্মিতেছে; "পাঞ্চ" পঞ্চানন্দও অপ্রচুর নয়।

রস-রচয়িতা মাত্রেই প্রায় হাস্য রসের "রচক"। এবং হাস্য রস অপরাপর রসের সহগামী। হাস্য সর্ব্বত্রই 'হাস্য' বটে, ক্রন্দন কোথায়ও নয়; কোথায়ও কোথায়ও উহা কার্য্যতঃ ক্রন্দন বা ক্রন্দনের কারণ হইলেও হাস্য নামটা নিশ্চয়ই কোন স্থলে হারায় না। তবে, যে সব স্থলে, হাস্য রস অপরাপর রসের অনুগামী ও সহগামী, সে সব স্থলে, উহাকে নিছক বা একক হাস্যরস না বলা যাইতে পারে। কাব্যে সাহিত্যে হাস্যরস; হাল সাবেক সকল সময়েই, অপরাপর রসের সহিত একত্রে অবস্থিত থাকা দেখা যায়। এক মাত্র নাট্য মঞ্চের প্রহসনকার ভিন্ন কোনও কবি স্বতন্ত্র ভাবে কেবল মাত্র এক হাস্যরসের পসরা লইয়া সাহিত্যের হাটে কদাচিৎ উপস্থিত হইতেন।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত যুগে, বিদূষকগণ হাস্য ভাণ্ড বহন করিতেন। নিছক হাস্য এবং নিন্দা এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা বিদূষকদের ব্যবসা ছিল। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে, বিশেষতঃ নাটকে প্রহসনেই, বিদূষকদের সঙ্গে দেখা হয়। কাব্য বা নাট্য প্রসঙ্গের যত কিছু হাস্য কৌতুক, নিন্দা কুৎসা ও ব্যঙ্গ তাহার প্রায় সবই প্রধানতঃ অভিব্যক্ত ও অভিনয় করেন বিদূষক। এ অধিকার এবং কার্য্য আর কাহারও নয়, কেবল মাত্র তাঁহারই। নাটককার কবি নিজে এই অধিকারের কার্য্য করা বা অপর কোনও নায়ক নায়িকা বা কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তি দ্বারা করান অনুপযোগী ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই যেন উহার জন্যে বিদূষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তৎকালের সামাজিক ব্যবহারের বিধি নিষেধে সম্ভবতঃ ঐরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

বিদূষকগণ, রাজসংসারে ও রাজসভায় থাকিতেন। রাজ সভার এক শ্রেণীর সদস্য মধ্যেই পরিগণিত ছিলেন। বিদূষক নহিলে রাজ দরবার কেবল বেমানান ও "বেমশগুল" নয়, অঙ্গহীন ও অপূর্ণই থাকিত। বিদূষকগণ রাজসভার অপরিহার্য্য উপাঙ্গস্বরূপ ছিলেন এবং সভায় ও সমাজে স্বপদ ও অধিকারোচিত অনুগ্রহ ও আদর প্রাপ্ত হইতেন। অধিকারাধীন কার্য্যে বিশেষত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিলে, যশস্বী হইয়া প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভও করিতেন। এতাদৃশ অবস্থায় সে কালে হাস্যরস উপজীবী ও বিদূষক-বৃত্তি-অবলম্বী বিশেষ এক শ্রেণীর লোক স্বতন্ত্র ভাবে উত্থিত হইবার অবসর পাইয়াছিল এবং চিত্তরঞ্জক সম্প্রদায়স্থ অপরাপর শ্রেণীর শিল্পী ও গুণীদের মত, স্বকীয় সাম্প্রদায়ীক ব্যবসায়ে ও স্ব স্ব করণীয় কার্য্যে গৌরব জ্ঞান করিয়া সমাজে বিচরণ করিত, এমন অনুমান করা অসঙ্গত না হইতে পারে। পরন্তু ইহাও খুব সম্ভব যে, লাভকর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-ক্ষেত্র পাওয়াতে রাজসভায় রাজানুগ্রহ ও উৎসাহ এবং সম্ভ্রান্ত জন সমাজে সমাদর ও সুখ্যাতি পাওয়াতে ঐ শ্রেণীতে উপযুক্ত লোক সকল আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং উহাদের হাস্যরসোদ্দীপক শক্তি ও তদানুষঙ্গিক কল্পনা, রচনা কৌশল ও বাকপটুতা প্রভৃতি ক্ষমতা সবিশেষ বিকাশ লাভ করিতে পারিয়াছিল।

বিদূষকগণ রাজ-বয়স্য, সঙ্গী ও মোশাহেব স্বরূপ রাজা, রাজবাড়ী ও উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ধনী লোকদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা ফিরিতেন। ও তাঁহাদের চিত্ত-রঞ্জন ও দরবারের

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত।

"দেশীবুদ্ধ" রচয়িতা
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ,।

গৌরব গরিমার বর্দ্ধন করিতেন। হাসি, তামাসা ও ঠাট্টা বিদ্রূপ উপলক্ষে অনেক সময়ে সকলকেই, এমন কি প্রতিপালক প্রভুকেও মুখের উপর কৌশলক্রমে, খুব 'উচিত কথা' ও অপরের অনুচ্চারণীয় ও অবাচ্য কথা শুনাইয়া দিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। রাজকীয় অনুগ্রহে তাঁহারা এইরূপ 'উচিত বলা'র ও শ্লেষ ও বিদ্রূপ করার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং সমাজও অবশ্য তাহা অনুমোদন করিয়াছিল। নহিলে এমন ব্যঙ্গ ও "বে-আদপি"র অধিকার বিদূষক ব্যতীত আর কাহারও তখন ছিল না। হইতে পারে, সে কাল অপেক্ষা একালে, সময় ও সভ্যতার উন্নতি ভেদে, রুচি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু, বিদূষকদের এই 'অধিকার' অপরাপর আরও অনেক ব্যাপারের ন্যায়, তখনকার রাজা, রাজবাড়া ও সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিগণের উদারতা ও সরলতার সবিশেষ পরিচায়ক বলিতে হইবে। একালে এটা কিন্তু, একবারেই উল্টাইয়া গিয়া বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনও রাজা মহারাজাদের 'মসনদের' চারিপার্শ্বে ও বড় লোকদের মজলিসে, বিদূষক গোছের মোসাহেব দেখা গিয়া থাকে। এখন মহারাজামোসায়েবী বা বাবু বিদূষকী সম্বন্ধ কিন্তু স্বতন্ত্র। এখনকার বিদূষক কেবল পরকুৎসাকারী নীচ প্রকৃতির নিন্দুক নয়, প্রভুর পুরা চাটুকর ও সাংঘাতিক জিঘাংসা পরায়ণ "চুকলখোর"। তথাচ এমন বলা যায় না যে, সে কালে হাস্য ভাণ্ড-ধারক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বাহক, রাজসভার অনুগ্রহ ও জনসমাজের আদর সত্ত্বেও, খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দরবারে যে কদরের কার্য্যকারী ও যে দ্রব্যের কারবারী ছিলেন গুণে জ্ঞানে যতই দক্ষ হউন, লোকে তাঁহাকে সেই দৃষ্টিতেই দেখিত। বিদূষকের আভিধানিক অর্থ নিন্দুক, হাস্য ভাণ্ডবাহী "ভাঁড়"। আমোদ উৎপাদন ও আনন্দ প্রদানই ছিল ইঁহাদের অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য ও একমাত্র কার্য্য। এবং আমোদানন্দ উৎপাদিত ও হাস্য তরঙ্গ প্রবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে যে প্রকৃতির ও যে পরিমাণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষাদি কল্পনা ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইত, কেবল তাহাই নানা কথার ও কার্য্যের নৈপুণ্যছলে এবং গদ্য পদ্যের কৌশলে, অতি সরল ও সরসভাবে প্রযুক্ত করিতেন। অতএব সে সব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যতই ব্যক্তিগত হউক, কিছুমাত্র কষ্টদায়ক মর্ম্ম বা চর্ম্ম বিদারক বা রূঢ়তাব্যঞ্জক হইত না;—অন্ততঃ তদ্রূপ ভাবে তাহা কেহ কখনও গ্রহণ করিত না। তাহা পরিহাসোদ্দীপক আমোদোৎপাদক ও আনন্দদায়ক, হইয়া সকলেরই উপভোগ্য হইত, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষয়ীভূত ব্যক্তি নিজে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ করিতেন। সে কালের সরল ও সরস অন্তঃকরণের সেই আমোদকর উপভোগ্য কোনও বাক্যাবলী, তৎকালে রাজা মহারাজাকে প্রয়োগ অযোগ্য না হইলেও, একালে কোনও সাধারণ নগণ্য লোকের প্রতি প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা অভিমানস্ফীতের মান-বিনাশক হইতে পারে ও পেনাল কোডের ধারা বিশেষের অভিযোগ যোগ্য ও দণ্ডণীয় হইয়া, তামাসাকারীকে কারাগার প্রেরণের কারণ হইয়া পড়ে। ইহার অবশ্য আর এক "পীঠ" আছে। সেটা পরে দেখান যাইবে।

সে কালের সাময়িক রীতি ও সামাজিক প্রথানুসারে, লোকের রুচি অবশ্য অন্যরূপ ছিল; তাহাকে আমরা এখন অমার্জ্জিত ও স্থূল রুচি,—চাই কি অশ্লীল উক্তি বলিতে পারি। তা, এটা কাল ও দেশভেদে ভিন্ন হইয়াই থাকে; সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই হইয়া চলিয়াছে। সে কালের প্রথানুরূপ রুচি অনুসারে ব্যক্তিগত বৈবাহিক ও পারিবারিক অতি নিকট বা দূর সম্পর্ক উপলক্ষ্য করিয়া, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও হাস্য পরিহাস বিলক্ষণই চলিত। হাস্যাধিকারে এরূপ বিদ্রূপের নিষেধ ছিল না, সম্পর্কের অধিকারানুসারে ইহার অবাধ প্রচলন ছিল। ব্যঙ্গব্যবসায়ী বিদূষক এ বিদ্রূপেও বঞ্চিত ছিল না। রাজকীয় প্রভুর বেহাই বেহান, শ্যালক শ্যালিকা শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতিকে বাকচাতুর্য্যে বিদ্ধ করিয়া হাস্য কৌতুক উৎপাদন করিতে ছাড়িতনা। বিদূষক আপনাকেও আপনি ছাড়িত না, স্বকার্য্য সাধনানুরোধে আপনাকেও অসংখ্য রকমের 'সঙ' সাজাইত।

বাঙ্গালীর খাস বাঙ্গালা আমলে ঐরূপ হাস্য কৌতুকের ভাণ্ড যাহাদের হাতে পড়িয়াছিল, তাহাদের নাম ছিল "ভাঁড়"। "ভাঁড়" বিদূষকেরই পরবর্ত্তী সংস্করণ ও বিদূষকেরই কার্য্য সম্পাদক ব্যক্তি ও নামান্তর মাত্র। বাঙ্গালা আমলে সংস্কৃত "বিদূষক" বিদায় লইয়া বাঙ্গালী "ভাঁড়" কে স্বপদে পদস্থ হইতে দিয়াছিল। কৃষ্ণনগর দরবারের ভাঁড়রাজ "গোপাল ভাঁড়" বাঙ্গলা মুলুকে

অমর হইয়া আছেন। প্রতি গৃহে ঐ নাম পরিচিত। প্রত্যেক বাঙ্গালী-কণ্ঠে গোপালভাঁড়ের নাম উচ্চারিত, সদরে অন্দরে অঙ্গনে উনুনের পীঠে তাহার" ভাঁড়ামির" গল্প আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি হইয়া হো হো হাসির ঢেউ উত্থিত অদ্যাবধি হইতেছে, হয়ত চিরকালই হইবে। খুব লোক-প্রিয় কোন বাঙ্গালী কবি,কীর্ত্তনিয়া বা যাত্রাওয়ালা, অতটা লোকময় কিনা সন্দেহ। গোপালের পরবর্ত্তী কালে মহা-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরগণের আমলে বহুপুরুষ পর্য্যন্ত ঐ পদ, হাস্যরসরসিক আরও বহুযোগ্য ব্যক্তি অধিকার করিয়া দরবার গুলজার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম অল্পাধিক পরিমাণে আজও লোকের মনে আছে। এখন আর "ভাঁড়ের" সেরূপ পদ ও অধি-কার দেশের কোথাও নাই, "ভাঁড়ামি" কথাটী সম্ভ্রম-করও নয়।

ভাঁড়দের কর্ত্তৃক হাস্যরসের কল্পনা ও রচনার কার্য্য বহুস্থলে সাহিত্যের সহিত সংযোগযোগ্য বা সঙ্কলন সম্ভাব্য হইলেও,সে কালে ভাঁড় সম্প্রদায় সাহিত্যাধিকারের বাহিরেই ছিলেন। একালে বরং তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের কর্ত্তৃক তৎকালে কৃত স্থায়ীরূপে রক্ষাযোগ্য কার্য্যকলাপকে সে অধিকারে গ্রহণ করা হইতেছে।

হাল সাহিত্যে, মৃত দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সময়ে 'হাস্যাবতার' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। অনাবিল, নির্দ্দোষ আমোদ আরাম দায়ক হাসির উৎস ছুটাইতে অমনটী আর দ্বিতীয় ছিল না; আজও এ ক্ষেত্রে দীনবন্ধু বোধ হয় অদ্বিতীয়ই রহিয়াছেন। সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবেন। যেমনটী যায়, তেমনটী আর হয় কি? সর্ব্বভূতে সমবেদনা যুক্ত, দয়া মমতার দুগ্ধ ধারায় উচ্ছলিত, অসূয়া-সংস্পর্শ-বিরহিত, ক্রোধহীন, নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে রোগে তাপেও সদা প্রফুল্ল, সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত, উদার মহৎ অন্তঃকরণের অমন উচ্চ, অবাধ, পূর্ণ ও প্রীতি-জ্যোতি-পুলকিত হাসি আর কোথায়! দীনবন্ধু বাবুর নাট্য প্রহসনে হাস্য রসের লহরী লীলা। কিন্তু, তাঁহার নিজের কৌতুকোদ্দিষ্ট স্বাভাবিক কথোপকথনে যেজীবন্ত হাস্যরস সশরীরে মূর্ত্তিমান হইত, তাহার তুলনায় তাঁহার নাটকে, প্রহসনে কাব্যে প্রকটিত হাস্য রস, মধুরোজ্জ্বল হইয়াও, প্রায় কিছু নয় বলা যাইতে পারে। কেবল রসের পরি-মাণ ও গৌরবগণনায় গুণীর গুণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, মিত্রজ মহাশয়কে হাস্য রসের কবি বলা বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না।

দীনবন্ধু-বঙ্কিম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের নাতি পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কাব্য কাণ্ডের সহিত হাস্য রসের ভাণ্ড, সহজাত শক্তির স্বত্বাধিকার সূত্রে কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছিল ও জিম্বা ছিল নিছক বাঙ্গালা সাহিত্যের শেষ বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের। গুপ্ত কবির সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রতিযোগী পাল্লাদার, সহযোগী জুড়িদার ও সাগরেদ শিক্ষানবিশ আরও ছিলেন অনেকে। গুপ্ত-গুড়গুড়ে-উদ্গারিত রসের—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শ্লেষাদি মূলক ও তদতিরিক্ত ও তদ্‌সম্প্রসারিত গৌরব-গালিগালাজের গুলজার-ঝঙ্কারিত হাস্যরসের উত্তাল তরঙ্গতুফানে,—তাহার 'ঘেরতা ফেরতা' পাল্‌টা দরপাল্‌টা প্রবাহের প্রখর প্রচণ্ড প্লাবনে ও উজান ভাটি উভদিক ব্যাপী আলোড়ন বিলোড়নে, কতকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুল্লুক বিপুল অনুরাগে ও বিপর্য্যয় বেগে এক বিরাট 'বাইচ' খেলার পাল্লা দিয়াছিল; এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের তরী সে বেগ ধারণ করিয়া, 'বান্‌চাল' না হইলেও কিরূপে বিপন্ন ও ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা এখন কেবল অনুমেয় এবং এ সময়ের কোনও কোনও দিক বিশেষের রসোদ্গারের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সহিত তুলনীয়। গুপ্ত গুড়গুড়ের অপকৃষ্ট ও অপভ্রংশ অংশ আজও বিদ্যমান আছে এবং বিগত কতক কাল হইতে বেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু, সেই অপকৃষ্ট অংশের সঙ্গেও যে সে কালের একটা সাবেক সরলতা ছিল তাহা আর এখন নাই। সে সরলতার স্থান এখন গরলতায় অধিকার করিয়াছে। তখন তাঁহাদের তাৎকালিক রুচি অনুরূপ ও জন সাধারণের উপভোগ উপযোগী রসের সৃষ্টি ও পুষ্টির অভিপ্রায়ে, এবং "কবি-যুদ্ধে" প্রতিযোগীর সহিত জয় পরাজয়ের জিদাজিদতে, আবশ্যকস্থলে শাস্ত্র ও শস্ত্র-কৌশলে, আদিরস সিঞ্চিত অল্পাধিক অশ্লীল উক্তি বা গা ঢাকা গালিগালাজের কাব্যগত ব্যবস্থা ও ব্যবহার করা হইত; তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল হো হো হাস্যের অবতারণা ও প্রতিযোগীর "কবি-শক্তির' অবমাননা এবং লাঞ্ছনা গঞ্জনা করা; তদ্ভিন্ন তদ্দ্বারা তাহার আর্থিক পারমার্থিক, বৈষয়িক, সাংসারিক ও সামাজিক সর্ব্ববিধ অনিষ্টের ও সর্ব্বনাশের কামনা ও

সাধনা করার অনুমাত্রও উদ্দেশ্য থাকিত না। তাহা তখনকার লিপি-যোদ্ধাদের স্বপ্নাতীত ছিল। এখন সেইটাই হইয়াছে সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। যে লোকের উপর লিপিজীবীর জাত-ক্রোধ ও যে সূত্রেই হউক কলহ বিবাদ, তাহা সে নিরস্ত্র হউক বা যাহাই হউক সে বেচারী ও তাহার অষ্টবিংশ পুরুষ লিপি আক্রমণ ও জঘন্য রচনা-রস-উদ্গারিত বিষাক্ত গালি বর্ষণের বিষয়ীভূত হয়। এবং লিপিকর, কুৎসা-কৌশলে তাহার সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন। সেকালে একালে, তফাৎ এই। আর তফাৎটা কি সাংঘাতিক, সাহিত্যের ও সমাজের কি ভয়ানক পীড়াদায়ক, তাহা কেবল অনুভবনীয় "লাইবেলের" ভাতি ও দণ্ডবিধির দুর্গতিতেও এই দুরন্ত রস-স্রাবের অবাধ স্রোতে বাধা দিতে পারিতেছে না। তা, কটা লোকেই বা তাহা করিয়া উঠিতে পারে ও করিতে গিয়া অগ্নিময় কটাহ হইতে অগ্নিকুণ্ডে পড়িতে চায়।

গুপ্ত কবির হাস্যরসের রচনায় তৎকালের লোক বড়ই প্রীতিলাভ করিতেন। আমরা বাল্যকালে, অনেককেই উহা অতি আগ্রহ ও আদরের সহিত আবৃত্তি করিতে শুনিতাম। এখনও কোন্ উহার আদর না আছে। গুপ্ত মহাশয়ের অনেক সাগরেদ্ জুটিয়াছিল। দত্ত অক্ষয় কুমার বাবু, বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু বাবু, রঙ্গলাল বাবু প্রভৃতি, পরে স্ব স্ব খোদিত পথে উদিত হইয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রথম উদ্যমে ইঁহারাও ঈশ্বর গুপ্তের ওস্তাদী স্কুলে অল্পাধিক সাগরেদী করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুতে ও রঙ্গলালে ঈশ্বরী-আভা দিব্য একটু ছিলও বটে।

ঈশ্বর গুপ্তের "জের" মদনমোহন তর্কালঙ্কার। "বাস-দাদা" য় সে কালের প্রাচীন ছাঁচের কাব্যের সর্ব্বশেষ আহুতি। মদনমোহন হইতেই পুরাতন প্রদীপ পূর্ণ নির্ব্বাণ; এবং মাইকেল দত্তের "মেঘনাদ" মহা আসরে নূতন ইঙ্গ-বঙ্গ—বিলাতি বাঙ্গালাগানের উৎপত্তি। সে বহুকালের কথা নয়;—প্রায় এই সে দিনকারই কথা। মধ্যে দুইটা দশ বৎসর পার হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যেই আমরা নূতনের পর নূতন,নূতনের নূতন, নেহাত আনকোরা নূতন-আসর, সুর ও ছন্দ দেখিতে পাইতেছি। একটাও যেন বাসী হইতে, পাকিতে ও টিকিতে পারিতেছে না। মাইকেলী সুর মারা গিয়াছে; হেমচন্দ্রী সুর হারিয়া গিয়াছে। কিছু কাল হইতে আর একটা সুর বা একটা ছোট সুরকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটা খাট খাট আনকোরা নূতন সুর ঘুর ঘুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ সুরটা বা সুর কয়টা কিন্তু নেহাত চুটকী সুর। ওস্তাদী আখড়াই, হাফ্ আখড়াই আসরের পর যেন খেমটাউলীদের খেমটার আসর;—আড় খেমটা, গড় খেমটা ও খেমটা এই তিন শ্রেণীতে ইহা বিভক্ত করিলে করা যাইতে পারে। নিছক ও খাটি খেমটার সুর একা ক'দিন টিকিবে বলা যায় না; টিকিলে বাঙ্গালী পুঙ্গবেরা নিশ্চয়ই নিশ্চিন্তপুরের নিকটস্থ হইয়াছেন. ইহাই ঠিক করিতে হইবে। কিন্তু বিলাতী বাঙ্গালা কাব্যের সুর কোনটাই টেকসই ও স্থায়ী হইতেছে না। ইহা দৃষ্টিবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। 'মঙ্গল কবিদের' উত্থিত খাঁটি বাঙ্গালীর খাঁটী বাঙ্গালা সুর মুকুন্দরাম হইতে আরম্ভ হইয়া মদনমোহন পর্য্যন্ত পুরাদমে পৌঁছিয়াছিল; এবং মাইকেলে ঠেকিয়া থামিয়াছিল। গণিয়া দেখুন এ গতি ও স্থিতি অল্পাধিক চারি শত বৎসর ব্যাপী। এটা কাহারও ঘরগড়া মতনয়; এটা সংঘটিত ঘটনা।

কিন্তু বিলাতী সুর মাইকেল দত্ত হইতে সুরু করিয়া হাত নাগাত এই মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত, মাত্র ত্রিশ বৎস-রের মধ্যে, গড়পড়তা গণ্ডা পারাইয়া, সোয়া গণ্ডার কোটায় পড়িয়াছে। যদি বল এটা উন্নতি তবে কাবেই নাচার; কারণ উপস্থিতপ্রসঙ্গে একথা তুলিয়া তর্ক করিবার অবসর নাই; পরেও বৃথা বিতণ্ডায় প্রবেশ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে যদি সাহিত্য পথের কোনও প্রকৃত ও সরল শান্ত পথিক শীতল চিত্তে, কোন দিন একথা উত্থাপন করা আবশ্যক মনে করেন, আমরা এ বিচারে তাঁহার সহিত সরলান্তঃকরণে যোগ দিয়া পরস্পরের চিন্তার আদান প্রদান করিতে পারি, এবং তাহাতে আমরা ভুল বুঝিয়া থাকিলে তাহা সংশোধন করিবার অবসর পাই। এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞা যে, পূর্ব্ব-পক্ষের প্রদত্ত ও অনুকূল যুক্তির অনুমাত্রও অপলাপ করিব না। যে হেতু, বিলাতি সুরের জিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের হিত হইলে, আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তোষ লাভ করিব।

সাবেক বাঙ্গালীর সাহিত্যাধিকারেও হাস্যরস প্রচুর ছিল; সঙ্গীতাধিকারে বরং বেশী বেশিই ছিল। কিন্তু

সর্ব্বত্রই প্রায় অপরাপর রসের সহিত একত্রে, অপরাপরের পরে, পশ্চাতে, মধ্যস্থলে বা বাহিরে বসবাস করিত। প্রায় কোথায়ও অপরের সঙ্গ-বিরহিত হইয়া, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে, হাস্য আপনার আস্য দেখাইতে অগ্রসর হইত না। বাঙ্গালীর বারইয়ারী তলায়ও না। তথায় সে আর যতই ঠেঠামি, নোংরামি ও নেংটামি দেখাক, এ পক্ষে আদপ কায়দাটী ছাড়িত না। হয় ত ল্যাংঠো হইয়া আসরে নামিত, অথবা আসরে নামিয়া নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ হইত; কিন্তু অপরের পরে পশ্চাতে নামিত; একা সর্ব্বস্ব হইয়া ও নিজের নিরবচ্ছিন্নতা মাত্র লইয়া আসর লইত না। আমরা আমাদের হাল সাহিত্যেই কিছু কাল হইতে "প্রহসনে" ও পঞ্চাননেই নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরস উৎপাদন আকাঙ্ক্ষী রচনা স্বতন্ত্র আধারে ও স্বাধীন আকারে দেখিতে পাইতেছি।

উপরি উল্লিখিত যে তিন খণ্ড নূতন ও চারিখণ্ড পুরাতন পুস্তিকা উপলক্ষ করিয়া, আমরা আজ এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা পরস্পরে অল্পাধিক পরিমাণে, নিছক হাস্যরস জননার্থী রচনা হইয়াও, কিন্তু অপর প্রকৃতির এবং অপর আকারাবয়ব ও অপর পরিচ্ছদের কেবল ইংরাজী "পাঞ্চ"টী ভিন্ন ইহাদের কোনটীই প্রহসন বা পঞ্চানন্দ নহে। এই হিসাবেই আমরা ইত্যগ্রে বলিয়াছি,—প্রহসন, পঞ্চানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী উদয় ও অস্তত্ব সত্ত্বেও বলিতে সাহসী হইয়াছি যে, আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বক্ষ্যমাণ প্রকৃতির ও পৃথক আকৃতির নিছক হাস্যরস রচনার প্রথম প্রবর্ত্তক ইন্দ্র নাথ বাবুর পরে বোধ হয়, মিষ্টার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

তবে ইহার মধ্যে আর একটু কথা আছে। এ ধরণের নিছক 'হাসির গান' ও নিরবচ্ছিন্ন হাস্য রসের কবিতা প্রথম প্রণয়ন করিয়া পৃথক ভাবে প্রকাশ করিলেও মিষ্টার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, একমাত্র কেবল হাস্য রসের কবি নহেন, তিনি অপরাপর রসেরও কবি, এবং এ সময়ের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর শক্তিমান কবি। অভিনব যুগের যতগুলি গুণবান্ ও গৌরবান্বিত কবি, এ মুহূর্ত্তে কাব্য রচনা করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা ইনি হীনপ্রভ নহেন, ইঁহার কবিত্ব-প্রভা বরং অধিকতর উজ্জ্বল। ইঁহার গীতি কবিতা কোমল ও মধুর হইয়াও নেহাত কামিনীজনোচিত কিঙ্কিণি কঙ্কণ ঝঙ্কার নয়, বা অলস আধ-ঘুমন্ত অসুস্থ চিত্তের অপুষ্ট, অস্ফুট রুগ্ন ভগ্ন ভাব-বিক্ষুব্ধ ও অহেতুক বিষণ্ণতা-ভাব গদ্ গদ্ অবোধ বিলাস কাকলী নয়। তাঁহার সহযোগী অপরাপর কবির গীতি কবিতা নিচয়, সংখ্যার হিসাবে, যেমন অসুখমারভাবে অনবরত ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র নির্গত হইতেছে, তাঁহার তেমন নয়; মিঃ রায়ের গীতি কবিতা সংখ্যায় তত বেশী হইবে না, কাহন কাহন ত নয়ই, গণ পুরিয়াছে কিনা সন্দেহ বোধ হয়, কয়েক ডজন মাত্র হইবে; তা সংখ্যা তাহার যতই কম হউক তাহা সহজ চিত্তের সবল উক্তি, বোধ ও শরীর যুক্ত, উহা কৃত্রিম শিল্প শোভা সমন্বিত। বিচিত্রবর্ণরাগ রঞ্জিত, নীরদ-নীলিমা-সংলগ্ন, বিমানে দোদুল্যমান দিব্য চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল, বাষ্পময় মুক্তামতির মালা নয়। সর্ব্বোপরি এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্প্রতি নাটক রচনায় অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা প্রকৃতই পুরুষোচিত প্রতিভার পরিচায়ক। এই অসামান্য স্বাভাবিক শক্তি, উচ্চতর শিক্ষার ও বিস্তৃত অধ্যয়নের সহিত সংযুক্ত; ইহা তাঁহার সবিশেষ সুবিধা ও সৌভাগ্য। হাস্য রসের রচনা তাঁহার কবিত্ব শক্তির অন্যতম বিকাশ মাত্র। তাঁহার গভীরতর ক্ষমতার তুলনায় এ অংশটা খুবই ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তথাচ একমাত্র হাল্কা হাসি দৃশ্যতঃ যত তুচ্ছ, কার্য্যতঃ তত নহে। উহা উৎপন্ন হওয়া, বিশেষতঃ উহা উৎপাদন করিতে পারা সর্ব্বথা সৌভাগ্য সাপেক্ষ। রায় মহাশয় সময়ে সময়ে যে হাস্যরস রচনা করিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি একত্রিত হইয়া এই 'হাসির গান' পুস্তিকা। এই হিসাবেই আমরা এ ক্ষেত্রে পৃথক্ ও একক ভাবে নিছক হাসির কথা বলিয়াছি।

আমাদের আলোচ্য অপর দুই নূতন কবিও কেবল হাসির কবি নহেন। ইঁহাদের উপস্থিত পুস্তকদ্বয় নিছক হাস্যরসের রচনায় পর্য্যবসিত বটে। কিন্তু ইঁহারা অপরাপর রসেরও কবি। শ্রীযুক্ত রসময় লাহার গাঢ় প্রকৃতির কবিতা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার এই হাসির পুস্তিকার শেষাংশে, তাহার পরিচয়ার্থে কতকগুলি প্রশংসা পত্র ছাপিয়া দিয়াছেন। 'পণ্ডিত শাস্ত্রী' 'সুকবি এম্ এ, সি এস্' 'বিখ্যাত লেখক হীরেন্দ্র দত্ত এম্ এ,' 'প্রতিষ্ঠাবান্ কবি রবীন্দ্র ঠাকুর' এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালা পত্রের অর্দ্ধ ডজন সম্পাদক ইঁহার সমূহ কবি-শক্তির সার্টিফিকেট দিয়াছেন। তাহা অবহেলা করিবার সাধ্য নাই। অতএব তাঁরা যে যেমনটি বলিয়াছেন, আমরাও ইহাকে তেমনটিই গ্রহণ করিয়াছি

পরন্তু শ্রীযুক্ত বেনোয়ারীলাল গোস্বামী নব্য তন্ত্রের কোনও কবি অপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন, ইহা আমরা মাসিকপত্র সকলের পাঠক স্বরূপ সম্যক রূপেই জ্ঞাত আছি। ইনি বহুদিন যাবৎ ভিন্ন ভিন্ন পত্রে কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন, অতএব ইনি অনেকেরই পরিচিত কবি। ইহার চিত্ত কবিজনোচিত,—রচনা সুন্দর ভাব ও ভাষায় সজ্জিত, মিষ্ট মোলায়েম, সরস।

মিঃ দ্বিজেন্দ্র রায়ের কথা এখনি বলিয়াছি। আরও একটা কথা বলা যাইতে পারে, যাহা ইঁহার নিজের ও ইঁহার স্বজাতি বাঙ্গালীর কিঞ্চিৎ গৌরবের কথা। মিঃ রায় ইংরেজী কবিতার রচনায় বিদেশীয় দুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে ক্ষমতা দেখিয়া উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ কবি স্বয়ং স্যর এডুইন আর্ণোল্ড বিস্মিত বিমুগ্ধ। এই বাঙ্গালীর লিখিত ইংরেজী কাব্য (Lyrics of Ind) পড়িয়া ঐ ইংরেজ কবি বিস্ময়সূচক প্রীতি প্রশংসা প্রকাশ করিয়া বলেন 'Astonishing undoubted poetical power বিস্ময়কর। সন্দেহবিরহিত সুনিশ্চিত কবিত্ব শক্তি।" পরন্তু, বিশিষ্ট বিলাতি পত্র 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিবিউ' এবং 'স্কচম্যান' এই বাঙ্গালীর ঐ ইংরেজী কবিতা পুস্তকের প্রভূত ও প্রকৃত প্রশংসা করিয়াছেন। শেষোক্ত পত্রের সমালোচক, রায় মহাশয়ের রচনায় ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ-দক্ষতার ও ইংরেজী-ছন্দ-ব্যবহার-নিপুণতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 'এই বাঙ্গালী ইংরেজী কবিতা প্রণয়নকল্পে জন্মকবি,—যথার্থই ইংরেজ কবি।"

প্রশংসা ইহার অধিক হইতে পারে না। এবং একটা অতি বিশিষ্ট ও পূর্ণমাত্রায় মার্জ্জিত এবং অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ও বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম বিদেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিয়া, এরূপ প্রশংসা উদ্দীপন করা জনৈক বিদেশীয়ের পক্ষে আদৌ দুর্লভ। প্রথমতঃ ইহা আদৌ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। বিদেশীয় ভাষায় এবং বিদেশীয় বিদ্যার অপরাপর বিভাগে শক্তিশালী ব্যক্তিগণ বহু শ্রম শিক্ষা অভ্যাস ও আয়াসে, কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন,—করিতেছেন বটে, কিন্তু বিদেশীয় কবিত্ব-কলা, কাব্যগত ভাব, ছন্দ ও সুর, সর্ব্বোপরি তাহার সহজাত স্বাভাবিকতা সম্যক্রূপে আয়ত্তাধীন করিয়া, সে ভাষায় কবিতা প্রণয়ন করা এবং তদ্দ্বারা সে দেশের সাহিত্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় কবি ও সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়া প্রীতি প্রশংসা আকর্ষণ করা বস্তুতই বিস্ময়কর। এ প্রকৃতির কৃতিত্ব কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এ দেশীয়গণ ইদানীং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে ও বহুবিধ বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইতেছেন; পক্ষান্তরে ইউরোপীয় আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এদেশীয় সাহিত্যে ও শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও দেশীয়দের গুরুস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কিন্তু কই তাঁহাদের কেহ ত কখনও এ দেশীয় কোন ভাষায় কবিতা লিখিতে বা লিখিয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। পরন্তু, আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যত বড় ইংরেজীনবিশ হউন বা থাকুন, কেহ কখনও ইংরেজী কবিতা প্রণয়নে প্রকৃত পক্ষে পারদর্শী হইতে পারেন নাই। ইংরেজী কবিতা রচনায় কৃতিত্বের কথা এক শুনা গিয়াছিল, —স্বল্পজীবী-কুমারী তরুদত্তের; আর শুনিতেছি এই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। ইহা বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকর; তথাপি বাঙ্গালীর বহুমুখী শক্তিরও সুদুর্লভ।

একমাত্র নিছক হাস্যরসের কারবার বোধ হয়, কেবল "ভাঁড়" সম্প্রদায়ই করিত। সেটা ব্যবসায়ী "বকুন" ভিন্ন বস্তুতই সম্ভবে না। নহিলে হাস্যরসের রচয়িতা মাত্রেই সাহিত্যের, সঙ্গীতের ও কবিতার গুরু ও গভীর অংশেরও রচয়িতা ও অভিনেতা। কবি, কথক, লেখক, গায়ক সকলেই।

সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে বা পাইবে কি না জানি না; এবং মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত না হউক, 'কমিক' গান এ দেশে একটুও নূতন নয়। সমাজের সাময়িক রঙ ও মনুষ্য স্বভাবের দোষ দুর্ব্বলতা ও বিসদৃশ-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান কৌতুকের বিষয়ীভূত করিয়া চিরকালই লেখক, বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন গায়ক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তথা তাহার বাহিরে অবস্থিত অপরাপর আমোদ অভিনেতাদের কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক হাসির গান রচিত ও গীত হইয়া আসিতেছে। সমাজে যখন যে স্রোত বিশেষরূপে বহে ও বেগমান হয়, তখনি তাহার কৌতুকাবহ 'কমিক' গান উঠে, এবং যে পর্য্যন্ত আর একটা স্রোত ছুটিয়া আবার নূতন কৌতুককর 'কমিক' গীতির সৃষ্টি না করে, সে পর্য্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে গীত হইতে থাকে। সমাজের উচ্চ স্তর হইতে ক্রমে নিম্ন নিম্নতর

স্তরে যাইয়া উহা গড়াইয়া পড়ে ও গীত হয়। পরন্তু, এ প্রকৃতির যে দুই চারিটা গান, অধিক মাত্রায় লোক-প্রিয় হয় ও জনসাধারণের অধিকাংশ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা টিকিয়াও যায়। আবার নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের নিজের নিজের রচিত রসানুরূপ হাসি-তামাসার গান উঠিয়া বহুল পরিমাণে গীত হয়; তাহা আর তত উপর স্তরের দিকে যায় না। ইতর শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের নিজস্ব হাসির গানের সংখ্যা কম নয়। "গাড়োয়ানী গান" নানা রকমেরই আছে।

মিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাস্যরসের যে গান রচিয়াছেন, তাহা অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি রসানুরূপ "বৈঠকি গান" এবং সুরে ছন্দে ভাবে ভাষায় ও বিষয়ে ঠিক এই মুহূর্ত্তের উপযোগী, তজ্জন্য তাহা উক্ত সমাজের আদৃত, উপাদেয় ও উপভোগ্যও হইয়াছে। মিঃ রায় তাঁহার গানের মধ্যে নিজের মৌলিক ও অনুকৃত গুণপণার একমাত্রা অভিনবত্ব দিয়াছেন, যাহা এরূপ গানে পূর্ব্বে ছিল না; আর তজ্জন্যই আমরা তাঁহাকে উহার প্রবর্ত্তক বলিয়াছি; নহিলে যে সকল বিষয় সাধারণতঃ অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার গান রচিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে অপরাপর রচয়িতার অন্য রকমের হাসির গান বিদ্যমান আছে। থিয়েটারে, যাত্রাদলে ও তাহার বাহিরেও আছে। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। পরন্তু মিঃ রায় তাঁর গানে যে একটু অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাও যে খুব একটা বেশী কিছু ইহাও বলা যায় না। দাস্যুরায় পাঁচালী-গানে ও মধুকান 'ঢপ' গানে নিজের নিজের বিশেষত্বের যে একটা অভিনবত্ব মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন ও যাহা চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, মিঃ রায়ের অভিনবত্বটুকু তদনুরূপ হইলেও তাহা অপেক্ষা কম।

কিছুকাল মাত্র পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরের বাবু সম্প্রদায়ে "রূপচাঁদ পক্ষী"র ভারি নাম ডাক ছিল। রূপচাঁদ পক্ষী গান বাঁধনদার ও বৈঠকি গায়ক ছিলেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের এই সব হাসির গান এখন যেমন বৈঠকে বৈঠকে ও মজলিসে মজলিসে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন "পক্ষী"র গান বাবুলোকের বৈঠকখানায় ও বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন সভায় এমনিই আদরের সহিত গীত হইত। "পক্ষীর দল" বলিয়া রূপচাঁদ পক্ষী প্রমুখ একটী দলও নাকি ছিল শুনিয়াছি। রূপচাঁদ হাসির গান অনেক রচিয়াছিলেন এবং তাহার পশার মিঃ রায়ের কমিক গানের অপেক্ষা তখন বরং বেশীই হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ রায় সমাজ সংক্রান্ত যে সব আধুনিক বিষয়ে গান বাঁধিয়াছেন, সে সব বিষয়েও রূপচাঁদ কত কমিক গান রচিয়াছিলেন। সে সব গানের এক আধটা এখনও এখানে ওখানে শুনা গিয়া থাকে। রূপচাঁদের সমসাময়িকই বোধ হয়, আর একজন বৈঠকি গানের বাঁধনদার ও গায়ক বর্দ্ধমান অঞ্চলে ছিলেন ও দেশ মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম "প্যারীমোহন কবিরত্ন"। ইনি লেখাপড়ায় রূপচাঁদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বোধ হয়, সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানও হয় ত তাঁহার ছিল। কবিরত্নের কবিতা ও গীত রচনা শক্তি সবিশেষ বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং রূপচাঁদ অপেক্ষা কম ছিল না; হয় ত কিছু বেশীই বা ছিল। এই শক্তিরই জন্য তিনি বর্দ্ধমান রাজদরবার হইতে "কবিরত্ন" উপাধি পাইয়াছিলেন। রূপচাঁদের ন্যায় প্যারীমোহনও অনেক কমিক গান রচিয়াছিলেন ও রাখিয়া গিয়াছেন। বড় ছোট, গভীর ও তুচ্ছ উপস্থিত মত বা সাময়িক হুজুগ অনুসারে যখন যেটা সম্মুখে পড়িত, তখনি তাহার গান বাঁধিয়া গায়িতে লাগিতেন। এই উভয় ব্যক্তিরই বিনা-সবিশেষ-চিন্তায় ও চেষ্টায় ও বিনা ক্লেশে, বলিতে বলিতে তখনি গান রচিবার ক্ষমতা ছিল ও রচনাও অতিশয় দ্রুত ছিল। ইঁহাদের হাসির গানের খুব আদর ও পশার হইলেও, কেবল মাত্র হাসির গানই বাঁধিতেন না ও গায়িতেন না। গুরু গম্ভীর বিষয়েও ইঁহাদের বিস্তর গান আছে। ঈশ্বরতত্ত্ব সৃষ্টি রহস্য, সংসার-বৈরাগ্য ও অদ্বৈতবাদাদি হইতে আলু, পটল, কইমাছ, কলাই দাল, ও বিলাতি চাল চলন, বাবুআনা, সাহেবীআনা ও স্বাধীন জেনানা কিছুই ইঁহাদের গানে বাদ পড়ে নাই। কিন্তু ইঁহাদের যে কয়টা গান আজও বাঁচিয়া আছে, অর্থাৎ লোকের মুখে সময়ে সময়ে গীত হইতে শুনা যায়, তাহাদের মধ্যে গভীর বিষয়ের গানই বেশী; এবং হাল্‌কা হাসির গান খুব কম। এবং সে "কম" ও বোধ হয়, আর কিছুকাল মধ্যে একেবারেই কিছু থাকিবে না।

প্যারীমোহনের "কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন? যে জন সৃজন লয় করে।" এই দীর্ঘায়াতন গানটী ও রূপচাঁদের 'চিরদিন কখন সমান না যায়' এই গানটী, ইহাদের

গুণাগুণ যাহাই হউক, খুব লোক-প্রিয় হইয়াছিল ও আজও ঐ দুই গান অনেকে গাহিয়া থাকে। কথিত আছে, একদা রূপচাঁদ পক্ষী ফরাশডাঙ্গায় এক মজলিশে তাঁহার "চিরদিন কখন সমান না যায়" গানটী গাহিতেছিলেন। গান সমাপ্তির পর সমবেত বাবুদের মধ্যে কয়েকটী হিন্দুস্থানী বাবু ঐ গানের অর্থ বা স্থূল তাৎপর্য্য জানিতে উৎসুক হওয়াতে, পক্ষী গায়ক তৎক্ষণাৎ উৎকৃষ্ট হিন্দিতে ঐগানের তাৎপর্য্যবোধক ও অর্থ ও বাক্যানুরূপ এক গান উপযুক্ত সুর সংযোগে যুগপৎ বাঁধিয়া ও গাহিয়া বাবুদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিলেন। গানটীর রচনা ও গাওনা বাজনা অনায়াসে একত্রেই হইল। সে গানটীর কয়েক চরণ এই;—

এসা দেখো ফিন্ রহেগা নেই।
যব যেসা, তব তেসা, ছোড় দিল্‌কা আশা,
দুনিয়া কে তামাসা দেখো ভাই।

* * *

দুনিয়াকি খেলা কভি বুরা ভালা,
কোভি ঘটা ঘোর কভি হোয় উজালা,
কভি হীরামতি কভি মিলে লালা,
কভি ঘাটতি হ্যায় বাড়তি নেই।
ছোড় নিরানন্দ করোজী আনন্দ,
ধ্যানসে ধরোজী সদা সদানন্দ
চন্দ রোঝকে বাস্তে দুনিয়াকে, এ ফন্দ দ্বন্দ্ব ধন্দ না রই।

কহে পঞ্চী রূপ নহোজী বিরূপ
ধ্যানমে ধরোজী প্রভুজীকি রূপ
অপরূপ রূপ ও রূপ স্বরূপ, এরূপ জগমে নেই।

কিন্তু রূপচাঁদের ও প্যারীমোহনের খুব লোক-প্রিয় 'কমিক' গানও, যাহা কতককাল খুব দাপটে চাপটে যথা তথা গীত হইয়াছিল, তাহাও এখন আর বড় শুনা যায় না। ফল কথা, সাধারণতঃ যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে হাসির কবিতা বা হাসির গান শীঘ্রই 'বাসি' হইয়া পড়ে। টাটকাতেই উহার তেজ। বাসি কৌতুক প্রায় বাসি কুসুমেরই মত ম্লান ও মলিন হইয়া আপনার আকর্ষণ হারায় ও বিস্মৃতির সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের কেহ কেহ একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও, অবহেলার অন্ধকার কোণে একটু স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া থাকে ও কখনও কালে ভদ্রে এক আধবার ব্যবহারে আসিয়া আপ্যায়িত হয়।

হাস্য-গীতি অপেক্ষা ক্রন্দন গীতি বরং বেশী দিন বাঁচিয়া থাকে; তাহাদের অনেকে চিরজীবীও হয়। ইংরেজী সাহিত্যের সুবিখ্যাত হাস্যের কবি "টম হুড" ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হুডের ছায়া, আমাদের এই মুহূর্ত্তের ইঙ্গবঙ্গ কাব্য সাহিত্যের কমিক কৌতুকে ও হাস্যরস রচনায় রচয়িতাগণের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ইদানীং নিপতিত হইয়া, তাহাতে অনুকৃতির এক আধমাত্রা অপূর্ব্বত্ব, অভিনবত্ব বা উজ্জ্বলত্ব প্রদান করিতেছে।—রসেটী বলেন—শেলী ও টেনিসনের মধ্যস্থিত অর্থাৎ ঐ দুই কবির কবিত্ব বিকাশের মধ্যবর্ত্তী কালে আবির্ভূত ইংরেজ কবিগণের মধ্যে টম হুড সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মধুর; পরন্তু, লয়েল ও এলাইজা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ হুডের কবিত্ব স্মৃতির সম্মানার্থে, কবি প্রদত্ত কবিজনোচিত উপহার,—উৎকৃষ্ট কবিতা গুচ্ছের কুসুম হার গাঁথিয়া স্বজাতীয় সাহিত্যের গলে দোলাইয়া দিয়াছেন। তথাচ হুডের কবিতা সম্বন্ধে, ইংরেজী সাহিত্যের ইংরেজ সমালোচকই বলিতেছেন;—

—'But it is doubtful whether the 'humourous fancies grafted on meloncholy impressions' which form the staple of his verse, have in them the staff of immortality.

হুড হাস্য রসের কবি বলিয়াই সাধারণ লোকে জানে। পরন্তু, হুডের রস রসিকতা বিষণ্ণতার মুদ্রাঙ্ক উপরে বিন্যস্তও বটে, তথাচ ঐ সমালোচক বলিতেছেন—হুডের হাস্য রস রচনায় অমরত্বের উপাদান আছে কিনা সন্দেহ। তা হউক। তবুও হুড এখনও খুব সজীব। কিন্তু, হাস্যের জন্য এই হাসির কবি হুড তত সজীব নহেন—যত সজীব তাঁহার ক্রন্দন কবিতার জন্য। হুডের হাসির ছোট ছোট কবিতা সেওয়ায় হাস্য রসের দুইটী দীর্ঘ রচনা আছে। একটীর নাম "বসন্ত-বিদ্যাধরী" এবং অপরটী "কুমারী কিলমানসেগ্ এবং তাঁহার পদপল্লবমুদারম্"। এ উভয়ই উত্তম। হাস্য রসাত্মক এ দুই দীর্ঘ কবিতা এবং কৌতুকপ্রদ আর কয়েকটী ক্ষুদ্র খণ্ড কবিতা আজও বেশ সজীব থাকিলেও ইহারা কদাচিৎ কবিকে জীবিত রাখিতে পারিত। ইহারা সকলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে হুডের প্রতি লোকের প্রীতি

প্রসন্নতার-পরোক্ষ উপাদান হইলেও, ইহারা কেহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ মুহূর্ত্তে, তাঁহাকে মলিনতা ও মৃতকল্পতা হইতে হয় ত রক্ষা করিতে পারিত না। টম হুড যে এখনও ইংরেজ জাতির মধ্যে সবিশেষ জীবিত ও জাগ্রত রহিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবেন, তাঁহার হাস্য রসের কবিতা আদৌ তাহার কারণ নয়, তাহার কারণ তৎকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী ক্রন্দনের কবিতা। হুডের সার্ট সঙ্গীত Song of the Shirt এবং "নিশ্বাস সেতু" the Bridge of Sighs করুন রসোদ্দীপক এই দুই সুপ্রসিদ্ধ কবিতা, ইংরেজ জাতির হৃদয়ে, রক্তে মাংসে মিশ্রিত হইয়া হুডকে নিরতিশয় লোক-প্রিয় ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই দুই কবিতাই অতি করুণ, কোমল ও মর্ম্মস্পর্শী। ইহাদের ক্রন্দন-শীলতার স্বাস্থ্যকর সমীরে, হুডের হাস্যরস যেন সংশোধিত হইয়া, লোকের অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায় যে, কবির একটী অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের কৃতিত্ব তাঁহার আর পাঁচটী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রচনার প্রতি লোকের নয়নাকর্ষণ করে।

রেবারেণ্ড আর্, এইচ্ বারহাম, ইংরেজী সাহিত্যের আর একটী হাস্য রস রচয়িতা কবি, বিখ্যাত ও যশস্বীও বটে। এই রেবারেণ্ড পাদরী রসিক "Thomas Ingoldsley Esq বিকল্পিত নামে "বেনামা" হইয়া, তাঁহার হাস্যরস লহরী প্রবাহিত করিয়াছিলেন। নব প্রকাশিত ইঁহার হাসির কবিতা কিছু কিছু পাঠ করিয়া,—এবং অধিকতর আদৃত টম হুডের কবিতার সহিত সংপ্রতি উহা একত্রে পাঠ করিয়া, আমাদের বিদেশীয় চিত্তে যেরূপ ধারণা হইল, তাহাতে হাস্য রসোদ্দীপনে এই পাদরী সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ হুড অপেক্ষা একটুও কমও ছিলেন না, উহার কোনও কোনও অংশে বরং বেশীই ছিলেন বলিয়া বোধ হইল। ডাক্তার গার্নেটেরও দেখিতেছি এইরূপ অভিমত। প্রগাঢ় সাহিত্য তত্ত্বদর্শী ও এ সময়ের প্রবীণ সমালোচক ঐ ডাক্তার সাহেবের বিবেচনায়, হাসির কবিতা রচনায়, সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে একমাত্র হুড ভিন্ন, আর কেহই, পাদরী বারহামের মত নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। পরন্তু, হাস্য রসের আখ্যান কবিতার রচনায়, অধিকতর ক্ষমতা ও ওস্তাদী হাত দেখাইয়া বারহাম, হুডকে খুব বেশী "রকমই হারাইয়া দিয়াছেন।" ডাক্তার গার্নেটের মত বিশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণই অবশ্য এরূপ বিষয়ে এমন নির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিতে সমর্থ। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নিগূঢ় স্বরূপ-গত সূক্ষ্ম চাতুর্য্যে অনভিজ্ঞ ও অনভ্যস্থ এবং তাহাদের সুবিচারে অক্ষম হইয়াও, বিদেশীর বিদেশীর কর্ণেও যেরূপ শুনায় ও যৎসামান্য জ্ঞানে যেমন অনুভব হয়, তাহাতেও আমরা দেখিতেছি যে, বারহামের কবিতাবলীর ছন্দ, যতি, মিলন ও সুর সলিলস্রোতবৎ সর্ব্বত্রই এমন সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও মিষ্ট মোলায়েম ভাবে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা হাস্য রসেরই স্বাভাবিক ও সম্যক উপযোগী এবং অল্পাধিক 'কটমট' ইংরেজী ভাষায় নেহাত সাধারণ নয়। যথা স্থানে, আবশ্যকানুসারে আমরা ইহার দুই চারি চরণ উদ্ধৃত করিলেও করিতে পারি। কিন্তু ইংরেজী কবিতা উদ্ধৃত করিবার অবসর ও উপযোগিতা আমাদের খুব কমই আছে; নহিলে হাস্য রসের যতগুলি রচনা সংপ্রতি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে, বারহামের এই বই হইতেই বেশী মাত্রায় উদ্ধৃত করিবার অবকাশ বিদ্যমান বটে।

কিন্তু, এস্থলেও সেই কথা, হাসির কবিতা বা হাস্যরস বাসি হইলেই 'বিগড়ে' যায়। ইংরেজী মতও তাই। ইংরেজ এ রসকে 'স্যাম্পান' মদিরার সঙ্গে তুলিত করিয়া বলেন Humourous poetry like champagne, gets flat soon after it has been drawn তবুও ইংরেজী অনুকৃত আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে, বিদেশীর বিপণির অন্যান্য বস্তুর ন্যায়, বিলাতি 'বাসি' হাস্য রসের অস্বাভাবিক বিকৃত বাষ্প রাশি, জোর বাতাসে আসিয়া যে পৌঁছিতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, গোপন করিয়াও লাভ নাই। উপস্থিত আলোচনা প্রসঙ্গে, অগত্যাই এই বায়বিয় ক্রিয়াটিরও গতি-ক্রম কিয়ৎপরিমাণে অধ্যয়ন ও প্রদর্শন করা আবশ্যক হইবে, এ কারণেও ইংরেজী সাহিত্যের ঐ অঙ্গ বিশেষকে প্রবন্ধের অন্তর্গত করিতে হইয়াছে।

টমহুডের হাস্যের ন্যায়, রেবারেণ্ড বারহামের অনেকানেক হাস্য, এখন ঔদাস্যের বিষয়ীভূত হইয়া আস্ত ডাকিয়াছে। বারহাম নিজে খৃষ্ট ধর্ম্ম যাজক পাদরী পুরোহিত হইয়াও, ঐ ধর্ম্মের কোনও কোন শাখা প্রশাখা সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপের এমন সাংঘাতিক শক্তিশেল

হানিয়াছিলেন যে, হাস্য লহরীর অজস্র রসোচ্ছ্বাসেও তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনার লাঘব হয় নাই; বেদনা তাহাতে বরং আরও বেশী বাড়াইয়াই দিয়াছে। বহু লোকের এই বেদনা ও অন্তর্যাতনা হেতু এবং কৌতুক কবিতার বিষয়ীভূত তাহাদের সমসাময়িক প্রসঙ্গাদির অন্তর্দ্ধান ও অল্পাধিক অবোধ্যতা হেতুও বারহামের বহু কবিতা এখন বিলুপ্ত বা বিস্মৃত হইয়াছে। তথাচ তাঁহার Jackdaw of Rheims নামক বিষম বিদ্রূপাত্মক কৌতুক কবিতা, সাহেব বিবিদের মধ্যে অনেকেরই নাকি আজও কণ্ঠস্থ, এবং খুবই আগ্রহ আহ্লাদ সহকারে তাঁহারা ইহার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই কবিতায়, এক দাঁড়কাককে ক্যাথলিক কার্ডিনালের আসনে বসাইয়া, সুতীক্ষ্ণ শ্লেষে, কার্ডিনাল ও তদীয় সম্প্রদায়ের বিলক্ষণ দুর্গতি করা হইয়াছে। প্রথমতঃ দাঁড়কাকের দৌরাত্ম্য, কার্ডিনালের ক্রোধ, উভয়ের বিষম বিরোধ, কার্ডিনাল কর্ত্তৃক কাকের অষ্ট পৃষ্ঠে অভিসম্পাৎ, ক্রমে কাকের নীরব "কন্‌ফেসন" বা পাপাঙ্গীকার, কাকে কার্ডিনালে মহামিলন, উপসংহারে দাঁড় কাকের দেবত্ব-প্রাপ্তি বা "সেণ্ট" হইয়া স্বর্গে গমন। এক কথায় রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সকলকে শ্লেষও ব্যঙ্গ করিয়া এই কৌতুকোদ্দীপক কবিতা। বারহামের প্রায় সব কবিতাতেই এই সম্প্রদায়ের উপর শ্লেষ ও ধর্ম্ম যাজকগণের বিলাস ব্যভিচারাদির ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দেখা যাইতেছে ও তাহাতে সবিশেষ শক্তিবত্তার পরিচয় আছে।

আলোক-বার্ত্তা

বা

তারবিহীন টেলিফোন্।

তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি যে বার্ত্তা প্রেরণের অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংবাদ এখনও আমাদের দেশের অনেকের অগোচর রহিয়াছে। মার্কনি বা আচার্য্য বসুর উদ্ভাবিত তারবিহীন তাড়িত-বার্ত্তায় যেরূপ বৈদ্যুতিক কম্পন তারের সাহায্য ব্যতিরেকেই দূর দূরান্তে প্রেরিত হইতে পারে, তেমনি এই নবাবিষ্কৃত আলোকবার্ত্তা বিনাতারে কেবল মাত্র এক আলোকরেখার মধ্য দিয়া বার্ত্তা প্রেরণে সক্ষম হইয়াছে। অধিকন্তু আলোক-বার্ত্তা তাড়িতবার্ত্তা অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে অধিকারী।

এই অদ্ভুত আবিষ্কার দ্বারা সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুই ব্যক্তি বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও পরস্পরের কণ্ঠস্বরে বিনা তার সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইবে। সকলেই জানেন, তাড়িত-বার্ত্তা বা টেলিগ্রাফে নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন বা সঙ্কেত দ্বারা বাক্য রচনা করিতে হয়, তাহা সকলের আয়ত্ত নহে; কিন্তু আলোক-বার্ত্তা দ্বারা কথিত বাক্য সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্যরূপে প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং সঙ্কেতেও প্রেরণ করা কষ্টকর নহে, অতএব ইহা একরূপ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অধিকন্তু, তারহীন তাড়িত-বার্ত্তা নভোমণ্ডলের অনুকূল অবস্থার উপর নিতান্ত নির্ভরশীল এবং ইহার প্রেরণ অনেক সময় দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে; কিন্তু আলোকবার্ত্তায় ইচ্ছা মাত্রই সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে, এবং প্রেরণ-স্থানে কথা কহিবা মাত্র গ্রহণ-স্থানে শ্রুত হইয়া থাকে; বায়ুমণ্ডলের কোন অবস্থার উপরই নির্ভর করে না।

ঊনবিংশ শতাব্দী বৈজ্ঞানিক-যুগ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, একের পশ্চাতে অন্য, অন্যের পশ্চাতে আর আবিষ্কার জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতেছে। কিন্তু এই সকল আবিষ্কার এত জটিল যে, অনেক সময় সর্ব্ব-গ্রাহ্য হয় না; এই জটিল আবিষ্কারের দিনে আলোকবার্ত্তা একটি অতি সরল ও সহজ-বোধ্য আবিষ্কার। এই যন্ত্রের নাম Radiophone বা রশ্মি-বার্ত্তা; নাম দ্বারাই বোঝা যাইতেছে যে, একটি

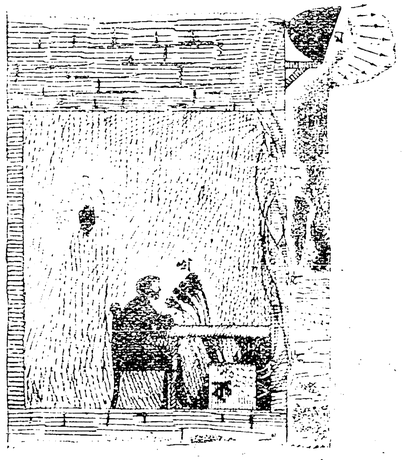

আলোক রশ্মির মধ্য দিয়া বার্ত্তা প্রেরণের উপায় বিশেষ। আমরা যে চিত্র দিয়াছি, তাহাতে প্রেরণস্থান একটি বাতিঘর (Light-house) এবং গ্রহণস্থান একটি জাহাজ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বাতিঘরে একটি শব্দ-পরীক্ষিত (Sound-Proof) টেলিফোন বাক্স (ক) আছে, বাক্সের টেবিলের উপর একটি শব্দ প্রেরকের স্থানে চারিটি শব্দপ্রেরক খ (Transmitters) আছে, এবং তাহা হইতে চারি জোড়া তার গ গ গ গ, একটি নিয়ামক যন্ত্রের (Resistance box and reguiator) মধ্য দিয়া বাতিঘরের 'সন্ধানালোকের' (Search-light, যাহা দ্বারা দুর সমুদ্রে জাহাজ প্রভৃতির স্থিতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই আলোকের) পশ্চাৎভাগে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। প্রেরণ-স্থানে যন্ত্রের আবশ্যক এই পর্য্যন্ত।

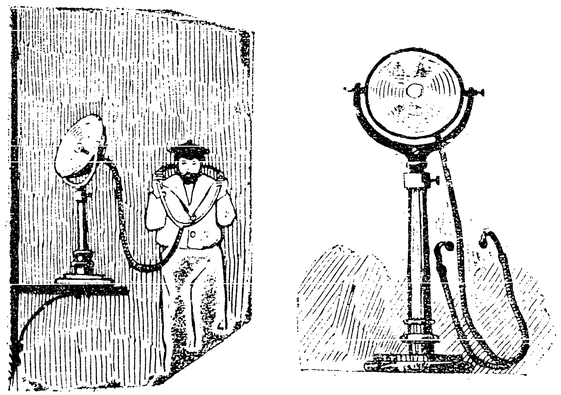

এক্ষণে দেখা যাউক, গ্রহণ-স্থানে কি কি আবশ্যক। গ্রাহক টেলিফোন বাক্সর স্থানে কেবল মাত্র একটি গোলাকার কটাহ মধ্য (concave) দর্পণ (mirror) তাহার মধ্য স্থলে তাপমান যন্ত্রের (Thermometer) নিম্ন গোলকের (bulb) মত একটি কাচগোলক অঙ্গার চূর্ণ (carbonised filament) পূর্ণ হইয়া সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তাহার অপরাংশ পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া একটা শ্রবণ নলের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। শ্রবণ নলের আকার অবিকল phonograph যন্ত্রের নলের ন্যায়।

মনে করা যাক, দুই মাইল দূরবর্ত্তী একখানি জাহাজের কাপ্তেনকে সংবাদ দিতে হইবে। বাতিঘরের সন্ধানালোক (Search light) ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জাহাজের উপর ফেলা হইল, কাপ্তেন বুঝিলেন তাঁহাকে কিছু বলা হইবে, তিনি নল কাণে দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আলোক আসিয়া দর্পণের উপর পড়িল, বাতিঘর-রক্ষক উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিতে লাগিলেন, কাপ্তেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিলেন; জাহাজের গতি বা আন্দোলনে কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। এক্ষণে আলোক বহুদূরে প্রেরণের পারকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু সকলেই জানেন যুদ্ধক্ষেত্রে Heleographic principle দ্বারা আলোক সঙ্কেত বহু দূরব্যাপী হইয়া থাকে, অতএব সে বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই।

এই সত্যের আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত Hammond V. Hays of Boston Mass. স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহাই অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আলোকবার্ত্তার (radiophone) প্রধান তত্ত্ব এই যে, আলোক রশ্মিদ্বারা গ্রাহক-যন্ত্রে (Receiving mirror) নানা প্রকার তাপ কম্পন (varied heat-waves) প্রেরণ করা যাইতে পারে। কাচগোলকে (bulb) আলোক-রশ্মি পাত হইলে অঙ্গার চূর্ণ সকল আলোকের তাপ আত্মসাৎ করে, এবং তদ্দ্বারা তন্মধ্যস্থ বায়ু প্রসারণ সংঘটিত হয়। প্রেরক যন্ত্রে উচ্চকণ্ঠে কথা বলিলে আলোকের গতিতে প্রত্যেক শব্দ বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা উৎপাদন করিয়া তাপের তারতম্য করিয়া দেয়; তদ্ধেতু গোলকের অন্তঃস্থ বায়ুর প্রসারণও ইতস্ততঃ হইয়া যায়, এজন্য প্রত্যেক শব্দ যথাযথরূপে কর্ণে প্রবেশ করে।

তারহীন তাড়িত বার্ত্তা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন তাহার সংবাদ ইচ্ছামত স্থানে প্রেরণ করা যাইত না, যে যে স্থানে গ্রাহক-কল (receiver) থাকিত, সকলেই সে সংবাদ জানিতে পারিত; কোন গুপ্তকথা প্রেরণের উপায় ছিল না। এক্ষণে এ দোষের সংশোধন হইয়াছে। আলোকবার্ত্তায় কিন্তু পূর্ব্বাপর হইতেই যথেচ্ছা সংবাদ প্রেরণ কষ্টকর নহে। আলোক-বার্ত্তার আর একটি সুবিধা ব্যয়-সংক্ষেপে; টেলিগ্রাফের ব্যয়ের সহিত ইহার ব্যয় তুলিত হইলে নগণ্য বলিয়া মনে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে টেলিগ্রাফির তার কাটার যে হাঙ্গামা, আলোকবার্ত্তা ও তারহীন টেলিগ্রাফি তাহার অনেক নিরাকরণ করিবে সন্দেহ নাই।

এক পক্ষে যেমন আলোকবার্ত্তা, টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার অধিকারী, অপর পক্ষে তেমনি ইহাপেক্ষা উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আলোক-বার্ত্তা খোলা স্থানে—যথা যুদ্ধক্ষেত্র, সমুদ্র-বক্ষ ইত্যাদি—কার্য্যকর হইতে পারে, কিন্তু সৌধমালাসমাকুল নগর প্রভৃতিতে অসংখ্য প্রাচীর প্রভৃতি বাধা ভেদ করিয়া আলোক প্রেরণ কোন প্রকারেই সম্ভব নহে; যুদ্ধক্ষেত্রে বেলুনে চড়িয়া হেলিওগ্রাফ করা হয়, তাহাও দৈনিক জীবনের উপযোগী নহে। প্রকৃত পক্ষে আলোকবার্ত্তা বিশাল সমুদ্র-বক্ষে নাবিকদিগের দেবাশীর্ব্বাদ, অন্যের ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি খুব কম। আবিষ্কর্ত্তা আশা করেন যে, কালে এই যন্ত্র প্রত্যেক বাতিঘরে ও বন্দরে বিরাজ করিবে—এবং এই যন্ত্রের উপকারিতা, সরলতা, ও মিতব্যয়িতাই তাহার কারণ সন্দেহ নাই। ইহা দিন রাত্রি সমভাবেই কার্য্য করিতে সমর্থ, আলোক সংশ্লিষ্ট দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, রাত্রি ভিন্ন ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই। ইহার কার্য্য, বায়বিক-তাপ-কম্পনের উপর নির্ভর করে, আলোক দিবালোকে দৃষ্ট হউক বা নাই হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

অনেকে ইহাও প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সূর্য্যতাপেই ত কাচগোলক বিস্তৃত হইয়া অন্তঃস্থ বায়ুতে কম্পন উৎপাদন করিয়াছে, অতএব আলোকরশ্মি তাহাতে আর কম্পন তুলিতে পারিবে না; কিন্তু এ ধারণা ভুল। সূর্য্যালোকের সহিত প্রেরিত আলোক রশ্মি মিশ্রিত হইয়া নূতনতর কম্পন উৎপাদন করিবে। কোয়াসা, কুজ্ঝটিকাও ইহার পক্ষে বিশেষ বাধা নহে; আলোকের তাপ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেই কার্য্য চলিবে।

এক্ষণে আবিষ্কর্ত্তার একটু পরিচয় দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। পূর্ব্বেই তাঁহার নাম ও বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছি; তিনি একজন যুবক ইঞ্জিনিয়র, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন সহরে Bell Telephone companyর অধীনে কার্য্য করেন। তিনি অতিশয় সদালাপী ও বিনয়ী; তিনি বহুদিন এই সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াও অতি অল্পদিন হইল এই যন্ত্র নিউইয়র্ক নগরের Madison square gardenএর বৈদ্যুতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের সহিত কথোপকথন করিয়াও বলিতেছেন যে ইহা এত সামান্য যে এক্ষণে ইহার প্রকাশে জন সাধারণের কোন উপকার নাই। এবং তিনি বলিতে চাহেন যে, অন্যে চেষ্টা করিলেই ইহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন; তাঁহার হঠাৎ মনে লাগিয়াছিল, ইহাতে বিশেষ বাহাদুরী কি আছে? এ theroy ত বহু দিন হইতে অনেকেরই জ্ঞাত আছে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি নিরস্ত; তিনি যে তারহীন টেলিফোন বা আলোক-বার্ত্তার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা, তাহা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় না। তিনি অন্যের সত্য ধার লইয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রবর্ত্তক (adapter) মাত্র। এরূপ সৎগুণাধার না হইলে কি ঈশ্বর তাঁহার চিত্তে এই অপূর্ব্ব সত্য জ্ঞান প্রকটিত করিতেন?

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধুরী।

দৃশ্যকাব্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

দুর্গাধিপ—(সিন্ধুদেশস্থ গোবিন্দগড়ের অধীশ্বর)
কাশী—ঐ বিশ্বস্ত প্রাচীন অনুচর।
ভবানী—ঐ নগরপাল।
বীরেন্দ্র—ঐ ভাবী জামাতা।
কুমার—ঐ পুত্র
দয়ানন্দ—সন্ন্যাসী
রাঘব—দস্যুপতি
অনন্ত, হারিৎ, অন্যান্য দস্যু-অনুচর ও প্রহরীগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীলোক।

কৌশল্যা—দুর্গাধিপের স্ত্রী
মাধুরী—ঐ কন্যা

মাধুরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দুর্গাধিপের গৃহ।

(কৌশল্যার প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে জানু পাতিয়া দুর্গাধিপ)

দু। অনিত্য সংসারে দিয়ে আত্ম বিসর্জ্জন,
হে আনন্দময়ি তুমি করেছ গমন,

সুখে নিত্যানন্দ ধামে। দেবীরূপে তথা
বিরাজিছ আলো করি বিদ্যাধরী সনে
নিত্য দিব্য সিংহাসনে। আর আমি হেথা,
হতাশ, বিষাদ ভরা অধীর হৃদয়ে,
তোমার অনিত্য স্মৃতি এই প্রতিমার—
সম্মুখে রয়েছি বসি কৃপা ভিক্ষা তরে।
হে মহিমাময়ি, তব পুণ্য মহিমায়;
মুক্ত করি দিয়ো প্রিয়ে দুষ্কৃতি আমার।
ধর্ম্মের আসনে বসি দয়াময় যবে
করিবেন বিচার আমার ভবলীলা
অবসানে—মোর পক্ষ করো সমর্থন
করেছি তোমার প্রতি যত অত্যাচার
ততোধিক প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে বলিয়ো
মার্জ্জনা করিতে মোরে। ঘোর অপরাধী
আমি—ক্ষমার অতীত! তবু তুচ্ছ শাস্তি
ঘটে যেন তব পুণ্যবলে। (উঠিয়া)
—হৃদয়ের
ভার, হইল লাঘব কিছু দুষ্কার্য্যের
অনুতাপ আসিলে অন্তরে অশ্রুজলে
মনের মালিন্য ধুয়ে শান্তি আসে চিতে!
স্বেদজলে ধুয়ে গিয়ে দেহগ্লানি যথা
নিদাঘ সায়াহ্নে করে প্রফুল্ল শরীর।

(কাশীর প্রবেশ)

হেথা কেন?

কা। বাহিরে নগরপাল আছে
দাঁড়াইয়া আপনার লভিতে দর্শন।

দু। বল তারে আসিতে হেথায়। (কাশীর প্রস্থান)
অর্ব্বাচীন
বৃদ্ধ—তার কিবা প্রয়োজন মোর সনে?

(ভবানীর প্রবেশ)

দু। খুব সংক্ষেপে তোমার কথা বল।

ভ। তাই বল্‌চি প্রভু। আপনার আজ্ঞামত সংক্ষেপেই বল্‌চি।

দু। বল।

ভ। প্রভু, হয়ত শুনেছেন যে, ঐ পশ্চিমের জলার পাশে—

দু। যে অদ্ভুত স্ত্রীলোক থাকে তার কথা বল্‌ছ?

ভ। আজ্ঞে হাঁ। গাঁয়ের সবাই বলে সে মাগী ডাইনি, ভূত-পেরেতের সঙ্গে কথা কয়। এই দেখুন না, সব ধান গেল—গরু বাছুরগুলো সব মরচে, এই যে বিষ্টি হচ্ছেন না—সকলে তার দোষ দিচ্ছিল। আবার এই যে ভয়ানক বিষ্টিতে দেশটা একেবারে ভেসে গেল, এ সব তার কায। কেননা বিষ্টি হবার দু'দিন আগে থাকৃতে সে বলেছিল যে, এবার খুব বৃষ্টি হোক্। সে মানুষের সঙ্গে বড় মেশেনা। অবারে অক্ষণে, তেমাথা রাস্তায়, তেকোনা বাড়ীতে, শিয়ালের শিং, হাঁড়গিলের ঠোঁট, গিরগিটির পিত্তি, আরো যে কত কি সিদ্ধ করে ভাঙ্গা কুলো, মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে ফেরে, আর মন্তর-তন্তর নিয়েত আছেই, এই যে সব লোক মরচে সকলেই বলে যে এই ডাইনি বেটীর জন্যে—

দু। তা আমি কি কর্‌ব?

ভ। হুজুরের কাছে প্রার্থনা এই যে, তাকে এই দুর্গে এনে পরীক্ষা করুন। যদি সে সত্যি সত্যি ডাইনি হয়, তবে তাকে জলে ডুবিয়ে হোক, আগুণে পুড়িয়ে হোক, মেরে ফেলুন—আমাদের এ বিধি ত আছে।

দু। ভাল ভাল, তার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। আর কিছু বল্‌বার আছে?

ভ। আপনার সম্বন্ধে কিছু—

দু। আমার সম্বন্ধে?

ভ। জানেন ত প্রভু, প্রথম রাত্রির পর ঘোর অন্ধকারে আমাকে সহর ঘুরে দেখ্‌তে হয়, কোথাও কোন গোলমাল হয় কিনা—আর কোন কিছু সন্দেহ কর্‌বার মত দেখা যায় কিনা?

দু। এই সম্বন্ধে না কি?

ভ। শুনুন্‌না, আমি যখন রাত্তিরে ঘুরি, তখন আপনার দুর্গের উত্তর ধারে আলো দেখেছি।

দু। উত্তর দিকে? তুমি স্বপ্ন দেখেছ—সেখানে ত কেহ থাকে না!

ভ। তাইত বলি হুজুর—তবে ভূত কি আলেয়া হবে বুঝি, কিন্তু ভূতেরা ত কথা কয় না! আমি কিন্তু কিছু কথা কহিবার শব্দ শুনে ছিলাম।

দু। তুমি ঠিক বল্‌ছ?

ভ। নিশ্চয়ই—তবে তারা খুব চেঁচিয়ে কথা কয়নি।

লোকেরা যখন অবৈধ কার্য্য করে, তখন গোলমাল করে না।

দু। তুমি কাহারো কাছে এ কথা বলনি?

ভ। হুজুর ছাড়া কাহাকেও বলিনি।

দু। তবে তুমি আর কাহাকেও বলিও না।

ভ। হাঁ প্রভু; আশা করি এজন্যে দাসের অপরাধ লইবেন না।

দু। না, না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কায করেছ।

ভ। আপনি জানেন এ সব সন্ধান যদি না রাখি, তা হলে গরিবের চাকরিটী যাবে, আর রাজাও তাঁর একজন বিশ্বাসী লোক হারাবে।

দু। কি এক কথাই এক শ বার!

ভ। (স্বগত) এক কথাই এক শ বার (প্রকাশ্যে) নমস্কার (স্বগত) আমার এই কথাই এক শ বার। (প্রকাশ্যে) ডাইনির কথাটা যেন মনে থাকে। ভুল্‌বেন না।

(প্রস্থান)

দু। এ কি? উত্তরের দিকে আলো? কথাবার্ত্তা
করে শোনা যায় রাত্রে? এ যে অসম্ভব।
মাধুরী কি হেলা করি নিষেধ আমার
সৌভাগ্য-সম্পদ ভুলি' এখনো আসক্ত
সেই দরিদ্র যুবার প্রেমে! সত্য যদি—
ঘৃণা লজ্জা ক্ষোভে তারে বিসর্জ্জিব আজি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গের একটী কক্ষ।

বীরেন্দ্র ও মাধুরী।

মা। কেন এত নির্ব্বন্ধ তোমার? শুনিব না
কথা তব। প্রথম নিশার পরে আর
করিব না দেখা তব সনে। পিতৃ আজ্ঞা
করিব পোষণ। কেন করি আমাদের
অক্ষুণ্ণ সম্মানে আর কলঙ্ক লেপন?
ক্ষম মোরে।

বী। দিবসের পরিণাম সনে
চক্রবাক মিথুনের মত, তবে কি আমরা
কেঁদে যাচিব বিদায় পরস্পরে? জেনো
প্রিয়ে, প্রণয়ের তরে পবিত্র সময়
নিশা, যখন সকলে থাকে অচেতন
ঘুমে। প্রণয়ীরা মানে না সে বিধি কভু,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তার বহু মূল্যবান্
ভাবে তারা দিবসের প্রহরের চেয়ে!
আনন্দ মুখর হয় বিপদের মুখে
আমরা যখন মিলি আনন্দের আশে,
হারাবার ভয় আসে নিমেষে নিমেষে
আলিঙ্গন পাশে বাঁধা থাকি যে সময়
তখনও কাঁপি পরস্পরে।

মা। করিয়োনা
প্রলুব্ধ আমায় আর। আজি নিশা হতে
বিভিন্ন হইব পরস্পরে। আর কভু
আমাদের হবে না মিলন।

বী। বিপরীত
হইবে অথবা। আজি নিশা হতে মোরা
হব না বিচ্ছিন্ন আর। লভিব মিলন
দোঁহে চির তরে। শিবের মন্দিরে আছে
পূজারি ঠাকুর, সুহৃদ্ আমার তিনি,
পবিত্র মিলনে দিবে তোমায় আমায়
বাঁধি পরস্পর করে। অদ্যাই নীশিথে
অপার্থিব রতনের হব অধিকারী
যে রত্নের আশে প্রণয়ী সতত ফেলে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

মা। ত্যজ এ সঙ্কল্প তব
পিতা মোর কিছুতেই হবে না সম্মত।

বী। আমি জানি পিতা তব ধরিবে প্রথমে
রুদ্রমূর্ত্তি। শান্ত হ'লে সে রোষ ঝটিকা,
প্রকৃতি কহিবে কাণে করুণার বাণী
দুহিতার পক্ষ তার করি সমর্থন।
নিমেষের নির্দ্দয়তা ভুলিয়া অমনি
আবার স্নেহের কোলে লইবে তোমায়।
কি বল মাধুরী?

মা। করিওনা পীড়াপীড়ি।

বী। অবশ্য আমার হ'বে তুমি। অস্বীকার
করিতেছে রসনা তোমার—উপহাস

করি তারে আঁখি তব দিতেছে সম্মতি।
রাজত্ব করিছে সুখে প্রণয় উন্নত
বুকে তব। হৃদয়ের অনুরাগ লভি
দীর্ঘশ্বাস জয়োল্লাস করিছে ঘোষণা।

মা। এই কর মম—অর্পিব নিশ্চয় আজি
নিশাকালে হইব তোমারি প্রাণাধিক
আত্মীয়স্বজন, মান, সম্পদ সহায়,
সব পরিহরি মিশিব তোমার সনে।
সামান্য সৌভাগ্যে তব চির ভাগ্যবতী
গণিব আমারে।

বী। সে ভগ্ন মন্দিরে তবে
তোমায় আমায় হবে দেখা। পুরুষের
বেশ ধরি যেয়ো অসঙ্কোচে—সন্দেহের
রহিবে না ভয়—বীর পরিচ্ছেদে অঙ্গ
করি আচ্ছাদন—অথচ হৃদয় রবে
কোমলা নারীর।

মা। সোজা তবে বীর সাজা!

বী। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আছে বীর শত শত
অঙ্গ ভঙ্গী করি শুধু ফেরে যথাতথা
সম্মুখ সমরে কিন্তু হয় নিরুদ্দেশ!
পলায়ন বিধি হেন বীরের লক্ষণ।
অথচ তাদের মূর্ত্তি হয় প্রতিষ্ঠিত।
তাদের গৌরব-গানে ধরণী কম্পিত।

মা। আসিছেন পিতা বুঝি।

বী। যাবে তুমি?

মা। যাইব নিশ্চয় যদি না আসে মরণ!

বী। বিদায়! বিদায়! [প্রস্থান]

মা। এখনো আসিছে শব্দ
কল্পনাত নয়? ওই আসিছেন পিতা!

(দুর্গাধিপের প্রবেশ) পিতঃ!

দু। কি করিছ তুমি?

মা। পিতঃ!

দু। শীঘ্র বল।

মা। আমি এসেছিনু—

দু। যুবা বীরেন্দ্রের সনে সাক্ষাতের তরে?

মা। জান ত সকলি তুমি—

দু। প্রতি নিশা জ্বলে আলো উত্তরের দিকে
কথাবার্ত্তা শুনা যায়—

মা। আমারি সে আলো।

দু। কার কণ্ঠরব?

মা। আমার ও বীরেনের।

দু। নিষেধ কি করি নাই এই কার্য্য তরে?

মা। নিষেধ করেছ পিতঃ বড় অসময়ে!
না মানি নিয়তি বাধা তোমারি আদেশে
যে তরু আশ্রয় করি সুখী এ লতিকা,
করোনা বিচ্ছিন্ন তারে রাখ এ মিনতি—
অঙ্কুরে বাঁচালে যারে সলিল সেচনে;
অনুগতা তনয়া যে আমি। দেবতার
বাণীসম মানি তব কথা, হতে মম
জ্ঞানের বিকাশ। দ্বিরুক্তি করিনি কভু।

দু। তা হলে নিষেধ মম অবশ্য পালিতে।

মা। বীরেনের কথা বল প্রথম যে দিন
স্পন্দিত হইল দেহ পুলক হিল্লোলে।
সুন্দর বলিলে তারে, আমিও ভাবিনু
তাই—সাহসী সে শুনিয়া তোমার মুখে
হর্ষভরে দুরু দুরু করিল হৃদয়।
বলিলে যখন তুমি নহেক সে ধনী—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি ফিরানু বয়ান।
নয়নের ধারা হেরি উরসে আমার
বলেছিলে তুচ্ছ অতি সৌভাগ্য-সম্পদ
প্রকৃতির দান হ'তে। তোমারি আদেশে
বীরেনে বাসিনু ভাল—পিতঃ তদবধি!

দু। ছিল বটে আগে মোর এ মোহ স্বপন্।

মা। সে মধুর স্বপ্নে আমি এখনো বিভোর।
কি দোষ আমার ইথে?

দু। এই সে সময়
তবে জাগিবার তব। আত্ম সংযমের
তরে দৃঢ় কর মন—হয়োনাক আর
অগ্রসর। ঘৃণাকর নীচ অনুরাগে।
অপার স্নেহের কোলে ফিরে এস মোর।
সম্মত নহ কি তুমি আমার কথায়?
শুন তবে—দর্পভরে আমার আদেশ,

অবহেলি' মত্ত হয়ে হেয় অনুরাগে
পরিণয় কর যদি নীচ প্রজাসহ,
এ জীবনে হেরিব না আনন তোমার।
মরণের পরে পাবে ঘোর অভিশাপ
সম্পদের স্থলে মোর, করিনু প্রতিজ্ঞা।
যাহা ইচ্ছা কর স্থির—চলিলাম আমি।

[প্রস্থান]

মা। দাঁড়াও, দাঁড়াও, পিতঃ! চলে গেল হায়,
বুঝিলনা দুহিতার মরম বেদনা,
মা আমার, আজ যদি থাকিতে গো তুমি
তা হ'লে কি পিতা মোরে পারিত ত্যজিতে?
সরমের মাথা খেয়ে পিতারে বুঝাতে
হইত না এত কথা। হা অদৃষ্ট মোর!
বীরেন্দ্র, এখন আমি তোমারি কেবল।
সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জিয়া অর্পিনু তোমার
করে সর্ব্বস্ব আমার—জীবন সর্ব্বস্ব
তুমি—কিন্তু কর যদি অবহেলা মোরে
ভ্রূভঙ্গী করিয়া কর তীব্র তিরস্কার
এ প্রণয়ে ঔদাসীন্য দেখায়ে হৃদয়ে
ব্যথা দাও যদি—না না অসম্ভব তাহা
তুমি চির সত্যময় সন্দেহ কি তার?

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

রাঘব ও অনন্ত।

অ। এসেছি এ গহন কাননে। কি আদেশ
বল প্রভু?

রা। শত্রু তুমি মম।

অ। বটে!

রা। মৃত্যু হতে বাচায়েছ বলি'।

অ। তাই কি বিরাগ এত?

রা। দিন রাত তদবধি শান্তি নাই
মোর। ভাবিতেছি শুধু কেমনে তোমায়
পাঠাইব শমন সদনে।

অ। একি কথা!
বিচিত্র উপায় এ যে প্রতিদান তরে।

রা। এ অরণ্যে পড়েছিনু শান্তি রক্ষকের
প্রহরীগণের হাতে—

অ। এখনো হয়নি এক মাস।

রা। যুঝেছিনু তাহাদের সনে
আমরা সকলে, যদবধি অসি তব
খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েনি ভূতলে। আর
আহত অঙ্গের মম, বহিলে শোণিত
ধারা, বাধ্য হয়ে পলা'নু আমরা সবে।
বনের জটিল পথ আমাদের চির
পরিচিত—হনু অগ্রসর মোরা, তারা
সবে পড়িল ধাঁধায়। বৈরীপদধ্বনি
তাই হারানু হেলায়। তখনো শোণিত
স্রোত থামে নাই মম। পড়িলাম ক্লান্ত
হ'য়ে উরসে তোমার। কেশরী যেমন
শিকারীর অস্ত্র হতে শিশুরে আপন
রক্ষা করে, তুলি মোরে তেমতি সবলে
আনিলে আবাসে ত্বরা। মূর্চ্ছিত হইনু
আমি অমনি সেখানে।

অ। করুণার কার্য্য আমি ভেবেছিনু তাহা।

রা। আমিও রয়েছি
ঋণী এত দূর তব। কিন্তু তার পর?
তার পর খুলে ছিলে অঙ্গ আবরণ
মম, ক্ষত স্থান হেরিবারে। তার পর
কি হেরিলে বল?

অ। হেরিনু সঙ্কেত এক তব বাহু মাঝে।

রা। জানি, জানি, দেখেছিলে,
তুমি—মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়ে ছিল সে মুহূর্ত্তে
মোর—তোমার নয়ন সে সঙ্কেত 'পরে
ছিল নিবদ্ধ তখন। যা' কিছু গোপন
মম জেনেছ সকলি—করেছ প্রকাশ আর।

অ। করিনি প্রকাশ তাহা সত্য জেন স্থির।

রা। কঠিন শপথ কর—সে প্রসঙ্গ
আননি রসনা অগ্রে।

অ। যদি তার এক
বর্ণ উচ্চারিয়া থাকি, ভবানীর দয়া
হ'তে হইব বঞ্চিত।

রা। সখা তবে তুমি
মম। ওকি ? শুন দেখি—
অ। মানুষের পদ ধ্বনি।
রা। স্থূল মানবের বুঝি। সরে এস
এই ধারে—দেখি কেবা আসে ?
(দয়ানন্দের প্রবেশ)
অ। কোথা এত ত্রস্ত হয়ে যেতেছ ঠাকুর ?
দ। দিয়োনাক
বাধা মোরে—ওই দুর্গে যাব আমি, কার্য্য
আছে সবিশেষ।
রা। (স্বগত) দুর্গে! (প্রকাশ্যে) কি কায তথায় ?
দ। মূঢ় তুমি বড় বৎস। অতি গোপনীয়
এ বিষয়।
রা। দাও সদুত্তর—তা না হ'লে
দেহ হতে হৃদপিণ্ড করিব অন্তর।
অ। শীঘ্র বল।
দ। ভাল বলিতেছি।
রা। কায নাই ভূমিকায় আর।
দ। দুর্গাধিপচিত্ত বড়
হয়েছে চঞ্চল। আমি যাইতেছি তাঁর
গ্রহশান্তি তরে।
রা। দুর্গেশের পরিচিত
তুমি কি ঠাকুর ? স্বচক্ষে দেখেছ তিনি ?
দ। নহে।
রা। জানে কি তোমারে কোন অনুচর তাঁর ?
দ। কেহ নয়।
রা। কি নাম তোমার ? বুঝি—
দ। দয়ানন্দ।
রা। (স্বগত) তাই বটে। (প্রকাশ্যে) সত্বর মোচন
কর পরিচ্ছদ তব। ইতস্ততঃ কেন ?
এখনি ডাকিব তবে অনুচরগণে,
প্রহারি এ বেশচ্যুত করিবে তোমার। (বস্ত্রত্যাগ)
ভাল, শুন মোর কথা যাও নিজ মঠে,
এদিকে এসনা আর। নহিলে ভূতের
খেলা হেরিবে অচিরে। শীঘ্র মঠে গিয়ে
ইষ্টচিন্তা করগে আপন।
দ। রাম, রাম,
এই অত্যাচার হরি করোনা গ্রহণ ;
কৃপা বিতর, গুণে কর এদের মঙ্গল। [প্রস্থান]
রা। পলাইল। বুঝেছ কি উদ্দেশ্য আমার ?
অ। একরূপ বুঝিয়াছি বটে।
রা। ফিরে যাও
আমাদের দলে, দুঃসাহস কার্য্যভার
আজিকার রাত্রে দিনু তোমার উপর।
পাইবে সাহায্যকারী দুর্গের ভিতরে
যাহারা প্রশস্ত পথ দিবে দেখাইয়া।
অ। ভাল তবে বিদায় এখন।
(প্রস্থান)
রা। এই বার
হারাইবে দুর্গাধিপ হিতাহিত জ্ঞান।
স্বহস্তে সাধিব আজ স্বস্ত্যয়ন তার।
প্রতিশোধ হ'বে কিছু অদ্ভুত ভীষণ—
শোণিতাক্ত স্মৃতি যার ভবিষ্যতে দিবে
শিক্ষা দুর্দ্দান্ত মানবে—কুণ্ঠিত যাহারা
স্বীয় অনুচর প্রতি কৃপা বিতরণে।
শত অত্যাচার বটে মহতের ক্ষমা
লভিতে সক্ষম। কিন্তু অপমান আছে
হেন—যাহা বহির্ভূত করুণার সীমা। [প্রস্থান]

(ক্রমশঃ—)

কুকি জাতির বিবরণ।

(৪)

কুকিগণ কর্ত্তৃক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, বৃটিশ ত্রিপুরার অন্তঃপাতী খণ্ডল পরগণায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাণপুরে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এই হত্যাকাণ্ড তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা অতি সংক্ষেপে ও লঘুতররূপে বিবৃত হইয়াছিল। উক্ত বিজ্ঞাপনীর স্থূল মর্ম্ম এই ঃ—

"১৮৬০ খ্রীঃর জানুয়ারি মাসের প্রথমভাগে চট্টগ্রামে এইরূপ রিপোর্ট আগত হইল যে, চারি পাঁচ শত কুকি,

ফেনী নদীর মুখে একত্রিত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ পাওয়া গেল, তাহারা অনেক গুলি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং বিস্তর মনুষ্য হত্যা করিয়াছে। ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তৎ সংবাদ আমরা জানিবার পূর্ব্বেই ৩১শে জানুয়ারি তারিখ কুকিগণ ফেনী নদীর ভাটিতে যাইয়া ছাগলনাইয়া নামক স্থানে (ত্রিপুরা জিলার সমতল ভূমিতে) প্রবেশ করিল। তাহারা ১৫ খানা গ্রাম ভস্মীভূত ও লুণ্ঠন এবং ১৮৫জন বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করিয়া একশত লোক ধৃত করিয়া আনিয়াছিল।"

এই হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া, রাধামোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার ঘটনায় মোটামুটি অবস্থা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। কবিতাটির কিয়দংশ কৈলাস বাবু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

কবি বীণাপাণির পদ বন্দনা করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"শুন সর্ব্ব সাধুজন ইহার নির্ণয়।
যেন মতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়॥
দেখ মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুন্সীর খিল বাজারে বাবু ধুরন্ধর * ছিল॥
* ধরণীধর সিংহ কাপ্তান।
সেদিন প্রভাত কালে, করেছিল পূজার আয়োজন।
চিনি শর্করা আদি যত লয় মন॥
পূজা আরম্ভিল হেনকালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রা কুকি আসি দেখা দিল॥
তারা, দাও শেল হাতে বন্দুক কান্ধে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুজঙ্গর।
রণে প্রবেশিল যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়।
অবনীতে কাটা পড়ি ধূলাতে লুটায়॥
রুধির আবেসিল আকাশেতে উড়িছে শকুন।
ঘর জিনিস লুট করি চালে দেয় আগুন॥
তারা খন্তা নিল, কুড়াল নিল আর নিল, দাও কাঁচি।
সিন্দুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাছি॥
* * * *
ঠিক দুপর বেলা হ'ল, পুড়ে মুন্সী বাড়ী॥
সে দিন ফিরে যায়, রাত পোহালে ছিল রবিবার,
কাটা গ্রামে কাটি আসি দিল পুনর্ব্বার॥"

* কৈলাস বাবুর রাজমালা—৩য় ভাঃ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৩৬২।৩৬৩ পৃঃ।

* * * *
চৈলেছে কোলা পাড়া॥
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর কূলে আসি দিল দরশন॥
দেখে গুণাগাজী, গুণাগাজী এল সাজি, সিপাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল বন্দুক আওয়াজ করি।" *

খণ্ডাল পরগণার অন্তর্গত মুন্সীর খিল গ্রামের বাজারে ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের কাপ্তান ধরণীধর সিংহ কতক সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ, শনিবার শ্রীপঞ্চমীর পূজোপলক্ষে অস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া, পূজার নিমিত্ত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, চারি পাঁচ শত কুকিতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তান মহাশয় এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন।† তখন কুকিগণ অবলীলাক্রমে দাহন, লুণ্ঠন ও নিধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল ; তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার আর কেহই ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগকে মাতার সম্মুখে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া, নীচে সুতীক্ষ্ণ শেল ধারণ পূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিল। পুরুষ এবং বৃদ্ধ স্ত্রীলোক মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত বধ করা হইয়াছিল। কেবল যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে বন্ধন করিয়া, সঙ্গে লইয়া গেল। তাহারা এবার ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া, ১৮৫ জন লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিল এবং প্রায় এক শত লোককে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল। এই সকল গ্রামের স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ সমস্তই কুকিগণ লুণ্ঠন করিয়াছিল।

এই সময়ে গুণাগাজী নামক গ্রাম্য একজন প্রধান লোক চতুর্দ্দিকস্থ পল্লী হইতে ২৫। ৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া, বাউনালী নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরে কুকিদিগকে আক্রমণ করে। কুকিগণের সঙ্গে অধিক বন্দুক ছিল না। সুতরাং তাহারা আক্রান্ত হইয়া, নদী পার হইতে সাহস পাইল না ; এখান হইতেই পলায়ন করিল। গুণাগাজী সাহসে বুক বাঁধিয়া এরূপভাবে বাধা না জন্মাইলে কুকিগণ

† এই কারণে কাপ্তান ধরণীধরকে অনেক লাঞ্ছনা পাইতে ও কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইতে হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। 'জমাতিয়া বিদ্রোহ' সময়ে তাঁহার সাহস ও বিক্রমের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—

আরও বিস্তর ক্ষতি করিত, সন্দেহ নাই। আমরা বাউ-নালীর নদীর একখানি চিত্র নিম্নে প্রদান করিলাম।

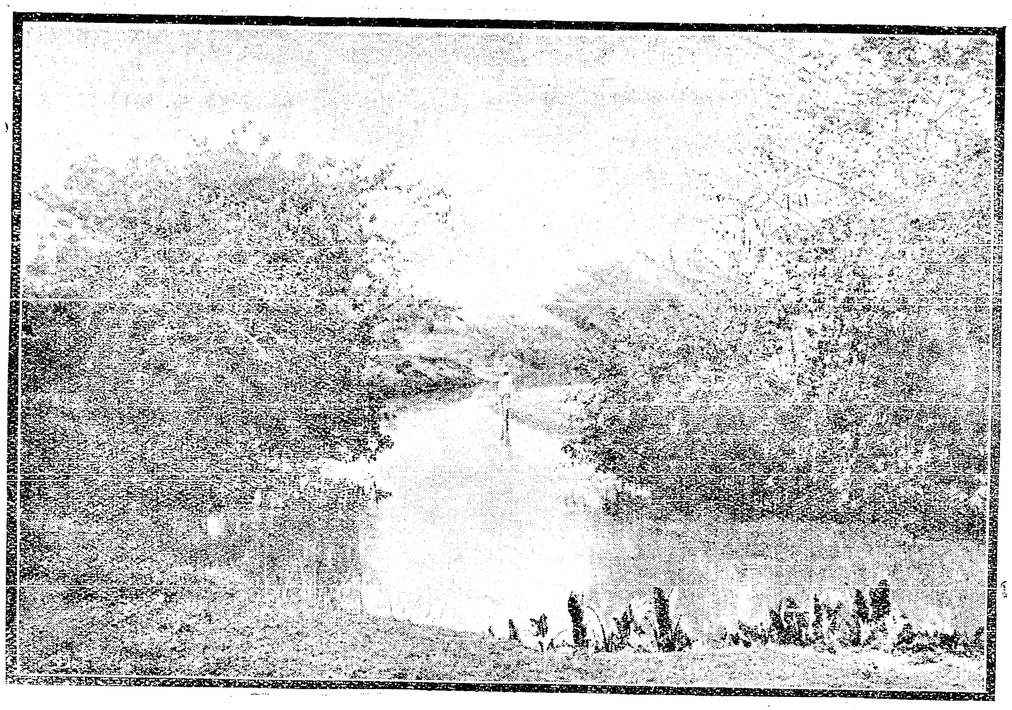

ত্রিপুরা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া, একদল পুলিস সৈন্য খণ্ডালে প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া কুকির অত্যাচারের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইল; কুকিগণ তাহার অনেক অগ্রেই পলায়ন করিয়াছিল।

এই শোচনীয় ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ঃ—

"পূর্ব্বে ইহা অনুমান করা হইয়াছিল যে, ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন রকম গোলমাল ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, রাজবংশের নিকট সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিদ্বারা যত দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত কুকিগণ চালিত হইতেছে। পরে নিশ্চয়রূপেই জানা গিয়াছিল যে, ত্রিপুরা রাজ্যের তিন চারি জন পলাতক ঠাকুর লোক এই আক্রমণের প্রধান উত্তেজনাকারী ছিলেন। এই সকল ঠাকুর লোক দীর্ঘকাল কুকিদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিল। এবং ইতিপূর্ব্বে মহারাজার কতকগুলি প্রজা ডুপটাং কুকিদিগকে আক্রমণ করায়, তাহাদের মনে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতে ছিল, এই সুযোগেও ঠাকুর লোকগণ কুকিদিগকে মহারাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। এই সকল লোক মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া, নানা শ্রেণীর কুকিদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে এবং মহারাজ বাহাদুরের অধিকৃত স্থান সমূহ মধ্যে মধ্যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল ঘটনার কথা মধ্যে মধ্যে আমাদেরও কর্ণগোচর হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রকৃত পক্ষে কোনও ঠাকুর লোক এই ঘটনায় সংলিপ্ত ছিলেন কিনা, তাহার কথা বলা যায় না। সম্ভবতঃ পূর্ব্বের দুই একটী ঘটনা দেখাইয়াই, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। এই ঘটনার প্রকৃত কারণ পরে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এইরূপ ঃ—

স্বাধীন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে 'রিয়াং' নামক এক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রিয়াংগণ ত্রিপুরা ও কুকির মধ্যবর্ত্তী সঙ্কর জাতি বলিয়া

অনেকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, রিয়াংগণের স্বভাব প্রায় কুকিগণের ন্যায়ই উগ্র। এবং ইহারা কতকটা হিংস্র ভাবাপন্নও বটে। খণ্ডালের বাঙ্গালী মহাজনদিগের নিকট হইতে রিয়াংগণ সর্ব্বদাই টাকা কর্জ্জ লইত। অনাবৃষ্টি হেতু উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর কাল পার্ব্বত্য অঞ্চলে শস্য উৎপন্ন না হওয়ায়, রিয়াংগণ নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে মহাজনেরা অবিরত টাকার নিমিত্ত তাগাদা আরম্ভ করিল। অভাবের সময় এই তাগাদা রিয়াংগণের পক্ষে নিতান্তই অসহনীয় হইয়া উঠিল। এবং এই কারণে তাহারা কতকগুলি কুকি প্রজার সহিত মিলিত হইয়া এই হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। খ্যাত নামা কুকি সরদার রতন পুইয়া এই ঘটনায় সংলিপ্ত ছিল। ত্রিপুরার রাজবংশ সংসৃষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর এই হত্যা ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

খণ্ডালের যে সকল লোক কুকিগণের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৩০০৭ টাকা প্রদান করা হয়। ইহার অর্দ্ধাংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর বহন করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের নিমিত্ত কুকিদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তৎপরবর্ত্তী শীত ঋতুতে অভিযানের আয়োজন করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক মনে করিলেন এবং এই সময় হইতেই তাহার অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, এক দল কুকি স্বাধীন ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করিল। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের একটি সেনানিবাস ছিল, তাহাতে ১ জন মাত্র হাবিলদার ও ২৫ জন সিপাহী অবস্থান করিত। এত অল্প সংখ্যক লোকের কুকিগণের মুখে দাঁড়ান সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহারা কুকির আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই "মেগেজিন" ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কুকিগণ এই "মেগেজিনের" বলে প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তন্নিকটবর্ত্তী দুই খানা গ্রাম আক্রমণ করিল। এখানে বিস্তর লোকের প্রাণ হত্যা এবং অনেক গুলি লোকালয় ও একটি সমৃদ্ধিশালী বাজার লুণ্ঠন ও দাহ করিয়াছিল। উদয়পুর নিবাসী ছেয়ড়ি লস্কর নামক একটি লোকের সহিত আমাদের আলাপ আছে। কুকিগণ কর্ত্তৃক ইহারও বাড়ী লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। ইহার স্ত্রীকে কুকিগণ লইয়া গিয়াছিল, কিছুকাল পরে সে পালাইয়া আসিয়াছে। কুকির আক্রমণের সময় ছেয়ড়িলস্কর ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, পথিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে দূর হইতে একজন কুকি তাহাকে গুলি করিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সেই গুলি তাহার গায়ে লাগিল না, কিন্তু বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে কুকিগণ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, সম্ভবতঃ মৃত কি জীবিত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দাও দ্বারা তাহার শরীরে তিনটি আঘাতের বড় বড় চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তত জোরে আঘাত করে নাই বলিয়াই প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

উদয়পুর হইতে কুকিগণ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ধাবিত হইল। ইহারা কালিন্দা রাণীর (চাখমা সরদার) অধিকৃত স্থানে যাইয়া, কয়েক খানা গ্রাম দগ্ধ করিবার পর একদল বৃটিশ পুলিস সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া, পর্ব্বতাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অতঃপর কুকিদিগকে বিশেষরূপে দমন করা আবশ্যক বোধে, চট্টগ্রামের কমিসনর বক্‌লেণ্ড্ সাহেব ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সহিত পরামর্শ করিবার নিমিত্ত লেফ্‌টেনেণ্ট্ গ্রেহাম্ কে আগরতলায় প্রেরণ করিলেন। গ্রেহাম্ সাহেব মহারাজ বাহাদুরের সহিত আলাপাদি করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট তারিখে কমিসনার সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তভাগে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সৈন্যস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ তাহাতে সম্মত নহেন। তিনি তাঁহার নিজ সৈন্য উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রস্তুত আছেন। নিবিড় অরণ্যে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ, কুকিদিগের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবে না। আগামী শীত ঋতুতে মহারাজ তাঁহার অধীনস্থ বৃহৎ এক দল কুকি সেনা, দুরন্ত কুকিদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। আমার বিশ্বাস, মহারাজ সরলভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন; এবং প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। *

* কৈলাস বাবুর অনুবাদ।

ইহার পরের বৎসর (১২৭২ ত্রি—১৮৬২ খ্রী) মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর পরলোক গমন করার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ত্রিপুর রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে, অথবা চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোনরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই; কিন্তু উত্তর প্রান্তে শ্রীহট্টের সীমান্তবর্ত্তী স্থানে (আদমপুরে) কুকিগণ কর্ত্তৃক বিষম উপদ্রব ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার মূল কারণ যাহা জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

লালছুকুলার পুত্র রাজা মুরছইলাল, প্রসিদ্ধ কুকি-সরদার সুকপইলালের ভগ্নি ভানুই থাঙ্গীকে বিবাহ করেন। এই সুকপইলালের পিতা মংপের কুকিগণের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুকপইলালও বিক্রমে পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কোনও কারণবশতঃ রাজা মুরছইলাল স্বীয় পত্নী ভানুই থাঙ্গীকে অপমানিতা করিয়াছিলেন। বীর দুহিতা এবং বীর ভগিনী, অভিমানিনী পত্নীর প্রাণে সে অপমান সহ্য হইল না। তিনি ভ্রাতা সুকপইলালকে এ সংবাদ জানাইলেন। এই সূত্রে কুকিগণের মধ্যে বিষম অশান্তি ঘটিয়াছিল। এবং সেই অশান্তি ক্রমে গড়াইয়া, হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির উপর পড়িল। সুকপইলাল, রাংবুং ও লালহুলন প্রভৃতি রাজাগণ মিলিত হইয়া, ত্রিপুর রাজ্যের কয়েকটি গ্রাম, এবং শ্রীহট্ট জিলার আদমপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া, অনেকগুলি লোক ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদের কয়েক জন পলায়ন করিয়া কাছাড়ে আসিয়াছিল, অবশিষ্টগুলিকে কুকিগণ বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর কুকিদিগকে কৌশলে বাধ্য করিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৮৬২—৬৩ খ্রীঃ)। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানিন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রেহাম্ সাহেব, খ্যাতনামা কুকিসরদার রতনপুইয়াকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিলেন। এই সন্ধিতে ধার্য্য হইয়াছিল যে, সীমান্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, রতনপুইয়াকে বার্ষিক ৪০০ টাকা, হাউলং দিগকে ৮০০ টাকা, এবং 'সাইলো'দিগকে ৮০০ টাকা প্রদান করিবেন। উত্তর অঞ্চলে কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনার ষ্টুয়ার্ট সাহেব, সুকপইলাল, মোল্লাসরদার ও বনপুইলালের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। এখানে, সুকপইলাল গবর্ণমেণ্টের বাধ্য থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিলে, তাঁহাকে বার্ষিক ৬০০ শত টাকা প্রদান করিবার কথা হইয়াছিল।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে কুকিগণ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে নানাবিধ উপদ্রব ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোনরকম অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইহারা ভীষণ আত্মকলহে লিপ্ত ছিল, সুতরাং সমতল ভূমিতে নামিয়া অনিষ্ট করিবার অবসর পাইয়াছিল না।

১৮৬৭ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে প্রায় ৫০০ শত হাউলং কুকি সমবেত হইয়া চট্টগ্রাম অঞ্চল আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষগণ রতন পুইয়া দ্বারা এই সংবাদ জানিতে পাইয়া, চট্টগ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা না পাইয়া, ত্রিপুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম হইতে সতর্ক থাকায়, এখানেও তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই নিরাশ হৃদয়ে পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

১৮৬৮ খ্রীঃ শেষ ভাগে, সুকপইলাল ও বানপুইলালের অধীনস্থ বহুসংখ্যক কুকি সম্মিলিত হইয়া, কাছাড়, ত্রিপুরা এবং মণিপুর অঞ্চলে সমভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিল। এই সময়ে মণিপুরের মহারাজ মারজিতের পুত্র কানাই সিংহ পিতৃসিংহাসন অধিকারের মানসে একটি ক্ষুদ্র দল সংগ্রহ করিয়া কুকিদিগকে সেই দলভুক্ত করিয়া লইলেন। ইনি কুকিগণের সহিত বিশেষ প্রীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ বাহাদুর কুমার কানাই সিংহের ভাগিনেয় ছিলেন। এজন্য খণ্ডলের হত্যাকাণ্ডে কুকিগণের সহিত নীলকৃষ্ণ গোপনে সংলিপ্ত ছিলেন বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্দেহের কারণ ঘটে। ত্রিপুরার তদানিন্তন মাজিষ্ট্রেট গর্ডন সাহেবের রিপোর্ট দ্বারা সেই সন্দেহ অপনীত হইয়াছিল।* এই হত্যাকাণ্ডে নীলকৃষ্ণের সহানুভূতি ছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কয়েকটি কুকি সরদারের সঙ্গে যে তাঁহার প্রীতি প্রগাঢ় ছিল, একথা মিথ্যা নহে। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি

* Government letters to the commissioner of Chittagong, 7th Nov. 1860. No. 5845.

কমিসনার এডগার সাহেবও * কুকি প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীঃর প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট, কুকিদিগের বিরুদ্ধে তিন দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রার ফল মোটের উপর ভাল হইয়াছিল না। এই সনের শেষ ভাগে, কুকিদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার পক্ষে, সার উইলিয়ম গ্রে, প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তদানিন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও বাহাদুর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি, ত্রিপুর রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিয়োগের প্রস্তাব বিশেষ রূপে অনুমোদন করেন। বলা বাহুল্য যে, ইহার পূর্ব্বে উক্ত রাজ্যে গবর্ণমেণ্টের রেসিডেন্সি ছিল না।

ইহার পরে প্রায় এক বৎসর কাল কুকিদিগকে কৌশলে বাধ্য করিবার নিমিত্ত ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনার মিঃ এডগার এই সময়ে কুকিগণের আবাস স্থানে (ব্যাপারির বাজারে) গিয়া, কুকিসরদার সুকপইলালকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সম্মানসূচক এক খেলাত প্রদান করিলেন। এই খেলাতে সোণালি লালবর্ণের ফুল বিশিষ্ট সবুজবর্ণের পায়জামা ১টি, এই রকমের কাজ করা বেগুনি রঙের কোট একটী, সাদা ও সবুজ রঙের কাজকরা সুন্দর টুপী ১টি, বেলোয়ারি ও সোণার দানাযুক্ত হার ১ ছড়া, এবং বেলোয়ারি কর্ণভূষণ দুইটি ছিল। এডগার সাহেব মনে করিলেন, কতকগুলি সামান্য মূল্যের ঝুটা জিনিস দিয়া বর্ব্বরকে হস্তগত করা হইল। বর্ব্বর তাহা গ্রহণ করিলেন বিপরীত ভাবে; তাঁহার অনুচরগণ মণিপুরের দরবারে যাইয়া প্রকাশ করিল, "কাছাড়ের বড় সাহেব আসিয়া, আমাদের রাজাকে কর দিয়া গিয়াছেন!"

ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের কৌশলজাল এখানে ব্যর্থ হইল। এই সকল কৌশল দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে বরং অপকার ঘটিয়াছিল। কুকিগণ বুঝিল,—তাহারা যত অত্যাচার করিবে, ইংরেজগণ ততই উপহারাদি প্রদান দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইবেন। সুতরাং ইংরেজদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় করিবার ইহাই উত্তম ব্যবস্থা! তদবধি কুকিগণ নরহত্যা, গৃহদাহ এবং লুণ্ঠনাদি কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল।

সুকপইলালকে খেলাত প্রদান করিয়া এডগার সাহেব শিলচরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন, কুকিগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ ও লুণ্ঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে! অল্প কালের মধ্যে ইহারা কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং মণিপুরের নানা স্থান আক্রমণ করিয়া, গৃহদাহ, নরহত্যা এবং লুণ্ঠনাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। এই সময়ে আবার অনেকগুলি যুবতী স্ত্রীলোককে কুকিগণ বন্দী করিয়া লইয়াছিল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

* ইনি পরে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

দেবীযুদ্ধ।*

"——একাকী এ ভবে
সহায় সম্পদ হীন,—আত্মীয় বান্ধব,
বিদ্যা, বুদ্ধি, কপর্দ্দক পথের সম্বল,
বিপদে সাহস বাক্য, বিলাপে সান্ত্বনা,
কিছুই ছিল না, নাই;—সংসার সাগর
তরঙ্গে পতিত পক্ষিশাবকের মত
ভাসিয়াছি, ভাসিতেছি, আরো কত কাল
ভাসিতে হইবে, তাহা জানেন বিধাতা!"

উৎসর্গপত্রের এইরূপ বিলাপাত্মক উপক্রমণিকায় কাব্যসূচনা করিয়া কবি প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কাব্য কথার মর্ম্মোদ্ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। শ্রীহট্ট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কবি শৈশবেই পিতৃহীন হন, দারিদ্র্য দুঃখে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানা ক্লেশে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর অনুকম্পা ও বাৎসল্য লাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল শিক্ষকের কার্য্যে ও শিক্ষাপরিচয় নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরিণত জীবনে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর ছায়া অবলম্বনে দেবীযুদ্ধ রচনা করিয়াছেন। ইহা কবির প্রথম রচনা নহে;—বহু বৎসরের সাহিত্য-সেবার ফল। কিন্তু ইহা ভক্তহৃদয়ের স্বাধীন উচ্ছ্বাস;— সুতরাং সমালোচকের অধিকারের অন্তর্গত নহে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ সকলের নিকট সুপরিচিত না হইলেও, তদন্তর্গত চণ্ডী হিন্দুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। দেবীযুদ্ধ তদবলম্বনে রচিত হইলেও কবিকল্পনা পৌরাণিক কাহিনীর ছায়ামাত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ইচ্ছামত বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া এক অভিনব দেবীযুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ভাল কি মন্দ আদ্যন্ত না পড়িয়া—মীমাংসা করিবার উপায় নাই। কাব্যের লক্ষ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি; সুতরাং যুক্তিতর্ক কাব্যমধ্যে

* শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ প্রণীত, মূল্য ১।০।
কলিকাতা ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত।

স্থান পাইতে পারে না। দেবীযুদ্ধ কাব্য—অথচ আদ্যন্ত যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ। তর্কের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের মিলন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা নিতান্তই গদ্য সাহিত্যের অন্তর্গত। কবি তাহাকে পদ্যের গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া কাব্যাকারে যে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা যেমন তীব্র, তেমনি সকরুণ।

দেবতার পরাজয়, অসুরের স্বর্গাধিকার, প্রাচীন সাহিত্যের চির পুরাতন কাহিনী! শুম্ভ নিশুম্ভ সেই পুরাকাহিনীর নায়ক। তাহারা শিবের বরে স্বর্গলোক অধিকার করিয়া, শিবানীর কোপে নিহত হইয়া দিবাধামে গমন করিয়াছিল; কিন্তু দেবদলের পরাজয় হইল কেন, পরাজিত দেবদল আবার স্বর্গাধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইল কেন, পুরাণে তাহার যুক্তি-সঙ্গত কারণ উল্লিখিত নাই; কেবল জয় পরাজয়ের ঘটনাবলী বিবৃত আছে। কবি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি নরলোকের ন্যায় সুরাসুরলোককেও নরলৌকিক কার্য্যাকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যুক্তি তর্কের সহায়তায় দেবীযুদ্ধ বুঝাইবার জন্য কাব্য রচনা করিয়াছেন।

ইহা নূতন ব্যাখ্যা। আজ কাল যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, এ ব্যাখ্যা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সমস্তই রূপক;—তদনুসারে দেবীযুদ্ধ পাপ পুণ্যের সমর—পুণ্যের বিজয়, পাপের পরাজয়, শরচ্চন্দ্রের দেবীযুদ্ধ সেরূপ আধ্যাত্মিক রূপক নহে; বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দেবীযুদ্ধের পাত্র পাত্রী সমস্তই শরীরী, দেবতা ও অসুর হইলেও অনেকটা যেন রক্ত মাংসের মানুষের মতই শরীরী জীব। দেবতা স্বর্গের আধিপত্য পাইয়া যেন গর্ব্বান্ধ অলস কর্ত্তব্যবিমুখ বিলাসলোলুপ মোগল বাদসাহের মত নেশাভাঙ্গে ঢুলিতে ঢুলিতে কোনরূপে চেরাসহী করিয়া রাজ্যপালন করিতেছিল; তখন অনলস কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধনশীল অসুরদল অপরাজিত উৎসাহে দেবশক্তির মূল দেববিদ্যা উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া পুরুষকারের পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। ইহাতে বাহুবলের সঙ্গে ছল কৌশল ও অসুর দলের কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা না করিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু একবার ছলে বলে কৌশলে স্বর্গরাজ্য হস্তগত করিবামাত্র অসুর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, বিচারের নামে অত্যাচার, প্রজা পালনের নামে দুর্ব্বল দলন, অসুর শাসনের মূলমন্ত্র হইল। তখন দেবদল দেবগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রণী করিয়া তাঁহার উপদেশে স্বর্গোদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। তজ্জন্য দেবদল শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শক্তিভূমিতে সমবেত হইলেন;—শক্তি শত্রুনাশ করিয়া দেবী যুদ্ধাবসানে দেবদলকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

দৈত্যরাজ যখন স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দেবদলের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। সুচতুর অসুররাজ দেবগুরু বৃহস্পতিকে দৈত্য-কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন।

কবি বলিতেছেন ঃ—

দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবে দেখিয়া
আগেই অসুর হরিল তাহারে;
দেবতা পূজিত সুর গুরু আজ
বন্দী অসহায় দৈত্য-কারাগারে।

এই বৃহস্পতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইহার রূপক হীন নাম—জাতীয় শিক্ষা! সে যুদ্ধ করে না, কিন্তু তাহার মন্ত্রণাবলেই ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে সক্ষম ছিলেন।

বৃদ্ধ সে ব্রাহ্মণ অস্ত্র নাহি ধরে,
যায় না কখন সংগ্রামের স্থলে;
ত্রিলোকের পতি আছিলাম আমি
একমাত্র তার মন্ত্রণার বলে।"

অসুরদল দেবদলের জাতীয় শিক্ষা কারারুদ্ধ করিয়া অস্ত্র শাস্ত্র কাড়িয়া লইয়া জ্ঞানবল ও বাহুবল বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। দেবতা-দের উপর কড়া পাহারা বসাইয়া দিয়াছিল;—

পথে ঘাটে সদা দৈত্যের প্রহরা,
যুড়ি তিন লোক দানবের থানা;
দেবের কপালে যথেচ্ছ বিহার,
কথোপকথন পরস্পরে মানা!

দেবদল সম্মিলিত না হইলে মন্ত্রণা হয় না, মন্ত্রণা না হইলে, বৃহস্পতিকে না পাইলে কর্ত্তব্য নির্ণয় হয় না। অসুর না ঘুমাইলে সে মন্ত্রণার অবসর কোথায়? তাই দেবদল আরাধনা করিয়া নিদ্রাদেবীকে স্তবে তুষ্ট করিলে নিদ্রার কৃপায় অসুর ঢলিয়া পড়িল,—

"সন্নদ্ধ সমর বেশে শ্লথমুষ্টিচ্যুতবাণ
সংজ্ঞাহীন দ্বারে দ্বারে প্রহরী অসুরগণ।"

তখন মন্ত্রণার সুযোগ পাইয়া দেবদল হিমাচলের নিভৃত নিকেতনে সমবেত হইলেন। মন্ত্রণার প্রথমেই আত্মকলহের সূচনা, কাহার দোষে দেবদল স্বর্গচ্যুত? মহাদেবের বরেই ত এরূপ ঘটিয়াছে। মহাদেব তাহাতে টলিলেন না; তিনি নানা যুক্তি তর্ক দৃষ্টান্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন ঃ—

"বংশগত বিলাসিতা, বংশগত অহঙ্কার,
বংশগত বলগর্ব্বে দেবতার অধঃপাত;
কর্ম্মবীর দেবকুল বাক্যবীর এবে হায়,
করিয়া কর্ম্মের পূজা শুম্ভ দৈত্য বিশ্ব-নাথ।"

দেবদল বৃহস্পতির পশ্চাতে পশ্চাতে শক্তি ভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রার প্রথমে তাঁহারা অসুরবলের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য শুম্ভপুরে আসিয়া দেখিলেন, অসুরের নূতন কোন সম্পৎ নাই—যাহা দেবতার সম্পৎ ছিল তাহাই অসুরের হাতে পড়িয়া দেবদল দলন করিতেছে। কেবল নূতনের মধ্যে ছিল প্রতারণা, প্রতিযুদ্ধে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে! সে সকল কথা স্মরণ করিয়া দেবদল মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু দেবদত্ত শক্তিই যে অসুর শক্তির মূল—যাহারা দিয়াছিল তাহারা কাড়িয়া লইতে পারিলে অসুরের নিজস্ব বলিবার যে বেশী কিছু থাকিবে না, তাহাও দেবদল বুঝিয়া লইলেন। তখন স্বর্গোদ্ধারে কৃতসংকল্প দেবদল মন্ত্রণাস্থানে সাব্যস্ত করিলেন ঃ—

"অগ্রগামী বৃহস্পতি, সঙ্গে দেবচয়,
আসে পাশে দৃষ্টি নাই, চলিছে সকল।"

কিন্তু চলিতে চলিতে দেবদলের মনে বিকার উপস্থিত হইল। কারণ শক্তিলাভে বহুবিঘ্ন। প্রথমেই বৃহস্পতির উপর সন্দেহ আসিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিল। দেববল ভাবিল,—

"কেন বৃথা শুনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাণী,
ছুটিয়াছি মেষপ্রায় তাহার পশ্চাতে?"

দেববল বুঝিল, বৃহস্পতির ইহাতে নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে। সে স্বার্থ কি? অসুর ব্রত নিয়মের ধার ধারে না, সুতরাং অসুর শাসনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অন্ন উঠিয়াছে। তাই বৃহস্পতি অন্ন সংস্থানের আশায় দেবদলকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতেছেন! পতিত জাতিকে উপদেশ দান করা কত কঠিন, তাহা বৃহস্পতি বুঝিলেন। তাহারা সকল কাজের মূলেই কোন না কোন নীচ অভিসন্ধি করিয়া লয়; নীচ হৃদয়ে উচ্চ নিঃস্বার্থ উপদেশ ধারণ করিতে পারে না। এইরূপে দেবদল কখন সন্দেহে, কখন বিতর্কে, কখন অবসাদে আন্দোলিত হইয়া বৃহস্পতির পরিচালনা কৌশলে দেব-দল অবশেষে কায়-ক্লেশে শক্তিভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে অসুররাজ প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে গিয়া শাসন কৌশলের মূলতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন; বাহুবলকেই পরমবল মনে করিয়া ন্যায়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। বিচার উঠিয়া গিয়াছে; তাহার স্থলে দৈত্যস্বার্থ দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান। দৈত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অভি-

যুক্ত অব্যাহতি পায়;—অভিযোক্তা কারাগারে প্রেরিত হয়। দেবতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইবা মাত্রই দণ্ড। কারণ, রাজাজ্ঞা এই-রূপ;—

"দানবের অভিযোগে না করিলে দণ্ডদান,
চিরদিন খাটিলেও হইবে না পদোন্নতি।"

সুতরাং বিচারকগণ পদোন্নতির আশায় পদমর্য্যাদা পদদলিত করি-তেছেন। ন্যায়ধর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে।

দেবাসুরের সংগ্রামের সকল কথাই অলৌকিক; কেননা তখনও লোক সৃষ্টি হয় নাই;—কেবল বিশ্ব রচনার প্রথম প্রভাত! তখনকার কোন কথাই মানবকল্পনায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে পারে না; সুতরাং দেবীযুদ্ধের সুখ দুঃখ জয় পরাজয় পার্থিব যুদ্ধের ন্যায় মানব হৃদয়ে উৎ-কণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা, অবসাদ বা উল্লাসের আবেগ আনিয়া দিতে পারে না। সে যেন কাহার কথা, সে যেন কোন্ স্বপ্নলোক-কাহিনী, সে যেন কোন্ অজ্ঞাতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভব ব্যাপার! তাহার সহিত মানব হৃদয়ের ভাব সামঞ্জস্য নাই; কেবল রচনা কৌশলে ঘনসন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ সমাসপুষ্ট সুললিত পদাবলী কর্ণকুহরে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের ক্ষণিক আনন্দ কোলা-হল ঘনীভূত করে;—পুঁথি বন্ধ করিবার পর আর তাহার প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কবি সেই পুরাতন পৌরাণিক কাহিনীকে লৌকিক পরিচ্ছদে সমাবৃত করিয়া মানুষের সুখ দুঃখের নিদানভূত লৌকিক ঘটনাও বিচিত্র চিত্রে সুশোভিত করিয়া কাব্য রচনা করায় মনে হইতেছে—এ বুঝি মানব সমাজের কথা; এ বুঝি প্রতিদিনের প্রত্যক্ষীকৃত প্রকাশ্য ঘটনাবলীর অস্ফুট চিত্রপট। এই গুণে দেবীযুদ্ধ লৌকিক উৎকণ্ঠা, লৌকিক আবেগে পাঠকচিত্ত বিমুগ্ধ করে। সেকালের কথা যেন একালের কথা বলিয়া—ইতিহাসের ঘটনা বলিয়া—নিতান্ত পরিচিত বন্ধুর ন্যায় হৃদয়দ্বারে আঘাত করে! আন্তরিকতা এত অধিক, মনে হয় বুঝি ইহার দেবাসুর সেকালের দেবাসুর নহে। অসুররাজ যখন রাজনীতির পন্থা-নির্দ্দেশের জন্য ঘোষণা করেন;—

"মন্ত্রিগণ, বীরগণ, সৈনিক, শাসকগণ,
শুন বিচারকগণ, ব'লে রাখি এক কথা;
রাজ্যের এ গুপ্তমন্ত্র মনে রাখ সাবধানে,
কিন্তু ইহা প্রকাশিয়া বলিওনা যথা তথা।—"

তখন সে গুপ্তমন্ত্র শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠা যেন প্রবল হইয়া উঠে; তাহা কাব্য-কৌতূহল অপেক্ষা উচ্চ গ্রামে আরোহণ করে;—অসুর-রাজনীতি কিরূপ তাহা জানিবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

"বহুদিনে, বহুকষ্টে, সুকঠোর তপস্যায়,
স্থাপিয়া দানব রাজা হয়েছি ত্রিলোকপতি;
এ রাজত্ব, এ প্রভুত্ব অব্যাহত রহে যাহে,
সে বিষয়ে চিরদিন সকলে রাখিবে মতি।"

এই রাজাজ্ঞা কে না শিরোধার্য্য করিবে? সে যাহা লাভ করিয়াছে, সে তাহা অব্যাহতভাবে চিরদিন ভোগ করিতে না পারিলে, ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে না; সুতরাং এই নীতি মানব নীতির মতই মানব হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কিন্তু পরক্ষণেই অসুর-প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার কার্য্যপদ্ধতি অবগত হইয়া হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া পড়ে!

"বন্ধ করি আট ঘাট, পাতিয়া কৌশলজাল,
জিতজাতি সমুদায় মুষ্টির ভিতরে রাখ;
জাতীয় জীবন যেন কোথাও না স্ফূর্ত্তি পায়,
বিজিতের প্রাণনাড়ী পলে পলে টিপে দেখ।"

ইহা যে অসুরনীতি, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই নীতি সাম্রাজ্য শাসনে কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, তাহার উপরেই সুখ দুঃখ নির্ভর করে। বিজেতার শাসন সুকোমল হইবার পক্ষে বাধা নাই;—তাহা বিজাতির শাসন অপেক্ষাও ভাল হইতে পারে। অসুররাজ সে আশঙ্কা নিবারণ করিয়া যখন ধীর গভীর নিনাদে নীতিব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়া মহাভাষ্য রচনা করিয়া বলিতেছেন;—

"সন্দংশে টানিয়া মাংস পরীক্ষিবে যার তার,
দেখিবে, পাইয়া ব্যথা করে কিনা চীৎকার;
নীরবে সহিয়া টান যে করিবে ধন্যবাদ,
সে বটে আদর্শ প্রজা, জীবন রাখিবে তার;
"কিন্তু সন্দংশের টানে 'আহা! উহু!' যে করিবে,
বুঝিবে জাতীয় তেজ এখনও রয়েছে তার;
দানবীয় নীতিচক্রে ফেলিয়া পিশিবে তারে
রহেনা শকতি যেন মুখ ফুটি কাঁদিবার।
* * * *
"যখন তখন সবে ধর্ম্মের দোহাই দিবে,
করিয়া ধর্ম্মের ভাণ প্রতারিবে প্রজাকুল,
যেমন করিয়া পার রাখ সদা পদানত
জিতজাতি,—শাসনের নীতিমন্ত্র এই মূল!"

তখন মানব হৃদয়ে এক অব্যক্ত ব্যথা জাগিয়া উঠে; মনে হয় এরূপ নীতি বুঝি অসুরের পক্ষেও ঘৃণাজনক! তখন ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। মানব সমাজ কোথায় কোন্ দেশে কবে এইরূপ অসুরনীতি অব-লম্বন করিয়া কি ফললাভ করিয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ইহাই এ গ্রন্থের গুণ, ইহাই আবার এ গ্রন্থের মুখ্য দোষ! অবাস্তবকে বাস্তবের মত জাগাইয়া তুলিয়া কাব্যরচনা করিতে পারিলে, তাহাকে অবশ্যই গুণ বলিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। ভ্রমর মধু সঞ্চয়ে ভবিষ্যতের জঠরজ্বালা নিবারণের উদ্দেশ্যেই প্রভাত হইতে না হইতে পদ্মবনে ছুটিয়া যায়; কোরকবিকাশে বিলম্ব থাকিলে, ভোঁ ভোঁ করিয়া অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করে; বিকশিত শতদলের সন্ধান পাইবামাত্র আনন্দে অধীর হইয়া ভোঁ-ও-ও করিয়া একেবারে পদ্মগর্ভশয্যায় শায়িত হইয়া পড়ে। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বড় অধিক নহে; ক্ষুধার্ত্তের অন্ন সঞ্চয় চেষ্টা কতই সুন্দর হইবে? কিন্তু ইহার মধ্যে কবিকল্পনা নায়ক নায়িকার ভাব বাস্তব ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করিবার সময়েই কাব্য-সৌন্দর্য্য উপস্থিত হইয়া উঠে; তখন আমরা কবিকল্পনাকে শতবার সাবাসি না দিয়া থাকিতে পারি না! ইহাই আমাদের স্বভাব! স্বভাব-গুণে ইহাকে আমরা কাব্যগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। যাহা নয় তাহাকে তাহাই করাই ত বাহাদুরী—সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা—কাব্যশক্তির সুব্যক্ত প্রমাণ! দেবীযুদ্ধের কবি সেরূপ প্রমাণ প্রয়োগে ত্রুটি করেন নাই; কল্পনা কৌশলে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অসুর কাহিনীকে যেন চিরপরিচিত মানব-কাহিনীর ন্যায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার কাব্যের মুখ্যদোষ। এই দোষে দেবাসুরের যুদ্ধ লৌকিক বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেবাসুরের যুদ্ধের অলৌকিকত্ব হারাইয়াছে। চণ্ডীনিহিত দেবী-যুদ্ধ কাহিনী পঠিত হইবার সময়ে লোক তৎপ্রতি মনঃসংযোগ করে না; এ "দেবীযুদ্ধ" পঠিত হইবার সময়ে লোক উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে; কিন্তু ইহা দেবীযুদ্ধ, না আর কিছু তাহা বুঝিতে একটু বিলম্ব ঘটিবে। লিখি-লাম রামায়ণ, লোকে তন্মধ্যে রাম-সীতা খুঁজিয়া পাইল না;—এরূপ হইলে তাহাকে দোষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। লিখিলাম চণ্ডী,—লোকে তাহার নাম শুনিয়া সভয়ে সশঙ্কোচে দূরে সরিয়া গেল না; আরও কাছে ঘনাইয়া বসিয়া শ্লোকের পর শ্লোক শুনিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, গ্রন্থ শেষ হইয়া গেলে কহিল 'তারপর'—এরূপ লেখাও দোষের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই দোষের জন্যই "দেবী-যুদ্ধ" সুখপাঠ্য হইয়াছে; নচেৎ সেই চিরপুরাতন চণ্ডীর চণ্ডরবে কেহ কর্ণপাত করিত না।

কবি স্বদেশহিতৈষী স্বধর্ম্মানুরক্ত ভক্ত সাধক। স্তোত্র পাঠ করিবার

সময়ে ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়; দেবীদত্ত মন্ত্র পাঠের সময়ে স্বদেশ-হিতৈষীর পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কবিকল্পিত মন্ত্রের নাম—ত্রৈলোক্য বিজয় মন্ত্র। এই মন্ত্রের সাধনায় দেবদল কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কবি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দোষেই ভারতবর্ষের অবনতি হইয়াছে বলিয়া আজকাল যেমন রব উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকেও দেবদল সেইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। কবি এই তিরস্কার কল্পনা করিয়া প্রসঙ্গ-ক্রমে ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতে একটি সুতীব্র প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে যে ব্রাহ্মণচিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা যেন পরশুরামকে স্মরণ করাইয়া দেয়;—

"ব্রাহ্মণ প্রস্তুত সদা করিতে সাধন
জগতের কল্যাণার্থ যে কোন ব্যাপার।
শুধু নহে মন্ত্র তন্ত্র,—জগতের হিতে
যাহা কিছু প্রয়োজন, তাই কার্য্যতার।
"অস্থিময় এই বাহু জানে অস্ত্র-খেলা;
সময়-তাণ্ডবে পদ অনভিজ্ঞ নয়;
এ ললাট লীলা-ভূমি কঠোর চিন্তায়;
বিশ্ব-হিত-ধ্যানমগ্ন সদা এ হৃদয়।
প্রয়োজন উপস্থিত হইবে যখন,
কোষাকোষী ছাড়ি বাহু ধরিবে কৃপাণ;
ক্ষুদ্র পিপীলিকাবধে আজ সে কাতর,
অনায়াসে শত্রুরক্তে করিবে সে স্নান।
যাহাতে বিশ্বের হিত তাহাই মঙ্গল;
ব্রাহ্মণের তপোব্রত অন্য কিছু নয়;
মঙ্গলের অন্তরায় করিতে সংহার,
ব্রাহ্মণ করুণা-হীন, নির্ভীক-হৃদয়।"

দেবী যুদ্ধের ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকে কিন্তু কৃপাণ ধারণ করিতে হয় নাই; তাঁহার মুখের কথাই দেবদলের রাজ্যোদ্ধারে সহায় হইয়াছিল। সুতরাং সুরগুরুর সগর্ব্ব শিখাসঞ্চালন দেখিতে নিতান্ত মন্দ হয় নাই!*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

খেদা।

(১)

"খেদা" শব্দটী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত নহেন। ক্ষুদ্র-শক্তি মানব মদমত্ত ভীষণকায় দুর্দ্ধর্ষ বন্য হস্তিবৃন্দকে কিরূপে স্ববশে আনয়ন করেন, তাহাও বোধ করি সকলে জানেন না। বহুকাল যাবৎ আমি সমুৎসুক-চিত্তে এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি; বহু যত্ন ও চেষ্টায় সম্প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। এক বৎসরের ঘটনা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এইস্থলে বিবৃত করিতেছি। আমি যে বৎসরের কথা বলিতেছি, এই বৎসর "হাতী ধরা কাজ" চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে সম্পন্ন হইবে—স্থিরীকৃত হয়। হস্তিযূথ নিবিড় অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকে এবং উহাদিগকে ধরিতে হইলে যে শ্বাপদ-সমাকুল গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতে হয়, ইহা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। মানব সমাগম-শূন্য অরণ্যানী মধ্যে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা ও ধৃত বন্য হস্তী সমূহকে স্থানান্তরিত করা কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তাহাও সহজেই অনুমেয়। মানুষের গমনাগমন-চিহ্ন বিরহিত হিংস্রজন্তুপূর্ণ দুর্গম অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করাও প্রাণান্তকর কার্য্য। প্রতি পাদবিক্ষেপে বাঁশ, গাছ, লতাগুল্ম কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল; স্থানে স্থানে অপরিসর গিরিসঙ্কটে বৃহৎকায় পোষা হস্তীদল নিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব দেখিয়া, বহু ক্রোশ পথ ঘুরিয়া, গন্তব্য পথে পৌঁছিতে হইয়াছিল। এই প্রদেশের পাহাড়গুলি বেশী উঁচু নহে। (সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটী মাত্র ১৫০০ ফুট উচ্চ)। তথাপি এই শৈলশ্রেণী সরলভাবে সমুন্নত বলিয়া সম্পূর্ণ দুরারোহ। এই অনুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় কখনও পর্ব্বত গাত্র কর্ত্তন করিয়া সোপানাবলী প্রস্তুত করিতে, কখনও বা সমতল করিয়া পোষা হস্তিযূথ চালাইতে হইয়াছিল। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এইরূপ লোক-ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করিলেও কিন্তু "হস্তী ধরা" ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভের কোনই নিশ্চয়তা নাই; কারণ এ দেশীয় হাতীর দল মানুষের আগমন কোনরূপে বুঝিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ পলাইয়া যায়। ভীত হস্তিযূথ এক রাত্রে ৪০।৫০ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে; এমন কি, পূর্ব্বদিকে চীনদেশ, দক্ষিণদিকে ষ্ট্রেইটস্ (straights) পূর্ব্বোত্তর কোণে কাছাড় গারো হিল, অধিক কি আসামের পর্ব্বত শ্রেণীতে পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। এই প্রদেশের হস্তী-গুলি কখনও মনুষ্যমুখ দেখিতে না পাওয়ায়ই গারো বা অন্যান্য স্থানের হস্তী অপেক্ষা অধিকতর চঞ্চল ও দুর্দ্ধর্ষ। আমরা যে স্থানের কথা অদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশ রাস্তাই জন-প্রাণীর যাতায়াতের চিহ্নশূন্য এবং লোকপ্রপিতামহ ব্রহ্মার আমলের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রতি পদে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া চলিতে হইয়াছিল; মাঝে মাঝে বংশ কণ্টক সমাকীর্ণ লতাগুল্ম সমাচ্ছন্ন বনভূমি একেবারে অভেদ্য হওয়াতে

* দেবীযুদ্ধ রচয়িতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের এক খানি প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।—প্রঃ সঃ

স্রোত-সলিলা গিরিতটিনীর প্রতিকূল স্রোতে নামিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়া এই স্থানের পাহাড়গুলি নীচু হওয়াতে কোনরূপ সাঙ্কেতিক সংবাদ প্রেরণ করাও অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কি উপায়ে "হাতী ধরা" কাজ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণ সংক্ষিপ্তভাবে বলিতেছি।

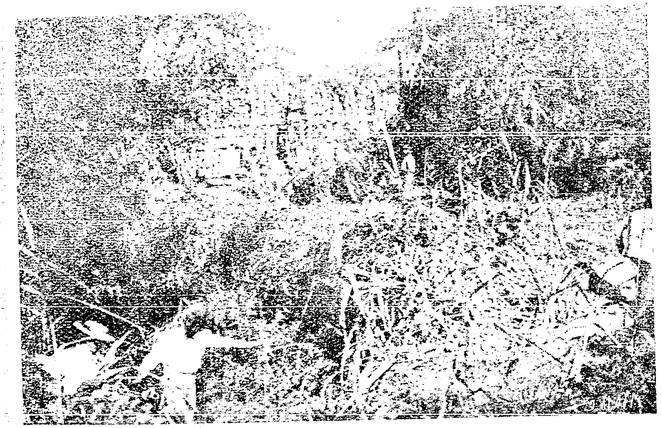

খেদার প্রথম দৃশ্য।

সমরোন্মুখ সৈন্যের অগ্রগামী "লাইট কেভেলরির" (light cavalry) ন্যায় পদাঙ্কানুসরণকারীদল (trackers) সর্ব্বাগ্রে গমন করে। ইহাদের এক দিনের রাস্তার পশ্চাতে প্রধান শীকারীর দল ও ফিল্ড হাসপাতাল (field Hospital) থাকে। তাহাদের আবার দিনমান রাস্তার পশ্চাতে পোষা হাতী ও খাদ্য দ্রব্যাদির থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক শীকারীর সঙ্গে ৫ দিনের খাদ্য দ্রব্য থাকিবার নিয়ম। এই ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইয়া ছিল না। সাঙ্কেতিক পতাকা-ধারিণী(signallers)দের দ্বারা বিভিন্ন দলের মধ্যে সংবাদাদী প্রেরণ করা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারাই প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। পদাঙ্কানুসরণকারী দল বন্য হস্তিযূথের অনুসন্ধান প্রাপ্তিমাত্র এই শুভ সংবাদ পশ্চাদ্বর্ত্তী শিকারী দলকে সঙ্কেত দ্বারা জ্ঞাপন করে। তাহারাও যেই জানিতে পারে যে জঙ্গলী হাতীর দল এক স্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে, অমনি উহারা যথা সত্বর সাঙ্কেতিক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ভাবে প্রধান শীকারীদল সঙ্কেতানুরূপ হস্তিযূথের নিকটবর্ত্তী হইলেই এই হস্তিদল সম্বন্ধে অনুসন্ধান কারীদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইল,—বিবেচিত হইবে। আমরা যেই বৎসরের কথা বলিতেছি, এই বৎসর অনুসন্ধানকারী দল উপর্য্যুপরি দুই তিন দিবস বিফলমনোরথ হইয়া বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধানের পর একটী প্রকাণ্ড যূথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব ও প্রধান জমাদার শীকারী আনোয়ার আলি প্রায় দুই কি আড়াই হাজার লোক সহ তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে অন্যান্য লোকজন "কুন্‌কী" হাতী সহ যথাসম্ভব দ্রুত গমনে তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল। (এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, খেদা কার্য্যের জন্য শিক্ষিত পোষা হাতীকে "কুন্‌কী" হাতী বলে।) তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখিল যে প্রায় চারি পাঁচশত হাতীর একটী প্রকাণ্ড বেষ্টন করা হইয়াছে। হস্তিযূথ বেষ্টন করিবারও একটা রীতি আছে। প্রদীপের পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে তাহাও বলা যাইতেছে।

শিক্ষিত কার্য্যপটু শিকারী দল হস্তিযূথকে এইরূপে কৌশলক্রমে চালনা করে যে, যে স্থলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও জল আছে,—সেই স্থানে তাহারা উপস্থিত হয়। বেষ্টন ঘেরাও করিবার পক্ষে ইহা অতি গুরুতর বিবেচ্য বিষয়, কারণ, হস্তিদলকে যত দিন এই স্থানে আবদ্ধ রাখা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহার মধ্যেই যদি জল ও খাদ্যের অভাব হয়, তবে নিশ্চয়ই হস্তিযূথ বেষ্টন ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যাইবে। সুতরাং হস্তিযূথ উপযুক্ত স্থানে উপনীত হওয়া মাত্রই ক্ষিপ্রকারী শিকারী দল বেষ্টনবৃত্ত সঙ্কুচিত করিতে থাকে, এবং বিভিন্নদল যেমন নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, অমনি প্রত্যেক শিকারী নিজের ও পশ্চাদ্বর্ত্তী মানুষের মধ্যস্থিত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলে; এই প্রকারে যে স্থলে হস্তিযূথ থাকে তাহার চতুর্দ্দিকে বেশ প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত হয়। এইরূপে বেষ্টন কার্য্য (ঘের) সম্পূর্ণ সম্পাদিত হইলে এই পথের স্থানে স্থানে লোক রাখা হয়। তাহাদের জন্য ক্ষুদ্র এক এক খানা ঘাসের ঘর প্রস্তুত করে। এই ঘরের সম্মুখভাগে রাত্রিকালে অগ্নি জালিয়া রাখে; কারণ হাতী আগুনকে অত্যন্ত ভয় করে। রাত্রিতে দুই তিনজন ও দিবাভাগে একজন মাত্র প্রহরী ঐ স্থানে পাহারা দেয়, উহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটী পুরাতন বন্দুক এবং

রেটল্ থাকে। হাতী বেষ্টনবৃত্তের নিকটবর্ত্তী হইলেই প্রত্যেকে তুমুল শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিতে থাকে। এইরূপ অগ্নি ইত্যাদি থাকা সত্বেও মাঝে মাঝে হাতীর দল বেষ্টন ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়; কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। বেষ্টন বৃত্তের পরিধি কখনও কখনও ১২। ১৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

খেদা প্রস্তুতকারী কুলীগণ।

ড্রাইবের (drive) এর সময় কৌশল ক্রমে হস্তী চালনা কি সুবৃহৎ ব্যাপার, তাহা ইহা হইতেই উপলব্ধি হয় না কি? আমরা যে বেষ্টনের কথা বলিতেছিলাম, এই বেষ্টনাবদ্ধ মদমত্ত হস্তিযূথ লতা গুল্মাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃক্ষ ও চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি একেবারে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া, বেষ্টন ভাঙ্গিয়া পলাইয়া যায়। কিছু দিন পর্য্যন্ত এই বন ভূমির সর্ব্বস্থলেই—হাতীর গভীর পদচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, ঘাস ও জলের একান্ত অভাবই হস্তিযূথের পলায়নের কারণ। এই ঘটনায় বহুদর্শী কার্য্যাধ্যক্ষ পশ্চাৎপদ না হইয়া বরং অধিকতর উৎসাহে অনুসন্ধানকারী দলের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ১৫০ মাইল গিয়াছিলেন। অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কার্য্যাধ্যক্ষ এই দলের সাক্ষাৎ পাইলেন। সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন, এখন এই দলে ১০০ কি ১৫০ হাতী বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পরিশেষে জানা গিয়াছিল যে, ঐ দলে ২০৩টি হাতী ছিল। এবার সকলেই বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত হাতীর দল চালনা করিতে লাগিলেন। উহাদিগের কার্য্যকুশলতায় হস্তিদল অবিলম্বেই এক উপযুক্ত স্থানে যাইয়া বেষ্টনে আবদ্ধ হইল। এইবারের বেষ্টনবৃত্তটী (ঘের) ৭০ বর্গ মাইল হইয়াছিল। এইরূপে বেষ্টনকার্য্য সুসমাপিত হইলে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ এই বৃত্তের মধ্যে কোথায় "খেদা" প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিলেন।

"খেদা" শব্দের অর্থ খোঁয়াড় বা ফাঁড়ী। ৮ হইতে ১০ ইঞ্চি ব্যাসের খুঁটী দ্বারা বৃত্তাকারে ইহা নির্ম্মাণ করিতে হয়। প্রত্যেক খুঁটীর ৫ ফুট কিম্বা ততোধিক অংশ মৃত্তিকার উপর ও ১২। ১৪ ফুট উঁচু থাকিবে। খোয়াড়ের ভিতর ও বাহির এইরূপ স্থূল স্থূল সারবান্ বৃক্ষদ্বারা বেড়ার মত শক্ত দড়ি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খেদার কাজ এইরূপে সম্পন্ন করাই নিতান্ত আবশ্যক, কারণ বলশালী আরণ্য হস্তী সমূহ খেদার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া অত্যন্ত বল প্রকাশ করিয়া থাকে। খেদার ফটক (Gate) প্রস্তুত করা বিশেষ নিপুণতা-সাপেক্ষ। আমরা যেটীর কথা বলিতেছি, তাহা বহুদর্শী কার্য্যাধ্যক্ষের আবিষ্কৃত; এবং অলৌকিক কৌশলে পরিপূর্ণ। উহা এইরূপে গঠিত হইয়াছিল যে, সর্ব্বশেষ হাতীটি খেদার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই গেট্ পড়িয়া যাইত। সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য এই গেটটি শক্ত দড়ি দ্বারা ঝুলাইয়া রাখা হয়, এবং সঙ্কেতধ্বনি হওয়া মাত্র লোকেরা

খেদা নির্ম্মাণ—১ম দৃশ্য।

তীক্ষ্ণধার কুঠারী দ্বারা এই দড়ি কাটিয়া দিয়া থাকে। দড়ির যে অংশ কাটিতে হইবে, তাহা একখণ্ড কাষ্ঠ ফলকের উপর এরূপ ভাবে সংস্থিত থাকে, যেন এক আঘাতেই দড়ি কাটিয়া যায়। অসাধারণ বলশালী ৫০ জন পাহাড়ী তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া গেটটি উপরে উঠাইয়া ছিল, ইহাতেই সম্ভবতঃ সে গেটটি কিরূপ দৃঢ় ও ভারবিশিষ্ট ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ফটকের নিকটস্থ খেদার অংশ খুব শক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কারণ, এই স্থানটি এইরূপ সঙ্কীর্ণভাবে গঠিত যে, দুইটি হাতী পাশাপাশি কোনরূপে যাইতে পারে, সুতরাং অন্যান্য হাতীগুলি অত্যন্ত ভীত ও উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর ভিড় করে। যে খেদার বিষয় এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে, তাহা ৪৯০০ বর্গফুট্ পরিমাণ হইবে। ২০০ শত হাতীর পক্ষে এই স্থানটুকু বেশী বলিয়া বোধ না হইতে পারে; কিন্তু একটু অপরিসর স্থান রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ বিস্তৃত স্থানে বেগ দেওয়ার (speed নেওয়ার) অবকাশ পাইলে হাতীরদল আক্রমণের (charge করিবার) সুবিধা লাভ করিতে পারে।

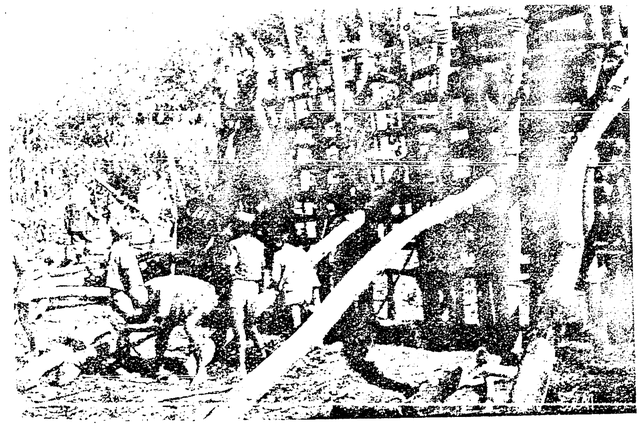

খেদা নির্ম্মাণ—২য় দৃশ্য।

খেদা নির্ম্মাণের সময় সমস্ত কার্য্য অতি নীরবে সাবধানতার সহিত করিতে হয়, কারণ হাতীর ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি প্রত্যন্ত প্রখর। ঘূণাক্ষরে একটু টের পাইলেই শীকারীদের সমস্ত কৌশল-জাল ছিন্ন করিয়া উহারা পলায়ন করিয়া থাকে। খেদা ভাগে ভাগে প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক ভাগের জন্য বহু লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে। কতক লোক বহুদূরে খেদার গেট্ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিন চারি হাজার সারবান্ বৃক্ষ এক মাইল দূরে খেদা কার্য্যের জন্য নীত হইয়া থাকে। গারো পাহাড়ের বা অন্যান্য স্থানের বলবান্ মজুরেরা কাঁধে করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নেয়, এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৃক্ষগুলি কাটিয়া খেদাস্থলে আনয়ন করিয়া থাকে। কুলী মজুরদের কার্য্য-তৎপরতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এই সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ খেদাটি ১২।১৩ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যেরূপ দ্রুত ভাবে ও কৌশল ক্রমে এই সকল মোটা ও ভারী গাছগুলি যথাস্থানে নিঃশব্দে আনীত ও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর কার্য্য। খেদার কার্য্য সমাপ্ত হইলেই ফানেল (funnel) এর কার্য্য আরব্ধ হয়। গেট হইতে আরম্ভ করিয়া ফানেল (funnel) টি আবশ্যক মত লম্বা করিতে হয়। ইহা যে স্থলে খেদার সহিত মিলিত হয়, সে স্থানের ফানেলও (funnel) গেটের ন্যায়ই সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাহিরের মুখের দিকে ক্রমশঃই অধিকতর প্রশস্তরূপে গঠিত হয়। যে ফানেল (funnel) টির বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইতেছে, তাহা আধ মাইল লম্বা ও মুখের নিকট ৫০ গজ প্রশস্ত ছিল। ফানেল (funnel) টিও খেদার মত খুঁটি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, কিন্তু ফটকের নিকটবর্ত্তী অংশ ছাড়া অন্যান্য ভাগ খেদার মত শক্ত ও মজবুত নহে। খেদা ও ফানেল (funnel) এর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে সমস্ত অংশই জঙ্গলে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। খেদার মধ্যস্থিত জঙ্গল রাশি একেবারেই অকর্ত্তিত থাকে। হাতীর দলকে ভুলাইবার জন্যই এইরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক; তাহারা যখন জঙ্গলবেষ্টিত ফানেল (funnel) দিয়া দৌড়িয়া যায়, তখন যেন মনে করে যে তাহারা কোনও রূপ ফাঁদে না পড়িয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছে। যে খেদা বর্ণিত হইতেছে, উহা জঙ্গল দিয়া এরূপ সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল যে, ফানেল (funnel) এর মধ্যে দাঁড়াইলে উহা নিবিড় বন পরিশোভিত "নিকুঞ্জকানন" (wood land glade) বলিয়াই প্রতীত হইত। একগাছি দড়ি কিম্বা

একটীও খুঁটি নয়ন পথে পতিত হয় নাই। এখন হস্তিবৃন্দের প্রকৃত উত্তেজনা ও বিপদাশঙ্কা আরব্ধ হইল। প্রত্যেক ড্রাইভ পরস্পর বিভিন্ন, তাহার যথাযথ বিবরণ বারান্তরে বর্ণনা করিব, বাসনা রহিল।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

বসন্ত।

কে তুমি লো বিধুমুখি, এ বন বিজনে বসি।
আলু থালু কলেবর, আনত আনন-শশী,
নয়ন-কমল-স্মিতে, মাধুরী উথলি উঠে,
চারি দিকে থরে থরে অমল কুসুম ফুটে;
ঘনকৃষ্ণ বিকুঞ্চিত অদমিত কেশ-ভারে—
বিজড়িত ফুল-দাম চির-পীত-লতা-হারে।
একাকিনী, রূপরাণি, কেন এ বিজন-বনে!
কি দেখিছ একমনে অনিমিষ-বিলোচনে!
দারুণ-হিমাণী-শেষে এ কুসুম-উপবনে
বসন্তের রাণী রূপে এসেছ কি বরাননে?
তোমার পরশে তাই ফুল-হীন বনতল—
সোহাগে সাজিল দেখ ফুল-জালে অবিরল;
সুরভিত সুকোমল তোমার কোমল-শ্বাসে
মলয় অনিল বয় নব চুত ফুল বাসে;
আনন্দে কোকিল কূজে, গুঞ্জরিয়া অলি দল—
কি মধুরে মুখরিত করিয়াছে বনতল।
এ আনন্দ-দিনে তবে বদন মলিন করি,
নমিত নলিন আঁখি কি দেখিছ রূপেস্বরি!
কোমল কমল-করে গতজীব বিহঙ্গমে,
উরসে চাপিয়া কেন রাখিয়াছ মনোরমে?
আজি তুমি সুধাময় কর-পদ্ম-পরশনে
জাগাইলে সুধাশ্বাসে এ অখিল অচেতন;
বল, দেবি, কেন তবে অই ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
জগতে রহিবে আজি প্রাণ হীন অচেতন!
চপল হরিনাপাঙ্গে অচপলে এক মনে
তাই কি গো ভাবিতেছ তুমি, ইন্দুনিভাননে!
মৃত সঞ্জীবনী ময়ী তুমি দেবী অমরার,
নিশ্বাসে নয়নে তব ঝরে সুধা অনিবার;
আজি অহ গত-প্রাণ অচেতন বিহঙ্গমে
পারিবে কি বাঁচাইতে সেই সুধা-পরশনে?

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।

কঙ্কণ চোর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

সন্ন্যাসিনী অটল অচল। তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। রজনীর একটী পূর্ণ যাম সময়ের মধ্যে নানাবিধ তোষামোদ ভয় প্রদর্শন করিয়াও প্রাড়বিবাক কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেই গভীররাত্রে আবার গৃহে ফিরিলেন।

রজনীর অন্ধকার, শ্যামল প্রকৃতির শ্যামলসুন্দর সৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়াছে। প্রাড়বিবাক রাজপথ অতিবাহিত করিতে করিতে দেখিলেন—সে দিনের অন্ধকার যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা প্রকাশ করিতেছে। এত কালো, গভীর মিশ্রমেশে অন্ধকার, তিনি যেন আর কখনও দেখেন নাই। আকাশে তারা জ্বলিতেছে। চাঁদ নাই, অন্ধকাররাশিই আধিপত্য করিতেছে। কেবল দূরে অদূরে—অতিদূরে, অনতিদূরে—ক্ষণে জাজ্জ্বল্যমান, ক্ষণে নিষ্প্রভ, ক্ষণে জ্যোতির্ম্ময়, ক্ষণে জ্যোতিহীন তারকারাজি। এই নক্ষত্র-কিরীটিণী যামিনীর নৈশ সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাড়বিবাক আগে কতই মোহিত হইতেন। হায়! আজ আর তাঁহার সে মোহ নাই। সে নৈশ সৌন্দর্য্য ভোগপ্রবৃত্তি নাই।

প্রাণপণে পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৌনাবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন সহসা অন্ধকারের মধ্য হইতে একজন দীর্ঘকায় লোক বাহির হইয়া প্রাড়বিবাকের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। প্রাড়বিবাক চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কে তুমি?" সেই ছদ্মবেশী আগন্তুক বলিল—"আপনি এই বিস্তৃত মগধ রাজ্যের প্রাড়বিবাক। মহাকালের মন্দির হইতে ফিরিতেছেন। আপনাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছে। মনের শান্তি গিয়াছে। রাণীর মহল হইতে কি চুরি গিয়াছে—তাই আপনারা বড় ব্যতিব্যস্ত।"

প্রাড়বিবাক চমকিত হইলেন। তাঁহার বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকারের আবরণে শরীর ঢাকিয়া, প্রকাশ্য

রাজপথে, একজন অপরিচিত আগন্তুক তাহার মনের কথা আদ্যোপান্ত বলিয়া যাইতেছে! প্রাড়বিবাক ভাবিলেন—"নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি কোন মহাপুরুষ। অন্তরের কথা জানিবার ক্ষমতা আছে।"

প্রাড়বিবাক সেই অন্ধকারে অপরিচিতের পদযুগল ধরিতে গেলেন। আগন্তুক সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"অতটার প্রয়োজন নাই। আমি মহাপুরুষ নাহি, বা অদ্বিতীয় লোক নই। তবে আপনার একটু উপকার করিব। আপনি নিজের প্রাণের চিন্তায় বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন—না? আমি আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।"

প্রাড়বিবাক আরও চমকিয়া গেলেন। এ সব কি? চারি দিকেই ভীষণ প্রহেলিকা! পদে পদেই অদ্ভুত ঘটনার আবির্ভাব! তিনি কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"আমি এই রাজ্যের প্রাড়বিবাক। ধর্ম্মাধিকারের প্রধান কর্ম্মচারী। আমার অঙ্গুলি হেলনে এত বড় মগধ সাম্রাজ্য চলিতেছে। আমি কাতর মুখে আপনার পায়ে ধরিতেছি—যদি কিছু জানেন ত বলিয়া দিন।"

সেই ছদ্মবেশী আগন্তুক বলিলেন—"মহাশয়! তাহা বলিবার জন্যই এই গভীর রাত্রে পথিমধ্যে আপনাকে ধরিয়াছি। আপনারা চোর ধরিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। চেষ্টা করিয়াও চোর ধরিতে পারিবেন না। চোর প্রকাশ্য রাজসভার কাল উপস্থিত হইবে।"

সেই এক কথা!! চোর যা বলিয়া পত্র দিয়াছে—সে কথাও যা, আর এই নিশাচারী, অদ্ভুত আগন্তুক যা বলিল এও তাই! প্রাড়বিবাক মহাসমস্যায় পড়িলেন। মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিলেন।

মুখ তুলিয়া দেখিলেন—সে আগন্তুক মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছে। হায় ভাগ্য!

(৩)

রাজা প্রাণের জ্বালায় রাজবাটী ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষে তখন সেই উষালোকে প্রজ্বলিত, প্রদীপ্ত কিরণরাজিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন অন্ধকারময়। সমগ্র বিশ্বকেন্দ্র যেন মহাবেগে ঘুরিতেছে। রাজপুরীর প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ যেন অনলের তাপসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব রাত্রে রাজপুরীর মধ্যে যে একটা সুখ, স্বচ্ছন্দ, আনন্দ, উল্লাস, প্রমোদভাব ছিল, তাহা আর নাই।

রাজার মনের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ ছিল। সে কারণ গুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। মনে যাহার সুখ আছে, সে-ই জগৎকে সুখময় দেখে। সুখ হৃদয়ের মধ্যে, বাহ্য জগতে সুখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। প্রাণের নিবিড় স্তরস্থিত একটা তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা আগে প্রাণটাকে তৃপ্ত করিলে, তবে বাহিরের জগৎ সুখময় বলিয়া বোধ হয়। প্রাণের মধ্যে তৃপ্তি না থাকিলে, বাহ্য জগতের কিছুই সুখময় নহে। রাজা মহানন্দের তা নাই।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সমগ্র ধরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। তরঙ্গিণীর তরল সলিলধারা, চাঁদের কিরণে রজতময় দেখাইতেছে। ধীরে ধীরে মলয়া, সেই চন্দ্রালোকিত রজতধারা চুম্বন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পাপিয়া কোথা হইতে এক নিবিড় পল্লবাবৃত বৃক্ষের শাখায় শরীর লুকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কোকিলও অবসর বুঝিয়া, তান ধরিল। পাপিয়ার কাতরধ্বনির সহিত কোকিলের বিলাসস্মৃতি পূর্ণ পঞ্চমের রাগ মিশিল। তোমার প্রাণে সুখ নাই, হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে। প্রকৃতির এ অনন্যভবনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তোমার চক্ষে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ হইবে। জগতের শত সহস্র লোক, শত সহস্র স্থানে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিল, মজিল, প্রাণটাকে অতি সুখময় জ্ঞান করিল; কিন্তু তুমি? তুমি হৃদয়ে অনন্ত জ্বালা লইয়া জগৎ ও প্রকৃতিকে অভিসম্পাৎ করিলে! তাই বলিতেছিলাম সুখ প্রাণে, বাহ্য প্রকৃতিতে নহে। সুখ হৃদয়ে, বহির্জগতে নহে। বহির্জগতের যা কিছু ভোগ্য, তাহা প্রাণের আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হইলেই সুখ হয়।

মন্ত্রণা সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাজা অশ্বপালকে অশ্ব আনিতে বলিলেন। উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় মদোন্মত্ত তুরঙ্গরাজ বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তোরণের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা বাহিরে আসিলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ধীরে ধীরে অশ্বে উঠিলেন। তোরণের উপর—রাজার সম্বর্দ্ধনার জন্য নহবৎ বাজিয়া উঠিল। রাজা পরুষকণ্ঠে বলিলেন—"বাদ্য থামাইয়া দাও—বড় তিক্ত! বড় বেসুরা।" নহবৎ তখনই বন্ধ হইল।

অশ্বারোহণে মহারাজ মহানন্দ, বিলাসকাননের দিকে চলিলেন। দুইজন শরীররক্ষী পশ্চাতে আসিতেছিল। রাজা তাহা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই। সহসা পশ্চাতে

দৃষ্টি করিলেন। বলিলেন—"তোরা কোথায় যাইতেছিস্" ? তাহারা মস্তক অবনত করিয়া বলিল "মগধেশ্বরের রাজলক্ষ্মী অচলা হউন। মহারাজ একাকী চলিয়াছেন, তাই আমরা সঙ্গে যাইতেছি।"

রাজা রোষকষায়িত নেত্রে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন! বলিলেন—"কে তোদের হুকুম দিয়াছে?" একজন প্রহরী বলিল--"মহারাজের আদেশের অপেক্ষা করি নাই। আমরা কর্ত্তব্য করিতেছি।"

রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মুখ ফিরাইয়া তাহাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহারা বুঝিল, মহারাজের মস্তিষ্কে কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। নচেৎ এরূপ ঘটিবে কেন? প্রহরীরা প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

বাস্তবিকই মহারাজ মহানন্দ, সেই অমিত-তেজশালী মগধেশ্বর, তখন একটু বিকৃতমস্তিষ্ক। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, প্রহরীরা তাঁহার তাড়া খাইয়া রাজপুরীর পথ ধরিতেছে। তিনি তাঁহাদের আবার ডাকিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আবার অভিবাদন করিল। মগধেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"তোমরা আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও।"

প্রহরীরা একটু যেন আশ্চর্য্য হইল। কিন্তু তাহারা কঙ্কণ চুরির ব্যাপার শুনিয়াছিল। বুঝিল, এই ঘটনায় তাহাদের প্রভুর—এই সুবিস্তৃত মগধরাজ্যেশ্বরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। কাজেই তাহারা রাজার নূতন আদেশ পালনে কোনরূপ বিস্ময় দেখাইল না।

মগধেশ্বর বুঝিলেন—প্রহরীদের নিষেধ করিয়া তিনি একটা ভ্রম করিয়াছেন, এরূপ ভ্রম আর করিবেন না।

মহারাজ অশ্বকে সস্নেহে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"জয়কেতু—তোমার সে ঈরম্মদ গতি কই? আজ তুমিও কি আমার দুঃখে বিকল ও শক্তিহীন?"

অশ্ব প্রভুর মনের কথা যেন বুঝিল। সেই নির্ব্বাক, ভাষাহীন, জ্ঞানশূন্য পশু যেন সংস্কার বশে বুঝিল, মহারাজা তাহার মৃদুগতিতে অপ্রসন্ন হইয়াছেন। আবার সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটিল।

রাজপথে আর এক নূতন ঘটনা! দুইজন কোতোয়াল এক চোরকে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। প্রতিদিন এমন কত ঘটনাই হয়। রাজার চক্ষে যে না পড়ে, এমন নয়। সে দিন মহারাজ সহসা অশ্বের বল্গা সংযত করিলেন। যাহারা চোর ধরিয়া আনিতেছিল, তাহারা সহসা মগধেশ্বরকে অশ্ব পৃষ্ঠে তাহাদের সম্মুখে দেখিয়া যেন একটু বিস্ময়ান্বিত হইল।

রাজা বলিলেন—"তোমরা ইহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছ কেন?"

একজন প্রহরী মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিল "মহারাজ! এ ব্যক্তি এক শ্রেষ্ঠীর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে।"

রাজা আগ্রহের সহিত বলিলেন—"প্রমাণ পাইয়াছ?" প্রহরী বলিল—"যথেষ্ট প্রমাণ আছে—মহারাজ।"

চোর মহারাজের সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "মহারাজ! সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। প্রহরীরা আমাকে চোর সন্দেহ করিতেছে। পীড়ন করায় আমি স্বীকার করিয়াছি।"

মহারাজ মহানন্দের মনে কঙ্কণচুরির ব্যাপারটা আবার জাগিয়া উঠিল। আবার সেই প্রকৃতিস্থ, সংযম-প্রশান্ত সৌন্দর্য্যগম্ভীর মুখমণ্ডল, ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। অন্য সময়ে এরূপ আবেদনে চোর হয়তো মুক্তি লাভ করিত; কিন্তু মহারাজ সে দিন গম্ভীরকণ্ঠে আদেশ করিলেন—"এ নিশ্চয়ই চোর। মগধে এত লোক থাকিতে এ হতভাগ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল কেন? ইহাকে শূলে দিব। এখন কারাগারে লইয়া যাও।"

যে প্রহরীরা চোরকে ধরিয়া আনিতেছিল, তাহারা মহারাজের আদেশে একটু স্তম্ভিত হইল। মগধেশ্বরকে তাহারা কখনও এত নির্দ্দয় দেখে নাই। তাহারা মনে মনে ভাবিল, মহারাণীর কঙ্কণচুরি ব্যাপারে মহারাজ অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। প্রহরীর মধ্যে একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"রাজরাজেশ্বর! অধীনের স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করিবেন। রাজাদেশ পালনে এ দাসেরা সর্ব্বদাই অগ্রসর। কিন্তু এই হতভাগ্যের প্রতি যে ব্যবস্থা করিলেন—তাহা বাহিরে হওয়া অসম্ভব।"

মহারাজ স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন—? এ কথা বলিতেছ কেন? রাজাদেশে চোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। তাহাতে আপত্তি কি?"

প্রহরী করজোড়ে বলিল—"এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ—অবধ্য।"

রাজা আরও রাগিয়া উঠিলেন। দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন—"আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য! এ

কখনও হয় নাই, আজ তাহা হইতে বসিয়াছে। রাজান্তঃপুর হইতে মহারাণীর অলঙ্কার চুরি—ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রেষ্ঠীর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ, আশ্চর্য্য কথা! ব্রাহ্মণ যদি চোর হয়, তবে রাজাদেশে সে বধের যোগ্য। তোমরা ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও। প্রাণদণ্ডই ইহার উপযুক্ত দণ্ড।"

সেই প্রহরী বলিল—"সহস্র অপরাধেও যে ব্রাহ্মণ অবধ্য মহারাজ! আমরা কর্ত্তব্য পালনার্থে ইহাকে ধরিয়াছি। আপনার আদেশেই ত রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র কারাগারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-চোর ইতিপূর্ব্বে তারও ধরা পড়িয়াছে। মহারাজ ত তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছিলেন!"

রাজা কি ভাবিলেন। তাঁহার মনটা যেন তখন একটু ওলটপালট। কিন্তু সে অবস্থাটা শীঘ্র অন্তঃহৃত হইল। রাজা অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বলিলেন—"এখন তোমরা ইহাকে কারাগারে রাখ। পরে যথামত ব্যবস্থা করিব।"

অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিল। অদূরে ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরিস্থ বিলাস কাননের শুভ্র, উন্নত তোরণ দেখা যাইতেছে। তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। বিলাসকানন, রাজার গুপ্ত প্রমোদগৃহ। সাধারণ লোকে জানিত, এখানে অন্তঃপুরিকা মাত্র নাই। কেননা, বিলাস কাননের পথে কোন পান্থের চলিবার আদেশ ছিল না। পথের মধ্যে মধ্যে প্রহরীর আড্ডা। রাজাদেশে তাহাতে সাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ। কেবল রাজকর্ম্মচারী, রাজদূত, রাজসেনা তথায়ই প্রয়োজন হইলে এই পথে আসিত।

আরও কিয়দ্দূর আসিবার পর আর এক নূতন দৃশ্য রাজার চক্ষে পড়িল। মগধেশ্বর অশ্ববল্গা সংযত করিলেন। দেখিলেন—প্রধান কোতোয়াল একটী স্ত্রীলোককে কঠিন প্রহরার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। রাজা অশ্ব থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি ব্যাপার?"

প্রধান চৌরোদ্ধরণিক প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ! এই স্ত্রীলোক সদ্বংশোদ্ভূতা, কিন্তু কুলটা। ইহার স্বামী ইহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া ইহাকে এক দিন তিরস্কার করে। সেই ক্রোধে এই কুলটা, বিষপত্র-রস-নিষিক্ত করিয়া নিদ্রিত স্বামীর কর্ণে ঢালিয়া দেয়। ইহার স্বামী এখন মুমূর্ষু অবস্থায়।"

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি সেই স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নারী! এ কার্য্য তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে! তুমি স্বামীহত্যা করিতে বসিয়াছিলে?"

সেই স্ত্রীলোকের মন তখন অনুতাপবিদগ্ধ। স্বয়ং মগধেশ্বর যখন প্রশ্ন করিতেছেন—তখন অস্বীকার করাটা তাহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। সেই স্ত্রীলোক অবনতজানু হইয়া করযোড়ে বলিল—"রাজেশ্বর! আমার স্বামী আমায় বড ভাল বাসিতেন। কিন্তু হায়! আমি কালসাপিনী। তাহার পবিত্র প্রেম উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আমি নরকে ডুবিয়াছি। রাজন্! আমার মৃত্যু ব্যবস্থা হউক।" রাজা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে কি ভাবিয়া বলিলেন—"তাহাই হইবে। এ রাজ্যে স্ত্রীহত্যা পাতক কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তোমার ন্যায় কুলকলঙ্কিনীর জন্য তাহাও করিতে হইবে। কিন্তু আমার মতে স্বামীঘাতিনীর প্রাণদণ্ড করিলে তাহার উপকার করা হয়। অনুতাপই তোমার উপযুক্ত দণ্ড! কাল বিচার করিয়া যা হয় করিব।"

এই স্ত্রীলোকের পশ্চাতে আর একটী যুবক দুই হস্ত আবদ্ধ অবস্থায় নীত হইতেছিল। যুবক অতি সুন্দর ও সুশ্রী, মুখ দেখিলে মায়া হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে?" প্রধান চৌরোদ্ধরণিক বলিল—"মহারাজ! এই যুবক এই রমণীর জার। এই স্ত্রীলোক অভিসারিকা হইয়া, ইহার সৌন্দর্য্য বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই যুবকের পিতা অশীতিপর বৃদ্ধ। পুত্রের মতিগতি জানিতে পারিয়া তিরস্কার করে। এই কামলোলুপ যুবক সেই বৃদ্ধের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দণ্ড প্রহারে বধ করিয়াছে।"

রাজা কোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিলেন। সেই প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে তরবারি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সকলেই প্রমাদ গণিল। সকলেই ভাবিল—এ অপরাধের বিচার বুঝি হাতে হাতেই হইয়া যায়। রাজা বলিলেন—"এ ব্যক্তিকে এই তরবারি বিদ্ধ করিয়া এখনই বধ করিব!"

প্রধান চৌরোদ্ধরণিক রাজপথে এক মহা-অনর্থ সংঘটিত হয় দেখিয়া যুক্ত করে জানু পাতিয়া বলিল—"মহারাজার ন্যায় ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আরও দৃঢ় হউক। এ ব্যক্তি অপরাধী, কিন্তু রাজ অসি ইহার অপবিত্র রক্তে কলঙ্কিত হওয়া যে

লজ্জার কথা। প্রজারা কি বলিবে?"রাজা প্রকৃতিস্থ হইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"ইহাকে নদীতীরস্থ ভূগর্ভ-নিহিত কারাগারে অনশনে রাখিয়া দাও। ধর্ম্মাধিকরণকে বলিও, আজ যাহা যাহা আমার চক্ষে পড়িয়াছে, সে গুলির বিচার আমি নিজেই করিব।"

অশ্ব একেবারে মহারাজকে বিলাস কাননের প্রকাণ্ড তোরণের সম্মুখে আনিয়াছে। তোরণদ্বার লৌহময়। রাজার আগমন সংবাদে প্রহরীরা আগেই তাহা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মগধেশ্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল—"সে রাজ্যে ব্রাহ্মণ চোর, পুত্র পিতৃঘাতক ও সতী কুলত্যাগিনী, সে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। হায়! গুরুদেবের বাক্য কি শেষে সত্য হইল! মুরলা! মুরলা! সর্ব্বনাশী—"

(৪)

দুই তিনটী কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া মহারাজ এক নীলকান্ত মণি খচিত—স্বর্ণমণ্ডিত কক্ষতলে দাঁড়াইয়া—কম্পিত স্বরে ডাকিলেন—"তড়িতা—তড়িতা"!

কাতর সম্বোধনে—রুদ্ধোচ্ছ্বাসে, আবেগপূর্ণ হৃদয়ে—মগধেশ্বর যাহাকে ডাকিলেন, সে আসিল।

সে তড়িতা। তড়িতা কে আমরা জানি না। লোকে জানে না। রাজপুরীর অন্তঃপুরিকারাও জানে না। তড়িতার দাসীরাও জানে না। মহারাণী মুরলাও জানেন না। জানেন কেবল মগধেশ্বর। আর জানে কেবল তড়িতা।

তড়িতা দ্রুত আসিয়া আভূমি-প্রণত হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিল। সেই রক্তোৎফুল্ল তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত সদ্‌গন্ধ পূর্ণ অধরে একটু অলস হাসি হাসিয়া বলিল "মনে পড়িয়াছে কি?"

সেই রত্নকক্ষের ভিত্তি গাত্রে 'মনে পড়িয়াছে' কথা দুইটী প্রতিহত হইল। সেই কক্ষ মধ্যস্থ স্বর্ণ গঠিত পুষ্প-পাত্রের মোহময় গন্ধের আশে পাশে যেন ঘুরিতে লাগিল—"মনে পড়িয়াছে কি?" রাজার হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্থানটীর শূন্যতা পূর্ণ করিয়া সে নিভৃত অন্তর কক্ষে কে যেন বলিয়া উঠিল—"মনে পড়িয়াছে কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, বহির্জ্জগতে—সমগ্র মগধ রাজ্যের উন্মুক্ত বায়ুস্তরে—যেন ছড়াইয়া পড়িল—"মনে পড়িয়াছে কি?"

তড়িতা সুন্দরী। বস্তুতঃই সে তড়িতা। সমস্ত দেহখানিতে কে যেন তড়িৎ মাখাইয়া দিয়াছে। সেই কজ্জল-রেখামণ্ডিত সুকৃষ্ণ ভ্রূযুগের কৃষ্ণরেখার নিম্নে—আরও কৃষ্ণতর ইন্দীবর লোচনদ্বয়—তড়িতে পূর্ণ। বাহুর দোলনি গ্রীবার হেলনি, তাহাতেও যেন অশনি। তাম্বূলরাগ রঞ্জিত ওষ্ঠাধরে হাসির মধ্যে যেন তড়িতের খেলা। তাই বলিতেছিলাম, বস্তুতঃই সে তড়িতা।

তড়িতা দেখিল—মহারাজ আসন গ্রহণ করেন নাই। কক্ষ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। সে আদরের সহিত হাত দুখানি ধরিয়া মুখে কাতরতা আনিয়া বলিল—"মহারাজ! আসন গ্রহণ করুন।"

রাজার হৃদয়ে বড় জ্বালা। সে জ্বালা রাজপথে আসিবার সময় বড় তীব্র হইয়াছিল। তড়িতে অনলশক্তি আছে। কিন্তু মগধেশ্বরের এ তড়িতা—নিসর্গের সে জ্বালাময়ী তড়িৎ নহে। সকল জ্বালা যেন সে নিভাইয়া দিল।

সেই হেমকান্তি বাহুযুগল মগধেশ্বরের গলদেশ বেষ্টন করিল। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যভরা মুখ, মহারাজের বিশাল বক্ষে লুক্কায়িত হইল। তড়িতার গলায় নাগকেশর মালার মনঃপ্রাণহারী সুগন্ধ মহারাজের নাসিকারন্ধ্র পূর্ণ করিল। তড়িতার স্পর্শ—মহারাজের শরীরে তড়িৎ ছুটাইল। তড়িতার কাতর কণ্ঠ, প্রেমভাষা বিজড়িত কাতর সম্বোধন—প্রেমালস আকুলিত কাতর আলিঙ্গন, অত বড় মগধেশ্বর মহারাজ মহানন্দকে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় লঘু করিয়া দিল। মায়া রাজ্যের আর একটা নূতন স্বপ্নময় উজ্জ্বল দৃশ্য মহারাজের সেই জ্বালাময় হৃদয়ে উজ্জ্বলতা আনিয়া দিল। সে উজ্জ্বলতার মধ্যে—মুরলা ডুবিল—রাজ্যচিন্তা ডুবিল। কঙ্কণ অপহরণের তীব্র জ্বালাময় স্মৃতি ডুবিল। রাজ্যের শুভ, আকাঙ্ক্ষা ও অমঙ্গল আশঙ্কা ডুবিল। মহারাজ তড়িতাময় হইয়া উঠিলেন।

তড়িতার বাহুপাশ উন্মুক্ত করিয়া মগধেশ্বর প্রেম বিজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন—"তড়িতা"। তড়িতা বলিল—"কেন রাজ্যেশ্বর?"

মহারাজ বলিলেন—"তুমি কে তড়িতা? তুমি বড় মায়াবিনী। তোমার এ সুন্দর মুখ দেখিলে আমি সব ভুলি। কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করিলে?"

তড়িতা মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—'সর্ব্বনাশ কি মহারাজ! ভাল বাসিলে কি সর্ব্বনাশ করা হয়! আমি পথের ধূলি, পথে পড়িয়াছিলাম। আপনিই ত স্বেচ্ছায় আমায় পদাশ্রয় দিয়াছেন।'

রাজার মনে সেই প্রভাতে দৃষ্ট রাজ্যের পাটরাণী মুরলার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য জাগিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন—মুরলার ভাষা নাই—মুরলার উন্মাদিনী শক্তি নাই; তাহার হৃদয়ে কি হইতেছে—মুরলার তাহাই বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাহার কথায় আকুলতা নাই, প্রেম সম্বোধন নাই—স্পৃহা নাই। তাহার স্পর্শে আসঙ্গলিপ্সা নাই—উন্মাদিনী শক্তি নাই। তাহার কথায় কোকিল ঝঙ্কার নাই, পাপিয়ার অলসিত প্রেমপূর্ণ কাতর কণ্ঠস্বর নাই। তড়িতাকে না দেখিলে—মুরলা রাজরাণী হইবার উপযুক্ত থাকিত। এখন আর নয়।"

আবার সেই কঙ্কণ চুরির ঘটনা, মুরলার চিন্তার সহিত মহারাজের মনে জাগিয়া উঠিল। হৃদয়ে যে একটু সুখ আসিয়াছিল, তাহা শরতের মেঘের মত উড়িয়া গেল। রাজা আবার কাতর হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

তড়িতা বুঝিল—আজ মগধেশ্বরের মনে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য নাই। কি যেন কি একটা দারুণ চিন্তায় তাহার চিত্ত সমাচ্ছন্ন। সে আরও কাতর কণ্ঠে বলিল—"কি হইয়াছে মহারাজ! আজ মুখ এত মলিন কেন?"

নগধেশ্বর তড়িতার কণ্ঠ দেশ, বিশাল বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া বলিলেন—"তড়িতা—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

'সে কি মহারাজ! কে আপনার সর্ব্বনাশ করিল?'

'হয়—দেবতা—নয় মুরলা!'

'মুরলা—আপনার পাটরাণী—?'

'হাঁ—সেই পাপীয়সী—'

'কেন—মহারাজ! মগধেশ্বরের পাটরাণী ইচ্ছা করিয়া এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন, যাহাতে মহারাজকে অত বিচলিত করিতে পারে?'

মহারাজ মহানন্দ কঙ্কণ চুরির সমস্ত ঘটনা তড়িতাকে খুলিয়া বলিলেন। সে সবই শুনিল। শুনিয়া স্থির ভাব ধারণ করিল—তাহার মনেও যেন কত চিন্তা! সে চিন্তা যেন মহারাজের প্রতি সহানুভূতিসংজাত। তড়িতা বলিল—'বৃথা সন্দেহ মহারাজ! এ সামান্য ঘটনায় এত অনিষ্ট সম্ভবপর নহে। গণনা অনেক স্থলে ফলে না।' মহারাজ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'সত্য তড়িতা—কিন্তু আমার গুরুদেব যে সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াই আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বিঘ্নের প্রতিকারের উপায়ও করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমিও মুরলাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। দেববাক্যে আমার অবিশ্বাস নাই।'

তড়িতা বলিল—'ইহাতে পাটরাণীর দোষ কি? তিনি ত ইচ্ছা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করেন নাই, কে কোথায় বা করিয়া থাকে?'

মহারাজ—চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন—"সত্য তড়িতা! দোষ মুরলার ইচ্ছাকৃত না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে রাজ্যের বিশেষ অনিষ্ট, আমারও অনিষ্ট! গুরুবাক্য যে বৃথা হইবে, তাহারও ত সম্ভাবনা নাই।"

তড়িতা হাসিয়া বলিল—'এত বড় রাজ্যেশ্বর যিনি, এরূপ একটা সামান্য ঘটনায় তাঁহার বিচলিত হওয়া উচিত নহে। যদি আপনার গুরুবাক্যে অনিষ্টসম্ভব বুঝেন, তবে তাঁহার দ্বারাই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া লউন না কেন? বিঘ্নের ত প্রতিকার হইতে পারে।"

মহারাজ—যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ চিত্তে বলিলেন—'গুরুদেবকে আসিতে লিখিয়াছি! তিনি না আসিলে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে না।'

তড়িতা—আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিল—'চোর ধরা পড়িয়াছে কি?'

রাজা উত্তর করিলেন—'না—তড়িতা, তাহা হইলে এত ভাবিব কেন?'

'চেষ্টা হইতেছে কি?'

'যথেষ্ট—কিন্তু আজ ত দুই দিন। কিছু ফল হয় নাই।'

'আশ্চর্য্যের কথা! যে অন্তঃপুরে পিপীলিকার প্রবেশ—পথরুদ্ধ—তাহারা মধ্য হইতে চুরি! তাও আবার পাটরাণীর গাত্র হইতে!!'

'আমিও তাই ভাবিতেছি। চোর ধরিতেই হইবে।'

তড়িতা সোৎসুকে বলিল—'মহারাজ! যদি চোর ধরা পড়ে।'

রাজা যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোক পাইয়া বলিলেন—'চোর ধরা পড়ে, তাহার প্রাণদণ্ড করিব,

যদি প্রাণদণ্ড অপেক্ষা আরও কিছু ভীষণ দণ্ড থাকে, তাহারই ব্যবস্থা করিব।'

'চোর যদি ঘটনাবশে স্ত্রীলোক হয়—মহারাজ!'

'তাহার কেশ মুণ্ডন করিয়া—রাজ পথে ভ্রমণ করাইব, তার পর প্রাণদণ্ড।'

তড়িতা যেন এ কথায় শিহরিয়া উঠিল, তাহার শরীরের মধ্য দিয়া যেন তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল। তৎক্ষণাৎ সে এ ভীষণ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল।

রাজারও আর পুরাতন কথা ভাল লাগিতেছিল না। তিনি বলিলেন—"পানীয় আছে- দাও, বড় তৃষ্ণা।'

তড়িতা স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে কর্পূরবাসিত স্নিগ্ধপানীয় পাত্রে ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিল। পানীয় মধ্যে একটা মাদক পদার্থের সমাবেশ থাকায় শীঘ্র তাহা রাজার মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিল; হৃদয়কে চিন্তা শূন্য করিল। অত কষ্টেও আবার যেন রাজার মনে এতটা স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল।

রাজা বলিলেন—'তড়িতা আবার পানীয় দাও। বড় মিষ্ট! যেন প্রাণের জ্বালা গেল!'

তড়িতা আবার সেই ভৃঙ্গার হইতে পানীয় ঢালিয়া রাজাকে দিল। পূর্ণ আগ্রহে মগধেশ্বর সেই পানীয় পান করিলেন। সুকোমল শয্যায়, মণিখচিত আস্তরণের উপর সেই বিশাল রাজবপু উপাধান আশ্রয়ে লম্বমান হইল। তড়িতা—মহারাজের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্পর্শ! স্পর্শ! সুকোমল স্পর্শেই মহারাজের শরীরের মোহ আসিল। আহা! তড়িতার স্পর্শ অতি কোমল! পুষ্প গুচ্ছের স্পর্শও তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। তড়িতার নিশ্বাসে সুগন্ধ, তড়িতার দেহে সুগন্ধ—তড়িতার রূপের দাহিকা শক্তি আছে। এই দাহিকা শক্তির মুখে মগধেশ্বর পতঙ্গবৎ হইলেন।

মহারাজ মহানন্দ তড়িতাকে বাহুবেষ্টিত করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! তোমার সেই গানটা গাও। এই ঘরের দ্বার জানালা খুলিয়া দাও। বাহির হইতে মুক্তবাতাস আসুক—তোমার চূর্ণ অলক তাহাতে দুলিয়া উঠুক। তোমার কণ্ঠ-বিলম্বিত পুষ্প মঞ্জরীর সুবাস চুরী করিয়া মলয় আমার গাত্রে ছড়াইয়া দিক্। বীণায় সুর চড়াও, তড়িতা তোমার সেই 'নীল যমুনা' গাও।'

তড়িতা—বীণা লইয়া আসিল। গৃহ মধ্যস্থ সুগন্ধী প্রদীপ আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। কক্ষের বাতায়নগুলি খুলিয়া দিল। বাসন্তী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার রজতস্রোতে সেই নীলকান্তমণি-খচিত রাজকক্ষ যেন লোচনানন্দকর দেবকক্ষের সৌন্দর্য্যের দৃশ্য বিকাশ করিল। এক স্বর্ণপাত্রে একছড়া মালা গাঁথা ছিল। তড়িতা সেই যত্নগ্রথিত পুষ্পমালা রাজার গলায় পরাইয়া দিয়া নিজের কবরী এলাইয়া দিল। বাম হস্তে বীণা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের চম্পকবৎ অঙ্গুলি দিয়া তাহার তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া সুর প্রবাহের সৃষ্টি করিল। চাঁদিনী রাতে—মলয়ার রাজত্বে, কোকিলের কুহুরবের জ্বালাময় প্রতিধ্বনির মধ্যে, পুষ্পমাল্য সুগন্ধিত হর্ম্ম্যের গন্ধময় বায়ুস্তরে সে নিজের কোমল কণ্ঠ হইতে—এমন আবেগময়ী, মোহময়ী, ভাবময়ী, সুর উত্থিত করিল—যে তাহাতে রাজার প্রাণ বিগলিত হইল। তড়িতা গাহিতে লাগিল—

ধীর সমীর চুম্বিত অঙ্গ।
নীল যমুনা সুনীল সলিলে তরঙ্গ ভঙ্গ।
নীল গগন তল, রাকাশশী ঢল ঢল,
অমিয় রাশি ধারা, ভুবন টল টল;
কাতরা নাগরী, পাইতে নাগর সঙ্গ।
ভ্রমর গুঞ্জন, অতি ঘন ঘন
সরমে কুসুম ফিরায় বদন,
না ভোলে ভোমরা, কুসুম কাতরা
চুম্বনালিঙ্গনে কতই রঙ্গ।
তমাল ডালে বসে, সুখে ডাকে পাপিয়া,
কুহরে কোকিল থাকিয়া থাকিয়া
মেঘে ঢাকে চাঁদ রহিয়া রহিয়া
ধায়-ফুলবাস মলয় সঙ্গ।
উলসিত সকলে, চিত বিভোরা—
আমি বিরহিণী, বিরহকাতরা
বলে দে গো আমারে, সজনী তোরা
কোথা মিলিবে পিয়ার সঙ্গ।

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে সুর ঘুরিয়া, ফিরিয়া শূন্যে গিয়া মিশাইল। বিলাসকাননের চারিদিকে জন মানব শূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আর সেই প্রান্তরের কোলে চারিদিক বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়। তড়িতার কোমল কণ্ঠস্বর যেন

ততদূর পৌঁছিতে না পারিয়া আপনা আপনি শূন্যে লয় পাইল। তবে নিম্নস্থ প্রহরীরা সেই চাঁদিনী রাত্রে একটা করুণ সুর লহরীকে কোন অপ্সরার কণ্ঠ-সঙ্গীত বলিয়া যে ভ্রম না করিয়াছিল, তাহা নয়!

আর মগধেশ্বর! তিনি উপাধানে মাথা রাখিয়া সেই মোহময় সুরের সঙ্গে এক নূতন মোহরাজ্যে গিয়া পড়িয়াছেন। সেখানে কেবল উল্লাস, আলোক! কেবল সুর কেবল সুগন্ধ! সে রাজ্য যেন ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সেখানে জ্বালা নাই, চিন্তা নাই, কাতরতা নাই, কেবল সুখ, অনন্ত সুখ। পাছে চক্ষুরুন্মীলন করিলে এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, তাই মগধেশ্বর সে রাত্রে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না।

(৫)

আমাদের একবার রাজবাড়ীতে যাইতে হইবে। রাজার পাটরাণী অভাগিনী মুরলা কি করিতেছেন দেখিতে হইবে।

মুরলা যখন শুনিল, মহারাজা মন্ত্রণাকক্ষ হইতে সরাসর বিলাস কাননে চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহার প্রাণ বড়ই আকুল হইল। বিলাস কাননের উপর সে কেন এত বিরক্ত তাহা নিজেই বলিতে পারে না। তবে এটুকু মনে আসে, সেখানে গেলে রাজা তাহার পর হন, স্নেহ ভুলিয়া যান, হাস ভুলিয়া যান, আদর সম্ভাষণ ভুলিয়া যান, আদরের আলাপন ভুলিয়া যান। তাই সে বিলাসকাননের নামে অত অস্থির হইয়া উঠে।

রাজা বলেন—"রাজকার্য্যের জন্য, গোপনীয় মন্ত্রণার জন্য, নির্জ্জনে বিশ্রামের জন্য, তিনি বিলাস কাননে যান। কিন্তু মুরলা বুঝেন, রাজকার্য্য নয়—সেখানে এমন একটা কিছু আছে, যাহা রাজাকে জোর করিয়া, আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এই প্রাসাদ ত অনেক দিনের পুরাতন। মগধের আরও দুই চারি জন রাজা ত ইহাতে বাস করিয়া গিয়াছেন। অন্য সময়ে এই বিলাসকাননে মুরলাও ত রাজার সঙ্গে গিয়াছে। কিন্তু দুই তিন মাস হইতে রাজা কাহাকেও সেখানে যাইতে দেন না কেন? মুরলা একদিন গোপনে এক দাসীকে পাঠাইয়াছিল; সে অনেক চেষ্টায়, তোরণে প্রবেশ করিতে পায় নাই। প্রহরী তাহাকে বলিয়াছিল—"এখানে মক্ষিকার প্রবেশ নিষেধ।"

মুরলার দাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এখানে আর কে আছে বলিতে পার? মহারাণী তোমায় মতির মালা বক্‌শিস্ দিবেন।" প্রহরী সেই দাসীকে ভয় দেখাইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সেই অবধি মুরলা আর কোন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই।

মগধেশ্বর যে দিন অগ্রাহ্য করিয়া মুরলার কক্ষ ত্যাগ করেন, সেদিন মুরলা কিছুই খায় নাই। সে কেবল মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়াছে—আর বলিয়াছে, 'হে ভগবান! হে বিপদবারণ বিষ্ণু, আমার স্বামীর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। কঙ্কণ যেন আমি ফিরিয়া পাই।' জানি না ভগবান তাহার কাতর প্রাণের প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন কি না?

ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। মুরলা অনেক ভাবিয়াও সে রহস্যের নিরাকরণ করিতে পারে নাই। রাত্রে যখন সে পালঙ্কে শুইয়াছিল, তখন হাতে কঙ্কণ ছিল। সাধারণ চোরের এ কাজ নয়। গায়ে ত আরও হীরা মতি ছিল। চোর তাহা হইলে সে গুলি রাখিয়া কঙ্কণ লইবে কেন? আর এক কথা, হাত হইতে চেষ্টা করিয়া কঙ্কণ খুলিবার কোন উপায় নাই, সামান্য বল প্রয়োগে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাইত। কঙ্কণের সন্ধিস্থলে একটা ক্ষুদ্র কৌশলময় স্থান ছিল, সেটা টিপিলেই কঙ্কণ আপনি খুলিয়া আসে। যে করিয়াছে সে এই উপায়ে কাজ সারিয়াছে। আর চুরিটা বাহিরের লোকের দ্বারাও হয় নাই!"

(ক্রমশঃ—)

বিরহী।

[মেঘমুখে দয়িতার প্রতি বিরহী যক্ষের উক্তি]

শ্যাম লতিকায় চারু অঙ্গ ভায়,
চকিত-হরিণী-লোচনে আঁখি,
বিধু দরশনে পড়ে মুখ মনে
শিখির কলাপে অলক আঁকি;
তটিনী অঙ্গে মৃদু তরঙ্গে
ভ্রূভঙ্গ তোমার প্রকাশ পায়,
কিন্তু লো কোপনে! কি আছে ভুবনে
প্রতি-অঙ্গ-তুলা মিলিবে যায়?

বিধি কি কঠিন প্রাণী !
করিয়া অঙ্কিত প্রণয় কুপিত
তোমার মূরতিখানি।
পদতলে তার ছবিটি আমার
যখনি আঁকিতে যাই,
ঝরে ঝরঝর নয়ন-নিঝর
কিছু না দেখিতে পাই !
জীবন শোষিনী এ দুখ কাহিনী
সজনি ! কহিব কারে,
বিধি বুঝি আর মিলন দোঁহার
ছবিতে সহিতে নারে !

স্বপন মাঝারে লভিয়া তোমারে
নিবিড় বাহুর ডোরে,
বাঁধিতে আকুলি দুটি কর তুলি
আকাশে ঘুমের ঘোরে।
হেরি সে দশায় বন দেবতায়
বিষাদে উঠয়ে কাঁদি,
মুকুতা আকার নয়ন-আসার
কিসলয় রাখে বাঁধি।

টুটি দেবদারু কিসলয় চারু
নির্য্যাসবাস লুটি'
হ'তে হিমাচল পবন শীতল
আসিছে দখিণে ছুটি'।
বুঝি সে তোমার তনু সুকুমার
পরশি লাগিছে গায়,
উঠি চমকিয়া যাই যে ছুটিয়া
আলিঙ্গন দিতে তায়।

দীরঘ রজনী কেমনে সজনি !
যাপিব পলক মত,
বিষাদ বিরস দীরঘ দিবস
তাপ হবে অপগত।

চটুল নয়নে ! ঘুমে জাগরণে
এমনি ভাবিয়া আন
তোমার বিহনে গভীর বেদনে
অশরণ হয় প্রাণ !

স্মরি' ভাবী সুখ মিলনের মুখ
বিরহ জীবন কাটিয়া যায়,
করি সে ভাবনা তুমিও দিয়োনা
পশিতে বেদনা মরমে হায় !
অতি সুখ কার কিম্বা দুখভার
নিয়ত কাহার হৃদয় দলে ?
চক্রনেমি পারা ঘুরিতেছে তারা
কখন উপরে কখন তলে।

ভুজগ-শয়ন হইতে যখন
জাগিবেন হরি মুরলীধর,
এ বিরহময় অভিশাপ লয়
হইবে তখন হরষকর।
হয়োনা হতাশ, এই চারিমাস
যাপি' কোন মতে,—মিলনে মাতি'
যত সাধ দোঁহে করিনু বিরহে
পূরায়ে সকলি হ'য়ে গলাগলি
যাপিব শারদ চাঁদিনী রাতি।

তোমারি ধেয়ান করিয়া পরাণ
রাখিয়াছে আজো বঁধুয়া চোর,
অসিত নয়নে ! লোকেরি বচনে
আনিয়োনা চিতে ভ্রমের ঘোর !
বৃথা লোকে কহে সুচির বিরহে
মরমের রাগ মুছিয়া যায়,
ভোগের বিহনে রস নিতি জমে
প্রেমরাশি রূপে বিকাশ পায়।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রদীপ।

প্রদীপ

পঞ্চম ভাগ।} চৈত্র, ১৩০৮। {৪র্থ সংখ্যা।

প্রদীপ।

এ নহে বিলাসদৃপ্ত ধনীর আগারে,
বিচিত্র স্ফটিক পাত্রে দীপ্ত দীপমালা।
শত বিদ্যুতের দ্যুতি শত আলো জ্বালা,
প্রমোদ উৎসব গৃহে চারু তারা হারে
জ্বলে না ইহার জ্যোতি, ঝলসি নয়ন;—
বিলাস-লালসা-পুষ্ট ভোগ হুতাশন।
অন্ধকার গৃহ-কোণে স্নিগ্ধোজ্জ্বল শিখা
এযে দরিদ্রের দীপ সংসার তামসে;
নিত্য নিশি জাগি রহে মৌন নির্ণিমেষে,
প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের পুণ্য বহ্নিশিখা।
দারিদ্র্যের দগ্ধ ভালে রাজত্বের টীপ্
অন্ধকার বঙ্গগৃহে সুমঙ্গল দীপ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কাশীনাথ।

প্রথম পর্ব্ব।

—※※—

প্রথম অধ্যায়।

একটু পরিচয়।

দয়াবীর, দানবীর, শক্তিবীর, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর এবং অর্থবীর কাশীনাথ সেনের একটু পরিচয়ে আখ্যায়িকার গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লই। তাঁহার ঘটনাময় জীবনের দুই একটী ঘটনাই আমাদের এই আখ্যায়িকার অবলম্বন। কর্ম্মবীর কাশীনাথের সমগ্র জীবনচরিত লিখিতে হইলে, আমাদিগকে বিংশশতাব্দীর বাণভট্ট হইতে হইবে; সে অবসর আমাদের নাই। অবসর থাকিলেও সাহস নাই, সাহস থাকিলেও প্রবৃত্তি নাই। যোগ্যতার কথা কহিব না, "যোগ্যতা নাই" বলিয়া পাঠকের কাছে খাট হইতে যাইব কেন? জানিয়া শুনিয়া পতঙ্গের মত প্রদীপে পড়িতে যাওয়া পাগলের কার্য্য। কাশীনাথ-জীবনের একটা ঘটনা যে সহৃদয় পাঠকসমাজকে দেখাইতে যায়, কাশীনাথের সমগ্র জীবনের বেলায় অযোগ্যতার ভাণ করা ত তাহার পক্ষে সরলতার কার্য্য নহে। জীবনের একটা ঘটনা যে দেখাইতে পারে, অভিজ্ঞতা থাকিলে, সে সমস্ত ঘটনা দেখাইতে না পারিবে কেন? যখন কাশীনাথের জীবনের একটা অঙ্কে বা অঙ্কের একটা গর্ভাঙ্কে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে আমি আপনাকে যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি, তখন তাঁহার সমগ্র জীবনের আখ্যানে নিজের অযোগ্যতা-খ্যাপন করিয়া সুবোধ পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে যাইব কেন? তাই বলিতেছি, যোগ্যতার কথা তুলিব না, অনবসর ও অপবৃত্তির দোহাই দিয়াই গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বসিব। আর একটা কথা; বর্ণনীয় বিষয়ের গুণে আখ্যায়কের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইয়া থাকে। বাল্মীকি যদি ভগবান্ রামচন্দ্রের লীলা-বর্ণনে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি রামায়ণের কবি হইতে পারিতেন না। বেদব্যাস যদি শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মহাভারত অপাঠ্য মহাভারে পরিণত হইত। মহর্ষি নারদ যদি হরিগুণ না গাহিয়া কেবল ঢেঁকির গুণ গাহিয়া বেড়াইতেন, তাহা হইলে নিজেও ঢেঁকি অবতার হইয়া থাকিতেন। মিল্‌টন যদি ভগবানের নাম গন্ধ না করিয়া কেবল শয়তানের কথায় কাব্য পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার মহাকাব্য নরকের পাঠ্য হইয়া থাকিত। মাইকেল মধুসূদন যদি মেঘনাদবধে কেবল রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে আঁকিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, যদি রাম লক্ষ্মণের লীলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার মেঘনাদ বাঁড়ের নার হইয়া মাঠে পড়িয়া থাকিত।

নায়ক নায়িকার গুণে কাব্য নাটকের গুণগরিমা। কালিদাসও যদি রঘুবংশ ফেলিয়া ঘুঘুবংশের বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কীর্ত্তিভবনে কেবল ঘুঘু চরিত। ভবভূতি যদি বীরচরিতে রামলীলা ফেলিয়া কেবল রাক্ষসলীলায় হাত দেখাইতেন, তাহা হইলে বীরচরিত পিশাচচরিতে পরিণত হইত। কাব্য বল, নাটক বল, কথা বল, সমস্তই নায়ক নায়িকার লীলা। নায়ক নায়িকার লীলায় বৈচিত্র্য না থাকিলে, কাব্যাদিতে বৈচিত্র্য হয় না। কেবল ভেরাণ্ডা-তলার ভেকের কথা কহিতে গেলে, বৃহস্পতিকেও ভেরেণ্ডা ভাজিয়া লণ্ডভণ্ড হইতে হয়। আমার আখ্যায়িকার নায়ক কাশীনাথ মহাত্মা লোক ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লীলা সাঙ্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশলোপ হইয়াছে, তাঁহার সৌধ প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নাই, সৌধ প্রাসাদের যত উপাদানে অন্য লোকের সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে; তাঁহার ধনে অন্য লোকে ধনবান্ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যশঃসৌরভে এখনও দেশ আমোদিত হইতেছে। তাঁহার পুণ্য তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে, তাঁহার যশ

ইহলোকে রহিয়াছে। তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যশ এখনও অদৃশ্য হয় নাই, কোন কালে অদৃশ্য হইবে না।

যে গণ্ডগ্রাম কাশীনাথের আবির্ভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, সে গ্রাম হুগলি জেলায়; ভারতের রাজধানী কলিকাতার প্রায় ষোল ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। কাশীনাথ সেন গুপ্ত বৈদ্যবংশাবতংস ছিলেন; কিন্তু বংশ-পরিচিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, তিনি কলিকাতার একটী বড় সওদাগরী আপিশের সামান্য কেরাণিপদে বসিয়া যৌবনেই সেই হাউসের মুচ্ছুদ্দি হইয়াছিলেন। এখনকার মুচ্ছুদ্দি-পদে আর তখনকার মুচ্ছুদ্দি-পদে প্রভেদ অনেক। হাউসের খরিদ বিক্রয়ে তখন মুচ্ছুদ্দির একাধিপত্য ছিল, লাভালাভেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; পদে তখন যথেষ্ট স্বাধীনতাও ছিল। কলিকাতার বনিয়াদি বাঙ্গালি বড় মানুষদিগের ভিতর অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষ হাউসের মুচ্ছুদ্দি হইয়া বিপুল ধনে ধনপতি হইয়া গিয়াছেন। ক্রয়-বিক্রয়ে মুচ্ছুদ্দি মহাশয় যে দস্তুরী পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার ধনকোষ পরিপূর্ণ হইত। সওদাগর সাহেবদিগকে তখন ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য সম্পূর্ণরূপেই মুচ্ছুদ্দির উপর নির্ভর করিতে হইত। বাজারের ব্যাপারী পসারীরা মুচ্ছুদ্দিকে চিনিত, সওদাগর সাহেবদিগের সহিত কাহারও ততটা সম্বন্ধ থাকিত না। তখনকার মুচ্ছুদ্দি ধনে মানে সৌভাগ্যশালী ছিলেন। এখনকার সওদাগর সাহেবেরা এখনকার দেশ কাল পাত্র চিনিয়াছেন, ব্যবসা বাণিজ্যের—খরিদ বিক্রয়ের অনেক কাজই আপনারা করিয়া থাকেন; এখনকার মুচ্ছুদ্দিরা সাহেবদিগের বেতনভুক্ ভৃত্য। তখনকার মুচ্ছুদ্দিরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন, সাহেবদিগের সমকক্ষ ছিলেন।

কাশীনাথও স্বাধীন মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। মুহুরি, সরকার, বাজার-সরকার, ওজনসরকার, গুদামসরকার, সরমেট প্রভৃতি অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন। ইঁহাদিগের বাহাল-বরতরফে সাহেবদিগের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কাশীনাথই সকলের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। দয়াবীর কাশীনাথ আশ্রিতবাৎসল্যেও অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যুদারমতের মর্য্যাদা বুঝিতেন না। আত্মীয় পর, স্বদেশী বিদেশী সকলকে তিনি সমান স্নেহে দেখিতে শিখেন নাই; "বসুধৈব কুটুম্বকম্" নীতির রহস্য তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না। সমগ্র জগতের ভাবনা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। সমগ্র ভারতের হিত-চিন্তায় তিনি ব্যস্ত হইতেন না। সমগ্র বঙ্গ দেশটাকেও তিনি নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। অধিক কথা কি, সমস্ত হুগলি-জেলাটাকেও নিজের জেলা বলিয়া অধিক যত্ন করিতে পারিতেন না।

তখনকার পরিচিত প্রথায় কাশীনাথ কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিয়াছিলেন। "স্কুল মাষ্টার" নামে একখানি সাহিত্যসংগ্রহ এবং "মরেস গ্রামার" নামে একখানি ব্যাকরণ তাঁহার ইংরেজি শিক্ষার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; ঐ দুই গ্রন্থেই বিদ্যাপথ একরূপ পর্য্যবসিতও হইয়াছিল। কিন্তু হাউসে যে সকল দ্রব্যের বেচা কেনা হইত, তৎসমস্তেরই ইংরেজি নাম কাশীনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। এ পক্ষে একখানি ইংরেজি বাঙ্গলা "ভকাবুলারি" বা "বাক্যাবলী" তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। যে জিনিসের নামটা কাশীনাথ ভুলিয়া যাইতেন বা যাহার নাম তিনি আদৌ জানিতেন না, এমন জিনিসের কথা সাহেবদিগকে বুঝাইতে হইলে, কাশীনাথ অবজেক্ট-লেসনের শরণ লইতেন, জিনিস দেখাইয়া সাহেবকে বলিতেন, "দিস থিঙ ওয়াণ্ট" বা "দিস থিঙ নট ঠিক।" তখনকার সাহেবরাও ইহাতে অবস্থা ব্যবস্থা বুঝিতেন; এইরূপ জ্ঞানেই তুষ্ট হইতেন।

"লাড ঈশ্বর গাড ঈশ্বর
প্লোমান চাষা।
এলিফেণ্ট হস্তীরে কহি
কোকন্দর শসা।"

এইরূপ ছড়ায় তখনকার ইংরেজি শিক্ষা হইত, বাক্যাবলীতে এইরূপ ছড়াও থাকিত। তখন সাহেবের কাছে রথযাত্রার ছুটির কথা বলিলে, রথের রহস্য সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে হইত।

"চার্চ্চ চার্চ্চ উডেন চার্চ্চ
আলমাইটি নো হাথ,
থোজেও মেন ক্রাই ক্রাই
জয় জগন্নাথ জগন্নাথ।"

মুহুরি মুচ্ছুদ্দির মুখে রথযাত্রার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়াই, তখনকার সাহেবেরা আনন্দিত হইতেন।

কাশীনাথও এইরূপ ইংরেজি বিদ্যা লইয়া মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করিতেন; আপিশে নিজের তাঁবে শতাবধি লোকের প্রতিপালন করিতেন; কলিকাতায় বাসায় বারমাস পঞ্চাশ ষাইট জন ভদ্র লোককে অন্ন দিতেন; আর স্বগ্রামে নিজের বাটীতে বেল দুর্গোৎসব শ্রাদ্ধ শান্তি প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে টাকার থলিয়া খুলিয়া ছড়াইতেন। আপিশে যাঁহারা কাশীনাথের অধীনে কাজ করিতেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই কাশীনাথের স্বগ্রাম-বাসী ছিলেন। বৈদ্যবংশজ কাশীনাথের বৈদ্যপক্ষপাতটা কিছু অধিক ছিল। ভিন্নগ্রামের বৈদ্যবংশজদিগের প্রতিও কাশীনাথের অনুরাগ ছিল। আত্মীয় কুটুম্বদিগের সাহায্য করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।

কাশীনাথ স্পষ্ট বলিতেন, "যাহাদিগের সাহায্য করিতেছি, তাহারা আমার অবশ্য-প্রতিপাল্য। আপিশে চাকরী দিতে পারিয়াছি, ইহা আমারই সৌভাগ্য; অন্যথা ত আমাকেই নিজের অর্থে ইহাদিগের পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত।"

গ্রামের ব্রাহ্মণসন্তানদিগকেও কাশীনাথ কাজকর্ম্ম দিতেন। যে কাজে ব্রাহ্মণসন্তানের অমর্য্যাদা-সম্ভাবনা, সেরূপ কাজ তিনি তাঁহাদিগকে দিতেন না। আর গুরু-পুরোহিত-বংশের কোন ব্যক্তিকেই আপিশে নিযুক্ত করিতেন না। কাশীনাথ বলিতেন, "দেবতাকে খাটাইতে নাই, দেবতাকে পূজায় তুষ্ট করিতে হয়।" তিনি উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি দিয়া গুরু-পুরোহিত-বংশের সাহায্য করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাপ্তাহিক যাতায়াত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রেল ছিল না। কাশীনাথকে ভাগীরথীর স্রোতে নৌকায় করিয়া কলিকাতায় আসা যাওয়া করিতে হইত। কলিকাতায় মস্ত বাসা ছিল, চাকর বাকর ছিল পাঁচ ছয় জন। আপিশের কাজে যে কয়জন বেহারা পেয়াদা নিযুক্ত ছিল, তাহারাও মুচ্ছুদ্দি বাবুর বাসায় থাকিত। স্বগ্রামস্থ স্বজাতীয় মুহুরি সরকার প্রভৃতি সকলেই কাশীনাথ সেনের বাসাতেই কালযাপন করিতেন। পাচক ছিল তিন চারি জন। বাসায় প্রত্যহ যজ্ঞ হইত। আহারাদি বিষয়ে কিন্তু তারতম্য ছিল না। এখনকার অনেক বাবুর সংসারে দেখিবে, তিন রকম চাউলের ভাত; বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর দরখানি, আর সকলের বালাম, চাকর বাকরদিগের মোটা বুকড়ী। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও কুত্রাপি এরূপ তণ্ডুল-বিচার দেখা যাইত না। কাশীনাথ বাবুর বাসায় কিন্তু কোন বিচারই ছিল না, সকল বিষয়েই সাম্য ছিল। অতিরিক্তের মধ্যে কাশীনাথ একবাটী নালতের জল আর যৎকিঞ্চিৎ আদা ছোলা খাইতেন, এটায় আর প্রবৃত্তি কাহারই ছিল না! আর অন্নের সঙ্গে কাশীনাথ একটা কাঁচা লঙ্কা খাইতে ভাল বাসিতেন, এটাতেও কেহ বড় দৃষ্টি দিতেন না।

বাসা-খরচে সীমা পরিসীমা ছিল না। স্বগ্রামের, শ্বশুরগ্রামের বা মাতুলগ্রামের যে ব্যক্তি কলিকাতায় আসিতেন, কাশীনাথের বাসায় তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। তাঁহারাও যত দিন ইচ্ছা বাসায় থাকিয়া আপনাদের কাজ কর্ম্ম সারিয়া লইতেন। যাত্রার সময়ে প্রায় কাহাকেও রিক্ত-হস্তে যাইতে হইবে না। রাহাখরচ বলিয়া দুই দশ টাকা কাশীনাথ সকলেরই হস্তে গুজিয়া দিতেন। অনেকে কেবল এ জন্যও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। ৺ পূজার দিন কতক পূর্ব্বে কাশীনাথের বাসায় লোকারণ্য হইত। যে সকল ব্রাহ্মণ কলিকাতায় বার্ষিক সাধিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই কাশীনাথের প্রতি কৃপা করিতেন।

বাসায় এত খরচ-পত্র, এত চাকর বাকর, তথাপি কাশীনাথ সহধর্ম্মিণীকে কখনও কলিকাতায় আনিতেন না। স্ত্রীকে প্রবাসে আনা তখনকার হিন্দুর পক্ষে যেন একটা পাপ বলিয়াই গণ্য ছিল। এখন বিশ পঁচিশ টাকার কেরাণী বাবুও কলিকাতায় সপরিবারে থাকেন। তখনকার দিনে কাশীনাথের মত লোকেও কলিকাতায় সপরিবারে থাকিতেন না। রেল ছিল না, নৌযাত্রায়ও সকলের পক্ষে সর্ব্বদা সুবিধা হইত না। তথাপি তখনকার লোকে কলিকাতায় পরিবার আনিতেন না। যে দুই একজন কলিকাতায় সপরিবারে বাসা করিয়া থাকিতেন, গ্রামে তাঁহারা নিন্দা-ভাজন ছিলেন। বস্তুতও স্বার্থপরতাটা তাঁহাদের হৃদয়ে কিছু বলবতী হইয়া আধিপত্য করিত।

এ পক্ষে কাশীনাথ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন না, যুবতী সহধর্ম্মিণীকেও কলিকাতায় আনিতেন না। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। রেল ছিল না, ষ্টীমার ছিল না, ডাকের গাড়ী ছিল না, পাল্‌কীর উপ্পা বসাইবার সুবিধা হইত না, তথাপি কাশীনাথ প্রতি-শনিবার কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেন, প্রতিসোমবার বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিতেন। তাঁহার নৌকা ষোল ক্রোশ পথে এইরূপে যাতায়াত করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের নৌকা।

কাশীনাথ ভাল মিস্ত্রী দিয়া, অধিক টাকা খরচ করিয়া, একখানি ভাউলে-পান্সী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সে ভাউলে ছিপ ছোটের মত ছুটিত। বসিয়া থাকিলে ভাউলে খানিতে আটজন চড়নদারের চলিত, শুইয়া থাকিলে চারি জনের বেশ চলিত। কাশীনাথের নৌকায় আটজন দাঁড়ী দাড় টানিত, একজন মাঝী হাল ধরিত, নয়জনই কাশীনাথের বেতনভুক্ ভৃত্য ছিল। রাজু নজু দুই ভাই, গ্রামের মাঝিকুলে কুলতিলক ছিল। ইহাদের মত মাঝী তখনকার দিনেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। দুই ভাইয়ের এক ভাইকে কাশীনাথের নৌকায় হাল ধরিতেই হইত। আটটী দাঁড়ী ছিল, আটটা অসুর অবতার। মাঝীর মধ্যেও রাজু নজু বলবান্ বলিয়াই বিখ্যাত ছিল।

তখনও মেলেরিয়া জ্বর দেশটাকে জনশূন্য করে নাই, জনগুলাকেও নির্জ্জীব করিয়া দেয় নাই। দস্যু-ভয় তখনও ছিল, অথচ অস্ত্র-আইন বাহাল হয় নাই। কাশীনাথের দাঁড়ী মাঝীরা সকলেই লাঠী ধরিতে পারিত, সড়কী চালাইতে পারিত, তরোয়াল ধরিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। নৌকায় নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র থাকিত। কাশীনাথ নিজেও কুস্তির জীব ছিলেন না, একটা পাঁঠা একলা খাইতে পারিতেন. নিজেও লাঠী তরোয়াল ধরিতে জানিতেন। বন্দুক পিস্তল এবং যথেষ্ট গুলি-বারুদ নৌকায় না রাখিয়া কাশীনাথ আসা যাওয়া করিতেন না। স্বগ্রামের যে সকল ভদ্র-সন্তান কাশীনাথের আপিশে কাজ করিতেন, আর তাঁহার বাসায় থাকিতেন, তাঁহাদের ভিতর হইতে কাশীনাথ প্রায়ই দুই তিনটিকে পর্য্যায়-ক্রমে সঙ্গে লইতেন। এইরূপ পর্য্যায়ের ব্যবস্থা থাকায়, সকলেই মধ্যে মধ্যে বাড়ী যাওয়ার সুবিধা পাইতেন। আশ্রিত-বৎসল কাশীনাথ আশ্রিত ছাড়িয়া প্রায়ই অনাশ্রিতকে সঙ্গে লইতেন না। তবে যদি গ্রামের কেহ কখনও কলিকাতায় হঠাৎ অসুস্থ হইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, তবে তাহাকে কাশীনাথ আগ্রহসহকারে নিজের নৌকায় লইয়া যাইতেন।

নৌকা শনিবার প্রত্যুষেই কলিকাতায় আসিয়া বাগবাজারের ঘাটে অপেক্ষা করিত। কলিকাতায় তখনও পাল্‌কীরই আধিপত্য ছিল বটে, কিন্তু গাড়ারও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। বড় হাউসের বড় মুচ্ছুদ্দি কাশীনাথকে কার্য্যোপলক্ষে সর্ব্বদাই এখানে ওখানে বেড়াইতে হইত, মহাজনদিগের সঙ্গে দেখা শুনা করিতে হইত। কাশীনাথ বাবুর সুতরাং একখানি গাড়ী এবং দুইটি ঘোড়া ছিল। আর পাল্‌কী অপেক্ষা গাড়ীতেই বলবান্ কাশীনাথ সুবিধাবোধ করিতেন।

মুচ্ছুদ্দি বাবু ইচ্ছামত আপিশ হইতে চলিয়া আসিতে পারিতেন, সাহেবদিগের অনুমতি লইতে হইত না; জরুরী কাজ কর্ম্ম থাকিলে কাশীনাথ নিজেই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন।

বাড়ী হইতে বা আপিশ হইতে যাত্রা দুই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া কাশীনাথ গাড়ি করিয়াই বাগবাজারের ঘাটে উপস্থিত হইতেন। জোয়ারের পূর্ব্বে নৌকায় উঠিয়া, জোয়ার মুখেই নৌকা ছাড়িয়া দিতেন। কটালের কয় দিন বান ডাকিয়া না গেলে তিনি নৌকায় উঠিতেন না। বাগবাজারের ঘাট ছাড়িয়া ভাউলে দক্ষিণের ছোটের মত তীরবেগে ছুটিত। আটটা দাঁড়ী আটটা অসুর, দাঁড়েও অবিতীয়। মাঝী রাজু নজু ঝিকায় পাকা। ষোল ক্রোশ পথ অন্য নৌকার পক্ষে এক দিনে অনতিক্রম্য হইলেও, কাশীনাথের নৌকার পক্ষে—স্বল্প সময়েই অতিক্রম্য ছিল। পূজার পর একটানা গাঙে আমরাই দেখিয়াছি, হাটুরে নৌকাও চারি পাঁচ ঘণ্টায় ষোল ক্রোশ আসিয়াছে; দক্ষিণে বাতাসে পালভরে পানসী পাঁচ ঘণ্টায় গিয়াছে। দাঁড়ে ভয়ঙ্কর জোর থাকিলে, বৈদ্যবাটীর ও দিকে জোয়ারের জোরকেও ওজর করিতে হয়। দাঁড়ের জোরে কিন্তু ভাঁটাও জোর করিয়া জোয়ার হয়। কাশীনাথ শনিবারেই বাড়ী পৌঁছিতেন; আবার রবিবার রাত্রিশেষে বাড়ী ছাড়িয়া সোমবার কলিকাতায় পৌঁছিতেন। দুই এক ঘণ্টার গহরি হইলে, মুচ্ছুদ্দি কাশীনাথকে কাহারও কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা পাইতে হইত না; মনিবের কোপানলে পড়িবার ভয়ে কাশীনাথকে কখনও ভীত হইতে হইত না।

নিজের মনোমত নৌকায় কাশীনাথ কোনরূপ অসুখের পথ রাখেন নাই। কোন কার্য্যে বা কোন প্রয়োজনে তাঁহাকে নৌকা প্রায় কুত্রাপি লাগাইতে হইত না। নিতান্ত ঝড় তুফানের ধুম না হইলে, নৌকা অবাধে চলিত। খাদ্যাদি যাত্রার সময়েই সংগৃহীত হইয়া থাকিত। নৌকায় চারিজন চড়নদারের প্রায়ই অভাব হইত না; তাসেও কাশীনাথের বিরাগ ছিল না।

বাড়ীর চারিজন পাকের দুইজনকে নৌকায় আসা যাওয়া করিতে হইত। দাঁড়ি মাঝি নয় জনের উপর পাক দুই জনকে না দেখিলে কাশীনাথ নিশ্চিন্ত হইতেন না। তাস খেলার সময়ে পাকেরা ঘন ঘন তামাক সাজিয়া দিত। দাঁড়ি মাঝিদিগের কিছুতেই হাত কামাই না হয়, এরূপ ব্যবস্থা কাশীনাথ করিয়া রাখিতেন।

কাশীনাথ গাহিতে বাজাইতে জানিতেন। সহচরদিগের ভিতর কেহ কেহ একান্ত অদক্ষ ছিলেন না। সংগীতে তখনকার লোকের বড় অনুরাগ ছিল। অনেকেরই সুতরাং দক্ষতাও ছিল। নৌকায় একটা বাঁয়া পড়িয়া থাকিত। তাহারই সঙ্গতে গান চলিত। খেলা ধূলা ও গান বাজনায় সময়টা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইত। যাতায়াতে সুতরাং কাশীনাথকে প্রায়ই বিরক্ত হইতে হইত না। ঝড় তুফানের জন্য কদাচ কখনও বিড়ম্বনাভোগ ঘটিত। কিন্তু সে কদাচিৎক কষ্ট-ভোগ সদাচিৎক সুখভোগের কাছে পরাস্ত হইয়া থাকিত।

যানের মধ্যে নৌযান শ্রেষ্ঠ, নৌযাত্রায় চারি পোয়া আনন্দ, চারি পোয়া উৎসাহ। সোমবার কলিকাতায় আসিবার সময়ে সুখের একটু খর্ব্বতা হইত সত্য; কিন্তু ছয় দিন পরেই আবার শনিবার, এই স্মৃতি কাশীনাথের সাপ্তাহিক বিরহদুঃখকে মাথা তুলিতে দিত না। আর শনিবাসরীয় যাত্রায় যে প্রগাঢ় সুখবোধ এবং প্রবল উৎসাহ হইত,

তাহার তুলনা ছিল না। তাহার মূল্য বুঝিতেন কাশীনাথ, আর বুঝিতেন কাশীনাথের অন্নপূর্ণা।

এইরূপেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইত, সপ্তাহে সপ্তাহে কাশীনাথ এইরূপেই যাতায়াত করিতেন। ৺ পূজার সময়ে কাশীনাথ ষষ্ঠীর দিন বাড়ী যাইতেন; নবমী রাত্রে যাত্রা করিয়া দশমীর দিন কলিকাতায় পৌঁছিতেন। দশমী সাহেবদিগেরও "লকি ডে"; সেদিন সওদাগরী আপিশে কিছু না কিছু সওদা করিতেই হয়। দশমীর সৌভাগ্য-দিবসে সুতরাং মুচ্ছুদ্দি কাশীনাথকে অন্ততঃ একজন মুহুরি ও একজন সরকার লইয়া আপিশে উপস্থিত হইতেই হইত। দশমীতে লকি ডের পালন করিয়াই, কাশীনাথ আবার যাত্রা করিতেন, কোজাগর-পূর্ণিমার পর দিন পুনরায় কলিকাতায় আসিতেন। কাশীনাথ যখনই যাতায়াত করিতেন, পাক দুই জনকে তখনই সঙ্গে থাকিতে হইত।

বার মাসে কাশীনাথকে বাহান্ন হপ্তার বাহান্ন বার আসিতে যাইতে হইত। পথটা তাঁহার খুবই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। কোন গ্রামে কিরূপ লোকের বসবাস, কোন গ্রামের কোন ব্যক্তি বর্দ্ধিষ্ণু, কোন্ বড় মানুষের সৎকার্য্য কিরূপ, কোথাকার জমিদার কেমন, কোন্ গ্রামের বাজারে কিরূপ জিনিসপত্র পাওয়া যায়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে কাশীনাথ নানা উপায়ে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। দুই বারের যে যে স্থানে তখন ভয় ডর ছিল, সে সে স্থানের উপর কাশীনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে উদাসীন হইতেন না, নিজে সাবধান হইয়া নৌকার সকলকে সাবধান করিতেন। নৌকায় সন্ধ্যার সময় হইতেই তিন চারিটা লণ্ঠন জ্বলিত। মধ্যে মধ্যে বন্দুকেরও আওয়াজ হইত। উভয় তীরের যত লোকেই জানিত কাশীনাথ যাইতেছেন; তিনি সকলেরই পরিচিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যুভয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দস্যুভয় প্রবল ছিল; স্থলে স্থলদস্যু, জলে জলদস্যু; দেশের লোককে তখনও সশঙ্ক থাকিতে হইত। গামছা-মোড়া ঠক, ডাকাত আর কতলা-পাড়া ঠেঙ্গাড়ের ভয় তখনও একেবারে দূর হয় নাই। ঠকদিগের আড্ডা ছিল পশ্চিমাঞ্চলে, বুন্দেলখণ্ডের নানা স্থানেই ঠকের বসতি ছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও জমিদারদিগের ভিতর অনেকে ঠকদিগকে প্রশ্রয় দিতেন, কেহ কেহ লোভে প্রশ্রয় দিতেন, কেহ কেহ ভয়ে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইতেন। ঠকদিগের ত অসাধ্য কার্য্য ছিল না। নানা দল নানাদিকে বিচরণ করিত, বঙ্গের এ দিকেও দুই এক দলের গতিবিধি ছিল। ডাকাতের উৎপাত প্রায় সর্ব্বত্রই ছিল। কোন কোন স্থানের ভদ্রলোকদিগের ভিতরও কোন কোন ব্যক্তি দস্যুদিগের সাহায্য করিতেন। অনেক ধনবানের বাড়ীতে দস্যুরাই শান্তি রক্ষা করিত, প্রভুভবনে কিন্তু তাহারা কোনকালে ডাকাতী করিত না, অন্য কাহাকেও প্রায় ডাকাতী করিতে দিত না। স্থানান্তরের দস্যুরা গ্রামের পাক সর্দ্দার দিগের সহিত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত না করিয়া কোন গ্রামের ডাকাতী করিত না। কোন কোন গ্রামের সর্দ্দার চৌকিদার নিমকের মান রাখিত, নিজ গ্রামে কাহারও বাড়ী ডাকাত পড়িতে দিত না। কোন কোন গ্রামের চৌকিদারদিগের নিমকভক্তিটা দুর্ব্বল ছিল, কেবল প্রভুভবনের বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত হইত। কোন কোন নিতান্ত নরাধম কিন্তু কখনও কখনও প্রভুভবনেও ডাকাতী হইতে দিত। কখনও কখনও প্রবল দস্যুদল গ্রামের শান্তিরক্ষক পাকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া শৌর্য্যপ্রকাশে অগ্রসর হইত। অনেক সময়ে দস্যুরা বাহাদুরী দেখাইবার জন্যও চৌকিদাররক্ষিত ধনিভবনে ডাকাতী করিতে আসিত। অতিলোভে উন্মত্ত হইয়াও কোন কোন দল বিপত্তি বিভ্রাটে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইত; সুযোগ্য সাহসী বিশ্বস্ত চৌকীদারদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইত। এরূপ স্থলে ঘোরতর যুদ্ধ প্রায়ই হইত, দুই একটা দস্যুকে সময়ে সময়ে প্রাণও দিতে হইত। কখনও কখনও বাড়ীর বা গ্রামের চৌকিদারকেও দস্যুহস্তে হত হইতে হইত। দস্যুপক্ষের কেহ হত হইলে, অপর দস্যুরা তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়া যাইত। গুরুতররূপে আহত হইলেও দস্যুপক্ষের লোককে দস্যুহস্তে প্রাণ দিতে হইত। দস্যুরা তাহারও মাথাটা কাটিয়া লইয়া যাইত। মুণ্ডহীন দেহ দেখিয়া পুলীশ ব্যক্তিনির্দ্দেশন করিতে পারিত না। দস্যুরা আত্মরক্ষার জন্যই এইরূপ দস্যুতা করিত। এরূপ অবস্থায় ভ্রাতার হস্তে ভ্রাতাকে মুণ্ডদান করিতে হইত, পুত্রহস্তে পিতাকে মুণ্ড দিতে হইত, দস্যু পিতাও স্বহস্তে পুত্রের মুণ্ড কাটিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইত না। সকল দেশেই দস্যুনীতি একরূপ, ইউরোপে ইতালি সার্দ্দিনীয়া প্রভৃতি রাজ্যের দস্যুরা এখনও স্বদলস্থ লোকের মাথা কাটিয়া লইয়া যায়!

যাহারা পথে ঘাটে পথিকদিগকে ঠেঙ্গাইয়া মারিত, তাহারা ঠেঙ্গাড়ে বলিয়া পরিচিত। দস্যুসমাজে ইহারা অতি হেয় জঘন্য বলিয়াই বিদিত ছিল। প্রকৃত দস্যুরা ডাকাতী-কাজকে যুদ্ধ বলিয়া মনে করিত। সৈনিকেরা যেরূপ শত্রুপক্ষের কেল্লা দুর্গ, আক্রমণপূর্ব্বক দখল করে, দস্যুরাও সেইরূপ গৃহস্থভবন, আক্রমণপূর্ব্বক দখল করিয়া, তার যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। দুর্গ দখল করিবার সময়ে সৈন্যকে যেরূপ যুদ্ধ করিতে হয়, দস্যুদিগকেও সেইরূপ গৃহস্থ-পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। বস্তুতও ডাকাতী একপ্রকার নকল যুদ্ধ—ক্ষুদ্র যুদ্ধ। প্রকৃত দস্যুরা শস্ত্র-ব্যবহারে সুদক্ষ ছিল, শৌর্য্য সাহসের অবতার ছিল, ভীরু কাপুরুষদিগকে তাহারা একান্ত অশ্রদ্ধা করিত। রথ্যা-দস্যুরা পান্থকে একাকী পাইলেই মারিয়া ফেলিত; অগ্রে প্রাণ লইয়া পরে পথিকের ধন লইত। অনেক সময়ে কিছুই পাইত না, কেবল নরহত্যা করাই সার হইত। এরূপ কার্য্য কাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব পায়। যাহারা শস্ত্রশাস্ত্রে একান্ত অজ্ঞ, যাহারা সাহসে অতি হীন, সেইরূপ নরাধমেরাই রথ্যাদস্যু হইয়া পান্থ-বধ করিতে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু প্রকৃত বীরদস্যুসমাজে ইহাদিগকে অতীব হেয় হইয়া থাকিতে হইত; কোন ঠেঙ্গাড়ে দস্যুই কখনও প্রকৃত দস্যুর সহিত মিলিতে পাইত না। ডাকাত সমাজে আর ঠেঙ্গাড়ে সমাজে আহার ব্যবহার চলিত না; বিবাহ ও আদান প্রদানও নিষিদ্ধ ছিল। দস্যুপতি বিশ্বনাথের জন্য অনেক ঠেঙ্গাড়ে কাপুরুষকে নিগ্রহভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতাপে অনেক স্থানের লোকে ঠেঙ্গাড়ের হাতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। পথিকেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিত। নদীয়া জেলায় ঠেঙ্গাড়ের উৎপাত তাঁহার জন্যই একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল, পরেও সে উৎপাত আর প্রবল হইতে পায় নাই।

জলদস্যুরা বোম্বেটে বলিয়া পরিচিত ছিল। যে নদী নদে নৌকা চলিত, সেই নদী নদেই বোম্বেটের উৎপাত ছিল। আমাদের ভাগীরথী-বক্ষেও বোম্বেটের ভয় এক সময়ে চরমে উঠিয়াছিল। তীরস্থ কোন কোন গ্রামের ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোকেও বোম্বেটের রাজা হইয়া প্রভূত ধনের উপার্জ্জন করিত। ভাগীরথীর জলপথ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক এক ভাগে এক একজন জলদস্যুপতির আধিপত্য ছিল। পূর্ব্বে চারি দিকে বোম্বেটের ছিপ ছোট ঘুরিত। লম্বা লম্বা সরু সরু নৌকা ছিপ নামে অভিহিত হইত। ছিপ ভয়ঙ্কর বেগে পরিচালিত হইত; কেহ তাহাকে ছিপের কাছে পরাস্ত হইতে হইত। দস্যুরা আপনাদের ছিপ ছোট আপনারাই চালাইত। কোন কোন ছিপে বত্রিশ জন, কোন কোন ছিপে চল্লিশ জন দস্যু বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বটে ফেলিত, আর ছিপ নক্ষত্রবেগে ছুটিত. উজান ভাটা মানিত না, প্রতিকূল স্রোতেও তরতর করিয়া চলিত। ক্ষুদ্র দাঁড়কেই বটে বলে। এখনকার পিনা নৌকাতেও বটে দেখিতে পাওয়া যায়। দাঁড় নৌকায় বাঁধা থাকে, বটে বাঁধা থাকে না। বটে

নাবিকদিগের হাতে থাকে; নাবিকেরা হাতে পায়ে বটে চালাইয়া থাকে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশে তমোলুক কাঁথী ডিজলী প্রভৃতির গণ্ডে ছোটের চলন। ছোটের তলা জাহাজের জালিবোটের মত মসৃণভাবাপন্ন। সহরের ছোটে বলিয়াই নাম "ছোট"। ছোট ডুবু ডুবু হয় বটে, কিন্তু ডুবিতে জানে না। দ্রুত গমনাগমনের পক্ষে ছোটও অদ্বিতীয়। জলে ডাকাতী করি নাই, কিন্তু ছোটে আমরাও চড়িয়াছি।

স্থলদস্যুদিগের সহিত জলদস্যুদিগের বিবাদ বিসংবাদ প্রায় হইত না। স্থল-দস্যুরা জলেই কাজ করিত; ইহারাও সড়কী বর্শা তরোয়াল লইয়া যুদ্ধ করিত। আরোহিতরী বাণিজ্যতরী দ্বিবিধ তরীই জলদস্যুদিগের ভোগ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। দস্যুরা যে তরীর সর্ব্বনাশ করিত, প্রায়ই বহুদূর হইতে তাহার অনুধাবন করিত, কখনও কখনও হঠাৎ লব্ধ শীকারের উপরও পড়িতে কুণ্ঠিত হইত না। কখনও কখনও নৌকায় নৌকায় জল-যুদ্ধ হইত, কিন্তু যে তরী সশস্ত্র শস্ত্রবিৎ গাইক রক্ষকে রক্ষিত হইত, যাহাতে সাহসী আরোহীরা বন্দুক পিস্তল লইয়া সাবধান থাকিতেন, সেরূপ নৌকার দিকে জলদস্যুরা বড় একটা ঘেষিত না। কাশীনাথের নৌকাকেও এই জন্যই কখনও বোম্বেটের হাতে পড়িতে হয় নাই। তিনি দস্যুদিগেরও পরিচিত ছিলেন, কাশীনাথের মুক্ত হস্ত দস্যুদিগের পক্ষেও রুদ্ধ হইত না, তখনকার ধনীদিগের কাছে দস্যুরাও অনুগ্রহ-লাভ করিত। জলে স্থলে দস্যুর আধিপত্য ছিল, ধনে প্রাণে যাহাদের সম্বন্ধ ছিল, ধনীদিগকে অগত্যা দস্যুতুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইত। সকল দেশেই এই নিয়ম। ইংলণ্ডের রবিনহুড এবং স্কটলণ্ডের রবরয়কেও ত অনেক ধনপতি তুষ্ট রাখিতে বাধ্য হইতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হক-সাহেব।

রাজাকে ঠক ডাকাইত বোম্বেটের আধিপত্য হইতে মুক্ত করিবার জন্য রাজা ইংরেজকে যে, একান্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল; বঙ্গের ডাকাতীর, এলিয়ট, স্মিথ প্রভৃতি সাহেবেরা যে, জলে স্থলে দস্যু-দমন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; এখনও যে, ঐ সকল মহাপুরুষের যশ চারি দিকে ঘোষিত হইয়া থাকে; তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। যখনকার কথা আমি কহিতেছি, তখন আমাদের এ দিকে দস্যু-দমনের দুরবস্থাই বাহাল ছিল। হুগলি সহরের উত্তরে সহরেরই সীমান্তে ভাগীরথী-তীরে দস্যু-দমন বিভাগের একটা বড় আড্ডা ছিল। এলিয়টের যশঃ সৌরভে তখনও দশদিক আমোদিত হইয়া ছিল। কিন্তু স্মিথ সাহেবের নূতন কীর্ত্তি এলিয়টের পুরাতন কীর্ত্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল।

ঠকের ভয়েই গবর্ণমেণ্ট প্রথমে স্বতন্ত্র দস্যুদমন-বিভাগের সৃষ্টি করেন। দাক্ষিণাত্যের কর্ণেল স্লীমান ঠক বংশের ধ্বংস করেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঠক ডাকাইতের শাসন ও ধ্বংসের জন্য এখনও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। ঠক-ডাকাত-বিভাগে এখনও প্রধান রাজপুরুষের প্রাধান্য আছে। প্রধান পুরুষ সর্ব্বপক্ষ সাহেবের দবদবা রবরবা এখনও শোনা যাইতেছে। কিন্তু তিনি মধ্য প্রদেশ ও মধ্য ভারত লইয়াই অধিক ব্যস্ত। আমাদের এদিকে ঠক দস্যুর ভার এখন সাধারণ পুলীসের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে; হুগলির সে স্বতন্ত্র আপিশ এখন নাই।

ঠক-দস্যু-দমনের কর্ত্তাই তখন "হক সাহেব" নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ বলিত ঠক সাহেব। 'ঠক সাহেব" বলিলে সাহেবের নামে দোষ পড়ে, এই জন্যই বুদ্ধিমান লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, "হক সাহেব।" হক অর্থাৎ ন্যায় ধর্ম্মের রক্ষা করিতেন; যাহার ধন তাহারই রাখিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন বলিয়াই ঠকী-ডাকাতী-বিভাগের কর্ত্তা "হক সাহেব" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

হুগলি জেলার পাঁচপাড়া প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। পাঁচপাড়ায় তখন বৈদ্যদিগেরই প্রাধান্য ছিল। ঐ গ্রামের মহাকুলীন রায়বংশে বৈদ্য চন্দ্রশেখর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঠকী ডাকাতী বিভাগের এসিষ্টাণ্ট কমিশনর অর্থাৎ প্রধানকর্ত্তার সহকারী হইয়া, তিনি "হক বাবু" বলিয়া প্রথিত হন। চন্দ্রশেখর নিজের শৌর্য্য সাহস এবং যোগ্যতায় হক সাহেবদিগকে তুষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল. হুগলি বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকটী জেলার দস্যুবংশ চন্দ্রশেখরের জন্যই নির্ব্বংশ হইয়াছিল। সত্য, অনেককে কোনরূপ উপস্থিত প্রত্যক্ষ অপরাধে অপরাধী না হইয়াও দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল; শুদ্ধ সন্দেহের সূত্র ধরিয়াই, চন্দ্রশেখর অনেককে কারাগারে বা দ্বীপান্তরে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাও সত্য; কিন্তু চন্দ্রশেখর যাহাদিগের হস্ত হইতে গ্রাম ও সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা যে দস্যুবৃত্তি করিত, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চন্দ্রশেখরের কল্যাণেই দস্যুপ্রধান হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলা দস্যুহীন হইয়াছিল; বাঁকুড়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল।

চন্দ্রশেখরের জন্য দস্যুবংশ লোকবলে এবং শক্তি বলে একান্ত হীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু বংশের উচ্ছেদ তখনও হয় নাই, তখনও জলে স্থলে মধ্যে মধ্যে দস্যুবৃত্তি চলিত। বিখ্যাত দস্যুবীর বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ রাধানাথ রঘুনাথ প্রভৃতির আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু হুগলি জেলার বলাগড় অঞ্চলের বলবান্ দস্যুপতি কেনারাম গোপ পরশুহস্তে তখনও পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুলকে—পুলীশের ক্ষত্রিয়াদিবংশধর পাশ্চাত্য প্রহরীদিগকে—ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছিল; কেনার ভয়ঙ্কর টাঙ্গী তখনও প্রবল পুলীশকে মধ্যে মধ্যে প্রকম্পিত করিতেছিল; বিশ্বনাথ বৈদ্যনাথ প্রভৃতির মত কাইকেলাসের দস্যু তখন ছিল না সত্য; দস্যুসমাজের নেপোলীয়ন, নে, স্কট প্রভৃতির তখন আর দর্শন পাওয়া যাইত না সত্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর দস্যু কিন্তু তখনও বঙ্গে বিরাজ করিতেছিল; কেনারাম, কেনারামের সহযোগী সহকারীদিগের প্রতাপরবি তখনও একেবারে অস্তমিত হয় নাই। ডাকাতী এখানে সেখানে কখনও কখনও তখনও হইতেছিল, জলে—গঙ্গাবক্ষে—তখনও মধ্যে মধ্যে বোম্বেটের নৌকা দেখা যাইত। শুক্লপক্ষে সূর্য্য অস্তমিত হইতে না হইতে চন্দ্র দেখা দেন। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে নক্ষত্র গ্রহগণ কিঞ্চিৎ আলোক দিয়া থাকে। দস্যুভয় অনেক কমিয়াছিল, কিন্তু একেবারে ঘুচিয়া যায় নাই; এই জন্যই আমাদের কাশীনাথ বাবুকেও নৌপথে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইয়াছিল; নৌকার জন্যই এই কারণে দুইজন স্বতন্ত্র পাক রাখিতে হইয়াছিল; বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্রদক্ষ নয়জন নাবিককেই এইজন্য নৌ-চালনে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বাড়ীর ও নৌকার জন্য কাশীনাথ যে চারিজন পাক রাখিয়াছিলেন, তাহারা চন্দ্রশেখরের পরিচিত ছিল; তাহাদিগের যোগ্যতাও তাঁহার বিদিত ছিল। কাশীনাথও চন্দ্রশেখরের সুপারিসেই চারিজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৌরহাটীই গরুটী।

পাঠক, একবার কলিকাতা হইতে জলপথে আমার সহিত হুগলি পর্য্যন্ত চল। কলিকাতা হইতে হুগলি যাইবার সময়ে তোমাকে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অনেক নগর গ্রাম দেখিতে হইবে। শালুকে, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, কোতরঙ, ভদ্রকালী, কোন্নগর, রিষড়া, মাহেশ, বল্লভপুর, শ্রীরামপুর, চাতরা, শেওড়াফুলী, বৈদ্যবাটী, চাপদানী, ভদ্রেশ্বর, গরুটী, ফরাসডাঙ্গা, চুচুড়া, এই কয়টী প্রসিদ্ধ স্থানকে বামে রাখিয়া, তোমাকে হুগলি সহরে পৌঁছিতে হইতে হইবে। হুগলি ছাড়িয়া

যদি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাইতে চাও, তাহা হইলে, বামে শাহাগঞ্জ, কেওটা, খামারপাড়া, বাঁশবেড়ে, শিবপুর কেলিয়া, তোমাকে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমে পুণ্যক্ষেত্র মুক্তবেণী—ত্রিবেণী গিয়া পৌঁছিতে হইবে।

পূর্ব্ব তীরেও গ্রাম নগরের অভাব নাই; কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল, আর পশ্চিমকূলেই আমাদের সম্বন্ধ। তাই পশ্চিম-কূলেরই কয়টী প্রধান গণ্ডগ্রাম ও নগরের সহিত তোমার পরিচয় হইল; স্থানগুলির কিছু কিছু ইতিহাস হয়ত তোমার জ্ঞাত আছে। মাহেশ বল্লভপুরের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা দৃষ্ট না হইলেও তোমার শ্রুত। শ্রীরামপুর যে, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দেও দিনেমারদিগের অধিকারে ছিল, তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নহে। ফরাসিদিগের ফরাসডাঙ্গা তোমার পরিচিত। চাতরা পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল, শেওড়াফুলীর জগন্মাতা নিস্তারিণী তোমার পূজনীয়। বৈদ্যবাটীর হাটের কলা বোধ হয় তোমারও রসনাতৃপ্তি করিয়াছে। বঙ্গদেশের লোকে প্রথমে বৈদ্যবাটীর হাটেই বিলাতী আলুর দর্শন পাইয়াছিল। বৈদ্যবাটীর পশ্চিমে সিংহুর গোপালনগর বন্দিপুর শেয়াখালা প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরাই প্রথমে আলুর চাষ করিয়াছিল। চাঁপদানী পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল না, এখন পাট চটের কলের জন্য চাঁপদানী প্রসিদ্ধ। ভদ্রেশ্বরের গঞ্জ দেশবিখ্যাত। নিকটেই তেলিনী পাড়ার বাবুরা এখনও বিরাজমান। গরুটী বা গৌরহাটীর খ্যাতি প্রতিপত্তি এখন কমিয়াছে, তখন অসীম ছিল। কেন ছিল, তাহা কহিবার পূর্ব্বে হুগলি চুঁচুড়ার কথা কহিয়া রাখি। হুগলি সহরে পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ-দিগের আধিপত্য ছিল। সরস্বতী মজিয়া গিয়া যখন সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-পথ রুদ্ধ করিয়া দেন, সেই সময়ে পর্ত্তুগীজেরাই হুগলিকে বাণিজ্য নগরে পরিণত করিয়াছিলেন। হুগলি যাইবার পূর্ব্বে পাঠক, তোমাকে চুঁচুড়া যাইতে হইয়াছে। চুঁচুড়া যে, ওলন্দাজদিগের ভারতীয় রাজধানী ছিল, তাহা তুমি শুনিয়া থাকিবে। শাগঞ্জ প্রভৃতি ছাড়িয়া তুমি ত্রিবেণী যাও; ত্রিবেণী পুরাতন পৌরাণিক স্থান। প্রয়াগে মুক্তবেণী, এখানেও মুক্তবেণী।

গরুটীর কথায় ঋণী আছি, ঋণশোধে বিলম্ব করিব না। গরুটী অতি প্রসিদ্ধ স্থানই ছিল, গরুটীর নাম জানিত না এমন লোক বঙ্গে অল্পই ছিল। কিন্তু মাহেশ বল্লভপুরের মত গরুটী দেবস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না, ত্রিবেণীর মত তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না, শ্রীরাম-পুর ফরাসডাঙ্গা চুঁচুড়া হুগলির মত সহর-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না, বৈদ্যবাটী ভদ্রেশ্বরের মত বাণিজ্য-স্থান বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিল না, বাঙ্গী উত্তরপাড়া, কোন্নগরের মত সমাজ-স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না। গৌর-হাটী প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার গঙ্গাতীরস্থ সেই বনময় বাগানের জন্য। গরুটীর বাগান দেখিয়া চিনিয়াছিলেন লক্ষ লক্ষ লোকে, শুনিয়া চিনিয়াছিলেন বহু বহু লক্ষ লোকে। অনেকে ঠেকিয়া ভুগিয়াও গরুটীর বাগান চিনিয়াছিলেন, গরুটী গ্রামও চিনিয়াছিলেন। পাঠক গরুটী যদি তোমার অপরিচিত হয়, তবে গৌরহাটী তোমার একান্ত অপরিচিত নহে। সে বৎসর বড়ার এক বন্ধুবংশধর এই গৌরহাটী গ্রামেই ডাকাতি করিতে গিয়া এক গৃহস্থ মহিলার হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন; অজ্ঞাত অপরিচিত অবীরা বড়ার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ বীরগ্রাম গৌরহাটীকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল! সৌভাগ্যের সময়ে সুপরিচিত হইয়া লোকে একান্ত দৌর্ভাগ্যের সময়েও আবার পরি-চিত হইয়া থাকে। লোকের গ্রাম নগরাদিকেও এইরূপে দুইবার পরি-চিত হইতে হয়। তাই বলিতেছি, পাঠক, গরুটী অপরিচিত হইলেও গৌরহাটী তোমার অপরিচিত নহে, সৌভাগ্যের গরুটী অপরিচিত হইলেও দৌর্ভাগ্যের গৌরহাটী অপরিচিত নহে; দৃষ্টান্তের অভাব নাই; নদীয়া জেলায়ও সৌভাগ্যের বীরনগর মেলেরিয়াঘটিত দৌর্ভাগ্যের জন্য উলা নামে পরিচিত; গরুটীর প্রায় পূর্ব্বতীরে কুমারহট্ট হালিসহর নামে প্রসিদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী।

আশ্বিনে শারদীয়া পূজা হইয়া গিয়াছে। মা জগদম্বা ভক্তের পূজায় উপচারে তুষ্ট হইয়া, দশভুজে ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, চলিয়া গিয়া-ছিলেন; থাকিতে পারেন নাই, আবার মা আমার শ্যামারূপে আসিবে-ছেন; কল্য অমাবস্যায় ভক্তবৎসলা আবার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাঁহাদের স্বগৃহে মার শুভাগমন হইতেছে, তাঁহাদের ত কথাই নাই, যাঁহাদের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু প্রতিমা আনিয়াছেন, তাঁহারাও আনন্দে উৎফুল্ল। তখন অবস্থা এইরূপই ছিল, ভক্ত পরের ঘরেও ভক্ত-বৎসলাকে দেখিয়া পুলকিত হইতেন। তখন প্রতিবেশীদিগের ভিতর যেরূপ আত্মীয়তা দেখা যাইত, এখন আত্মীয়দিগের ভিতরও সেরূপ আত্মীয়তা দুর্লভ। তখন পাড়ার এক বাড়ীতে পূজা মহোৎসব হইলে, সকল বাড়ীতেই মহোৎসবের সুখভোগ হইত। সাধ্য হইলে, উৎসবের দিনে পাড়ার সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।

শ্যামাপূজার পূর্ব্ব দিন ভাগীরথীর বক্ষে সুতরাং আরোহিনৌকার যাতায়াত কিছু বাড়িয়াছে। শনিবার অমাবস্যা, মা কালিকা সেই পূজায় তিথবারে অনুকূল সংযোগ। পূজার পর দিন রবিবার, সে দিনও আপিশ কাছারী বন্ধ। তৎপর দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, সে দিনও হিন্দুর মহোৎসব। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়ও অনেক আপিশ বন্ধ।

কাশীনাথের ভবনে বার মাসে তের পূজা। শ্যামা পূজায় শাক্ত কাশীনাথ উৎসবের একশেষ করেন। কাশীনাথ শক্তিভক্ত শাক্ত ছিলেন, তান্ত্রিক কৌল ছিলেন না। শ্যামাপূজার আর সকল অঙ্গই অক্ষুণ্ণ হইত কিন্তু কাশীনাথের ভবনে সুধাস্রোত প্রবাহিত হইত না। কাশীনাথের অবর্ত্তমানে সুরার বংশলোপ হইয়াছে, বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র সুধাকে বিষে পরিণত করিয়া তাহার হস্তে প্রাণ দিয়া, পিতার বংশ-লোপে সাহায্য করিয়াছেন। এ বিষম বিপত্তি কাশীনাথকে দেখিয়া যাইতে হয় নাই, পুত্রশোকহুতাশনেও তাঁহাকে প্রজ্বলিত হইতে হয় নাই।

চতুর্দ্দশীর দিন বেলাবেলি কলিকাতা ছাড়িয়া কাশীনাথের পরি-চিত নৌকা সন্ধ্যার সময়ে বৈদ্যবাটী পার হইল; নৌকা ক্রমেই বাটীর সন্নিহিত হইতে লাগিল। জোয়ারের টান কমিয়া গিয়াছে, কার্ত্তিক মাসেও একটানার স্রোত চলিতেছে। নৌকা বৈদ্যবাটীর এদিকে যত বেগে চলিয়াছিল, বৈদ্যবাটীর ওদিকে আর তত বেগে চলিতেছে না। কিন্তু অষ্ট অসুরের অষ্ট দাঁড়ে নজুমাঝীর হাল সহযোগিতা করিতেছে, গুণ হইয়ে বসিয়া মদন মালা স্বীয় অসাধারণ বল ও ক্ষেপণীচালন দক্ষতার পরিচয় দিতেছে। আর সপ্ত দাঁড়ও সপ্তবীরের হাতে গলুইয়ের দাঁড়ের সহিত সমকক্ষতা করিতেছে। নজুর ঝিঁকায় তরী মধ্যে মধ্যে কম্পিত কলেবরে অধিক ছুটিতেছে। বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি এক প্রহর, না হয় দেড় প্রহর হইবে। কাশীনাথ সান্ধ্যকার্য্য সমাপন করিবার জন্য নৌকার বাহিরে বহির্গত হইয়াছেন। দুই পার্শ্বে দুই পাক—ভজা আর গুরো—যষ্টিহস্তে বসিয়া আছে।

বাবুকে বাহিরে দাঁড়াইতে দেখিয়া নজু বলিল, "বাবু বসিয়া পড়ুন। ঝিঁকায় নৌকা কাঁপিবে, অসাবধানে থাকিলে, হয়ত পড়িয়া যাইবেন।" নজু পাকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভজা ভাই—গুরো বাবা—খবরদার, বাবুর দুই পার্শ্বে থাকিস।"

এই কথা বলিতে বলিতে নজু দেখিল, নৌকা প্রায় গরুটীর কাছে উপস্থিত হইয়াছে। কাশীনাথ বাবুও দেখিলেন, অদূরে গরুটীর বাগা-নের কাছেই একটা আলোক। অতিপরিচিত গরুটীর বাগান কাশী-নাথ দূর হইতে চিনিতে পারিলেন। আলোকটা দৃষ্টিপথে সাহায্য করিল।

আলোকটা হঠাৎ নিবিয়া গেল কেন? কাশীনাথ নজুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যে, আলোকটা বরাবর জ্বলিতেছিল, ওটা হঠাৎ নিবিয়া গেল কেনহে?" নজু বলিল, "আমিও তাই ভাবিতেছি। মনে হইতেছে, ওখানে দুই একখানা নৌকা আছে। নৌকার উপরে আলো ছিল। ঝড় বাতাস নাই, হঠাৎ আলো নিবিল কেন?"

কাশীনাথ অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ভজা বন্দুক ধর, গুরোকেও একটা দে। একটা পিস্তল আমায় দে, আর একটা কমলকে দে।" স্বগ্রামের স্বীয় কর্ম্মচারী কমলকৃষ্ণ দাসগুপ্ত সঙ্গে আছেন। কমল শৌর্য্য সাহসে শারীরিক ক্ষমতায় একপ্রকার অদ্বিতীয়।

তাঁহারা চারি জন দাঁড়ে থাকিল, চারি জন সড়কী বল্লম লইয়া প্রস্তুত হইল। দূরস্থ আলোক যাই নিবিয়াছিল, অমনি কাশীনাথ বুঝিয়া-ছিলেন, "আমার নৌকায় আলোক দেখিয়াই ঐ নৌকার লোকে আপনাদের আলোক নিবাইয়াছে। চারিটা আলোকের জন্য আমার নৌকা গাঢ় অন্ধকারেও লোকে দূর হইতে দেখিতে পায়, আর চিনিতে পারে।" কাশীনাথের এই সিদ্ধান্তে নজুও সমর্থন করিল। আর সিদ্ধান্তে অনুমোদন করিতে করিতে নজুও এক গাছা বর্ষা টানিয়া লইল।

কাশীনাথের নৌকা কাশীনাথের আদেশে বরাবর না চলিয়া গরু-টীর বাগানের দিকে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ বাগানের কোল হইতে একটা চীৎকার শব্দ আসিয়া কাশীনাথ ও তাঁহার দাঁড়ী মাঝী ও পাকদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। কর্ণে সেই চীৎকারের করুণরস আসিয়া কর্ণ-কুহরকে প্লাবিত করিল। আর নিমেষমধ্যেই কাশীনাথের নৌকা গরুটীর সেই বাগানের কোলে উপস্থিত হইল। কাশীনাথ দেখিলেন, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ভয়ঙ্কর ব্যাপারই যে দেখিতে হইবে, তাহা কাশী-নাথ পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াই আর সকলকে প্রস্তুত করিয়া নিজেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বীরপুরুষের হৃদয় ভয়শূন্যই হইয়া থাকে। ভয়শূন্য বীর-হৃদয় মহাবিপদে—মহাতঙ্কেও—ধীর স্থির থাকিয়া, আর সকলের হৃদয় ধীর স্থির করিয়া রাখে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

সকলেই ব্যস্ত, সকলেই শৌর্য্য সাহসের পরিচয় দিতেছে; কমল গুপ্ত কি স্তব্ধভাবে থাকিবার লোক? শৌর্য্য সাহসে যে, তিনি অদ্বিতীয় এবং যদি শক্তি থাকিলে মানুষের বুদ্ধি শৌর্য্য সাহস মহা বিপদেও স্থির থাকে। কমলের স্থিরতা ধীরতা দেখিলে, তখন অতি বীরকেও বিস্মিত হইতে হইত। যে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই, সেই দিকে কমলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কাশীনাথের কালীপূজায় যথেষ্ট আতস বাজী পুড়িত। পূজার দিন পুড়িত, বিসর্জ্জনের দিনও পুড়িত। বোম, তুবড়ি, হাউই প্রভৃতি মোটা বাজী স্বগ্রামের বাগানী প্রস্তুত করিয়া দিত। বাজীর কাজে রাধানাথ সিদ্ধহস্ত ছিল। রংমশাল প্রভৃতিও যে, রাধানাথ করিতে পারিত না এরূপ নহে; কিন্তু এ সকল বাজী কলিকাতায় ভাল হয় বলিয়া কাশীনাথ কলিকাতায় বায়না দিতেন। মেছো বাজারের এক বাজিওয়ালাই প্রতি বৎসর কালীপূজায় আর দোল মহোৎসবে বাজী যোগাইত। নিজ পাড়ার বারোয়ারী পূজার সময়েও কাশীনাথ মেছো বাজারের বাজী লইয়া যাইতেন। বাজীর উপর বীরপুরুষদিগের চিরন্তন অনুরাগ। উৎসবে কাশীনাথ অনেক টাকা বাজীতে পোড়াইতেন বলিয়া অনেকে প্রতিবাদ করিত। কিন্তু যাহা নিজে ভাল বুঝিতেন, কাশীনাথ সহস্র প্রতিবাদেও তাহা ছাড়িতেন না। খোদ অন্নপূর্ণার প্রতিবাদেও কাশীনাথের অটল হৃদয় টলিত না। কালীপূজার বাজী দুই ঝাঁকা নৌকায় ছিল। কমল বাজীর ঝাঁকা হইতে কেবল কতগুলা রঙমশাল তুলিয়া লইলেন না। রঙমশাল ধরাইয়া একটা নিজে লইলেন। আর একটা একজন দাঁড়ীর হাতে দিলেন। রঙমশালের আলোকে চতুর্দশীর অন্ধকারেও না গঙ্গা আলোকিত হইলেন; কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী পূর্ণিমায় পরিণত হইল।

সেই আলোকে সকলেই দেখিলেন, গরুটীর বাগানের ধারে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। পলকেই প্রলয়কাণ্ড দৃষ্ট হইল। কাশীনাথ দেখিয়াই বুঝিলেন, জলে স্থলে দস্যু। গঙ্গা তীরে পাঁচ ছয়টা ভীষণ দস্যুমূর্ত্তি বিরাজমান। হস্তে ভয়ঙ্কর লাঠী, দুই জনের হস্তে দুইটা ছড়। সরু শক্ত পাকা বাঁশের মুখ কলম-কাটার মত কাটা এবং সুচাগ্র বলিয়া তীক্ষ্ণ; ইহাকেই বলে ছড়। দস্যুরা বিনা মূল্যে বিনা আয়াসে সদা প্রস্তুত এইরূপ বংশময় বল্লমের বড়ই পক্ষপাতী। দস্যুহস্তে বেগে পরিচালিত হইলে, এই ছড় মনুষ্যের উদরে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার নিপাত করিয়া থাকে। ছড়ের গোছা দস্যু হস্তে থাকে, কখনও কখনও বলে নিক্ষিপ্ত হইয়া দূরস্থ মানবেরও নিপাত করে। গরুটীর তীরস্থ দস্যুদিগের ভিতর দুই এক জনের হস্তে লৌহমুখ সড়কীও না ছিল এরূপ নহে। বন্দুক পিস্তল এখনকার দস্যুহস্তে দৃষ্ট হয়, তখনকার দস্যুহস্তে দৃষ্ট হইত না। ইংরেজকৃত অস্ত্র-আইনের কল্যাণে শান্তিক্লিষ্ট ভদ্র লোকে অস্ত্র হীন হইয়াছে, দস্যুরা অস্ত্র হীন হয় নাই। তীরে যে ছয় জন দস্যুই ছিল, এরূপ মনে হয় না। ছয় জনই কাশীনাথ প্রভৃতির দৃষ্ট পথে পড়িল বটে। জলে দস্যু নৌকায় পাঁচ ছয় জনকে দেখিতে পাওয়া গেল। দস্যু-নৌকার যে, স্বতন্ত্র নাবিক থাকে না, দস্যু-নাবিকেরাই তরী চালাইয়া থাকে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে।

স্থলে একদল দস্যু, জলে একদল নৌকায় উপর। কাশীনাথ দেখি-লেন, মধ্যস্থলে একখানি পান্সী। পাছে পান্সি বাহি রগাঙে চলিয়া যায়, এই ভয়েই দস্যুরা জলে পথ আটকাইয়াছে। পাছে আরোহীরা ডাঙ্গায় উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, এই ভয়ে দস্যুরা স্থলে পথ আটকাইয়া আছে। অতএব দেখা গেল, জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ। জলপথে পালাইতে গেলে যে, আরোহীদিগকে এক বিপদ হইতে অন্য বিপদে পড়িতে হইত, মৃগকে ব্যাঘের ভয়ে পলাইয়া ব্যাঘের মুখে ঢুকিতে হইত, তাহা আমি জানি, কাশীনাথও জানিতেন। গরুটীর জলে স্থলে যে, সমান ভয় ছিল, তাহা অনেকেরই জানা ছিল। তথাপি দস্যুরা অতি সাবধান হইয়া জাল ঘিরিয়াছিল। হক সাহেবের উৎপাতে কাজ বড় মন্দা পড়িয়াছিল, শীকার সর্ব্বদা জুটিত না। অবস্থার আভাস দিতে সময় লাগিল, অবস্থা দেখিতে কাশীনাথের পলকমাত্রও বিলম্ব হইল না। প্রতিকারের পন্থা দেখিতেও বিলম্ব হইল না। দস্যুরা শীকার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাশীনাথের নৌকা যে, এরূপ নক্রত্রবেগে গিয়া পড়িবে, তাহা তাহারা বোধ হয় মনে করে নাই। হয় ত মনে করিয়াছিল, "আমরা জলে স্থলে শীকার ঘিরিয়াছি। দলেও আমরা নিতান্ত পাতলা নহি। বিশেষতঃ গরুটী আমাদের নিজের রাজ্য, বাগান আমাদের চিরন্তন কেল্লা। এখানে আমরা ভয় করিতে যাই কেন?" সাহসে তখনকার দস্যুরা অদ্বিতীয় ছিল।

কাশীনাথের নৌকা যেমন দস্যুতরীর কাছে গিয়া পড়িল, অমনই বীরবর কাশীনাথও সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া লাফদিয়া দস্যুতরীর উপর পড়িলেন। ভজহরি গুরুদাসও প্রভুর অনুগমন করিতে কুণ্ঠিত হইল না, দুই তিন জন দাঁড়ীও সেই নৌকায় গিয়া পড়িল। দস্যুরা প্রথমে একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সে ভাব মনে যেমন আসিল অমনই চলিয়া গেল। দস্যুরাও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

কিন্তু বন্দুক পিস্তলের কাছে সিংহ ব্যাঘ্রকেও মাথা হেট করিতে হয়। নৌকার দস্যুরা পলাইবার মানসে জলে ঝাঁপ দিল, কাশীনাথের ঘোরা পিস্তলেও দম দম করিয়া দুই তিনটা আওয়াজ হইল। ভজার বন্দুক পূর্ব্বেই শব্দায়মান হইয়াছিল, একটা গুলি তীরের দিকেও

ছুটিয়াছিল। বন্দুকের এক আওয়াজেই তীর দস্যুশূন্য হইয়া গেল, দুষ্টেরা বাগানের দিকে পলাইয়া গেল।

দাঁড়ীদিগকে কাশীনাথ জলে পাড়তে ইঙ্গিত করিয়া নিজে অভয় দিতে দিতে অন্য নৌকায় গিয়া পড়িলেন। দস্যুরা সে নৌকা খানাকে আপনাদের নৌকার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। অভিসন্ধি ছিল প্রথমে নৌকায় কার্য্যসিদ্ধি করিয়া পরে মাঝগঙ্গায় গিয়া উপস্থিত হইবে। সেই খানে বাঁধন খুলিয়া আরোহিপূর্ণ নৌকা খানা ডুবাইয়া দিবে। দৈব যে, এরূপ বিরূপ হইবে, ইহা দস্যুরা ভাবে নাই। দূরে এক খানা নৌকা আলোক দেখিয়া তাহা তাহারা বুঝিয়াছিল। কিন্তু সত্য সত্যই যে, কাশীনাথের নৌকা শুক্রবার সে পথে পথে চলিবে, ঠিক সেই সময়েই সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে; ইহা দস্যুরা আলোক দেখিয়াও অনুমান করিতে পারে নাই। শনিবার হইতে চরত দস্যুরা কাশীনাথের ভয়ে সাবধান হইত। কালীপূজার পূর্ব্বদিন বলিয়াই যে, কাশীনাথ শুক্রবার বাড়ী যাইতেছিলেন ইহা দস্যুরা মনে করিতে পারে নাই। দৈব প্রতিকূল হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। সোণার হরিণ ভগবান্ রামচন্দ্রকেও ভুলাইয়া দেয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিত্রাণ।

কাশীনাথের নৌকায় ক্রমাগত রঙমশাল জ্বলিতেছিল। জল স্থল আলোকাকীর্ণ হইয়াছিল; অরোহিনৌকায় গিয়াই কাশীনাথ দেখিলেন, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। প্রথমে তিনি ভয়ে সিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পুনর্ব্বার নেত্রপাত করিয়াই দেখিলেন, নৌকার ভিতর দুইটি স্ত্রীলোক ও একটীমাত্র পুরুষ ঠেশান দিয়া বসিয়া আছে। একটু ভাল করিয়া দেখিয়াই, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বৈদ্যবংশধর বুঝিলেন, অতিভয়ে তিনজনই মূর্চ্ছিত, হঠাৎ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কাশীনাথ দেখিলেন, বস্ত্রাবৃত এক শিশু-মূর্ত্তি। দস্যুভয় কাহাকে বলে, শিশু তহা জানে না, তাহার মূর্চ্ছা হয় নাই, কিন্তু অনেকক্ষণ স্তন্যপান করিতে না পাইয়া সে ক্রন্দন করিতেছে।

কাশীনাথ উচ্চৈঃস্বরে অভয়দান করিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছিত পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভয় নাই—ভয় নাই, আমি—বেণী গ্রামের কাশীনাথ সেন, আপনাদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি, ভয় নাই, ভয় নাই।"

ঘোর মূর্চ্ছা! এত চীৎকারেও ভাঙ্গিল না। কিন্তু শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমেই সপ্তমে উঠিল; শিশু ককাইতে লাগিল; ককানী না থামিলে অনেক সময়ে শিশুর দম আটকাইয়া যায়, শ্বাসরোধে শিশুর মৃত্যু হয়। কাশীনাথ কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবার লোক নহেন। ভজহরিকে বলিলেন, "ভজা তুই নৌকার ছইয়ের ভিতর ঢুকিয়া ছেলেটিকে কোলে নে। আহা বাছার কি কষ্টই না হইতেছে।" নিঃসন্তান কাশীনাথের বীরহৃদয় এত কাণ্ডেও তিলমাত্র বিচলিত হয় নাই, এইবার বিচলিত হইল। কিন্তু কাশীনাথ তৎক্ষণাৎ আত্মসংযম করিয়া ফেলিলেন।

ভজা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, নৌকার ভিতর অপরিচিত স্ত্রীলোক, স্থান সংকীর্ণ; ইতস্ততঃ করিবারই কথা বটে। কাশীনাথ ভজহরিকে অভয় দিয়া বলিলেন, "এরূপ বিপদের সময়ে অন্য চিন্তা করিতে নাই; যাহাতে শিশুটীর কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটে, অগ্রে তাহার উপায় কর।"

ভজহরি মাথা হেট করিয়া নৌকার ভিতর প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, এমন সময়ে জননীরও হঠাৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। ইতিপূর্ব্বে ঘোর চীৎকারেও যাহার চৈতন্য হয় নাই, সন্তানের রোদনশব্দেই তাঁহার চৈতন্য হইল; জননীহৃদয় এমনই অদ্ভুত পদার্থ। নৌকা-ডুবি হইলে জননী ডুবিয়া মরেন, তথাপি ক্রোড়ের শিশুকে ক্রোড় হইতে ফেলিয়া আত্মরক্ষা চেষ্টা করেন না।

জননীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতেছে দেখিয়াই, কাশীনাথ মৃদুস্বরে অভয় দিতে দিতে বলিলেন, "মা ভয় নাই, আমি অমুক গ্রামের কাশীনাথ। আপনি আমার গর্ভধারিণী, আমি পুত্র। ভয় দূর হইয়াছে আমার নৌকা আসিয়া পড়িল, দেখিয়াই দস্যু পলায়ন করিয়াছে।"

এরূপ অভয়বাক্যেও রমণীর ভয় ঘুচিল না। ওরা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মঙ্গুথে; তাহাদের মূর্ত্তিও ত ভয়ঙ্কর দস্যুমূর্ত্তি, কাশীনাথের পাক হইতে দস্যুবৃত্তিই ছাড়িয়াছে, কিন্তু ভগবদ্দত্ত দস্যুমূর্ত্তি ত ছাড়িতে পারে নাই। রমণী আবার ভয়ে চীৎকার করিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইলেন, কাশীনাথ দেখিলেন, ঘোর বিভ্রাট।

আট দশ জন মানুষের ঘোর চীৎকারে ও পিস্তল বন্দুকের শব্দে যে পুরুষের মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না, তিনি কাপুরুষ কি না, তাহার সন্ধান কাশীনাথ করিলেন না; মহাপুরুষের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর লাঠী গাছটা লইয়া একটা গোঁজা দিলেন। গোঁজায় মহাপুরুষের বোজা বদন হাঁ হইল। তিনি আঁ—আঁ—করিতে করিতে অজগরের মত একবার চাহিয়া দেখিলেন। কাশীনাথ দেখিলেন, মহাবিপত্তি। গরুটার কাছে আর ত বিলম্ব করা চলে না। দস্যুরা ত দলপুষ্ট করিয়া ফিরিতে পারে। ঐ আরোহি নৌকার দাঁড়ী মাঝীদিগের এতক্ষণ কেন খোঁজ খবর লওয়া হয় নাই। কাশীনাথ জানেন, নৌকায় দস্যু পড়িলে দাঁড়ী মাঝীরা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ সাহস কয় জনের আছে? পাল্‌কী দস্যুহস্তে পড়িলে অধিকাংশ বেহারারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। গাড়ী দস্যুহস্তে পড়িলে, গাড়োয়ানের এই পন্থা। নৌকার দাঁড়ী মাঝীরাই বা অন্য পথ যাইবে কেন?

তথাপি কাশীনাথ এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে হঠাৎ নৌকার পাটাতনের একখানা তক্তা তুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, ভিতরে মানুষ। সেখানেও একপ্রকার মূর্চ্ছা। ভজহরি আর গুরুদাস মানুষ টানিয়া বাহির করিল। কাশীনাথ দেখিলেন, এক বৃদ্ধ মাঝী। দাঁড়ীদের দর্শন পাইলেন না।

কাশীনাথ সঙ্কল্প করিলেন, স্ত্রীলোক দুইটীকে এবং সেই মহাপুরুষটীকে নিজের নৌকায় তুলিয়া লইলেন। শিশুকে কোলে করিয়া কাশীনাথ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়ীরা তিন জনকেই কাশীনাথের নৌকায় তুলিয়া দিল। দস্যু-নৌকা এবং অরোহি নৌকা সেইখানে রহিল। কাশীনাথও আর বিলম্ব না করিয়া স্বীয় নৌকায় আশ্রয় লইলেন। যাহারা কাশীনাথের আদেশে এতক্ষণ গঙ্গায় পড়িয়া দস্যু খুঁজিতেছিল, তাহারা কোন দস্যুরই সজীব বা নির্জীব কোনরূপ লাস ধরিতে পারিল না। তখন অগত্যা কাশীনাথ নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

নৌকা চলিতে লাগিল; কাশীনাথ ও কমল ঘরের বাহিরে বসিয়া নরনারীদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিন জনেরই চৈতন্য হইল। অপরিচিত নৌকায় অপরিচিত লোক দেখিয়া আবার বা তিন জনেই অচৈতন্য হন! এই ভয়ে কাশীনাথকে বড়ই সাবধান হইতে হইল। কিন্তু এবার দৈব সহায় হইলেন, আর কাহারও মূর্চ্ছা হইল না। তখন অতি স্বল্প কথায় উদ্ধারের আনুপূর্ব্বিক বলিয়া কাশীনাথ সকলকেই একটু সুস্থ করিলেন। মার বাছাকে মা কোলে দিয়া কাশীনাথও একটু নিশ্চিন্ত হইলেন।

এত কাণ্ডের পর রাত্রি যে গভীর হইয়া পড়িবে তাহা বিচিত্র নহে। কাশীনাথের নৌকা কিন্তু চলিতে লাগিল। নৌকা শীঘ্রই জগদ্দল পৌঁছিল। অনতিবিলম্বে নৌকা হক-সাহেবের আপিশের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আপিশের সম্মুখেই নৌকা অপেক্ষা করিল। কাশীনাথ নিজে

নৌকা হইতে কমলকে হক সাহেবের আপিশে পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুদমনের আপিশ দিবারাত্র সজাগ। কমলকে আপিশে গিয়া অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। কাশীনাথ সকলেরই পরিচিত। তাঁহার নাম করিতেই এক জন বরকন্দাজ গিয়া হক-সাহেবের সহযোগী, আমাদের পরিচিত, চন্দ্রশেখরকে খবর দিল। বিচিত্র ব্যাপারের আভাস পাইয়া এবং কাশীনাথের নাম শুনিয়া, চন্দ্রশেখর স্বয়ং আসিয়া নৌকার কাছে উপস্থিত হইলেন। কাশীনাথের কাছে সংক্ষেপে সমস্ত রহস্য শুনিয়া, সহস্র মুখে তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া, যথাকর্ত্তব্য অবশ্যই করিব বলিয়া চন্দ্রশেখর স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কাশীনাথের নৌকাও কিয়ৎকাল পরে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। কাশীনাথের কথা স্থগিত রাখিয়া আমরাও এবার এইখানে বিদায় লইলাম।

স্বর্গীয় মহাত্মা ডিরোজিও।

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল হইতে, হিন্দু সমাজে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতা; কিন্তু বিশেষ ভাবে কি কিছুই নাই? বিশেষ ভাবে তিনটি প্রধান শক্তি তিন স্থান হইতে আসিয়া এই মহা পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিতেছে। (১) খ্রীষ্টির মিসনারিগণ। (২) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। (৩) হিন্দুকলেজ অথবা মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও। ডেভিড হেয়ারের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, প্রদীপের পাঠকবর্গের নিকট মহাত্মা হেন্‌রি ডিরোজিওর বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিব।

জানবাজার ষ্ট্রীটের অপর দিকে, লোয়ার সরকুলার রোডের পূর্ব্বপার্শ্বে, ইটালি পদ্মপুকুরের একটী বাটীতে, ১৮০৯ সালের ১০ই এপ্রেল, হেন্‌রি ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেন। ডিরোজিও শৈশবকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ ডেভিড ডুমণ্ড সাহেবের স্কুলে প্রেরিত হন। উক্ত স্কুল বাড়ীর বর্ত্তমান চতুঃসীমা এই:—উত্তরে গুমঘর, পশ্চিমে হাঁসপাতাল লেন, দক্ষিণে ধর্ম্মতলা, পূর্ব্বে এক ঘোড়ার আস্তাবল। সে সময়ের স্কুলে যতদূর বিদ্যা সম্ভব, ডিরোজিও তাহা এই স্কুলেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অন্য কোন স্কুলে তিনি কখন অধ্যয়ন করেন নাই।

ডুমণ্ড সাহেব স্কটলণ্ড দেশীয় লোক। তিনি সুশিক্ষিত ও স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার ছাত্র ডিরোজিওর চিত্তে, এই স্বাধীন চিন্তাশীলতা তিনি বিশেষ ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। ডুমণ্ড সাহেব ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন বলিয়া অনেক লোকে তাঁহার স্কুলে আপনাদের বালকদিগকে ভর্ত্তি করিয়া দিতে সঙ্কুচিত হইতেন। পাছে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস বিচলিত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় অনেকে তাঁহার স্কুলে বালকদিগকে পাঠাইতে সম্মত হইতেন না।

সে সময়ে সাধারণ শিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল, বুঝা আবশ্যক। ডুমণ্ড সাহেবের স্কুল ব্যতীত আর একটী স্কুল ছিল—সরবরণ সাহেবের স্কুল। স্কুলটী আদি ব্রাহ্ম সমাজের বাড়ীর নিকটে ছিল। সরবরণ সাহেব এক ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি বড় অহঙ্কার করিতেন। দুর্গোৎসবের সময় তিনি ছাত্রদিগের নিকট পার্ব্বণী লইতেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে পূজার সময় তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় এক হাঁড়ী সন্দেশ হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। হিন্দু কলেজে যাইবার পূর্ব্বে, অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র সরবরণ সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করিতেন। এই স্কুলে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বৈঠক খানায় হষ্টিম্যান সাহেবেরও একটী স্কুল ছিল।

ডিরোজিও ছয় বৎসর বয়সে ধর্ম্মতলার ডুমণ্ড সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তথায় পাঠ করেন। এই আট বৎসর, ডুমণ্ড সাহেব তাঁহাকে অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ডুমণ্ড সাহেব কুঁজো ছিলেন, কিন্তু বড় পণ্ডিত ছিলেন।

ডিরোজিওর এরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল যে, তিনি বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই এদেশের মধ্যে একজন সদ্বিদ্বান লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় সাহিত্যাদিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক তখন কেহই ছিলেন না। তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। বিলাতে কোন নূতন ভাল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে শুনিলেই তিনি তাহা আনাইতেন। যে সকল নূতন পুস্তক কোথাও মিলিত না, তাহা তাঁহার পুস্তকালয়ে নিশ্চিতই পাওয়া যাইত। এমনি তাঁহার অধ্যয়ন তৃষ্ণা ছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ডিরোজিওর স্কুলে পড়া শেষ হয়। কিন্তু তাহার পর তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষক ডুমণ্ড সাহেব তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, যত্নের সহিত তাঁহার সংবাদ লইতেন। ডিরোজিও তাঁহার কুব্জ-

দেহী শিক্ষককে চিরদিন ভক্তি করিতেন। এখনকার মত নয়। এখন অনেক শিক্ষক তাঁহাদের ছাত্রকে চিনিতেই পারেন না। এখন অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটা সম্বন্ধই থাকে না। অবশ্য ইহার কারণ আছে। কারণ থাকিলেও, এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় নহে।

ড্রমণ্ড সাহেব স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মীয়-দিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসেন। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে জাহাজে চাকুরি স্বীকার করিয়া এদেশে আসিতে হইয়াছিল।

১৮২৩ সালে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ডিরোজিও জে স্কট কোম্পানীর আপিসে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তথায় দুই বৎসর চাকুরি করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পর ষোল বৎসর বয়সে ভাগলপুরে তাঁহার মাসীর বাড়ীতে গমন করেন। তাঁহার মেসো মহাশয়ের নাম জন্‌সন্ সাহেব। তিনি ভাগলপুরে একজন নীলকর ছিলেন। তথায় ডিরোজিও নীলকুঠির কার্য্য করিতেন।

এ প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ডিরোজিওর স্বাভা-বিক কবিত্বশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিল। ভাগিরথীর লহরীলীলা, মনোরম সুগম্ভীর পর্ব্বতমালা, তাঁহার ভাব-রাশিকে উদ্বেলিত করিল। এই স্থানেই তিনি Fakir of Jeengheera নামক কাব্য রচনা করেন।

Jeengheera's rocks are hoar and steep
And Ganges' wave is broad and deep.

এই সকল প্রাকৃতিক শোভা তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্তকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। ভাগলপুর হইতে ডিরোজিও কলিকাতার ইণ্ডিয়া গেজেট নামক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদকের নাম ডাক্তার জন গ্রাণ্ট। কবিতাগুলির নিম্নে স্বাক্ষর থাকিত, 'Juvenes'

১৮২৭ সালে ডিরোজিও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি-লেন। তখন তাঁহার বয়স সতের বৎসর মাত্র। এই সময় তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইবা মাত্র তিনি কবি বলিয়া যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তিনি এই সময়ে কলিকাতা লিটেরেরি গেজেটের সম্পাদক এবং ইণ্ডিয়া গেজেটের সহকারী সম্পাদক হইলেন। 'কলিকাতা মেগাজিন্', 'ইণ্ডিয়ান মেগাজিন্,' 'দি বেঙ্গল আন্নুয়েল' এই সকল পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি হিন্দু কলেজের উচ্চতম বিভাগে সহকারী শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন। তখন ডিরোজিওর বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে এত অল্প বয়সেই তিনি গুরুতর কার্য্য সকল দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ডেভিডহেয়ার সাহেব, গ্রাণ্ট সাহেব, ডি, এল, রিচার্ডসন্ এবং পার্কার সাহেব তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিতেন।

১৮২৮ সালের মার্চ মাসে ডিরোজিও হিন্দুকলেজে ইতিহাস ও ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিতে হইত।

হেন্‌রি ডিরোজিও ভিন্ন আরও কয়েক জন উপযুক্ত ব্যক্তি উহার শিক্ষক ছিলেন। আর একটী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক উহার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার নাম ডাক্তার টাইট্লার। ইনি বড় পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু আধপাগলা রকমের লোক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে হাস্যরসোদ্দীপক দুই একটা গল্প বলি। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে, টাইট্লার সাহেবের ছোট ছেলের একখানি ছাগলের গাড়ী ছিল। ঐ গাড়ীতে তাহাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। টাইট্লার সাহেব এক দিন নিজে সেই ছোট ছেলের ছাগলের গাড়ীতে গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সাহেবের দেখিয়া অবাক্।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় টাইট্লার সাহেবের বিষয়ে আরও দুই একটি গল্প বলিয়াছেন। যে দিন ছাত্রেরা গণিত শিক্ষায় ফাঁকি দিতে ইচ্ছা করিত, সে দিন তাহারা শেষে একটা কৌশল করিত। এক দিন ছাত্রেরা মনে করিল, যে, গণিত শিক্ষা বিষয়ে সাহেবকে ফাকি দিতে হইবে। তখন একটি ছাত্র শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিল।

"নলিনীদলগত জলমতি তরলং।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং॥"

সাহেব কবিতাটী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা

করিলেন ;—"কি বলিতেছ ? কি বলিতেছ ? উহার অর্থ কি ?" তখন শ্লোকের অর্থ আরম্ভ হইল। সেই কথাতেই সময় কাটিয়া গেল, পড়া দিতে হইল না।

ছাত্রেরা সাহেবকে লইয়া আমোদ করিত। একদিন পাঠ্য পুস্তকের যে স্থান পড়া হইতেছিল, সে স্থানে Crawl শব্দ ছিল। তাহারা crawl শব্দের অর্থ বিল-ক্ষণ বুঝিত। তথাচ তাহারা সাহেবকে পুনঃ পুনঃ উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সাহেব নানাপ্রকার বুঝা-ইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া সাহেব ঘরের মেজেতে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া গৃহের ছাদ বিদীর্ণপ্রায় করিল।

হিন্দুকলেজে রস্ নামক একজন সাহেব রসায়ণ বিদ্যা ভাল না জানিয়াও উক্ত বিষয়ে শিক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি কেবল সোডার গুণ ভাল জানিতেন। সোডার গুণই সর্ব্বদা ব্যাখ্যা করিতেন। সেই জন্য ছাত্রেরা তাঁহার নাম রাখিয়াছিল 'সোডা।' স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার শিরোনামা ছিল, "Soda and his pupils"।

ডিরোজিও সাহেব এই সময়ে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিল যে, বোধ হয় কখন কোন শিক্ষকের প্রতি আবার ছাত্রগণ ইহা অপেক্ষা অধিকতর অনুরক্ত হয় নাই। ছাত্রদের মন আকর্ষণ করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল।

তিনি কলেজের সময়ের পূর্ব্বে ও পরে কথোপকথন দ্বারা ছাত্রদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিশেষভাবে মনস্তত্ত্ব ও ইংরেজী সাহিত্য বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিতেন। ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থ হইতে সুন্দর সুন্দর স্থান সকল পড়িয়া শুনাইতেন। বেতন পাই, চাকরি করি ; এরূপভাবে ডিরোজিও শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন না। কালেজের সময় অতীত হইয়া গেলে, ছাত্রদের সঙ্গে সম্বন্ধ চলিয়া গেল, এমনভাবে তিনি কার্য্য করিতেন না। একজন উৎসাহী ধর্ম্মপ্রচারক যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করেন, ডিরোজিও সেইভাবে শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন।

তাঁহার জীবনচরিত-লেখক এডওয়ার্ডস সাহেব লিখিয়া-ছেন ঃ—No teacher ever taught with greater zeal with more enthusiasm, with more loving intercourse between master and pupil, than marked the short term of Deroyio's connection with the Hindu College. তিনি আরও বলিয়া-ছেন ;—Neither before nor since his day has any teacher within the walls of any native educational establishment in India, ever exercised such an influence over his pupils."

ইহা ভিন্ন তিনি ছাত্রদের উন্নতির জন্য একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উহার নাম Academic Association মাণিকতলার সিংহমহাশয়দের একটী বাগান বাড়ীতে উহার কার্য্য হইত। ডিরোজিও উহার সভাপতি ও উমাচরণ বসু সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রগণ প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া পাঠ করিতেন এবং প্রবন্ধের বিষয় সকল লইয়া আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হইত। সভার অধিবেশন দিবসে অনেক বড় লোক দর্শকরূপে উপস্থিত হইতেন। যেমন ডেভিড হেয়ার, স্যার এডওয়ার্ড রায়েন, কর্ণেল বেন্‌সন্ (ইনি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন।) কর্ণেল বীটসন্ (ইনি পরে আডজুট্যাণ্ট জেনারেল হইয়াছিলেন।) বিষপ কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার মিল্‌স্। এই সকল সভায় সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রই আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল।

ইহা ভিন্ন ইটালি পদ্মপুকুরে ডিরোজিওর নিজের বাটীতে ছাত্রগণ একত্র হইতেন। তথায় নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। ডিরোজিওর এমনি আশ্চর্য্য আকর্ষণ ছিল যে, কতক কতক ছাত্র বাগবাজার হইতে ইটালি পদ্মপুকুরে আসিয়া একত্র হইতেন।

আলোচনার বিষয় সকলের মধ্যে কয়েকটি প্রধান বিষ-য়ের উল্লেখ করিতেছি। আত্মার স্বাধীনতা, অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস, সত্যের পবিত্রগুণ, ধর্ম্মসাধন, পাপকার্য্যের হীনতা, স্বদেশহিতৈষিতা, পরমেশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রভৃতি। পরমেশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম সাহেব যাহা বলিয়াছেন, এবং তদুত্তরে রীড ও ডিউগ্যাল্ড ষ্টুয়ার্ট যাহা বলিয়াছেন, এতদুভয়ের তুলনায় সমালোচনা দ্বারা বিচার হইত। ডিরোজিওর এই সকল ছাত্র, দেশপ্রচলিত মূর্ত্তি পূজা

অসার ও কাল্পনিক বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে, ডিরোজিওর ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইষ্ট মন্ত্র জপের পরিবর্ত্তে পোপের ইলিয়ডের বিশেষ বিশেষ স্থান মনে আবৃত্তি করিতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়া পড়িলেন।

ডিরোজিও সাহেব ফিরিঙ্গি ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন বটে, কিন্তু এমনি তাঁহার প্রভাব ছিল যে, ছাত্রেরা তাঁহাকেই চিনিত, হেডমাষ্টারকে তত চিনিত না। তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি ও অকৃত্রিম ভালবাসায় ছাত্রগণ এতই বশীভূত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না। তাঁহার কথা বড়ই মিষ্ট ছিল। ছাত্রগণ তাঁহার কথায় মোহিত হইত। একদিন কলেজ বাটীতে একটী তামাসা হইতেছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ উহা দেখিতেছিলেন। একটি বালক ডিরোজিওকে আড়াল করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। অন্য শিক্ষক হইলে হয় ত তাহাকে এক ধমক্ দিয়া সরাইয়া দিতেন। কিন্তু ডিরোজিও অতি মধুরভাবে তাহাকে বলিলেন; "My boy! You are not transparent. "প্রিয় বালক তুমি স্বচ্ছ পদার্থ নও।"

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম উভয় ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বিবাদকারী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অবিশ্বাসের কথা পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আমেরিকার একজন পুস্তক ব্যবসায়ী, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাসের কথা শুনিয়া টমাস পেনের লিখিত খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধী কতকগুলি পুস্তক কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে এক টাকা মূল্যে উহা বিক্রয় হইতে লাগিল। ক্রেতার সংখ্যা অধিক দেখিয়া উহার মূল্য ৫ টাকা করা হইল। তাহাতেও বিক্রয় হইতে লাগিল। অনেকের মধ্যে উক্ত পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল যে, শেষে কেহ কেহ আট টাকা মূল্য দিয়াও উহা পাইলেন না!

১৮৩২ সালে খ্রীষ্টিয়ান অব্জারভার নামক পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখিত হইয়াছিল যে, "হিউমের সংশয়বাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল, ছাত্রগণ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেছে। টমাস পেনের 'Age of Reason' নামক খ্রীষ্টধর্ম্ম বিরোধী গ্রন্থ ক্রয় করিবার জন্য ছাত্রগণ আট টাকা পর্য্যন্ত দিয়াও প্রাপ্ত হয় নাই।" টমাস পেনের পুস্তকের কোন কোন অংশ অনুবাদিত হইয়া 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইয়াছিল। বড় বড় পাদ্রিদিগকে বলা হইয়াছিল, আপনারা ইহার উত্তর দিন্।

সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার জন্য ডিরোজিও যে সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণে এদেশে স্থানে স্থানে অনেক সভা সংস্থাপিত হওয়াতে জ্ঞানার্জ্জন বৃদ্ধি হইয়াছিল। মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে, ডিরোজিও নীতিবিজ্ঞান বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। বহুসংখ্যক হিন্দু যুবা এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন।

অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত ক্যাণ্টের Critique of Pure Reason নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া ডিরোজিও একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উহার নাম Critique of Kant। বিসপ কলেজের অধ্যক্ষ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তার মিল্ উক্ত গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না।

ডিরোজিওর প্রভাবে যেমন স্থানে স্থানে সভা সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, সেইরূপ ১২।১৪ খানি পত্রিকাও প্রকাশ হইয়াছিল। এই সকলের দ্বারা চারি দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ছাত্রগণের উপরে ডিরোজিওর উপদেশ ও চরিত্রের প্রভাব সম্বন্ধে বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই;—কলেজের ছাত্রদের উপরে তাঁহার এতই প্রভাব ছিল যে, কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে ও সাংসারিক বিষয়েও তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চায় যাহাতে তাহাদের রুচি হয়, কুসংস্কারের হস্ত হইতে যাহাতে তাহারা রক্ষা পায়, এবং যাহাতে তাহারা নির্ম্মল নৈতিক জ্ঞান লাভ করে, সে বিষয়ে তিনি প্রাণগত যত্ন করিতেন।

ডিরোজিওর যত্নে ছাত্রেরা কেবল সাহিত্য, দর্শনাদি বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল এমন নয়, তাহাদের চরিত্রেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল! তাহাদের ব্যবহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিল। সকলেই তাহাদের চরিত্রের প্রশংসা করিত! তাহারা সত্যবাদী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ

(১) ৺ রামগোপাল ঘোষ।

(২) ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর। (৩) ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

(৪) ৺ শিবচন্দ্র দেব।

করিয়াছিল। কলেজের ছাত্রদের সত্যপরায়ণতার বিষয়ে লোকের এত দূর দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোন কলেজের ছাত্রের বিষয়ে কথা হইলে, লোকে বলিত, "ও কলেজের ছাত্র, ও কখন মিথ্যা কথা বলিতে পারে না।'

'রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত' গ্রন্থে ডিরোজিও ও তাহার ছাত্রগণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে। সতী-দাহ নিবারিত হইলে, রাজা রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন পত্র দিয়া ছিলেন, গল্পটি সেই সম্বন্ধীয়। এ স্থলে উহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"এই অভিনন্দন পত্র সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট আমরা একটী গল্প শুনিয়াছি; যে সময়ে মহর্ষি জেনারলকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়, সেই সময় বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাবু দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা এক দিন কালেজের এক ঘরে বসিয়া অভিনন্দন পত্র লইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, উক্ত পত্রের ইংরেজী রচনা রামমোহন রায়ের কি আডাম সাহেবের? এমন সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় ডিরোজিও সাহেব আসিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, তোমরা মাতৃষ না এই দেয়াল? নারী হত্যা রূপ ভীষণ প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে তোমরা কোথা আনন্দ করিবে, না অভিনন্দন পত্রের ইংরেজী কাহার রচনা, এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন রায় ইংরেজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি জানিলে তোমরা ইহা আডাম সাহেবের বলিয়া মনে করিতে না।"

ডিরোজিওর ছাত্রগণের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি।

বাবু রামগোপাল ঘোষ। ইঁহার বক্তৃতা শক্তির জন্য বিলাতের সন্ নামক এক খানি সংবাদ পত্র ইঁহাকে 'the Indian Demosthenes' বলিয়া ছিলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাওয়া ও তথায় শবদাহ রহিত করিবার জন্য মিউনিসিপাল সভায় একটি আইন করিবার প্রস্তাব হয়। ইহাতে হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। রামগোপাল বাবুর সুযুক্তিপূর্ণ ও তেজস্বী বক্তৃতায় উক্ত আইন পাস হইতে পারে নাই। তিনি অতি খাঁটি মানুষ ছিলেন! ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহেবেরা, তাঁহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংরেজেরা এ দেশীয় লোককে অতিশয় অবিশ্বাস করিতেন। কিন্তু উক্ত সময়েও ইংলণ্ডবাসী বণিকদিগের সঙ্গে বিশ্বাসের উপর রামগোপাল বাবুর ব্যবসায় চলিয়াছিল। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, রামগোপাল বাবুর উপরে ডিরোজিওর এতই প্রভাব ছিল যে, তিনি বলিতেন His approbation was heaven to me and his disapprobation hell" অর্থাৎ ডিরোজিও তাঁহার কোন কার্য্যের অনুমোদন করিলে, তাহা তাঁহার নিকট স্বর্গতুল্য বোধ হইত এবং অনুমোদন না করিলে তাহা নরক তুল্য বোধ হইত।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইনি অযোধ্যার বর্ত্তমান উন্নতির মূল। অযোধ্যার ক্যানিংকলেজ, ইঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার বেথুন কালেজ যে ভূমির উপর রহিয়াছে, উহার অধিকাংশ দক্ষিণারঞ্জন বাবুর দান।

ভক্তিভাজন স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়। ইনি প্রথম যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। যখন ইনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ছিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ ইহার বিরোধী ছিলেন! যখন রামতনু বাবুর মনে এ বিষয়ে আন্দোলন হইতে ছিল, তখন কৃষ্ণনগরে তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। রামতনু বাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উপবীত রাখা উচিত কিনা? দেবেন্দ্রবাবু তদুত্তরে বলিলেন;—"উপবীত রাখাতে কোন দোষ নাই। উহা আমাদিগের চাপরাস।' রামতনু বাবুর ন্যায় সাধু লোক ইহজগতে বিরল। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার রচিত 'সুরধুনী' কাব্যে রামতনু বাবুর বিষয় লিখিয়াছেন;—

"এক দিন তাঁর সঙ্গে করিলে যাপন।
সাত দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন॥"

বাবু রাধানাথ শিক্দার। ইনি গণিত শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এভেরেষ্ট পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিবার জন্য ইঁহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইনি অতিশয় বলবান লোক ছিলেন। অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই জন্য অত্যাচারী ইংরেজদিগের সহিত অনেক সময় ঘুষো ঘুষিতে প্রবৃত্ত হইতেন। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় ইনি 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহাতে পণ্ডিতি ভাষা ত্যাগ করিয়া সহজ চলিত বাঙ্গালায় প্রবন্ধ রচনার দৃষ্টান্ত ইনি প্রথম প্রদর্শন করেন। তাঁহার একটি বিশেষ মত এই ছিল যে, গোমাংস ভোজন না করিলে আমাদের জাতির কখনও উন্নতি হইবে না। এ কথার তিনি এই প্রমাণ দিতেন যে,

পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। এক প্রকার চর্ম্ম রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। লোকে বলিত, উহা গোমাংস ভোজনের ফল।

বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ইনি হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র। সদ্বক্তা বলিয়াও ইঁহার খ্যাতি ছিল। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য করাতে ইঁহাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইঁহাকে বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, পরে বমন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইঁহার আত্মীয়গণ ইঁহাকে শাসন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া কিছুদিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি পরিশেষে তাঁহার পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চোরবাগানে বাস করেন। তিনি জ্ঞানান্বেষণ নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। রসিককৃষ্ণ বাবু একটী মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে গঙ্গাজল হাতে করিয়া সাক্ষ্য দিতে হইত। যখন আদালতের লোক তাঁহার হস্তে গঙ্গাজল দিতে আসিল, তখন "গঙ্গা মানিনা" বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে কলিকাতায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন, দক্ষতা সহকারে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বাবু রমাপ্রসাদ রায়। (রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র) ইনি হাইকোর্টের সর্ব্ব প্রধান উকীল ছিলেন। ইনিই হাইকোর্টের সর্ব্ব প্রথম দেশীয় জজ। কিন্তু ইনি জজের আসনে বসিতে পারেন নাই। যখন ইনি মৃত্যুশয্যায়, তখন হাইকোর্টের জজিয়তি পদের নিয়োগপত্র ইঁহার সম্মুখে আনা হইল। ইনি দেখিয়া বলিলেন "উহাতে আর কি হইবে? আমি এখন উচ্চতর আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে যাইতেছি।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহার বিষয়ে অধিক কি বলিব? এরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু মহাত্মা বর্ত্তমান সময়ে অতীব বিরল।

বাবু শিবচন্দ্র দেব। ইঁহার ন্যায় সত্যপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী প্রায় দেখা যায় না। ইনি ইঁহার বাসগ্রাম কোন্নগরের সকল প্রকার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপকগণের মধ্যে ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর উক্ত সমাজের সভাপতি ছিলেন।

বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা কে, এম, ব্যানার্জ্জি। ইনি যদিও ডিরোজিওর ক্লাসে কখন পড়েন নাই, কিন্তু ইনি তাঁহার বিশেষ অনুগত ব্যক্তি ছিলেন। কলেজে, ডিরোজিওর সভায় ও ডিরোজিওর গৃহে সর্ব্বদাই তাঁহার সংসর্গে থাকিতেন ও তাঁহার উপদেশ শুনিতেন। পত্রিকার সম্পাদনে তাঁহার সাহায্য করিতেন। ইঁহার বন্ধুগণ এক দিন তাঁহার বাটীতে আসিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিয়া প্রতিবাসীর বাটীতে অস্থি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, তথাচ এই ঘটনার জন্য তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছিল। ইনি পরে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৮২৯ সালের মে মাসে হিন্দু কালেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ, সাহসের সহিত ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের মত ও প্রথা সকলের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। দার্শনিক পণ্ডিত হিউমের সন্দেহবাদ বিষয়ক গ্রন্থ অনেকে পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল মত অনেকের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল, ছাত্রদিগের যে সকল সভা ছিল, তাহাতে ঐ সকল মত সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতে লাগিল। কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া ছাত্রগণ প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনেক সভাতে হিন্দুদিগের শোচনীয় অবস্থার বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ যে অজ্ঞান ও কুসংস্কার, ইহা স্পষ্টরূপে বলা হইতে লাগিল। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এই শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত করিবার উপায় উদার শিক্ষা। স্ত্রীলোকদিগকে অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় রাখা হইয়াছে বলিয়া এই সকল যুবা পুরুষ যারপর নাই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একদিন একটি বৃহৎ সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ধার্য্য হইল যে, হিন্দু নারীদিগকে সুশিক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক!

পাশ্চাত্য আলোক, হিন্দু যুবকদিগের হৃদয়ে যখন প্রথম প্রবেশ করে, তখন এই প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, বাবু রামগোপাল ঘোষ ও তাঁহার কয়েক জন বন্ধু একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন 'আমরা গরু খাই'। ইহাতে কলিকাতা নগরে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। হইবারই কথা। রামগোপাল বাবুকে রামতনু বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এমন কর্ম্ম করিলে কেন?" রামগোপাল বাবু উত্তর করিলেন, 'ঐরূপ কথা শুনিয়া শুনিয়া লোকের সহ্য হইয়া গেছে।'

হিন্দুকালেজের কয়েকজন ছাত্র কিরূপে সর্ব্ব প্রথমে পাঁউরুটি কিনিয়া খাইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। একদিন সন্ধ্যার সময় ঠনঠনের চৌরাস্তার নিকট কয়েকজন হিন্দু যুবক একত্র হইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন যে, কিরূপে পাঁউরুটি খাওয়া যায়। সকলেরই ইচ্ছা পাঁউরুটী আহার করেন, কিন্তু কে সাহস করিয়া দোকান হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনে? তন্মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী বস্ত্রদ্বারা মুখ ও মস্তক আবরণ করিয়া আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে দোকানে গিয়া উহা কিনিয়া বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত করিলেন। তখন সকলে মহোল্লাসে "hurra! hurra!" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই এক সময়! এখন মুসলমানের পাঁউরুটি আহার করিয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা, এবং যে সকল হিন্দুগৃহে উহার প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে তাহারাই সংখ্যা, কে গণনা করিবে?

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষেরা কলেজের হেডমাষ্টার ড, আন্‌সোন সাহেবকে আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অন্যান্য শিক্ষকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করেন যাহাতে এমন সকল বক্তৃতা রহিত হইয়া যায় যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাস বিনষ্ট হইতে পারে। অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞায় কোন ফল হয় নাই। এই সময়ে কোন কোন ছাত্র যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোনও কোনও ছাত্র গুরুদত্ত মন্ত্র জপের পরিবর্ত্তে, হোমরের ইলিয়ডের কোন স্থান মনে মনে আবৃত্তি করিতেন।

১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যক্ষেরা আর একটি আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কোন শিক্ষক ছাত্রদের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা হইতে পারিবে না। কালেজ বাটীর ভিতর কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। অধ্যক্ষেরা বিশেষভাবে আজ্ঞা করিলেন যে, যদি কেহ কালেজের ঘরে বসিয়া কিছু আহার করেন, তাঁহাকে কালেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

এই সময়ে পাদ্রিসাহেবেরা ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে আরম্ভ করিলেন। ডফ সাহেব, প্রভৃতি পাদ্রিগণ কালেজের নিকটেই কোন বাটীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। কালেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণ আজ্ঞা করিলেন যে, কালেজের ছাত্রগণ কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা বা খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে পাইবেনা।

কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র-সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের হুকুমের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। ইণ্ডিয়া গেজেট নামক সংবাদ পত্রে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই;—কালেজের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, ছাত্রগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার অথবা তজ্জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবার অধ্যক্ষগণের কোন অধিকার নাই। যদি ছাত্রগণ তাহাদের প্রকৃত অধিকার বুঝিয়া চলে, তাহা হইলে অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞায় কিছুই হইবে না। কেবল হিন্দুদিগের অর্থে কালেজ চলেনা। সুতরাং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষগণ যে কোন আজ্ঞা করিবেন, খৃষ্টান গবর্ণমেণ্ট কখনই তাহাতে মত দিবেন না।" উক্ত প্রবন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা শুনিবার জন্য ছাত্রদিগকে এত উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল। অধ্যক্ষদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তাহারা যেন শীঘ্র উক্ত আজ্ঞা রহিত করেন, নতুবা ফল ভাল হইবেনা। ডিরোজিওর রচনা প্রণালীর সহিত উক্ত প্রবন্ধটির ঐক্য ছিল বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে উহা ডিরোজিওর লিখিত।

ডিরোজিওকে এই সকল অনিষ্টের মূল মনে করিয়া তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য হিন্দু কালেজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আহ্বান করা হইল। স্বর্গীয় রামকমল সেন মহাশয় এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আহ্বান-পত্র তিনিই লিখিয়াছিলেন। ডিরোজিও যে দোষী, তিনি যে ছাত্রদিগকে খারাপ করিতেছেন, ইহা কমিটীর অধিকাংশের মতে প্রমাণ

হইল না। তথাচ স্থির হইল যে, তাঁহাকে তাড়ান হইবে। কেন না, সাধারণ-মত তাঁহার বিরুদ্ধে, তাঁহাকে রাখিলে কালেজের ক্ষতি হইবে। রামকমল সেন মহাশয়ের এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, ডিরোজিওর প্রধান প্রধান ছাত্রদিগকেও তাড়ান হয়। তাহা বোধ হয় হয় নাই। যে রামকমল সেন মহাশয় প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি আঘাত করার জন্য ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে বিদূরিত করিলেন, সেই রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন জাতিভেদ ও সাকারবাদের প্রতি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। ডিরোজিও সম্বন্ধে কমিটিতে কি ধার্য্য হইল, সংস্কৃত কলেজের হরেস্ উইলসন সাহেব তাহা তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে লোকে কি কি অভিযোগ আনিতেছে তাহাও তিনি তাঁহাকে জানাইলেন; ডিরোজিও বাধ্য হইয়া তাঁহার কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে লোকে কি কি অভিযোগ আনিয়াছিল, এবং তিনি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথম, লোকে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছিল যে, তিনি ছাত্রদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেন। ডিরোজিও ইহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সুস্পষ্টরূপে বলেন যে, তিনি ছাত্রদিগকে আস্তিকতাই শিক্ষা দিয়াছিলেন; তবে তিনি বলেন যে, কোন বিষয়ের দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষাইতে হইলে, দুই পক্ষের যুক্তি বুঝাইয়া না দিলে, এবং যে পক্ষের যুক্তি সকল ভ্রমাত্মক, তাহার খণ্ডন কিরূপে হয় তাহা প্রদর্শন না করিলে, প্রকৃত ভাবে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হিউম সাহেবের যুক্তি সকল ছাত্রদিগকে যেমন বুঝাইয়া দিয়াছেন; সেইরূপ আবার রীড ও ডিউগ্যাল্ড ষ্টুয়ার্ট তাহার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও ছাত্রদিগের নিকট অতি পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে দুই পক্ষের যুক্তিই তিনি ছাত্রদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। নিরীশ্বর দার্শনিকদিগের যুক্তি সকলের খণ্ডন কি, তাহাও পরিষ্কার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই দিক্ না শিখাইলে প্রকৃত রূপে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় না।

ডিরোজিওর নামে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি পিতামাতাকে অমান্য করিবার জন্য ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। ডিরোজিও একথা অতি ঘৃণার সহিত অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে তাঁহার পিতার বাধ্য ছিলেন, তাঁহার পিতা জীবিত থাকিলে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারিতেন। তাঁহার মাতা জীবিতা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, তিনি তাঁহার বাধ্য পুত্র। ডিরোজিও বলিয়াছিলেন যে, পিতা মাতার বাধ্য ও অনুগত হইতে তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এক দিন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিতে ইচ্ছা করেন। দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি যথার্থই যে অত্যাচার হইত, তাহা তিনি জানিতেন; তথাচ তিনি তাঁহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পিতা মাতা অনেক অত্যাচার করিলেও, সন্তানের তাহা সহ্য করা উচিত। তাঁহার পিতা যদি যথার্থই তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি স্বতন্ত্র বাসা করিতে পারেন, নতুবা নহে। তাড়িত না হইয়া স্ব-ইচ্ছায় স্বতন্ত্র বাসা করিলে লোকে মন্দ বলিবে। দক্ষিণারঞ্জন কিছুদিন তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরে ডিরোজিওকে কিছু না বলিয়া তাঁহার বাটির নিকটে বাসা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে গিয়া সংবাদ দিলেন। ডিরোজিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাটি ভাড়া করিবার পূর্ব্বে আমার সহিত পরামর্শ করিলেনা কেন? দক্ষিণারঞ্জন উত্তর করিলেন আমি জানিতাম আপনি আমাকে উহা করিতে দিবেন না। সেই জন্যই আমি আপনার সহিত পরামর্শ করি নাই।

ডিরোজিও আর একটী ঘটনার কথা বলিয়াছেন; মহেশ চন্দ্র সিংহ নামে তাহার একজন ছাত্র তাঁহার পিতার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন! ডিরোজিও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যতদিন না তিনি তাঁহার পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ততদিন তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিবেন না।

শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

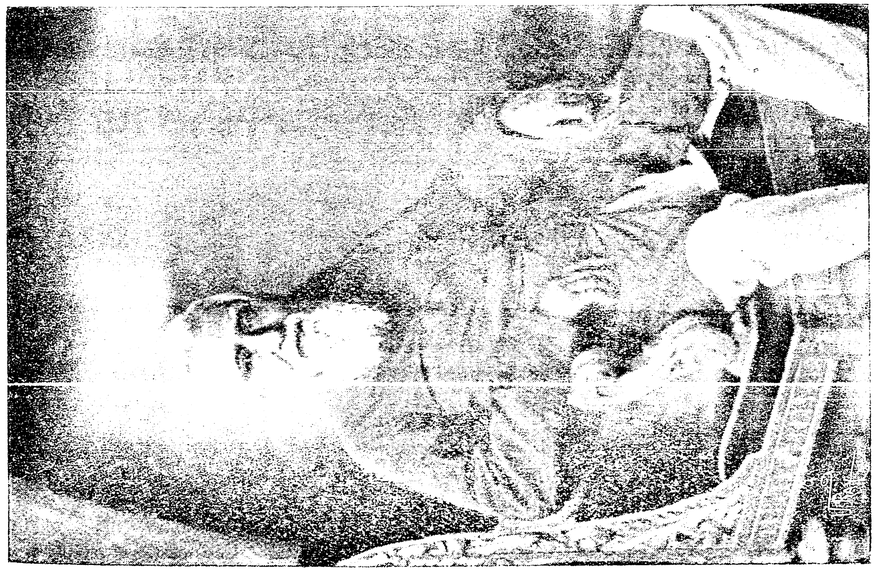

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী।

হইলেন। তখন ডিরোজিওর বয়স একুশ বৎসর মাত্র। ম্যাক্‌টনের বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর। ম্যাক্‌টন তথায় আসিয়া ডিরোজিওকে বলিলেন, "আমি তোমাকে প্রহার করিতে আসিয়াছি।" ডিরোজিও তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আচ্ছা, প্রহার করুন!" এমনি মধুর ভাবে ডিরোজিও কথাটি বলিলেন যে, ম্যাক্‌টনের রুদ্রভাব একেবারে চলিয়া গেল। তিনি প্রহার করিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে তাঁহার হস্তের বেত্রটি ডিরোজিওর স্কন্ধে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! মনে করুন যে, ইহাতেই আপনাকে প্রহার করা হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন! ডিরোজিও হাঁসিতে লাগিলেন। তাহার পর আবার এই ঘটনা লইয়া সংবাদ পত্রে অনেক লেখালেখি হইয়াছিল।

ডিরোজিও স্বদেশকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। স্বদেশের হিতের জন্য তিনি অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর স্বদেশ কি? কোন্ দেশ তাঁহার স্বদেশ? তিনি ভারতবর্ষকেই আপনার জন্মভূমি জননী বলিয়া প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, ভারতের হিতের জন্যই তিনি প্রাণগত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার রচিত এক খানি কাব্যের মুখবন্ধ স্বরূপ তিনি ভারতকে স্বদেশ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম দুটী চরণ এই :—

"My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই কবিতাটির একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগন-বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে অভাগা জননি!

ডিরোজিওর স্বজাতীয়গণ যদি তাঁহার ন্যায় ভারত ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভাল হইত; দেশের পক্ষেও ভাল হইত। কিন্তু তাঁহাদের বিপরীত ভাব। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, "মোদের বিলাত।" ডিরোজিও ভারতবাসিগণের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। দেশের কল্যান সাধনে তিনি দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। হিন্দুরা যে শীঘ্রই আপনাদের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবে, ইহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"In a few years the Hindus will take their stand by the side of the best and proudest Christians। ডিরোজিওর এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে।

১৮৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ডিরোজিও ডফ্‌স কলেজের কয়েকটী ক্লাশ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর বলেন যে, তিনি উক্ত কলেজে ব্যবহার শাস্ত্র ও অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত কলেজের ছাত্রগণ উহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ততা শিক্ষা লাভ করিবে! ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে ফিরিঙ্গিগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল; কিন্তু দারুণ মৃত্যু ডিরোজিওর এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে দেয় নাই।

১৮৩১ সালের শরৎকালে কলিকাতা অঞ্চলে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়। উক্ত সালের ১৭ই ডিসেম্বর ডিরোজিও ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হিন্দু কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহার ছাত্রদের সম্বন্ধ চিরদিনই সমান ছিল। কলেজ হইতে তিনি বিদূরিত

হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্রদের হৃদয় হইতে কেহ তাঁহাকে দূর করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রগণ রোগের সময় অহোরাত্র তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ছয় দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৮৩১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ২১ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

আদর্শ শিক্ষক, সুকবি, মহাপণ্ডিত, ধর্ম্মানুরাগী, প্রকৃত দেশহিতৈষী, এদেশের সামাজিক পরিবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগী, ডিরোজিও স্বর্গারোহণ করিলেন। সমস্ত সংবাদপত্রে ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটে পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইল। সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তিত হইল, এবং তাঁহার দেহত্যাগের জন্য শোকপ্রকাশ করা হইল।

ডিরোজিওর ন্যায় লোক এখন আর দেখা যায় না। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী আদর্শ শিক্ষক, তাঁহার ন্যায় সত্যপরায়ণ, সত্যানুরাগী, সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, তাহার ন্যায় প্রকৃত ভারতহিতৈষী, ও ভারতের হিতসাধক মহাত্মাগণকে প্রেরণ করিয়া দেশকে রক্ষা করুন। *

মাধুরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

কুটীর।

কুমারের প্রবেশ।

কু মা—মা—শুন, শুন—কই ঘরে নাই!
মুদ্রার থলিটা তবে রাখি এইখানে!
না হয় সময়ান্তরে মায়ের আশিস্
আসি লভিব হরষে।

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌ। বৎস,
কু। মা আমার
দু'কথায় সেরে নাও আশীর্ব্বাদ তব।
যা' রেখেছি কিছু দিন চলে যাবে বেশ।
এখনি যাইব আমি।
কৌ। কোথা হ'তে পেলে ইহা?
কু। সুধায়োনা কিছু—এ মুদ্রা তোমারি।
কৌ। সসাগরা ধরণী পেলেও জেনো বৎস,
তোমার পাপের ধন ছুঁইব না আমি।
অন্তর্যামী মন মম। তিন রাত্রি কোথা
ছিলে তুমি?
কু। চুপ্ কর, চুপি চুপি বল মা আমার।
কৌ। নিশ্চয় মিশেছ ডাকাতের দলে তুমি।
কু। সত্য, কিন্তু কি হয়েছে তায়?
কৌ। কি হয়েছে? একবার দেখেছ কি ভেবে—
কি দুর্ব্বহ জীবন তাদের? সমাজের
ঘৃণ্য তারা অতি। জীবনের সার রত্ন
দেবত্ব পাশরি তারা পশুর স্বভাব
হৃদয়েতে করেছে পোষণ, আশঙ্কায়
ভরে গেছে হিতাহিত জ্ঞান। চমকিয়া
উঠে ভয়ে নড়িলে গাছের পাতা; সারা
দিন থাকে সঙ্গোপনে—লুকায়ে বাহির
হয় ঘোর নিশাকালে। সুধাকরে দেয়
অভিশাপ। সভয়ে চাহিয়া দেখে প্রতি
পদক্ষেপে তারা, মৃদুজ্যোতি তারকার
পানে। নীরবে সাধিতে ফেরে নিরীহের
সর্ব্বনাশ—উহু কি ভীষণ!
কু। চুপ্ কর কথা শুন মা আমার।
কৌ। সুখনিদ্রা আর
তুমি ভুঞ্জিবে না কভু—মধুর প্রভাব
যার ক্লান্ত কৃষকের নিমীলিত করে
দেয় নয়ন পল্লব—অবসন্ন দেহ-
ভার, না রাখিতে তার ভূমি শয্যা'পরে।

---

* যাঁহারা ডিরোজিও সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা Thomas Edwards প্রণীত Henry Derozio নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। W. Newman & Co. র দোকানে পাওয়া যায়।

প্রঃ সঃ।

হইলেন। তখন ডিরোজিওর বয়স একুশ বৎসর মাত্র। ম্যাক্‌টনের বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর। ম্যাক্‌টন তথায় আসিয়া ডিরোজিওকে বলিলেন, "আমি তোমাকে প্রহার করিতে আসিয়াছি।" ডিরোজিও তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আচ্ছা, প্রহার করুন!" এমনি মধুর ভাবে ডিরোজিও কথাটি বলিলেন যে, ম্যাক্‌টনের রুদ্রভাব একেবারে চলিয়া গেল। তিনি প্রহার করিতে পারিলেন না। আস্তে আস্তে তাঁহার হস্তের বেত্রটি ডিরোজিওর স্কন্ধে স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! মনে করুন যে, ইহাতেই আপনাকে প্রহার করা হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন! ডিরোজিও হাঁসিতে লাগিলেন। তাহার পর আবার এই ঘটনা লইয়া সংবাদ পত্রে অনেক লেখালেখি হইয়াছিল।

ডিরোজিও স্বদেশকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। স্বদেশের হিতের জন্য তিনি অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর স্বদেশ কি? কোন্ দেশ তাঁহার স্বদেশ? তিনি ভারতবর্ষকেই আপনার জন্মভূমি জননী বলিয়া প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, ভারতের হিতের জন্যই তিনি প্রাণগত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার রচিত এক খানি কাব্যের মুখবন্ধ স্বরূপ তিনি ভারতকে স্বদেশ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক একটি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম দুটী চরণ এই :—

"My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই কবিতাটির একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগন-বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে অভাগা জননি!

ডিরোজিওর স্বজাতীয়গণ যদি তাঁহার ন্যায় ভারত ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভাল হইত; দেশের পক্ষেও ভাল হইত। কিন্তু তাঁহাদের বিপরীত ভাব। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, "মোদের বিলাত।" ডিরোজিও ভারতবাসিগণের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। দেশের কল্যান সাধনে তিনি দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। হিন্দুরা যে শীঘ্রই আপনাদের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবে, ইহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"In a few years the Hindus will take their stand by the side of the best and proudest Christians। ডিরোজিওর এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে।

১৮৩১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ডিরোজিও উক্ত কলেজের কয়েকটী ক্লাশ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর বলেন যে, তিনি উক্ত কলেজে ব্যবহার শাস্ত্র ও অর্থ ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত কলেজের ছাত্রগণ উহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ততা শিক্ষা লাভ করিবে। ঐ সময়ের অনতিপূর্ব্বে ফিরিঙ্গগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল; কিন্তু দারুণ মৃত্যু ডিরোজিওর এই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে দেয় নাই।

১৮৩১ সালের শরৎকালে কলিকাতা অঞ্চলে বীভৎস মারীভয় উপস্থিত হয়। উক্ত সালের ১৭ই ডিসেম্বর ডিরোজিও ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হিন্দু কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত তাঁহার ছাত্রদের সম্বন্ধ চিরদিনই সমান ছিল। কলেজ হইতে তিনি বিদূরিত

হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্রদের হৃদয় হইতে কেহ তাঁহাকে দূর করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রগণ রোগের সময় অহোরাত্র তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ছয় দিন রোগ ভোগ করিয়া ১৮৩১ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ২১ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হইল।

আদর্শ শিক্ষক, সুকবি, মহাপণ্ডিত, ধর্ম্মানুরাগী, প্রকৃত দেশহিতৈষী, এদেশের সামাজিক পরিবর্ত্তনের একজন প্রধান উদ্যোগী, ডিরোজিও স্বর্গারোহণ করিলেন। সমস্ত সংবাদপত্রে ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটে পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইল। সংবাদপত্র সমূহে তাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তিত হইল, এবং তাঁহার দেহত্যাগের জন্য শোকপ্রকাশ করা হইল।

ডিরোজিওর ন্যায় লোক এখন আর দেখা যায় না। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী আদর্শ শিক্ষক, তাঁহার ন্যায় সত্যপরায়ণ, সত্যানুরাগী, সাহসী ও দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তি, তাহার ন্যায় প্রকৃত ভারতহিতৈষী, ও ভারতের হিতসাধক মহাত্মাগণকে প্রেরণ করিয়া দেশকে রক্ষা করুন। *

মাধুরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

কুটীর।

কুমারের প্রবেশ।

কু মা—মা—শুন, শুন—কই ঘরে নাই!
মুদ্রার থলিটা তবে রাখি এইখানে!
না হয় সময়ান্তরে মায়ের আশিস্
আসি লভিব হরষে।

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌ। বৎস,
কু। মা আমার
দু'কথায় সেরে নাও আশীর্ব্বাদ তব।
যা' রেখেছি কিছু দিন চলে যাবে বেশ।
এখনি যাইব আমি।
কৌ। কোথা হ'তে পেলে ইহা?
কু। সুধায়োনা কিছু—এ মুদ্রা তোমারি।
কৌ। সসাগরা ধরণী পেলেও জেনো বৎস,
তোমার পাপের ধন ছুঁইব না আমি।
অন্তর্যামী মন মম। তিন রাত্রি কোথা
ছিলে তুমি?
কু। চুপ্ কর, চুপি চুপি বল মা আমার।
কৌ। নিশ্চয় মিশেছ ডাকাতের দলে তুমি।
কু। সত্য, কিন্তু কি হয়েছে তায়?
কৌ। কি হয়েছে? একবার দেখেছ কি ভেবে—
কি দুর্ব্বহ জীবন তাদের? সমাজের
ঘৃণ্য তারা অতি। জীবনের সার রত্ন
দেবত্ব পাশরি তারা পশুর স্বভাব
হৃদয়েতে করেছে পোষণ, আশঙ্কায়
ভরে গেছে হিতাহিত জ্ঞান। চমকিয়া
উঠে ভয়ে নড়িলে গাছের পাতা; সারা
দিন থাকে সঙ্গোপনে—লুকায়ে বাহির
হয় ঘোর নিশাকালে। সুধাকরে দেয়
অভিশাপ। সভয়ে চাহিয়া দেখে প্রতি
পদক্ষেপে তারা, মৃদুজ্যোতি তারকার
পানে। নীরবে সাধিতে ফেরে নিরীহের
সর্ব্বনাশ—উহু কি ভীষণ!
কু। চুপ্ কর কথা শুন মা আমার।
কৌ। সুখনিদ্রা আর
তুমি ভুঞ্জিবে না কভু—মধুর প্রভাব
যার ক্লান্ত কৃষকের নিমীলিত করে
দেয় নয়ন পল্লব—অবসন্ন দেহ-
ভার, না রাখিতে তার ভূমি শয্যা'পরে।

---

* যাঁহারা ডিরোজিও সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা Thomas Edwards প্রণীত Henry Derozio নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। W. Newman & Co. র দোকানে পাওয়া যায়।

প্রঃ সঃ।

তুমি চমকিবে কিন্তু অশান্তির ক্রোড়ে।
না করিবে যতক্ষণ নিদ্রাদেবী জয়
তব উৎকণ্ঠা ভীষণ—জ্বরগ্রস্ত রোগী
সম রহিবে জাগিয়া। চেতনা বিলুপ্ত
হ'য়ে আসিবে যেমনি মৃদু সমীরণ
স্বনে শিহরি অমনি রুদ্ধশ্বাসে ত্রাসে
রবে চেয়ে—দুরু দুরু হৃদয়ে ভাবিবে
ধর্ম্মের শাসন দূরে আসিছে বাঁধিতে।

কু। ওই কে আসিছে যেন!

কৌ। কেহ নহে বাছা।

কু। না, না, মানুষের পদশব্দ।

কৌ। নহে, নহে,
তরুশাখে ঝুলিতেছে শুধু দুর্ভাগার
দেহখানা। হত্যা অপরাধে হের তার
শোচনীয় পরিণাম।

কু। দেখিতে সাহস
নাহি মোর; তুমি কি দেখিতে পার?

কৌ। কেন, কিসের আশঙ্কা? আমিত ঘাতকী নহি!

কু। আমিও, আমিও নহি ঘাতক জননী।
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর যদি
হই আমি, তবু হয় না সাহস মোর
চাহিতে ওদিকে।

কৌ। শুধু দস্যু বলি' তুমি,
দস্যু ব্যবসায়ী যেবা, বাধা তার পদে
পদে; কাটে সে সকল বাধা অবিচারে।
নিদারুণ বাধা পেলে রক্তস্রোতে শেষে
করে তার সমাধান। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত
তার হের ওই মূর্ত্তি। সদয় হৃদয়
ছিল ওর এক কালে তোমারি মতন।
ভাবনায় তুমি কেঁপে উঠিছ যেমন।
হের হের পরিণাম তার। হাড়ে হাড়ে
পশিয়া ঝটিকা তার তুলেছে নূতন
ধ্বনি—যেন সে চেতনা লভি' মূঢ় নরে
সাবধান হ'তে শিক্ষা দিতেছে সরমে
নিজ পরিণাম স্মরি' অব্যক্ত ভাষায়—
যে শিক্ষা পারে না দিতে নীতিজ্ঞ-বচন।

কু। অহো কি দুর্ব্বহ এ জীবন; এ জীবিকা
কল্যই করিব পরিহার।

কৌ। আজি রাত্রে পারিবে না কেন?

কু। আজ পারিব না (দ্বারে আঘাত) শোন।

কৌ। কেহ এসেছে এবার।

কু। আসিব তোমার কোলে মা আমার কাল।

কৌ। ভাল তাই হবে। (কুমারের প্রস্থান)।
কে এসেছে ধীরে ধীরে করিছে আঘাত।

(কাশীর প্রবেশ)।

বৃদ্ধ তুমি, কেন দীর্ঘ জলা ভূমি পারে
এসেছ দারুণ শীতে? তুষারের কণা
বহিছে পবন সদা। স্থবির অথবা
পলিত কেশের সেত করেনা সম্মান।
কে তুমি প্রবীণ?

কা। দুর্গাধিপ অনুচর
দাসত্বের সীমা পারে হেরিয়া আমায়
তবু রেখেছেন প্রভু; জীর্ণ তরু রাখে
যথা যতনে মধুর ফল দিয়েছে যে
আগে। লক্ষ্মী রূপা ছিলা প্রভুর গৃহিণী,
আমাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী। হয়ত বা
আছেন জীবিতা এবে কোন স্থানে। লোকে
বলে সকল ঘটনা জানিবার শক্তি
ধর তুমি; জলে, স্থলে, কি বাতাসে, যাহা
কিছু ঘটে তোমার অজ্ঞাত নহে তাহা।

কৌ। মিথ্যা বলিয়াছে তারা।

কা। করিয়ো না রোষ,
বলে দাও—কর্ত্রী ঠাকুরাণী বেঁচেছে কি
তরণী ডুবিলে পর?

কৌ। এখনি প্রকাশ তুমি করিবে তা'হলে।

কা। কখনই নহে।

কৌ। বলিবে নিশ্চয়—বৃদ্ধ ও অবলা জাতি
বড়ই বাচাল।

কা। মনুষ্যত্ব আছে মোর।

কৌ। বিশ্বাসের পাত্র তুমি বটে হে স্থবির—
শপথ করনি বলি'। আছেন জীবিতা
তিনি, যদি বলি—

কা। ধন্য ভগবান তুমি।

কৌ। তা'হ'লে যাবে কি তুমি আবাসে তাঁহার?

কা। শুধু পায়ে যাব তথা যতই বন্ধুর
কেন হোক না সে পথ।

কৌ। চক্ষের সমক্ষে
তব, যদি পারি দেখাতে তাঁহারে—

কা। আমি
দেখিতে দেখিতে যদি অন্ধ হয়ে যাই—
তবু রহিব চাহিয়া।

কৌ। দেখ মোর পানে।

কা। উপহাস কোরনা আমায়।

কৌ। উপহাস নহে অভ্যস্ত আমার। হায় বৃদ্ধ কাশী,
তুমিও কি ভুলিলে আমায়?

কা। কখনই নহে।
এখন চিনেছি আমি চির সম্মানের
তুমি কর্ত্রী ঠাকুরাণী। চির দয়াবতী
তুমি—আমাদের স্নেহের জননী তুমি।
কুমার কোথায় মাতা?

কৌ। আছে সে জীবিত এবে বলিষ্ঠ যুবক।

কা। দয়াময় হরি
ধন্য তুমি ধন্য প্রভু বিপদ বারণ।

কৌ। উন্মত্ত সে পঞ্চভূত মর্ম্ম কাতরতা
শুনেছিলা মম; বিচ্ছিন্ন করেনি তাই
মাতৃবক্ষ হইতে সন্তানে। দয়াময়
করেছেন রক্ষা দুজনায়। বুঝি তাঁর
অমোঘ আদেশ দোঁহার কম্পিত দেহ
শিরে ধরি উত্তাল লহরী প্রাণ সহ
রেখে গেল দুর্গম বেলায়। ছিল সাথে
সামান্য সঙ্গতি, তাই আছি এ কুটীরে।

কা। এ যে বড় শোচনীয় স্থান শীঘ্র কর
পরিহার। দুর্গাধিপ আদেশে তোমায়
এসেছি লইতে। দুর্গে চল দুর্গেশের
রাণী।

কৌ। এ কি কথা?

কা। তোমারে ডাকিনী বলি
করিয়াছে অভিযোগ অবোধ প্রজারা।

কৌ। ডাকিনী বলিয়া? ভাল আমার উদ্দেশ্য
হইবে সফল ইথে। চল যাই তবে
আবার মিলিব দোঁহে।—

কা। ঈশ্বর কৃপায়—

কৌ। দুটি স্রোত যথা দুর্ভাগ্য ঝটিকা বশে
হইয়া বিভিন্ন পুনঃ হয় সম্মিলিত
মিলিব তেমতি। এ মিলন আমাদের
হেরিবে অন্তিম—বিধাতার আশীর্ব্বাদে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

বালক বেশী মাধুরী।

মা। এতদূর আসিলাম তবু পাই নাই
জন মানবের দেখা। পল্লীবাসী শুধু
এক জন—বড় ভদ্র স্বভাব তাঁহার—
মিলিল পথের মাঝে কথোপকথনে
নিরাশ অন্তরে তাই লভিনু সাহস
মিষ্ট আলাপনে শেষে লইলা বিদায়।
আর এই মাত্র পাশ দিয়ে চলে গেল
শিবা এক।

(ভৈরব ও অন্যান্য দস্যুর প্রবেশ ও মাধুরীকে পরিবেষ্টন।)

হায় ভগবান! কে তোমরা?

ভৈ। ভয় নাই, যুবক তোমার কিছু ভয় নাই, তোমার কাছে টাকা কড়ি ও যা' কিছু দামী জিনিস পত্র আছে সব দাও। কিন্তু যদি বাধা দাও, তা'হ'লে তোমার মাথা ভাঙ্গিব।

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

বী। ছেড়েদে ছেড়েদে ভীরু কুক্কুর তোরা
মানুষ যদ্যপি হোস্ আয় মোর পাশে
বহু মূল্য দ্রব্য হেথা কররে লুণ্ঠন।

ভৈ। তবে দেখ্‌চি রক্তারক্তি না হ'লে এখানে সহজে কিছু মিটবে না। যাক্, আমি যে পাখী ধরেছি তাকে ত আগে নিয়ে যাই। দেখ ছোক্‌ড়া তুমি কিছু বাধা দিও না—আমার সঙ্গে চল।

(বীরেন্দ্রের সহিত দস্যুদিগের যুদ্ধ। যুদ্ধে বীরেনের অক্ষমতা প্রকাশ—কতকগুলি দস্যুর মাধুরীকে লইয়া পলায়ন ও অপর দিক দিয়া, দুর্গাধিপের সৈন্যদলের প্রবেশ; বীরেন্দ্রের উদ্ধার সাধন, দস্যুদিগের পলায়ন ও কতকগুলি সৈন্যের পশ্চাদানুসরণ।)

সৈ। (বীরেন্দ্রের প্রতি) আপনাকে অবশ্য আমাদের সঙ্গে দুর্গে যেতে হবে।

বী। না, চল আমরা গভীর বনের ভিতর গিয়ে এই বন্য দস্যুদিগের আবাস বাহির করিগে।

সৈ। না, তা' হ'বে না—অনেকেই ওদিকে গিয়াছে, এখন আপনাকে দুর্গে লইয়া যাইতেই আমাদের উপর আদেশ।

বী। না—আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—তাকে এমন অবস্থায় ফেলে যাব?

সৈ। আদেশ আমরা অমান্য করিতে পারিব না।

বী। কি, তোমাদের সাহস নাই— সাহস নাই?

[সকলের প্রস্থান]

ক্রমশঃ—

হাস্য রসের রচনা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

আমরা সবাই হাসি বটে; কিন্তু সব সময়ে একই রকমের হাস্য হাসি না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভোর হইয়া, রকমারি রসানুভব করিয়া, আমরা রকম-বি-রকমের হাস্যে আস্য বিকাশ করিয়া থাকি। আস্যের অল্পাধিক বিকাশই হাস্যের বহির্লক্ষণ বটে। অথবা আলঙ্কারিক কথায় উহাকে "অনুভাব" বলি। পরন্তু, ঐ আলঙ্কারিক "পরিভাষা"তেই হাস্যের আরও তিনটী স্তর বা কার্য্য কারণ ও ফলাফল পরিব্যঞ্জক সম্বন্ধের নির্দ্দেশ আছে, যাহাকে বলা হয়, "আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব এবং ব্যভিচারী ভাব।"

যাহাতে আমাদের হাস্য উদ্দীপন করে বা যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা হাসি, তাহাই আলঙ্কারিক কথায় উহার "আলম্বন বিভাব"। হাস্যোত্তেজক ভাবের ভরে হাসির চেষ্টা হাস্য স্ফুরণের অব্যহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা উহার "উদ্দীপন বিভাব।" পরন্তু, হাস্যের স্ফুরণজনিত ক্রিয়া—অধরোষ্ঠাদির চাঞ্চল্য, চক্ষের সঙ্কোচ, দন্তাদির বিকাশ, ললাট, কপোলাদির আকুঞ্চন প্রসারণ, এই সকলকে আলঙ্কারিক বলেন,—"অনুভাব।" পুনশ্চ, হাস্য বা হাস্যের কারণ, হর্ষাদি গোপন বা হর্ষাদিতে অবসন্ন অভিভূত মোহিত হইয়া নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্যাদি আলঙ্কারিকের ভাষায়, হাস্যের "ব্যভিচারি ভাব!"

কিন্তু, এই "ব্যভিচারি ভাব"কে আরও 'বুরুল' কতক টানিয়া বাড়াইয়া, উহার ভিতর হাস্যের আরও কিছু কিছু ভাষ্য ভরিয়া দিলেই ভাল হয়। নহিলে আলঙ্কারিক সংজ্ঞায় হাস্যসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারটাকে বাঁধিতে কুলায় না। দীর্ঘ প্রস্থে ও 'চড়াই উতরাইতে খুব অনেকখানিই কম পড়ে। যেহেতু হাসি একই ভাবের ও একই রকমের নয়, আমরা এখনি বলিতেছিলাম। হর্ষ ভিন্ন অপরাপর ভাবেও হাসির উদ্রেক হইয়া থাকে। হর্ষের হাসি যেমন, হিংসার হাসিও তেমনি আছে। হর্ষের ঠিক বিপরীত ভাব—বিমর্ষের হাসিও কোন্ না আছে? হতাশের হাসি হায়! জানি কি জ্বালাময়। হৃদয়ের দ্রবীভূত হুতাশন সময়ে সময়ে হাস্যের বাতায়ন দিয়াও বহির্গত হইয়া থাকে। হর্ষের হাসি হাল্‌কা, পাতলা, এবং সময়ে সময়ে 'ছেবলা' ও বটে। আর বিমর্ষের এ হাসি অন্তরের অন্তস্তলনিহিত গুরু ভারাক্রান্ত নিগূঢ় বেদনা রাশির প্রজ্জ্বলিত বহ্নি ধারা প্রবাহিত সাংঘাতিক উচ্ছ্বাস। উভয়ে কতই বিভিন্ন! কিন্তু উভয়ই হাসি বটে। যে বিষাদ ক্রন্দনে পরিব্যক্ত হয়, তাহার বিপুলতা সত্ত্বেও, তবুও যেন কিছু আশ্বাস থাকে, কিন্তু, হাস্যবিচ্ছুরিত বিষাদ প্রায়ই পার্থিব সান্ত্বনার অতীত; তাহা ক্রন্দনতৃপ্ত বিষাদ অপেক্ষা অশিত গুণ তীব্র।

হাসির "আলম্বন" এবং উদ্দীপন-কারণ, অনেক রকমের। হাসিও হরেক রকমের রকমারি। তা, ছাড়া আসল হাসি ও জাল হাসি আছে। ভাবের হাসি ও ভেল হাসি আছে। জাল হাসি ও ভেল হাসিকে হাস্যরসের "ব্যভিচার" বই আর কি বলিবে? পরন্তু হর্ষাতিরিক্ত অপর ভাবোদ্দীপ্ত বা অপর অনুভূতিসূচক হাসিও তাহার ব্যভিচার বটে।

সাধারণতঃ আমরা হাসিকে হর্ষের বিকাশ বা হর্ষসূচক আনন্দোচ্ছ্বাস বলিয়াই জানি এবং উহা তাহাই বটে। কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা নয়; এবং বোধ হয় সর্ব্বদাও তাহা নয়। অনেক স্থলেই তাহার ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার হয় আমরা এখনই দেখিয়াছি এবং হর্ষ ভিন্ন অপরাপর মনোভাবও হাসির অব্যবহিত উদ্দীপন কারণ হইতে পারে, ইহাও বোধ হয় বুঝিয়াছি। কেন না আহ্লাদের সুধাময় হাসিরই মত বিষাদ বেদনার বহ্নিময় হাসিও আছে;

পরন্তু, বিষাদের বহ্নিস্রাবী হাসিরই মত, হিংসা, বিদ্বেষ শ্লেষের ও বিদ্রূপের বিষাক্ত ও বিষোদ্গারী হাসিও বিরল নয়। অনুরাগের হাসির ন্যায় ঔদাস্যের হাসিও আছে। প্রীতির হাসির মত ঘৃণার হাসিও কোন্ কম! সিধা হাসি বাঁকা হাসি, সেত আছেই।

অতএব আমরা দেখিতেছি, হাসি কেবল হর্ষসূচক, আনন্দব্যঞ্জক, আমোদোচ্ছ্বাস নয়। হাস্য মনোগত ভিন্ন ভিন্ন ভাববিশেষের বিকাশ বা প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস। উহা কখন স্বাগত, আত্মচিত্ত হইতেই আপনি উত্থিত; কখনও বা বাহিরের কোনও বস্তুর আঘাতে উদ্দীপ্ত হইয়া স্ফুরিত হয়। বাহিরের ঐ হাস্যোদ্দীপক বস্তুকেই আলঙ্কারিক হাস্যের "আলম্বন বিভাব" বলেন। হাস্য রসের রচনা, হাস্যের "আলম্বন বিভাব" বটে।

হাসি, মনে উঠিয়া মুখে ফুটে, সময়ে সময়ে সঘন শব্দায়মান হইয়া, খুব দ্রুতও ছুটে। হাসি, মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায়, মস্তিষ্কে সৃষ্ট হইয়া স্নায়বীয় আকুঞ্চন প্রসারণে, বাহিরে প্রকাশিত ও প্রবাহিত হয়। অতএব মনোতত্ত্ব ও শরীর বিজ্ঞানের সঙ্গেও উহার সমূহ সম্বন্ধ সংশ্রব রহিয়াছে। কিন্তু, প্রিয় পাঠক পাঠিকা ভয়ে পলাইবেন না, আমরা সে অঞ্চলে একেবারেই যাইতেছি না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও যাইব না, শপথ করিয়াই বলিতেছি। মহাশয় মহাশয়াগণ আর এক বিন্দু সহিষ্ণু হইয়া থাকুন, থাকিয়াই দেখুন, আপনাদের চিত্ত মনে নয়নে বদনে স্নায়বীয় ক্রিয়া প্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ ক্রীড়ার জন্য যথেষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিই কিনা। আমরা তাহা যেমন পাইয়াছি তেমনি আনিয়া দিব; বরং বেশ বাছিয়া গুছিয়া সাজাইয়া গোজাইয়াই সম্মুখে উপস্থিত করিব। তবে তাহা যদি আপনাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমালোচনা স্বাদভেদে তৎপর নেহাত নাসিকাকুঞ্চনকারী রসনায় না রুচে, এবং আপনাদের অতি মার্জ্জিত উন্নত রুচির ক্বচিৎ বিনোদন ও উন্মোচনসাধ্য চিত্তবৃত্তির বহিঃদ্বার দিয়া বা খিড়কী খুলিয়া, তাহারা আত্মভাবে আপনাদের ভোগাত্মা স্পর্শ করিতে ও ওষ্ঠাধর নাড়িতে না পারে, তাহাতে অবশ্যই 'নাচার'। আমাদের নূতন মালের নমুনা নামাইয়া যথাসময়েই দেখাইব।

আশা আকাঙ্ক্ষার উত্তেজক, নূতন আমদানির আকর্ষণ অধিক, নূতনকে অগ্রেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা আবশ্যক;—নূতন নিজেও "নজর" দিবার বা পাইবার জন্য, অগ্রে ও আগ্রহে আহ্বান করে। পুরাতনে, নিন্দা প্রশংসার "পালি" পড়িয়া 'দেনা-পাওনা' প্রায় পরিশোধ হইয়া গিয়াছে, এখন সে হিসাবে যেটা অবশিষ্ট, সেটা অদৃষ্ট এবং তাহার দাবিটাও একমাত্রা অতিরিক্ত রিষ্টপুষ্ট;—মানে,—"অমরত্ব" অতএব, অতটা দূর-পথ গমনোৎসুক, ঐরাবত, অজগর জাহাজের গাত্র স্পর্শ করা বা নঙ্গর ধরিয়া টানা কতটা "সাকুবি" তাহা বলা যায় না। তাঁরা হাসি জাতীয় হইলেও তাঁহাদিগকে লইয়া আর বড় হাসিও চলে না।

নূতন হাস্যরস-রচয়িতাদের মধ্যে কে কেমন হাসাইয়াছেন, কে কিরূপ হাসাইয়াছেন? হাসিত নানান রকমেরই আছে। মৃদু হাসি, মধুর হাসি, হো হো উচ্চ হাসি, ঈষৎ হাসি, ইতর ও উলঙ্গ হাসি, মার্জ্জিত ও সংযত হাসি, হা-করা হাসি, গাল-পোরা হাসি, টেপা হাসি, চিবান হাসি, মাপাহাসি মুরুব্বি আনার হাসি, রসের হাসি, বিলাসের হাসি, বিদ্রূপের হাসি, কৌতুকের হাসি, কুৎসার হাসি, অহমিকার হাসি, আহম্মুকের হাসি, উন্মাদের হাসি, সরলতার হাসি, কুব্জতার হাসি, তোষামোদ হাসি, তেলদানের হাসি, তাহার উপর আবার দেঁতোর হাসি ও চড়ুকের হাসি আছে;—হাসি হরেক রকমেরই হয়,—হাজারও 'কিছিমের' হইতে পারে। আসরে উপস্থিত অভিনব রসিকগণের কে কোন্ রসে কি ভাবের হাসি ভেয়াইয়াছেন ও কে কি রকমের হাসি হাসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেটা আমরা ঠিক দিয়া বলিতে বসিব না; সেটা পাঠক পাঠিকারা আপনারাই ঠাওর করিয়া লইবেন। তবে আমরা তাঁহাদিগকে ঠকাইব না; তাঁহাদের কাছে ঠকামিও করিব না, এটা ঠিক জানিবেন। খুঁত খাত খতাইয়া খামাকা একটা কথা কহা আমাদের রীতি নয়। পরন্তু, 'পদ্মমধু' বলিয়া পুঁই ফলের রস কাহারও পাতে দেওয়া আমাদের পদ্ধতির অপর পারে অনেক দূরে রহিবে। এ সকল অঙ্গে যাহা আমাদের আলোচ্য বলিয়া জানি তাহারই আলোচনা,—যেটা 'অংশ' বলিয়া মানি সেইটারই অভিনয়, এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি কেবল তাহারই পূরণ যতটা পারি করিয়া তুলিতে চাই।

আমাদের কর্ত্তব্য পূরণ বা পালন কল্পে, আপাততঃ এই খানেই আর একটা কথা পড়িতেছে। সে কথাটা নিশ্চয়ই নেহাত অকেয়ো কথা নয়,—কথাটা এই যে,

একাল সেকাল, হাস্য রসের রসিকরা তাঁদের হাস্য রসের রচনা সাধারণতঃ কি কি উপাদানে, উপকরণে,—কি কি মাল মশলায় পাক ও প্রস্তুত করিয়া, লোকের পাতে ঢালিয়া, তাহাদের চঞ্চুপুট চালনার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন? আমরা তাহাতে কিসের আস্বাদ পাইয়া হাসি, তাহার কি উপাদানে, কোন্ উপকরণে, মনে হাসির ভাব উদ্দীপন করে? আলঙ্কারিক যাহাকে হাস্য রসের "আলম্বন বিভাব" বলেন, এবং আনাড়ী আমরা যাহাকে 'উত্তেজক উপলক্ষ' উদ্দীপক উপাদান বা অবলম্বন কারণ বলিতে পারি, তাহা কি বস্তুতে কোন্ বর্ণে, কি বাক্য দিয়া গঠিত।

আমরা 'শঙ' দেখিয়া হাসি, 'রঙ' দেখিয়া হাসি; 'ঢঙ্গ' দেখিয়াও হাসিয়া থাকি। 'ভড়ঙ' দেখিলেও হাসি পায়। পরন্তু যেটাকে লোকে 'জবড়জঙ' বলে, সেটাও হাসির কারণ হয়। আমরা কৌতুকের কথা শুনিয়া, গাথা ও গান শুনিয়া এবং কাব্য ও কবিতা পড়িয়া, কোনও না কোন রকমের হাস্য হাসিয়া থাকি। প্রসঙ্গ প্রস্তাব, প্রবন্ধ উপন্যাস তাহাকে পরিহাসোপযোগী উপাদান বা উপহাসোদ্দীপকস্বরূপানুসারে হাস্যের কারণ হইয়া থাকে। হাস্য রসের গঠিত মূর্ত্তি ও চিত্রিত ছবি খুব হাসি হাসাইতে পারে। এ সবই হাস্যরসের আলম্বন বিভাব।" বাক্যচিত্র ও বর্ণচিত্রে উভয় ক্ষেত্রেই হাস্যরস আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। আকার গত গঠন ভঙ্গিতে ও স্বরূপ গত ইসারা ইঙ্গিতে উহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ সংযোগের ন্যায় নিঃশব্দেও হাস্যরস প্রবাহিত হইতে পারে। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বক্ষেত্র হইতেই হাস্যরস সংগৃহীত ও সৃজিত হয়। ঘটনা ও কল্পনা উভয়ই হাস্যরসের বিষয়ীভূত। উহার ক্রীড়া-প্রাঙ্গন বা কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি খুবই বিস্তৃত। সমগ্র সংসারে, এমন সামগ্রী বোধ হয় খুব কমই আছে যাহা অল্পাধিক পরিমাণে হাস্যাধিকারে পড়ে না। নরলোকের ও দেবলোকের প্রায় কাহাকেই উহা ছাড়ে না; কোথায়ও যাইতে কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হয় না। হাস্য তাহার হাল্কা হাওয়ায় অটলকে টলায়, অনড়কেও নাড়ে; চপল খল খল হাসি অচলকেও সঞ্চালিত বা বিচলিত করে, লঘু স্পর্শে অতি বড় গুরু গম্ভীরকেও গলাইয়া ফেলিতে পারে। এতই শক্তি অথচ কতই হালকা এই হাসি।

হাসি, উহার সরল ও নির্ম্মল শক্তিতে উপাদেয়, উপভোগ্য অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করে, আহ্লাদের স্নিগ্ধ সমীরণ হিল্লোলে, সুশীল ও ক্রীড়াশীল কৌতুকের কোলে, সুখদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটায়। পক্ষান্তরে, ঐ হাস্যই আবার উহার বক্র শক্তির সাংঘাতিক শরে, বিষ ও বহ্নি বর্ষণ করে। "তা একটু হাসি বৈত নয়! গায়ে ত আর ফোস্কা পড়ে না!" হাঁ, হাসিতে "গায়ে ফোস্কা পড়ে না" বটে, কিন্তু উহা রক্ত কুম্ভের ভিতর গিয়া, ভীমরুল হইয়া হুল বসায়। প্রকৃতরূপে ও পরিমিত মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে, হালকা হাসির হিল্লোলে পাহাড় পর্ব্বতও "পাতলা" হয়; শৌর্য্য ঐশ্বর্য্যের শূর বীরও পার পায় না।

উপহাসে এবং হাস্যে, 'রহস্যে' ও পরিহাসে প্রভেদ আছে। উপহাস, হাস্য পরিহাসের অন্তর্ভূত, অধীন ও ব্যবহার্য্য ও ব্যবহৃত অস্ত্র হইতে পারে, কিন্তু ঠিক হাস্য পরিহাস নয়। হাসের নিম্নভূমিস্থ উপহাস। উপহাস, অশ্রদ্ধা, উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ব্যঞ্জক ও তাহাতেই প্রযোজ্য; কিন্তু 'হাস' ঠিক তাহা নয়। হাস্য পরিহাসের বিষয়ীভূত হওয়া এক, উপহসিত বা উপহাসাস্পদ হওয়া অপর বস্তু। উপহাস সম্যকরূপে অবজ্ঞাসূচক, শাফ্ ঘৃণার পরিচায়ক। উপহসিত হওয়া, অবজ্ঞার সহিত হাস্যাস্পদ হওয়া। কিন্তু হাস্য পরিহাসের বিষয়ীভূত হওয়া তাহা নয়। অতি সম্ভ্রান্তও তোমার হাস্য পরিহাস বা কৌতুকের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু উপহসিত নহেন, এবং ঠিক হাস্যাস্পদও নহেন। হাস্যাস্পদে এবং উপহাসাস্পদে তফাৎ আছে, আবার হাসির অবসর বিধায়কে ও হাস্যাস্পদেও প্রভেদ আছে। পরিহাস, তামাসা, কৌতুক এক মাত্রা ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও পর্য্যবসিত হয়। এ সবই হাস্যের হস্তের হাতিয়ারের মত। * (ক্রমশঃ)

---

* ভ্রম-সংশোধন।

গত মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা প্রদীপে "হাস্যরসের রচনা" নামক "প্রথম প্রবন্ধে"র কয়েকটী স্থানে মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদ ঘটিয়াছে। একটী স্থানে ঐ প্রমাদ এমনি গুরুতর হইয়াছে যে, তাহাতে লেখকের প্রকৃত বক্তব্য কথার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হইয়া পড়িয়াছে। ৭২ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৯ম লাইন হইতে ১১শ লাইন পর্য্যন্তের প্রকৃত পাঠ এই;—

"উহা কৃত্রিম শোভা-সমন্বিত, বিচিত্র বর্ণ-রাগ-রঞ্জিত, নীরব-নীলিমা-সংলগ্ন, বিমানে দোদুল্যমান, দিব্য চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল, বাষ্পময়, মুক্তা-মতির মালা নয়।"

"শোভা-সমন্বিত" শব্দের পরস্থিত 'কমা-স্থলে' পূর্ণচ্ছেদ হইয়া এবং শেষ লাইনের শেষ শব্দ "নয়" স্থলে "ময়" হইয়া যে ভয়ানক ভ্রম ও তজ্জনিত অর্থ-বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

প্রদীপ-সম্পাদক

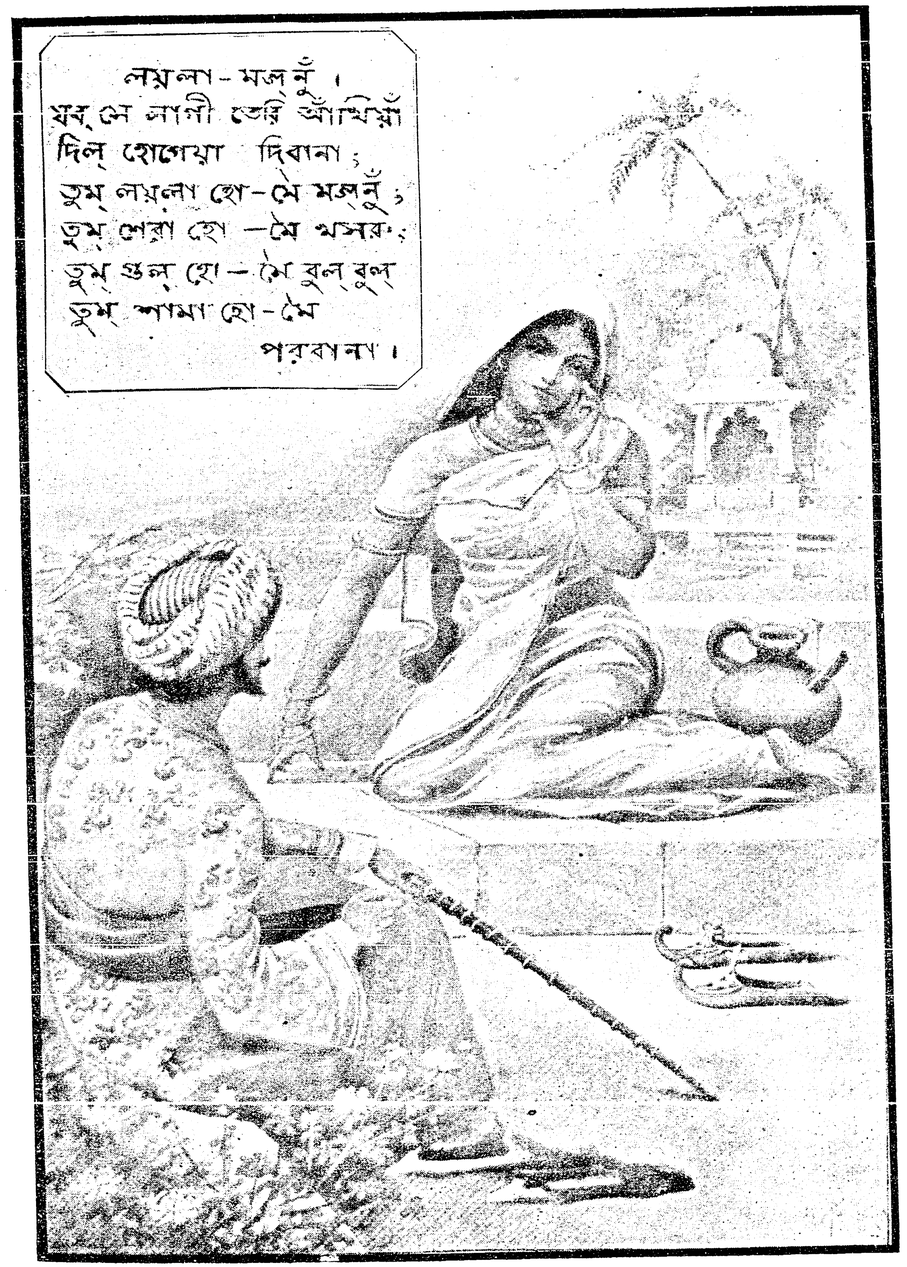

নাগ পূজা।

ভারতবাসী আমরাই যে কেবল নাগপূজা করিয়া থাকি তাহা নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু য়ুরোপখণ্ডের কথাই বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাসেও নাগ পূজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ফারগুসান সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন যে, নাগ পূজা ও বৃক্ষ পূজা সমস্ত মনুষ্য জাতিরই আদিম ধর্ম্ম। পূর্ব্বে অনেক স্থানেই দেবতার সম্মুখে নরবলি দেওয়া হইত। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপে নরবলি প্রচলিত। এখন অবশ্য ধর্ম্মের, শিক্ষার এবং সভ্যতার পুণ্যোজ্জ্বলকিরণ-সম্পাতে অন্ধ কুসংস্কার দূরে পলায়ন করিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের নামে যে সকল নৃশংস পাপের অভিনয় হইত, তাহাও বিস্মৃতির অতল জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেখানেই নরবলি দেওয়া হইত, প্রায় সেই সকল স্থানেই নাগ পূজাও হইত। দাহোমি ও মেক্সিকো দেশে নাগপূজা সর্ব্ব সাধারণের একটী প্রিয় ধর্ম্ম ছিল। এখনও দাহোমিতে মহা ধূমধামের সহিত নাগ-পূজা হইয়া থাকে।

বহুদিন হইতে সকল দেশেই সর্পের প্রতি দেব-সম্মান প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি আলেক্‌জান্দারের সময় পর্য্যন্ত টায়রে সর্পের প্রতি ভক্তি পূর্ণ সম্মান দেখান হইত। গত ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগেও পোলণ্ড দেশে নাগপূজা হইয়া গিয়াছে। ওফাইট (Ophites) নষ্টিক্ (Gnostics) এবং নিকোলিটন(Nicoletons) নামক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভিতর অনেকদিন হইতেই নাগপূজা প্রচলিত ছিল। ওফাইটগণ যদিও যীশুর ভক্ত খৃষ্টান, তথাপি তাহারা সর্পকে যীশুর অপেক্ষাও অধিক ভয় ও ভক্তি করিত। প্রত্যেক ওফাইট এক একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত কাঠের বাক্‌সের ভিতর যে কোন প্রকারের একটি সর্প ধরিয়া রাখিত এবং তাহাকেই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের তুল্য জ্ঞানে পূজা করিত।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত অসাধারণ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকেই সর্প হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহা শ্লাঘার সহিত আপনাদিগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অগষ্টাস্ (Augustus) বলেন যে, এটিয়া নামক সর্পই তাঁহার জন্মদাতা! রোমক সেনাপতি সিপিও (Seipio Africanus) নাগের সন্তান বলিয়া পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস যে স্বয়ং আলেক্‌জান্দারও নাগনন্দন। নিম্নে ইংরাজ কবি ড্রাইডেনের "Alexanders' Feast" বা 'সঙ্গীতের ক্ষমতা' শীর্ষক কবিতা হইতে এবং ডারউইন লিখিত একখানি পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আলেক্‌জান্দারের জন্ম-বৃত্তান্ত প্রমাণিত হইবে।—

(ক) "A dragon's fiery form bety'd the God ;
Sublime on radiant spires he rode
When he to fair Olympia pressed,
And while he sought her snowy breast.
Then rounded her slender waste he curled
And stamp'd an image of himself,
a sovereign of the world."

(খ) "When glides a silver serpent,
treacherous guest,
And fair Olympia folds him to her breast."

উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং Jove আলেকজান্দারের মাতা অলিম্পিয়ার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কোন একটী স্তব্ধ শান্ত নিশীথে একটী মহাসর্পের বেশে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, এবং নিদ্রিতা অলিম্পিয়ার সুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যা-সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে আলেকজান্দারের জন্ম হইল।

ইতিহাস অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, ইস্‌রাইলের রাজা যোথাম নাগপূজার নিমিত্ত একটী সুন্দর সুদৃশ্য মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরে তাঁহার আরাধ্য সর্প বাস করিত।

আমাদিগের দেববৈদ্য যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তেমনি গ্রীক ও রোমকদিগের দেববৈদ্যের নাম এস্‌কুলাপিয়স্ Esculapias। এই দেববৈদ্যের হস্তে যে দণ্ড আছে, তাহা দুইটী সর্প দ্বারা বেষ্টিত। খৃষ্টের জন্ম হইবার পরেও গ্রীক দেশে এস্‌কুলাপিয়সের দণ্ডবেষ্টিত সেই সর্প দুইটি

(ক) Dryden's 'Alexandar's Feast
(খ) Darwin's 'Economy of Vegetation.'

দেবতা-সদৃশ সম্মানিত ও পূজিত হইত। আমাদিগের নাগ দেবতার নাম যেমন মনসা, বাসুকী, অনন্ত, তক্ষক প্রভৃতি, তেমনি মিশরবাসীদিগের নাগদেবতার নাম হার্ম্মিস Hermis ; ফিনীসিয়দিগের নাগ দেবতার নাম "এসমন্", বাবিলনে 'বেল' ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে নাগদেবও বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহুদিদিগের মধ্যে এই পূজা প্রচলিত ছিল। লানুরিয়ম্ রোমনগর হইতে ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই লানুরিয়মে একটি নিবিড় অন্ধতমোরাশিব্যাপ্ত নিকুঞ্জ ছিল। সেই নিকুঞ্জ জুনোর (Juno) কুঞ্জ বলিয়া পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তথায় একটি বৃহদাকার সর্পের আবাস ছিল। রোমকগণও তাহাকে বিশেষ ভক্তি করিত। এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার মন্দিরে সদা সর্ব্বদার জন্য একটি জীবিত সর্প রক্ষিত হইত। ইহাকে সকলে সেই মন্দির-রক্ষক সর্প বলিয়া জানিত।

য়ুরোপ খণ্ডে সর্পে দেবতা-জ্ঞান সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ঃ—

১। বাইবেলে সর্পকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves."—Math ; x. 16.

২। প্লুটার্ক (Plutarch) সর্পকে দেবতা বলিয়া গিয়াছেন। "It feeds upon its own body ; even so all things spring from God, and will be resolved into deity again."—De Iside it os iride.

৩। কেহ কেহ বলেন যে, সর্প হইতেই আমাদের মনে অনন্তের একটা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ সর্প যখন তাহার লাঙ্গুল আপন মুখবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়, তখন তাহার দেহ একটী অনির্দ্দিষ্ট সীমায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"The serpent is symbolical of eternity. It is represented as forming a circle and holding its tail in its mouth. Dr. Brewer.

৪। সর্প চিরযৌবনের চিহ্ন স্বরূপ। কারণ একবার খোলস পরিবর্ত্তন করিবা মাত্রই ইহাদের আবার নূতন খোলস ও নব বিষের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

"The serpent is symbolical of renovation. It is said that the serpent, when it is old has the power of growing again like the eagle by casting it slough."

৫। গ্রীক এবং রোমকদিগের উপাসনার বেদীর উপর সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে।

৬। রোম নগরে যখন একবার ভয়াবহ মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তখন দেববৈদ্য ইস্‌কুলাপিয়স্ সর্পের আকার ধারণ করিয়া রোমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে স্থানে ঐ সর্পটী অবস্থান করিয়াছিল, রোমবাসিগণ সেই স্থানকে একটী পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদবধি স্বাস্থ্যদেবীর হস্তে একটী করিয়া সর্প থাকে।

(ক) "Esculapius assumed the form of a serpent, when he appeared at Rome during a putilence. Therefore is it that the Goddess of the health bears in her hand a serpent.

(খ) "O wave, hygeia, o'ver Britanian throne
Thy serpent-wand,and mark it for thine own.
Darwin : Economy of Vegetation IV.

এই সকল দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, য়ুরোপের প্রায় সকল স্থানেই সর্পপূজা হইত ; কোন কোন স্থানে এখনও তাহার প্রচলন আছে। কোন দিনই নাগপূজা প্রচলিত ছিল না, এমন স্থান পৃথিবীতে অতিশয় বিরল। সমগ্র এসিয়ার মধ্যে কেবল চীন দেশের কোন কোন স্থানে সর্পের পূজা হইত না। তদ্ভিন্ন আফ্রিকা, কাল্‌দীয়া, পালেস্তিন, বাবিলন, পারস্য, গ্রীস, ইতালি, কাশ্মীর, কাম্বোজ, তিব্বত, ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই, এমন কি আমেরিকার মধ্যেও কোন কোন স্থানে যে নাগপূজার রীতি ছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এসিয়া মাইনরে যে সকল অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপরেও সর্পের আকৃতি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পের প্রতি সম্মানের ইহাও একটী অন্যতম নিদর্শন।

এই ত গেল অন্য দেশের কথা। এখন ভারতবর্ষের কথা একটু বিবেচনা করা যাউক। প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার গৃহেই যে মনসা পূজা হইয়া থাকে, তাহার

আর সন্দেহ নাই। শুধু বাঙ্গালী হিন্দু কেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকটেই নাগপূজা একটী নূতন ব্যাপার নহে। প্রায় সকল পৌরাণিক গ্রন্থেই সর্প অমরত্বের নিদর্শন স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির অনেক দেব দেবীর প্রাচীন মূর্ত্তির মস্তকোপরি সর্পফণা ছত্রাকারে বিস্তারিত রহিয়াছে দেখা যাইবে। হিন্দুগণ যেমন মৃত মনুষ্যের সৎকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনেক স্থানে নিহত সর্পেরও সৎকার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভারতে সর্ব্ব প্রথমে কাশ্মীর প্রদেশে নাগপূজা প্রচলিত ছিল। আবুল ফজেল পাঠে জানা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ৩৫০।৪০০ শতাব্দীতে কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় সাত আট শত স্থানে নাগপূজা প্রচলিত ছিল।

কোনও কোনও স্থানে জীবিত গোখুরা সর্পের পূজা হইয়া থাকে, কোথাও বা খোদিত সর্প-প্রতিমূর্ত্তি পূজিত হয়; ইহা ভিন্ন মনসা দেবীর অন্যতম প্রতিরূপ মনসা গাছ ত আছেই।

দাক্ষিণাত্যে পূজার্থিগণ সর্পের আবাস অন্বেষণ করিয়া বাহির করে এবং পূজার দিনে তথায় যাইয়া পূজা করে ও সুগন্ধি পুষ্পের মালা গাঁথিয়া উপঢৌকন স্বরূপ রাখিয়া আসে।

দক্ষিণ ভারতে মহীসুর রাজ্যের পশ্চিমভাগে সুব্রহ্মণ্য-দেবীর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের ভিতর একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত মূর্ত্তিও স্থাপিত রহিয়াছে। পূজার্থিগণ নাগ-গণের উদ্দেশে সেই সুব্রহ্মণ্যদেবীর পূজা করিয়া থাকে। এখন পর্য্যন্ত তথায় পূর্ব্বের মত মহা সমারোহে নাগপূজা হয়।

রাজপুতগণ তাহাদিগের সর্পদেবতার মূর্ত্তি অর্দ্ধেক মনুষ্যাকারে নির্ম্মাণ করে। সিংহল ও গুজরাতবাসিগণ পূজা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বাড়ীতে সর্প ধরিয়া রাখে।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, সর্পের পূজা করিলে কুষ্ঠ, চক্ষু উঠা, বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি ভাল হয়। তাই সকল হিন্দুর গৃহেই নাগপূজা হইয়া থাকে। রমণীগণই অধিক আগ্রহের সহিত পূজা করিয়া থাকেন।

বোম্বাই অঞ্চলে প্রত্যেক হিন্দুই কাষ্ঠে অথবা কাগজে সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে।

নাগপূজার দিনে মারাঠা রমণীগণ অনেকে একত্র হইয়া সর্পমন্দিরে গমন করে, এবং পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পঞ্চবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট বর প্রার্থনা করে।

নাগ-পঞ্চমীর দিনেই নাগপূজা করিবার বিধি। এই দিনে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই অষ্ট নাগের পূজা দিতে হয়। সাঁতারা অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর খুব ধুমধাম। এই প্রদেশে অনেকগুলি নাগ-মন্দির আছে। স্ত্রীলোকেরা স্নানাদি করিয়া শুদ্ধচিত্তে মাটীর সর্প বা কাষ্ঠ ফলকে সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা চিত্রিত সর্প এবং পূজার উপকরণাদি লইয়া পূজার দিনে মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং ভক্তিভরে সর্পের পূজা করে।

নাগপত্তন্ বা নেগাপটামে নাগনাথ নামে একটী অতি-শয় প্রাচীন নাগমন্দির আছে। ঐ মন্দিরের ভিতর নাগ-নাথ নামে অনন্ত অবস্থান করিতেছেন। নাগনাথের সম্মুখে একটি বৃহৎ বল্মীকস্তূপ। উহারই মধ্যে বাস্তু-দেবতার অবস্থিতি বলিয়া ঐ বল্মীকস্তূপের নিকটে নৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়।

অন্যান্য স্ত্রীব্রতের ন্যায় নাগব্রতেরও স্ত্রী সুলভ কথা আছে। মনসা পূজার ব্রতকথা বোধ হয় আর হিন্দু পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে একটি কথা এস্থলে বলা অসঙ্গত হইবে না যে, বোম্বাইয়ের প্রভুকায়স্থ রমণীরা নাগ ব্রতের যে কথা কহিয়া থাকেন, তাহা আমাদের দেশের কথা হইতে একটু স্বতন্ত্র। সে যাহা হউক, নাগব্রতের কথা লিখিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিব না।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

টেলিগ্রাফে ছবিতোলা।

বিজ্ঞান-বলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, যখন প্রথম টেলিগ্রাফি আবিষ্কৃত হয়—তখন মানুষ মনে করিয়াছিল--এ কি হইল! অতঃপর আর কি হইতে পারে? তৎপরে আসিল তারহীন টেলিগ্রাফি, তৎপরে আসিল আলোক-বার্ত্তা, অতঃপর আরো কি আসিবে কে বলিবে? কিন্তু ঐ গুলির সঙ্গে সঙ্গে যে আর একটি অদ্ভুত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার বিষয় অদ্য কিছু বলিব।

টেলিগ্রাফে সংবাদ যায় এবং ফোটোগ্রাফে ছবি-তোলা হয়, ইহা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু ইহাদের একের কার্য্য অন্যে করিতে পারে, তাহা কেহ কখনও চিন্তা করি নাই; কিন্তু বিজ্ঞান সকলই পারিতেছে। টেলিগ্রাফ ছবি তুলিতেছে, ফোটোগ্রাফ টেলিগ্রাফের ন্যায় সংবাদ প্রেরণ করিতেছে! ফোটোগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ, অনেকটা রূপক; যথা মানুষের অস্থায়ী মনোভাব মানব-মুখে সদা পরিবর্ত্তনশীল ভাব-রেখা অঙ্কিত হইতেছে, ফোটোগ্রাফ তাহার সংবাদ স্থায়ী করিয়া দিতেছে; বহুদূরবর্ত্তী বুধগ্রহ, চন্দ্র উপগ্রহ, প্রভৃতির সংবাদ, বিজলীর বিচিত্র গতিরহস্য ফোটোগ্রাফ বহন করিয়া আনিতেছে; এ সকলের আলোচনা সময়ান্তরে করিব ইচ্ছা রহিল। অদ্য টেলিগ্রাফে ছবি-তোলা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া বিদায় লইব।

এই নবোদ্ভাবিত উপায়ের নাম হইয়াছে Telediagraph; ইহাতে ব্যয়াধিক্য বা জটিলতা কিছুই নাই। এই উপায় দ্বারা বিলাতের বহু সংবাদপত্র ও পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শত শত মাইল দূরবর্ত্তী রাজ্যে হঠাৎ কোন বিপ্লব উপস্থিত হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার নেতাদিগের চিত্র প্রকাশিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, জন সাধারণ অবাক হইয়া ধন্য ধন্য করিতে থাকে। এই টেলিডিয়াগ্রাফ ক্রমশঃ ব্যবসায় বাণিজ্যের অঙ্গরূপে পরি-গণিত হইতেছে।

ইহার উদ্ভাবক শ্রীযুক্ত আর্ণেষ্ট এ, হুমেল (Ernest A Hummel, of St Paul, Minnesota); ইনি একজন ঘড়ি-নির্ম্মাতা। তরুণ বয়স্ক হইলেও ইনি এই বয়সেই এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছেন; ইনি প্রথম ১৮৯৫ সালের মে মাসে ইহার মূল সত্য (theory) ধরিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

এই সময়ে যখন তিনি জর্ম্মনিতে তাঁহার জনক জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন একখানি সংবাদ পত্রে একটি ছবি দেখিয়া তিনি এই আবিষ্কারের সত্যে উপনীত হন। তৎপরে ১৮৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে New York Herald আফিসে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত আফিসের দুটি ঘর তিনি গ্রহণ করিয়া একটিতে টেলিগ্রাফের প্রেরক কল (Transmitter) অপরটিতে গ্রাহক কল (Receiver) রাখিয়া ছবির আদান প্রদান সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই প্রথম চেষ্টার সময়ই আফিসবেষ্টিত, আট মাইল লম্বা তারের মধ্য দিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং কি কি অভাব অভিযোগের উন্নতি আবশ্যক তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

এইরূপে বৎসরান্তে ১৮৯৯ সালের ১৯শে এপ্রেল তারিখে New york Herald আফিস হইতে Chicago Times Herald, the St. Louis Republic, The Boston Herald, and The Philadelphia Inquirer আফিস সকলে ছবি প্রেরিত হইতে থাকে। একই সময়ে একই তার দিয়া ঐ সকল আফিসে একটি ছবি গৃহীত হইয়া হুমেল-কীর্ত্তি-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল।

আচার্য্য মর্স (Morse) যে উপায়ে তাঁহার বিন্দু ও রেখা চালিত করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, হুমেলও সেই উপায়ে বিন্দু ও রেখা দ্বারা (dash & dots) ছবি অঙ্কিত করিতেছেন। মর্সের সংবাদ বিন্দু ও রেখা হইতে অনুবাদ আবশ্যক, হুমেলের বিন্দু ও রেখা একেবারেই ছবি আঁকিয়া দেয়।

টেলিগ্রাফিতে যেমন পৃথিবীকে একটি conductor করিয়া একটি মাত্র তার দিয়া একটি (complete circuit) পূর্ণ বেষ্টন করা হয়, Telediagraphএও তেমনি একস্থান হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা অপর স্থানে বিন্দু ও রেখা প্রেরিত হয়, ইহা পূর্ব্বে কর্ণদ্বারা গ্রহণ করিতে হইত; পরে দেখা গেল যে, প্রেরক কলে যেরূপ ভাবে বিন্দু ও রেখা পাঠান যায়, গ্রাহক স্থানে কলের নীচে একখানি সরু কাগজ রাখিয়া দিলে তাহাতেও সেই প্রেরিত চিহ্নের অপরূপ চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায়। এই ব্যাপারের উপরেই হুমেলের উদ্ভাবনের ভিত্তি স্থাপিত।

যন্ত্র দুইটী এক প্রণালীতে গঠিত (transmitter ও receiver) ও তার দ্বারা সংযুক্ত। প্রত্যেক কলে এক একটী ৮ ইঞ্চি লম্বা cylinder আছে, তাহাদিগকে একরূপ ঘড়ির কলের মত কল (clock work) দ্বারা একইরূপে ঘুরাইতে পারা যায়।

প্রত্যেক cylinderএর উপর একটী সরু প্লাটিনাম কাঁটা (Stylus or needle) আছে, ইহা টেলিগ্রাফের চাবির অগ্রভাগের ন্যায় (the point in a telegraph key)। এই কল ভিন্ন ছবি তুলিতে আরো কয়েকটি

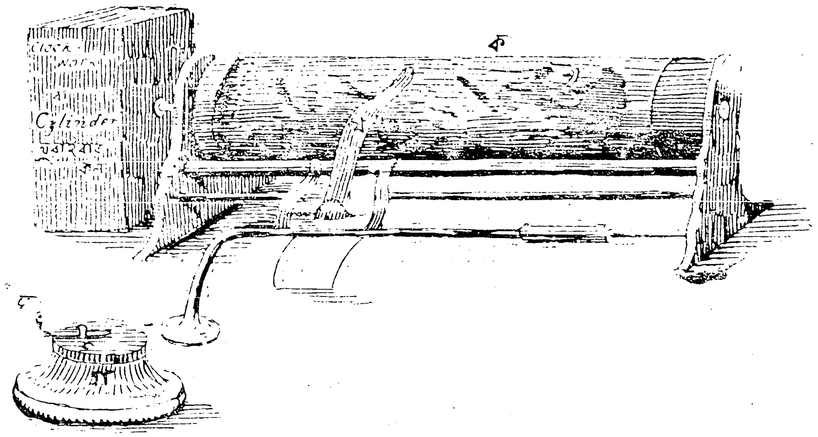

আবশ্যকীয় দ্রব্যের আবশ্যক,—যথা, একটি ৮ ইঞ্চি লম্বা ৬ ইঞ্চি চৌড়া টিনের পাত, এবং ঐ মাপের একপাত carbon manifold copying paper (যেরূপ কাগজ পোঃ আফিস প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়)।

এক্ষণে প্রেরণের নিয়মটি কি দেখা যাউক।—যাহার ছবি পাঠাইতে হইবে, তাহার ফোটোগ্রাফ হইতে উক্ত টিনের পাতে একটি ছবি আঁকিতে হইবে; ছবির চারিদিকে এক ইঞ্চি (Margin) স্থান ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। অঙ্কন কার্য্যে কলম বা তুলি ব্যবহার্য্য, কিন্তু লেখ্য পদার্থ কালী অপেক্ষা ঘন ও non conductor of electricity হওয়া আবশ্যক। 'সুরাসার' দ্রাবিত গালা কালীরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই গালা-অঙ্কিত টিন ফলকের ছবিখানি cylinderএর গাত্রে জড়াইয়া দিয়া প্রেরিতব্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইলেই ছবি প্রস্তুত হয়। তখন গ্রাহক কলের Cylinder গাত্রে দুইখানি কাগজের মধ্যে একখানি 'কয়লা কাগজ' রাখিয়া বেশ করিয়া জড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং কাঁটা বা Stylus কাগজের উপর রাখা হইল। এক্ষণে উভয় ষ্টেসনের মধ্যে প্রবাহ (Current) যোগ করা হইল এবং Cylinder দুটির কল (clock work) চালিত হইয়া দুটিকে সমভাবে ঘুরাইতে লাগিল। প্রেরক কলের কাঁটা যখন টিনফলকের গালার উপর দিয়া যায়, তখন গালা non-conductor বলিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ গ্রাহক কলে পৌঁছে না, ইহার ফলে গ্রাহক কলের কাঁটা কাগজের গায়ে জোরে লাগিয়া দাগ কাটিতে থাকে। যেমন গালা দিয়া ছবি আঁকা হইয়াছে, কাগজের গায়ে ঠিক সেইরূপ দাগ পড়িতে থাকে; টিন ফলকের গালাশূন্য স্থানে কাঁটা ঠেকিলেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিত হয়, আর অমনি গ্রাহক কলের কাঁটা কাগজ হইতে উঠিয়া পড়ে, তখন আর কোন দাগ পড়ে না। এইরূপে Cylinder একবার আবর্ত্তিত হইলে একটু থামিয়া উভয়েই বাম দিকে একটু সরিয়া যায় ও আবার ঘুরিতে থাকে। ক্রমে দাগের গায়ে দাগ লাগিয়া ২০ কি ৩০ মিনিটে একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। তৎপরে কাগজ খুলিয়া লইয়া দেখা যায়, ভিতরের কাগজে কয়লাঙ্কিত একটি ছবি। তৎপরে চিত্রকর দ্বারা সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন ও আলোক ছায়ার সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া তাহা প্রকাশযোগ্য হয়। পক্ককেশ হইলে অনেক সময় ছবিতে লিখিয়া দেওয়া হয়, চিত্রকরও তদ্রূপ আলোক ও ছায়া পাত করিয়া থাকেন। একই কল হইতে একই সময়ে একই ছবি ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাউক কতক্ষণের মধ্যে ছবি পাঠান যাইতে পারে। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিদ্যুৎ এক সেকেণ্ডে ৪০০,০০০ মাইল ছুটিতে পারে! অতএব দুই স্থান যত দূরবর্ত্তী হউক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎই প্রাপ্ত হওয়া যায় বলা যাইতে পারে।

এই প্রণালী এত সহজ যে, এক্ষণে আমরা প্রতিভার পূজা ভুলিয়া গিয়া মনে করি, হায়, এই সহজ কথাটা এতদিন কেহ ভাবে নাই? এক্ষণে ইহা New York Herald আপনার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, কালে ইহা সর্ব্বদেশে বিস্তৃত ও আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিলন।

মধুর সময় মধুর মলয়
মৃদুল মৃদুল বহে—
ডালে ডালে পিক মোহি' চারিদিক
মধুর মধুর গাহে।
মালতী বকুল অতীব আকুল
কাঁপিতেছে ধীরে ধীরে—
ফুল্ল কমল সুকোমল দল
ভাসিছে সুনীল নীরে।

ভ্রমর চুম্বিত ধরা-বিলম্বিত
কুন্দ কাঞ্চন ফুল—
প্রকৃতি সুন্দরী বাঁধিয়া কবরী
পরেছে শোভন দুল্।
সুনীল আকাশে চন্দ্র তারা ভাসে
জ্বালিয়া কনক দীপ—
হাসিছে প্রকৃতি নবীনা যুবতী
পরিয়া সোণার টীপ্।
ফুলের বিছানা করিয়া রচনা
আনন্দে বিভোর প্রাণ—

শ্যাম কলেবর কাঁপে থর থর
বিহগ গাহিছে গান।
যমুনা পুলিনে কুসুমিত বনে
চম্পক আসন রাজে—
কিশোর কিশোরী আপনা পাশরি
বসিয়া তাহার মাঝে।
অরুণ চরণ কাঞ্চন বরণ
কামিনী কান্তের দেহ—
যুগল অধরে কত সুধা ঝরে
মুখর নিকুঞ্জ গেহ।
ভাব বিভঙ্গিম চাহনি রক্তিম
শ্বাস বহে ঘন ঘন—
বিরহী দম্পতী উলসিত অতি
পুলকিত প্রাণ মন।
হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
কত প্রেম আলাপনে—
বিম্বাধর'পরি নাগর নাগরী
মুগ্ধ চুম্ব-আলিঙ্গনে।

ছাই।

ডে'কনা ডে'কনা ওরে ক'রোনা আদর,
লক্ষ্যহারা চ'লে যাক্ দগ্ধ পরিণাম,
উদাস-বিনাশ-গীতি গাহি ভয়ঙ্কর,
মহাশূন্যে করি ভর, দহি মনস্কাম!

জড় জগতের মাঝে অব্যক্ত সোপান,
অতি সূক্ষ্ম, অতি লঘু, লইতে সুদূরে
অণু পরমাণুগণে, গঠিয়া বিতান
সৌন্দর্য্যের নব কান্তি নব জড়পুরে।

গৌরবের অভ্রভেদী তুঙ্গ শৃঙ্গ সম
জ্ঞাননিধি মনীষীরে কি গড়িলি তুই?—
সুধু ছাই! তার মধ্য দিয়া অন্যতম
তরু, লতা, ফল, ফুল—ঘেটু কিংবা যুই!

যায় কল্লোলিয়া জল ছাই ভাসাইয়া
অই মহা শ্মশানের, লক্ষ পরমাণু,
ধনী-দীন-দেহ-কণারূপে মিশাইয়া
গড়িবে সুদূরে কোন্ অভাবিত তনু!

কার্থেজের চিহ্ন কবে সূক্ষ্ম দেহ ধরি
ছাই, তোর অনুপম বিমানে চড়িয়া,
পশেছিল ইউরোপে, কিম্বা অশরীরী
মূর্ত্তি তার কোন রূপে পোষিল এশিয়া;

কোন্ অগ্নি পর্ব্বতের দহি অভ্যন্তর,
ছাই রূপে রত্ন রাজি দূর দূরান্তরে
ঢেপিয়াছে, মিশিয়াছে তায় মহত্তর—
সহস্র জীবের ছাই, কে বলিতে পারে?

জ্যোতির পর্ব্বত যেই নৃপতি বাসনা
হীরক, কৌস্তুভমণি গৌরব ভাস্কর,
তার (ও) অই পরিণাম, একই লাঞ্ছনা
তুলে ক্ষীণ কণ্ঠে সেই বিষাদের স্বর!

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের ছবি হয়ে যায় ছাই,
অশ্রুমুখ প্রণয়ীর আশা বিনাশিয়া,
চাওনা চিতোর পানে, কি ছিল কি নাই,
জহর ব্রতের কথা দেখনা ভাবিয়া!

সকলেরি অন্তে রহে ছাই বিদ্যমান,
ভাঙ্গা গড়া, হাসি কান্না, প্রসাদ বিষাদ,
সকলেরি সাক্ষী ছাই উড়ায়ে নিশান,
গাইছে ধ্বংসের গীত—করুণ-নিনাদ!

তাই কি ভবের গায় চন্দন ছাড়িয়া
ছাই তোর সমাদর? চন্দন (ও) যে ছাই
হবে সেই এক দিন। গর্ব্ব তেয়াগিয়া
হে চতুর্দ্দিকে ছাই, আর কিছু নাই!

তাই কি ভবের গায় ছাই-বিলেপন?
তাই কি ললাট রঞ্জে সাধক সম্ভ্রমে
চিন্তিয়া অন্তিম ছবি?—কি ঘোর চিন্তন!
ছাই, তোর রুদ্ররূপ হেরিনু চরমে।

শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রেষ্টব্য।

স্থানাভাব বশতঃ এবার "কঙ্কন চোর" প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।—প্রদীপ সম্পাদক।

২৫।১নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রদীপ

পঞ্চম ভাগ। } বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ক্লিয়োপেট্রা।

"এস এস সহচরি, দিব শেষ আলিঙ্গন,
হবে আজি মৈশরীর জীবলীলা-সমাপন!
জীবন-নাটকে মম, কত অঙ্ক অভিনয়
করিলাম, আজি সখি ফুরাইল সমুদয়!
কোথায় প্রাণের মণি প্রাণাধিক প্রিয়তম,
এ কণ্ঠের সুরভিত প্রেম-ফুল-হার মম!
রূপ, রাজ্য, দেহ, প্রেম, জীবন, যৌবন ধন—
সর্ব্বস্ব চরণে তব করেছিনু সমর্পণ।
আজি প্রাণ দিব, নাথ, তোমার কমল পায়;
কি ছার এ প্রাণ মম, তব প্রেম তুলনায়!
দেখ নাথ, ওই দূরে ভূমধ্যের নীল জল,
কি অনন্তে কি অসীমে খেলা করে অবিরল;
নাহি কূল, নাহি সীমা, যত দূর দৃষ্টি যায়,
কেবল অসীম জল দিগন্তরে শোভা পায়!
কিন্তু ভূমধ্যের সীমা আছে নাথ নিরূপণ,
দূরান্তরে কূল তার, পায় করি অন্বেষণ।
নাহি সীমা আমার এ প্রেম-প্রীতি-মমতার,
অকূল যে অভাগীর হৃদি প্রেম-পারাবার!
সে প্রেম-সাগরে নাথ! তুমি মম রত্নোত্তম,
এ অতৃপ্ত বক্ষঃস্থলে তুমি তৃপ্তি, প্রিয়তম।
কিন্তু দুরদৃষ্ট নাথ! এত প্রেম-সুধাসার,
অভাগী জ্বলন্ত প্রাণে বরষিলে অনিবার;
এই দুঃখ, পরশিয়া সেই সুধা অবিশ্রাম,
"সাহারার" তপ্ত বুক জুড়াইতে নারিলাম।

"তৃপ্ত হয় মরু, নাথ, পরশি বরষা নীর,
হইল না ও অমৃতে তৃপ্ত বুক অভাগীর!
মিটিল না এ জগতে এ অতৃপ্ত তৃষা মম,
পরলোকে সে অতৃপ্তি মিটাইব, প্রিয়তম।
কেন তবে, প্রিয় সখি, লুটিতেছ ধরা'পরি,
নলিনাক্ষে অশ্রুজল কেন ঝরে সহচরি?
আজি এ সুখের দিনে কেন ফেলি আঁখি-নীর,
করিতেছ কলঙ্কিত এ আনন্দ অভাগীর।
কুল মান দেহ ধন এ রাজ্য সম্পদ মম,
আমার সর্ব্বস্ব যারে করেছিনু সমর্পণ,—
সেই প্রাণাধিক-পদ চলিলাম সেবিবারে;
কেন তবে, প্রিয় সখি, ভাসিতেছ আঁখি-ধারে?
বসন্ত-পূর্ণিমা আজি নিলীম গগনতলে,
যামিনী-অলকে চারু চন্দ্র-মণি ঝলমলে!
কুন্দ-পুষ্প-ধবলিত প্রেম বিভাবরী হাসে,
চরাচরে জলে স্থলে মনসিজ পরকাশে।
বেল যূথি হেনা গন্ধে সুরভিত বন-তল,
কি প্রেম যামিনী আজি কত শোভা নিরমল!
এমনি মনোজ্ঞ রাতি, পূর্ণ চন্দ্র নীলাকাশে,
আছে কি স্মরণ সখি! অনুরাগে অভিলাষে—
যেই দিন, এ যৌবন-রূপ-রাশি-উপহারে,
পাইলাম প্রাণেশ্বরে এই বক্ষঃস্থল 'পরে।
সে প্রেম যামিনী আজি, সেই পূর্ণ শশধর;
তাই আজি যাব সখি যথা মম প্রাণেশ্বর।
কি কায বিলম্বে আর, আন তবে ত্বরা করি,
বসন ভূষণ মম আছে যত, সহচরি;

"বিখচিত হেম হীরা মণি মুক্তা মরকত,
সুচিত্র বিচিত্র চারু কোমল বসন যত,
সে চারু রঞ্জিত বাসে, মণি মুক্তা অলঙ্কারে,
দেহ সখি সাজাইয়া এ সুতনু লতিকারে।
দেব-রাণী রাজ-রাণী আমার এ রূপে লাজে,
সাজিব যে অলঙ্কারে আরো মনোহর সাজে!
চরণ-চুম্বিত চারু শ্যাম কুন্তলের ভার;
অলকে কুঞ্চিত মম ক্ষুদ্র কাল-ফণি-হার;
অই কুঞ্জে তুলি ফুল, গাঁথিয়া বিনোদ মালা,
বিনাইয়া বেণী তায়, সাজাইয়া দাও বালা।
হেম-মণি-বিখচিত শত অলঙ্কার পরি,
এই দেখ চারু বাসে সাজিলাম, সহচরি।
অমরীর এত রূপ আছে কি, লো বরাঙ্গনে,
ধরে কোন রাজেন্দ্রাণী এতরূপ এ ভুবনে!
শেষ দিন, আজি হবে জীবলীলা সমাপন,
শেষ দিনে রূপ-ঘটা তাই এত অতুলন।
কত শোভাময়ী আজি প্রেম নিশি পূর্ণিমার,
মরিবার হেন দিন জগতে কি আছে আর!
বিদায় জনম শোধ দাও তবে সহচরি,
এ দুখিনী মৈশরীরে মনে রেখ দয়া করি;
দুখে সুখে দুইজনে জগতে সঙ্গিনী ছিলে,
জনম জনম যেন তব সম সখী মিলে।
তোমার মমতা স্নেহ, তব প্রেম প্রতিদান,
এ জনমে প্রিয় সখি শোধিবারে নারিলাম।
শত জন্মে শোধিবারে নাহি সাধ্য সহচরি,
তাই আজি চলিলাম সে বাসনা বক্ষে ধরি।"

মৈশরীর সুরভিত সেই সুখ কক্ষান্তরে,
ফলাধারে ছিল ফল সুসজ্জিত থরে থরে;
কোমল কমল কর বিধুমুখী বিকাশিয়া
ধীরে পরশিতে ফল, ক্ষুদ্র ফণা বিস্তারিয়া,—
ক্ষুদ্র ফণি শিশু দুটী উঠিল সে ফলান্তরে,
দুষ্ট প্রহারকে যেন দংশিবারে ক্রোধ ভরে।
সে অমরা-রূপ-ছবি ফণি-শিশু নিরখিয়া,
রহিল বিমুগ্ধ চিত বিষ-ভার সম্বরিয়া।
দলিত ভুজঙ্গ-শিশু নিরখিয়া অবিরাম,
চঞ্চল হইল ক্ষণে মৈশরী বিকল প্রাণ;
শ্যাম-পদ্মপলাসাক্ষে ঘুরিল এ বসুমতী,
জগত মমতা মায়া সকলি ভুলিল সতী;
অনিন্দ্য-লবঙ্গ-লতা ভুজবল্লী প্রসারিয়া,
ধরিল সে বিষ-লতা বিরহ-আতুর-হিয়া!
অমল চম্পক দাম বেড়িল সে ফণি-হার,
ভাবিল মৈশরী তাহা মালা নব যূথিকার;
মরমের বিষ জ্বালা যুড়াইতে অনিবার,
ভাবিল সে ফণী-মুখে আছে সুধা অমরার।
মৈশরী এতেক ভাবি তীব্র-বিষ-নিকেতন,
করিল সে ফণিমুখ বিম্বাধরে পরশন;
ফণিমুখ-সুধাপানে, সে অমৃত মদিরায়,
ঢলিল রূপসী মৃদু সুচারু শয্যার গায়।
করতলে বদ্ধ ফণী, ক্ষুদ্র ফণা বিস্তারিয়া,
রহিল সে রূপলতা ভুজবল্লী জড়াইয়া!
কুরঙ্গ-চপল-আঁখি সে রূপসী অমরীর,
মুদিল জনম তরে ঢালি শেষ অশ্রুনীর!
ঝরি অশ্রু মুক্তা-রূপে শোভিল বয়ানে ধীরে,
"বশোরা" গোলাপ পুঞ্জ সাজিল নীহার নীরে!
সে পূর্ণ যৌবন-দৃপ্ত দেহলতা সুগঠন,
শিথিলে রহিল পড়ি ছিন্ন নলিনের সম।
পূর্ণতম চৈত্র শশী খুলিয়া কিরণ হার,
যেন সে পর্য্যঙ্ক-অঙ্কে ঘুমাইল অনিবার!
আতপে বিশুষ্ক হেরি রূপলতা সুকুমার,
মলিন বিবর্ণ-রুচি ও হিরণ্য-প্রতিমার;—
ভর্ত্রী-শোকে সখিদ্বয় বিনাইয়া হাহাকারে,
কাঁদিল ভূতলে লুটি ভাসিয়া নয়ন ধারে!
কাঁদিল "ইরস" দুখে আঘাতিয়া বক্ষঃস্থল,
আবরিয়া কর-পদ্মে ইন্দু-মুখ নিরমল।
অন্যতম ফণি-শিশু ধরি করে "চারমিয়ণ,"
চুমিল সে ফণি-মুখ শোকার্ত্ত বিকল মন।
রাখিয়া অমর-স্মৃতি ভর্ত্রী-প্রেম-মমতার,—
ভক্তির অক্ষয় চিত্র দেখাইয়া অনিবার,—
ভর্ত্রী-শোক সখিদ্বয় না সহিয়া হৃদিতলে,
ঘুচাইল জন্ম শোধ প্রিয় ভর্ত্রী-পদতলে

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।

শব্দ ও সঙ্গীত।

মনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব চির প্রসিদ্ধ। স্বভাব-ক্রূর সর্প ইহার মোহিনী শক্তিতে, ক্ষণকালের জন্য আপন ভীষণ ধর্ম্ম ভুলিয়া স্তব্ধ ভাব ধারণ করে; হরিণযূথ নাকি ব্যাধের বংশীরবের যাদুকরী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিস্তৃত জালে পদক্ষেপ করে। মানুষ ত গীতরাগে চিরমুগ্ধ; সুস্বর-মেলনজাত সঙ্গীতের মোহময়ী শক্তিতে মুগ্ধ না হয়, এ প্রকার মানুষ প্রকৃতই জগতে বিরল। ইতর প্রাণী ও সাধারণ শ্রোতার নিকট সংগীতের সুস্বরই একমাত্র উপভোগ্য সামগ্রী; কিন্তু সংগীতজ্ঞ শ্রোতৃবর্গ সুস্বর ব্যতীত আর একটা দিক্ হইতে সংগীতকে দেখিয়া থাকেন,—শাস্ত্রোক্ত বিধিতে গীত হইতেছে কি না, বিচার না করিলে, ইঁহারা পরিতৃপ্ত হন না; সুস্বরের সহিত গানটীতে কড়ি কোমল ও বাদী বিসম্বাদী সুরের যথারীতি সম্মিলন হইতেছে কি না, তাহারই প্রতি ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই দুই দিক্ ছাড়া সংগীতের আর একটী দিক্ আছে, তাহাকে গানের বৈজ্ঞানিক দিক্ বলা যাইতে পারে। এই দিক্ হইতে সংগীত আলোচনা করিলে, যে মূল কারণে কর্কশ ও মধুর শব্দের মধ্যে আমরা একটা পার্থক্য দেখিতে পাই এবং যদ্দ্বারা দুইটী সুরের মধ্যে ঐকাতান ও স্বরবিরোধাদির উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। প্রথমোক্ত দুই দিক্ হইতে সঙ্গীতালোচনা করিতে শিখিলে, তাহা সাধারণ সঙ্গীতের রসাস্বাদনের পক্ষে যথেষ্ট হয় সত্য, কিন্তু উহার বৈজ্ঞানিক দিক্টা একবারে ছাড়িয়া দিলে শাস্ত্রটা যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক দিক্টা দেখিতে হইলে কি প্রকারে শব্দের উৎপত্তি হয়, প্রথমে তাহা মোটামুটি জানা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকগণ শব্দকে শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কম্পন বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। যে কোনও উপায়ে একটী পদার্থ কম্পিত করিলে তৎসন্নিহিত বায়ুও তদনুরূপ কম্পিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে একটা তরঙ্গের উৎপত্তি করে। তার পর সেই তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহিত হইয়া শ্রোতার কর্ণে আঘাত করিলেই শব্দ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মৃদু বায়ুপ্রবাহ দ্বারা শ্যামল শস্যক্ষেত্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং স্থিরজলে এক খণ্ড ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে যে বৃত্তাকার তরঙ্গ-প্রবাহ দেখা যায়, পদার্থের কম্পনজাত বায়ুতরঙ্গও কতকটা তদ্রূপ। পাঠকগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, বায়ু বলে আহত শস্যশীর্ষ স্থানান্তরিত না হইয়া তাহাদের চাঞ্চল্য কেবল পরবর্ত্তী শস্য-মঞ্জরীতে চালিত করে, এবং ইহাতেই শস্যক্ষেত্রে একটা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গমালার উৎপত্তি হইয়া পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, কোন পদার্থ কম্পিত হইতে আরম্ভ করিলে, তৎসংস্পৃষ্ট বায়ু তদ্দ্বারা আঘাত পাইয়া কম্পিত হইতে থাকে এবং পরে তাহাই আবার পার্শ্বস্থ বায়ুতে একটা তদনুরূপ আঘাত দিয়া পূর্ব্বোক্ত বায়ুকম্পিত শস্য-মঞ্জরীর ন্যায় নিশ্চল হইয়া যায়। এই প্রকারে কম্পমান পদার্থের চারিদিকে একটা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের উৎপত্তি হয়।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, জগতে বায়ুই একমাত্র শব্দবাহক পদার্থ (medim of sound), কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ ধাতু, কাষ্ঠ ও বাষ্প প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে শব্দপরিচালন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছেন। এক খণ্ড দীর্ঘ কাষ্ঠের এক প্রান্তে কাণ রাখিয়া অপর প্রান্তে সূচ্যগ্র দ্বারা আঘাত করিলে, কাষ্ঠের শব্দ পরিচালকতা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সূচ্যাঘাতে কাষ্ঠের কম্পনহেতু বায়ুরাশিতে অতি মৃদু শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, কাযেই সে তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহিত হইয়া দূরস্থিত শ্রোতার কর্ণগোচর হইতে পায় না, কিন্তু সমঘন কাষ্ঠ তাহার ঘনত্বাধিক্যপ্রযুক্ত সে তরঙ্গ বহুদূর পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে পরিচালিত করিতে পারে।

এই ত গেল শব্দোৎপত্তির স্থূল কথা; এখন আমাদের প্রচলিত সংগীত-যন্ত্রগুলিতে কি প্রকারে শব্দের উৎপত্তি হয়, দেখা যাউক। বলা বাহুল্য, এখানেও সেই কম্পন ও তরঙ্গ বিদ্যমান,—তারের যন্ত্রগুলিতে বাদক যন্ত্রসংবদ্ধ তার ছড় দিয়া বা অঙ্গুলি দ্বারা টানিয়া কম্পিত করে, হার্‌মোনি-য়ম্ প্রভৃতি যন্ত্রে তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতলা ধাতু ফলকগুলি হাফরের বায়ু দ্বারা কম্পমান হয়, এবং ক্লারিয়নেট্ প্রভৃতি যন্ত্রের সেই প্রান্তসংলগ্ন বংশফলকটী বাদকের ফুৎকারে কম্পিত হইয়া উঠে। সাধারণ বাঁশীতে কম্পনোৎপাদনের জন্য সূক্ষ্ম ধাতুফলক বা তারসংযুক্ত থাকে না বটে, কিন্তু বাদক সঙ্কীর্ণ বংশীপ্রান্তে যে ফুৎকার প্রদান করে, তাহাই তন্মধ্যস্থ আবদ্ধ বায়ুতে শব্দ-তরঙ্গোৎপত্তির পক্ষে যথেষ্ট হয়।

তন্ত্র-যন্ত্রের তারের কম্পনে কি প্রকারে নানা সুস্বরের উৎপত্তি হয়, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, এই শ্রেণীর যন্ত্রে তারগুলি সাধারণতঃ এক একটী শূন্যগর্ভকোষের উপর কীলক দ্বারা আবদ্ধ থাকে, বাদক সেই কীলক ইচ্ছানুরূপ ঘুরাইয়া সুর উঁচুনীচু করিতে পারে। এই শূন্যগর্ভকোষ বা ধ্বনিকোষ তন্ত্রযন্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ। অঙ্গুলিতাড়ন বা ছড়ের ঘর্ষণবশতঃ তারে যে কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত মৃদু, সুতরাং সেই কম্পনে সন্নিহিত বায়ুতে যে শব্দ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন শব্দই উদ্ভূত হইতে পারে না। তবে যে আমরা তারের অতি মৃদু আন্দোলনেও স্পষ্ট সুস্বর শুনিতে পাই, তাহার কারণ সেই ধ্বনিকোষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মৃদু কম্পনশীল তার সন্নিহিত বায়ুকে কাঁপাইতে পারে না বটে, কিন্তু ধ্বনি-কোষের সূক্ষ্ম আবরণ-ফলক তারের সংস্পর্শে থাকায়, সেই অতি মৃদু কম্পনে তাহা নিজে কাঁপিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিকোষস্থ বায়ুকেও তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে। তারের অতি মৃদু কম্পন এই প্রকারে প্রবলতর হইয়া বিস্তার লাভ করিলে, ধ্বনিকোষের সন্নিহিত বায়ুও তদ্দ্বারা সহজে কম্পিত হইয়া প্রচুর শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করিতে থাকে।

ধ্বনিকোষের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যটি একটা সহজ পরীক্ষা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দেওয়ালে বা ভূতলে দুইটী প্রেক্ বিদ্ধ করিয়া, তাহাতে একগাছি তার খুব টানিয়া বদ্ধ করিলে, সেই তারের আন্দোলনে কোন শব্দই কর্ণগোচর হইবে না। কারণ এখানে তারের মৃদু স্পন্দনকে প্রবল করিবার কোন ব্যবস্থাই ইহাতে নাই। কিন্তু পরে সেই তারটীকেই যদি ধ্বনিকোষের অনুরূপ কোন একটা জিনিসের উপর ঠিক পূর্ব্ববৎ বদ্ধ করিয়া আহত বা আন্দোলিত করা যায়, তবে তারের সেই মৃদু কম্পন হইতেই অতি মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধ্বনিকোষ সঙ্গীতযন্ত্র মাত্রেরই একটা অপরিহার্য্য অংশ এবং ইহারই কার্য্যোপযোগিতার উপর যন্ত্রের মূল্য নির্ভর করে। একখানি সাধারণ বেহালা এবং আর একখানি বহুমূল্য পুরাতন ইটালিয়ান্ বেহালার মধ্যে পার্থক্য কেবল তাহাদের ধ্বনি-কোষের কয়েকখানি কাষ্ঠের কার্য্যোপযোগিতার তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। পুরাতন ইটালিয়ান্ বেহালার ধ্বনিকোষের আবরণ ফলকগুলি এপ্রকার সুন্দরভাবে নির্ম্মিত এবং বহু ব্যবহারে তাহার অণুসকল এ প্রকার কম্পন-প্রবণ হইয়া উঠে যে, তৎসংযুক্ত তার একটুমাত্র স্পন্দিত হইলেই বাতাসে প্রবল শব্দ তরঙ্গের উৎপত্তি করে। কিন্তু সাধারণ বেহালার কাষ্ঠ যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত নয় বলিয়া, তারের মৃদুকম্পনে তাহার কোষাবরণ কম্পিত হয় না। যদি বা কথঞ্চিৎ কম্পিত হয়, তবে যথোপযুক্ত আণবিক বিন্যাসের অভাবে, তাহা তারের কম্পনজাত সুরটা অবিকল গ্রহণ করিতে পারে না, কাযেই যন্ত্রে বিকৃত সুর উৎপন্ন হয়। তানপূরা, এস্রাজ, সেতার, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র মাত্রেরই উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে ধ্বনিকোষের গঠন ও উপাদানভেদে নির্ণীত হইয়া থাকে।

ধ্বনিকোষ ব্যতীত তন্ত্র-যন্ত্রের আর একটা প্রধান অংশ আছে। ইহাকে "শোয়ারি" বা bridge বলে। যন্ত্রের তারগুলির দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া তদুৎপন্ন কম্পন ধ্বনিকোষে পরিচালন করা ইহার প্রধান কার্য্য। বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে সোয়ারি শব্দকোষের সহিত স্থায়িভাবে সংলগ্ন থাকে না, বাদক ইচ্ছামত সে'টীকে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন; কিন্তু পিয়ানো ও সেতার প্রভৃতি পরদা-বাঁধা যন্ত্রে, সোয়ারি স্থায়ী ভাবেই সংলগ্ন থাকে।

এখন তারের কম্পনের প্রকৃতিটা কি, দেখা যাউক। পাঠকগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, কোন যন্ত্রের তারের ঠিক মধ্যস্থানটা অঙ্গুলি-তাড়ন বা ছড় টানিয়া কম্পিত করিলে তারটা কিয়ৎকাল সমগ্রভাবে ইতস্ততঃ আন্দোলন করিয়া শেষে বায়ুর ঘর্ষণ ও মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে স্থির হইয়া যায়। তারের এই কম্পন কতকটা ঘড়ির দোলক বা pendulum এর আন্দোলনের অনুরূপ। ঘড়ির দোলক যতই বল-প্রয়োগে আন্দোলিত কর না কেন, অবলম্বন রজ্জুর দৈর্ঘ্য স্থির থাকিলে, উহার এক পূর্ণান্দোলন যেমন ঠিক এক সেকেণ্ডে শেষ হইয়া যায়, সেই প্রকার দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিয়া যত জোরেই তার টানা যাউক না কেন, প্রত্যেক আন্দোলনটী পূর্ণ হইবার কাল অপরিবর্ত্তিত থাকে, দেখা গিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, দৈর্ঘ্য স্থির রাখিয়া কোন যন্ত্রের তার স্পন্দিত করিলে তাহার পূর্ণান্দোলন-সংখ্যা প্রতি

সেকেণ্ডে একই থাকিবে। খুব সবলে তার টানিলেও স্পন্দনসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে না; কাযেই সুরটা অবিকল একই থাকিয়া যাইবে। কারণ শব্দের উচ্চনীচতা তদুৎপাদক কম্পনসংখ্যার প্রাচুর্য্য ও স্বল্পতা দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে, আন্দোলন বলের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। আন্দোলন-বলের আধিক্যে কেবল তজ্জাত শব্দের উত্তালতা (loudness) বৃদ্ধি পায় মাত্র।

একই সময়ে সমসংখ্যক কম্পনের এই পৌনঃপুনিক উৎপাদনই সুস্বর-উৎপাদক কম্পনের প্রধান বিশেষত্ব। সাধারণ শব্দের উৎপাদক কম্পন-সংখ্যার গণনা করিলে পূর্ব্বাপর সমকালের কম্পন-সংখ্যায় একতা বা কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অনুপাত দেখা যায় না। কিন্তু যে সকল তরঙ্গ দ্বারা সুস্বর উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি সমকালে একই কম্পন সংখ্যা দেখা গিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে পৌনঃপুনিক সমকম্পন হইতে এখন সুস্বর উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কম্পন-সংখ্যা কোনও প্রকারে অন্যথা করিয়া দিলে, সেই সুস্বরের পরিবর্ত্তে একটা কোলাহলময় কর্কশ স্বর শ্রুত হইতে থাকিবে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় দেখিয়াছেন,—ঝড়ের সময় প্রবহমান বায়ু দ্বারা কখন কখন এক প্রকার সুস্বরের উৎপত্তি হয়। ইহার উৎপত্তিতত্ত্ব খুঁজিলে আমরা দেখিতে পাই,—বাতাস এক নির্দ্দিষ্ট গতিতে প্রবাহিত হইয়া নিশ্চয়ই কোন স্থানে পুনঃ পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত এবং তদ্দ্বারা সমান কালে সমসংখ্যক শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। এই কারণে সেই ধ্বনিও সুস্বরবিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই সুস্বর উৎপাদক বায়ুর বেগ কোনপ্রকারে অনিয়মিত বা পরিবর্ত্তিত হইলে সেই শব্দ আর শুনা যায় না। বরং তৎপরিবর্ত্তে অনিয়মিত কম্পনজাত একটা উচ্চ রণৎকার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে থাকে।

তন্ত্রযন্ত্রের তারের পূর্ব্বোক্ত সমগ্র কম্পন হইতে যে সুরের উৎপত্তি হয়, তাহাই যন্ত্রের সর্ব্বনিম্ন প্রাথমিক স্বর বা "সা"। বলা বাহুল্য, সেতার প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে না, তাহাতে উক্ত প্রাথমিক সুরের স্থিরতা রাখা যায় না। সঙ্গীত আলোচনা কালে বাদক প্রয়োজন মত কীলক মর্দ্দন করিয়া স্বীয় অভীপ্সিত একটা সুর ঠিক করিয়া লন এবং পরে সেই সুর অনুসারে ঋ, গা, প্রভৃতি

ধ্বনি উৎপাদন [illegible] সুরের কণ্ঠস্বর কর্কশ
মিক সুর হইতে কি[illegible] প্রকৃতি বা
ও উচ্চ নিম্ন সপ্তকের [illegible]
দেখা যাউক।

বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থা[illegible]
প্রভৃতি তন্ত্রযন্ত্র হইতে নানা সুর উৎ[illegible]লে,
আমরা প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া প্রে[illegible] তারের
দৈর্ঘ্য কমাইয়া থাকি এবং পরে তারের সেই অঙ্গুলি-ব্যবহিত অংশটা কম্পিত করিয়া ঈপ্সিত সুর উৎপন্ন করি। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, কোন তারের ঠিক মধ্যস্থলটা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টিপিয়া বাজাইলে, তারটী সমগ্র ভাবে কম্পিত হইয়া যে প্রাথমিক স্বর উৎপন্ন করে, তাহা দ্বারা সেই প্রাথমিক সুরের ঠিক এক সপ্তক উচ্চ সুর উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ যদি সমগ্র কম্পনজাত সুরটীকে আমরা উদারার "ঘাত" বলি, তাহা হইলে উক্ত অর্দ্ধ তন্তুর কম্পনজাত স্বর তারার "মা" হইয়া পড়িবে। বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, একগাছি সমগ্র তারের কম্পন সংখ্যার তুলনায়, তাহারই অর্দ্ধাংশের কম্পন সংখ্যা ঠিক দ্বিগুণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন এক সুরের কম্পন সংখ্যার সহিত তাহার ঠিক উচ্চতর সপ্তকস্থ সেই সুরের কম্পন সংখ্যার তুলনা করিলে দ্বিতীয় সংখ্যাটী প্রথমটীর ঠিক দ্বিগুণ হইবে। অর্থাৎ তারার "সা" তন্নিম্ন সপ্তক উদারার "সা"র কম্পন সংখ্যার দ্বিগুণ ও তারার রে গা মা প্রভৃতিরও কম্পন যথাক্রমে উদারার রে গা মা ইত্যাদির কম্পনের দ্বিগুণ হয়। তার ছোট করিলে যেমন কম্পনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতর সুরের উৎপত্তি করে, তারের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে সেই প্রকার কম্পন সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসে এবং সুরও নামিয়া যায়। এইজন্য একটা তারের সমগ্র কম্পনে যে সুর উৎপন্ন হয়, টান্ সমান রাখিয়া তাহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত করিলে তদ্দ্বারা নিম্ন সপ্তকের ঠিক সেই সুরের উৎপত্তি হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তারের দৈর্ঘ্য অর্দ্ধেক করিলে তদ্দ্বারা সমগ্র তারের কম্পনজাত প্রাথমিক সুরের ঠিক এক সপ্তক উচ্চ সুর পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র তার হইতে উৎপন্ন সুরটাকে "সা" ধরিলে সপ্তকের রে, গা, ইত্যাদি সুরগুলি বাজাইবার জন্য অর্দ্ধেকের

তন্ত্র-যন্ত্রের তারের কম্পনে কি প্রকারে নানা সুস্বরের উৎপত্তি হয়, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, এই শ্রেণীর যন্ত্রে তারগুলি সাধারণতঃ এক একটী শূন্যগর্ভকোষের উপর কীলক দ্বারা আবদ্ধ থাকে, বাদক সেই কীলক ইচ্ছানুরূপ ঘুরাইয়া সুর উঁচুনীচু করিতে পারে। এই শূন্যগর্ভকোষ বা ধ্বনিকোষ তন্তুযন্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ। অঙ্গুলিতাড়ন বা ছড়ের ঘর্ষণবশতঃ তারে যে কম্পন উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত মৃদু, সুতরাং সেই কম্পনে সন্নিহিত বায়ুতে যে শব্দ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন শব্দই উদ্ভূত হইতে পারে না। তবে যে আমরা তারের অতি মৃদু আন্দোলনেও স্পষ্ট সুস্বর শুনিতে পাই, তাহার কারণ সেই ধ্বনিকোষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মৃদু কম্পনশীল তার সন্নিহিত বায়ুকে কাঁপাইতে পারে না বটে, কিন্তু ধ্বনি-কোষের সূক্ষ্ম আবরণ-ফলক তারের সংস্পর্শে থাকায়, সেই অতি মৃদু কম্পনে তাহা নিজে কাঁপিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিকোষস্থ বায়ুকেও তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে। তারের অতি মৃদু কম্পন এই প্রকারে প্রবলতর হইয়া বিস্তার লাভ করিলে, ধ্বনিকোষের সন্নিহিত বায়ুও তদ্দ্বারা সহজে কম্পিত হইয়া প্রচুর শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করিতে থাকে।

ধ্বনিকোষের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যটি একটা সহজ পরীক্ষা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দেওয়ালে বা ভূতলে দুইটী প্রেক্ বিদ্ধ করিয়া, তাহাতে একগাছি তার খুব টানিয়া বদ্ধ করিলে, সেই তারের আন্দোলনে কোন শব্দই কর্ণগোচর হইবে না। কারণ এখানে তারের মৃদু স্পন্দনকে প্রবল করিবার কোন ব্যবস্থাই ইহাতে নাই। কিন্তু পরে সেই তারটীকেই যদি ধ্বনিকোষের অনুরূপ কোন একটা জিনিসের উপর ঠিক পূর্ব্ববৎ বদ্ধ করিয়া আহত বা আন্দোলিত করা যায়, তবে তারের সেই মৃদু কম্পন হইতেই অতি মধুর ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধ্বনিকোষ সঙ্গীতযন্ত্র মাত্রেরই একটা অপরিহার্য্য অংশ এবং ইহারই কার্য্যোপযোগিতার উপর যন্ত্রের মূল্য নির্ভর করে। একখানি সাধারণ বেহালা এবং আর একখানি বহুমূল্য পুরাতন ইটালিয়ান্ বেহালার মধ্যে পার্থক্য কেবল তাহাদের ধ্বনি-কোষের কয়েকখানি কাষ্ঠের কার্য্যোপযোগিতার তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। পুরাতন ইটালিয়ান্ বেহালার ধ্বনিকোষের আবরণ ফলকগুলি এপ্রকার সুন্দরভাবে নির্ম্মিত এবং বহু ব্যবহারে তাহার অণুসকল এ প্রকার কম্পন-প্রবণ হইয়া উঠে যে, তৎসংযুক্ত তার একটুমাত্র স্পন্দিত হইলেই বাতাসে প্রবল শব্দ তরঙ্গের উৎপত্তি করে। কিন্তু সাধারণ বেহালার কাষ্ঠ যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত নয় বলিয়া, তারের মৃদুকম্পনে তাহার কোষাবরণ কম্পিত হয় না। যদি বা কথঞ্চিৎ কম্পিত হয়, তবে যথোপযুক্ত আণবিক বিন্যাসের অভাবে, তাহা তারের কম্পনজাত সুরটা অবিকল গ্রহণ করিতে পারে না, কাযেই যন্ত্রে বিকৃত সুর উৎপন্ন হয়। তানপূরা, এস্রাজ, সেতার, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র মাত্রেরই উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা ঠিক পূর্ব্বোক্ত কারণে ধ্বনিকোষের গঠন ও উপাদানভেদে নির্ণীত হইয়া থাকে।

ধ্বনিকোষ ব্যতীত তন্ত্র-যন্ত্রের আর একটা প্রধান অংশ আছে। ইহাকে "শোয়ারি" বা bridge বলে। যন্ত্রের তারগুলির দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া তদুৎপন্ন কম্পন ধ্বনিকোষে পরিচালন করা ইহার প্রধান কার্য্য। বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে সোয়ারি শব্দকোষের সহিত স্থায়িভাবে সংলগ্ন থাকে না, বাদক ইচ্ছামত সে'টীকে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন; কিন্তু পিয়ানো ও সেতার প্রভৃতি পরদা-বাঁধা যন্ত্রে, সোয়ারি স্থায়ী ভাবেই সংলগ্ন থাকে।

এখন তারের কম্পনের প্রকৃতিটা কি, দেখা যাউক। পাঠকগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, কোন যন্ত্রের তারের ঠিক মধ্যস্থানটা অঙ্গুলি-তাড়ন বা ছড় টানিয়া কম্পিত করিলে তারটা কিয়ৎকাল সমগ্রভাবে ইতস্ততঃ আন্দোলন করিয়া শেষে বায়ুর ঘর্ষণ ও মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে স্থির হইয়া যায়। তারের এই কম্পন কতকটা ঘড়ির দোলক বা pendulum এর আন্দোলনের অনুরূপ। ঘড়ির দোলক যতই বল-প্রয়োগে আন্দোলিত কর না কেন, অবলম্বন রজ্জুর দৈর্ঘ্য স্থির থাকিলে, উহার এক পূর্ণান্দোলন যেমন ঠিক এক সেকেণ্ডে শেষ হইয়া যায়, সেই প্রকার দৈর্ঘ্য ঠিক রাখিয়া যত জোরেই তার টানা যাউক না কেন, প্রত্যেক আন্দোলনটী পূর্ণ হইবার কাল অপরিবর্ত্তিত থাকে, দেখা গিয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, দৈর্ঘ্য স্থির রাখিয়া কোন যন্ত্রের তার স্পন্দিত করিলে তাহার পূর্ণান্দোলন-সংখ্যা প্রতি

সেকেণ্ডে একই থাকিবে। খুব সবলে তার টানিলেও স্পন্দনসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে না; কাযেই সুরটা অবিকল একই থাকিয়া যাইবে। কারণ শব্দের উচ্চনীচতা তদুৎপাদক কম্পনসংখ্যার প্রাচুর্য্য ও স্বল্পতা দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে, আন্দোলন বলের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। আন্দোলন-বলের আধিক্যে কেবল তজ্জাত শব্দের উত্তালতা (loudness) বৃদ্ধি পায় মাত্র।

একই সময়ে সমসংখ্যক কম্পনের এই পৌনঃপুনিক উৎপাদনই সুস্বর-উৎপাদক কম্পনের প্রধান বিশেষত্ব। সাধারণ শব্দের উৎপাদক কম্পন-সংখ্যার গণনা করিলে পূর্ব্বাপর সমকালের কম্পন-সংখ্যায় একতা বা কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অনুপাত দেখা যায় না। কিন্তু যে সকল তরঙ্গ দ্বারা সুস্বর উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি সমকালে একই কম্পন সংখ্যা দেখা গিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে পৌনঃপুনিক সমকম্পন হইতে এখন সুস্বর উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কম্পন-সংখ্যা কোনও প্রকারে অন্যথা করিয়া দিলে, সেই সুস্বরের পরিবর্ত্তে একটা কোলাহলময় কর্কশ স্বর শ্রুত হইতে থাকিবে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় দেখিয়াছেন,—ঝড়ের সময় প্রবহমান বায়ু দ্বারা কখন কখন এক প্রকার সুস্বরের উৎপত্তি হয়। ইহার উৎপত্তিতত্ত্ব খুঁজিলে আমরা দেখিতে পাই,—বাতাস এক নির্দ্দিষ্ট গতিতে প্রবাহিত হইয়া নিশ্চয়ই কোন স্থানে পুনঃ পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত এবং তদ্দ্বারা সমান কালে সমসংখ্যক শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। এই কারণে সেই ধ্বনিও সুস্বরবিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই সুস্বর উৎপাদক বায়ুর বেগ কোনপ্রকারে অনিয়মিত বা পরিবর্ত্তিত হইলে সেই শব্দ আর শুনা যায় না। বরং তৎপরিবর্ত্তে অনিয়মিত কম্পনজাত একটা উচ্চ রণৎকার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে থাকে।

তন্তুযন্ত্রের তারের পূর্ব্বোক্ত সমগ্র কম্পন হইতে যে সুরের উৎপত্তি হয়, তাহাই যন্ত্রের সর্ব্বনিম্ন প্রাথমিক সুর বা "সা"। বলা বাহুল্য, সেতার প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রে সুর বাঁধা থাকে না, তাহাতে উক্ত প্রাথমিক সুরের স্থিরতা রাখা যায় না। সঙ্গীত আলোচনা কালে বাদক প্রয়োজন মত কীলক মর্দ্দন করিয়া স্বীয় অভীপ্সিত একটা সুর ঠিক করিয়া ল'ন এবং পরে সেই সুর অনুসারে ঋ, গা, প্রভৃতি ধ্বনি উৎপাদন করিয়া সংগীতের আলাপ করেন। প্রাথমিক সুর হইতে কি প্রকারে তদনুযায়ী ঋ, গা প্রভৃতি সুর ও উচ্চ নিম্ন সপ্তকের নানা সুর উৎপন্ন হয়, এখন তাহা দেখা যাউক।

বোধ হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, সেতার, বেহালা প্রভৃতি তন্তুযন্ত্র হইতে নানা সুর উৎপন্ন করিতে হইলে, আমরা প্রথমে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া প্রয়োজন মত তারের দৈর্ঘ্য কমাইয়া থাকি এবং পরে তারের সেই অঙ্গুলি-ব্যবহিত অংশটী কম্পিত করিয়া ঈপ্সিত সুর উৎপন্ন করি। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, কোন তারের ঠিক মধ্যস্থলটা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টিপিয়া বাজাইলে, তারটী সমগ্র ভাবে কম্পিত হইয়া যে প্রাথমিক সুর উৎপন্ন করে, তাহা দ্বারা সেই প্রাথমিক সুরের ঠিক এক সপ্তক উচ্চ সুর উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ যদি সমগ্র কম্পনজাত সুরটীকে আমরা উদারার "ঘাত" বলি, তাহা হইলে উক্ত অর্দ্ধ তন্তুর কম্পনজাত স্বর তারার "মা" হইয়া পড়িবে। বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, একগাছি সমগ্র তারের কম্পন সংখ্যার তুলনায়, তাহারই অর্দ্ধাংশের কম্পন সংখ্যা ঠিক দ্বিগুণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন এক সুরের কম্পন সংখ্যার সহিত তাহার ঠিক উচ্চতর সপ্তকস্থ সেই সুরের কম্পন সংখ্যার তুলনা করিলে দ্বিতীয় সংখ্যাটী প্রথমটীর ঠিক দ্বিগুণ হইবে। অর্থাৎ তারার "সা" তন্নিম্ন সপ্তক উদারার "সা"র কম্পন সংখ্যার দ্বিগুণ ও তারার রে গা মা প্রভৃতিরও কম্পন যথাক্রমে উদারার রে গা মা ইত্যাদির কম্পনের দ্বিগুণ হয়। তার ছোট করিলে যেমন কম্পনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া উচ্চতর সুরের উৎপত্তি করে, তারের দৈর্ঘ্য বাড়াইলে সেই প্রকার কম্পন সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসে এবং সুরও নামিয়া যায়। এইজন্য একটা তারের সমগ্র কম্পনে যে সুর উৎপন্ন হয়, টান্ সমান রাখিয়া তাহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত করিলে তদ্দ্বারা নিম্ন সপ্তকের ঠিক সেই সুরের উৎপত্তি হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তারের দৈর্ঘ্য অর্দ্ধেক করিলে তদ্দ্বারা সমগ্র তারের কম্পনজাত প্রাথমিক সুরের ঠিক এক সপ্তক উচ্চ সুর পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র তার হইতে উৎপন্ন সুরটাকে "সা" ধরিলে সপ্তকের রে, গা, ইত্যাদি সুরগুলি বাজাইবার জন্য অর্দ্ধেকের

অপেক্ষা ছোট করিলে পূর্ব্বোক্ত সুরগুলি ধ্বনিত হয়। পাঠকগণ তানপূরা বা সেতারের কোন একটা তার লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন,—তারটীর ½, ⅓, ¼, ⅕, ⅙, ⅛ ও ⅑ অংশ ক্রমে মাপিয়া, সেই সেই স্থানে অঙ্গুলি টিপিয়া সুর উৎপাদন করিলে যথাক্রমে রে, গা, মা, পা, ধা, নি ও উচ্চ সপ্তকের "সা" র উৎপত্তি হইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তারের দৈর্ঘ্য অর্দ্ধেক করিলেই তাহার কম্পন সংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ তারের কম্পন সংখ্যা তাহার দৈর্ঘ্যের বিলোমানুপাতে (inversely) পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং রে, গা, ইত্যাদি সুর উৎপাদক পূর্ব্বোক্ত অংশগুলির কম্পন সংখ্যা যে কত হইবে, তাহা উল্লিখিত সূত্র দ্বারা অনায়াসে গণনা করা যাইতে পারে। এই হিসাবে পাঠক পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, যদি সেই সমগ্র তারের কম্পন-জাত সুর "সা"র কম্পন সংখ্যা ১ ধরা হয়, তাহা হইলে তৎপরবর্ত্তী রে, গা, মা ইত্যাদি সুরের কম্পন সংখ্যা যথাক্রমে ⅛, ¼, ⅓, ½, ⅔ ও ⅘ হইবে, অর্থাৎ প্রাথমিক "সা" সুরের উৎপাদক কম্পন সংখ্যা যাহাই হউক না কেন, তাহার রে, গা মা, ইত্যাদি সুরের কম্পন-সংখ্যা, প্রাথমিকের কম্পন সংখ্যার যথাক্রমে ⅛, ¼, ⅓ ইত্যাদি গুণ হইবে। স্থূল কথায়, যদি প্রাথমিক সুরের কম্পন-সংখ্যা প্রতিসেকেণ্ডে ৯৬ ধরা যায়, তাহা হইলে রে, গা, মা প্রভৃতির কম্পন-সংখ্যা যথাক্রমে নিশ্চয়ই ১০৮, ১২০, ১২৮, ১৪৪, ১৫০ ও ১৮০ হইতে দেখা যাইবে।

সারঙ্গ, এসরাজ, বেহালা, সেতার, ইত্যাদি যন্ত্রে অঙ্গুলি স্পর্শে তারের দৈর্ঘ্য পূর্ব্বোক্ত অনুপাতে কমাইয়া বাদক নানা সুর উৎপন্ন করে, কিন্তু পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রে তারে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবার আবশ্যকতা হয় না। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত অনুপাতে খণ্ডিত বহু তার যন্ত্র মধ্যে সজ্জীকৃত থাকে, সুতরাং অপর যন্ত্রে একই তারের নানা অংশ টিপিয়া যে সকল সুর বাহির করা যায়, এ গুলিতে সেই নানা দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন তারের প্রত্যেকটী দ্বারা সেই সকল সুরের এক একটি উৎপাদিত হইয়া থাকে।

এই ত গেল তারের দৈর্ঘ্যের কথা। এখন তারের স্থূলতা ও ঘনত্বের সহিত তদুৎপন্ন সুরের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা দেখা যাউক। বোধ হয় অনেকে অবশ্য দেখিয়াছেন, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রে খাদ্ অর্থাৎ খুব নীচু সুর উৎপন্ন করিবার জন্য একটা তামার তারে মণ্ডিত মোটা তন্তু যন্ত্রে সংযোজিত থাকে, এবং সেটাকে খুব টানিলেও উচ্চ সুর পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তার যত স্থূল হয়, তাহার কম্পন সংখ্যাও তত হ্রাস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তদুৎপন্ন সুরও নীচু হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ নানা পরীক্ষাদি দ্বারা, তারের স্থূলতা ও তাহার সুরের একটা অনুপাত আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, সুরের কম্পন-সংখ্যা তারের দৈর্ঘ্যের ন্যায় স্থূলতারও বিলোম অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তারকে, যদি ঠিক তাহার দ্বিগুণ বা তিনগুণ স্থূল করিয়া বাজান যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পূর্ব্ব সুরের ½ বা ⅓ কম্পনযুক্ত নীচু সুর বাহির হইতে থাকিবে। তারের ঘনত্ব ও তদুৎপন্ন সুরের মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের একটা সম্বন্ধ আছে। সমস্থূল ও সমদীর্ঘ একগাছি লোহার তার এবং আর একটা তামার তারকে সমান বলে টানিয়া কম্পিত করিলে, তাহা হইতে একই সুর উৎপন্ন হইবে না,—যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অল্প তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই উচ্চতর সুর উৎপন্ন হইতে থাকিবে। সম-আয়তন লৌহ ও তাম্রের মধ্যে তাম্রের গুরুত্বই অধিক, এজন্য লৌহ-তন্তুজাত ধ্বনি, তাম্রতন্তু হইতে উৎপন্ন সুর অপেক্ষা উচ্চতর দেখা যায়।

ফলতঃ তারের দৈর্ঘ্য, স্থূলতা ও ঘনত্ব ঠিক রাখিয়া, তাহার টান বৃদ্ধি করিলে উচ্চ সুর উৎপন্ন হয়। টানের বলবৃদ্ধির সহিত যে নিয়মে তারের আন্দোলন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহাও বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই নিয়মানুসারে দেখা যায়, টানের বলের বর্গমূল অনুসারে তারের কম্পন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; অর্থাৎ চারি সের বল দ্বারা দীর্ঘীকৃত তারে যতগুলি কম্পন হইবে, ১৬ সের বল দ্বারা আবদ্ধ তারে তাহার ঠিক দ্বিগুণ স্পন্দন দেখা যাইবে। তারের দৈর্ঘ্য ও তদুৎপন্ন সুরের যে সম্বন্ধের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাঁশী জাতীয় যন্ত্রের দৈর্ঘ্য ও তদুৎপন্ন সুরের মধ্যেও ঠিক সেই সম্বন্ধ দেখা যায়। বাঁশি যত লম্বা হয়, তদুৎপন্ন সুরও তত নীচু হইয়া পড়ে, আবার বাঁশীর দৈর্ঘ্য কমাইলে তদনুপাতে সুরও উচ্চ হইয়া থাকে।

এই ত গেল তারের কম্পন ও তদুৎপন্ন সুর সম্বন্ধী

স্থূল কথা। এতদ্ব্যতীত কম্পমান তারের আরও কয়েকটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে; এগুলিকে সঙ্গীত ও বিজ্ঞান উভয় দিক্ হইতেই দেখা অতি আবশ্যক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন একটী তারের ঠিক মধ্যস্থলটী পালক কিম্বা অপর কোনও কোমল পদার্থ দ্বারা মৃদুভাবে চাপিয়া রাখিয়া, পরে যদি তাহা কোনও একার্দ্ধ ছড় দ্বারা কম্পিত করা যায়, তাহা হইলে কোন প্রকারে আন্দোলিত না করিলেও অপরার্দ্ধটী পৃথগ্‌ভাবে কম্পিত হইতে থাকিবে; কিন্তু তারের যেস্থানটী পালক-সংস্পৃষ্ট থাকে, তথায় তারের কোনও আন্দোলন-লক্ষণ দেখা যায় না। অর্থাৎ একটা সমগ্র তারের কেবল একার্দ্ধ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পৃথক্ করিয়া আঘাত করিলে, সেই কম্পন-স্রোত পালকসংস্পৃষ্ট পাত-বিন্দুর (node) মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, অপরার্দ্ধকেও ঠিক তদ্রূপ স্পন্দিত করে। এই প্রকারে তারের ½, ⅓ ইত্যাদি অংশ পৃথক করিয়া কম্পিত করিলে, সমগ্র তারটী সমেতই যথাক্রমে ৩, ৪ ইত্যাদি সমান ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কম্পিত হইতে থাকে। পাঠকগণ তানপূরা বা সেতারের কোন একটী তার লইয়া উল্লিখিত উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে পারেন; পালক-সংস্পৃষ্ট অংশের অনুরূপে তারটী যে পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত হইয়া আপনিই কম্পিত হয়, তাহা এই সহজসাধ্য পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-গোচর হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কম্পন সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সুরের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তার যত জোরে কম্পিত করা যায়, সুরও তত উত্তাল হইয়া উঠে। এই জন্য বেহালায় বলে ছড় টানিলে বা হারমোনিয়মে জোরে হাফর করিলে আমরা সুরের ধ্বনি খুব প্রবল করিতে পারি বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কম্পন-সংখ্যার কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারি না; কাজেই সুরের উচ্চতাটা অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যায়। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, মৃদুপ্রবলতা এবং উচ্চ নীচতা ব্যতীত প্রত্যেক যন্ত্রের সুরেরই আর একটা বিশেষ ধর্ম্ম আছে। ইহাকে সুরের প্রকৃতি (Timbre or quality) বলা যাইতে পারে। যে ধর্ম্ম বশতঃ দুইটি ভিন্ন যন্ত্র বাদিত একই নির্দ্দিষ্ট সুরকে, স্বতন্ত্র যন্ত্রোৎপন্ন বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি এবং একই প্রকার ভারবিশিষ্ট সুর দুই-জন গায়ক উচ্চারণ করিলে সুরের যে ধর্ম্ম দ্বারা একজন গায়কের কণ্ঠ স্বরকে মধুর এবং অপরের কণ্ঠস্বর কর্কশ বলিয়া বুঝিতে পারি, আমরা তাহাকেই সুরের প্রকৃতি বা quality বলিতেছি।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এক নির্দ্দিষ্ট উচ্চতাসম্পন্ন কোনও সুরের কম্পনসংখ্যা সকল সময়েই ত সমান হয়, তবে সারঙ্গ ও হারমোনিয়মে সেই একই সুর বাজাইলে, আমরা একটাকে সারঙ্গের সুর ও অপরটা হারমোনিয়মের সুর বলিয়া কি প্রকারে চিনিতে পারি? একই সুরের এই প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন,—কোনও যন্ত্র হইতে সংগীত-কুশলী বাদক যে কোন নির্দ্দিষ্ট সুর উৎপাদন করিতে পারেন বটে, কিন্তু ঠিক্ অবিমিশ্র সুর কোনও যন্ত্র হইতে ধ্বনিত করা যায় না। সেতারের সমগ্র তারের কম্পন হইতে যে প্রাথমিক সুর "সা"র উৎপত্তি হয়, তাহার সহিত তারের সেই পূর্ব্বোক্ত খণ্ডিত অবস্থার কম্পনজাত উচ্চ সপ্তকের কতকগুলি মৃদু সুর আপনিই মিশ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু এই মিশ্রিত মৃদু সুরের সংখ্যা সকল যন্ত্রে সমান থাকে না, অর্থাৎ যদি সারঙ্গের প্রাথমিক সুরে চারিটী উচ্চ সপ্তকের সুর মিশ্রিত থাকে, তবে কোনও বেহালার সুরে হয় ত কেবল দুইটী মাত্র উচ্চ সুরের অস্তিত্ব দেখা যাইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, উচ্চতর নানা সপ্তকস্থ মৃদু সুরের এই বিভিন্ন মিশ্রণই সুরের প্রকৃতিভেদের একমাত্র কারণ; এবং প্রত্যেক কণ্ঠস্বর ও যন্ত্রের ঝঙ্কারে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ সুরের মিশ্রণ বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে বলিয়া, আমরা এক কণ্ঠ নিঃসৃত কোনও সুরকে অপর কণ্ঠজাত সেই সুর হইতে পৃথক বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি এবং সারঙ্গ ও পিয়ানোর সুরের পার্থক্যও ঐ কারণে বুঝিতে পারি। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সুরের সহিত তাহার উচ্চ সপ্তকের মৃদুসুর যাহাতে উৎপন্ন হইতে না পারে, এ প্রকার ব্যবস্থা করিলে, নানা যন্ত্রের সুরের প্রকৃতিগত পার্থক্যটা আর মোটেই থাকে না; তখন বেহালা, হারমোনিয়ম, পিয়ানো ও একতার প্রভৃতি সকল যন্ত্রেরই সুর একই রকম শুনায়।

কোন্ যন্ত্রের সুরে কতগুলা মৃদু উচ্চ সপ্তকের সুর মিশ্রিত আছে, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। যন্ত্রের প্রাথমিক সুরের তরঙ্গগুলি সেই সকল উচ্চ সুর উৎপাদক

তরঙ্গের তুলনায় এত প্রবল, যে প্রথম সুরের ঝঙ্কারে সে গুলা এক প্রকার ঢাকা পড়িয়া থাকে ; এজন্য সঙ্গীত-কুশলী ব্যক্তিও মিশ্রসুর হইতে সেই উচ্চ সপ্তকস্থ সুরগুলিকে হঠাৎ বিশ্লিষ্ট করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব আমরা পিয়ানো বা হারমোনিয়মের সুরে কতকটা বুঝিতে পারি। হারমোনিয়মের কোনও একটা চাবি খুব অল্পক্ষণের জন্য টিপিয়া ছাড়িয়া দিলে, প্রধান সুরটা যেমন মন্দীভূত হইয়া আসে, অমনই উচ্চতর সপ্তকের সুরও ইহার সহিত শুনা যায়। পিয়ানো বা হারমোনিয়মের খুব বামদিকের নীচু সুরের কোনও চাবি টিপিয়া পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বোক্ত বিষয়টা প্রত্যক্ষ দেখিবার সুবিধা হয়। কারণ এস্থলে খুব নীচু প্রধান সুরের সহিত, উচ্চতর সপ্তকের ধ্বনি মিশ্রিত থাকে, কাযেই উচ্চ সুরগুলিকে প্রধান সুর হইতে বাছিয়া লওয়া কঠিন হয় না।

যন্ত্র বিশেষের প্রত্যেক সুরের সহিত তাহার উচ্চসপ্তকস্থ নানা সুর কি প্রকারে সম্মিলিত হয়, এখন দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একটা তারের কোনও অংশ যদি পালকের দ্বারা মৃদুভাবে স্পর্শ করাইয়া আন্দোলিত করা যায়, তাহা হইলে তারের ক্ষুদ্র অংশটা যেমন কম্পিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশিষ্ট অংশ স্বতঃই উক্ত খণ্ডিত অংশের অনুরূপ ভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কম্পিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, তন্ত্র-যন্ত্রের যে স্থানে ছড় টানিয়া বা যেখানে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সমগ্র তারের কম্পনোদ্রেক করা যায়, সে স্থানটা তারের সেই পালক সংস্পৃষ্ট পাতবিন্দুর অনুরূপ কার্য্য করিয়া সমগ্র তারটাকে খণ্ডিতভাবে কম্পিত করিতে থাকে, কাযেই বাদকের ঈপ্সিত সেই প্রাথমিক সুর ছাড়া আরও কতকগুলি উচ্চ সপ্তকস্থ মৃদু সুর তাহার সহিত যোগ দেয়।

তারের কোন স্থানে ছড় টানিলে বা অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে প্রাথমিক সুরের সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিনির্ণায়ক সুরগুলি মিশ্রিত হইয়া ঐক্যতান উৎপন্ন করে, তাহা বাদক মাত্রেই জানেন। এইজন্য সেতার ও বেহালা প্রভৃতিতে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে তারটা অন্দোলিত করিবার রীতি দেখা যায়। তারের কীলক বা সোয়ারির নিকটবর্ত্তী স্থানে ছড় টানিলে কতকগুলা বিসম্বাদী সুর উৎপন্ন হইয়া প্রাথমিক সুরের সহিত মিশিয়া যায়, কাযেই যন্ত্রোৎপন্ন সুরটা কর্কশ হইয়া পড়ে। আবার তারের ঠিক মধ্যস্থলটা আন্দোলিত করিলে প্রাথমিক সুরের সহিত কেবল উচ্চ সপ্তকের একটীমাত্র সুরের মিশ্রণ হয় ; কাযেই এস্থলে যন্ত্রোৎপন্ন সুরের মাধুর্য্য রক্ষিত হয় না। এইজন্য পিয়ানোর মধ্যস্থ সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারখণ্ডগুলির এক নির্দ্দিষ্ট স্থানেই যাহাতে যন্ত্রস্থ সেই ক্ষুদ্র মুদ্গরগুলির আঘাত পড়ে, তাহার ব্যবস্থা দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় কেবল ঐক্যতান উৎপাদক উচ্চসুরগুলিই যন্ত্রের প্রাথমিক সুরের সহিত মিলিত হইতে পায়, এবং তদ্দ্বারা সুরের মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়।

সাধারণ বাঁশীতে কি প্রকারে সুস্বরের উৎপত্তি হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্যই দেখিয়াছেন, বংশী জাতীয় যন্ত্র মাত্রেরই এক মুখে এক একটা সূক্ষ্ম-প্রান্ত অংশ থাকে। ইহাই বংশীধ্বনির উৎপাদক। বাদকের ফুৎকার-সঙ্কুচিতবায়ু সেই তীক্ষ্ণপ্রান্তে পুনঃপুনঃ আহত হইলে তৎসন্নিহিত স্থানে প্রথমে একটা দ্রুত বায়ু তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এবং পরে সেই মৃদু তরঙ্গগুলি দ্বারা বংশী মধ্যস্থ বায়ুর প্রবল কম্পন আরম্ভ হইলে সুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তারের দৈর্ঘ্যের বিলোম অনুপাতে যেমন তদুৎপন্ন সুর পরিবর্ত্তিত হয়, দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন দ্বারা বাঁশীর সুরেরও ঠিক তদনুরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তবে অঙ্গুলী দ্বারা তারের দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ঈপ্সিত সুর উৎপন্ন করিবার যেমন সুযোগ দেখা যায়, বাঁশীতে সে ব্যবস্থা অসম্ভব বলিয়া তাহার পার্শ্বস্থ নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রগুলি দ্বারা দৈর্ঘ্য ছোটবড় করিবার কাযটা সারিয়া লইতে হয়। বাঁশী বাজাইবার সময় তাহার কোনও একটী ছিদ্র খুলিয়া রাখিলে ছিদ্রের নিম্নস্থ অংশটাকে যেন পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, কাযেই তদ্দ্বারা বাঁশী ছোট করার অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত তারের কম্পনে, সুরের সহিত যে উচ্চ সপ্তকস্থ নানা মৃদুসুর মিশ্রণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বংশী মধ্যস্থ বায়ুর কম্পন দ্বারাও তাহার প্রত্যেক সুরের সহিত তদ্রূপ উচ্চ সপ্তকস্থ নানা সুর মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায় এবং এই উভয়বিধ যন্ত্রেই ঐ সকল প্রকৃতি নির্ণায়ক সুরের উৎপত্তি ঠিক্ একই কারণে হইয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, তার পাশাপাশি ভাবে কম্পিত হইয়া তির্য্যক্

কম্পন (Transverse vibrations) উৎপন্ন করে, কিন্তু বংশী স্বরের উৎপাদক তরঙ্গগুলি সর্ব্বদাই নলিকাস্থ বায়ুতে অনুদৈর্ঘ্য কম্পন (longitudinal) উৎপন্ন করিতে থাকে।

হারমোনিয়ম শ্রেণীর যন্ত্রের সুরও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হয়। হাফরের বায়ুতে যন্ত্রমধ্যস্থ সেই সূক্ষ্ম ধাতুফলক গুলির কম্পনই এখানে সুর উৎপত্তির মূল কারণ। সাধারণ তন্ত্রযন্ত্র ও বংশীর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, সেই সকল যন্ত্রে যেমন তারের বা বংশী নলিকার দৈর্ঘ্য হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ইচ্ছামত সুর উৎপন্ন করা যায়, ইহাতে সে ব্যবস্থা নাই। হারমোনিয়মে প্রত্যেক সুরের জন্য এক একটা স্বতন্ত্র ধাতু-ফলক নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার সমগ্র কম্পন দ্বারা যে সুরটী উৎপন্ন হয়, তাহা ছাড়া সেই ধাতু ফলক দ্বারা অপর কোনও সুর পাওয়া যায় না। তবে অপরাপর যন্ত্রের প্রত্যেক সুরের সহিত যে উচ্চ সপ্তকস্থ নানা সুর সংমিশ্রণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হারমোনিয়মে সুরেও দেখা যায় এবং ইহার উৎপত্তি প্রক্রিয়ায় অপর যন্ত্রের সহিত হারমোনিয়মের কোনও পার্থক্য নাই।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কুহক চতুরস্র।

কুহক চতুরস্রের ইংরাজি নাম ম্যাজিক্ স্কোয়ার(magic square)। একটি সমচতুর্ভুজ বা স্কোয়ার অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি সংখ্যাকে এমতভাবে বসাইতে হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক স্তম্ভ এবং প্রত্যেক কর্ণের সংখ্যা সমূহের যোগফল সমান হইবে। ঐরূপ স্কোয়ারকে ম্যাজিক স্কোয়ার বা কুহক-চতুরস্র বলা যায়।

চতুরস্রের সংখ্যা সমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন হয়, অর্থাৎ কোনও সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহৃত না হয়, এবং উহাতে ১ হইতে ক' পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যাগুলি যদি বর্ত্তমান থাকে, তবে ক ঐ চতুরস্রের মূল সংখ্যা। যে কোনও সংখ্যাকে ক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, যথা ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি। যদি চতুরস্রের মধ্যে ১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত সমুদয় সংখ্যা থাকে, তবে উহার মূল সংখ্যা ৫ ; যদি ৪৯ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যা থাকে, তবে মূল সংখ্যা ৭, এইরূপ। স্কোয়ারকে কোনও বর্গ সংখ্যক (যথা ২৫, ৪৯, ৬৪ ইত্যাদি) ঘরে বিভক্ত করিয়া এমন ভাবে সংখ্যাগুলি বসাইতে হয় যে, প্রতি পংক্তি, প্রতি স্তম্ভ ও প্রতি কর্ণের যোগফল সমান হয়। লম্বালম্বি ভাবে অবস্থিত শ্রেণীকে পংক্তি বলে, ইংরাজিতে row বলে ; ঊর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত শ্রেণীকে স্তম্ভ বা ইংরাজিতে column বলে। কর্ণ ইংরাজি diagonal.

নিম্নে ম্যাজিক স্কোয়ারের দুইটি চিত্র দেওয়া গেল, উহাদের মূল সংখ্যা ৪।

১ নং চিত্র

১	১৫	১৪	৪
১২	৬	৭	৯
৮	১০	১১	৫
১৩	৩	২	১৬

২ নং চিত্র

১৫	১০	৩	৬
৪	৫	১৬	৯
১৪	১১	২	৭
১	৮	১৩	১২

উল্লিখিত চতুরস্রের পংক্তি স্তম্ভ প্রভৃতির সাধারণ যোগ ফল ৩৪। এই দুইটী চিত্র একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে, আমাদের বর্ণিত কুহক চতুরস্রের ধর্ম্ম, এবং পংক্তি, স্তম্ভ ও কর্ণের সংজ্ঞা পাঠক সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

চতুরস্রের সাধারণ যোগফলকে উহার কুহক-সংখ্যা বলা যায়, যথা। মূল সংখ্যা ৪ হইলে কুহক সংখ্যা ৩৪, ইত্যাদি।

কুহক সংখ্যার পরিমাণ চতুরস্রের মূল সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এক্ষণে মূল সংখ্যা জানা থাকিলে, কেমন করিয়া কুহক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহার উপায় আমরা বলিব।

যদি মূল সংখ্যা 'ন' হয়, আর কুহক সংখ্যা 'ক' হয়, তবে চতুরস্রান্তর্গত সমুদায় সংখ্যার যোগফল ন × ক, হইবে। কারণ চতুরস্রের একটি পংক্তি অথবা স্তম্ভের যোগফল ক, এবং চতুরস্রের মধ্যে এইরূপ 'ন' পংক্তি অথবা স্তম্ভ আছে। সুতরাং ন × ক = ১ + ২ + ৩ + ... + ন

---

* পাঠক পাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায়, আরো কি কি কারণে ঐকতান (Harmony) এবং স্বরবিরোধ (Discord) উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইল না। এই সকল বিষয় প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। লেখক।

কারণ চতুরস্র মধ্যে ১ হইতে n^2 পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যা বর্ত্তমান।

এক্ষণে $১+২+৩+\cdots\cdots n^2$ একটী শ্রেণী (A.P.)

উহার যোগ ফল $\frac{n^2}{২}(n^2+১)$

সুতরাং $n \times ক = \frac{n^2}{২}(n^2+১)$

যখন $n=৪$, $ক=২\times১৭=৩৪$,

যখন $n=৫$, $ক=৫\times১৩=৬৫$,

যখন $n=৮$, $ক=৪\times৬৫=২৬০$,

ইত্যাদি—

আমরা দেখিলাম, মূল সংখ্যা পরিজ্ঞাত থাকিলে কুহক-সংখ্যা কেমন করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এক্ষণে, কেমন করিয়া কুহক চতুরস্র আঁকিতে হয়, কেমন করিয়া ম্যাজিক স্কোয়ারের সংখ্যাগুলিকে সাজাইতে হয়, তাহার আলোচনা করিব। এতৎসম্বন্ধে নানা গণিতবিৎ পণ্ডিত নানা উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, এবং বহুকাল হইতে নানা গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে ফরাশিস্ পণ্ডিতঃ বেকে (Bachet), ফ্রেনিক্‌ল্ (Frenicle), ফার্ম্মাট্ (Fermat), পইনার্ড (Poignard), ডিলা হায়ার (De La Hire) এবং অয়েলার (Eular) প্রধান। ভারতবর্ষেও ইহার চর্চ্চা কথঞ্চিৎ ছিল, কিন্তু উহা খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্বে। ভারতবর্ষ হইতে, অন্যান্য অনেক জিনিষের ন্যায়, ইহাও মোশোপুলাসের (Mosehopulus) দ্বারা ইয়ুরোপ খণ্ডে নীত হয়।

প্রাচীন কালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কুহক চতুরস্র মহামারীর কবচস্বরূপ, তাই ধাতুময় কবচের উপর কুহক চতুরস্র আঁকিয়া লোকে ব্যবহারও করিত। লেখক একবার একটি মুসলমানের গলদেশে একখানি এইরূপ কবচ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ৩-মূল-সংখ্যক কুহক চতুরস্র অঙ্কিত ছিল।

কুহক-চতুরস্র দ্বিবিধ, যুগ্ম এবং অযুগ্ম। যাহার মূল সংখ্যা যুগ্ম অর্থাৎ যোড়, যেমন ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি, তাহা যুগ্মচতুরস্র, আর যাহার মূলসংখ্যা অযুগ্ম বা বিযোড়, যেমন ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি, তাহা অযুগ্ম চতুরস্র। প্রথমে আমরা অযুগ্ম কুহক-চতুরস্র নির্ম্মাণের নিয়মাবলীর আলোচনা করিব। যুগ্মাপেক্ষা অযুগ্ম স্কোয়ার নির্ম্মাণ অধিকতর সহজ-সাধ্য।

নিম্নলিখিত চিত্র ৫ মূল-সংখ্যক একটি কুহক চতুরস্র প্রদত্ত হইল। উহা নির্ম্মাণের নিয়ম এই ঃ—

৩ নং চিত্র

১৭	২৪	১	৮	১৫
২৩	৫	৭	১৪	১৬
৪	৬	১৩	২০	২২
১০	১২	১৯	২১	৩
১১	১৮	২৫	২	৯

(১) সর্ব্বোচ্চ পংক্তির মাঝের ঘরে ১ বসাও। পরে কোণাকোণি ভাবে উপরের দিকে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া ক্রমান্বয়ে ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি বসাইয়া যাও। দাবার গজের চাল যেমন কোণাকোণি দক্ষিণ দিকে উপরি ভাগে অগ্রসর হয়, সেইরূপ চালে সংখ্যাগুলি পরে পরে বসাইতে হইবে। উক্ত গতির দিক্ প্রকাশ করিতে হইলে, এইরূপ একটি রেখা দ্বারা দেখাইতে হয়, যথা— ৮

(২) এইরূপ গতিতে যখন সর্ব্বোচ্চ পংক্তিতে আসিয়া উপনীত হইবে, তখন কল্পনা করিতে হইবে যেন সর্ব্বনিম্নের পংক্তি সর্ব্বোচ্চ পংক্তির ঠিক উপরেই সংস্থিত রহিয়াছে। তৎপরে (১ চিহ্নিত পরিচ্ছেদে লিখিত গতির অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যা সর্ব্বনিম্ন পংক্তিতে বসাইতে হইবে, যথা, ১এর পর ২, ৮ এর পর ৯, ইত্যাদি।

(৩) এইরূপ গতিতে যখন সর্ব্বদক্ষিণ স্তম্ভে আসিয়া উপনীত হইবে, তখন পরবর্ত্তী সংখ্যা সর্ব্ব বাম ভাগস্থ (অর্থাৎ প্রথম) স্তম্ভ বসাইতে হইবে, যেন সর্ব্বদক্ষিণ স্তম্ভের পরেই সর্ব্ব প্রথম স্তম্ভ পুনরায় আরব্ধ হইয়াছে।

যখন পূর্ব্বোক্ত গতির অনুসরণ করিয়া এমন একটি ঘরে আসিয়া পড়িবে, যেখানে ইতঃপূর্ব্বেই অপর একটি সংখ্যা বসান হইয়াছে, তখন সেই সংখ্যাটি ঐ ঘরের ঠিক নীচের ঘরে বসাইবে। তৎপরে পুনরায় উর্দ্ধদিকে গজের চালে অগ্রসর হও। সর্ব্ব প্রথম পংক্তির শেষ ঘরে উপনীত হইলেও এই ব্যবস্থা।

উপরি অঙ্কিত চিত্র হইতে কুহক চতুরস্রের নিয়মগুলি সহজেই উপলব্ধ হইবে, এবং এই প্রণালীতে যে কোনও অযুগ্ম মূল সংখ্যা লইয়া কুহক চতুরস্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত নিয়মে সংখ্যা গুলি বসাইলে কেন যে চতুরস্রটি

কুহক চতুরস্রে পরিণত হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ঐ ২৫ ঘরের স্কোয়ারটিকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা নিম্নাঙ্কিত চিত্রে লিখিত সংখ্যাগুলি পাই, যথা ঃ—

৪ নং চিত্র।

১৫+২	২০+৪	০+১	৫+৩	১০+৫
২০+৩	০+৫	৫+২	১০+৪	১৫+১
০+৪	৫+১	১০+৩	১৫+৫	২০+২
৫+৫	১০+২	১৫+৪	২০+১	০+৩
১০+১	১৫+৩	২০+৫	০+২	৫+৪

উল্লিখিত চিত্র হইতে লক্ষিত হইবে যে, পূর্ব্বে প্রদত্ত নিয়মাবলীর অনুযায়ী চতুরস্র গঠিত হইলে প্রত্যেক পংক্তি এবং স্তম্ভে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ০, ৫, ১০, ১৫, ২০, এই সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটি একের অনধিক বার বসিয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক পংক্তি অথবা স্তম্ভের যোগফল—$(১+২+৩+৪+৫)+(০+৫+১০+১৫+২০)=১৫+৫০=৬৫$। আবার কর্ণদ্বয়ের একটিতে উপরি উক্ত সংখ্যাগুলি সমস্তই একের অনধিকবার বিদ্যমান, এবং অপরটিতে ১, ২, ৩, ৪, ৫ ব্যতীত ১০ সংখ্যা ৫ বার বর্ত্তমান, সুতরাং কর্ণদ্বয়ের প্রত্যেকেরও যোগফল ৬৫ হইয়াছে। যাহাতে পূর্ব্বোক্ত ১০টি সংখ্যা প্রত্যেক পংক্তি ও স্তম্ভে এবং এক কর্ণে একের অনধিকবার অবস্থিত হয়, তাহার জন্যই ঐরূপ নিয়মের প্রয়োজন। উপরে অযুগ্ম ম্যাজিক স্কোয়ার গঠনের যে প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, উহা পণ্ডিত ডি লা লুবেয়ারের (De La Loubère) দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। নিম্নে পণ্ডিত ডি লা হায়ারের প্রণালী বর্ণিত হইতেছে, এ উপায়টিও বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

ডি লা হায়ার প্রথমে দুইটি আনুষঙ্গিক (subsidiary) চতুরস্র নির্ম্মিত করিয়া পরে তদুভয়ের সম্মিলনে কুহক ব্যূহের রচনা করিয়াছেন। উক্ত চতুরস্র দুইটীর মধ্যে প্রথমটির রচনা নিম্নোক্ত উপায়ে করিতে হইবে, যথা ; —

যদি মূল সংখ্যা ৫ হয়, তবে সর্ব্ব প্রথম কক্ষে ৩ বসাও, এবং প্রথম পংক্তির অপর চারি কক্ষে ১, ২, ৩, ৪, যথেচ্ছভাবে বসাও। পরে প্রথম পংক্তির যে কক্ষে যে সংখ্যা আছে, সেই কক্ষ হইতে কোণাকোণি ভাবে নীচে দক্ষিণ দিকে সেই একই সংখ্যা বসাইয়া যাও। বলা বাহুল্য তাহার গতি ৬ এইরূপ রেখায় হইবে।

এখানেও লুবেয়ারের প্রণালীর ৩ সংখ্যক নিয়ম খাটিবে, অর্থাৎ সর্ব্বদক্ষিণ স্তম্ভে উপনীত হইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা সর্ব্বপ্রথম স্তম্ভে যথাযোগ্য কক্ষে বসাইতে হইবে। স্কোয়ার যথা ঃ—

৫ নং চিত্র।

৩	৪	১	৫	২
২	৩	৪	১	৫
৫	২	৩	৪	১
১	৫	২	৩	৪
৪	১	৫	২	৩

উপরি অঙ্কিত চিত্রে লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে যে, এই স্কোয়ারের প্রত্যেক পংক্তি ও স্তম্ভের যোগফল ১৫, কারণ উহাতে ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ এই ৫টি সংখ্যার প্রত্যেক সংখ্যাই একের অনধিকবার বর্ত্তমান। কর্ণদ্বয়েরও প্রত্যেকের যোগফল ১৫, কারণ এক কর্ণের যোগফল $=১+২+৩+৪+৫$, ও অপর কর্ণের যোগফল $=৩\times৫$। এই কারণেই সর্ব্বপ্রথম কক্ষে ৩ (অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ এই পাঁচটি সংখ্যার মধ্য সংখ্যা (অথবা mean) বসান হইয়াছিল। এই গেল De La Hire এর প্রথম আনুষঙ্গিক স্কোয়ার।

ডি লা হায়ারের দ্বিতীয় স্কোয়ার বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে নির্ম্মিত হইবে। ইহাতে ০, ৫, ১০, ১৫, ও ২০ এই কয়েকটি সংখ্যা ব্যবহৃত হইবে, এবং উহাদের মধ্যসংখ্যা (mean) ১০ প্রথম পংক্তির সর্ব্বশেষ কক্ষে বসাইতে হইবে। পরে প্রথম স্কোয়ারে যে নিয়মে কক্ষ সকল পূর্ণ হইয়াছিল, এক্ষণেও সেই নিয়মের অনুসরণ করিয়া সংখ্যাগুলি বসাইয়া যাও। তবে এক্ষেত্রে সংখ্যা বসাইবার গতি কোণাকোণি ভাবে নীচে বামদিকে হইবে, অর্থাৎ ৬ এই রেখায় হইবে। স্কোয়ার যথা ঃ—

৬নং চিত্র।

১৫	০	২০	৫	১০
০	২০	৫	১০	১৫
২০	৫	১০	১৫	০
৫	১০	১৫	০	২০
১০	১৫	০	২০	৫

উল্লিখিত চিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক পংক্তি, স্তম্ভ, ও কর্ণের যোগ ফল ৫০ হইয়াছে।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্কোয়ার মিলাইয়া, অর্থাৎ প্রথম স্কোয়ারের সংখ্যাগুলি দ্বিতীয় স্কোয়ারের সেই কক্ষের সংখ্যা সমূহের সহিত যোগ করিয়া, একটি তৃতীয় স্কোয়ার গঠন কর। তাহা হইলে দেখিবে যে, এই তৃতীয় স্কোয়ার ৫-মূলসংখ্যক কুহক-চতুরস্রে পরিণত হইয়াছে। উহার প্রত্যেক পংক্তি, স্তম্ভ ও কর্ণের যোগফল যে ৫০+১৫ অর্থাৎ ৬৫ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। পরন্তু উহাতে যে ১ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি সমুদায়ই একের অনধিক বার বর্ত্তমান রহিবে, তাহাও একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধ হইবে। কারণ, ২১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি পাইতে হইলে, দ্বিতীয় স্কোয়ারের যে যে কক্ষে ২০ আছে, সেই সেই কক্ষ হইতেই উহা পাওয়া যাইবে। এদিকে প্রথম স্কোয়ারের তত্তৎ কক্ষে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই কয়টি মাত্র সংখ্যা আছে; সুতরাং উভয় স্কোয়ার মিলাইয়া ঐ কয়েকটি কক্ষ হইতে ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫, এই কয়টি সংখ্যা একের অনধিকবার পাওয়া যায়। এই জন্যই দুইটী আনুষঙ্গিক স্কোয়ারে সংখ্যা বসাইবার সময়, উভয়ের গতি বিভিন্ন রেখায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখন মিলিত স্কোয়ার বা চতুরস্র এইরূপ হইবে, -যথা,—

৭নং চিত্র

১৮	৪	২১	১০	১২
২	২৩	৯	১১	২০
২৫	৭	১৩	১৯	১
৬	১৫	১৭	৩	২৪
১৪	১৬	৫	২২	৮

De La Hire এর প্রণালী বর্ণিত হইল। অন্যান্য পণ্ডিতগণ অপরাপর প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উপরে যে দুইটি উপায় কথিত হইয়াছে, তাহার অন্যতর অবলম্বন করিয়া যে কোনও অযুগ্ম কুহক-চতুরস্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে যুগ্ম কুহক-চতুরস্রের গঠন প্রণালী বর্ণিত হইতেছে।

যুগ্ম কুহক চতুরস্র দ্বিবিধ, যথা সামান্য যুগ্ম ও যুগ যুগ্ম। যাহার মূল সংখ্যা ৪ এর দ্বারা বিভাজ্য, তাহা যুগ যুগ্ম (ইংরাজিতে ইহাকে doubly even বলে), আর যাহার মূল সংখ্যা ২ এর দ্বারা বিভাজ্য, কিন্তু ৪ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নহে, তাহা সামান্য যুগ্ম বা Single even। যুগ-যুগ্ম চতুরস্র নির্ম্মাণের একটি সহজ উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ২—মূল সংখ্যক কুহক চতুরস্র নির্ম্মাণ সম্ভবপর নহে।

যে কোনও যুগ-যুগ্ম চতুরস্র ১৬টি ক্ষুদ্রতর চতুরস্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

৮নং চিত্র

ক	খ	খ	ক
খ	ক	ক	খ
খ	ক	ক	খ
ক	খ	খ	ক

যদি মূল সংখ্যা ১২ হয়, তবে ক ও খ চিহ্নিত প্রত্যেক চতুরস্রে ৯টি করিয়া সংখ্যা রহিবে। এক্ষণে যুগ-যুগ্ম চতুরস্রকে কুহক চতুরস্রে পরিণত করিবার নিয়মাবলী বুঝাইতে হইলে কয়েকটি সংজ্ঞার প্রয়োজন হইবে। প্রথমে আমরা সেই গুলির বর্ণন করিতেছি। চতুরস্রের শিরোভাগ ও তলদেশ হইতে সমদূরবর্ত্তী দুইটি পংক্তিকে সম্বন্ধী-পংক্তি বলা যায়; যথা ৭ মূল সংখ্যক চতুরস্রে তৃতীয় ও পঞ্চম পংক্তি পরস্পর সম্বন্ধী-পংক্তি, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ পরস্পর-সম্বন্ধী, ইত্যাদি। তদ্রূপ চতুরস্রের বাম ও দক্ষিণ ভাগ হইতে সমদূরবর্ত্তী দুইটি স্তম্ভকে পরস্পর-সম্বন্ধী স্তম্ভ বলা যায়। ইংরাজিতে বলে complementary। একই পংক্তির যে দুইটি কক্ষ দুই পরস্পর-সম্বন্ধী স্তম্ভে বর্ত্তমান, তাহাদিগকে পাংক্তিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলা যায়, যথা—উল্লিখিত ৭ মূল সংখ্যক চতুরস্রের দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় ও পঞ্চম কক্ষ। তদ্রূপ একই স্তম্ভের যে দুইটি কক্ষ পরস্পর সম্বন্ধী পংক্তিতে বর্ত্তমান, তাহাদিগকে স্তাম্ভ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলা যায়। ইংরাজীতে Horizontally Related ও Vertically Related বলে। যে দুইটি কক্ষ পরস্পর-সম্বন্ধী পংক্তি ও স্তম্ভে অবস্থিত, তাহাদিগকে কার্ণিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলা যায়, যথা ৯নং চিত্রে ১ ও ৪ এর মধ্যে পাংক্তিক সম্বন্ধ, ১ ও ২ এর মধ্যে স্তাম্ভ সম্বন্ধ, ১ ও ৩ এবং ২ ও ৪ এর মধ্যে কার্ণিক সম্বন্ধ। কার্ণিক সম্বন্ধকে ইংরাজিতে Spewly Related বলে। ১, ২, ৩ ও ৪ এই চারটি সংখ্যা লইয়া একটি সম্বন্ধী

সংখ্যা মণ্ডল হয়, তাহাকে ইংরাজিতে Associated group বলে।

৯নং চিত্র

	১				৪	
	২				৩	

পাংক্তিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ সংখ্যাদ্বয়ের পরস্পর স্থান-পরিবর্ত্তন করিলে, তাহাকে ঐ সংখ্যাদ্বয়ের পাংক্তিক পরিবর্ত্তন বলে (ইংরাজিতে horizontal interchange), যথা, পূর্ব্বাঙ্কিত চিত্রে, ১এর স্থানে ৪, ও ৪এর স্থানে ১ বসাইলে উহাদের পাংক্তিক পরিবর্ত্তন হইল। তদ্রূপ ১ ও ২ কে পূর্ব্বোক্তভাবে পরিবর্ত্তিত করিলে উহাকে ঐ সংখ্যাদ্বয়ের স্তাম্ভ পরিবর্ত্তন বলা যাইবে। আর ১ ও ৩এর পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তনকে কার্ণিক পরিবর্ত্তন (ইংরাজিতে vertical interchange এবং skew interchange) বলা যায়।

১০নং চিত্র।

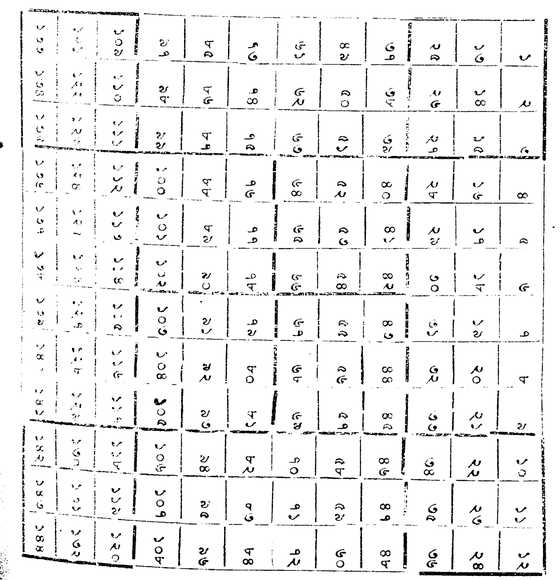

অতঃপর যুগ যুগ্ম কুহক-চতুরস্র রচনার নিয়ম বর্ণিত হইতেছে। প্রথমে চতুরস্র মধ্যে সমস্ত সংখ্যাগুলিকে ১, ২, ৩ ..... করিয়া পর পর বসাইয়া যাও। পরে চতুরস্রকে ৮ নং চিত্রের ন্যায় ১৬টি ক্ষুদ্র চতুরস্রে বিভক্ত কর এবং ক চিহ্নিত ৮টি স্কোয়ারের অথবা খ চিহ্নিত আটটি স্কোয়ারের অন্তর্গত সমুদায় সংখ্যাগুলিকে কার্ণিক ভাবে পরিবর্ত্তিত কর spewly interchange)। তাহা হইলে দেখিবে, স্কোয়ারটি কুহক-চতুরস্র বা ম্যাজিক স্কোয়ারে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে ১২ মূল সংখ্যক কুহক-চতুরস্রের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, উহা হইতে নিয়মটি স্পষ্টতররূপে হৃদয়ঙ্গত হইবে।

উল্লিখিত চিত্রে ১ হইতে ১৪৪ পর্য্যন্ত সমুদায় সংখ্যাগুলি পর পর বসান হইয়াছে। এক্ষণে স্থূল রেখান্তর্গত সংখ্যাগুলিকে পরস্পর কার্ণিকভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা ঃ—

১১শ চিত্র।

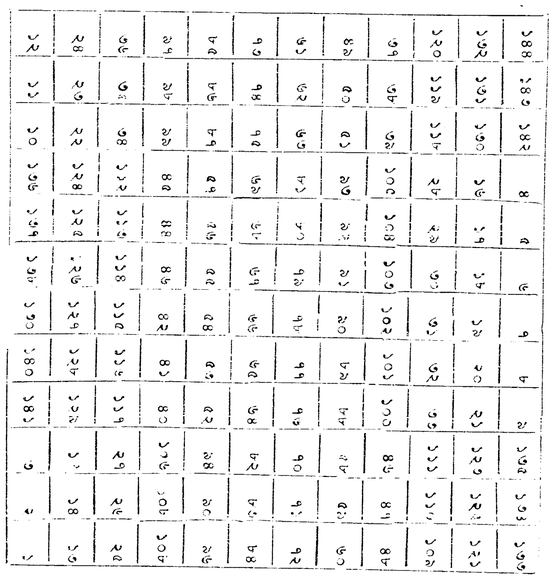

উপরি অঙ্কিত চিত্র ১০ নং চিত্র হইতে কার্ণিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা লব্ধ। এই স্কোয়ারটি যে ম্যাজিক, তাহা সহজেই পরীক্ষিত হইতে পারে। ইহার মূল সংখ্যা ১২, কুহক সংখ্যা ৮৭০। ইহার প্রত্যেক পংক্তি, স্তম্ভ, ও কর্ণের সমষ্টি ৮৭০।

এবংবিধ কার্ণিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা স্কোয়ারটি কেন যে

ম্যাজিক স্কোয়ারে পরিণত হয়, তাহার হেতু বুঝাইতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এতৎ সম্বন্ধে কোনও ইংরাজি গ্রন্থ পাঠ করিলেই সম্যক্ জানিতে পারিবেন, অথবা নিজে একটু নিবিষ্ট চিত্তে চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিবেন। তবে সামান্য দু'এক কথা আভাষ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১০ নং চিত্রে পরস্পর-সম্বন্ধী দুই পংক্তি অথবা স্তম্ভের যোগফল কুহক সংখ্যার দ্বিগুণ। পরবর্ত্তী চিত্রে প্রত্যেক পংক্তি ও স্তম্ভের অন্তর্গত ৬টি সংখ্যার ঐরূপ কার্ণিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রত্যেকের যোগফল কুহক সংখ্যার সমান করা হইয়াছে। পুনশ্চ, ১০ নং চিত্রে লক্ষিত হইবে যে, প্রত্যেক কর্ণের যোগফল কুহক সংখ্যার সমান, সুতরাং ১১ নং চিত্রেও কর্ণের যোগফল উহার সমানই হইয়াছে। কারণ, উভয় চিত্রে কর্ণদ্বয়ের সংখ্যা সমূহের প্রকৃত পরিবর্ত্তন হয় নাই।

নিম্নে ৪-মূল সংখ্যক কুহক-চতুরস্রের রচনা প্রদর্শিত হইতেছে। এস্থলে ঋ চিহ্নিত (৮ নং চিত্র দেখ) কক্ষবর্গের কার্ণিক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কুহক সংখ্যা = ৩৪।

১২ নং চিত্র।

১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬

১৩নং চিত্র।

১	১৫	১৪	৪
১২	৬	৭	৯
৮	১০	১১	৫
১৩	৩	২	১৬

এই স্থলে এবারকার মত প্রবন্ধের শেষ করিলাম। বারান্তরে সামান্য যুগ্ম কুহক চতুরস্র রচনা-প্রণালীর আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এরূপ প্রবন্ধ অতি-দীর্ঘ হইলে পাঠকের ধৈর্য্য থাকে না। তবে যদি পাঠক একবার নিজে ম্যাজিক স্কোয়ার রচনা করিতে চেষ্টা করেন বা কখনও করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ প্রবন্ধ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আমোদ দান করিতে পারিবে, ইহাই ভরসা। বস্তুতঃ এরূপ বিষয়ে সামান্য মনোনিবেশ করিলেও যথেষ্ট বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা যায়। ইতি—

শ্রীমুরলীধর রায় চৌধুরী।

কাশীনাথ।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা; তিনি কাশীনাথের সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং কাশীনাথের সহমর্ম্মিণীও বটেন। কাশীনাথ যেমন পতি, অন্নপূর্ণা সেইরূপ পত্নী; কাশীনাথ দয়াময়, অন্নপূর্ণা দয়াময়ী; পরোপকারে আত্মীয়পালনে আশ্রিতবাৎসল্যে কাশীনাথ যেরূপ মুক্তহস্ত, অন্নপূর্ণাও সেইরূপ মুক্তহস্তা। প্রতিবেশীদিগের দুঃখ দেখিলে, কাশীনাথ কাতর হন, অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন। ভগবান তখনও অন্নপূর্ণাকে সন্তানমুখ দেখিবার মত সৌভাগ্য দেন নাই, কিন্তু অন্নপূর্ণা আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনীদিগের সন্ততি সন্তানে সে অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন। শিশু দেখিলে কর্ত্তা গৃহিণী দুই জনেই কোলে লইয়া দেন। কাশীনাথ বা অন্নপূর্ণার কাছে অন্যের জাতিভেদ আছে, কিন্তু শিশুর জাতিভেদ নাই। শিশুর হৃদয় সদা পবিত্র; তাহার দেহ কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণার বিচারে সদা পবিত্র।

বৃহৎ গ্রামে কাশীনাথের বাস, গণ্ডগ্রামে লোক অনেক। দীনদরিদ্রের অভাব ছিল না। গ্রামের সকলের দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দূর করেন, এরূপ শক্তি কাশীনাথের নাই; মন থাকিলেও সেরূপ ধন নাই। না থাকিলেও কিন্তু নিজ পাড়ায় কাশীনাথ প্রকৃত অন্নাভাব থাকিতে দেন না। কাশীনাথের অর্থ, কিন্তু অন্নপূর্ণার সমর্থ। কাশীনাথের উপার্জ্জিত ধনে অন্নপূর্ণার অকুণ্ঠিত অধিকার। প্রতিবেশিনীদিগকে অন্নপূর্ণা এতদূর আত্মীয় করিয়াছেন, যে, তাঁহার কাছে কাহারই মনের কথা খুলিয়া দিতে লজ্জাবোধ হয় না। অন্নপূর্ণার কাছে নিজের বা সংসারের দুঃখ অভাব জানাইতে কেহই কুণ্ঠিত হয় না।

অন্নপূর্ণারও তিলমাত্র ঔদাসীন্য নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়া নৈত্যিক কর্ত্তব্য সারিয়া, অন্নপূর্ণা প্রথমেই প্রতিবেশিনীদিগের খবর লইতে বাহির হন। কাহার পুত্র কন্যা কিরূপ আছে, কাহারও কোনরূপ অসুখ হইয়াছে কি না, কাহার সংসারে কিরূপ খাদ্য-ব্যবস্থা চলিতেছে, অন্নপূর্ণা সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন। এই অনুসন্ধানে অন্নপূর্ণা জাতিভেদে কর্ত্তব্যভেদ করেন না। কিন্তু যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে বলিয়া সকলের বিদিত, তাহাদের গৃহেই অন্নপূর্ণা অগ্রে পদার্পণ করেন। যে গৃহে রুগ্নশয্যা, সে গৃহে সর্ব্বাগ্রে অন্নপূর্ণার পদার্পণ। রুগ্নভবনে একবার পদার্পণ করিয়াই তিনি তুষ্ট হন না, দিনে দুই তিন বার নিজে যাতায়াত করেন। যাহার সংসারে রুগ্ন, তাহার পক্ষে কাশীনাথের ভবন দিবারাত্র অবারিতদ্বার।

কাশীনাথের বাড়ীতে একজন প্রবীণ ও সুচিকিৎসক বৈদ্য আছেন। কাশীনাথের কৃপায় তাঁহার কোন অভাব নাই। কবিরাজ মহাশয়ের দুই পুত্র কলিকাতায় কাশীনাথের হাউসে কাজ করেন; এক পুত্র চৌদ্দুকে ব্যবসায় শিখিয়াছেন, কাশীনাথের বাড়ীতে থাকিয়াই পিতার সাহায্য করেন। কবিরাজ মহাশয়েরাও পিতা পুত্রে মহাশয় লোক। স্বভাব, শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তের গুণে, তাঁহারাও কাশীনাথের মত পরহিতব্রত। ঔষধ পত্রের সমস্ত ব্যয়ভার কাশীনাথ বহিয়া থাকেন। উৎকৃষ্ট বহুমূল্য ঔষধ প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়, দিবারাত্র অকাতরে বিতরিত হয়। দুইজন সুচিকিৎসক প্রাণপণে পরোপকার করেন, ঔষধের অভাব নাই; গ্রামের দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছে। তখনও মেলেরিয়ার আবির্ভাব প্রাদুর্ভাব হয় নাই, গ্রামে রোগ ব্যাধি কম। কাশীবাবুর কবিরাজেরাই গ্রামকে রোগমুক্ত রাখিয়া থাকেন।

কদাচ কখনও যদি ডাক্তারী চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন হইত, তাহা হইলেও কাশীনাথ কুণ্ঠিত হইতেন না। হুগলিতে তখনও সাহেব ডাক্তার বিরাজ করিতেন। তাঁহার সহিত কাশীনাথের বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু কাশীনাথ তাঁহার সময় ও পরিশ্রমের মূল্য বুঝিতেন। সুতরাং ডাক্তার সাহেবকে কাশীনাথের জন্য কেবল পরার্থপরতায় নির্ভর করিতে হইত না। তবে ডাক্তার সাহেবও ভাল লোক ছিলেন; কাশীনাথের পরার্থপরতায় তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। কাশীনাথের, পরামর্শে বা উদ্যোগে যাহারা হুগলি পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহাদের প্রবেশপত্র ডাক্তার সাহেবের কাছে অবারিত ছিল। যাহারা আসিতে পারিত না, যাহাদিগকে দেখিবার জন্য ডাক্তার সাহেবকে কাশীনাথের গ্রামে যাইতে হইত, তাহাদিগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার সাহেব কিছু কিছু দর্শনী লইতেন; কিন্তু একজনকে দেখিতে গিয়া তিনি স্থানে বদলে দশজনকে দেখিয়া আসিতেন। কবিরাজী চিকিৎসা এবং কবিরাজী ঔষধেই কাশীনাথের অনুরাগ অধিক ছিল। কবিরাজী চিকিৎসাই গ্রামের পক্ষে প্রায় যথেষ্ট হইত। ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য কাশীনাথকে বড় অধিক বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু বেগ ধরিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না।

চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ঔষধপত্রের ভার কবিরাজ মহাশয়দিগের হস্তে, ভোগ্য এবং পথ্যের ভার অন্নপূর্ণার হস্তে। অন্নপূর্ণা বাছিয়া বাছিয়া দুইটী দাসী রাখিয়াছিলেন, এসব কার্য্যে তাহারা অকাতরে তাঁহার সাহায্য করিত। আবার প্রতিবেশিনীদিগের ভিতরও অনেকেই অন্নপূর্ণার পথে বিচরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার সৎকার্য্যে আর্থিক সাহায্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না; সাময়িক সাহায্যে তাহারা অল্পকালের জন্যও ইতস্ততঃ করিতেন না। পাড়ার ভদ্রবংশীয়া বিধবারা ঐ সকল পরোপকার-কার্য্যে প্রাণপণে সাহায্য করিবার জন্য লালায়িত থাকিতেন। যাহারা উচ্চবংশে জন্মে নাই, সেরূপ স্ত্রীলোকদিগের ভিতরও অনেকের মন উচ্চ ছিল। অন্নপূর্ণার দৃষ্টান্ত সংক্রামক হইয়াছিল, সুতরাং সৎকার্য্যে অন্নপূর্ণার কখনই সহায়াভাব হইত না।

রমণীসমাজে অন্নপূর্ণার দৃষ্টান্ত যেরূপ সংক্রামক হইয়াছিল, পুরুষ সমাজে কাশীনাথের দৃষ্টান্তও সেইরূপ সংক্রামক হইয়াছিল। গ্রামের সকল অভাবেই কাশীনাথ অনুরূপ সহায় ও সহকারী পাইতেন। গ্রামটীর ভাব স্বচ্ছন্দ দেখিলে অন্য গ্রামের লোককে বিস্মিত হইতে হইত। ভিন্ন গ্রামের দুই একজন কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণার গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া কাশীনাথের গ্রামে—তাঁহার পাড়ায়—আসিয়া সপরিবারে সবাস করিয়াছিলেন।

অন্নপূর্ণা গ্রামের অন্নপূর্ণা। পাড়ায় তিনি অদ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা; বাড়ীতে সদাব্রত অন্নসত্র। চারি দিকে অন্ন-বিতরণ। চাউল, দাউল প্রত্যহ এক বার মাস বিলি হয়; অর্থ-বিতরণেরও অভাব হয় না। বিলাস বাবুকে বলে, অন্নপূর্ণা জানেন না। অন্নপূর্ণা সুন্দরী, কিন্তু কেবল ঈশ্বরভক্তিতেই আলো করিয়া আছেন। পরণে টক্‌টকে কস্তা পেড়ে সাড়ী, হাতে কঙ্কণ, পায়ে টক্‌টকে আলতা, সিঁথায় টক্‌টকে সিন্দুর, কপালে একটী গোলাকার ক্ষুদ্র উল্‌কী। বিলাস বল, সজ্জা বল, বসন ভূষণ বল, ইহাতেই পর্য্যবসিত। স্নানান্তে বালুচরে চেলী ভরসা। অন্য-রূপ পরিবর্ত্ত ঘটেই নাই। শীতকালে যে, কাশ্মীরী শাল, রুমাল, জামিয়ার কাশীনাথের অঙ্গে উঠিত না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সে বিষয়েও বাহুল্য ছিল না।

অন্নপূর্ণা দশজনকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসেন। এ ব্যবস্থা বারমাস। সেই অন্নপূর্ণা কালীপূজার আয়োজনে ব্যস্ত, অন্নপূর্ণার গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব। উদ্যোগ আয়োজনের কথা আর কহিতে হইবে কেন? কালীপূজার পূর্ব্ব দিন—চতুর্দ্দশীর দিন—অন্নপূর্ণা কিরূপ ব্যস্ত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দিবাভাগের চারি প্রহর যে, কিরূপে কাটিয়া গেল, অন্নপূর্ণা তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। সন্ধ্যার পর একটু অবসর পাইয়াছেন। সন্ধ্যার পর হইতেই অন্নপূর্ণার মনটায় পূজার চিন্তা ছাড়া আর একটা চিন্তা আসিয়া উঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমে রাত্রি বাড়িতেছে, সেই চিন্তার আসা যাওয়াটাও ঘন ঘন হইতেছে। কাশীনাথে সোমবার কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দশীর যাত্রা সম্বন্ধে যেরূপ আভাস দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে রাত্রি ৯টার পরই অন্নপূর্ণার হৃদয়ে আশার বলবতা হইবার কথা। নয়টা হইয়া গেল, দশটাও বাজে। বাড়ীতে ঘড়ী ছিল। সাপ্তাহিক যাতায়াতের জন্য কাশীনাথকে সময়ের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইত, কাজেই একটী ভাল বিলাতী ঘড়ী তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিতে হইয়াছিল। আজ চতুর্দ্দশীর রাত্রে সেই ঘড়ী অন্নপূর্ণাকে ক্রমেই উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল। দশটার পর উদ্বেগ বাড়িল, ক্রমেই উদ্বেগ চরমে উঠিয়া পড়িল।

তখন অন্নপূর্ণাকে মনের উদ্বেগ মুখে বাহির করিতে হইল। কিন্তু উপায় কি? কর্ত্তা কি কলিকাতা ছাড়িতে পান নাই? তাহা ত স্বপ্নের অগোচর। বাড়ীতে পূজা, নিশ্চিত আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথার কখনও অন্যথা হয় না। যদি আপিশের কোন গুরুতর কাজ হঠাৎ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে কর্ত্তা নিশ্চিত ভজাকে পূর্ব্বাহ্নে পাঠাইয়া দিতেন। ষোল ক্রোশ পথ ভজার পক্ষেত পথই নহে!

অন্নপূর্ণা অস্থির হইয়া পড়িলেন। টেলিগ্রাফের সবে সূত্রপাত হইতেছিল, রেল হয় নাই। কলিকাতায় লোক না পাঠাইলে খবর পাওয়া যাইবে না। অন্নপূর্ণা বড় উতলা হইয়া, একজন পাককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চারি জন পাক, ভজা গুরো কর্ত্তাকে লইতে আসিয়াছে, বাড়ীতে যদো মধো দুই ভাই বর্ত্তমান। দুই জনেই নামজাদা। তখনকার দিনে দুই জনেই সকলের পরিচিত।

অন্নপূর্ণার আহ্বানে যদু আসিয়া অন্দরে উপস্থিত হইল। কাশীনাথ বাটী আসেন নাই, বাড়ীর সকলেই উতলা। বাহিরের দালানে কমিটী বসিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সভাপতি হইয়াছেন। যদু মধুও উতলা হইয়াছে। অন্দরে আসিয়া যদু মা-ঠাকরুণের হুকুম শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বলিলেন,

"যদু, কর্ত্তা এখনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। মনে কত কি আসিতেছে! হয়ত হঠাৎ পীড়া হইয়াছে! হয়ত শক্ত ব্যারাম। তাই ভজা গুরোও আসিতে পায় নাই। মা কালীই ভরসা! এখন খবরটা পাইবার কি হইবে বল দেখি যদু?"

পীযূষাকৃতি—লম্বপদ—যদু বলিল, "মা, আপনার আশীর্ব্বাদে—যদু মধু দুই জনেই কাল সকালেই কলিকাতা হইতে খবর আনিতে পারে: ষোল ক্রোশ পথ কি আর পথ! কিন্তু রাত্রিকাল! হক সাহেবের দরবার! আমাদের সেরূপ চলন—সেরূপ মূর্ত্তি—দেখিলে, হক সাহেবের লোকে আটকাইয়া ফেলিবে। বাবুর নাম করিলে যমে ছাড়িয়া দেয়, জানি। কিন্তু একবার ধরা পড়িলে, ছাড়াইতে অনেক লেঠা, অনেক বিলম্ব। পাঁচপাড়ার রায় মহাশয় আমাদিগকে চেনেন, কিন্তু রাত্রিকাল, তাঁহার কাছে যাইতে, তাঁহাকে সব কথা বলিতে, অনেক দেরী হইবে। তাই ভাবিতেছি, আর কি উপায় আছে।"

অন্নপূর্ণার মনে হঠাৎ আর একটা চিন্তা আসিল। একটু ভাবিয়া তিনি যদুকে বলিলেন,

"কর্ত্তাকে আনিতে কোন্ মাঝী গিয়াছে?"

যদু বলিল, "যেই যাউক, এক ভাই ঘরে আছে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে তাকে গিয়া বল, এখনই খিলা ছাড়িয়া কলিকাতায় রওনা হউক। চারি বটে বহিলে, খিলা এক প্রহরের মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিবে। খবর লইয়াই খিলা চলিয়া আসিবে। তাহা হইলে, বেলা ৮।৯টার মধ্যে খবর পাইব।"

পাঠক, খিলা একপ্রকার ক্ষুদ্র ডিঙ্গী, তীরের মত ছোটে। এখনকার

গঙ্গায় খিলা দেখা যায় না, তখন অনেক ছিল। দুই বটে ফেলিয়া দুইজন লোকে ছয় ঘণ্টায় ষোল ক্রোশ পথ অনায়াসে আসা যাওয়া করিত। খিলায় ভয়, মাঝী দাঁড়ী খুব শক্ত না হইলে, হঠাৎ উলটিয়া যাইতে পারে। এই জন্য দাঁড়ী, মাঝী, জেলে, মালা প্রভৃতি যত জলের পোকাই খিলায় চড়িয়া যাতায়াত করিত। অন্য লোকে খিলার ত্রিসীমায় যাইত না।

যদু অন্নপূর্ণার আদেশ লইয়া সদরে উপস্থিত হইল। সেখানে একবার কমিটীতে ঐ প্রস্তাবের আলোচনা হইল। কিন্তু অন্নপূর্ণার প্রস্তাবে প্রতিবাদ হইল না। তখন যদু সর্দ্দার, মাঝীর ঘরের দিকে, যাত্রা করিল। অন্নপূর্ণাও মা কালীর শরণ লইয়া কালীনাম করিতে বসিলেন।

যদু সর্দ্দার যে, হঠাৎ ফিরিয়া আসিল! কেবল ফিরিয়া আসিল না, যদু ছুটিয়া অন্দরে পশিল! অন্দরে আসিয়া যদু "মা—মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সোণায় সোহাগা।

"কি—কি—যদু তুই ফিরিলি কেন?" বলিয়া অন্নপূর্ণা ক্ষিপ্রপদচারে যদুর কাছে উপস্থিত হইলেন। মার উদ্বেগ দূর করিবার জন্য যদু বলিল, "বাবু আসিয়াছেন, নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে। ভজা ভাই বেহারা পাড়ায় খবর দিতে গিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মা কালি—মা করুণাময়ি! রক্ষা কর মা! হাঁরে তিনি কেমন আছেন? কি ব্যারাম হয়েছে?" যদু সর্দ্দার বলিল, "বেহারার কথা শুনিয়া আমিও প্রথমে আঁধার দেখেছিলাম। ভজা ভাই বলিল, ভয় নাই, কর্ত্তা ভাল আছেন। নৌকায় দুইটী মেয়ে মানুষ আছে, ভদ্র ঘরের মেয়ে মানুষ, তাই কর্ত্তা পাল্‌কী চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন, ইহাদিগকে না তুলিয়া দিয়া নিজে আসিতে পারিবেন না।"

অন্নপূর্ণা অবাক হইলেন! দুইটী স্ত্রীলোক, পালকী চাই: কর্ত্তার সঙ্গে আসিয়াছে! অবশ্য আত্মীয় কুটুম্ব। কিন্তু এমন গুপ্ত কুটুম্ব কে আছে, যাহাকে অন্নপূর্ণা চিনেন না? যদি থাকে, তবে কাশীনাথই বা অন্নপূর্ণাকে পূর্ব্বাহ্নে না বলিয়া সেই গুপ্ত কুটুম্ব কুটুম্বিনীদিগকে নিজেই লইয়া আসিলেন কেন? অন্নপূর্ণা বিস্ময়সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। গভীর অতলস্পর্শ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াও কিন্তু অন্নপূর্ণা স্থির করিলেন, নিশ্চিতই কর্ত্তা কর্ত্তব্যের পালন করিয়াছেন। পতিগত-প্রাণা পতিব্রতার মনে এইরূপ সিদ্ধান্তই অগত্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্নপূর্ণা অতিথিসৎকারের আয়োজন করিলেন।

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োতিথিঃ॥"

একে অতিথি, তাহে স্ত্রীলোক, তাহে আবার পতির আদৃত। অন্নপূর্ণা যথোচিত আয়োজনেরই ব্যবস্থা করিয়া অতিথি-সংবর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনটা কিন্তু গঙ্গাতীরের দিকেই ধাবিত হইল, সেন পাড়ার ঘাট হইতে সেনেদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করিতে থাকিল। এরূপ ব্যস্ত থাকিয়াও কিন্তু অন্নপূর্ণার মন এক নিমিষের জন্যও কাশীনাথের কাছ-ছাড়া হইল না। মহাশয়া অন্নপূর্ণার মন মহাশয় কাশীনাথকে সঙ্গে লইয়াই ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নারীর নারায়ণ পূজ্যতম স্নেহতম পতি সুস্থ দেহে ঘরে আসিয়াছেন, অশুভ চিন্তা দূর হইয়া গিয়াছে; ইহাতেই অন্নপূর্ণা আনন্দিতা। তাঁহার মন তখন ছুটাছুটি করিতে করিতে একবার বিস্ময়সাগরে ঝাঁপ দিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ আনন্দসাগরে সাঁতার দিতেছে। ক্রমাগত এইরূপ করিতে করিতে মনকেও ক্লান্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু অন্নপূর্ণার উত্তেজনায় ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়াও অবসন্ন হইতে পাইতেছে না। মন বেচারীকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। কি যে করিবে, কিসে যে চিন্তিত হইবে, অন্নপূর্ণার মন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। এক একবার আসিয়া অন্নপূর্ণার কাছে আশ্রয় চাহিতেছে, কিন্তু আশ্রয় পাইতেছে না। অন্নপূর্ণা তখন নিজেই আশ্রয়ের জন্য লালায়িত, মনকে আশ্রয় দিবেন কিরূপে?

এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া অন্নপূর্ণা বসিয়া রহিয়াছেন, মনও তাঁহার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময়ে বেহারাদের সেই বাঁধা সুরের চীৎকার-ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দুলীবাহকদিগের স্বর দেশের সর্ব্বত্রই একরূপ। সম্প্রদায়ভেদে বেহারাদের স্বরভেদ হইয়া থাকে, পাঠক শুনিয়াছ কি? দুলে বেহারার স্বরে আর ধাওয়া বেহারার স্বরে কিরূপ তারতম্য, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি? মেদিনীপুর অঞ্চলের বাউরি-বেহারার স্বর যে, আমাদের অঞ্চলের দুলীর বা ধাবক বাহকদিগের মত নহে, একেবারেই ভিন্নরূপ, তাহা মনোযোগ দিয়া দেখিয়াছ কি? উৎকল বেহারাদের স্বর সকলেরই পরিচিত। কিন্তু উহাদিগের ভিতর স্থানভেদে স্বরভেদ হইয়া থাকে। বালেশ্বরের বাহক-দিগের স্বরে আর কটকের বাহকদিগের স্বরে তারতম্য আছে। আবার এক কটক বা বালেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরও ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিহার অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের ভিস্তী ধাওয়ার বেহারাদের স্বরও স্বতন্ত্ররূপ! কিন্তু বিহারী বাহকদিগের স্বরে আর অযোধ্যিক বাহকদিগের স্বরে যে, প্রভেদ আছে, তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক শুনিলেই, বেশ বুঝা যায়। দাক্ষিণাত্যে দেখিবে, বোম্বাই বাহকদিগের স্বরে আর হায়দরাবাদী বাহকদিগের স্বরে কখনও ঐকতান সঙ্গীত চলিবে না। মাদ্রাজীদিগের স্বরেও দেখিবে, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য।

আমাদের হুগলি জেলায় দুলে এবং ধাওয়া বেহারাদিগের স্কন্ধেই শিবিকাভার ন্যস্ত ছিল, এখনও ন্যস্ত হইয়া আছে। কাশীনাথের গ্রামেও এই দুই সম্প্রদায়েরই বাহকতাকার্য্যে অধিকার ছিল; দুলীর আর ধাবকেরাই পাল্কী ডুলি তঞ্জাব তক্তনামা বুঁচো বহিয়া কাশীনাথের বাহকজীবন সার্থক করিত। মাছ ধরা দুলীদিগের অন্যতর ব্যবসায়, তাল কাটা, খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করা, রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা, ধাবক বা ধাওয়াদিগের অবান্তর কার্য্যরূপে পরিচিত এবং পরিচিত ছিল। তালগাছের কচি তাল কাটিয়া তালশাঁস বাহির করা, খেজুর গাছের মস্তকে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া রস বাহির করা, যে সকল ধাওয়ার পরিচিত কার্য্য, তাহারাই শিউলি বলিয়া আখ্যাত।

কাশীনাথের গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী পল্লীবিশেষের ধাওয়াদিগের উপর এক সময়ে ভয়ঙ্কর পাপ-কার্য্যেরও আরোপ হইত। লোকে বলিত, জাঙ্গালের পথে উহারাই পান্থ-হত্যা করিত। জাঙ্গালের পার্শ্ববর্ত্তী একটী ভয়ঙ্কর জলাশয়েই হত পথিকদিগের শব নিক্ষিপ্ত হইয়া জলাশয়কে নরক-স্থানে পরিণত করিত। সে দীঘির নাম শুনিলে, এখনও লোকের শিহরিয়া উঠিতে হয়। জলাশয়ের জলভাগ ঘননিবিড় পদ্মবনে আচ্ছন্ন ছিল। প্রস্ফুটিত সহস্র সহস্র শতদলে জল স্বর্গীয় শোভাধারণ করিত, দেখিলে মনে হইত যেন নন্দন-কাননের কমল-সরোবর। পদ্মপত্রে জল আচ্ছন্ন থাকিত, জলের ভিতর কি আছে না আছে কেহই দেখিতে পাইত না, দেখিতে সাহসও করিত না। সরোবরের উপরিভাগে স্বর্গ, তল ভাগে ঘোর সজীব নরক!

একতলে রৌরব, অন্যতলে সাক্ষাৎ স্বর্গ। এরূপ স্থানও সংসারে বিরল নহে। এই সরোবরের অদূরেই ধাবকদিগের বসবাস ছিল। ধাবকদিগের উপরে আমরাও বাল্যকালে মহাপাপের আরোপ করিতাম। কেহ কেহ বলিতেন "অমুক অমুক ধাওয়াকে যষ্টি হস্তে জাঙ্গালের পথে বনের অন্তরালে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।" কেহ কেহ বলিতেন,

"অমুক ধাওয়াকে অমুক দিন গাবড়া ছুড়িতে দেখিয়াছি।" কিন্তু আমরা কখনও কোন ধাবককে দণ্ডভোগ করিতে দেখি নাই। হক সাহেবের দরবার সময়ে কোন কোন ধাবককে সন্দেহভাজন হইয়া মুচলেকা দিতে হইয়াছিল, কাহাকে কাহাকে মাস তদারকের আসামী হইয়া প্রতিদিন রাত্রে থানায় হাজির থাকিতেও হইত। কিন্তু এরূপ সন্দেহভাজন অন্যান্য লোককেও ত হইতে হইয়াছিল। নিম্ন সম্প্রদায়ের সবল দৃঢ়কায় অনেক পুরুষকেই হক সাহেবের বা তাঁহার সহকারীদিগের সন্দেহভাজন হইতে হইত। একদা অতি প্রত্যূষে, অন্ধকারের ঘোর কাটিয়া যাইবার পূর্ব্বে, মাটী কাটিতে বাহির হইয়া, নিরীহ নির্ব্বিরোধ শান্তপ্রকৃতি গুরু-দাস কুম্ভকারকেও ত হক সাহেবের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে পড়িয়া, অনেক কষ্টে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইয়াছিল। তাই বলিতেছি, হক সাহেবের সময়ে বেহারা কাজ অনেক হইত, ধাবকদিগকে হয়ত বিনাদোষে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইত।

গানের রাগিণী ভাঁজা, তান মারা, গিট্‌কিরি দেওয়া যেরূপ গায়কের স্বভাবসিদ্ধ, রচনার প্রসঙ্গসূত্রে নানারূপ অবান্তর-কথার অবতারণা করাও সেইরূপ লেখকের স্বভাবসিদ্ধ। গায়কের ফাউ-কাজে মজলিস মাত হয়, রাগ রাগিণীর ভাঁজাতেই শ্রোতারা মজা পান, তান-মারায় তাঁহারা তর হইয়া সারা হন, গিট্‌কিরির গমকে গাঢ় সুখের উপভোগ করেন। লেখকের সকল পাঠক কিন্তু তাঁহার ফাউ লইতে সম্মত নহেন; অরসিক, অসামাজিক, অবোধ পাঠক অবান্তর রসের আস্বাদনে বঞ্চিত হন; উপন্যাস উপাখ্যান হইলে কেবল মূল আখ্যা-য়িকার জন্য লালায়িত হইয়া পড়েন।

"কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহকথ্যতে।"

ভাবভঙ্গি আচার ব্যবহার কাজ কর্ম্ম দেখিলে ত মনে হয়, এখনকার পাঠকসমাজে বাল্যেরই একাধিপত্য। বালক বালিকার বাল্য ত আছেই, আবার যুবক যুবতী প্রবীণ প্রবীণাদিগেরও চিরবাল্য, শ্মশান-যাত্রী বৃদ্ধেরাও বাল্যে গড়াগড়ি দেন। প্রকৃত বালকে আর এই সকল অপ্রকৃত বালকে যে প্রভেদ আছে, তাহাতেই লেখককে বিড়ম্বনাভোগ করিতে হয়।

একলা বৈশাখী বালককে বুঝান সহজ, বারমেসে বালকদিগকে বুঝান শক্ত। গাছের কচি ডাল বাঁকান চলে, পাকা ডাল বাঁকে না। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। লেখককে অবসর বুঝিয়া নানা কথার অবতারণা করিতেই হইবে, সুবোধের ভাবনাই তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। পাঠক-সমাজে অবোধ বালকের সংখ্যা অধিক বলিয়াই ত আর লেখক কেবল আমাটে গল্প লইয়া আসর রাখিতে পারেন না; কেবল 'বাঙ্গমা বাঙ্গমী' কেবল 'টঙ্কাবতী ডঙ্কাবতী' কেবল 'লুলু গুলু' কেবল 'রাঙ্গুলী খুঙ্গুলী' কেবল 'হামুদো মামুদো' কেবল 'ফুলী বুলী' লইয়া ভদ্রমজলিসে বসিতে পারেন না। তিনি জানেন, একটী উপযুক্ত শ্রোতা সহস্র সহস্র অনুপযুক্ত শ্রোতার সমষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি দেখেন, একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি। তিনি দেখেন, কোটি কোটি খদ্যোতেও কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষে পরিণত হয় না। মহাজনের পথেই আমাদিগকে চলিতে হইবে। "কথা-সরিৎসাগরেই" আমাদিগকে তরী ভাসাইয়া চলিতে হইবে। বানভট্টকেই গুরুপদে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে; সময়ে নানা কথার অবতারণা আমাদিগকে করিতেই হইবে। পাঠকের ঔৎসুক্য চাপিয়া রাখিয়াও আমাদিগকে তাঁহার অভিজ্ঞতা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্নপূর্ণার অবস্থা বুঝিয়াও আমরা হঠাৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। শিবিকার কথায় আমাদিগকে বাহকের কথা আনিতে হইল; বাহকের কথায় দুলীর ধাবকাদির তারতম্য অগত্যা পাঠককে দেখাইতে হইল। সবুরে মেওয়া ফলে; সোণায় সোহাগা পড়ে; চন্দ্রে চন্দ্রিকা হয়; আমে রস আসে; দুধে মাখন উঠে; বালো যৌবন দেখা দেয়; বর্ষা শীতের পর বসন্ত আবির্ভূত হয়; ভেকের মক্‌মকানি থামিয়া গেলে, কোকিল কুহরবে জগৎকে মুগ্ধ করে।

ঐ দেখ, পাল্‌কী আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। বাহকেরা স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইল, অন্নপূর্ণাও শিবিকা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অতিথিসেবার সূত্রপাত করিলেন। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, একটী সধবা, অন্যটী বিধবা; সধবা সুন্দরী, বিধবা পরম সুন্দরী। সধবার ক্রোড়ে সুন্দর নবনীতকোমল শিশুপুত্র। এই শিশুই পাঠক গরুটীর ঘাটে কাশী-নাথের বক্ষ শীতল করিয়াছিল।

অন্নপূর্ণা দুই রমণীকেই স্বপ্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। বাসীরা প্রস্তুত ছিল; পূজাবাড়ী খাদ্য পেয়ে পরিপূর্ণ। অন্দরে রমণীরা শিশু লইয়া অন্নপূর্ণার সমাদরে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অন্নপূর্ণার হৃদয়স্থ সরলতা মধুরতা তাঁহার কার্য্যে ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। অপরিচিত রমণীদিগের হৃদয়ে দণ্ডমধ্যেই সুখের প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দণ্ডকাল অতীত হইতে না হইতেই, অপরিচিতারা যেন কতকালের পরিচিতা হইয়া পড়িলেন। "সদ্ভিরসঙ্গং কিমু বুদ্ধিমাঙ্গং।" সত্য সত্যই আভাষণে বন্ধুত্ব ঘটিয়া গেল। অন্দরে রমণীদ্বয়ের আদর, সদরে পুরুষের আদর। কিন্তু পুরুষটি নৌকারোহী কাশীনাথের পরিচিত হইয়াছেন, অপরিচিত অনাত্মীয় পরিচিত পরমাত্মীয় হইয়াছেন। সদরে অন্দরে সমান পরিচর্য্যা চলিতে লাগিল। বাড়ীর সকলে ব্যস্ত সমস্ত, ওদিকে নিশার যে, অবসান হইয়া গিয়াছে, কেহ তাহা দেখেন নাই। কাকের ডাকেই চমক ভাঙ্গিল। বাড়ীতে উৎসব জমিল, নব-বন্ধু-সমাগমে উৎসব আরও গরম হইয়া উঠিল। সোণায় সোহাগা পড়িলে, সোণা পলকের মধ্যে গলিয়া যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংক্ষিপ্তসার।

কাশীনাথ গৌরহাটী হইতে বাড়ী যাইবার সময়েই, নৌকায় বসিয়া, বিপত্তিমুক্ত পুরুষের মুখে তাঁহার ইতিহাস শুনিয়া লইয়াছিলেন। স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া, অন্নপূর্ণার কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবার জন্য, ইতিহাসের সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিলেন। আমরাও তাঁহারই মুখে শুনিয়া পাঠকের ঔৎসুক্যনিবৃত্তি করিতেছি।

কলিকাতার পাঠক বালী গ্রামের রহস্যজ্ঞ। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের, ঐ গ্রামে, একটী ষ্টেশন হইয়াছে। বালী সমাজ-স্থান, সেখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; কায়স্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। বালী গ্রামে অনেকগুলি বৈদ্যেরও বসবাস আছে। হুগলী জেলায় গুপ্তপল্লী, নামে গুপ্ত হইলেও, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় চির দিনই ব্যক্ত। গুপ্তপল্লীই গুপ্তি-পাড়া বলিয়া পরিচিত। নামেই বুঝা যায় যে, গ্রামটী বৈদ্য প্রধান। পূর্ব্বে গুপ্তপল্লী নানাবিধ গুপ্ত বংশে ভূষিত ছিল। ৺কীর্ত্তিচন্দ্র সেনের কীর্ত্তি-কলাপে এখনও গ্রাম দেশবিখ্যাত। ৺বৃন্দাবনচন্দ্র গ্রামের দেবতা, বৃন্দাবন-চন্দ্রের কৃপায় গ্রাম একপ্রকার তীর্থস্থান।

গুপ্তিপাড়ার নরোত্তম সেন গুপ্ত বালীগ্রামে বিবাহ করেন। কালী পূজার পূর্ব্বদিন নরোত্তম বালীগ্রাম হইতে স্ত্রীকে নিজের ভবনে লইয়া যাইতেছেন। নরোত্তমের বয়স তখন ত্রিংশ বত্রিংশ বৎসর। সহধর্ম্মিণী নারায়ণী দেবীর বয়স বিংশতি মাত্র; ক্রোড়ে একমাত্র শিশুপুত্র। নারায়ণীর পিতা মাতা কেহই ছিলেন না। তিনি মাতুলালয়ে প্রতি-পালিতা। বালীগ্রামে মাতুলালয়েই বসবাস। বিবাহাদিও সেইখানে হইয়াছিল। সঙ্গে যে বিধবা, তিনি নরোত্তমের সহোদরা। ৺কালীমাতার পাদপদ্ম দেখিবার জন্যই দাদার সঙ্গে কালীঘাটে আসিয়াছিলেন। মুখ-দেখা কলা-বেচা, দুই কাজই এক যাত্রায় সারিয়াছিলেন; কালীর পূজা দিয়া দাদার সঙ্গে বালী গিয়া বউকে সঙ্গে করিয়া গুপ্তিপাড়ায় ফিরিতেছিলেন। পথে গরুটীর কাছে সকলকেই দস্যু হস্তে পড়িতে হইয়াছিল।

কথায় কথা বাড়ে, পরিচয়ে পরিচয় বাড়ে। বৈদ্যজাতির সংখ্যা

কম ; খুঁজিলে প্রায়ই সম্বন্ধ বাহির হইয়া পড়ে। কথায় কথায় কাশীনাথ জানিতে পারিয়াছিলেন, মাতামহবংশের সম্বন্ধসূত্রে নরোত্তমের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ আছে। আর জানিতে পারিয়াছিলেন, গুপ্তি পাড়ায় নরোত্তমের তেমন আত্মীয় কেহ নাই। নরোত্তমের পিতা মাতাও লোকান্তরে গিয়াছেন। পর-প্রতিপালিত নরোত্তম ৺বৃন্দাবনচন্দ্রের দেবোত্তর জমিদারীতে সামান্য গোমস্তাগিরি কাজ করিয়া, কষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন।

নরোত্তমের পরিচয় এখন এইখানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকুক ; আমরাও কালী-পূজায় প্রবৃত্ত হই। ব্যসনের আপাততঃ উপসংহার হইয়াছে, এখন উৎসবের সময়। অদ্য কাশীনাথের কালীপূজা। পূজা সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাশীনাথ শাক্ত, কিন্তু কৌল নহেন ; পূজায় বলিদান আছে, কিন্তু কারণ নাই। কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণা কাঙ্গালের বাপ মা। ইঁহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল উৎসবেই কাঙ্গালি-ভোজনের ধূম লাগিয়া থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক সকল উৎসবেই অন্নসত্র বসিয়া থাকে। জন্মাষ্টমীপূজায় মাকাল পূজায়ও বাড়ীতে অন্নের ছড়াছড়ি হইয়া থাকে। কালীপূজারত কথা নাই, পূজার মত পূজা। শাক্ত কাশীনাথের দুর্গোৎসবে যেরূপ আগ্রহ, শ্যামাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজায়ও সেইরূপ আগ্রহ। বাড়ীতে শারদীয়া পূজা হয় বলিয়া কাশীনাথ বাসন্তী-পূজা করেন না। কিন্তু বাসন্তী মহাষ্টমীর দিন অন্নপূর্ণা নিজে মা অন্নপূর্ণার পূজা করেন, অন্নপূর্ণার অন্নপূর্ণা-পূজায় অন্নব্যঞ্জনের পর্ব্বত প্রস্তুত হয়। অন্নপূর্ণার অন্নপূর্ণা-পূজায় যে ব্যয় হয়, তাহাতে পাঁচ গৃহস্থের দুর্গোৎসব সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইতে পারে।

কিন্তু অন্নপূর্ণা-পূজায় এখনও বিলম্ব আছে। আজ অন্নপূর্ণা শ্যামা-পূজায় প্রবৃত্তা। চতুর্দ্দশীর নিশা কাশীনাথের কিরূপে কাটিয়াছে, তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। কাশীনাথ এক মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষু মুদিতে পান নাই। দস্যুর সহিত যুদ্ধ, দস্যু-হস্তে পতিত সপরিবার নরোত্তমের উদ্ধার, অনন্তর গৃহে আগমন, নরোত্তম ও তাঁহার সহোদরা এবং সহধর্ম্মিণীর অভ্যর্থনা, ইত্যাদিরূপ কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কাশী-নাথকে কত বার কতরূপ উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। উপবাস অনিদ্রা ত আছেই। অন্যের শরীর, একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িত। কাশীনাথের শরীর মন দুই সবল ; বিশেষতঃ সৎকার্য্যে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ উৎসাহ। সুতরাং অদ্য কালীপূজার দিনে প্রাতঃকাল হইতেই কাশীনাথ বিনা অবসাদে উৎফুল্ল হৃদয়ে উৎসবের আয়োজন করিতেছেন। পূজার বাজার হাট পূর্ব্বেই হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনেও ঔদাসীন্য হয় নাই। ঘৃত ময়দা চিনি প্রভৃতি সমস্তই স্বগ্রামের গঞ্জে প্রচুর পরিমাণ সুপ্রাপ্য। প্রাতঃকাল হইতেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ীতে ভিয়ান বসিয়াছে। লুচী কচুরী তরকারী বাড়ীতে হইবে। খাজা গজা পানতুয়া প্রভৃতি যে সকল মিষ্টান্ন রসে মজিয়া মধুর হয়, তৎসমস্ত চতুর্দ্দশীর রাত্রেই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। মুড়কী পক্কান্ন প্রভৃত পরিমাণ প্রস্তুত হইয়া, ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। গ্রামে নররার অভাব নাই, শিবনাথ, বিশ্বনাথ, ভোলানাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মোদকের সন্দেশ কলিকাতায় পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। শিবু ময়রার সন্দেশ কলিকাতায় আসিয়া আদর পায়! শিমলা ও শুঁড়িপাড়া শিবুর একচেটিয়া ; শিকদারপাড়ায় ভোলানাথের আধিপত্য ; বিশ্বনাথ মল্লিক বাড়ীর মোদক।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কাশীনাথের গ্রামে উৎকৃষ্ট সন্দেশের মন ছিল ১৬ টাকা। রেল হয় নাই, যে স্থানের ছানা সেইস্থানে থাকিত। কাজেই সন্দেশ শস্তা ছিল। কাশীধামে শিবচন্দ্র বিশ্বনাথ দুইজনে সন্দেশের বায়না লইয়াছেন, বেলা দশটার পর হইতেই সন্দেশের আমদানী হইবে। কোন বস্তুরই কোন দিকে ত্রুটি হইবে না। ব্যয়ে কাশীনাথ অকুণ্ঠিত, লোক-বলের অভাব নাই ; ত্রুটি হইবে কেন ?

তথাপি কাশীনাথ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেছেন, সকল বিষয় অনুসন্ধান লইতেছেন। সদরের বৈঠকখানায় মজলিস হইতেছে। গ্রামের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক আসিয়া মজলিসে অধিষ্ঠান করিয়াছেন। কাশীনাথ কলিকাতা হইতে অম্বুরী তামাক লইয়া গিয়াছেন ; মজলিসে ঘন ঘন কলিকা-বদল হইতেছে। চতুর্দ্দশীর নিশার চূড়ান্ত অভিনয়ের কথার কাশীনাথকে অন্যূন দ্বাদশবার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। যিনি আসিয়াছেন, তিনিই আদ্যোপান্ত না শুনিয়া ছাড়েন নাই। অবশেষে কাশীনাথ নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, সহচর কমলকেই অভিনয়-কথার ভার লইতে হইয়াছে।

সকল ঘটনারই প্রশ্ন অনেকবার হইয়াছে। প্রশ্ন অন্দরে অন্দরে হইয়াছে। গৌরহাটীর সকল দস্যুর গতিবিধি বিষয়েই প্রশ্ন হইয়াছে। যে তিন দস্যু গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে যে, প্রশ্ন হয় নাই, এরূপ কেন মনে করিতে চাও? কাশীনাথ নিজে যে, দুই দস্যুর উদ্দেশে পিস্তল চালাইয়াছিলেন, তাহাই বা কেন ভুলিয়া যাও? এ সম্বন্ধে প্রশ্নও একাধিকবার হইয়াছিল। কিন্তু কাশীনাথ সন্তোষজনক উত্তর একবারও দিতে পারেন নাই। দাঁড়ীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া জাহাজ হইয়াছিল, গঙ্গায় পড়িয়া চারি দিক ঘাবাইয়াছিল, ডুব মারিয়া লাস ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। সজীব নির্জ্জীব কোনরূপ লাসই ধরিতে পারে নাই। ইহা কাশীনাথ প্রভৃতির জানা আছে, পাঠকেরও দেখা আছে। গ্রামের যাহারা অভিনয়ের কথা শুনিয়াছে, তাহাদেরও ইহা বিদিত হইয়াছে। যাহারা নূতন শুনিতেছে, তাহারাই নূতন প্রশ্ন করিতেছে। আর কমলকে উত্তর দিতে হইতেছে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন প্রবীণ শ্রোতা কমলের কথায় তুষ্ট না হইয়া কাশীনাথকে প্রশ্ন করিতেছেন ; কাশীনাথও কিন্তু কমলের উপর বরাত দিয়া তাম্রকূট সেবন করিতেছেন।

বড় বড় কলি-হুকায় ঘন ঘন জল ফেরান হইতেছে। কলিকাতার খাসা অম্বুরী বড় বড় কলিকায়, বসিয়া ভিয়ান-ঘরের গনগনে আগুনে দগ্ধ হইতে হইতে, কাশীনাথ ও তাঁহার প্রতিবেশীদিগের তৃপ্তি-সাধনে সাহায্য করিতেছে।

তামাক দেখিতে কাল বটে, কিন্তু তাহার সেই কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্বভাবে বড় উৎকৃষ্ট ; তাহার প্রকৃতি বড় মধুর ; গৌড় বলিয়াই তাম্রকূট মধুর হইয়াছে। স্বভাব বড় মধুর বড় মিষ্ট বলিয়াই, সে নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়াও পরকে পুলকিত করিতেছে ; গুড়ুক বঙ্গের মানবকে আত্মবর্ম্ম শিখাইতেছে। কাশীনাথকে আর শিখাইবে কি ? গুড়ুক বরং তাহার কাছে নিজেই শিক্ষালাভ করিতেছে ; সেই জন্যই তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, হুকার নলিচার মাথায় বসিয়া আছে।

পূর্ব্বদিনের নৈশ অভিনয়ের ভিতর দস্যুর জন্যই শ্রোতাদিগের বড় ভাল লাগিয়াছে। বাঙ্গালিবীর বীররসের বড় পক্ষপাতী, কিন্তু কেবল কথায় আর উপন্যাসে ; কেবল যাত্রা আর গানে। এই জন্যই ত বাঙ্গালীর যাত্রায় কেবল রামরাবণের যুদ্ধ, না হয় কেবল কীচকবধ আর শিশুপালবধ ; বাঙ্গালীর থিয়েটারেও কেবল পাণ্ডব-গৌরব আর কংসবধ। বাঙ্গালীর উপন্যাসেও বীররসের প্রবাহ, হয় সীতারাম, না হয় দেবী চৌধুরাণী। বাঙ্গালীর কাব্যে পলাসীর যুদ্ধ, ভাগবিবিজয়, মেঘনাদ বধ। কথায় বীররসের অভিনয় করিতে বাঙ্গালিবীর অদ্বিতীয়। বীররস পাইলে বাঙ্গালী আর কোন রসই চাহেন না ; যদি একান্ত চাহেন তবে করুণ। আর আদি ? তা, সে পক্ষে বাঙ্গালীর অনুরাগ অনাদি ও অনন্ত।

কাশীনাথের বৈঠকখানায় এইরূপ বীররসের প্রবাহ চলিতেছে। নৈশ-নাটকের দস্যু অঙ্কের পিস্তল-গর্ভাঙ্কের অভিনয়টা ঘন ঘন জমিতেছে। সুবক্তা কমল গুপ্তও অকুণ্ঠিতভাবে বাক্‌পটুতার বাহার দিতেছেন। জল-মগ্ন দস্যুত্রয়ের অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, কাশীনাথ ভায়ার পিস্তল অব্যর্থ, দুই গুলিতে দুইটা দস্যুর

নিশ্চিত নিপাত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন, নিপাত হইলে, সেইখানেই কাত হইত, লাস ধরা পড়িত ; কেহ মরে নাই, জখম হইয়া পলাইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, যে বেটার দিকে কাশীনাথ দাদা লক্ষ্য করেন নাই, সে বেটা গঙ্গা পার হইয়া পলাইয়াছে ; দস্যুরা সমুদ্র পার হইতে পারে, গঙ্গাত ইহাদের কাছে খানা ডোবা। কেহ বলিতেছেন, সেই রবো ডাকাত পুলিপোলাও হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল! অপর কেহ বলিতেছেন, রঘুর মার কি বুদ্ধি ছিল! ছেলের জন্য একটা লাউ পাঠাইয়া দিয়াছিল ; আর সেই লাউয়ের ভিতর যে উখা ছিল, সেই উখা দিয়া লোহার গরাদে ঘষিয়া ঘষিয়া, খয়া গরাদে রঘু উপড়াইয়া ফেলিয়াছিল। সেই ফাক দিয়া গলিয়া সমুদ্রে পড়িয়া বরাবর ভাসিতে ভাসিতে—চিৎসাঁতার দিতে দিতে—ঝিজলী কাথার কাছে আসিয়া, রঘুবীর মেদিনীপুর দিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। পাড়ার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিলেন, যে দুই বেটার গায়ে গুলি লাগিয়াছিল, তাহাদের হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ভাঙ্গা হাতে সাঁতার দিতে পারে নাই। বেটারা ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত, কাশীনাথ ভায়ার নৌকার তলায় ডুব মারিয়া বসিয়াছিল। দাঁড়ীরা আর সকল দিকে খুঁজিয়াছিল, বেটারা যে, ভায়ার নৌকার তলায় থাকিবে, তাহা মনে করে নাই। যোগই বাঘের বাসায় যায় ; বাঘ যে, যোগের বাসায় থাকিবে, তাহা ত মনেই হয় না। কাজেই বোকেবেটে বেটারা যে, নৌকার তলায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। তাহার পর কাশী ভায়া যখন নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, তখন বেটারা উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

কবিরাজের কথা কাশীনাথের কর্ণে স্থান পাইল, একটু আদরও পাইল। এমন সময় ভজহরি সর্দ্দার আসিয়া কাশীনাথের হাতে এক খানি পত্র দিল। ভজা ভোরে হুগলি গিয়াছিল, চন্দ্রশেখর রায়ের সহিত দেখা করিয়াছিল। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্র আনিয়া ভজহরি কাশী-নাথের হস্তে প্রদান করিল। পত্র খানা পাঠক তুমিও শুনিও। কিন্তু তোমার পত্রশ্রবণেচ্ছা এ পরিচ্ছেদে পূর্ণ হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

চন্দ্রশেখরের পত্র লইয়া কাশীনাথ পড়িলেন। সভাসদেরাই বা তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে ছাড়িবেন কেন? চন্দ্রশেখরের পত্র কাশীনাথ কর্ত্তৃক পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হইল। পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, এত দিনের পর প্রচারিত হইল। এই দেখ সেই পত্র ;

"নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন।

"কালী মাতার কৃপায় আপনার মঙ্গল হইবে। এখানকার কুশল জানিবেন। কল্য রাত্রিতেই আমি চারি দিকে প্রহরী এবং গোয়েন্দা পাঠাইয়াছিলাম। সে বিষয়ের কতক কতক কিনারা হইয়াছে। দুই জন আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। সকল আসামীই গ্রেপ্তার হইবে, এরূপ আশা আছে। সে পক্ষেও কিঞ্চিৎ সূত্র পাওয়া গিয়াছে। যে দুইটা আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহারা দুই জনই জখমী আসামী ; হাঁসপাতালে আছে। দুই জনেরই দক্ষিণ হস্ত একেবারে গিয়াছে। কাশীনাথ সেনের লক্ষ্য যে অব্যর্থ, তাহা পূর্ব্বেই আমার জানা ছিল। এবার প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আপনার সাহস ধৈর্য্য এবং কৌশল প্রশংসনীয়। শুনিয়া আমাদের সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, কাশীনাথ বাবু যদি আমাদের লাইনে কাজ লইতেন, তাহা হইলে, দেশের বড় উপকার হইত। কিন্তু আপনার উপস্থিত পদ ও আয়ের কথা শুনিয়া সাহেব হাসিয়া বলিলেন, কাশীনাথ বাবু ত রাজা। মা কালীর কাছে কামনা করিতেছি, আপনি রাজাই হউন। আসামী দুইটারই দক্ষিণ হস্ত আজ ডাক্তার সাহেব কাটিয়া দিবেন ; অন্যথা তাহাদের বাঁচা ভার। এরূপ ভয়ঙ্কর দস্যুদিগের অপঘাত হইলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ইহাদের মৃত্যু হইলে, অন্যান্য আসামীর কিনারা করা কিছু কঠিন হইত। বেটারা আপনার পিস্তলের গুলি খাইয়াও হতবুদ্ধি হয় নাই, যদুবায় চীৎকার করে নাই, আপনারই নৌকার তলায় ডুবিয়া ডুবিয়া লুকাইয়াছিল। নৌকা যদি আর একটু বিলম্বে খুলিয়া যাইত, তাহা হইলে উহাদিগকে প্রাণের দায়ে তৎক্ষণাৎ ধরা দিতে হইত, ডুবিয়া ত আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না। যে দস্যুটা গুলি খায় নাই, সে ডুব সাঁতারে কিছু-দূর গিয়া, পরে গা-ঢাকান দিয়াছিল। কোথায় গিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অদ্যই জানিতে পারিব। তাহারও সন্ধান হইয়াছে। জখমী আসামীরা জীবনে হতাশ হইয়া একরার করিয়া ফেলিয়াছে। কল্যকার সকল আসামীরই কিনারা হইবে। আপনার কল্যাণে এবার গৌরহাটীর দস্যু-হাট ভাঙ্গিয়া দিতে পারিব বলিয়া মনে করিতেছি। সাহেব বলিলেন, যদি এদেশে দশজন কাশীনাথ বাবু থাকিতেন, তাহা হইলে, দস্যুদমনের জন্য আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইত না। আপনার আত্মীয় এবং সহকারী কমল বাবুকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। সাহেব তাঁহারও যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছেন। আপনার পাক ভজহরি, গুরুদাস, যদু এবং মধু আমার পরিচিত। আমিই যে, তাহাদিগের জন্য আপনার কাছে সুপারিশ করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে আছে। তাহাদের কার্য্যে আপনি সন্তুষ্ট আছেন, ইহাতে আমারও সন্তোষ জানিবেন। ভজা আর গুরো, দুইজনই কল্য যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিল। উহাদের কথা সাহেবকে বলিয়াছি। দুই জনই সরকার হইতে পুরস্কার পাইবে। আমি মনে করিতেছি, দুই জনকেই গোটা কতক করিয়া সোনার কণ্ঠী গড়াইয়া দিব! মা দুর্গার পদতলে অসুরের গলায় কণ্ঠী যেরূপ শোভা পায়, ভজার গলায় ঠিক সেইরূপ শোভা পাইবে। আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, আপনার প্রতিমার অসুর আর ভজহরি দেখিতে প্রায় একরূপ ; বলে ও সাহসেও ভজহরি অসুর। এই গৌরহাটীর হাঙ্গামা উপলক্ষে যদি আমাকে বড় ব্যস্ত থাকিতে না হইত, তাহা হইলে, অদ্য গিয়া আপনার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ করিতাম। ভজার মুখে শুনিলাম, অদ্য রাত্রে আপনার বাড়ীতে লালু অধিকারীর যাত্রা হইবে। লালু বয়সে নবীন বটে, কিন্তু গুণে প্রবীণ। লালু যখন বৃন্দা সাজিয়া দূতীগিরী করে, তখন মুগ্ধ হন না এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার পাঁচপাড়ার বাড়ীতে এবার দশভুজার পূজায় লালু অধিকারী মানভঞ্জনে আমাদিগকে বড় মুগ্ধ করিয়াছিল! লালু অধিকারীর যাত্রা, আবার আপনার বাড়ীতে, তাহাতে শ্যামাপূজা! তথাপি যে, আমি যাইতে পারিলাম না, ইহাতেই বুঝিবেন, আমি সরকারী কার্য্যে কিরূপ বিব্রত আছি।

কলিকাতায় আসিবার সময়ে আমাদের ঘাটে একবার নৌকা লাগাইবেন। আমি আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। মকদ্দমার বিলম্ব আছে! সকল আসামী ধরিতে হইবে, যে দুইটী ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের যাহা হয় একটা হেস্তনেস্ত হইবে। আসামী দুইটীর মৃত্যু হইলেও ক্ষতি নাই, ইহাদের একরারের ফল পাইব। আর এরূপ দস্যুর অপঘাত হইলেও আপনাকে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ভজা ওরো এবং জন দুই দাঁড়ীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হইবে। দায়রায় ত আসামীরা উকিল দিতে পারিবে না! যদিই দেয়, তাহা হইলেও, যাহাতে আপনার সাক্ষ্য দিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিব। যখন দুইটী আসামী একরার করিয়াছে, তখন সকলকেই একরার করিতে হইবে। আপনি জানেন, তাহারা একরার না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

যাঁহাদের জন্য এত কাণ্ড, তাঁহাদের পরিচয় পাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত আছি। সেই জন্যও আপনার সহিত দেখা করা আমার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহাদিগেরও মামলা উপলক্ষে কোনরূপ কষ্টভোগ

করিতে হইবে না। একথা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিবেন। গৃহিণীকেও আমার নমস্কার জানাইবেন। তাঁহার সৌভাগ্যেই আপনার সৌভাগ্য। তিনি সত্যই আপনার সংসারের অন্নপূর্ণা; যেমন কাশীনাথ, তাঁহার সেইরূপ অন্নপূর্ণা! আপনারা পুত্রমুখ দেখিলেই, আমাদের সকল আক্ষেপ মিটিবে, জানিবেন। বোধ হইতেছে, আমাদের সাহেব আপনার খেতাবের জন্য লাটসাহেবকে বলিবেন। আপনি যে, নাম চাহেন না, উপাধি খেতাব চাহেন না; লোকহিতে যে, আপনার স্বাভাবিক ঈশ্বরদত্ত অনুরাগ; তাহা আমি জানি। আমাদের সাহেবকেও একথা বলিয়াছি। কিন্তু সাহেব আপনাকে খেতাব না দিয়া ছাড়িবেন না। তিনি বলেন, কাশীনাথ বাবুর কাজ কাশীনাথ বাবু করিতেছেন, আমাদের কাজও ত আমাদের করিতে হইবে।

নিঃ শ্রীচন্দ্রশেখর রায়।"

পত্র শুনিয়া মজলিসের সকল লোকেই আনন্দিত হইলেন, বাড়ীর সকলেই আনন্দিত হইলেন। পত্রের মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ সদর হইতে অন্দরে গেল। অন্নপূর্ণা কিন্তু আনন্দ-প্রকাশ করিলেন না। সদরেও কাশীনাথ আনন্দপ্রকাশে যোগ দিতে পারিলেন না। কাশীনাথ বলিলেন, "তাইত দুইটা মানুষ মরিবে না কি? দস্যুও ত মানুষ। কলিকাতায় যাইবার সময়ে একবার হুগলিতে নামিতে হইবে। আসামী দুই জনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিব। ডাক্তার সাহেব আমার বন্ধু, আমাকে বড় ভালও বাসেন। তাঁহাকে একটু জিদ করিয়া অনুরোধ করিব, মানুষ দুইটা যাহাতে হস্তচ্ছেদের যন্ত্রণায় মারা না যায়, তাহা তিনি অবশ্যই করিবেন। ডাক্তার সাহেব বড় দয়ালু। আমি ত দেখি, সাহেব জাতিরই মনে বড় দয়া। আমাদের হাউসের সাহেবেরাই কি কম দয়ালু!"

সদরে কাশীনাথের যে জন্য ভাবনা, অন্দরে অন্নপূর্ণারও ঠিক সেই জন্যই ভাবনা। চোর হোক ডাকাত হোক, মানুষত বটে। মানুষ অপঘাতে মরিবে! আবার নিজের পতির জন্য! অন্নপূর্ণা আনন্দ করিতে পারিলেন না! কিন্তু পতির কৃতকার্য্যেও তিনি দোষ দেখিতে পাইলেন না। সকল ভার অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া অন্নপূর্ণা পূজার কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। নরোত্তমের ভার্য্যা ভগিনী কিন্তু অন্নপূর্ণাকে আনন্দ-প্রকাশ করিতে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ না থাকিলে হয় ত বিরক্তি প্রকাশও করিতেন। বাড়ীর যে সকল স্ত্রীলোক দস্যুদের বিপত্তির কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছিল, নরোত্তমের সহধর্ম্মিণী ও সহোদরা তাহাদের সহিত যোগ দিয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার হৃদয় দস্যুর জন্যও ব্যথিত হইল, সকলেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অন্দরে অন্নপূর্ণার সমালোচনা, সদরে কাশীনাথের সমালোচনা চলিতে লাগিল। দস্যুর কথায় কত কথা উঠিল। অন্নপূর্ণা জীয়ন্ত মাছ কুটিতে দেন না; কই মাগুর মাছ বাড়ীতে আনিতে দেন না; ছারপোকা মারেন না। কড়াশুদ্ধ দুধ খাইয়াও বিড়াল অন্নপূর্ণার জন্য দণ্ডভোগ করে না। ভাঁড়ার-ঘরে ইঁদুরের বাসা, তথাপি অন্নপূর্ণা সেখানে জাঁতিকল পাতিতে দেন না। অন্নপূর্ণা আরও কত কি অন্যায় কাজ করেন! এই সব অন্যায় কাজের ফর্দ্দ ধরিয়া মহিলারা অন্নপূর্ণার নিন্দা করিতে লাগিলেন। দস্যুর দুঃখে অন্নপূর্ণার দুঃখ হইয়াছে দেখিয়া যে, তাঁহারা অন্নপূর্ণাকেও দস্যু-সম্প্রদায়ভুক্ত করিলেন না, ইহাই অন্নপূর্ণার পরম সৌভাগ্য।

যাহাই হউক, অন্দরে অন্নপূর্ণার চরিত্রসমালোচন অন্নপূর্ণার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল না। সদরে কাশীনাথের চরিত্র-সমালোচনও কাশীনাথের কর্ণে পথ পাইল না। কাশীনাথ ও অন্নপূর্ণা পূজাব্যাপারেই ব্যস্ত হইলেন। বেলাবসানে বাড়ীতে লোকারণ্য হইল, ক্রমেই উৎসব পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিচার।

কালীপূজা সমাপ্ত হইল, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইয়া গেল; পাড়া-সুবাদের গ্রাম-সুবাদের ভগিনীরা কাশীনাথকে ভাইফোটা দিয়া গেলেন। প্রাঙ্গণ ভগিনীরা বয়োনির্ব্বিশেষে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বৈদ্য ভগিনীরা বয়ঃপুরঃসরে আশীর্ব্বাদ প্রণাম করিলেন; কায়স্থাদি ভগিনীরা প্রণাম করিয়াই কার্য্যসমাপ্তি করিলেন। তখন দেশে সৎসৎ লইবার ব্যবস্থা হয় নাই; রিজলে সাহেবের তখন আবির্ভাব হয় নাই; জাতিগত -রহস্যের সিদ্ধান্ত লইয়া বিবাদ কলহ উপস্থিত হয় নাই। কায়স্থ বৈদ্যের পর্য্যায় বা প্রাধান্য স্থির করিবার জন্য তখন বাবুরা ব্যস্ত হন নাই; কাজেই কায়স্থ-ভগিনীরা বৈদ্য কাশীনাথকে প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

কাশীনাথের ভগিনীবৃন্দে গ্রাম পূর্ণ ছিল; মুক্তহস্ত কাশীনাথ আশীর্ব্বাদ প্রণাম কখনও বিনা দক্ষিণায় গ্রহণ করিতেন না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন তাঁহার খরচ হইল চারিশত সাড়ে চারিশত টাকা। গ্রামের অধিকাংশ ভগিনীই যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আর আশীর্ব্বাদ বা প্রণামে মঙ্গল-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। দুই একটী ভগিনীই বস্ত্র দিলেন। যাঁহারা বস্ত্র দিয়া দ্বিতীয়া করিলেন, তাঁহাদের প্রণামী আশীর্ব্বাদী কিছু অধিক হইল। আর সকলের বরাদ্দমত দুইটী করিয়া টাকা হস্তগত হইল। বস্ত্রদাত্রী ভগিনীরা যে টাকা পাইলেন, তাহাতে বস্ত্রব্যয় পোষাইয়া গেল, অধিকন্তু দুই আড়াই টাকা হাতে থাকিল।

নরোত্তমের সহধর্ম্মিণী ও সহোদরাও উদাসীন থাকিতে চাহিলেন না, তাঁহারাও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু এক কাশীনাথ ত আর ননদ ভাজ দুইজনের দাদা হইতে পারিলেন না। নরোত্তম প্রথম দিনেই কাশীনাথকে দাদা বলিয়াছিলেন, তাঁহার ভগিনীই নবলব্ধ দুইটী দাদাকে ভাইফোটা দিবার অধিকার পাইলেন। নরোত্তমের সহধর্ম্মিণী নারায়ণী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু ক্ষোভনিবৃত্তির উপায় দেখিতে পাইলেন না। কাশীনাথের সহধর্ম্মিণী বলিলেন, "তা আর দুঃখ কেন? এ যে, আমিও ত কর্ত্তাকে ভাইফোটা দিতে পাইলাম না। আমারও যে দশা, তোমারও সেই দশা। বিদ্যাবাগীশ দাদা এলে শাস্ত্র বলাইতে বলিব। ভাসুরফোটার বিধান লইয়া তোমার ক্ষোভ মিটাইয়া দিব।" নারায়ণীকে অগত্যা শান্ত হইতে হইল।

কাশীনাথ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরদিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন, পথে হুগলিতে নৌকা লাগাইয়া চন্দ্রশেখরের সহিত দেখা করিলেন। হক-আপিশে হকসাহেবের সহিতও দেখা হইল। কাশীনাথের কমনীয় ব্যবহারে কমিশনর সাহেব একান্ত পরিতুষ্ট হইলেন। খেতাবের কথা তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কাশীনাথ সে প্রস্তাবেও বিনয়ের একশেষ দেখাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। যথাসময়ে কলিকাতায় আসিয়া হাউসের কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। হুগলিতে কাশীনাথ ডাক্তার সাহেবের সহিত নিজে দেখা করিতে পারেন নাই, কালীপূজার পরদিন প্রাতেই চিঠী দিয়া ভজাকে পাঠাইয়াছিলেন। চিঠী পড়িয়া ডাক্তার সাহেব বলিয়াছিলেন, "যাও বাবুকে সেলাম দেও, ওঃ হাউ কাইণ্ড-হার্টেড!" আহত দস্যুদ্বয়ের চিকিৎসার উপর সাহেবকে অধিক মনোযোগী করাই যে পত্রের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।

কাশীনাথ আপিশের কাজকর্ম্ম দেখিয়া, আবার শনিবার কলিকাতা ছাড়িলেন। যাইবার সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বকই গরুটীর কাছ দিয়া নৌকা লইয়া যাইতে বলিলেন। চতুর্দ্দশীর ঘটনার পর চারিদিকে একটা গুজব উঠিয়াছিল। ভয়ঙ্কর গুজবে কাশীনাথ ছাড়া আর সকলকেই ভীত হইতে হইয়াছিল। "গৌরহাটীর দল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পূর্ব্বপারের জগদ্দলের দলও যোগ দিয়াছে। দস্যুরা কাশীনাথকে প্রাণে মারিবে, তবে নিশ্চিন্ত হইবে।" এইরূপ গুজবই লোককে

বিচলিত করিয়াছিল। গুজব শুনিয়া কাশীনাথ হাসিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাতে কথাটা অন্নপূর্ণার কানে না যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ জানিতেন, দস্যুজাতি স্বভাবতই কাপুরুষ; সাধারণতঃ বাঙ্গালি দস্যু একান্ত কাপুরুষ। যাহারা প্রতিহিংসার কথা রটাইয়া দেয়; তাহারা কাজে প্রতিহিংসা করিতে সাহসী হয় না। কাশীনাথ কমলকে বলিলেন, "দস্যুদের উদ্দেশ্য কি জান? তাহারা মনে করিয়াছে, আমি ভয় পাইব, যাওয়া আসার সময়ে কেবল আত্মরক্ষা করিতেই বিব্রত হইব, কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিব না। তা হবে না দেহে যত দিন বল থাকিবে, হাতে যতদিন অর্থ থাকিবে, ততদিন কাশীনাথ সেন্ কেবল আত্মরক্ষায় বিব্রত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন না।" শক্তি সাহসে কমল গুপ্ত হীন ছিলেন না, নিজের প্রাণে কমল দৃক্‌পাতও করিতেন না। কিন্তু কাশীনাথ দাদার জীবনকে কমল ভায়া বহুমূল্য—অমূল্য বলিয়া মনে করিতেন। গ্রামে কমলের যুড়িদার ছিলেন ৫।৬ জন। তাঁহারাও কাশীনাথের আপিশে কাজ করিতেন। কমল নিয়ম করিলেন, তাঁহাদের তিনজনকে পালা করিয়া নৌকায় লইবেন; আর নিজে ত থাকিবেনই। নৌকায় পাঁচ জনেরই যাওয়া আসা চলিতে লাগিল। দাঁড়ি সম্প্রদায়ের যাহারা বলে কৌশলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল, নৌকায় তাহারাই দাঁড় ধরিতে লাগিল। কমলের অনুরোধে চন্দ্রশেখর আর দুইজন পাককে পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের একজন বাড়ীতে যদু মধুর সাহায্য করিতে লাগিল, একজন নৌকায় ভজা গুরোর সহচর হইল। ভজা একদিন হাসিতে হাসিতে কমলগুপ্তকে বলিল, বাবুর পরসা-আছে বলিয়াই বুঝি ক্রমে লোক বাড়াইতেছেন? কিন্তু ভজহরির কমলটা একদিন আপনাকে দেখিতে হইবে। কমল তুষ্ট হইয়া বলিলেন, ভজু তা আমি জানি; তথাপি সাবধান হইতে দোষ কি?

হুগলীর খবর কাশীনাথ সর্ব্বদাই লন। সেখানে লোকজন আছে, তাহারা পত্র লেখে। একদা হুগলীর পত্র পড়িয়া কাশীনাথ একটু সন্তোষের পরিচয় দিলেন। নিত্যসহায় কমল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা আজ পত্র পড়িয়া আনন্দিত হইলেন কেন? হক সাহেব বুঝি খেতাবের যোগাড় করিয়াছেন? দাদা আপনি যে দিন রায় বাহাদুর হইবেন, সে দিন আমি সত্য সত্যই নৃত্য করিব।" এই বলিয়া কমল তখনই নৃত্যের উদ্যোগ করেন দেখিয়া, কাশীনাথ বলিলেন, কমল আনন্দের কারণ শুনিবে? হতভাগাদের হাত দুইটা জন্মের মত গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, আর ভয় নাই; ধনুষ্টঙ্কারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে!

"হরিবোল হরি"—কমল বলিলেন, "হরিবোল হরি! এই জন্য আহ্লাদ; তবে আর আমার নাচা হলো না।"

কাশীনাথ কমলের মুখ চাপা দিয়া বলিলেন, "তোমাকে পনর দিন ছুটী দিলাম, কলাই হুগলি যাইতে হইবে। ভজা সঙ্গে গিয়া তোমাকে রাখিয়া আসিবে। মৌলবী আমীর হোসেনকে পত্র দিব; তিনি হুগলির প্রধান উকিল, ফৌজদারীতে অদ্বিতীয়। তাঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে। কিন্তু আলাপ পরিচয়েরই বা প্রয়োজন কি? তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা তুমি দিবে, টাকা-কড়ি তোমার সঙ্গে দিব। টাকা কড়ি নিজের কাছে রাখিও না, মণ্ডলদের গদিতে জমা করিয়া দিও, যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা লইও। অর্থ অনর্থের মূল; অর্থের জন্য তোমাকে যাহাতে বিব্রত হইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি অগ্রেই স্থির করিয়াছি। তোমাকে বড় একটা কিছু করিতে হইবে না; মৌলবী সাহেব একজন কি দুজন মোক্তার রাখিবেন, তাঁহারাই মকদ্দমার তদ্বির করিবেন।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ কথা শুনিয়া কমল অবাক হইয়া রহিলেন! কিসের মকদ্দমা, কাহার মকদ্দমা, তাহাত কাশীনাথ প্রথমে বলিলেন না। কাশীনাথকে নিজের জন্য কোন কালে আদালতের আশ্রয় লইতে হয় না। অথচ হঠাৎ একটা সঙ্গীন মকদ্দমা উপস্থিত হইল, আর কমলও জানিতে পারিলেন না! বস্তুতঃ অবাক হইবার কথা! কমলকে বিস্ময়-বিজড়িত দেখিয়া কাশীনাথ চুপি চুপি বলিলেন, "ভায়া! সেদিনকার কয়টা ডাকাইতই ধরা পড়িয়াছে। মাজিষ্টর সাহেব কয়জনকেই দায়রায় ঠেলিয়াছেন। বিচার দায়রায় হইবে। দেখ কমল, বিনা বিচারে যেন কাহারও কোন কালে দণ্ড না হয়। মনু বলিয়াছেন,

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"

যাহারা অপরাধী, প্রকৃত দণ্ডনীয়, তাহাদিগের উচিতরূপ দণ্ড হয়, ইহা আমার ইচ্ছা। কিন্তু যাহারা অপরাধী নহে—দণ্ডনীয় নহে, তাহাদের দণ্ড হইলে আমাকে বড়ই মনঃকষ্ট পাইতে হইবে। হক সাহেবের কর্ম্মচারী দিগকে বিশ্বাস নাই, হয়ত দুই চারি জন নিরাপরাধও অভিযুক্ত হইয়াছে। তাই বলিতেছি, তোমাকে দেখিতে হইবে, নিরপরাধের দণ্ড না হয়। আর একটা কথা বলি, যাহাদের হাত কাটা গিয়াছে, ভগবান তাহাদের যথেষ্ট দণ্ড করিয়াছেন; আমিও নিমিত্তের ভাগী হইয়াছি। যাহা হইয়াছে, তাহার আর চারা নাই, বাটা হাত কিছুতেই গজাইবে না। উহারা যে, প্রাণে বাঁচিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। এখন যদি দুই বেচারী দায়রায় মুক্তি পায় কিম্বা অল্প দণ্ডে অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে, আমার মনে শান্তি হইবে। অন্যথা আমি যত দিন বাঁচিব, ততদিন মনঃকষ্ট পাইব। উকিল মৌলবি সাহেবের পত্রে আমি সব কথা খুলিয়া লিখিতেছি, তুমিও তাঁহাকে বেশ করিয়া বলিও; অর্থের জন্য চিন্তা করিও না।

"দাদা তুমি দেবতা—মানুষ নও দেবতা।" বলিয়া কমল হুগলি যাইবার-জন্য ব্যগ্রতা দেখাইলেন। কাশীনাথের নৌকা আসিয়া ঘাটে ছিল, ভজাকে সঙ্গে লইয়া, টাকা কড়ি লইয়া, কমল পরদিন হুগলি-রওয়ানা হইলেন। কমল হুগলি পৌঁছিয়া উকিল আমীর হোসেনের সহিত দেখা করিলেন, কাশীনাথের পত্র পড়িয়া মৌলবী সাহেব সব বুঝিলেন, কাশীনাথের মহত্ত্ব দেখিয়া তিনিও বিস্মিত হইলেন।

দায়রার দিন আগতপ্রায়; আর দিন দুই তিন বিলম্ব। কাশীনাথের যে কয় জন দাঁড়ী মাঝি মাজিষ্টরের আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছিল, দায়রায়ও তাহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে হইল। কমলকে মাজিষ্টরের কাছে সাক্ষ্য দিতে হয় নাই! চন্দ্রশেখর সে পক্ষে সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আর একরারী আসামীদের বিচারে এত সাক্ষী না মানিলেও চলিত। পাছে গ্রামে হৈচৈ হয়, পাছে অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন হন, এই ভয়ে কাশীনাথ প্রথম বিচারেয় কথা কাহাকেও বলেন নাই, নিত্য-সহচর প্রিয়বন্ধু কমলকেও বলেন নাই। মাজিষ্টরের কাছে যাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তাহারাই কাশীনাথের আদেশে নিঃশব্দে হুগলি উপস্থিত হইয়াছিল; সাক্ষ্য দিবার পরও কাশীনাথের নিষেধ শিরোধার্য্য করিয়া মূক হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাই ত সহসা দায়রার কথা শুনিয়া কমলকে অবাক্ হইতে হইয়াছিল।

যথাদিনে দায়রা বসিল, উকিল সরকার বক্তৃতা করিয়া সাক্ষ্য লইতে আরম্ভ করিলেন। মৌলবি আমীর হোসেনও আসন হইতে উঠিয়া জেরা করিবার জন্য জজসাহেবের অনুমতি চাহিলেন। হুগলির প্রধানতম উকিল মৌলবি সাহেব দস্যু আসামীদিগের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, দেখিয়া জজ সাহেব বিস্মিত হইলেন। কিন্তু অনুমতি তিনি দিতে বাধ্য। মৌলবী সাহেব জেরায় মন দিলেন। উকিল-সরকার সাক্ষীদিগের এজেহার লইতে লাগিলেন, মৌলবি সাহেবও জেরা করিতে লাগিলেন। কমল বিস্মিতভাবে একপার্শ্বে বসিয়া সব দেখিতে শুনিতে লাগিলেন।

দুই দিনেই বিচার সাঙ্গ হইয়া গেল। মৌলবী সাহেবের বক্তৃতায় কমল সিদ্ধান্ত করিলেন, দাদা ঠিক বলিয়াছেন, সকল আসামীত অপরাধী নহেই বটে। বক্তৃতায় জজ সাহেবকেও একটু বিচলিত হইতে হইল।

জজ রায় দিলেন;—

অভিযোগ, আসামীরা দস্যুবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চারি

আসামীর দণ্ড হইতে পারে না; ইহারাই যে, সেদিন গরুটীর গঙ্গাতীরে নরোত্তম সেনের নৌকায় ডাকাতী করিতে আসিয়াছিল, তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই। সন্দেহের ফল আসামীদের প্রাপ্য। চারি আসামী খালাস পাইল। অবশিষ্ট আসামীদের ভিতর যে দুইজনের হাত কাটা গিয়াছে, ইহাদের অপরাধ সম্বন্ধে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দণ্ডও ইহাদের যথেষ্ট হইয়াছে। দুই জনেরই ডান হাত দুইটা একবারে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, ইহাদের ১৮ মাস করিয়া কারাদণ্ড হইল। অবশিষ্ট কয়জনের তিন বৎসর করিয়া মিয়াদ হইল। ইহারা অকুস্থানে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু কাজে হাত দেয় নাই।

বিচারে সকলকেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। মৌলবি সাহেবকে কাশীনাথ বাবুই নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শুনিয়া জজ সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। মানুষের মহত্ত্ব দেখিলে, মানুষ তুষ্ট হইয়া থাকে। হক-সাহেব এবং রায় মহাশয়ও কাশীনাথকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

আসামীরাও জানিতে পারিয়াছিল, কাশীনাথ বাবু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া হুগলির বড় উকিলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাই এরূপ বিচার হইল। মুক্ত আসামীরা কাশীনাথের জয়গান করিতে করিতে চলিয়া গেল। দণ্ডিত আসামীরাও কাশী বাবুর ধন্যবাদ করিতে লাগিল, তাহারা স্থির করিয়াছিল, এবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস!

হাত-কাটা আসামী দুইটা কমলকে প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোন কালে দস্যুবৃত্তি করিব না। দায়রা চুকিয়া গেল। কমল হুগলিতেই অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন। ভজা ও দাঁড়ী মাঝীরা নৌকা লইয়া কলিকাতায় ফিরিল। কাশীনাথ বিচার সংবাদে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি শনিবার কলিকাতা ছাড়িয়া, হুগলিতে চন্দ্রশেখরের সহিত দেখা করিয়া, কমলকে তুলিয়া লইয়া, বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিচারফল অন্নপূর্ণা যথাকালে জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনিও ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না; দায়রার খবরের জন্য দুই দিনই লোক পাঠাইয়াছিলেন!

অন্নপূর্ণাকে বিচারফলে তুষ্ট দেখিয়া, কাশীনাথ আরও তুষ্ট হইলেন। গ্রামে মতভেদ হইল। চারিটা আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছে, অপর গুলার সামান্য দণ্ড হইয়াছে, শুনিয়া অনেকে দুঃখিত হইলেন। আবার কাশীনাথ প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া আসামীদের পক্ষে উকীল মোক্তার দিয়াছিলেন বলিয়াই চারিটা আসামী মুক্তি পাইয়াছে, অপর গুলার অল্প দণ্ড হইয়াছে, ইহা শুনিয়া উহারাত খুবই বিরক্ত হইলেন। কিন্তু কমলের দলস্থ যত সাহসী মহাপুরুষই কাশীনাথকে বাহবা দিতে লাগিলেন। কাশীনাথ কাহারও নিন্দা প্রশংসায় কর্ণপাত করিলেন না। নিজের মনে শান্তিলাভ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; আর অন্নপূর্ণা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আরও যথেষ্ট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

দায়রার বিচারের পর যশস্বী কাশীনাথের যশ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার শৌর্য্য সাহস দয়া দানশক্তির সহিত তাঁহার উদারতা এবং ক্ষমাশীলতা মিশিয়া তাঁহার মধুর যশঃসৌরভ অধিক মধুর করিয়া দিল। কিন্তু দেশের সকল লোকে তাঁহার ক্ষমাশীলতার মর্য্যাদা গ্রাহ্য করিতে পারিল না। দস্যুকে ক্ষমা করা, বিচারে দস্যু পক্ষে অর্থব্যয় করিয়া উকীল দেওয়া, দস্যুর উদ্ধারে চেষ্টা করা, এরূপ কার্য্যে মহত্ত্বপ্রকাশ হয়, ইহা অনেকে বুঝিতেই পারিল না। কেহ কেহ বলিল, "আর কিছুই নয়, বাবাজী শেষে ভয় খাইয়া গিয়াছেন। প্রথমে সাহস করিয়া পিস্তল চালাইয়া বাহাদুরী দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন শুনিলেন, দেশের সকল ডাকাত তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন বাবাজীর সব সাহস বাহির হইয়া গেল। প্রাণের ভয় বড় ভয়। কাশী যেন দস্যুদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য এইরূপ চলাইলেন।" কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, যে কয়টা দস্যুর ঠিক মনাক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে খালাস পাইতে দেখিয়া যেন কাশীনাথ মনকে প্রবোধ দিলেন, কিন্তু যে দুইটাকে নিজের হাতে গুলি করিয়াছিলেন, সেই দুইটারও দ্বীপান্তর হইল না দেখিয়া, তিনি আহ্লাদ করেন কি কাঁদিয়া? যাহাদিগকে নিজের হাতে গুলি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উপর দয়া! এ আবার কিরূপ দয়া ভাই? এ যে, কসাইয়ের কান্না! লোকটা শেষ টাকার গরমে ক্ষেপিয়া গেল নাকি?" কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন, "কাশীনাথ নিজে ছয়টা ডাকাত পুষিতেছেন; ভজা ওরা যদো মধো পাকা ডাকাত। আর দুটো নূতন আসিয়াছে, সে দুটোও যেন যমদূত। যার ছয় ছয়টা ডাকাত, সে কি ডাকাতের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বাঁচিতে পারে? ঘরের ডাকাত কয়টার ভয়েই কাশীনাথ সেনকে বাহিরের ডাকাতের সঙ্গে শেষে ভাব করিতে হইল। প্রথমে গোয়ার-তমীর জন্য একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল, টাকা খরচ করিয়া আর একটু দুঃখ দেখাইয়া, তাহা সারিয়া লইল।"

দুই একটী অতিমহাশয় চুপি চুপি চারিদিকে চাহিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আমাদের মনে ত কেবল কুই গায়! বাপ, খরচ করে যে সিঙুড়ের নবাব বাবুর মত! নবাব বাবু টাকার ছিনিমিনি খেলিল, কাশী বাবু টাকার জলছত্র দেন। এত টাকা কি মানুষে রোজগার করিতে পারে? মুচ্ছুদ্দি অনেক দেখিয়াছি। এই ভাগবত মজুমদারও কলিকাতায় মুচ্ছুদ্দিগিরি করেন, তিনিত এত খরচ করিতে পারেন না। আরে ভাই—অন্য পন্থা আছে; নইলে কি এতগুলো ডাকাত বৃথা পুষিতেছে? ঐ যে, গরুটীর ওখানে কয়টা ডাকাতের সঙ্গে ঝকড়া হইয়াছিল, তাহার ভেদ আছে। বুঝিতেছ না—ভাগ বাঁটোয়ারার বিবাদ!"

সমাজে ভাল মন্দ দেব দানব চিরকাল। যাহারা কাশীনাথের কৃপায় জীবনধারণ করিত, তাহাদের ভিতরও অনেকে তাঁহাকে বিদ্বেষ করিত। পূর্ব্বোক্তরূপ আলোচনায় যাহারা মন দিয়াছিল, তাহারা কাশীনাথের সাহায্যে বঞ্চিত ছিল না।

ক্রমে সকলের সকল আলোচনার সবই কাশীনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। যাহারা পাড়ায় নিন্দা করিতে লাগিল, তাহারাই আবার সম্মুখে কাশীনাথকে দুঃখীদের আসরে বসাইতে লাগিল। কাশীনাথ বুঝিলেন সব, মানবপ্রকৃতির আলোচনা করিয়া একটু দুঃখিতও হইলেন। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য এক দিনের তরেও কুণ্ঠিত হইল না।

দুইটা নরাধমের কথায় কিন্তু কাশীনাথের অটল অচল হৃদয়ও একটু বিচলিত হইল। গ্রামের ঈশ্বর সেন আর ভৈরব সেন, দুই জনই কাশীনাথের কৃপায় সপরিবারে জীবনধারণ করিত। দুই জনই গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বদলোক; প্রবীণ হইয়াও নবীনসুলভ বড় পাপে লিপ্ত। দুই জনেরই প্রধান কাজ ছিল; হুগলির আদালতে আসিয়া নানারূপ কুকার্য্য অকার্য্য করা। লোকে বলিত, ঈশ্বর ভৈরব জালীয়াত। কাশীনাথের সম্বন্ধে ঈশ্বর ও ভৈরব দিবারাত্র আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিল। একদিন কমল স্বকর্ণে শুনিলেন: ঈশ্বর ভৈরবকে বলিতেছে, দাদা আসল খবর রাখ কি? ঐ যে এক বেটা অজ্ঞাতকুলশীল ঐ যে নরা বেটা—নরত্তমে বেটা, ঐ বেটাই যত নষ্টের গোড়া। বেটার বিধবা ভগিনীকে দেখিয়াছ ত? সুন্দরী বটে! মাগটাও কি কম সুন্দরী! আমি শুনিয়াছি, ঐ দুইটা কুলটার জন্যই যত কাণ্ড! এক জমিদারের সঙ্গে উহাদের জন্য কেশের বিবাদ হইয়াছিল, তাই খুনজখম! চন্দ্রশেখর রায়টা ঘুষখোর; কেশের ত আর টাকার ভাবনা নাই। তাই নিজে গুলি করিয়াও বিনা বিচারে উদ্ধার পাইল। আর জমিদারের লাঠিয়াল গুলাকে হক সাহেব জেলে পাঠাইল! আবার

কুমারের মত মায়াকান্না কাঁদা হইল! যদি ভিতরে টান না থাকিবে, তবে কোথাকার কে নরোত্তম, তাহার উপর এত যত্ন কেন হইল? আরে মরে আমার নরোত্তম ঠাকুররে! বড় আত্মীয়! ভাই তুমি ত জান, আমার সহিত কেশের কি সম্বন্ধ। আমি পিতামহার কাছে শুনিয়াছি, আমার প্রপিতামহের এক পিশীর ভাসুরঝীর সঙ্গে কেশের প্রপিতামহের জেঠার শালার মেলের বিবাহ হইয়াছিল। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বত্বেও কাশীনাথ বাবু—আমাদের মুচ্ছুদ্দি বাবু—করেন কি? আমাদের অন্ন বস্ত্রের ভার লইয়াছেন। দাদা এইত সাহায্য! আর দেখনা, নরোত্তম ঠাকুরের কত যত্ন! আবার শুনছি, ঐ মহাপ্রভুই নাকি বাড়ীর দেওয়ান হইলেন? ঠিক হইল, "আমরা হলেম অসতী সব খাব আনবে জল।" কাশী বাবু আমার উপর চটা! কেন জান, আমরা আদালতে গিয়া ভদ্র লোকের সাহায্য করি! বাবু বলেন, আমরা গঙ্গাজলে বব্বলে! তা যদি এই বুদ্ধিজ্ঞান, তবে হাতখরচা বলিয়া কোন্ দশটা টাকাও মাঝে মাঝে আমাকে দেন? কেবল খাওয়া পরা হইলেই কি সব হইল? আমাদের কি আর পাঁচ খরচ নাই? আমাদের প্রাণে কি সখ নাই?"

ভৈরব নাকি সুরে বলিলেন, "আমার অদৃষ্ট কি কম মন্দ! আমিও ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছি, আমার প্রপিতামহ আর কাশীনাথের প্রপিতামহ দুইজনেই শ্রীখণ্ডে বিবাহ করিয়াছিলেন; এক সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ী যাইতেন। এরূপ আত্মীয়তাস্থলেও ভায়া তোমার যে দশা, আমারও সেই দশা। কাশীনাথের কাছে সেই ভাত কাপড়! তোমার কথা মিথ্যা নহে ভায়া; আমরা পরের বাড়ীতে আমোদ করিতে যাই, বাবু—আমাদের সরঞ্জাম নিজের বাড়ীতে আনিয়াছেন। তা নরোত্তমের ফল হইবে না ত কি তোমার আমার হইবে? আমাদের যদি ঐরূপ বুক মাগ থাকিত, তাহা হইলে, আমরাও বাড়ীর দেওয়ান হইতাম!"

কমল স্বকর্ণে এই কথা শুনিয়া, সিংহের মত পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ যদি কাশীনাথ সেই সময়ে সেই খানে উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে, ভৈরব আর ঈশ্বরের সেই দিনই গঙ্গা প্রাপ্তি হইত।

নরাধমেরা কিন্তু এত ধূর্ত্ত যে, আপনাদের সমস্ত উক্তিই কমলের উপর চাপাইয়া, আপনারা নিষ্কলঙ্ক হইতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কমলের স্বভাব কাশীনাথ জানিতেন, ঈশে ভৈরেও তাঁহার বিলক্ষণ পরিচিত ছিল। কাশীনাথ কমলকে শান্ত করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু কমল—বিশালজঙ্ঘ বিশালবক্ষা কমল—বলিলেন, "দাদা তুমি প্রতিজ্ঞা কর, নরাধমদিগের মুখদর্শন করিবে না, তবে আমি ক্ষান্ত হইব। নতুবা দুইটা-নরহত্যা করিয়া আমি নিজেই গিয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিব।" কমলের অনুরোধে কাশীনাথকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল। কিন্তু হতভাগাদের প্রতি-পালনে কাশীনাথ কুণ্ঠিত হইলেন না। সমগ্র জগতের নিন্দায় কাশীনাথ ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। কর্ত্তব্যে হিমালয়ের মত অটল ছিলেন। তিনি, নরোত্তমকে বাড়ীর দেওয়ান করিলেন। তাঁহার একটী বাড়ী করিয়া দিলেন। নরোত্তম সেই বাড়ীতে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহার সেই পুত্র বড় হইল, তাহার বিবাহ হইল। মা জগদম্বার কৃপায় অধিক বয়সে অন্নপূর্ণাও পুত্রমুখ দেখিলেন। কিন্তু কাশীনাথের জীবনী লিখিতে বসি নাই, তাঁহার ঘটনাময় মহৎ জীবনের একটা ঘটনাই পাঠককে দেখাইতে বসিয়াছিলাম। সেই ঘটনাসূত্রেই যাহা শুনিবার পাঠক তাহা শুনিলেন; আমরাও এবারকার মত নিশ্চিন্ত হইলাম। * (সমাপ্ত)

---

* এই গল্পটী সত্যঘটনামূলক।

প্লেগাসুর।

(২)

বাহন, লক্ষণ, মূর্ত্তি ও দমন।

প্লেগের রণভেরী আবার বাজিল। নৈশ-তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকুলের শঙ্খধ্বনি, পতি-পুত্র-হারা রমণীদের আর্ত্তনাদ এবং প্লেগদূত কর্ত্তৃক অর্দ্ধদগ্ধ শয্যার ধূমে কলিকাতা নগরী আবার পরিপূর্ণ। এই সময় পাঠকদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে প্লেগ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে আবার প্রবৃত্ত হইতে হইল। গত বারে

মূষিক বাহনে

প্লেগের গমনাগমন সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর, কলিকাতা প্লেগ বিভাগের শিরোমণি মেজর ডীন্ এই বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইঁদুরের সঙ্গে প্লেগপ্রাদুর্ভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। গবর্ণমেণ্টের মতে ডীন্ একজন প্লেগতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ হইতে পারেন, কিন্তু আমাদিগের নিকট তিনি অদ্যাবধি বিশেষ অভিজ্ঞতার কোন পরিচয় দেন নাই। বরং তাঁহার বিভাগে যে রীতি মত কোন অনুসন্ধান হয় না, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর প্লেগপ্রাদুর্ভাবের সময় বড়বাজারের একজন মাড়োওয়ারীর হাতের আঙ্গুলে ইঁদুর দংশন করে। দংশনের পর তাহার বগলের বীচি ফুলিয়া জ্বর হয় এবং কিছু দিন পর সেই বীচি পাকিয়া উঠে। ডাক্তার কৈলাস চন্দ্র বসু রায় বাহাদুর প্লেগ ডাক্তারদের সম্মুখে সেই বীচি অস্ত্র করেন এবং প্লেগ বিভাগীয় একজন উমেদার ইন্সপেক্টর (Candidate Inspector) সেই ক্ষত স্থানে অঙ্গুলি দিয়া লিণ্ট ঔষধ ও পটি ইত্যাদি দিয়াছিল। ইহার ৪। ৫ দিনের পর সেই ইন্স্পেক্টরের প্লেগে মৃত্যু হয়! মেজর ডীন্ কি তাহার কোন সংবাদ রাখেন না? ডাক্তার সিম্সনের সময় মেডিকেল্ ইন্সপেক্টরেরা যেরূপ অনুসন্ধান করিতেন, সেই রীতি অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করিলে জানা যাইত প্রত্যেক বৎসর প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কত শত ইঁদুর মরিয়া থাকে। যেখানে রীতিমত অনুসন্ধান হয়, সেখানেই দেখা যায় ইঁদুর প্লেগের একটী প্রধান বাহন। ১৮৯৬ সালে ফর্ম্মোসাতে যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, সকলে

ইহাকে ইঁদুর-জনিত রোগ মনে করিত। ১৯০০ সালে সিড্‌নীতে প্লেগ মানবজাতিকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ইঁদুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অসুরেরা কি মায়াবী! এ হেন ভয়ঙ্কর প্লেগাসুর সূক্ষ্ম দেহে ইঁদুরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কেপ্‌-টাউন্‌ হইতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া কি কৌশলে সিড্‌নীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। ১৯০১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এণ্টি-লিয়ান্‌ (*Antillian*) জাহাজ যখন কেপ্‌ টাউন্‌ ছাড়ে, তখন কেহই জানিত না যে ঐ মানব শত্রু তন্মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। তিন সপ্তাহ পর পথে ১৫টী মরা ইঁদুর জাহাজ হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, এবং ২৭এ ফেব্রুয়ারী ইঁদুরস্পৃষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্লেগাক্রান্ত হইয়া ৩রা মার্চ্চে সিড্‌-নীতে প্রাণ ত্যাগ করে। জাহাজের ভাণ্ডারীও যখন আক্রান্ত হইল, ভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ১০টী মৃত ইঁদুর তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সে দিন বাগ-বাজারের একজন বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তারের বাড়ীতে অনেকগুলি ইঁদুর মরিয়াছিল। তাঁহার ভৃত্য প্লেগাক্রান্ত হইয়া আল্‌বার্ট হ্বিক্‌টর হাসপাতালে মারা গেল; তৎপর ঐ ডাক্তার স্বয়ং প্লেগ কবলে পতিত হইয়াছেন। ইঁদুর-দেহ হইতেই যে প্লেগ একেবারে নরদেহে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা নহে। অনেক সময় আরও সূক্ষ্ম হইয়া ক্ষুদ্র ওয়াঙ্কির (flea) ভিতর প্রবেশ করিয়া নরদেহ আক্রমণ করে। প্লেগাক্রান্ত ইঁদুরের দেহে অসংখ্য ওয়াঙ্কি আশ্রয় গ্রহণ করে। ইঁদুরের মৃত্যুর পর ইহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ করে এবং কাহাকেও নিকটে পাইয়া যদি দংশন করে, প্লেগ তৎক্ষণাৎ ঐ অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া নরদেহে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। প্লেগাসুরের

ওয়াঙ্কি বাহনের

কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। ওয়াঙ্কি সহজ ব্যক্তি নহেন। তাঁহার জ্বালায় প্রকাণ্ড হস্তীকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। ঠাকুরমাদের কাছে বাল্যকালে শুনিয়া থাকিবেন, টুনী পক্ষীর পশ্চাদ্দেশে ফোঁড়া হইয়াছিল। বেদনায় অস্থির হইয়া কৌলিক সার্জ্জনের দ্বারে গভীর রাত্রে গিয়া সে হাঁকিল, "নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া, বাড়ী আছ হে?" "এত রাত্রে তুমি কে"। "আমি টুনি পক্ষী, আমার ফোঁড়াটা অস্ত্র ক'রে দিতে পার?" সার্জ্জনোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত নাপিত বলিলেন "দূৎ হ টুনী পক্ষী, এত রাত্রে আমি তোর কথায় কি না বিছানা ছাড়িয়া উঠিব?" তখন টুনী পক্ষী রাজাকে গিয়া বলিল নাপিত কে তাড়াইয়া দিতে। রাজা উপেক্ষা করিলেন। তথা হইতে টুনী পক্ষী ইঁদুরের নিকট গিয়া রাজার ভাণ্ডার কাটিবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু ইঁদুর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। তখন সে মেনার নিকট গিয়া ইঁদুরকুল সংহারের জন্য অনুরোধ করিল, মেনা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিল। নাদনাকে বলিল মেনা মারিতে, নাদনা এই কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন আগুণের নিকট প্রস্তাব হইল নাদনা পোড়াইতে; সে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইল। সমুদ্রকে বলা হইল আগুণ নিভাইতে, সমুদ্র সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। হাতিকে অনুরোধ করা হইল সমুদ্র শোষণ করিতে; হাতি সে কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে টুনী পক্ষী ওয়াঙ্কিকে বলিল, "ভাই ওয়াঙ্কি, হাতিটাকে কামড়াও ত"। ওয়াঙ্কি সক্রোধে হাতিকে কামড়াইল। তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হাতি বলে "সাগর শুষি," সাগর বলে "আগুণ নিভাই," আগুণ বলে "নাদনা পোড়াই," নাদনা বলে "মেনা মারি," মেনা বলে "ইঁদুর মারি," ইঁদুর বলে "রাজার ভাণ্ডার কাটি," রাজা বলে নাপিত তাড়াই"। তখন নাপিত শশব্যস্ত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সার্জ্জিকেল ব্যাগ হইতে নরুণাস্ত্র বাহির করিয়া ফোঁড়া কাটিলেন;

টুনী পক্ষীর পেছনে ফোঁড়া।
রক্ত পরে ঘড়া ঘড়া॥

যে ওয়াঙ্কি ইঁদুর থেকে হাতি পর্য্যন্ত, এবং নাপিত থেকে রাজা পর্য্যন্ত, সমস্ত প্রাণিজগতে একটা মহা বিপ্লব সংঘটন করিতে পারে, তাহার পক্ষে প্লেগাসুরের বাহন হওয়াটা কিছু দুরূহ ব্যাপার নহে। ভরসা করি এখন হঠাৎ মেজর ডীন্‌ কেবল ইঁদুরের প্রতি সমুচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন না, তাহার আশ্রিত ওয়াঙ্কিকেও দূর করিয়া চলিবেন। প্লেগের

সংক্রামক শক্তি

সম্বন্ধেও মেজর ডীন্‌ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যে পালা জ্বরের ন্যায় রোগ তাহা

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। ১৯০০ সালে গ্লাসগো (Glasgow) নগরে যে প্লেগের প্রকোপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণীতে ডাক্তার চামার্স্‌ এম্‌ ডি, পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে প্লেগ সংক্রামক। তবে প্রকার ভেদে সংক্রামকতার তারতম্য। বিউবনিক প্লেগ (বীচি ফোলা) তত সংক্রামক নহে। বীচি যখন পাকিয়া ফাটিয়া যায়, তখনই বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু নিউমোনিয়া বা উদরাময় সংঘটিত প্লেগের বিষ বায়ুতে বা বস্ত্রে লিপ্ত থাকে; সুতরাং ব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। গ্লাস্‌গোতে প্লেগ প্রথমতঃ উদরাময় আকারে প্রবেশ করে। তথাকার হাসপাতালে যখন একব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত বলিয়া ধরা পড়িল, তখন জানা গেল ইহার ২৪ দিন পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী ও নাতনী উদরাময় সংঘটিত প্লেগে আক্রান্ত হইয়া এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। চিরন্তন "ওয়েক্‌" (wake) প্রথা অনুসারে ইহাদের মৃতদেহ কিছুদিন রক্ষা করিয়া সমাহিত করা হয়। এই "ওয়েক"কারী দলের মধ্যে অনেকেই প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদের সংস্পৃষ্ট অনেকের এই রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। এই ওয়েক্‌-প্রথা কবে কি কারণে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সে সব দেশে নানা কারণে মৃতদেহ সমাধির পূর্ব্বে অনেক দিন ঘরে রাখা হয়। পাছে কোন ভূত আসিয়া মৃতদেহ লইয়া যায়, এই ভয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবাসিগণ মৃতদেহের নিকট বসিয়া গান, মদ্যপান ও আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে এই প্রথা আছে। ব্রিটীশ গায়েন হইতে প্রত্যাগত একজন ডাক্তার বলেন, সেখানেও এই প্রথা অনুসারে মৃতদেহ একমাসকাল রাখা হয়। ব্রহ্মদেশেও নাকি "তায়েত্তা" নামক চূর্ণ মাখাইয়া মৃতদেহ অনেকদিন রাখা হয়। কোন ব্রহ্ম-প্রবাসী ইহার অনুসন্ধান করিয়া লিখিলে ভাল হয়। যাহা হউক গ্লাস্‌গো গবর্ণমেণ্ট "ওয়েক্‌" প্রথা রহিত করিয়াছেন।

প্লেগাশ্রিতের লক্ষণ

জানিতে অনেকের ইচ্ছা। অনেকে আবার পূর্ব্ব লক্ষণ গুলি জানিয়া রাখিতে চান; কিন্তু ইহার কিছুই স্থিরতা নাই। প্লেগে প্রথম চেহারাকেই ধরে। সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি মাটির মতন বিবর্ণ হইয়া যায়; যে চক্ষুর ভিতরে বুদ্ধি খেলি-তেছিল তাহা হাবার ন্যায় লক্ষ্য বিহীন হইয়া পড়ে। যাহার বাক্‌চাতুর্য্যে সকলে বিস্মিত হইত, এক কথা দশবার জিজ্ঞাসা

(ক) প্লেগাশ্রিতের মুখশ্রী।

করিলেও তাহার নিকট কোন উত্তর পাওয়া যায় না; তাহার ভাষা এত জড়ান যে সহজে বোধগম্য হয় না। জ্বর সাধারণতঃ খুব বেশী হয়। নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত হয়। রোগী প্রলাপ বকে অথবা গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়। বিউবনিক প্লেগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রধান উপসর্গ বীচি ফোলা। অধিকাংশ স্থলে কুঁচকি ফুলে, যেমন এই ছবিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

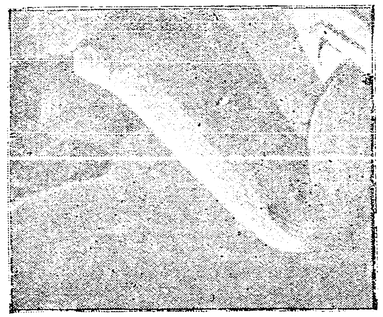

(খ) কুঁচ্‌কিগত প্লেগ।

এই (ক) চিত্রে বগলের বীচিফোলা দেখান হইয়াছে। গলার বীচিও ফুলিয়া থাকে, কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত খুব

অল্প। বীচি প্রথমতঃ অত্যন্ত শক্ত হয়; ইহাতে এত বেদনা হয় যে হাত ছোঁয়ান যায় না। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়ও ইহাতে হাত দিলে রোগী আঁতকিয়া উঠে। কখনও বা জ্বরের পর বীচি ফুলে, কখনও বা বীচি ফোলার পর জ্বর হয়। যাহাদের বীচি পাকিবার সময় পায়, তাহারা প্রায়ই বাঁচিয়া যায়। যাহাদের কুঁচকি ফুলে তাহাদের যে নিউমোনিয়া হইতে পারে না, এরূপ কথা বলা যায় না। আমার একজন রোগী এতদূর ভাল হইয়াছিল যে, একাদশ দিনে আমার নিকটে আসিয়া দেখাইয়া গেল তাহার কুঁচকি পাকিয়াছে। পরদিন কুঁচকি অস্ত্র করিয়াছিলাম, দুইদিন পর তাহার নিউমোনিয়া হইয়া মৃত্যু হয়। উদরাময়ঘটিত প্লেগে বীচিফোলা কখনও থাকে কখনও বা থাকে না। পায়ে কিম্বা অন্যান্য স্থানে কখনও কখনও ফোস্কা, কখনও বা লাল লাল দাগ দেখা যায়। এই লাল দাগ পরে কাল হয়। মৃদু মারীতে (*pestis ambulans*) এই সমস্ত লক্ষণেরই মৃদু প্রকাশ। প্লেগের লক্ষণ বর্ণনা করা কঠিন, কিন্তু যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা দৃষ্টি মাত্র প্লেগ চিনিতে পারেন। প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু প্রায়ই ২৪ ঘণ্টা হইতে ৫ দিনের মধ্যে হইয়া থাকে, কখনও বা ৪৩ দিন পরেও হইতে দেখা গিয়াছে। বাঘ যেমন খাদ্য জন্তুকে ধরিবা মাত্র মারে না, কিন্তু কিছুকাল তাহাকে লইয়া খেলা করে, প্লেগও তেমনি আক্রান্ত ব্যক্তির যাতনা লঘু করিয়া আশার উদ্রেক করে; তৎপরে বিনাসংবাদে একলম্ফে আক্রমণ করিয়া শমন ভবনে লইয়া যায়। রোগীর আত্মীয়েরা কতবার আমাকে বলিয়াছে "বুঝি, আপনার রোগী এ যাত্রায় রক্ষা পাইল" কিন্তু হায়, ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদের সমুদয় উল্লাস বিলাপ ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতায় গত বৎসর হাসপাতাল রোগীদের শতকরা ৭৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মেজর ডীন বলেন গৃহে চিকিৎসিত রোগীদের শতকরা ৬৬ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কথায় বা অনুসন্ধান প্রণালীতে যদি আস্থা থাকিত, তাহা হইলে বলিতাম গৃহচিকিৎসাই ভাল, কিন্তু মোট মৃত্যুসংখ্যা গণনা করিয়া অন্যত্র তিনি বলিয়াছিলেন মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ কি ৯২। গ্লাসগো প্লেগ রোগীদের শতকরা ৫৬ জন বাঁচিয়াছিল। মোটামোটি প্লেগের লক্ষণ ও পরিণাম এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। জন সাধারণের নিকট প্লেগের প্রধান লক্ষণ—একসঙ্গে একস্থানে বহুলোকের মৃত্যু। ব্লাক্‌ডেং আকার ধারণ করিয়া প্লেগ ইউরোপ খণ্ডে আড়াই কোটি প্রাণী সংহার করিয়াছিল। এখন ভারতবর্ষে প্রতি সপ্তাহে পাঁচিশ হাজার লোক প্লেগ কবলিত হইতেছে। প্রতিদিন যাহার উদরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক প্রবেশ করিতেছে, একহস্তে যে ভারতবাসী ও অন্যহস্তে সেই সুদূরস্থিত আফ্রিকাবাসীকে একমুহূর্ত্তে গ্রাস করে, একপদে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে ও অপরপদে ইংলণ্ডের উত্তরদেশে চকিতের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, মনে হয় তাহার দেহ একটা বিশাল হিমালয় এবং তাহার

মূর্ত্তি

একটা বিশ্বব্যাপিনী লোল জিহ্বা। কিন্তু তাহা নহে। সাতবৎসর পূর্ব্বে জাপানী ডাক্তার কিটাসাটো (Kitasato) ও ইয়ার্সিনের (Yersin) নিকট ইহার যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এত সূক্ষ্ম যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখা যায় না। ইহার প্রকৃত আকার ডম্বরুর

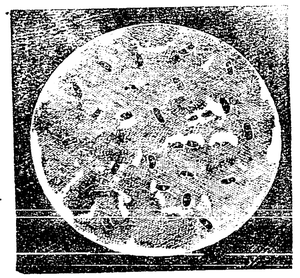

(গ) প্লেগ ব্যাসিলাসপুঞ্জ।

ন্যায়। আকার অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু এই প্রকার লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি রোগীর রক্ত ও ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্র আক্রমণ করে। কিটাসাটো প্লেগাক্রান্ত গৃহের ধূলা জলমিশ্রিত করিয়া ইঁদুরের শরীরে পিচকারী দিয়া প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ২।১ দিনের মধ্যে ইঁদুরগুলির প্লেগ হইল এবং ২।৫ দিনে মৃত্যু হইল। মৃতদেহে ঐ প্রকার অসংখ্য প্লেগ ব্যাসিলাস পাওয়া গিয়াছিল। এইগুলি বিলাতী ইঁদুর, মাছি ও ওয়াঙ্কি দেহেও পাওয়া যায়। ব্যাসিলাস্ বলিতে অনেকে কীটাণু মনে করেন। কিন্তু ব্যাসিলাস্ উদ্ভিদ জাতীয়; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ মাত্র। যাহার মাহাত্ম্য এতক্ষণ বর্ণিত হইল, তাহার

দমন বিধি

আলোচনা করা কর্ত্তব্য। দমন দুই প্রকার, (১) চিকিৎসা ও (২) নিবারণ। চিকিৎসা—বিশেষ কোন ঔষধের আবিষ্কার হয় নাই। লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসক ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং যাহাতে রোগী সবল থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। চিকিৎসায় ফল পায় না বলিয়া নিরুপায় হইয়া কেহ বা শীতলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, কেহবা সংকীর্ত্তনে জনতা স্রোত বৃদ্ধি করিতেছে, আর কেহ বা মনে করিতেছে নৈশতোপধ্বনিমিশ্রিত শঙ্খঘণ্টার বাদ্য শুনিয়া প্লেগ পলায়ন করিবে। যদি কেহ শীতলা গলগণ্ড, ফোড়া, নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও কঠিন কঠিন রোগের দেবতা; যথা,

গলগণ্ড গ্রহারোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাং।
ত্বদনুধ্যান মাত্রেন শীতলে! যান্তি তে ক্ষয়ং॥

কুসংস্কার যে কেবল আমাদের দেশেই আবদ্ধ তাহা নহে। ইউরোপে এই সংস্কার ছিল যে, পাপের শাস্তির জন্য ঈশ্বর প্লেগ প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার ক্রোধের শান্তির একমাত্র উপায় তাঁহার পুত্র, মাতা মেরী, পীর্ আণ্টুনি (St. Anthony), পীর সিবাস্‌টিয়ান্ (St. Sebastian), এবং পীর রখের (St. Roch) কৃপা। পীর এনি, (St. Anne), পীর এড্রিয়ান (St. Adrian), পীর ভেলেণ্টাইন্ (St. Valentine) এবং পীর কুইরিনাসেরও (St. Quirinus) পূজা হইত। গ্রামাঞ্চলে ওলাবিবিকে তাড়াইবার জন্য যেমন ঘরে ঘরে দরজার উপর কিম্বা বাঁশের মাথায় মন্ত্র লিখিয়া কাগজ রাখে, তদ্রূপ সেই সময় সেই সব দেশে প্রত্যেক গৃহে T চিহ্ন অঙ্কিত হইত। কেহ কেহ মনে করেন হিব্রু টা (Tau) হইতে এই T চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছিল। দেব দেবী উপাসক ইহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর পেগম্বর ইজিকিয়েলকে বলেন, তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পতিত হইবে এবং অবশিষ্ট শত্রুর তরবারী দ্বারা নিহত হইবে। কেবল পাপের জন্য যাহারা ক্রন্দন করিবে তাহাদের কপালে একটী টীকা দেওয়া হইবে, সেই টীকাযুক্ত ব্যক্তিরাই উদ্ধার লাভ করিবে। অবশেষে কালী দ্বারা একজন কতিপয় ব্যক্তির কপালে টা (Tau) চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল*; তাহারাই প্লেগ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। গ্রীক ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিবার সময় হিব্রু "টা" "Tau" গ্রীক "T" অক্ষরে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীক "T" অবশেষে ইংরাজী "T" ক্রুশের আকার ধারণ করে। এই T চিহ্ন আণ্টুনি পীর ও সিবাস্‌টিয়ান পীর ধারণ করিতেন; এইজন্য প্লেগ দমনের জন্য তাঁহাদের আরাধনা হইত। বাইবেলে প্লেগ প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে তীরধারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সিবাস্‌টীয়ানেরও চিহ্ন তীর (arrow), এই জন্য† তাঁহাকেও প্লেগ দমনকারী বলিয়া পূজা করা হইত। কিন্তু প্লেগারি পীরদিগের মধ্যে রখই (St. Roch) বাস্তবিক পূজার যোগ্য। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ১৩৪৮ সালে ইতালীতে যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়, তিনি তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব গরিব দুঃখীকে বিতরণ করিয়া ইতালীর প্লেগাক্রান্ত রোগীদের শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং প্লেগাক্রান্ত হন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিস্ (Venice) নগরে যখন প্লেগের ভয় হয়, প্লেগ হইতে নগরকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন ভিনিস্‌বাসী তাঁহার স্মরণ চিহ্নাদি, রখের জন্মস্থান হইতে তথায় চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। রখের প্লেগ দমন শক্তিতে লোকের এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেও কোন আপত্তি ছিল না। সে যাহা হউক, যতদিন না প্লেগের প্রকৃত চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে সকল কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন

নিবারণ প্রণালী

বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। প্লেগ কোন নগর কি গ্রাম আক্রমণ করিলে কি করা কর্ত্তব্য? (১) বীচি ফুলিয়া জ্বর হইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকা উচিত। (২) চিকিৎসকের মতে জ্বর প্লেগ সংসৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখা উচিত এবং শুশ্রূষাকারী ভিন্ন আর কাহারও রোগীর নিকট যাওয়া অনুচিত। (৩) শুশ্রূষাকারিগণ বাহিরে যাইবার বা কিছু খাইবার পূর্ব্বে

* Ezekial, V. 12.

* Ezekiel, IX. 4.

রসকর্পূরের বা কার্ব্বলিকের আরকে হাত ধুইবে। (৪) যাহার শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই, হাসপাতালে পাঠান কর্ত্তব্য। (৫) সম্ভব হইলে হাফ্‌কিনের টীকা দেওয়া ভাল। এই টীকা এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৯৬ সালে এই টীকা যখন প্রবর্ত্তিত হয়, বোম্বাই হইতে অধ্যাপক হাফ্‌কিন আমাকে লিখিয়াছিলেন, "প্লেগের সংস্রবে আসিলে টীকা হীন ব্যক্তি টীকা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা দশগুণ অধিক মরে"; অর্থাৎ কোন বাড়িতে যদি কাহারও প্লেগ হয় এবং সেই বাড়ীতে যদি ১০ জনকে টীকা দেওয়া যায়, আর ১০ জন টীকা নিতে অস্বীকার করে, পূর্ব্বোক্ত ১০ জনের মধ্যে কেবল ১ জন মরিতে পারে, কিন্তু শেষোক্ত ১০ জনের মরিবার সম্ভাবনা। এই টীকার দোষ এই যে, প্রতিবৎসরে প্লেগের সময় নিতে হয়। ইঁদুর ধরিয়া পোড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা উচিত। (৫) রোগীর ঘর খালি হইলে রসকর্পূরের আরক দিয়া ধোয়া উচিত। রসকর্পূরের আরক প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই :—

রসকর্পূর*	... ...	আধ আউন্স্
হাইড্রোক্লোরিক এসিড্†	...	এক "
জল	... ...	১৫ সের বা পাইণ্ট বোতলের ৮ বোতল

প্রত্যেক মিউনিসিপালিটী কি লোকেলবোর্ডের গুটিকতক ইকুইফেক্স্ স্প্রেয়ার (Equifex Sprayer) ও বাগানে জল দিবার পিচকারী রাখা উচিত। ইকুইফেক্স্ স্প্রেয়ারের পাত্রে রসকর্পূর আরক ঢালিয়া দমকল ক্রমাগত টানিলে নলের মুখ দিয়া ঐ আরকের বাষ্প বাহির হইবে। ঘরের দরজা, মেজে, দেয়াল, ছাদ, কাপড় চোপড় প্রভৃতিতে ঐ বাষ্প দিতে হয়, তৎপর বিছানা মাদুর প্রভৃতি পোড়াইয়া ফেলিয়া ঘরের অবশিষ্ট কাপড় গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ফেলা উচিত, কিম্বা রসকর্পূরের আরকে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা উচিত। রোগীর লেপ গদি ছাড়া যদি ঘরে অন্য তুলার কাপড় থাকে এবং তাহা পোড়াইতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত কাপড় একখানা দড়ির কি বেতের চারপায়ার উপর রাখিয়া সমস্ত একখানা পুরু কাপড়ে ঢাকা দিতে হইবে। চারপায়ার নীচে একটী তেপায়ার উপর একটী চীনের পাত্র রাখিয়া তাহাতে কার্বলিক লোশন* ঢালিয়া নীচে একটি কেরোসিনের ল্যাম্পে জ্বালাইতে হইবে। কার্বলিক লোশনের বাষ্পে সমস্ত কাপড় পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। পীতল কাঁসার বাসনগুলি বাহিরে নিয়া কার্বলিক লোশনে ধুইতে হয়। তৎপরে সমস্ত ঘর ও দেয়াল প্রভৃতি পিচকারী দিয়া রসকর্পূরের জলে ধুইতে হইবে। সঙ্গতিপন্ন মিউনিসিপালিটীর লেপ গদির বিষ নষ্ট করিবার জন্য একটা† ষ্টীম ডিস্‌-ইনফেক্টর থাকা উচিত। বসন্ত কি ডিফ্‌থিরিয়ার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন। (৬) জনতার মধ্যে প্রবেশ না করা, বাজারের খাবার প্রভৃতি না খাওয়া, ধোপার বাড়ীর কাপড় কার্বলিক বাষ্পে শোধিত করা, ঘরের বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, পানাহার ও স্নান প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করা, এই সমস্ত সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতে হইবে, এবং যাহাতে সমস্ত দিন রোগ ও মৃত্যুর চিন্তা না আসে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

দুইজন বিখ্যাত প্লেগদলনকারীর নাম উল্লেখ না করিলে প্লেগদলন কাব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই সংগ্রামে

অধ্যাপক হাফ্‌কিন

প্রধান বীর। ইনি নাকি রুশদেশীয় ইহুদী, কিন্তু এখন ফরাশীশ রাজ্যের প্রজা। কলেরার টীকা প্রচলিত করিবার জন্য ইনি ১৮৯৪ সালে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার নিকট আমি রোগবীজতত্ত্ব (Bactriology) অধ্যয়ন করি। তাঁহার শিক্ষাদানে এত উৎসাহ ছিল যে, রাত্রি একটার সময়ও শিক্ষা দিতে কাতর হন নাই। অনেক বৈজ্ঞানিকের একটা প্রধান দোষ—জেদ বা স্বীয় মতের প্রতি অসঙ্গত আস্থা। অধ্যাপক হাফ্‌কিনের সে দোষ আদৌ ছিল না। সত্যের অপলাপ করিয়া তিনি কখনই নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার সময় সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম, যে চৌত্রিশ

* Hydrag Perchloride
† Strong Hydrochloric Acid

* কার্বলিক এসিড্ ... ... ১ আউন্স্
জল ... ... ১ বোতল (পাইণ্ট)
† Steam Disinfection

বর্ষীয় যুবক আবর্জ্জনাকুণ্ডে কি মলভাণ্ডে, নর্দ্দমায় কি ডোবায়, যেখানে সেখানে ভীষণ রোগবীজ সংগ্রহ করিয়া

অধ্যাপক হাফ্‌কিন।

বেড়াইতেছেন, এবং সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আসিয়া দিবা দুপ্রহরে ঘরের সমুদয় শার্সি বন্ধ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ মালায় বেষ্টিত হইয়া যিনি অবিশ্রান্ত প্রাণনাশক রোগবীজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহার যশঃসৌরভ যে অনতিবিলম্বে পৃথিবীময় বিকীর্ণ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। এখন পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে অধ্যাপক হাফ্‌কিনের নাম অজ্ঞাত। মৃত্যুকে ভয় না করিয়া স্বীয় দেহে ইনি কতবার যে প্লেগ-বিষ প্রবেশ করাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। ইংরাজ অন্য দেশের জিনিস ভাল হইলেও ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে বড়ই কুণ্ঠিত। সেই ইংরাজের দেশেও হাফ্‌কিনের টীকা প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "সি, আই, ঈ" উপাধি দিয়াছেন। উপযুক্ত বেতন দিয়া তাঁহাকে টীকা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্লেগ দমন সংগ্রামে দ্বিতীয় বীর

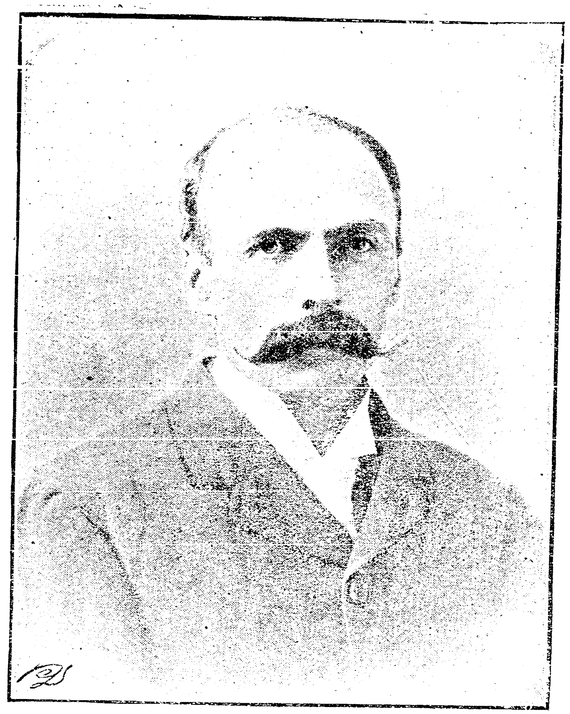

অধ্যাপক ডবলিউ, জে, সিমসন্।

ইনি ১৮৮৬ সালের শেষ ভাগে স্বাস্থ্য-রক্ষক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং ১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি কলিকাতায় প্লেগের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করেন। তাহা লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। একদিকে গবর্ণমেণ্ট, অপর দিকে মিউনিসিপালিটী, ডাক্তার কনিংহাম, দেশবৎসল ও দেশ-দ্রোহী সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ, প্রভৃতি সপ্তরথী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি প্রকৃত বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাধ্য হইয়া অবলীলাক্রমে পদ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। যে কানিংহামের কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার সিমসনকে অপদস্থ করিলেন, তাঁহার প্রতি কাহারও কাহারও অবিচলিত ভক্তি রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলিব না; কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে তিনিও একজন জেদবাজ

লোক। সিমসনিয়ান্ প্লেগের বীজ ত তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, আবার প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট বোম্বে প্লেগের যে বীজ পাঠান হইয়াছিল তাহাও অন্যপ্রকার বীজ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন সেই ডাক্তার সিমসনই প্লেগতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক সিমসন রূপে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা স্থানে স্থানে আহূত হইতেছেন। আফ্রিকায় প্লেগ কমিশনর নিযুক্ত হইয়া তিনি সেখানে অনেকদিন ছিলেন। হংকংএ প্লেগ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় অনেক দিন ছিলেন। এখন তাঁহাকে প্লেগ দমনার্থ তথায় পাঠান হইয়াছে। সেখানে গিয়া তিনি নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এই দেশীয় আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পাঠাইতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি।

কঙ্কণ চোর।

(১০৩ পৃষ্ঠার পর)

(৬)

মুরলা কত দেবতাকে ডাকিল। কত দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা মানিল। তাহার যথা সর্ব্বস্ব গেলেও যদি সে কঙ্কণ দুগাছি ফিরিয়া পায়। সেই কঙ্কণ দুগাছিতেই তাহার অদৃষ্ট, শুভাশুভ, সবই নির্ভর করিতেছে। সেই কঙ্কণের সহিত যেন তাহার রাজরাণীত্ব বিজড়িত। মুরলা ভাবিল, যথা সর্ব্বস্ব যাক, তবু যেন কঙ্কণ ফিরিয়া পাই।

সে কঙ্কণে মুরলার এত আদর কেন, সে কঙ্কণ অভাবে মুরলার এত কষ্ট কেন, একটু খুলিয়া বলিতে হইবে। সে যে অনেক দিনের কথা!

মুরলা তখন কিশোরী। মগধের রাজ-অন্তঃপুরে প্রতি বাসন্তী পূর্ণিমায় একটী উৎসবানুষ্ঠান হইত। সে উৎসব—হোলি।

বসন্তের মলয় সমীরণ—চারিদিকে ফুলের আভরণে প্রকৃতির নূতন সাজ। নূতন তরু, নূতন লতা, নূতন ফুল—আর তাহাতে মলয় বায়ুর ধীর আবেগ বিপ্লুত চুম্বন। চারিদিকে সুবাস, চারিদিকে প্রফুল্লতা। চারিদিকে উৎসব, চারিদিকে আনন্দ।

সেই প্রফুল্লতার মাঝে সোণার রূপার পিচকারী হস্তে লইয়া যত কুমারী, কিশোরী, যুবতী রাজ-অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিত। মগধেই যাঁহাদের একটু বংশ মর্য্যাদা ছিল, তাঁহাদের অন্তঃপুরিকারা সকলেই হোলির দিনে রাজ-অন্তঃপুরে যাইতেন; স্বয়ং মগধেশ্বর ভিন্ন অপর কোন পুরুষ তথায় গমন করিতে পারিতনা।

মগধেশ্বর মহানন্দের এক পাটরাণী ছিলেন, তাহার নাম মহারাণী রজত কুমারী। তখন বেলা অবসান হয় নাই, সূর্য্যের কিরণে তখনও অন্তঃপুরের উদ্যানের প্রস্ফুটিত তরু লতা বিচুম্বিত। তখনও নহবৎ ধ্বনি থামে নাই। তখনও কেলিপরায়ণা রমণীগণের দ্রুতগতিসঞ্জাত মঞ্জীর-নিক্কণ মধুরতাবিহীন হয় নাই।

সমস্ত দিন তরুতলের শীতল ছায়ায় উৎসবানন্দে সকলেই দিন কাটাইয়াছে। প্রখর সূর্য্য-কিরণ অনেক যুবতীর গণ্ড দেশের আরক্ত ভাব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। অনেকেরই গণ্ডে পুষ্পপরাগ ঘর্ম্ম বিগলিত হইয়া কৃত্রিম রাগরঞ্জনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অনেকেই কাঞ্চন-শৃঙ্গমুক্ত সুবাসিত বর্ণোদক ধারায় শ্যামল দূর্ব্বা ক্ষেত্র ও শ্বেত প্রস্তরময় বিশ্রাম কক্ষের বক্ষকে লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়াছিল। দূর্ব্বাদলের হরিত বর্ণ যেন লোপ পাইয়া গিয়াছে—আর সেই অরুণিমাই যেন চিরহরিত নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণকে গ্রাস করিয়াছে।

প্রাঙ্গণের কোথাও বা কোন যুবতীর কবরীসংযুক্ত এবং ধাবনবিচ্যুত ছিন্ন পুষ্প মাল্য, কোথায় বা মৃদুবেগে নিক্ষিপ্ত অবিদীর্ণ কুঙ্কুম, কোথাও বা মহারাণীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত পুষ্প রাশি। কোথাও বা চূর্ণ কুন্তলের সীমান্ত-ব্যাপী কপোলবিশোভী স্বেদ-চিহ্ন।

কোথাও বাঁশী বাজিতেছে। কোথাও বীণা কাঁদিতেছে। কোথাও রবাবের মধুর রবে বাঁশীর ও বীণার সুর আরও সম্মোহন করিয়া তুলিয়াছে। কোথাও বাঁশী থামিয়াছে, কোথাও গানের সুর উঠিয়াছে, কোথাও গান থামিয়াছে, কিন্তু সুরের হিল্লোল তখনও মলয়বায়ুর গায়ে মিশিয়া রহিয়াছে।

মগধেশ্বর সুবর্ণমণ্ডিত রাস মণ্ডপে দাঁড়াইয়া আছেন। বামে রাজরাণী রজত কুমারী। সে মণ্ডপের চারিদিকে লতা পাতা ফুল ও কৃত্রিম প্রস্রবণ। সম্মুখে সোপানাবলীতে দুইধারে রূপ-যৌবনসম্পন্না অন্যান্য রাজ-অন্তঃপুরিকাগণ। তাহার পর সারি গাঁথিয়া যত নিমন্ত্রিত যুবতী ও কিশোরীর দল। সকলের গাত্রই আবিরে লালে লাল। কাহার ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের উপর আবির চিহ্ন, কাহার আরক্তিম গণ্ডস্থলে আবির রেখা, কাহারও উরসোপরি নিক্ষিপ্ত কুঙ্কুমের লোহিত রঙ্গের রেখা। রাজরাণী যেমন মণ্ডপে দাঁড়াইলেন, অমনি কোথা হইতে আবার বীণাবাঁশী বাজিয়া উঠিল। সে বীণা বাঁশীর প্রাণ মাতানো সুরে সকলেই মুগ্ধ।

যুবতীরা সকলে রাজা ও রাণীর অঙ্গে পিচকারী নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে সুন্দর কমনীয় দেহ চারি দিকের সুবাসিত বর্ণোদকধারায় লাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই সুখের সময়ে এক নূতন বিভ্রাট। সহসা রাজরাণী রজত কুমারীর মাথার মুকুট খসিয়া পড়িল! এ দুর্ঘটনায় সকলেই যেন মনঃক্ষুব্ধ হইল। কখনও ত এরূপ ঘটেনা। কতবার হোরির উৎসব হইয়াছে, কিন্তু কখনও ত এমন হয় নাই। মহারাণী বিচলিত হইলেন, সখীগণ বিচলিত হইল, রাজাও বিচলিত হইলেন। সহসা এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী কিশোরী সম্মুখীন হইয়া সেই স্থানভ্রষ্ট স্বর্ণখচিত হীরক শোভিত রাজমুকুট মহারাণীর মাথায় পরাইয়া দিতে গেল।

সে সুন্দরশ্রী রাগরক্তিম গণ্ডের উপর আবির রেখা, কুঞ্চিত কেশকলাপ পৃষ্ঠের উপর মলয় স্পর্শে দুলিতেছে। সেই টানা ভ্রূযুগ, সেই কৃষ্ণতার কটাক্ষ-বিহীন, চাঞ্চল্য বিহীন ইন্দীবর নেত্র, সেই হাসিমাখা মুখ, সেই নীলবাস-বেষ্টিত লজ্জা-সংকুচিত গৌর কান্তি—যেন চঞ্চলা বিজলীকে মেঘে বেষ্টন করিয়াছে। সেই সুন্দর মুখে পূর্ণ চন্দ্রের প্রস্ফুট আভা, আর সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধরে কত সংকুচিত কত সংযমিত, কত মাধুরীময় হাসির রেখা, সেই সুন্দর হাত দুইখানি মহারাণী রজত কুমারীর মাথায় সোনার মুকুট পরাইয়া দিতে গেল বটে, কিন্তু সে মুকুট স্থির রহিল না। দোষ মুকুটের নহে, দোষ রাজার। মহারাজ সেই কিশোরীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। সেই সুন্দরী সেই দৃষ্টিতে যেন কত সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। লজ্জায় তাহার শরীরে বিদ্যুতের স্রোত ছুটিল। হাত কাঁপিয়া উঠিল, মুকুট এবার মাটীতে পড়িয়া চূর্ণীভূত হইল, মহারাণী রজত কুমারী আরও বিষণ্ণা হইলেন। তাঁহার সুন্দর মুখ আরও মলিন হইল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন—তাঁহার কি যেন একটা অমঙ্গল হইবে।

এই দুর্ঘটনায় যে রূপসৌন্দর্য্যশালিনী কিশোরী রাজরাণীর মুকুট পরাইতে গিয়াছিল, সে যেন ব্যথিত চিত্তে বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় যাতনা-কাতর-হৃদয়ে সে স্থান হইতে সরিয়া গেল। উৎসব ভাঙ্গিয়া গেল, রাজরাণী রজতকুমারী বিষণ্ণ মুখে নিজের গৃহে চলিয়া গেলেন। মহারাজও ধীরে ধীরে মণ্ডপ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। আর যাহারা সেই উৎসবে সমবেত হইয়াছিল, তাহারাও চলিয়া গেল।

(৭)

রাজার প্রাণ আজ বড় শূন্য। এ আনন্দের দিনে হৃদয়ে শূন্যতা লইয়া সেই প্রদোষে তিনি একাকী রাজোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই শূন্যতার পাশে যেন কি একটা পূর্ণতার অভাব ছিল। সে এক সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি খানা ঠিক যেন সেই কিশোরীর—যে ব্যাকুলতার সহিত রাজরাণীর মাথার মুকুট পরাইতে গিয়াছিল।

আবির-রাগ-রঞ্জিত শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর মহারাজ চঞ্চল মনে বিবরণ করিতেছেন। মনে যেন কোন সুখই নাই। এ আমোদের দিনে, উৎসবের দিনে, এত সুখের দিনে যেন তাঁহার মনে কত দুঃখ। প্রতি বৎসরের দোল পূর্ণিমায় ত সমস্তদিন সমস্ত রাত ধরিয়া এ উৎসব হয়। রাজা কত আনন্দে দিনরাত কাটাইয়াছেন। কিন্তু আজ এ দৈব প্রেরিত বিঘ্নে তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ভাঙ্গামনের আগে পাশে আর একখানি অতি সুন্দর অপ্সরী মূর্ত্তির উজ্জ্বল ছায়া ঘুরিতেছিল। রাজা অনেক ভাবিয়া বুঝিলেন, এই ছায়া মূর্ত্তিই তাঁহাকে আকুল করিয়াছে।

কি সুন্দর রূপ! কি সুন্দর ভ্রূযুগ, কি চাঞ্চল্যহীন কটাক্ষ! কি রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর, আর তাহাতে কত হাসির রাশি; সেই সুন্দর স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট গ্রীবার উপর সেই কাল কুঞ্চিত কেশরাশির কি সুন্দর শোভা, সেই মৃণাল প্রতিম বাহুর কি সুন্দর হেলনি দোলনী! সেই

আগ্রহ-কাতর-রক্তিম গণ্ডস্থলের কি মাধুরী। রজতকুমারী! ছিঃ! সে কি পাটরাণীর যোগ্যা? না—আজ পাটরাণী মিলিয়াছে। রাজা ভাবিলেন, এই কিশোরীই পাটরাণীর সম্পূর্ণ যোগ্যা।

রাজা উদ্যানের চারিধারে সেই রমণীয় সন্ধ্যায় ফিরিতে লাগিলেন। আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরণদ্বয়কে দ্রুত বেগে চালিত করিল। মুক্তদ্বার প্রমোদাগার, মর্ম্মর বেদী, প্রস্রবণের ধার খুজিয়া খুজিয়া রাজা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, হায় কেন তখনই তাহার সঙ্গ লইলাম না। তাহা হইলে ত এত কষ্ট পাইতাম না!

সহসা রাজা চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সেই উদ্যানের এক কৃত্রিম নির্ঝরিণী তীরে এক সুন্দরী মূর্ত্তি সেই প্রদোষ-ছায়ায় শীতল সমীরে উৎফুল্ল হইয়া জলে ফুল ভাসাইয়া দিতেছে। এই সেই! রাজা ব্যাকুল চিত্তে যাহাকে খুজিতেছিলেন, সেই রত্ন এখানে অনাদরে নিভৃতে বসিয়া রহিয়াছে।

রাজা একেবারে নিকটস্থ হইলেন। পদশব্দে সেই সুন্দরী চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইল। সে মরাল গ্রীবা যেন কত সুন্দর ভঙ্গী দেখাইয়া, সেই কৃষ্ণতার চক্ষু যেন মহারাজের দিকে একবার কত সলজ্জ ভাবে চাহিয়া আবার নির্ঝরিণীর বক্ষে প্লবমান ফুল রাশির দিকে, তাহার চঞ্চল তরঙ্গ লীলার দিকে ফিরিল।

রাজা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে—নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"মায়াবিনী কে তুমি?"

সেই তটিনী-কূলোপরিস্থা কথা কহিল না। রাজা আবার বলিলেন—"কে তুমি আমার প্রাণ লইয়া পলাইতেছ? পরিচয় দাও"

সেই যৌবন-সন্ধিগতা সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। একবার রাজার দিকে সলজ্জভাবে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন—"মহারাজ! দাসী দীনাতিদীনা। মগধেশ্বরের পরিহাসের উপযুক্ত নহে।"

মগধেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—পরিহাস কাহার সুন্দরী? তোমার না আমার? তুমি আমার প্রাণ চুরি করিয়া পলাইতেছ—আমি তোমায় এত খুজিয়া ধরিলাম। শেষ তোমার মুখে এই কথা? তুমিই পরিহাস করিতেছ।"

সে কেন কথা কহিল না। কত লজ্জা যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কত আধো আধো বাধো বাধো সম্ভাষণ যেন তাহাতে বাধিয়া যাইতে লাগিল। কেমন করিয়া অমন অযাচিত প্রেম সম্ভাষণের উত্তর দিতে হয়—তাহা বুঝিতে না পারিয়া যেন সেই লজ্জা-রাগ-রক্তিম অধরে আরো লোহিত রাগ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু এতবড় রাজা—এতবড় মগধেশ্বর—তাঁর কথার উত্তর না দেওয়াটা যেন কত ধৃষ্টতা—সে ধৃষ্টতার সে প্রগল্‌ভতার যেন মার্জ্জনা নাই, ইহা বুঝিয়া যেন সে কিশোরী দিশাহারা হইল।

রাজা সে লজ্জার মধুরত্ব বুঝিলেন। কাজটা অন্যায় করিয়াছেন ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইলেন। সে সংকোচ আবার সেই সলজ্জ অতি উজ্জ্বল, অতি মধুর, অতি কমনীয়, অতি উন্মাদিনী শক্তিবিশিষ্ট রূপমাধুরীর নিকট ভাসিয়া গেল! রাজা প্রেম ও স্নেহ বিপ্লুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি সুন্দরী"

অতি সলজ্জভাবে উত্তর হইল—"আমার নাম মুরলা"

"মুরলা—অতি সুন্দর নাম! আমি রাজগুরু বসুদেব উপাধ্যায়ের মুখে তোমার নাম শুনিয়াছি। আজ তোমায় চক্ষে দেখিলাম। তোমায় আমি রাজ-রাণী করিব।"

মুরলা শিহরিয়া উঠিল। সে সামান্যা দীনা, সংসারের সামান্যস্তরে পরিপুষ্টা। পর্ণ কুটীর তাহার বিশ্রাম কক্ষ। মুক্ত প্রকৃতি তাহারই বিচরণ ক্ষেত্র। একবারে রাজ রাণী! মুরলা ভাবিল, রাজা রহস্য করিতেছেন। এ রূপোন্মাদ! চক্ষের সম্মুখ হইতে অন্তরাল হইলেই এ অনুরাগ, এ আসক্তি, এ প্রেম—এ আকাঙ্ক্ষা শরতের মেঘের ন্যায় চলিয়া যাইবে! তাহার স্বপ্ন পূর্ণ হইবে না, আবার সে পথের কাঙ্গালিনী হইবে।

কিন্তু বিধাতার লিপি অন্যরূপ। বিধাতা মুরলার সহিত রাজার মিলন করিয়া দিলেন। মুরলা পর্ণকুটীর হইতে রাজপুরীতে আসিল। কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে রাজগুরু রাজাকে সাবধান করিয়া দিলেন—"মহারাজ! এ কন্যার ভাগ্য-চক্র গণনায় যাহা পাইয়াছি—তাহাতে ইহার অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ ফল শুভ নহে। ইহার অদৃষ্টের সহিত—আপনারও অদৃষ্ট বিজড়িত। তবে ঐ দৈব বিঘ্নের প্রতিকার আছে। আমি এই নূতন রাজরাণীকে মন্ত্রপূত কঙ্কণ প্রস্তুত করিয়া দিব। এই কঙ্কণ যতদিন ইহার হাতে থাকিবে, ততদিন কোন অনিষ্ট হইবে না। আপনার

কোন অমঙ্গল হইবে না। কিন্তু এ কঙ্কণ কোনরূপে নষ্ট হইলে সমূহ অমঙ্গল। হয়তঃ এ রমণী পতিঘাতিনী হইতে পারে।"

মুরলাও সে কথা শুনিল। মুরলা অতি সাবধানে এই স্বর্ণ-কঙ্কণ রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দৈব তাহার প্রতিকূল। সে যেন দৈবের সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ঘটনাবশে কঙ্কণ মুরলার হস্তচ্যুত হইল। ইহাতেই রাজা ক্ষিপ্তপ্রায়! মুরলার ত কপালই ভাঙ্গিয়াছে। কেন এ দুর্ঘটনায় মুরলা এত কাতর, অতবড় মগধেশ্বর কাতর, তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিলেন।

(৮)

মুরলার শত্রু ছিল অনেক। প্রধানা রাজমহিষী দেখিলেন, হতভাগিনী মুরলা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে। রাজা সকলকে ভুলিয়াছেন। রাজা ভুলিয়াছেন, পাটরাণী ভুলিয়াছেন, রাজ্যের চারিদিকে শত্রু—সে চিন্তা ভুলিয়াছেন। তাহার সহস্র চিন্তার মধ্যে প্রধান চিন্তা মুরলা। দিনরাতই তিনি মুরলার গৃহে থাকেন।

মগধেশ্বরের অনেক মহিষী। সকলেই এখন পাটরাণীর দিকে দাঁড়াইল। কিসে মুরলার সর্ব্বনাশ হয় তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা। রাজার ভয়ে কেহ তাঁহাকে কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না। কিন্তু কঙ্কণ চুরির পর হইতে যখন তাহারা শুনিল, রাজা মুরলার কক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন—মুরলাকে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—আর মুরলা দিনরাত কাঁদিয়া অনাহারে কাটাইতেছে—তখন তাহারা মনে মনে খুব একচোট হাসিয়া লইল।

আর মুরলাও যে সকল কথা না বুঝিত এমন নয়। সে বুঝিত সে বড় অভাগিনী। কেন সে অত রূপজ্যোতি লইয়া রাজার চোখে পড়িয়াছিল? কেন সেই সুন্দর শোভাময়ী দোল পূর্ণিমার উল্লাস-উৎসব-ক্ষেত্রে মরিতে উৎসব দেখিতে গিয়াছিল? কেন সে রাজার প্রেমাহ্বান সাদর বচন প্রত্যাখ্যান করে নাই? কেন সে যাহা ছিল তাহা থাকিতে চেষ্টা করে নাই? কেন সে রাজপুরীতে আসিয়া সকলের মনোকষ্টের কারণ হইল? এ প্রশ্নের উত্তর মুরলা অনেক দিন ধরিয়া দিতে পারে নাই। পাটরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে পাটরাণী মুখভার করিয়া থাকিতেন, মুরলা নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। তাহার মনে তখন যে একটা যাতনা হইত, তাহা রাজার মুখ দেখিলে আবার দূর হইয়া যাইত।

রূপজ্যোতিপূর্ণ সেই রাজদেহে, সেই দীর্ঘ বপুতে যেন কতরূপের উচ্ছ্বাস। উন্নত নাসিকা, সমুন্নত দেহ, কুঞ্চিত কেশকলাপ। কর্ণে বীরবৌলি, মাথায় মণিময় উষ্ণীষ গাত্রে স্বর্ণ মণ্ডিত কারু-কার্য্য-খচিত শোভন পরিচ্ছদ, কোষে মণিময় তরবার। সেই সুন্দর আয়তলোচনে কত প্রেম সম্ভাষণ, সেই স্ফুরিতাধরে কত আদরের হাসি। মুরলা রাজাকে দেখিলে সব ভুলিয়া যাইত। রাজরাণীর অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইত।

মুরলা মনে মনে বলিত, হৃদয়েশ্বর, স্বামিন্, মহারাজ! অতি ক্ষুদ্রতম দাসী আমি! দয়া করিয়া পায়ে রাখিয়াছ, পথের ধুলা কুড়াইয়া রাজরাণী করিয়াছ, তোমার উপযুক্ত কি আমি? বিধাতার নিকট কিছু চাই না, কেবল যেন দিনান্তে একবার তোমায় দেখিতে পাই। চিরদিন যেন ও কোমল স্নেহমাখা সম্বোধনের মধ্যে কখনও না বিরাগ দেখা দেয়! অই হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যেন স্বর্গে চলিয়া যাইতে পারি!—হায়! মুরলার এ কাতর প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই।

দিন কাটিয়া গেল। প্রভাতে যখন উষার আলোকে প্রকৃতির শ্যামলবক্ষ ছাইয়া ছিল, সে ভাব কবে চলিয়া গিয়াছে। তারপর মধ্যাহ্নের দারুণ সূর্য্যতেজে রাজোদ্যানের সেই শ্যামল বিটপীশ্রেণীকে বিদগ্ধ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রদোষের কৃষ্ণ ছায়ায় প্রকৃতির শ্যামলবুক ঢাকিয়া ফেলিল। মুরলা তাহাও দেখিয়াছে। তাহার পক্ষে প্রকৃতি ভাল লাগে নাই, দিবালোক ভাল লাগে নাই, সন্ধ্যা ভাল লাগে নাই, কি যেন একরূপ হইয়া পড়িয়াছিল।

গবাক্ষপথ মুক্ত করিয়া দিয়া মুরলা একবার সেই অন্ধকার প্লাবিতা রাজোদ্যানের বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল। নীলাকাশে তারা জ্বলিতেছে, অন্ধকারের মধ্য দিয়া খদ্যোত তীব্র গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে, মলয় সেই অন্ধকারের মধ্যে ফুলের সুবাস চুরি করিয়া, মুরলা যে গবাক্ষে বসিয়া ছিল তথায় পৌঁছিয়া দিতেছে, মুরলা চিন্তায় বিভোরা। সে

আলন্দ্যে কোন শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠে। ভাবে, বুঝি রাজা আসিতেছেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখে কেহ নয়।

মুরলার কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। কিন্তু সেই রত্নময় দীপপ্রভা আজ তাহার পক্ষে বড়ই তীব্র জ্বালাময়। তাই মুরলা নিজ কক্ষ ত্যাগ করিয়া গবাক্ষে আসিয়া বসিয়াছিল। যদি নৈশ প্রকৃত তাহার জ্বালাময় প্রাণে একটু শান্তি ঢালিতে পারে—হতভাগিনী একাকিনী সেই আশায় বসিয়াছিল। পরিচারিকা কত সাধাসাধি করিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুরলা কোন ক্রমেই আহার গ্রহণে সম্মত হয় নাই।

মুরলা মনে মনে ভাবিতেছিল—"আমি মরি, আমার রাজরাণীর এ মায়ার খেলা ঘুচিয়া যায় যাক্, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। কে আমায় বলিয়া দিবে, কি করিলে তাহাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে পারি! গুরু-বাক্য ত মিথ্যা হয় না। সেই কঙ্কণ যে আমার রাজরাণীত্বের প্রধান শক্তি ছিল। যতদিন সেই স্বর্ণালঙ্কার আমার হস্তে ছিল, আমিত কোন কষ্টই পাই নাই! সব যায় ক্ষতি নাই, কিন্তু কে বলিয়া দিবে—কিসে তাঁহার কোন অমঙ্গল হইবে না?"

এ চিন্তায় বাধা পড়িল। সহসা কে সেই অন্ধকারময় অলিন্দে আসিয়া মুরলার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। মুরলা চমকিয়া উঠিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, এক নাতি দীর্ঘ—নাতি খর্ব্ব—জটাজুট সমন্বিতা—ত্রিশূল হস্তা ভৈরবী মূর্ত্তি।

মুরলা ভয় পাইল। বলিল "কে তুমি?"

সেই ভৈরবী গম্ভীর স্বরে বলিল—"মুরলা ভয় পাইও না।"

মুরলা বলিল—"ভয় পাই নাই। কিন্তু কে তুমি মা? কেমন করিয়া এ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলে?"

ভৈরবী বলিলেন—আমাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

মুরলা সবিস্ময়ে বলিল—"এখানে আপনার কি প্রয়োজন?"

ভৈরবী ত্রিশূলটা বাম হস্তে লইয়া বলিল—"আমার উপর বিশ্বাস করিতে পারিবে কি?"

মুরলা কি ভাবিল। ভাবিয়া বলিল—"অবিশ্বাসের কারণই বা কি? ভৈরবী সন্ন্যাসীরা কখনও ত কাহারও অনিষ্ট করেন না।"

ভৈরবী হাসিয়া বলিল—"সেই বিশ্বাসই ভাল মা! তুমি আমার সঙ্গে এস।"

"কেন"?

"তোমার চোর ধরাইয়া দিব।"

"চোর—কিসের চুরি? আপনি কি আমার অপহৃত কঙ্কণের কথা বলিতেছেন?

"হাঁ—তাই।"

আমি রাজরাণী—কুলকামিনী—গভীর রাত্রে পুরী ত্যাগ করা কি আমার পক্ষে ভাল? আমি দাসীকে দিয়া কোতোয়ালকে আদেশ করিতেছি, সে আপনাকে সিপাহী দিবে। চোর ধরিয়া আনুক্।"

ভৈরবী বলিল—"তাহা হইবে না। তাহা হইলে তাহাকে ধরা যাইবে না। আমি যখন বলিতেছি—তোমার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি—তখন তোমার ভয় কি মা? বিশেষতঃ সে চোর ত পুরুষ নয়।"

"পুরুষ নয়—আ! বাঁচিলাম। কিন্তু সে কি সাহসে রাজপুরীর মধ্যে আসিয়া কঙ্কণ চুরি করিল?"

"তা আমি জানিনা। আমি মহারাজের হিতাকাঙ্ক্ষিণী—এই রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষিনী—যাহাতে রাজা থাকে—রাজ্য থাকেন—আর তুমি থাক—তাহার উপায় করিতে আসিয়াছি। রাজা এখন হৃদয়ে বলহীন, কিন্তু শুনিতে পাইতেছি ম্লেচ্ছ-শত্রুরা শীঘ্রই পুষ্পপুর আক্রমণ করিবে, এ সময়ে রাজাকে বাচান চাই। তুমি আমার সঙ্গে এস, সাহস না হয় এখানে থাকিয়া অশ্রু জলের প্রবাহ বহাও।"

মুরলা যখন শুনিল যে ইহাতে রাজার সমূহ মঙ্গল, তখন আর সে দ্বিরুক্তি করিল না। ভাবিয়া বলিল, আমায় এ রাত্রিতে বাহিরে যাইতে—প্রহরী ছাড়িয়া দিবে কেন?"

"তবে কিসের তুমি রাজরাণী, মুরলা? তোমার হুকুম সেই নফরেরা শুনিবে না? যাক্, সে চিন্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। সব আমি স্থির করিয়া আসিয়াছি।"

সেই গভীর নিশীথে মগধের মহারাণী অন্ধকারময় রাজপথ দিয়া সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে অন্ধকারে মিশাইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

হাস্য রসের রচনা।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্ন এখন এই যে, হাস্য-রস প্রধানতঃ কি পদার্থে, কোন্ খানে, এবং কি রূপে প্রস্তুত হয়?

এক কথায়, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে,—বিপরীতের বিপর্য্যয়ের, বিকৃতের বা বিসদৃশের সরস প্রদর্শন হইতেই হাস্যরস উৎপন্ন হয়। যেখানে যে প্রকৃতির হাস্যই হউক, তাহার অভ্যন্তরে বা অন্তরালে কোনও না কোনও বিষয়গত বৈপরীত্য, বিপর্য্যয়, বিকৃতি বা বিসদৃশি থাকিবেই থাকিবে। ঐ উপাদান ভিন্ন হাস্যরস কদাচিৎ উদ্ভব হইতে পারে। হাস্য স্মরণই হউক—আর শব্দগতই, বাক্যগত, অর্থগত বা ভাবগতই হউক; রূপগত, রসগত, বা রচনাগতই হউক; প্রগাঢ় হাস্যই হউক আর চঞ্চল হাস্যই হউক, কোনও না কোনও রকমের বিকৃতি বা বৈপরীত্য, পর্য্যায়ের ব্যাঘাত বা বিসাদৃশ্যের ব্যতিক্রম তাহার মূলে থাকিয়া তাহাকে সৃষ্ট ও সঞ্চালিত করে। যে অবস্থায় ও যে ব্যবস্থায় হউক, হাস্য-রস বিশ্লেষ করিলে, তাহার এই সারসত্ত্বা, মৌলিক উপাদান বা উৎপত্তি-নিদান বাহির হইয়া পড়ে।

মনুষ্য, স্বভাবতই আত্ম-সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত ও আত্ম-পক্ষ-প্রিয়। ইহা মনুষ্যের প্রকৃতিগত প্রবল প্রবণতা;—মনুষ্য-চিত্তের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী পক্ষপাততা এই যে, মনুষ্য তাহার স্বরূপে ও স্বভাবে বা স্বজাতীয় মনুষ্য সমাজে সচরাচর যাহা দেখে, আবহমান কাল যাহা দেখিয়া, শুনিয়া ও জানিয়া আসিতেছে, পরন্তু তাহাতে করিয়া যে দৃশ্যে, সাদৃশ্যে ও ভাবাদিতে,—যে আচারে ও অনুষ্ঠানে, যে রীতি প্রকৃতি ও যে প্রণালী পদ্ধতিতে, মনুষ্য অভ্যস্থ ও শিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত—তাহারই সে প্রবল পক্ষপাতী, চিরাগত সংস্কার ও নিত্য ব্যবহার বশতঃ তাহাই তাহার নিকট স্বাভাবিক, সঙ্গত, সুসদৃশ ও সুন্দর, তাহাকেই সে উচিত, বিহিত ও উপাদেয়, প্রকৃত ও পরিপাটী জ্ঞান করে, তাহাই সে সকলেরই পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় ও প্রেয়, শোভন ও মনোজ্ঞ অনুভব করে। তাহার বিন্দুমাত্র বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম বা বিপর্য্যয়, বিকৃতি বা বৈসাদৃশ্য দেখিলে মনুষ্য বিস্মিত হয়, বিচলিত ও বিরক্ত হইয়া থাকে। এই বিচলিত ভাব,—বিস্ময় বা বিরক্তি, স্থান কাল, পাত্র, সংস্থান ও অবস্থাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। কখন উহা অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা উৎপাদন করে, কখনও বা রোষ উত্তেজন করে। অনেক সময়ে উহা হাস্য-রস উদ্দীপন করিয়া, পরিহাস, কৌতুক বা ব্যঙ্গ বিদ্রূপাদির বিষয়ীভূত হয়। আত্ম-সাদৃশ্যের ও চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিপরীত দৃশ্য মানুষের স্নায়বীয় শৃঙ্খলায় সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন তাহার চিত্তে এই বৈচিত্র ঘটায় ও বিপ্লব আনয়ন করে।

বলা বাহুল্য যে, দেশ, কাল, অবস্থা, সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা, রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি, আচার ও অনুষ্ঠানাদি ভেদে, সংস্কারের ভিন্নতা হেতু, প্রকৃতের ও পরিপাটীর, শোভনের ও সুন্দরের আদর্শ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রও হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র তাহাদিগকে চিরস্থায়ী সত্য বা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না; প্রায়ই তাহাদের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। অতএব উপরি উক্ত বিকৃতি ও বিপর্য্যয়াদি হেতু যে বিরক্তি, বিস্ময়াদি তাহাও বিরক্ত ও বিস্মিত পক্ষে চিত্তবিকার বটে। তুমি আমাকে বিসদৃশ দেখিয়া, বিকৃত বলিয়া হাসিতেছ, তোমার ঐ হাসি অপর প্রকারেরই বিকার মাত্র।

যাহা হউক, হাস্য রসের মূলে, বৈপরীত্যের ও বৈসাদৃশ্যের সমাবেশ প্রধানতঃ কার্য্য করে এখানে ইহা বলাই আমাদের অভিপ্রায়। 'শঙ' দেখিয়া আমরা হাসি কেন? 'শঙ' আমাদের সাদৃশ্যের বিপরীত,—আমাদের রূপের, স্বরূপের ও হাব ভাবের বিকৃতি "কিম্ভূত কিমাকার"—এই কারণেই শঙ দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। স্বভাবের সোপার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ, শঙের বিসদৃশ ও বিকৃত মূর্ত্তির সন্দর্শন সংঘাতে আমাদের স্নায়ু-সূত্র সকল শিথিল হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে; অতএব আমাদের গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইয়া, হাস্যের উদ্ভব হয়। তা, এদিক দিয়া দেখিলেও, দৃষ্টের বিপর্য্যয় দ্রষ্টাতেও বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, যদিও তাহা অপর প্রকৃতির পর্য্যায়-চ্যুতি। এইরূপে, প্রতিমায়, প্রতিলেখে, গঠিত বা অঙ্কিত মূর্ত্তিতে, চিত্রপটে বা বর্ণনাদির বাক্য চিত্রে, বিসদৃশের বিকৃতের বা বিপরীতের প্রদর্শনই হাস্যের কারণ হয়। বারইয়ারির পুতুল, ও পাঞ্চ পঞ্চানন্দের ছবি দেখিয়া এবং ঐ পাঞ্চ-পাঁচালীর ছড়া গান ও গদ্য পদ্য পড়িয়া যে

লোকে হাসে তাহার হেতুই ঐ,—বিরূপের ও বিসদৃশের গঠন, অঙ্কন ও বর্ণন।

য়ুরোপীয় মতে, কলা বিদ্যা, কবিতা সমেত পাঁচ প্রকারের;—ভাস্কর বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, স্থপতি বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, এবং কবিতা; এই পঞ্চ বিদ্যার প্রত্যেকটীই সূক্ষ্ম কলা বা সুকুমার শিল্প এবং বীর, করুণ, বীভৎস, শৃঙ্গার ও রৌদ্রাদি নব রসোৎপাদক ও নব রসের "আলম্বন বিভাব"। অতএব অপরাপর রসের ন্যায় হাস্য রসও ইহাদের বিষয়ীভূত এবং ইহাদের প্রত্যেকটীতেই স্ফুরিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে। রস কল্পে, হাস্য রস ততটা উন্নত হউক বা না হউক,—কতকটা উন্নত তাহা এখনকার কবি ও আলঙ্কারিকরাই স্থির করিবেন,—কেননা পুরাতন মতের এখন আর বড় "কদর" নাই,—তা সে যাহাই হউক, হাস্য রস ইহাদের প্রত্যেক কলাতেই কল্লোলিত হইয়া আত্মবিকাশ করিতে পারে।

ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কলাধিকারে আকার খোদিত ও গঠিত করা; উহাদের আধার ও উপাদান প্রস্তর ইষ্টকাদি কঠিন জড় পদার্থ; আলেখ্যের অঙ্কন চিত্র শিল্পের অধিকার, উহার উপকরণ বা আধার, বর্ণ; পরন্তু, সঙ্গীত কলার অধিকারাধীন গীতি বাদ্য,—আধার, স্বর,—সুর। সর্ব্বোপরি, কাব্য কলা; ইহার বিস্তৃত অধিকারে জড়, চেতন ও সমগ্র ভাব রাজ্য,—কার্য্যোপদান,—শব্দ বাক্য।

স্থাপত্য নিম্নতম কলা; ভাস্কর্য্য তদুপরি; চিত্র তদুপরি; সঙ্গীত কলা—চিত্র-কলার উপর পর্য্যায়ে। কবিতা-কলা-সর্ব্বোরি,—সর্ব্বোচ্চ সুকুমার বিদ্যা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, এই শিল্প পঞ্চককে, কলা-পর্য্যায়ে সর্ব্ব প্রধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া এবং সম্যক রূপে "কলা" নামের উপযোগী বিবেচনায়, কেবল সর্ব্বাগ্রগণ্য নয়, একমাত্র গণনায় করিয়া, তদানুষঙ্গিক ও তদনুরূপ বা তদতিরিক্ত সূক্ষ্ম ও সুকুমার শিল্প-নিচয়কে, অন্ততঃ তাহাদের কতকগুলিকে, এই প্রধান, পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট কলা পঞ্চের অধীনে বা নিম্নে, নিম্নতর, নিম্নতম পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া, 'কনিষ্ঠ কলা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন নাটকাভিনয়, উহার সম্যক সাতন্ত্র্য হেতু, কাব্য কলার অধীন না হইয়াও, তাহার আনুষঙ্গিক। নৃত্য, সঙ্গীত কলার অধীন। 'উদ্দীপনা' (eloquence) বা শিক্ষা-লব্ধ বক্তৃতা-নৈপুণ্য বা বাক-বিন্যাস, নিজেই একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কলা বিদ্যা বটে। এই সকল সুকুমার বিদ্যাকে, পঞ্চ প্রধান শিল্পেরই প্রায় অনুরূপ, শ্রেষ্ঠ কলা বলিয়া, চিত্ত স্বতঃই গ্রহণ করিতে চায়। কিন্তু, পাশ্চাত্য কলা-শ্রেণীতে ইহারা স্বস্বোপযোগী উপযুক্ত স্থানাধিকার করিতে আদিষ্ট হয় নাই; কতকটা ঔদাসিন্যের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। এতদ্ভিন্ন সূক্ষ্মতর শিল্প-চাতুরী ও নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য সূচক কতক গুলি হস্ত কৌশলের কার্য্যকেও তাহাদের বাহ্য সৌন্দর্য্য হেতু, যেন কতকটা ভয়ে ভয়ে ও সংশয় সঙ্কোচের সহিত 'কনিষ্ঠ কলা' মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, সূত্র ও সূচের সূক্ষ্ম কার্য—বস্ত্রের উপর লতা পাতা ফুল ফল তোলা, 'কল্‌কা' ও নক্সা কাটা ইত্যাদি, কুম্ভকারের ও কাচের কাজ, বস্ত্র বয়ন শিল্প, রত্নকর ও স্বর্ণকারের কার্য্য ইত্যাদি। কিন্তু, প্রত্যাচ্য ও প্রাচ্য উভয় সম্প্রদায়েরই পণ্ডিতগণের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে পক্ষ-পাত-শূন্য হইয়া এবং সম্ভ্রমে তাহা শিরে ও কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া, স্বাধীন চিত্তে ক্ষণেক চিন্তা করিলে, বোধ হয় ইহা বিশিষ্ট রূপেই বোধগম্য হইতে পারে যে, বাহ্য সৌন্দর্য্যপ্রধান ঐ সকল শোভন শিল্পকে, ভাব-গৌরব-শ্রেষ্ঠ ও অন্ত সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট আত্মিক সত্তা-সমন্বিত ও সাত্ত্বিক স্বরূপ সংস্পর্শ প্রবল সুতরাং কলা বিদ্যার পর্য্যায়ে প্রবিষ্ট ও অযথা অত্যুন্নীত না করিয়া, ব্যবহারিক আবশ্যকীয় বা সাংসারিক নিত্য ব্যবহারোপযোগী সূক্ষ্মতর শিল্প (usefull fine arts) শ্রেণীভুক্ত করিলেই, তাহাদিগকে, তাহাদের উচিত প্রাপ্য সবিশেষ সম্ভ্রমকর স্বস্থানে স্থাপিত করা হইতে পারে।

শিল্প কলার পাশ্চাত্য শ্রেণী নির্ব্বাচনে, স্থাপত্য শিল্পকে সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বাগ্রগণ্য পঞ্চ কলার অন্তঃনিবিষ্ট করা হইয়াছে; অথচ অত্যুচ্চ ও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, শিল্প কলা, মানস সৌন্দর্য্যাধার "উদ্দীপনাকে" তাহার মধ্যে স্থান না দিয়া কনিষ্ঠ কলা আখ্যায় বহিঃপ্রাঙ্গনে রাখা হইয়াছে। নৃত্য ও নাটকাভিনয়াদিতেও নেহাৎ নিম্নতমে স্থান হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণের এই শ্রেণী-বন্ধন যে সমীচীন নহে, সঙ্গতও নহে, তাহা তাঁহাদের এখনকারের অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিবাদও করিয়াছেন।

এদিকে, প্রাচ্যভূমের প্রাচীন পণ্ডিতগণ, আধার, সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরিক্তের দিকে দৌড়াইয়া, প্রত্যাচ্যদিগকে

হারাইয়াছেন। তাঁহারা অসঙ্কোচেই কলা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ৬৪টী!!!

সাধারণ কথা নয়! প্রতীচ্যেরা এ পরিচ্ছদে যেমন পশ্চাতে, প্রাচ্যেরা তার তের গুণ অগ্রে; গড়পরতায়, আসলটা হয়ত পোষাইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্যদের মোটে পাঁচটী কলা, প্রাচ্যদের পঁয়ষট্টিটী; কবিতা কলাটী ইহাদের সঙ্গে মিশিলে পঁয়ষট্টিটী হইত; এক আধ গুণ নয়, পুরা তেরগুণ বেশি, প্রতীচ্যের চেয়ে প্রাচ্য কলা।

পাশ্চাত্যদের পাঁচটী মাত্র প্রধান কলার মধ্যে কাব্য কলা আবার একটী; সেইটী লইয়াই পাঁচটী পুরিয়াছে। প্রাচ্যদের কিন্তু, কাব্যবাদেই চতুঃষষ্ঠী কলা। সেই তিন কুড় চারি কলার মধ্যে, নখকাটা চুলছাটা হইতে ভূত নামান বিদ্যা অবধি স্থান পাইয়াছে! তবে সৌভাগ্য এই যে, প্রাচ্যগণ, প্রতীচ্যদের মত কাব্য কবিতাকে শিল্প-শ্রেণীতে ফেলেন নাই। বস্তুতই সেটা যেন বড় "কেমন" বোধ হয় না কি? তাহাতে কাব্য কবিতার যথার্থই কিছু সম্মানের হানি হয়। প্রাচ্যমতে, কাব্য স্বতন্ত্র একটী সুবিস্তৃত শাস্ত্র; এবং কবিশক্তির কার্য্য, শিল্পীর কার্য্য-নৈপুণ্য অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও অধিকতর সম্মানিত; তাহা অনেক স্থলেই উপাস্য।

প্রাচ্যগণ শোভন শিল্পের যে সূক্ষ্ম বিভাগ রাখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা যায় যে, সেই স্মরণাতীত কালেও, তাঁহাদের সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান কত অধিক অগ্রসর হইয়াছিল। পাশ্চাত্যগণ যে পাঁচটীকে 'প্রধান কলা' বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাব্য বাদে অবশিষ্ট চারিটী, প্রাচ্য চতুঃষষ্টী কলার অন্তর্গত; তদ্ভিন্ন "কনিষ্ঠ কলা" বলিয়া তাঁহারা যে কয়টী সূক্ষ্ম শিল্পকে গণ্য করিয়াছেন, তাহা এবং তদতিরিক্ত আরও বহু সংখ্যক শোভন শিল্প আর্য্য চতুষষ্ঠীর অন্তর্গত। উহার মধ্যে "নাট্য" ও নেপথ্য যোগ" বলিয়া দুইটী কলা আছে; তাহাদের অর্থ যথাক্রমে নাটকাভিনয় ও রঙ্গসজ্জা। কিন্তু, "নাটক রচনা" বলিয়া কোনও কলা চতুঃষষ্ঠি কলার ভিতর নাই। উহা কাব্যশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়াই 'নাই' ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। গীত ও বাদ্যের ন্যায় নৃত্যকে একটী স্বতন্ত্র কলা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা সঙ্গত। কিন্তু, আলতা পরান, গহনা গাথা, কাপড় রঙ্গান, কাণ বেঁধান, টেকো ঘোরাণও এক একটী কলা; পরন্তু, ভেল্কী বাজী জুয়াখেলা, পুতুল নাচান, মেড়ার লড়াই, মুরগীর লড়াই ইত্যাদিও এক একটী "কলা"! আবার উহাদেরই পার্শ্বে, যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ, "বৈজয়িন্তী বিদ্যা" ভাষা ও শব্দ বিজ্ঞান, অতি বড় বড় বিদ্যা সকলও চতুঃষষ্ঠির অন্তর্গত এক একটী কলা। পুনশ্চ, 'মালাগ্রহণ বিকল্প', 'পুষ্পাস্তরণ' 'সূচিবরণ কর্ম্ম' ত কলা বটেই। কাযেই দেখুন, এই সকল 'বিসদৃশের' একত্র সমাবেশে, এই কলা ক্ষেত্রেও কিঞ্চিৎ হাস্য-রসের উদ্ভব হইতেছে কিনা। যদিও "শিল্পে কালভেদেপ্যা" ভিন্ন, 'কলার' অপর অর্থ,—"সুষমা পরমা শোভা, শোভা কান্তিদ্যুতিচ্ছবি" তথাচ, শিল্প-কলার এই চতুঃষষ্ঠি বিভাগ দেখিয়া, বেশ বোধ হয় যে, তৎকাল-প্রচলিত ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোনও বিদ্যাতে, বৃত্তি ব্যবসাতে বা কার্য্য কারিগরিতে, কিছুমাত্রও শোভনীয়তা বা নিপুণতা, কিছু মাত্রও নির্ম্মাণ-কৌশল বা সম্পাদনচাতুর্য্য দৃষ্ট হইয়াছিল, প্রাচ্য পণ্ডিত ও শিল্প-সংহিতাকারগণ তাহাকেই "কলা" বলিয়া একই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন।

"হাস্য" কে "রস" বলিয়া কাব্যনির্ণায়ক অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে লওয়া হইয়াছে, নহিলে নিশ্চয়ই "হাস্য কলা" নামে আর একটা অতিরিক্ত কলার 'নাগাল' পাওয়া যাইত। কিন্তু, 'হাস্য কলা' বলিয়া কোনও কলা চতুঃষষ্ঠি কলার মধ্যে না থাকুক, তাহার 'কারণ কলার' অভাব নাই।

যাহা হউক আমরা দেখিতেছি যে, 'প্রাচ্য কলা' ও পাশ্চাত্য "ফাইন আর্ট্‌স্‌" বা শোভা শিল্প, প্রধানতঃ চারিটী বা পাঁচটী ভৌতিক উপাদানে বা পদার্থের অবলম্বনে আত্মবিকাশ করে। আমরা একটু অগ্রে বলিয়াছি উহা চারিটী; কিন্তু 'নৃত্যকে' পাশ্চাত্য প্রধান কলা নিচয়ের অন্তর্গত করিলে, এবং উহাকে 'সংগীত কলা'র অধীন না করিয়া স্বতন্ত্র ধরিলে; পরন্তু নৃত্যের আলম্বন "গতি"কে "আকার" বিশেষ না বলিয়া, আকারাতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিলে, উহা পাঁচটী হয়।—১। আকার। ২। বর্ণ। ৩। গতি। ৪। স্বর,—সুর। ৫। অর্থযুক্ত বাক্য। আমরা এখনি বলিয়াছি এবং একটু ব্যাখ্যা করিবারও চেষ্টা করিয়াছি যে, হাস্য-রস এই পঞ্চভূতেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। পরন্তু, "কলা" ঠাকুরাণীগণ, পার্থিব ও অপার্থিব

জড় ও চেতন যত পদার্থ হইতে রসাকর্ষণ ও যত পদার্থের অনুকরণ করিয়া থাকেন, হাস্য প্রায় তাহাদের সকলকেই আলিঙ্গন করিয়া, আত্ম কার্য্য সম্পাদন ও আত্ম পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

"হাস্য রসের রচনা" লইয়া আমাদের কথা। কলা নিচয়ের সকলেই রচনা-পরায়ণা। কাব্য কবিতা বা বাক্য রচনাই যে কেবল 'রচনা' তাহা নহে; বর্ণ বা চিত্র রচনাও রচনা; নৃত্য অঙ্গ সঞ্চালন ভঙ্গিমার সুন্দর রচনা; সঙ্গীত শব্দ ও সুর গ্রামের গরিষ্ট রচনা; স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সুমহৎ আকারের ইষ্টকপ্রস্তরময় প্রশস্ত রচনা। রচনানিপুণা, রসপরায়ণা কলা নিচয় প্রত্যেক "হাস্যরসের রচনা" করিয়া থাকে। সর্ব্ববিধ রচনাতেই "হাস্যরসের রচনা" হইতে পারে। বিসদৃশ আকারে, বিকৃত আলেখ্যে, বিপরীত বা বিদ্রূপকর গতিতে, পরন্তু, বিপর্য্যস্ত ও বিচিত্র কণ্ঠ-স্বরে হাস্যরস উদ্দীপ্ত হয়। বাক্যের বিসদৃশ বিন্যাস সে ত হয়ই। হাস্যরস আকারে আত্মা বিকাশ করে, বর্ণে করে, গতিতে করে, স্বরেও দন্ত বিকাশ করে। হর বোলার বুলি তোমার হাস্যের উদ্দেশেই বটে। ভাঁড়েও বাক্য বিন্যাসের ন্যায়, আকার ইঙ্গিতের ও অঙ্গ ও কণ্ঠস্বরের বিসদৃশ ব্যবহারে তোমায় হাসায়, হাস্যরসের রচনা করে।

ভাঁড় ভাঁড়ামির ভঙ্গি করিয়া রচে, কবি "কাব্যি" করিয়া হাস্য রস রচেন। কবির কাব্যিই আমাদের অধিকতর আলোচ্য "কাব্যি," কথাটা আমরা নেহাত কৌতুক করিয়া বলিতেছি না। সে কালে বাঙ্গালী সমাজে কথাটা চলিত ছিল। যাহা কৌতুকোদ্দীপক তাহাই "কাব্যি"। কাব্য-পরিবারের কানা-পোকড়া কন্যা বা পুত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাচ সে ঐ পরিবারের খাস বসত বাড়ীর বাহিরে বাহিরেও বেড়ায় বা বেড়াইত। আমরা এখানে তাহাকে কাব্য বাড়ীর বেড়া প্রাচীরের ভিতরেই ধরিলাম।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

৺গঙ্গাধর কবিরাজ।

ইঁহার জন্মস্থান—যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা, কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায় পিতা এবং মাতা অভয়া দেবী। শকাব্দা ১৭২০, বাঙ্গালা সন ১২০৫ সালের আষাঢ় মাসের ২৫শে দিবা ৬ : ৫০ পল সময়ে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, শুক্রবার।

পিতা মাতার অধিক বয়সে গঙ্গাধরের জন্ম হয়, বিশেষতঃ তাঁহার মাতামহী জামাতৃগৃহে সর্ব্বদা থাকিতেন, এজন্য গঙ্গাধর সম্ভবাতিরিক্ত আদরের সামগ্রী হইয়াছিলেন। সমবয়স্ক শিশুর সঙ্গে স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার গঙ্গাধরের ছিল না। ভবানীপ্রসাদের অভিপ্রায় অনুসারে দাস দাসীর নিকট সর্ব্বদা অবস্থিতিও গঙ্গাধরের পক্ষে বর্জ্জনীয় হইয়াছিল। প্রতিবেশীর ভবনে গমনাগমনেও গঙ্গাধরের বিশেষ বাধা ছিল। মাগুরার শীকদারেরা ভবানীপ্রসাদের অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রতিবেশী ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা গুরুমহাশয়ের কিঞ্চিৎ বিদ্যাধন গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাহারা নীলকুঠীর সাহেবের চাকরী লইয়া মানার মানে সর্ব্বাগ্রে কুঠারাঘাত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিত; যাহারা লেখা পড়ায় শ্রম করিতে পারিত না, তাহাদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত মৃদু হইলেও সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীদের সুখশান্তির সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় ছিল না। তবে প্রাচীনের মধ্যে ভগীরথ শীকদার ও নবীন গোলোক শীকদার সজ্জন এবং ভবানী প্রসাদের অনুকূল ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিলে অন্যান্য শীকদারবর্গ কুপিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ভবানীপ্রসাদের বাড়ীর কেহই প্রতিবেশী ভবনে যাতায়াত করিতেন না। কাযেই গঙ্গাধরকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্ত মাতা ও মাতামহীর নিকট থাকিতে হইত। ইহার ফলে ন্যূন বয়স্ক শিশু দেখিলেও গঙ্গাধর ভয়ে বিহ্বল হইতেন। প্রতিবেশীরা ভবানীপ্রসাদের পুত্রকে নির্দ্দোষ মনে করিত। এইরূপে পঞ্চম বর্ষ বয়স হইলে কুলপুরোহিত গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী গঙ্গাধরের বিদ্যারম্ভ করান। পাঠশালায় অন্য শিশু হইতে পাড়নাশঙ্কা ও ভীতি নিবারণের জন্য গুরু মহাশয় গঙ্গাধরকে নিজের আসনে বসাইয়া শিক্ষা দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই গুরুমহাশয়ের প্রীতিপাত্র হইয়া গঙ্গাধর তথাকার বিদ্যা শেষ করেন।

তদনন্তর স্বকীয় পিতৃস্বস্রীয় কবিরাজ নন্দকুমার সেনের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করেন। তিনি নাটোর চলিয়া গেলে শূনকগোত্রজ মানিকা চন্দ্র

৺গঙ্গাধর কবিরাজ।

বিদ্যাসাগরের নিকট ব্যাকরণের শেষাংশ অধ্যয়ন করেন। তাহার পর বারুইখালির রামরত্ন তর্কচূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, বাদশাস্ত্রাদি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। চূড়ামণির টোলে প্রবেশের অনেক দিন পরেই গঙ্গাধর গুরুর আজ্ঞায় অন্যান্য ছাত্রের অধ্যাপনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশী হইতে প্রতিপদ পর্য্যন্ত টোলে অধ্যয়ন হয়না, এই অনধ্যায় কালে মাতা ও মাতামহীর অনুরোধে গঙ্গাধর বাড়ী যাইতেন এবং দ্বিতীয়ার দিন পূর্ব্বাহ্নে টোলে উপস্থিত হইতেন। কিছুদিন অধীত গ্রন্থের আলোচনা ও কবিতা রচনা দ্বারা অনধ্যায়ের দীর্ঘ-সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। টোলে অন্যান্য ছাত্রদিগকে মুগ্ধবোধের টীকা পড়াইবার সময় গঙ্গাধরের অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইত, অথচ তাহারাও ভাল বুঝিতে পারিত না। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে টীকার কঠিন অংশের সরল টিপ্পনী লিখিয়া অনধ্যায়ের সময় বাড়ীতে বসিয়া অতিবাহিত করিতেন। যদিও তাহাতে পরীক্ষার সময় তাঁহার এবং ছাত্রবর্গের বিশেষ সুবিধা হইত, কিন্তু তিনি বুঝিলেন ক্ষুদ্র কাগজে টিপ্পনী লিখিয়া পরিশ্রমের ফল স্থায়ী করা অসম্ভব, সেই সময় হইতে নিয়ম করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে স্নাতা হইতে মুগ্ধবোধের সরলটীকা প্রণয়ণে প্রবৃত্ত হন। প্রাচীন টীকার দুর্ব্বোধ অংশ সরল করা এবং পূর্ব্বপণ্ডিতগণের অনুকরণে মুগ্ধবোধের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা পুস্তক প্রস্তুত করা গঙ্গাধরের অভিপ্রেত হইলেও কারক সমাসের স্থানে স্থানে পূর্ব্ব টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারদের ব্যাখ্যার সেই সকল উক্তি লইয়া আলোচনায় গঙ্গাধরের পক্ষ জয়যুক্ত হইত। চূড়ামণি মহাশয় গঙ্গাধরের এইরূপ শক্তি দর্শনে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিতেন। এমন কৌশলে গঙ্গাধর এই সকল প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন যে, তাঁহার টীকা প্রণয়নের কথা অধ্যাপক মহাশয় পর্য্যন্ত জানিতে পারিতেন না।

কোন সময় অনধ্যায়ের মধ্যে বারুই খালির কোন সম্পন্ন গৃহে বহুদূরের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবার কথা, গঙ্গাধর প্রতি অনধ্যায়ের সময় বাড়ী গিয়া থাকেন, এবার না গেলে তাঁহার মাতা ও মাতামহী ভাবনায় অস্থির হইবেন ভাবিয়া—মাগুরা গমন করিলেন বটে, কিন্তু সহাধ্যায়ীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ব্যাকরণের একটি কূট-প্রশ্ন সভায় উত্থাপন করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন। সহাধ্যায়ী গঙ্গাধরকৃত প্রশ্নের অপূর্ব্বত্ব দর্শনে মর্ম্ম বুঝিয়া গৌরব বৃদ্ধির আশায় পুলকিত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে পণ্ডিত-সভায় ছাত্রবর্গ মধ্যে সেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কিন্তু উহা মীমাংসায় ছাত্রদের সামর্থ্যাভাব বুঝিয়া পণ্ডিতবর্গই উহার বিচারে যখন প্রবৃত্ত হইলেন, তখন চূড়ামণি তাঁহার অন্যতম প্রধান ছাত্রকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ গঙ্গাধর আসিয়াছে নাকি? ছাত্র বলিলেন, 'না'। 'তবে এ প্রশ্ন করিল কে?' বলিয়া চূড়ামণি চিন্তান্বিত হইলে ছাত্র বলিলেন—'গঙ্গাধর বাড়ী যাইবার সময় এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বলিয়া গিয়াছিল।'

চূড়ামণি মহাশয়ের টোলে পাঠ শেষ করিয়া আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবার সময় উপস্থিত হইলে গঙ্গাধর যখন পিতৃসন্নিধানে নাটোর গমন করেন, তখন তাঁহার নিজকৃত স্ত্রীতা, কারক, সমাস ও তদ্ধিতের টীকা লেখা শেষ হইয়াছে। অতঃপর অপরাংশের টীকা লেখা এবং লিখিত অংশে কোন ত্রুটি আছে কিনা পড়িয়া—সংশোধন করা গঙ্গাধরের প্রধান কার্য্য হইয়াছে। পিতার আদেশে বৈদ্য বেলঘরিয়ার দেশবিখ্যাত পণ্ডিত রামকান্ত সেন কবিরাজ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে আয়ুর্ব্বেদ পাঠের জন্য গঙ্গাধর প্রবিষ্ট হন। দুই একটি প্রশ্নোত্তরেই রামকান্ত গঙ্গাধরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। গঙ্গাধরও সানন্দে গুরুসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। রামকান্তের চতুষ্পাঠীতে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের জন্য অল্প দিন মধ্যে গঙ্গাধর অধ্যাপক ও সতীর্থবর্গের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। স্বহস্তে পুঁথি লেখা, পড়া, চিকিৎসা দর্শন, ঔষধাদির পর্য্যবেক্ষণ, প্রস্তুত করণ, ও সতীর্থবর্গের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চায় গঙ্গাধর সমান পরিশ্রম করিতেন। স্নানাহারে গঙ্গাধরের অধিক সময় ব্যয় হইত না। তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে বসিলে আমাদের অধিক সময় লাগিত না, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সের জন্য তাঁহার সময় অধিক লাগিত, সেই সময় তাঁহার গুরুগৃহে আহারাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। সেখানে আহারের স্থান হইলে এক সময়ে সকলকে ডাকিত, রামকান্ত সমস্ত ছাত্র লইয়া আহার করিতে বসিতেন। গঙ্গাধর ২।৪ দিন এইরূপ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গুরুর সহিত আহার করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হইত। এইজন্য অন্য সকলের আহার শেষ হইবার প্রাক্কালে তিনি উপস্থিত হইতেন, সকলের সঙ্গে একসময়ে আহার শেষ করিয়া উঠিতেন। রামকান্ত অতি দ্রুত ভোজনের দোষ গঙ্গাধরকে শুনাইতেন। একদিন গঙ্গাধরের বিষম লাগিয়াছে—তিনি সেই যন্ত্রণায় অস্থির, তাঁহার কবিরাজ মহাশয় তাহার উপর অতি দ্রুত ভোজনের এই একটা ফল বলিয়া বাল-চাঞ্চল্যের প্রতি তীব্র কষাঘাত করিতে লাগিলেন। সেদিন একদিকে লজ্জায়, অন্যদিকে কষ্ট, উভয় ভোগ করিতে করিতে গঙ্গাধর আহার শেষ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিতেন, সেই আমি, কিন্তু এখন সকল অপেক্ষা আহারে অধিক সময় আমারই লাগিতেছে। বয়স হইলে এ বাহাদুরী তোমরাও দেখাইতে পারিবে না।

আর এক দিনের পুঁথি লেখার কথা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যহ দশ পাত পুঁথি লেখার নিয়ম ছিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরের ভিতরে অন্ধকার হইয়াছে, কিন্তু প্রদীপ জ্বালিবার সময় হয় নাই, এই জন্য একখানি ক্ষুদ্র আসন ও আদর্শ-পুস্তকের ২।৩টি পাত, সাদা পাত, দোয়াত, কলম ইত্যাদি উপকরণ লইয়া বাহিরের খোলা বারান্দায় বসিয়া গঙ্গাধর পুঁথি লিখিতেছিলেন। অন্ধকার হইয়া আসিলে ঘরের ভিতর প্রদীপের কাছে যাইবার জন্য সমস্ত উপকরণ সহ উঠিয়াছেন, কিন্তু দোয়াতটি পাইতেছেন না। এজন্য অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে অনুসন্ধান করিতে প্রায় ৪ দণ্ড সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ছাত্র ও চাকরেরা গঙ্গাধরের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। এমন সময় রামকান্ত সন্ধ্যা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যাপার বুঝিলেন—শুবুদ্ধি গঙ্গাধরের দোয়াত যে কেহ আমাদ করিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ হইল না, তিনি নিকটে ডাকিয়া আনিয়া গঙ্গাধরকে বলিলেন, তোমার সমস্ত জিনিষ আমার সম্মুখে এক একটি করিয়া রাখ;—তিনি বগল হইতে ক্রমে আসন, কলম, পাত, পুঁথি আর দোয়াত রাখিলেন, রামকান্ত বলিলেন এখন দেখ—তোমার কি পাওয়া যাইতেছে না। সর্ব্ব প্রথমে দোয়াতটি হাতে তুলিয়া তাহার উপর পুঁথির পাত লইয়াছেন, দোয়াত দেখা যায় না—এই জন্য বাড়ীর সকল লোককে কষ্ট দেওয়া, শেষ কবিরাজ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে!! এইরূপে দোয়াত পাওয়ার জন্য গঙ্গাধর লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন। আরব্ধ কার্য্যে এমনিভাবে মনোনিবেশের স্বভাব গঙ্গাধরের চিরকালই ছিল।

কিছুদিন গুরুগৃহে অতিবাহিত হইলে গুরুর কৃপা এবং স্বকীয় যত্ন—পরিশ্রমে বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও রামকান্তের চতুষ্পাঠীতে গঙ্গাধর প্রধান ছাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীত অনধীত সকল গ্রন্থে অন্যান্য ছাত্রগণ সাহায্য লইতেন।

পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকালিয়া গ্রামের পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী অনেক দিন হইতে রামকান্তের নিকট আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেছিলেন, কিন্তু শ্রম ও যত্নের ত্রুটি না থাকিলেও অধীত গ্রন্থ তাঁহার অনায়ত্তই রহিয়া যাইত, এজন্য গুরুর নিকট সমাদর-লাভ তাঁহার ভাগ্যে দুর্ল্লভ হইয়াছিল; এবং কোন কোন দিন বয়ঃকনিষ্ঠ গঙ্গাধর তাঁহার পরে আসিয়া কেমন কার্য্য করিতেছে তাহা দেখিতে বলিতেন। এজন্য পরমানন্দ অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন। গুরুর নিকট পড়িতে বসিতে তাঁহার সাহস হইত না। গোপনে গঙ্গাধরের নিকট পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে "গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত এস্থানে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে, তুমি যদি ইচ্ছা কর—আমার অধ্যয়ন শেষ হইলে নাটোর গিয়া আমার নিকট পড়িতে পার" গঙ্গাধরের এই কথা শুনিয়া পরমানন্দ নাটোর গিয়া গঙ্গাধরের নিকট অধ্যয়নই সুবিধাজনক বোধ করিলেন।

পাঠ শেষ করিয়া গঙ্গাধর গুরুর অনুমতি লইয়া নাটোরে পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, পরমানন্দ গঙ্গাধরের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরিশ্রমের পর, পাঠ শেষ করিয়া তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। পরমানন্দের পুত্র আনন্দ চক্রবর্ত্তী গঙ্গাধরের নিকট আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াছিলেন। আনন্দের পুত্র রাজসাহীর সর্ব্বপ্রধান বৈদ্য সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও গঙ্গাধরের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। ইনি বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদ মতে অস্ত্র-চিকিৎসা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ক্রমে তিন পুরুষ গঙ্গাধরের ছাত্রত্ব স্বীকার, আর কেহ করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে পিতাপুত্রে দুই পুরুষে গঙ্গাধরের শ্রীচরণ সেবায় আত্ম প্রসাদ লাভাধিকারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। লেখক এবং তাঁহার ২।১টি সহাধ্যায়ী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মুগ্ধবোধের টীকার প্রণয়ন ও সংশোধন আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন কালেই গঙ্গাধর শেষ করিয়াছিলেন। পুত্রের কৃত গ্রন্থ বলিয়া ভবানী প্রসাদ অত্যন্ত যত্নের সহিত উহা রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রধান বৈয়াকরণ পাইলেই গুণ-দোষ পরীক্ষার নিমিত্ত উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একদিন একজন প্রাচীন পণ্ডিত গঙ্গাধর কৃত সেই টীকার কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এই টীকা প্রাচীন বটে, কিন্তু প্রচলন নাই।" ভবানী প্রসাদ সহাস্যবদনে "ইহার প্রণেতা আমার পুত্র গঙ্গাধর" এই কথা বলিলে পণ্ডিত মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাধর যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইবেন তাহা বুঝাইবার জন্য তৎকৃত টীকার অপূর্ব্বত্ব ভবানীপ্রসাদকে দেখাইয়াছিলেন। নাটোরে কিয়দ্দিন অবস্থানের পর গঙ্গাধর কলিকাতা গমন করেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসু গুরু, ছাত্র পড়াইবার সময় একদিন বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় বেচারাম বাবুর বাড়ীতে একখানি চরক আছে শুনিয়াছি। গঙ্গাধরের সে কথা মনে ছিল, কলিকাতা গমনের পর বহু অনুসন্ধানে বেচারাম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ এবং চরকখানি লিখিয়া লইবার অনুমতি পাইয়া ৪।৫ মাসের পরিশ্রমে স্বহস্তে আদ্যান্ত সেই চরকখানি লিখিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অধীত চরকগ্রন্থের মধ্যে মধ্যে ২।৪ পাত ছিল না এবং স্থানে স্থানে জীর্ণ আদর্শ পুস্তকের অক্ষর নষ্ট হইয়াছিল। এই কারণে গঙ্গাধরের স্বহস্ত লিখিত চরকেও ঐ দোষ ছিল। বেলঘরিয়া ও কলিকাতা উভয় স্থানের উভয় আদর্শ দেখিয়া গঙ্গাধর চরক সংহিতার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই বিশুদ্ধ পুঁথির সর্ব্বশেষে এই শ্লোক কয়টি দ্বারা তিনি সময় ও সংগ্রহের কষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন।

শাকে রসারস রসাধ্র রসাপ্রমে হৃদ্ধে
মাসে বৃষে চরতি পূষণিচ দ্বিতীয়ে।
সৌম্যে চ সৌম্য দিবসে হৃদ্যময়া নিশীথে
স্থানং সদষ্টমমিদং বমনাদি সিদ্ধেঃ॥
বহুভি র্বহুভি র্বহুভি র্বহুভি র্যত্নৈরায়াসৈঃ ক্লেশৈঃ স্বৈঃ।
লৌকৈ র্লোকে কলিকাতাখ্যে বেচারামাখ্যস্য সুধাম্নি।
দুর্লভ্যা সংহিতাচেয়ং গৌড় দেশেহতি যত্নতঃ।
দুর্লভ্য লিখিতা স্বাভি র্ন দেয়া যস্যকস্যচিৎ।
দেয়া বিদ্যাবতে চেয়ং যেন বিধ্বস্যতে ন চ।
নচাপহ্নীয়তে নীত্বা লিখিতুং চাদ্রিয়েত চ॥

রসা ১, রস ৬, রসাধ্র ৭, রসা ১, 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই নিয়মে ১৭৬১ শকাব্দা হয়। সন ১২৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ

মাসে বহু যত্ন, আয়াস ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু লোকের সাহায্য লইয়া, বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য চরকসংহিতা, কলিকাতা নগরে বেচারাম-গৃহে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া, অতি যত্নে লিখিয়া লইয়াছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়সে গঙ্গাধর মুর্শিদাবাদ গমন করেন, তাহার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় চরক-প্রাপ্তি অনুমান করিলেও সংশুদ্ধি সম্পাদনের মধ্যে ২০ বর্ষকাল পাওয়া যায়। নূতন স্থানে প্রথম পদার্পণ করিয়াই একজন নবাচিকিৎসক অনন্যমনা হইয়া কেবল মাত্র গ্রন্থ বিশেষের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন আমাদের তাহা বোধ হয় না, কারণ অর্থ ব্যতীত অবস্থিতি অসম্ভব, কর্ম্ম ব্যতীত অর্থলাভ হয় না। স্বকীয় অন্যান্য কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে চরক সংহিতার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিলেও ২০ বৎসর কাল অক্লান্ত-কর্ম্মা গঙ্গাধর এজন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বোধ হয়। এই চরকের তিনি 'জল্প কল্পতরু' নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন। তাহা ৬০,০০০ ষাইট হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ হয়। এই টীকা লিখিতে যে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির সময়োল্লেখের অভাবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইহার মুদ্রাঙ্কনে ১৪।১৫ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর গমনের ৪।৫ মাস পরে চরকের ছাপা শেষ হয়। বহুশাস্ত্রজ্ঞ, অনলস, দীর্ঘায়ুঃসম্পন্ন গঙ্গাধর চরকের জন্য সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চরকের সংশুদ্ধি সম্পাদন ও টীকা প্রণয়ন জন্য গঙ্গাধরকে ক্ষুদ্র, বৃহদয়াতন, আর্ষ, অনার্ষ, বৈদ্যক, অবৈদ্যক বহু গ্রন্থ বিশেষ যত্ন, শ্রম ও অভিনিবেশ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল। বেলঘরিয়ার পুস্তক ও কলিকাতার চরক উভয় গ্রন্থে যেখানে অসামঞ্জস্য, বা পত্রাভাব অথবা লিপি বা পত্র-বৈগুণ্য, সেখানে কোন প্রাচীন সংগ্রহ বা টীকার অথবা কোন আর্ষ-গ্রন্থের মূলে বা টীকায় সে বিষয়ের কিরূপ সমাধান উক্ত হইয়াছে, মতান্তর সমর্থিত বা সমালোচিত হইয়াছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য সুলভ দুর্লভ বহু সংস্কৃত গ্রন্থও গঙ্গাধরকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্রের বহু কথা চরকে উক্ত হইয়াছে, তাহার সংশুদ্ধি রক্ষার জন্য উভয়শাস্ত্রে গঙ্গাধর বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে শাস্ত্রের আলোচনায় বাধ্য না হইলে সাংখ্য, বৈশেষিক, গৌতমাদি দুরধিগম্য আর্ষ দর্শন শাস্ত্রের এবং মূল উপনিষদ্ সমূহের টীকা প্রণয়ন ও পরস্পরের মত বিরোধ রূপ কলঙ্ক-ভঞ্জনে গঙ্গাধর সমর্থ হইতেন কিনা বলা যায় না। পরন্তু এই সকল উপাদেয় গ্রন্থে দৃঢ়জ্ঞান ব্যতীত চরকের টীকা প্রণয়নে অসাধারণত্ব এবং বহু প্রাচীন টীকাকার সংগ্রহকারের অনিবার্য্য দোষ প্রদর্শনে সুবিধা পাইতেন কিনা সন্দেহ।

চরকের বিশুদ্ধি সম্পাদনের মধ্যে গঙ্গাধরকে পারিবারিক বহু ভাবান্তর ভোগ করিতে হইয়াছিল—এই সময় মধ্যে তাঁহার ও অপর দুই সহোদরের বিবাহ হয়, গঙ্গাধরের পুত্র ধরণীধর জন্মগ্রহণ করেন, ক্রমে তিন ভ্রাতারই স্ত্রীবিয়োগ, পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ ভ্রাতা হরচন্দ্রের বিয়োগ প্রভৃতিতে গঙ্গাধর অত্যন্ত মানসিক অসুখ ভোগ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ—

মাধুরী।

তৃতীয় দৃশ্য।

দস্যুদিগের আবাস।

অনন্ত, হারিৎ ও অন্যান্য দস্যুগণ।

হা। এস সকলে মিলে এক এক পাত্র কারণ বারি পান করি—এখানে যেমন অজচ্ছল টাকা, তেমনি খরচেরও অন্ত নাই। যে যত পার মায়ের চরণামৃতে চুমুক মার। (অনন্তের প্রতি) আচ্ছা দাদা, সদ্দার কিসে সন্ন্যাসী সেজে বস্‌ল?

অ। শুধু সন্ন্যাসীর সাজ পরে সন্ন্যাসী সাজা নয়—অন্তরের মধ্যেও তিনি এখন সন্ন্যাসী সেজে বসেছেন।

হা। আর তিনি ঐ বেশেতেই দুর্গে প্রবেশ করবেন বোধ হয়। শোন—

অ। এ ভৈরবের বাঁশী—সে এল বলে'।

(ভৈরব ও কুমারের মাধুরীর সহিত প্রবেশ।)

এস এস সোণার চাঁদ এস—এ চাঁদ পেলে কোথা ভৈরব?

ভৈ। ঘুরতে ঘুরতেই পেলুম—ঠিক্ সেই মন্দিরের পথে—দেখতে পাচ্চনা একে যুবা বয়েস—তাতে চোস্ত গাল, এক গাছিও চুল উঠেনি—আমার বোধ হয় সেই দুঃখে যুবা 'মানসিক' করতে মন্দিরে যাচ্ছিল, যদি একবার দাড়ীটা গজায়!

অ। বেশ, বেশ, এ শিকারটী বড় মন্দ নয়। তুমি কেহে বাপু? কোথা থেকে আস্‌ছিলে—আর যাচ্ছিলেই বা কোথায়?

মা। বড় ভদ্র আপনারা; অনুনয় করি
অনিষ্ট আমার কিছু ঘটে নাক যেন।

ভৈ। তুমি বড় কর্কশ ব্যবহার কচ্চ—একে ত আমরা যুবকের অজানা—তারপর আমাদের মতন ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেল মেশা এ ব্যক্তির ভাগ্যে কখন ঘটেইনি। সেই জন্যে দেখ্‌চ না লোকটা কিছু লজ্জিত;—না, না, তোমার ভয় কি? ইনি কেবল তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কচ্চেন।

মা। নিরীহ বালক আমি সরল প্রকৃতি,
যদিও সঙ্গতিহীন—তবু যাহা কিছু
আছে মোর তোমাদেরি সব—আছে মাত্র
যৎকিঞ্চিৎ অর্থপূর্ণ এই থলি মোর
সাদরে গ্রহণ করি কর চরিতার্থ।

ভৈ। (থলি লইয়া) বাঃ ছেলেটীর কথাবার্ত্তা বেশ। আর ভাল ভাবেই সব কথা বুঝ্‌তে পারে।

অ। বেশ, বেশ, বালক তুমি বোস, কিছু জলযোগ কর—আমাদের খাবার মোটামুটী রকমের কিন্তু তুমি যখন আমাদের অভ্যাগত—আমি বলচি তুমি বসো—তুমি কি আমাদের অবিশ্বাস কর?

মা। নয়, নয়, মন্দ কায করিনিত জ্ঞানে,
কিহেতু থাকিবে ভয় হৃদয়ে আমার!

অ। ভাল তবে বসো—(মাধুরীর উপবেশন) আচ্ছা ভৈরব আমাদের দলকে কি নির্ব্বিঘ্নে যেতে দেখেছ?

ভৈ। যেমন কথা—কায়ও ঠিক তেমনি হচ্চে—দুর্গেতে যাবার পথ—দেখ যুবকের দিকে—(মাধুরীর মনযোগের সহিত কথাশ্রবণ) রাত্রিতে সহজেই পরিষ্কার হবে (মাধুরীকে দেখাইয়া) আবার দেখ!—আমরা এক দণ্ডের মধ্যেই উত্তর দিকের দরজা পার হ'তে পার্‌ব।

অ। তা হলেই বস্—আর বলতে হবে না আমি সব বুঝে নিয়েছি।

ভৈ। আজকের রাতটা ভালয় ভালয় কাটাতে পার্‌লে হয়—সর্দ্দারের কি বুদ্ধি দাদা—এখন দুর্গের ভিতর ঢোকবার যা দেরি।

অ। দেখ, দেখ, বালক এখনো আমাদের কথা একমনে শুনচে—আমি বড় ভাল বুঝচিনি; কি বল হারিৎ?

হা। ওটাকে শেষ কল্লেই হবে।

অ। সেই ঠিক্ বটে।

হা। কুমার একে শেষ কর্‌বে—সেইত আমাদের দলে এবার নতুন জুটেছে।

অ। ঐ বালক আমাদের সব পরামর্শ মন দিয়ে শুনেছে।

হা। তাই আমাদের বিপদে ফেল্‌তে পারে।

কু। না, না, সে ভয় নাই।

হা। হাঁ সে ভয় থাক্‌বে না বটে, ওটাকে মেরে ফেলবার পর।

কু। কেন?

হা। তোমাকে খুন কর্‌তেই হ'বে।

কু। খুন কর্‌ব?

হা। হাঁ, হাঁ, তুমি যাই বল ওকে শেষ কর্‌তেই হবে।

কু। কেন? ওকে কাল অবধি আটক করে রাখ না কেন?

অ। দেখ্‌ছ না ওর প্রত্যেক নিশ্বাসের উপর আমাদের প্রাণ রয়েছে। ওকে মার্‌তেই হ'বে।

কু। আচ্ছা তাই যদি হয়—

হা। তাই-ই।—আমি তোমার কোনও কথা শুন্‌তে চাইনে।

অ। আমরা ঐ বনের মধ্যে চল্লেম—আবার ফিরে আস্‌ব। সেই অবসরে তোমার কায শেষ করা চাই—যেন স্মরণ থাকে।

কু। আচ্ছা—আচ্ছা—

হা। (স্বগতঃ) আমি ত এখানে রইলাম—দেখি কুমার কি করে? দেখ্‌তে পাচ্চি ওর কায নয়—ওকে সাহায্য না কর্‌লে ও পেরে উঠবে বলে বুঝাচ্চে না—আমাকেই দেখ্‌চি শেষ রক্ষে কর্‌তে হবে।

মা। কি ভীষণ মূর্ত্তিসব—কালান্তক যেন,
অস্পষ্ট বচন অহো আরো ভয়ঙ্কর,
অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি যত, প্রতি
কটাক্ষেতে যেন পেতেছে বিকাশ। হেরি

নিস্তব্ধতা উহাদের—শুখাইছে প্রাণ,
ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হ'তেছে হৃদয়।

কু। (স্বগত) আমার মা গুণীন্ বটে—তার ভবিষ্যৎ বাণী সফল হ'ল—আমি ত এখনই খুন কর্‌ব। (প্রকাশ্যে)
বুঝেছ যুবক, কেন সবে চলে গেল
এ নির্জ্জনে রাখিয়া মোদের ?

মা। বাস্তবিক,
কিছুই জানি না—নাহি ত বিপদ কোন ?

কু। তোমারে নাশিব আমি।

মা। কিছুতেই নহে—
সাধিয়ো না হেন কার্য্য সখাহে আমার।
কিবা অপরাধ মম ?

কু। নহ অপরাধী—
বটে তুমি মোর পাশে।

মা। কোন মানবের
কাছে নহি অপরাধী। তুচ্ছ প্রাণীপরে
কভু করিনি অন্যায়। জ্ঞানে কভু কোন
কীট দলিনি চরণে। বিমল প্রকৃতি
মম—শিখেছি দয়ার পাত্র সৃষ্ট জীব
যত। তবে কেন হরিবে জীবন মোর ?
তোমার জীবন সীমা মুহূর্ত্তের তরে
হবে কি বর্দ্ধিত তাহে ?

কু। স্থির হও যুবা।

মা। কি ভীষণ অনুষ্ঠান তব। ভেবে দেখ
আজ যদি ঘটে তব সহজ মরণ,
পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন—হাহাকার
তুলিবে শুনিয়া। শোনে যদি প্রাণ তব
কুরায়েছে দস্যুকরে—ভেঙ্গে যাবে বুক।
কিন্তু যদি শোনে তাঁরা নরঘাতী তুমি
ঘোর অভিশাপ দিবে কুক্ষণে জনম
বলি' তব। ক্ষোভে শেষে উন্মত্ত হইয়া
তাঁরা বিসর্জ্জিবে প্রাণ।

কু। (স্বগত) শিথিল হতেছে
বাহু, তুলিতে অক্ষম—দেখি এই বার।
(প্রকাশ্যে) হয়েছ প্রস্তুত তুমি —

মা। অহো নয়, নয়,
জীবন সুখের বড় মৃত্যু ভয়ঙ্কর;
তাপস পারে না দিতে সুখে প্রাণ তার
সহজে বালক আমি শত আশা বুকে

কু। এখনি নাশিব আমি—

মা। না না পারিবে না
কখনই পারিবে না তুমি, কাঁপিতেছে
সর্ব্বাঙ্গ তোমার—অবশ হয়েছে বাহু।

কু। হায় এই বার—

মা। অমন করিয়া তুমি
ফিরায়োনা শির—ছাগ-শিশু নাশোদ্যত
যারা—হেরিতে পারি না আমি তাহাদেরি
মূর্ত্তি—এখনও কাঁপিছ তুমি—করুণার
শুভ্র অশ্রুকণা অপাঙ্গে তোমার ; ওই
ঝরিল কপোলে—তুমি পারিবেনা কভু।

কু। প্রভুরে দিয়েছি কথা—সাধিব নিধন
তব—হয় হোক শিথিল এ বাহু, অশ্রু-
কণা ঝরুক নয়নে—কি হয়েছে তায়।
এই দেখ— (ছোরা উত্তোলন)

মা। রমণীর প্রতি কর দয়া
আমি যে অবলা।

কু। নারী ?

মা। কি বলিনু হায়,
নূতন বিপদ বুঝি করিনু আহ্বান
এ ঘোর বিপদ পুনঃ। বিদ্যুতের সম
মৃত্যু এস মোর পরে।

কু। পবিত্র গণিয়
মোরে পরিত্রাণে তব।

মা। এ মহৎ কার্য্যে
এই পুণ্য-মহিমায়—পাপ-অন্ধকার
তব পলাইবে দূরে, দয়াময় কৃপা-বলে।

কু। তব পুণ্যে করিয়াছ জয় মোরে।

মা। করিবে কি নিরাপদ আমায় এখন?

কু। যদ্যপি পুরুষ হও তবু করিব না
অনিষ্ট তোমার। হারায়েছি বল আমি
তোমার নিকটে যেন হয়েছি অবলা।

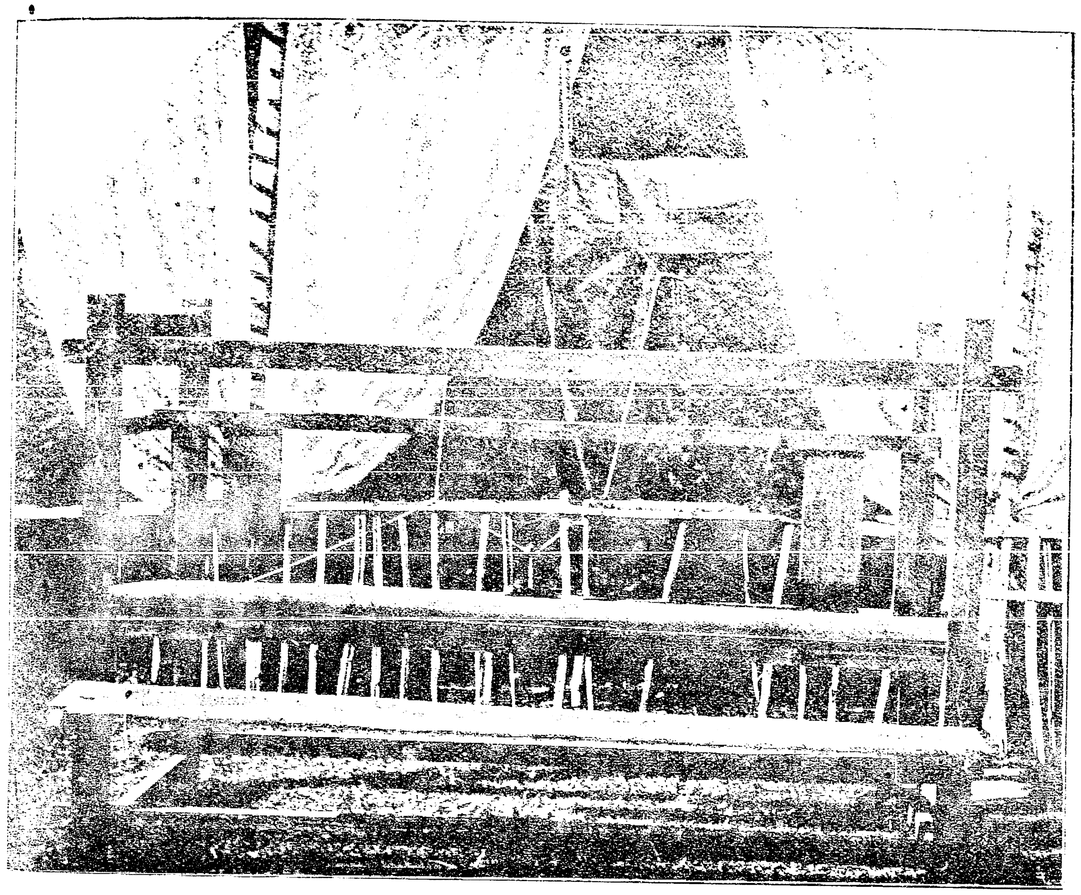

বস্ত্র-বয়ন যন্ত্র।

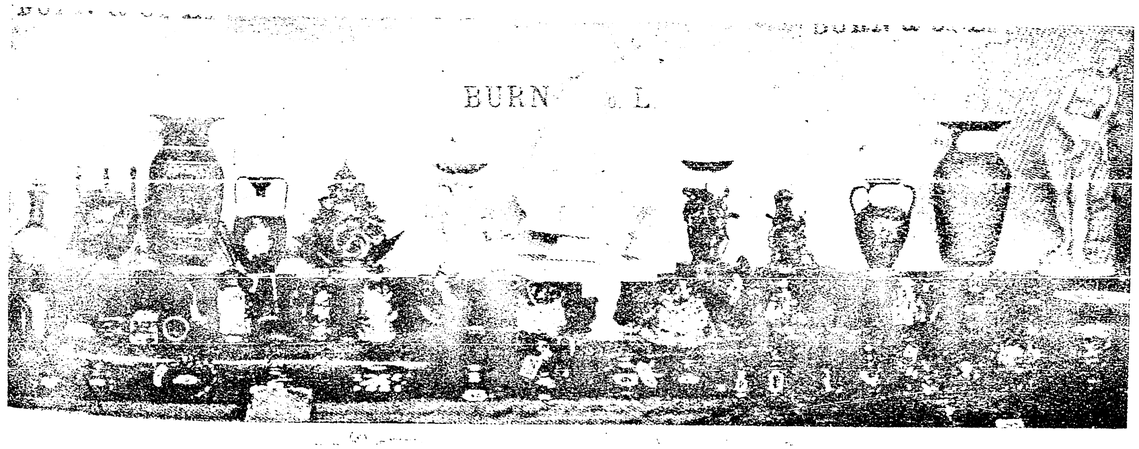

বার্ণ কোম্পানীর মৃণ্ময় পাত্রাদি।

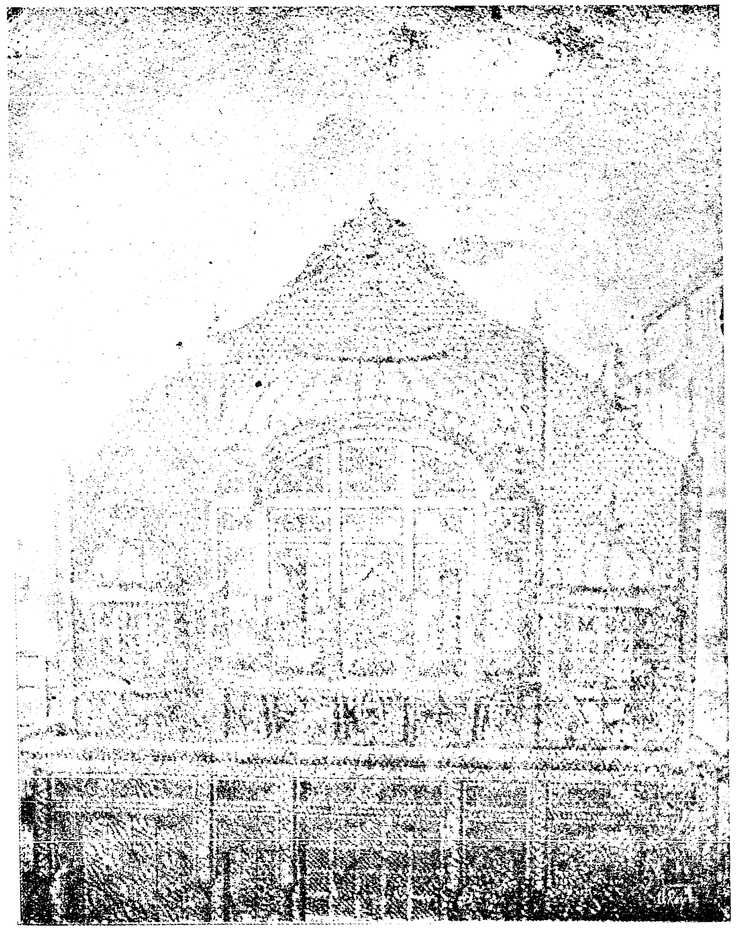

জলন্ধরের গজদন্ত মণ্ডিত দারু শিল্প।

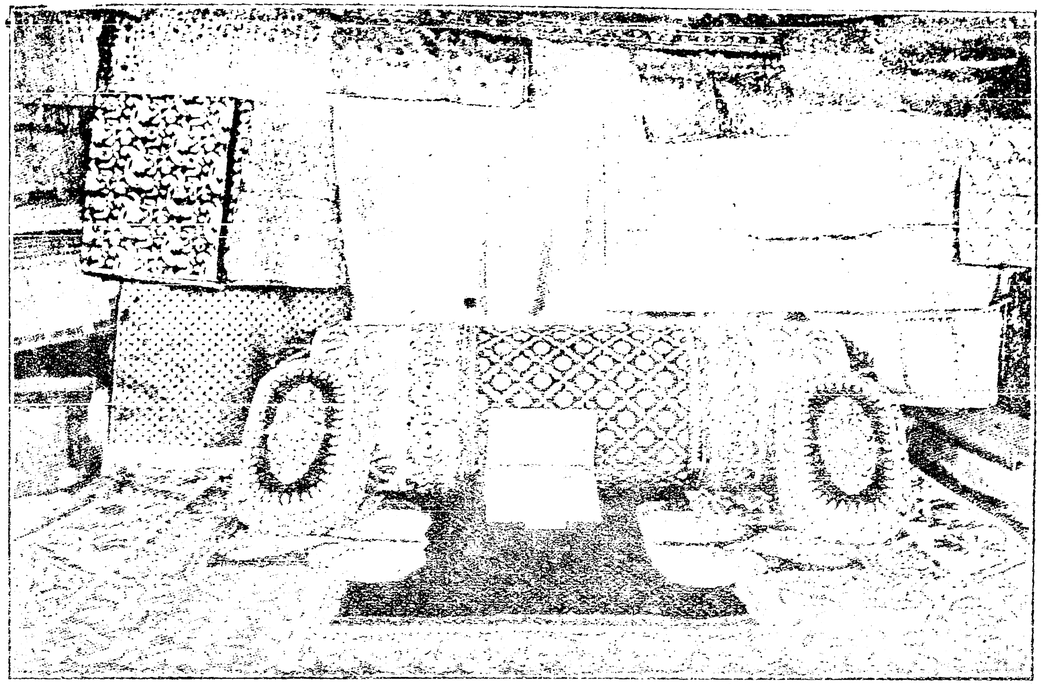

কাশীর মসনদ্।

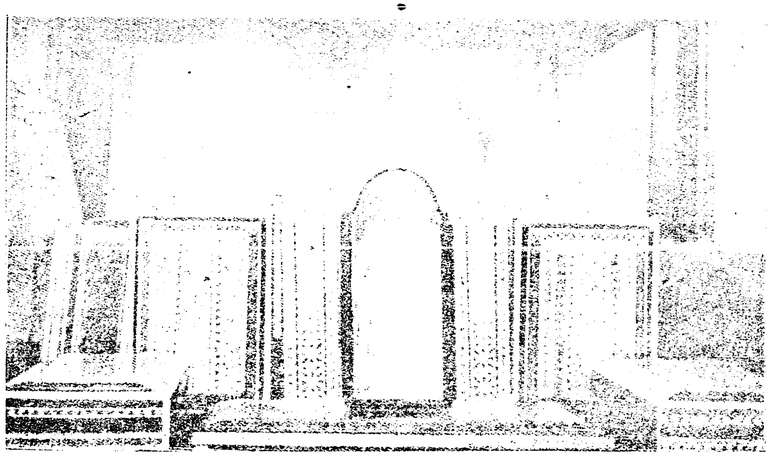

চন্দননির্ম্মিত শিল্প।

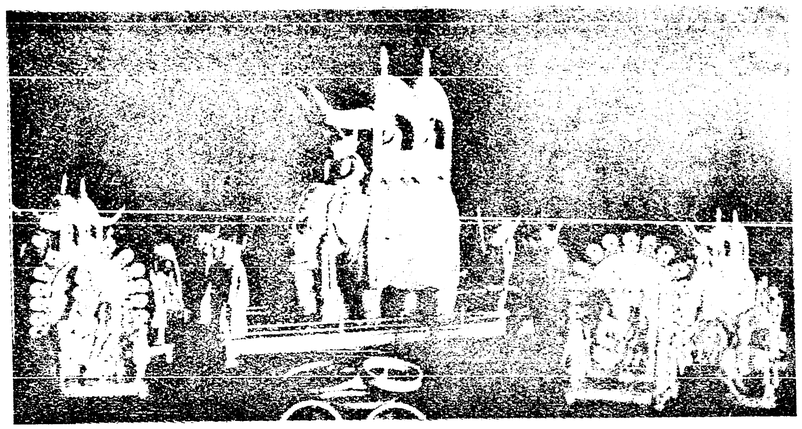

মুর্সিদাবাদের গজদন্ত পুতুল।

রেশমের কার্য্য।

মা। ধর মোর হৃদয়ের শত ধন্যবাদ
আর কিছু নাহিক সম্বল।

কু। মনুষ্যত্ব
লভিনু করুণা বলে তব। বাড়িতেছে
হের নিশা— সঙ্গীগণ ফিরিবে এখনি,
এ ঘাতক পরে তুমি করিবে নির্ভর?

মা। যাইব তোমার সনে যেথা যাবে লয়ে।

কু। এস তবে বিশ্বস্ত এ রক্ষকের সনে।
(হারিতের প্রবেশ।)

হা। পারিবে না যাইতে।

কু। কে তুমি? হারিৎ!

হা। এই কি বিশ্বাসী তুমি?

কু। ক্ষান্ত হও; আমাদের
দিয়োনাক বাধা—এ যে অবলা রমণী

হা। না হয় অপ্সরী হ'ল কি হয়েছে তায়?

কু। যুবতি, সুন্দরী, আহা নিরপরাধিনী
অনুনয়ে ভরা দেখ নয়ন কমল।

হা। আমি জানি কর্ত্তব্য আমার।

কু। তাইকর—
প্রথম কর্ত্তব্য নিরাশ্রয়া অবলার
পরিত্রাণ দান। হয়োনা কঠোর আর—

হা। কাঠোরই জেনেছি মোরে।

কু। হের অবলায়।

হা। বেশ।

কু। অবলার এ যৌবন এ সুষমা
কাতর নয়ন পারিল না টলাতে—?

হা। এক পদ (ও) নহে।

কু। পিশাচ তাহ'লে তুমি।

হা। সেই মূর্ত্তি হেরিবে আমার, একপদ
হলে অগ্রসর।

কু। এখানে অসিই তবে করুক মীমাংসা।

হা। আমিও তাহাই চাই।

কু। রক্তপাত ঘটে যদি—পুরুষের রক্ত-
পাত ঘটুক তাহলে।

হা। তোমার অথবা মোর।

কু। এস তবে। (অন্তরালে গমন)

মা। যথা ধর্ম্ম তথা জয়
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু, ধর্ম্মের কৃপাণ
পরে শক্তি কর দান। উদ্ধত অসির
ঝন্ ঝন্ শব্দ বুঝি থামিল এবার
মৃত্যুসম স্থির ভাবে।
(কুমারের পুনঃ প্রবেশ)

কু। এইবার এস
ভদ্রে;

মা। হইল কি মৃত্যু তার?

কু। হইয়াছে
সৎকার সাধন। নদীগর্ভে মৃত দেহ
লভিয়াছে শান্তি। কলস্বনে মুক্তিগীত
গাহিছে তটিনী। ভেবনা তাহার কথা—
দয়া কিম্বা অনুতাপ হতভাগ্য হৃদে
ছিল না কখন। দারুণ শোণিতপ্রিয়
শোণিতের স্রোতে শেষে বিসর্জ্জিল প্রাণ।
চলে এস মোর সনে—মুহূর্ত্ত সময়
আর কথা কহিবার—নাহিক এখন।

[প্রস্থান]

ক্রমশঃ—

শ্রীরসময় লাহা।

শিল্প-প্রদর্শনী।

কঠিন রোগাক্রান্ত চেতনা-বিলুপ্ত আত্মীয়ের দেহে যখন চৈতন্যের সঞ্চার হয়, দুই একটি করিয়া কথা বলিবার শক্তি হয়, পাশ ফিরিয়া শুইতে সক্ষম হয়, তখন স্বজনবর্গের মনে কতই না আশার উদ্রেক হয়—মনে হয়, বুঝিবা এবার বাঁচিয়া উঠিল, বুঝিবা আবার সবল ও সুস্থ দেহে অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় কর্ম্মক্ষম হইবে—আবার হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া সকলের চিত্ত রঞ্জন করিবে। এই আশার সূত্র ধরিয়া তখন তাহাদের ক্রন্দন হাহাকার থামিয়া যায় এবং "আর আশা নাই" বলিয়া যাহারা হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিল—তাহারা নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া চিকিৎসা ও সেবা

শুশ্রূষায় পুনঃপ্রবৃত্ত হয়। আমাদের মৃতকল্পা ভারত-জননীর দুরবস্থা দর্শনে যাহারা এতদিন——

"দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ॥

* * * * *

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল—
কেমনে হরিল, কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টি-হীন।
তুঙ্গ দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাক আর,
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,
ধর্‌বে কি লোক দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
ছুঁচ সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দীয়াশলাই কাটি তাও আসে পোতে
প্রদীপটা জ্বালিতে খেতে শু'তে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন—কলিকাতার বিগত শিল্প-প্রদর্শনী দেখিয়া তাঁহাদের মনে আবার আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল বিলাপ করিতে করিতে বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছেন, কেবল বিলাপ করিলে কিছু হইবে না, যাদুকর জাতির, তুঙ্গদ্বীপ-প্রত্যাগত পঙ্গপালের বা রাজাকে দোষ দিলে কিছু হইবে না, অথবা "ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ" বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলেও, "তাঁতি কর্ম্মকারের হাহাকার" বা "বাকল টেনা ডোর কপিন্" ঘুচিবে না। পীড়িতা, অবসন্না দীনা, ক্ষীণা জননীকে বাঁচাইতে হইলে উদ্যম, আয়োজন ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। তাই বুঝি এবার কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। এ আয়োজনে জাতীয় ভগ্ন-প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। মনে হইতেছে—চেষ্টা করিলে আমরাও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি—তুঙ্গদ্বীপের দিকে না তাকাইয়াও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি নিজেরা করিয়া লইতে পারি—'তুঙ্গরাজ' আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেও 'দিগম্বরের' সাজ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। রজার্সের ছুরি, কাঁচি না হইলেও যে কাঞ্চনগরের ছুরি কাঁচিতে কাজ চলিতে পারে, চপ্‌সের তালা চাবি না পাইলেও দাস কোম্পানী, নাটাগোরের বা তাদৃশ অপর কোন দেশীয় নির্ম্মাতার তালা চাবিতে ধন সম্পত্তি আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, কৃত্রিম বিলাতী রেশমী বস্ত্রাপেক্ষাও আসাম, মালদহ, রাজসাহী বা মুর্শিদাবাদী রেশমী বস্ত্র মূল্যবান ও স্থায়ী, বেণ্ট্‌উড্ বা তাদৃশ বিলাতী চেয়ার চৌকী না হইলেও যে আমরা কাশী, মালদহ, মুরাদাবাদ, ও ঝাঁশীর বিচিত্র কারুকার্য্যময় মসনদ, গালিচা, সৎরঞ্জে গৃহ সজ্জিত করিতে পারি, বিদেশী কড়ি 'চীনামাটী' বা পর্সলেনের পুতুল না কিনিয়াও যে কৃষ্ণনগর বা লক্ষ্ণৌর পুতুল কিনিয়া শিশুদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে বা গৃহ সাজাইতে পারি—বিলাতী প্লেট ও পেয়ালা না হইলেও যে স্বদেশীয় থালা বাসন ও গ্লাসে নৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি—এতদিন পরে যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত স্বদেশীয়েরা বুঝিতে পারিয়াছেন—ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। এবং শুধু বক্তৃতা বা রিজলিউশন করিয়া, খবরের কাগজে গমর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিয়া, আত্মশক্তিতে অনাস্থাবান্ হইয়া যে কোন প্রকার কার্য্য হয় না—এ কথাও যে দেশের লোক এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছে, ইহাও কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

জ্ঞানবল, ধনবল ও বাহুবল না হইলে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় না। পৃথিবীতে যত জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে সকলেরই মূলে যুগপৎ এই ত্রিশক্তিরই বিকাশ দেখিতে পাই। আমাদের জ্ঞান বল আছে স্বীকার করি—কিন্তু অন্নহীন উদরে, সামর্থ্যহীন দেহে সে জ্ঞান কোন্ কার্য্যে লাগে? উচ্চ অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া রাজাকে বিরক্ত করিবার পূর্ব্বে যদি আমরা আমাদের জ্ঞান, স্বাস্থ্য, ও ধন বৃদ্ধির চেষ্টায় যত্নবান হই, তবে দেশের কল্যাণ অধিকতর রূপে সম্পাদিত হয়। ইহাও দেশের লোক ক্রমে বুঝিতেছেন।

পূর্ব্ব-স্মৃতি যাহাদিগের ভবিষ্য উন্নতির পথে সহায় হয়, তাহারাই তো প্রকৃত পুরুষ—তাহারাই পিতৃপুরুষের গৌরবের অধিকারী। যদি স্বদেশকে প্রকৃত ভালবাস, যদি প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিতে চাও তবে ভারতের অতীত ইতিহাসের কথাও একবার স্মরণ কর। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস স্পষ্ট ভাষায় তোমাকে বলিয়া দিবে যে, এ দেশ কেবলমাত্র জ্ঞানবিজ্ঞানেই যে জগদ্বিখ্যাত ছিল তাহা নহে; জ্ঞান-প্রসূ ভারত চিরকাল রত্ন-প্রসূ এবং একদিন শিল্পনৈপুণ্যে সভ্যজগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। পুরাতন দিন আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু পুরাতনের চক্ষে নূতনকে চিনিয়া লও এবং সর্ব্বপ্রযত্নে স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনে যত্নশীল হও। সে দিন আর ফিরিয়া আসিবে না—যখন ভারতবাসীর গৃহে অন্ন ছিল, চিন্তা করিবার অবসর ছিল এবং প্রতিভা প্রকাশ পাইবার সুযোগ ছিল। আজ প্রতিপালনের জন্য সে কেবল পরমুখাপেক্ষী, মনের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। এদেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিবে কেন, প্রতিভা বিকাশ পাইবার সুযোগ পাইবে কোথা হইতে; স্বাধীন চিন্তা ফুটাইতে হইলে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। অতি আনন্দ ও আশার কথা এই যে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই ক্রমে এই প্রকার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। বঙ্গের পার্শী জাতি বাণিজ্য ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি সামরিক জাতিগণ অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে উৎসুক হইয়াছে। মসিজীবি বঙ্গ সন্তানগণের মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতেছে। সাধু ইচ্ছা, উচ্চ অভিলাষ মনের মধ্যে উপস্থিত হইলে কি হইবে, যদি সেই অভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় বর্ত্তমান না থাকে। আজ যদি হঠাৎ ভারত সন্তানগণ পরের দাসত্ব পরিত্যাগ করেন, কাল তাহারা অনাহারে মরিয়া যাইবেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে পন্থা কি? উপায় কি?—আমাদিগের সমগ্র জাতীয় জীবনের কথা ভাবিতে গেলে এই মনে হয় যে, দেশের যে সকল সম্প্রদায় জীবন সংগ্রামে দাঁড়াইতে না পারিয়া বিনাশোন্মুখ হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জাতীয় জীবনের সমগ্র উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিবে না—যদি আমরা ইহার কোন অঙ্গকে অকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে অবসর প্রদান করি।

পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক সংগঠন ভারতবর্ষ হইতে অনেকাংশ বিভিন্ন। তথায় ব্যবসা জাতিগত নহে, কিন্তু স্বেচ্ছানুগত। সুতরাং সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন কোন ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় না টিকিতে পারে, তখন তাহারা অন্য লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমূহ বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে। ভারতবর্ষে ব্যবসায় বংশানুক্রমিক—ব্যবসায় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন-জনিত সামাজিক শাসন অবশ্যম্ভাবী। ফল এই হইয়াছে যে, প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া শিল্পিগণ ঘোর দারিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছে এবং প্রাচীন শিল্প ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইতেছে। স্বদেশীয় রাজগণের নিকট শিল্পিগণ যে উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে সে পথ তো অনেক দিন রুদ্ধ হইয়াছে। এখন নবাগত বিদেশীয় রাজার অবাধ বাণিজ্য প্রথানিবন্ধন দেশীয় শিল্পী নানা কারণে স্বস্থানচ্যুত হইতেছে—শিল্পকারগণ অকর্ম্মণ্য হইয়া দেশের দরিদ্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং ভারতবর্ষের পরমুখাপেক্ষিতার শৃঙ্খল দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। কিন্তু ভারতের এ দুর্দ্দিন আর অনেক দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। স্বদেশভক্ত অর্থশালী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত জনগণ স্বদেশীয়গণের উৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতার বিগত জাতীয় মহাসমিতির সময়ে অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনী পরিষ্কারভাবে এই নব ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

জাতীয় মহাসমিতির উদ্যোক্তাগণ এই শিল্প সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া ভারতবাসী প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই জানিতেন না। তাঁহারা স্বদেশীয় শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার এক সুযোগ পাইয়াছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা বিদেশীয় তৈজস পত্র দ্বারা আপন গৃহ সজ্জিত করিতেছিলেন, তাহারা স্বদেশজাত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্য কৃতসংকল্প

হইয়াছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক বিলাত-প্রত্যাগত কৃতবিদ্য যুবক ভারতজাত দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিয়াছেন এবং গৃহ সজ্জিত করিবার জন্য অনেক জিনিস ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। অনেক বিদেশীয় ভদ্রলোক প্রদর্শনীয় শিল্পদ্রব্যের প্রশংসা করিয়াছেন এবং কোন কোন জিনিস ক্রয় করিবার জন্য সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। (২য়তঃ) প্রদর্শনীর সহিত কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাতে যে সকল কংগ্রেসদ্বেষী মহাপুরুষ কংগ্রেসকে এ দেশীয় বক্তৃবর্গের বাক্‌চাতুর্য্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র বলিয়া উপহাস করিতেন, তাহারাও এই প্রদর্শনীর কথা বলিতে বা লিখিতে গিয়া ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন এবং উদ্যোগীদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রদর্শনীর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কর্ম্মকর্ত্তাগণ দোলায়মান চিত্তে এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা আশার অতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর কর্ম্মচারিগণ প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক প্রদর্শনীকে একটী আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেকে মহাসমিতির অধিবেশন উপেক্ষা করিয়াও প্রদর্শনীর উন্নতি কল্পে দিবস রজনী কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করিয়াছেন। ইহা স্বদেশের উন্নতির একটী বিশেষ শুভ লক্ষণ।

শিল্প-সমিতির পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর ন্যায় একজন প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক, কষ্ট-সহিষ্ণু, কার্য্যদক্ষ ও ধীর-প্রকৃতির লোককে আপনাদের সম্পাদক-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ প্রদর্শনীর সাফল্য তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও কার্য্য-তৎপরতার উপর নির্ভর করিয়াছিল। তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিচিত্র রুচি ও স্বভাব-সম্পন্ন লোকের সহিত সমস্ত দিবা রজনী নানা বিষয়ে কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও আমরা কখনও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন দর্শন করি নাই। স্বদেশ-জাত শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে গেলে যেমন এক দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও যত্নের প্রয়োজন, সেইরূপ অর্থশালী ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্যক। সুখের বিষয় এই যে শিল্প সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ সমিতিতে সকল শ্রেণীরই প্রধান প্রধান লোক বর্ত্তমান ছিলেন। বাহিরে, ধনী সম্প্রদায়ের অগ্রণী কুচবিহারের মহারাজা শিল্পসমিতির পৃষ্ঠ-পোষকরূপে, মহারাজা সূর্য্যকান্ত, নাটোরের মহারাজা, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ম্মাধ্যক্ষ সভার সদস্য ও কর্ম্মচারী রূপে সমিতির নানা প্রকার সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দেশীয় ও বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের অনেকেই এই সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক ও কর্ম্মচারী রূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। জাতীয় মহাসমিতির ঠিক্ ৬ সপ্তাহ পূর্ব্বে শিল্পসমিতির অনুষ্ঠান বিষয় স্থিরীকৃত হয়; কিন্তু আশ্বাসের বিষয় এই যে, এই অল্প কালের মধ্যেই দেশ দেশান্তর হইতে নানা প্রকারের শিল্পজাত দ্রব্যাদি আসিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছিল। প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য অনেক দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল, সাময়িক পত্রিকাদিতে তাহার তালিকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমরা তন্মধ্যগত কেবল কয়েকটির চিত্র প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। শিল্প-প্রদর্শনী আমাদের নিরাশ হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার করিয়াছে, প্রার্থনা করি সে আশা অচিরে ফলবতী হইবে। দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

চির-সঙ্গিনী।

লোকালয়ে, সমাজের চির-কোলাহলে,
রাত্রিদিন শান্তিহীন জীবন-সংগ্রামে,
নহে মোর বাস-স্থল! বিজনে, আরামে,
ফুটায়ে তুলিতে ধীরে মানস-কমলে,
স্বভাবের শোভামাঝে নিকুঞ্জ-কুটীরে
মগ্ন হ'য়ে ঘন সুখে শান্তি-অমিয়ায়,
অনন্ত সুন্দর, শান্ত বিভু-মহিমায়
করিবারে আরাধন;—ভবসিন্ধু-তীরে
সেই মোর চির গেহ!—প্রবাস, সংসার!
যাপিনু অশেষ ক্লেশে এ বিদেশে হায়
জীবনের অর্দ্ধযাম;—লহ করুণায়
ফিরায়ে আমায় সখি! স্বদেশে আবার।
প্রবাসের সাথী যারা, গিয়াছে ছাড়িয়া;—
কবিতা, সঙ্গিনি! মোরে ধর আলিঙ্গিয়া!

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সম্রাটের অভিষেক উৎসবে স্বয়ং ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কলিকাতার প্রতিনিধি

মহারাজকুমার শ্রীযুত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর।

PRINTED AT THE MOHILA PRESS, [illegible], BARANAGORE

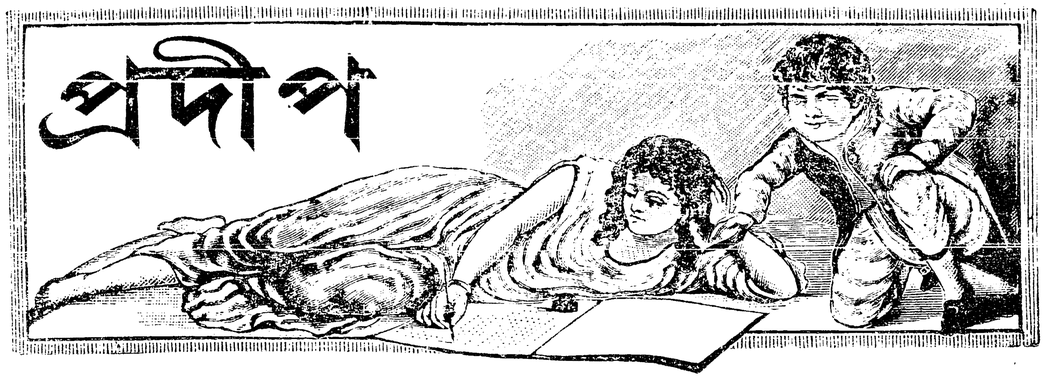

৭ম ভাগ। | আষাঢ় ১৩০৯। | ৭ম সংখ্যা।

মরণ-চিন্তা।*

না ফুরাতে জীবনের সকল সাধনা
কাল যদি জাগে পার্শ্বে সুপ্তি পরিহরি
প্রাণের তৃষিত ক্ষুণ্ণ বাসনা কামনা
অকাল মুকুল সম যায় মৌনে ঝরি!
আধ-গীত স্বপ্ন ভরা জীবন সঙ্গীত
যদি ছিন্ন-তন্ত্রী মাঝে গুমরি মিলায়
আচম্বিতে নেহারিয়া কালের ইঙ্গিত
প্রাণ-পাখী উড়ে যায় ছাড়িয়া কুলায়!
—হোক্ তবে,—নিবে যাক্ সৌরকর রাশি
চঞ্চলা আলেয়া সম আঁধার প্রান্তরে;
ধরিত্রীর শ্যামকান্ত স্নিগ্ধ মৃদু হাসি
স্নেহ-চুম্ব সনে যাক্ মিলি' চিরতরে!
চারিভিতে দাসদাসী স্বজনেরা সবে,
জানি, মর্ম্মভেদী রোলে উঠিবে কাঁদিয়া;
মরণের আঁখি দুটি ছল্ ছল্ হবে
নিয়মের সুশাসন পালিতে আসিয়া!
শেষে মনে প'ড়ে যাবে শ্মশানের কথা,
ক্ষণতরে রোধি' সবে আবেগ অধীরে
নামাইতে সে অসহ্য নিদারুণ ব্যথা;
'হরিবোল' ধ্বনি লবে স্রোতস্বতী তীরে!
বিচিত্র শয্যা পাতি' শোয়ায়ে তাহায়,
রাক্ষসী প্রকৃতি-করে দিবে সঁপি শেষে;
খল্ খল্ হাস্য করি উন্মাদিনী প্রায়,
লক্ লক্ শত জিহ্বা ভস্মিবে নিমেষে!
—হেরি কাছে পরপার নিঃশ্বাসি' সঘন
কাঁপ দিবে ভীত-আত্মা জটিল অকূলে;
শশ্মান-বান্ধবে, প্রিয়ে, বলিও তখন
ভস্ম মুষ্টি তোলে যেন না মিশিতে ধূলে!
শেষ-চিহ্ন গৃহ পানে আনে যেন তারা
মনে ক'রে, সযতনে অঞ্চলে বাঁধিয়া;
করিও না হাহাকার, অয়ি আত্মহারা,
অশ্রুনীরে স্মৃতি-রেখা ফেলো না মুছিয়া।
ভস্ম-কণা গুলি যত্নে প্রোথিয়া ভূতলে
উপরে গড়ায়ো এক দেউল সুন্দর
প্রকৃতির মুক্ত-ক্রোড়ে বিজনে বিরলে,
যেন তাহে স্নিগ্ধ শোভা ঘোষে নিরন্তর;
বাধুলি, সেফালি গুচ্ছ, বিল্ব, আমলকে
রোপি'—করে রেখো শুচি অন্তিম-মন্দির;

* এই কবিতাটি ১৩০৩ সালে লিখিত।

আর সে সমাধি-গাত্রে মর্ম্মর-ফলকে
অক্ষরে খোদিও তার বেদনা গম্ভীর !—
"ভাসাইয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গা পান্থ কোন জন ;—
সীমাহীন স্রোত বেয়ে লক্ষ্য পানে চলে,
সহসা উঠিল ঝঞ্ঝা !—ভাঙ্গিল স্বপন,
না ভিড়িতে তরী গেল ডুবিয়া অতলে।"
তার পরে লিখে রেখো নাম, ধাম, কুল,
আর যা লিখিতে হয় বিধিমত করে'।
উষায় ছাইয়া দিও থরে থরে ফুল,
সন্ধ্যা-দীপ জ্বালি' চেয়ে থেকো সকাতরে !
কদাপি একটী পান্থ পথশ্রান্ত অতি,
বসিবে শীতল মানি' সে সমাধি তলে ;
চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ শুভ্রমঠ প্রতি
পড়িবে সুবর্ণ-লিপি অতি কুতূহলে !
চির-পরিচিত মত তপ্ত গাথাগুলি
ঐকতানে ধ্বনিবেক অন্তরে অন্তরে ;
ভাবিয়া ভাবিয়া যাবে আপনারে ভুলি'
মুছিবে সে অশ্রু বিন্দু সম্ভ্রমে সাদরে,
যদি অহমিকা নাশি' একটী জীবনে
প্রাণের দীনতাগুলি ধরা পড়ে যায়,
সেই শুভ বার্ত্তা বায়ু কহিবে বিজনে
প্রবাসীর কাণে কাণে ;—সমাধি-ছায়ায়
জেনো প্রিয়ে, শুভক্ষণে হয়েছে তখন
প্রেতাত্মার সন্তোষার্থে সার্থক-তর্পণ !

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

স্ত্রীশিক্ষা।

নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিদ্বারা স্ত্রীশিক্ষা নিয়মিত হওয়া উচিত :—

(১) স্ত্রীলোকের শারীরিক দুর্ব্বলতা পুরুষাপেক্ষা অধিক। অত্যন্ত মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা শরীরের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার শক্তি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের অল্প। (২) জনন-ব্যাপার পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির জীবনে গুরুতর ঘটনা। সমুদয় শারীরতত্ত্ববিদের মতে জনন কার্য্য মস্তিষ্ক পরিচালনার বিরোধী ; সুতরাং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা স্ত্রীজাতির শারীরিক যন্ত্রগুলি পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিকৃত হয়। (৩) স্ত্রীজাতির এই শারীরিক বিকৃতি সমগ্র জাতির পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকারী। পুরুষের ঈদৃশ বিকৃতি সারিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের অনেক সময়ই বসিয়া থাকিতে এবং অধিকতর অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয় বলিয়া অযৌক্তিক শিক্ষাপ্রসূত শারীরিক অনিষ্টের কুফল তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। (৪) সন্তানের পক্ষে পিতা অপেক্ষা মাতার স্বাস্থ্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। পিতৃত্ব লাভ করিতে পিতার যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়, মাতার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর ; এবং গর্ভধারণ, সন্তান জনন ও শিশুপালন প্রভৃতির জন্য মাতার অধিকতর শারীরিক ও নৈতিক শক্তি সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। মহৎ লোকদিগের মাতৃগণ তাঁহাদের সন্তানদিগের কৃতকার্য্য সমূহ হয়ত স্বয়ং করিতে পারিতেন না, কিন্তু অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম দ্বারা স্বীয় জননশক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই তাদৃশ সন্তানের জন্মদানে অক্ষম হইতেন। (৫) জনক জননী স্বোপার্জ্জিত জীবনীশক্তির অপব্যয় করিলে সন্তানদিগের জীবনীশক্তি অবশ্যই হ্রস্বীকৃত হয়। এজন্য কোল্‌রিজ বলিয়াছেন 'গর্ভের নয়মাস শিশুর পক্ষে যতদূর গুরুতর, তাহার পরবর্ত্তী জীবনের আর কোন ঘটনা ততদূর নহে।' (৬) বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদিগের মতে স্ত্রীলোকের শিক্ষা যে পরিমাণে উচ্চ হয়, তাহাদের সন্তানগণ সেই পরিমাণে দুর্ব্বল হয়।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন অধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা স্ত্রীজাতি অংশতঃ অথবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যায় প্রাপ্ত হয়। "উচ্চশ্রেণীর মহিলাদিগের খাদ্য নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের খাদ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়মাদি সম্পর্কেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের জনন শক্তির হ্রাস কেবল মস্তিষ্ক-পরিচালনা-প্রসূত বলা অন্যায় হইবে না ; কারণ মস্তিষ্কের উপর গুরুচাপ দেওয়ার শারীরিক কুফল অত্যন্ত বেশী। এই জনন শক্তির হ্রাস প্রাপ্তি

কেবল যে তাঁহাদের বন্ধ্যাত্ব দ্বারা প্রমাণিত হয় এরূপ নহে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে জনন শক্তির বিলোপ এবং সন্তানগণকে স্তন্যদানের অক্ষমতাতেও প্রকাশ পায়। জনন শক্তির প্রকৃত অর্থ সুস্থ সন্তান প্রসব ও স্বাভাবিক কাল পর্য্যন্ত তাহাকে স্তন্যদানের ক্ষমতা। অতি-শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষার চাপ অতিক্রম করিয়া উঠিতে সক্ষম, তাঁহাদের অধিকাংশেরই এই ক্ষমতা নাই। কৃত্রিম সহায় ব্যতিরেকে তাঁহারা প্রত্যেকে যে কয়টি সন্তান প্রসব ও পালন করিতে সক্ষম, তদ্দ্বারা তাঁহাদের উৎপাদিকাশক্তি পরিমিত হইলে তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত জননশক্তি-বিহীন বলিতে হয়।" * দেনমার্কবাসী ডাক্তার হাটেল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, গুরুতর অধ্যয়ন-শ্রমে তাঁহার স্বদেশে শতকরা ২৯টি বালক ও ৪১টি বালিকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ইহাদের মধ্যে তিনি রক্তহীনতা, গণ্ডমালা ও মাথাধরা প্রভৃতি রোগেরই প্রাবল্য দেখিয়াছেন। সেণ্টপিটার্স্‌বর্গের প্রফেসর বিস্‌ট্রক্‌ও এই প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা ও এইরূপ অন্যান্য অনেক বিবরণ হইতে অনুমান করা যায় যে, উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার আধিক্য হেতু যে গুরুতর মানসিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে বালক অপেক্ষা বালিকাদিগের অধিকতর অনিষ্ট হয়। ঈদৃশ পরিশ্রম ক্রমাগত করেক পুরুষ ধরিয়া চলিলে স্ত্রীলোক মাতৃত্বের কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িবে। সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণালী পুরুষজাতি অপেক্ষ স্ত্রীজাতির পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক। কারণ স্ত্রীলোকদিগকে বসিয়া কাজ করিতে হয় বেশী, এজন্য তাহারা মানসিক শ্রমে অধিক সময় নিয়োজিত করে ও বেশী মনোযোগ দেয়। কেবল মানসিক পরিশ্রম নহে, সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থিতি, নিকৃষ্ট খাদ্য, অপ্রচুর ব্যায়াম প্রভৃতিতেও তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। বংশানুক্রমিকতায় ইহা হইতে এক ভয়ানক কুফল প্রসূত হয়। কারণ যে সকল উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের উন্নতিবিধানের আশাস্থল, তাঁহারা ক্রমে মাতৃপদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন অথবা রুগ্ন সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত সুস্থকায় রমণীবৃন্দ মানবজাতিকে বিলোপ সাধন হইতে রক্ষা করে।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন :—"মাতৃগণ কন্যাদিগকে পুরুষ জাতির চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াও যে তাহাদিগকে মানসিক শিক্ষা প্রদান করিতে প্রয়াস পান, এতদপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছু হইতে পারে না। হয় তাঁহারা পুরুষদিগের রুচির দিকে লক্ষ্য করেন না, নতুবা তৎসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। পুরুষ বিদুষী পত্নীর প্রার্থী নহে ; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য, সৎপ্রকৃতি ও সদ্‌বুদ্ধির পক্ষপাতী। কোন্ পুরুষ ইটালীয় বা জর্ম্মন্ ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া কোন রমণীর পাণি পীড়ন করিয়াছে ? কিন্তু রক্তিমগণ্ড ও হাস্যোৎফুল্ল নয়ন সকলেরই চিত্তাকর্ষক, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রসূত শান্তপ্রকৃতি ও প্রফুল্লস্বভাব পুরুষ মাত্রেরই মনোহারী। সকলেই এরূপ দুচারিটি ঘটনার বিষয় অবগত আছেন, যে স্থলে অন্য কোন গুণের অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও শারীরিক সৌন্দর্য্য গাঢ় প্রণয়ের উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু কেহই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন না যেখানে নৈতিক অথবা শারীরিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্য দ্বারা পুরুষচিত্তে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছে। যে সমস্ত গুণের সমবায়ে ভালবাসার সৃষ্টি হয়, দৈহিক সুষমাই তন্মধ্যে প্রধান : নৈতিক গুণাবলী দ্বিতীয়, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ তৃতীয় ও সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ; এবং এস্থলেও আয়াসলব্ধ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি, রসিকতা ও দ্রুত বোধশক্তি অধিকতর মনোভিরাম। যদি কেহ বলেন এ কথা ঠিক নহে এবং বাস্তবিকই এরূপ হইলে পুরুষ চরিত্র নিন্দনীয়, তাহা হইলে তিনি কিছু জানেন না। প্রকৃতির মহত্তম উদ্দেশ্য,—ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের হিতসাধন। ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের পক্ষে রুগ্নদেহবিশিষ্ট মার্জ্জিতবুদ্ধি নারিগণ অকল্যাণ, কারণ দুই এক পুরুষেই তাহাদের বংশ বিলুপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে মানসিক গুণবিবর্জ্জিত সুস্থকায় নারীগণ রক্ষণীয়, কারণ ভবিষ্যতে তাহাদের বংশধরগণের মানসিক বৃত্তিনিচয় অতুল বৈভবশালী হইতে পারে। অতএব অযথা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বালিকাদিগের স্মরণ শক্তি ভারাক্রান্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শরীরের অনিষ্ট সাধন নিতান্তই মূর্খতার কার্য্য।" *

* Principles of Biology, Vol. II. pp. 485-86.

* Harbert Spencer *Education*, pp. 187-88.

তবে কি স্ত্রীশিক্ষা অন্যায়? না, তাহা নহে। আমরা ইহাও বলি যে, তাহাদের শক্তি অনুযায়ী যথাসম্ভব শিক্ষা প্রদান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু শিক্ষা এক কথা আর মানসিক বৃত্তি সমূহের অপচয় আর এক কথা। শিক্ষার, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, শিশুর মানসিক শক্তির যথাসম্ভব অল্প অপচয় করিয়া তাহাকে যথা সম্ভব অধিক আবশ্যকীয় বিদ্যা ও ললিতকলা শিক্ষা দিতে হইবে। পারিবারিক জীবনে স্ত্রীলোকের একটি কর্ত্তব্য আছে যাহা তাহার কিছুতেই এড়াইবার যো নাই। সন্তানগণের নৈতিক ও শারীরিক শিক্ষার ভার তাহার উপর। একার্য্যে স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তোলা দরকার। সুতরাং ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রণালী ও গার্হস্থ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান এই দুই বিষয়ের অভিজ্ঞতা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

সমাজ সম্পর্কে স্ত্রীজাতির অন্য একটি কর্ত্তব্য আছে। মানবজাতির অধ্যাত্মরাজ্যে নারী হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম ভাব সমূহের আবাস ভূমি, যথা—দয়া, মমতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা। নারী মূর্ত্তিমতী করুণা, দয়ারূপিণী ভগিনী! নারীর নিকট রাজনীতি নীরস ও অনুপযোগী; কিন্তু পরোপকার তাহার আয়ত্বাধীন। পরোপকারিতার সহিত অর্থনীতি শাস্ত্র দৃঢ়সম্বদ্ধ; অতএব-অর্থনীতি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।*

মানবহৃদয়ের উন্নতিসাধন মাতার বিশেষ কার্য্য। মাতৃভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ ও প্রয়োজনীয় ধর্ম্মসাধন। অতএব সর্ব্বপ্রকার নীতিশিক্ষার সহিত মাতৃভক্তি সম্মিলিত করা মাতার কর্ত্তব্য। মাতার মনোকষ্ট শিশুচিত্তের একমাত্র আশঙ্কা। মাতার হর্ষ বিষাদই শিশুর একমাত্র বিবেকবাণী। শিশু হৃদয়ের এই মাতৃভক্তির ভিত্তিতে মাতা সর্ব্ববিধ উচ্চতম ভাব সমূহের বীজ রোপন করিবেন।

এক কথায়, স্ত্রীশিক্ষায় আমাদের দুটী বিরুদ্ধ তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। একদিকে, পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া তত্তুল্য মানসিক পরিশ্রম করিলে স্ত্রীলোক তাহার ন্যায় পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ে অক্ষম। অপরদিকে, স্ত্রী পুরুষের সঙ্গিনী এবং সন্তানগণের বাল্যাবস্থার শিক্ষয়িত্রী, অতএব পুরুষের করণীয় বা চিন্তনীয় কোন বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় নহে।

অধুনা বালকদিগের মানসিক শ্রম বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়াই বালিকাদের পক্ষেও তদ্রূপ হইতেছে। পাছে বালিকাদের শারীরিক উন্নতির ব্যাঘাত হয় এই আশঙ্কায় এবং পিতার মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা সন্তানের যে অনিষ্ট হয় মাতার স্বাস্থ্যের দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণের আশায় বালিকাদের মানসিক পরিশ্রম একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টা বৃথা সম্ভবপর। সন্তান পিতামাতার ভালমন্দ উভয়বিধ প্রকৃতিরই উত্তরাধিকারী হয়, সুতরাং ঐরূপ করিলে অনেক স্থলে সন্তান পিতার ভগ্নস্বাস্থ্যের সহিত অশিক্ষিতা মাতার মানসিক অবসাদের উত্তরাধিকারী হইবে। যে মাতা সন্তানকে তাঁহার সবল শরীরের উত্তরাধিকারী করেন তিনি তাহাকে একটী অমূল্য নিধি প্রদান করেন বটে, কিন্তু এতদুপরি যদি তিনি সন্তানের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিতে ও বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম্মঠতা ও ইচ্ছাশক্তির উপযুক্ত বিকাশ সাধনে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার দানের মূল্য দ্বিগুণিত হয়। প্রথমোক্তটি অপেক্ষা শেষোক্ত কার্য্য কঠিন। আর ভবিষ্য সন্তানগণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে নারী মাত্রেরই স্বীয় হিতাহিত দেখাও কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত ভবিষ্যদ্দর্শী হইতে গেলে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা কেবল বালিকাদিগের রক্তিমগণ্ডের কথা ভাবেন তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, অবসরসম্পন্ন রমণীদিগের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগের উপযুক্ত পন্থা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ প্রকৃতি তাহাদিগকে যথেষ্ট ধীশক্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং তাহা সৎপথে নিয়োজিত না হইলে নিশ্চয়ই নানাবিধ অকিঞ্চিৎকর কার্য্য ও অহিতকর আমোদ প্রমোদের দিকে ধাবিত হইবে। চিন্তাশীল ও উন্নত জীবন যাপনে জীবনীশক্তির যতদূর অপচয় সম্ভব, আলস্যময় জীবন যাপনে তাহার আশঙ্কা তদপেক্ষা কম নহে। বিশেষতঃ বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে নৈতিক গুণগুলিও উন্নতিলাভ করে। কেবল সঙ্গিনীর রক্তিম গণ্ডদেশ শিক্ষিত পতিকে বহুকাল সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। সর্ব্বদা একত্রবাসে দৈহিক লাবণ্য-প্রিয়তা কমিয়া আসে; কিন্তু নৈতিক গুণরাজি কখনই বিরক্তি উৎপাদন করে না; শিক্ষিত মহিলার উন্নত অন্তঃকরণ অলক্ষ্যে চিরাধিপত্য স্থাপন করে। এ কথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন যে, অনেক পুত্র মাতৃ-অনুকারী হয়। সুতরাং মাতার নৈতিক ও মানসিক উন্নতি পুত্রের চারিত্রিক উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী সংশোধন আবশ্যক, কিন্তু উহা একেবারে রহিত করা উচিত নহে। বালকবালিকা উভয়কেই আমরা অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের বশীভূত করিতেছি, অথচ তদ্দ্বারা তাহাদের শারীরিক বলের যে হ্রাস হইতেছে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করিতেছি না। উপযুক্ত পাথেয় না লইয়া দূরদেশ যাত্রার যে ফল, ইহারও সেইরূপ। প্রায় সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনেক কুনিয়ম প্রচলিত, এবং এ বিষয়ে বালিকাগণ প্রায়ই অজ্ঞ, এ জন্যই শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতিপ্রয়াসী বালিকাগণের শারীরিক অবনতি এত বেশী। ইহার প্রতিকার সহজ। যদি বালিকাদিগকে কোন নিয়ম অবশ্যপালনীয় বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতে তাহারা পুরুষাপেক্ষা অধিকতর যত্নশীল হয়। যেমন মেয়েদিগকে ঘরকন্না শিক্ষা দেওয়া হয়, সেরূপ ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি শিখাইলে, তাহারা যেরূপ রন্ধনে সামান্য ময়লাও দেখিতে পারে না, সেইরূপ সেই নিয়মগুলির সামান্য ব্যতিক্রমও দেখিতে পারিবে না।

যে সমুদয় বিষয়ে মন সহজে আকৃষ্ট হয় না,—এরূপ অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দ্বারা স্ত্রী জাতির মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। যে সকল বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট থাকে না, তাহাদিগকে বহু ক্লেশ মধ্যে বৃথা পাণ্ডিত্যে পূর্ণ না করিয়া আবশ্যকীয় শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের একটী মোটামুটি ধারণা প্রদান করা উচিত। এইরূপে একটি মোটামুটি শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, আবশ্যক হইলে যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় তাহারা সহজে আয়ত্ব করিয়া লইতে পারিবে। বালকদিগের ভবিষ্যৎ জীবন অপেক্ষা বালিকাদের ভবিষ্যৎ অধিক অনিশ্চিত। স্ত্রীকে স্বামীর কার্য্যে সহায়তা করিতে হইতে পারে, সন্তানগণের প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করা হইতে পারে, কন্যাগণকে শিক্ষিত করা আবশ্যক হইতে পারে। কাহার কখন কি অবস্থা হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং সমুদয় পরিবার প্রতিপালনের ভারও তাহার স্কন্ধে পড়িতে পারে। কিন্তু এটা পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে সকল বিষয়ে বালিকাদিগকে পণ্ডিত করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নহে। আমাদের উদ্দেশ্য, আবশ্যক হইলে সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা করিয়া লইতে পারে, তাহাদের মন এরূপভাবে গঠিত করা।

ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত অবস্থার রমণীবৃন্দ বিলাসিতা ও সুখভোগের আশায়, অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে বলিয়া গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু তাহাতে এই দাঁড়াইয়াছে যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ১২,৭৪১টি যুবতী শিক্ষকতা-প্রার্থী ছিল, তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকেরই কর্ম্মপ্রাপ্তির আশা ছিল। সুতরাং এইরূপ নিষ্ফল প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের ভবিষ্যৎ এখন একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষার প্রভাবে তাহারা তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ বিস্মৃত হইয়াছে বা তাহা করিতে অপমান বোধ করিতেছে। সুতরাং তাহারা দেশে নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক বিপ্লবের আশঙ্কা সৃষ্টি করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষা যেরূপ হওয়া উচিত সেই প্রণালী সঙ্গত হইতেছে না বলিয়াই ঈদৃশ কুফল ফলিতেছে। বাস্তবজীবনের প্রয়োজন সাধনে আমাদিগকে অধিকতর উপযোগী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া নহে। অতএব মেয়েদের অতিমার্জ্জিত রুচি ও অযথা পাণ্ডিত্য পরিহার পূর্ব্বক দৃঢ়তর নীতি জ্ঞান, শারীরিক পরিশ্রমক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তির বলাধান, সাংসারিক জ্ঞানের পরিপক্কতা, ও বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা শিক্ষা প্রয়োজন।

জর্ম্মাণিতে স্ত্রীশিক্ষার ঐরূপ কুপ্রথা বর্ত্তমান। কোন জর্ম্মণ লেখক বলেন "আমাদের বালিকাদিগকে অনেক

* বলা বাহুল্য, এ কথা ইউরোপের সম্বন্ধেই খাটে; আমাদের দেশে পরোপকার, ব্যক্তিগত হিতসাধন। ইউরোপে তাহা কম, কিন্তু বিশ্বজনীন প্রেম বা স্বদেশহিতৈষিতা দ্বারা পরোপকার নিয়ন্ত্রিত। বলিতে হইবে যে এতদুভয়ের সম্মিলনে পরোপকারিতার প্রকৃত সফলতা।

অনাবশ্যকীয় নাম, তারিখ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয় যাহা পরবর্ত্তী জীবনে তাহাদের কোন কার্য্যে আসিবে না। অথচ যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক,—মাতৃত্বের উপযোগিতা—তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া এক একটি চলৎ-শক্তি বিশিষ্ট বিশ্বকোষে পরিণত করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমাজের আবশ্যকীয় রমণী গঠন করিতে সক্ষম হই না।"

এই দোষ নিরাকরণের কেবল এক উপায় আছে,—বর্ত্তমান সময়ে বালিকা বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বিষয় পঠিত হয় তাহার অর্দ্ধেক বর্জ্জন করিয়া তৎস্থানে স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রকৃত আবশ্যকীয় কতকগুলি বিষয় নির্ব্বাচিত করা।

উপরে আমরা ফরাসি বিজ্ঞানবিদ্ M. Guyan প্রণীত Education and Heridety নামক পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ের সারোদ্ধার করিয়া দিলাম। ফ্রান্সে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকাংশ আমাদের দেশ সম্বন্ধেও খাটে। তবে পার্থক্য এই পরিক্ষার্থিনী রমণীর সংখ্যা আমাদের দেশে অতি কম, এবং দারিদ্র্য বশতঃ আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদিগেরও স্বহস্তে অনেক গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যাঁহারা বলেন আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা একেবারে নাই তাঁহারা একটি কথা বিস্মৃত হন। কেবল পুস্তকস্থ বিদ্যাই বিদ্যা নহে, শিক্ষার অন্যান্য উপায়ও আছে। আমাদের দেশের পুরুষদিগের শিক্ষার সহিত স্ত্রীলোকদিগকেও বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতে হইতেছে,—শিক্ষিত নর একেবারে অজ্ঞ কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহে না। স্ত্রীলোকদিগকে ক্রমেই এইরূপে ঠেকিয়া অধিকতর শিক্ষিত হইতে হইবে। কিন্তু অবরোধ একান্নবর্ত্তিত্ব ও অকাল মাতৃত্ব বশতঃ বিবাহের পর বধূদিগের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক স্থলে একেবারেই থামিয়া যায়। তথাপি আর এক প্রকারে শিক্ষা চলিতে থাকে। শিক্ষিত স্বামী, দেবর ও পুত্রের সংসর্গে অন্তঃপুরস্থ মহিলাবৃন্দ অলক্ষ্যে তাহাদের উন্নত ভাব সমূহ কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করে, এবং তাহাদের দেখাদেখি স্বীয় প্রকৃতি ও রীতিনীতি কতকটা সংশোধিত করিয়া লয়। বস্তুতঃ অস্মদ্দেশে পুঁথিগত বিদ্যা ব্যতিরেকেও অনেক ভদ্রমহিলা যেরূপ মার্জ্জিত রুচি, উন্নত আদর্শ ও উদার চরিত্রের পরিচয় দেন তাহা অনেক শিক্ষিত মহোদয়গণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তথাপি এরূপ অর্দ্ধশিক্ষা কিছুতেই যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না। অনেকস্থলে রমণীগণ দুই চারি পৃষ্ঠা উল্টাইতে শিখিয়াই বিবাহিত হন, এবং যথেষ্ট শিক্ষা ও তজ্জাত নির্ব্বাচন ক্ষমতার অভাবে বিবাহের পর কেবল অপাঠ্য নাটক নভেলের চর্চ্চা করিতেই ভালবাসেন। আবার গৃহকর্ম্মে শিক্ষাভাব প্রযুক্ত এবং তথাকথিত বিদ্যাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া তাঁহারা পাচকতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া একমাস পরিশ্রমে ও বাজার দরের দ্বিগুণব্যয়ে একজোড়া কার্পেটের জুতা তৈয়ার করিয়াই প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। সুতরাং আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে ভালরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, যাহা প্রকৃত পক্ষে আবশ্যক ঐরূপ বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, এবং সর্ব্বোপরি শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষাসমূহে প্রতিযোগিতা স্ত্রীলোকদিগের শরীর ও মাতৃত্বের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর তাহা ডাক্তার স্পেন্সার ও মুঁসো গিয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে অনেকগুলি (স্ত্রীলোকের পক্ষে) অনাবশ্যকীয় বিষয় শিখিতে হয়, এবং স্মৃতি শক্তির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। * বিবাহের বয়স বৃদ্ধি না হইলে এবং স্বামী স্ত্রীর শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইতে না পারিলে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণতার আশা করা বৃথা। কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ঐ আবশ্যকীয় সংস্কারগুলি কিছুতেই সংসাধিত হইবে না। একেবারে আমূল সংস্কারের চেষ্টাও বিফল হইবে। যেরূপ আছে, সেই অবস্থায়ই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে স্ত্রীজাতি অধিকতর শিক্ষিত হইলে ঐ সকল সংস্কার আপনা আপনি ঘটিবে। অধুনা সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসরের পূর্ব্বে বালিকাদিগের বিবাহ হয় না।

* স্ত্রীজাতির মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেই, এবং তাহাতে কোন অনিষ্ট নাই। কিন্তু বহুসংখ্যক রমণীর উচ্চশিক্ষালাভে সমগ্র জাতির মোটের উপর ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই, উপরে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করিলে বিবাহের পূর্ব্বে ৬।৭ বৎসর শিক্ষার সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহে মোটামুটি শিক্ষাদান অসম্ভব নহে ঃ—

১। স্বাস্থ্যরক্ষা
২। উচ্চসাহিত্য (বিশেষতঃ উচ্চ অঙ্গের কাব্যগ্রন্থ)
৩। পাটিগণিত (ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত) ও মৌখিক গণনা, বাজার হিসাব
৪। ভারতবর্ষের (বিশেষতঃ বঙ্গদেশের) ইতিহাস ও ভূগোল
৫। শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা প্রণালী
৬। পাকপ্রণালী
৭। শিল্পকার্য্য (কাঁথা সেলাই, মোজা বুনন, ইত্যাদি)।

এই কয়টি বিষয়ে ভালরূপ শিক্ষা হইলেই আমাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, সমস্ত শিক্ষা মাতৃভাষায় দিতে হইবে। যাঁহারা বিশেষ অবস্থাপন্ন, তাঁহারা এতৎসহ আরও কোন কোন বিষয় শিক্ষা করা,—যথা সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি—শিক্ষা করিতে পারেন। ইহার মধ্যে ৬ষ্ঠ ও ৭ম বিষয় এতদ্দেশীয় বালিকাগণ বিশেষ শিক্ষা ব্যতিরেকেও আয়ত্ত করিয়া থাকে। ১ম, ২য় ও ৪র্থ বিষয়ে ৬।৭ বৎসরে ভালরূপ শিক্ষালাভ হইতে পারে। নারীহৃদয় স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ, সুতরাং কবিতায় তাহাদের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং কাব্যে যত সহজে উচ্চভাবনিচয় হৃদয়ে দৃঢ় প্রোথিত করিয়া দেওয়া যায়, এরূপ আর কিছুতে নহে। চিত্ত উদার ও রুচি মার্জ্জিত করিতে কাব্য অতুল শক্তিমান্। এই সকল কারণে স্ত্রীশিক্ষায় কাব্য উচ্চস্থান অধিকারের যোগ্য। অবশ্য ১২।১৩ বৎসরের বালিকা সাহিত্যগত সর্ব্ববিধ উচ্চভাবগুলি হৃদয়ে ধারণা করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তাহাকে এই পরিমাণ শিক্ষিত করা সম্ভব যাহাতে উচ্চসাহিত্য চর্চ্চায় তাহার তীক্ষ্ণ রুচি জন্মে। শিশুপালন ও শিক্ষা প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে মাতা হওয়া দরকার। কিন্তু তৎসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত সময় প্রযুজ্য। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ধাত্রী অথবা পরীর বাহুল্যভাবে ভদ্রশ্রেণীর মেয়েদেরও ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলির সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, সুতরাং ১০।১২ বৎসরের বালিকা এ বিষয়ে নিতান্ত অবোধ থাকে না। বালিকাদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে কোন কঠোর নিয়ম না থাকাই ভাল, এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে যথেষ্ট খেলা ধূলার অবসর দেওয়া উচিত, তাহা হইলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে না। অবসরমত বাড়ীতে তাহারা মাতার গৃহকর্ম্মেও সহায়তা করে, তাহাতেই অনেকটা ব্যায়ামের কার্য্য হয়। আহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংস্কার বাঞ্ছনীয়, সরটা ননীটা কেবল পুরুষভোগ্য রাখিলে চলিবে না, স্ত্রীপুরুষের আহার সাম্য থাকা আবশ্যক। এই প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বিবাহযোগ্যা কন্যা বিদুষী বলিয়া পরিগণিত হইবে না বটে,—তাহা ততটা প্রার্থনীয় কিনা তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে—কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করিতে পারিবে। উপযুক্ত স্বামীর হস্তে পড়িলে তিনি তখন তাহাকে রীতিমত শিক্ষিত করিয়া লইতে পারিবেন। এরূপ স্ত্রীলোক দুর্ল্লভ নহে যাঁহারা বিবাহের পর পতিকর্ত্তৃক বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছেন। আমরা জানি অনেক স্বামী পত্নীর ঘোরতর অজ্ঞতা দর্শনে নিরাশ হইয়া পড়েন, হয়ত অল্প কিছুদিন তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়া সাফল্য লাভ আয়াসসাধ্য দেখিয়া সে চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। পতি যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিতা পত্নীও লাভ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অল্পায়াসে তাহাকে স্বীয় যোগ্যা করিয়া লইতে পারেন ও করিয়া লন। মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার্থ ভারতমহিলাগণ যে ভাণ্ডার খুলিয়াছেন তদ্দ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি জেলায় জেলায় উক্ত প্রণালীসঙ্গত কতকগুলি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ শিক্ষার সফলতা পরীক্ষিত হইতে পারে। এরূপ বিদ্যালয়ে ব্যয় বাহুল্যের আশঙ্কা নাই। আমরা ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই প্রস্তাবের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া উপসংহার করিলাম।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুকি জাতির বিবরণ।

(৫)

কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার এড্‌গার সাহেব কর্ত্তৃক সুকপই লালকে খেলাত প্রদত্ত হওয়ার পরে কুকিগণ যেরূপ উপর্য্যুপরি অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে কোন সময়ই তদ্রূপ করিবার কথা শুনা যায় নাই। এই সময়ে তাহারা কাছাড় জিলার অন্তর্গত আলেকজেণ্ডারপুর চা-বাগান আক্রমণ করিয়া, অনেকগুলি কুলির সহিত, বাগানের ম্যানেজার উইন্‌চেষ্টার সাহেবকে বিনাশ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীতঃ—

(১) ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে ;—১৮৭১ খ্রীঃ ২১শে, ২২শে, জানুয়ারি ও ২রা মার্চ্চ তারিখে বিবিধ স্থান আক্রমণ এবং লুণ্ঠন, দাহন ও নরহত্যাদি করিয়াছিল।

(২) শ্রীহট্ট জিলায় ;—১৮৭১ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারি তারিখে কাছাড়িয়া পাড়া নামক স্থান আক্রমণ করিয়া, ২০জন মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ করে এবং অনেকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া নেয়। ২৪শে জানুয়ারি তারিখে চারগোলা থানার পার্শ্ববর্ত্তী একখানা গ্রাম আক্রমণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারি আলিনগরের নিকটবর্ত্তী একখানা গ্রাম কুকিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কৈলাস বাবু বলিয়াছেন,—"এড্‌গার সাহেবের বন্ধু সুকপই লালের অনুচরগণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।"

(৩) কাছাড় জিলায় ;—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারি তারিখে আইনের খাল নামক গ্রাম, আলেকজেণ্ডারপুর ও কাতলাছড়া চা-বাগান কুকিগণ আক্রমণ করে। ২৪শে জানুয়ারি তারিখে পুনরায় কাতলাছড়া চা-বাগান আক্রমণ করিয়াছিল। ২৭শে জানুয়ারি মনিয়ার খাল ও নন্দীগ্রাম চা-ক্ষেত্র এবং রুকণী নদীর তীরবর্ত্তী একদল কাঠুরিয়া কুকিগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জালনাছড়া চা-বাগান আক্রমণ করিয়াছিল।

(৪) মণিপুর রাজ্য মধ্যে ;—১৮৭১খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে মণিপুর রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একখানি গ্রাম কুকিগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। এখানে অনেক লোক হত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে,—সাইলো কুকিসরদার সবোঙ্গা ; হাউলং কুকিসরদার লাল সোবনা ও সেইপইয়া ; খচাক কুকিসরদার বোনপাইলাল, তাঁহার মাতা ঈমপাহ, বনোলাল, তাহার পুত্র লাল বোরা ; জোং দং এবং সুকপই লাল, তাঁহার পুত্রদ্বয় ও ভগিনী ভানুই থাঙ্গির অনুচরগণ উপরিউক্ত ঘটনাবলীর অধিনায়ক ছিল।

কুকিগণের অত্যাচারের কথা অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের দরবারে পৌছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন যে, ঝুটা জিনিসের খেলাতে কুকিগণ ভুলিবার নয়। ১৮৭১ খ্রীঃ ১৮ই মে তারিখে তদানিন্তন বঙ্গেশ্বর সার জর্জ্জ কেম্পবেল সাহেব বাহাদুর, পূর্ব্ব সীমান্তে শান্তি স্থাপনার্থ একটি সামরিক অভিযানের অনুষ্ঠান জন্য প্রস্তাব করেন। তদবলম্বনে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও বাহাদুর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জুলাই তারিখে যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, তাঁহার সার মর্ম্ম এইঃ—

"পূর্ব্ব সীমান্তে শান্তি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আগামী শীত ঋতুতে একটি সামরিক অভিযান হইবে। ত্রিপুরা ও মণিপুরাধিপতি এই অভিযানে আমাদের সহায় হইবেন। সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। একদল চট্টগ্রাম হইতে কুকিগণের প্রতিকূলে গমন করিবে ; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার মিঃ লেউইন্‌, সিবিল অফিসার স্বরূপে এই দলের সঙ্গে যাইবেন। 'হাউলং' ও 'সাইপো'দিগকে দমন করাই এই দলের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইবে। খচাক (লুসাই) দিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অন্য এক দল সৈন্য কাছাড় হইতে গমন করিবে। এই দলের সঙ্গে সিবিল-আফিসার স্বরূপে থাকিবেন—কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার এড্‌গার সাহেব।

"বিগত শীত ঋতুতে কোন্ কোন্ কুকিসরদার দ্বারা প্রজাগণ অত্যাচারিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় হইতে পারে নাই। অভিযান সময়ে তাহা স্থির করিতে পারিলে, অপরাধিদিগকে উপযুক্ত দণ্ড, প্রদান করিতে হইবে বন্দিদিগকে মুক্ত করিতে হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি বন্দিদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি আদেশ অমান্য করিলে, তাহার গ্রাম, শস্যের গোলা ও শস্য ক্ষেত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে।

প্রত্যেক সেনা দলের সহিত এক কি ততোধিক সার্ভে অফিসার যাইবেন, এবং তাঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করিবেন।"

বিজ্ঞাপনীর মর্ম্ম কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কাছাড়ে ও চট্টগ্রামে বৃহৎ দুই দল বৃটিশ সৈন্য উপস্থিত হইল। জেনারেল ব্রাউন লো চট্টগ্রামের সেনাদলের, এবং জেনারেল বোরসিয়ার কাছাড়ের সেনাদলের নায়ক হইয়াছিলেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্য ভাগে অভিযান আরম্ভ হইল।

জেনারেল ব্রাউন লো লুসাই ও হাউলং সরদারদিগকে এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই হস্তগত করিলেন। মেরি উইনচেষ্টার প্রভৃতি বন্দীগণকে তিনি বিনা আয়াসেই উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ব্রাউনলো ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ডোমাগিরি হইতে কুকিগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশে ২৩১ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া, ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। খ্যাতনামা কুকি সরদার রতনপুইয়া তাঁহার পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন।

কাছাড় দলের অধিনায়ক বোরসিয়ার কোন কোন কুকি পল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি কুকি সরদারদিগকে পরাস্ত করিয়া, প্রবল পরাক্রান্ত কুকিরাজ লাল বোরোকে হস্তগত করেন। ইহার নিকট হইতে কতকগুলি জিনিসও লওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি উল্লেখযোগ্য ;—

গজদন্ত ১ জোড়া, ঘোং ১ জোড়া, হার ১ ছড়া, কুঁকেপাঠা ১০টি, শুকর ১০টি, মোরগ ৫০টি, ধান্য ২০ মণ। এতদ্ব্যতীত মণিয়ার খাল ও নন্দীগ্রাম চা-ক্ষেত্র লুণ্ঠন দ্বারা কুকিগণ যে পরিমাণ বন্দুক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক বন্দুক দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, ১০ই মার্চ্চ তারিখে বোরসিয়ার কাছাড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা লালবোরোর পল্লী কাছাড় হইতে ১৯৩ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ঐ পল্লী আক্রমণ উপলক্ষে তিনি খচাক, সাইলো ও হাউলং প্রভৃতি কুকি সরদারগণকে বিশেষরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন।

অভিযান সময়ে যে সকল সার্ভে অফিসার সৈন্যগণের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের মধ্যবর্ত্তী ৬৫০০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মানচিত্র প্রস্তুত এবং সরাসরি রকমে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমানা নির্দ্দেশ করেন। এই সীমারেখা দ্বারা সুকপই লাল প্রমুখ কতকগুলি খচাক কুকির বাসভূমি ত্রিপুরারাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। আমরা জানি, অনেক স্থলে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব ও উত্তর সীমা লইয়া আজ পর্য্যন্তও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত তর্ক চলিয়া আসিতেছে। ইহার শেষ মীমাংসা কতকালে হইবে, তাহা বলা সহজ সাধ্য নহে।

উপরিউক্ত অভিযানের পর, সার জর্জ্জ কেম্প্‌বেল বলিয়াছিলেন, "কুকির অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে। চা-কর এবং আমাদের প্রজাগণ নিশ্চিন্তে কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারিবে।" প্রকৃতপক্ষে, অভিযানের পর কয়েক বৎসরকাল কুকিগণ কোনরূপ অশান্তিকর কার্য্যে লিপ্ত হয় নাই।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কুকি প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায়, কুকিগণ কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনারের নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়। ইহার পূর্ব্বে, কুকি প্রদেশে, চাংশীল, সোণাই ও টেপাইমুখ নামক স্থানে তিনটি বাজার ছিল। বাঙ্গালী দোকানদারগণ সেই সকল বাজারে থাকিয়া ধান, চাউল ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিত এবং কুকিদিগের নিকট হইতে সুলভমূল্যে রবার ক্রয় করিত। কুকিরাজগণ দোকানদারদিগের উপর অতিরিক্ত শুল্ক দাবি করায় এবং রবারের কারবার বন্ধ হওয়ায়, ঐ সকল বাজার উঠিয়া যায়। দুর্ভিক্ষের ইহাই প্রধান কারণ ছিল। দুর্ভিক্ষকালে, গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ বাক্যে, বাঙ্গালী বণিকগণ ধান চাউল ইত্যাদি সহ ঐ সকল বাজারে যাইয়া পুনরায় দোকান সংস্থাপন করিয়া, কুকি প্রদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্প্‌ল প্রস্তাব করেন যে, "পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে জনৈক পলিটিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া, ত্রিপুরারাজ্য ও সমগ্র কুকি প্রদেশের—তত্ত্বাবধান ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করা উচিত।" আসামের চিফ-কমিসনার কর্ণেল কিটিঙ্গ ইহার প্রতিবাদ করেন ; তিনি বলেন,—"লুসাই কুকিগণ কাছাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে, চট্টগ্রাম হইতে ইহাদিগকে শাসন করা কঠিন হইবে। সুরমা নদীর তীরস্থ স্থান সমূহে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত আগরতলায় জনৈক পলিটিক্যাল এজেণ্ট

রাখাই আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি।" কর্ণেল কিটিঙ্গের মন্তব্যই কার্য্যকরী হইয়াছিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণের মধ্যে ভীষণ আত্মকলহ উপস্থিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করেন, এবং তিনি ইহাও জানাইলেন যে, "সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত কলমপুর, কৈলাসহর, ধর্ম্মনগর, একছড়ি, উদয়পুর, ঋষ্যমুখ, খাদলা মাদলা এবং আগরতলায় মহারাজ বাহাদুরের যে ৮টি সেনা নিবাস সংস্থাপিত আছে, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বারুদগোলা ইত্যাদি সরঞ্জাম রক্ষিত হয় না।" এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন, "সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত মহারাজ বাহাদুর যেরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, তাঁহাকে অবশ্যই ওরূপ কার্য্য করিতে হইবে।" ইহার পর সেনানিবাসগুলির উপর ত্রিপুর দরবারের অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক দল কুকি কর্ত্তৃক চাংশীল বাজার লুণ্ঠিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারগণ কাছাড়ে উপস্থিত হইয়া অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিল। ডেপুটি কমিসনার এতদুপলক্ষে, বণিকগণের ক্ষতিপূরণ জন্য কুকি রাজা সুকপই লালের এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড করেন, এবং এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, উক্ত টাকা প্রদান না করিলে কোন বাঙ্গলী চাংশীল বাজারে দোকান স্থাপন করিবে না। রাজা সুকপই লাল জরিমানার অধিকাংশ টাকা আদায় করার পর, আসামের চিফ-কমিসনার অবশিষ্ট টাকার দায় হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সুকপই লাল মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর কুকিগণের মধ্যে আবার আত্মকলহ আরম্ভ হইল। ১৮৮১।৮২ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ পরস্পরে পরস্পরকে বধ করিয়া, আপনাদের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। এই সময়ে কুকি প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎকালে কুকিদিগকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি কুকি মিলিত হইয়া, চৈপাইমুখের কুকিরাজার বাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। ইহার পর ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কুকিদের নিজভূমিতে কোনরূপ উপদ্রব ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য প্রদেশে সামান্য রকমের অশান্তি ঘটাইতেছিল মাত্র। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লেপ্টেনেণ্ট ষ্টুয়ার্ট পার্ব্বত্য প্রদেশের জরিপ কার্য্যে লিপ্ত হন। এই সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে সিন্ধু কুকিগণ ষ্টুয়ার্টের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই জন ইংরেজ ও একজন দেশীয় খৃষ্টান প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল। এই ঘটনায় গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন, এই বর্ব্বর জাতিকে সহজে দমন করা সম্ভবপর হইবে না। এজন্য পরবর্ত্তী শীত ঋতুতে বৃহৎ রকমের অভিযানের আয়োজন হইতে লাগিল।

১৮৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে "চীন-লুসাই" অভিযান হয়। ফেনী, চট্টগ্রাম ও কাছাড় এই তিন স্থান হইতে বৃহৎ তিনটি সেনাদল কুকিগণের প্রতিকূলে প্রেরিত হইল। লুসাইগণ এই সময়ে বিপুল বিক্রমে বৃটিশ সৈন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের উৎপীড়নে বৃটিশ-সিংহকে বেশ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, মণিপুর অথবা উক্ত প্রদেশ অধিকার কালে বোধ হয় তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ আয়াস ভুগিতে হয় নাই। ভারতের ইতিহাসে লুসাইদিগের বীরত্ব কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কিছুদিন পরে লুসাই প্রদেশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের করকবলিত হইল। গবর্ণমেণ্ট কুকি প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, "উত্তর লুসাই" ও "দক্ষিণ লুসাই" নামক দুটি জেলা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই দুই জিলার পরিমাণফল প্রায় চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল হইবে।

মিঃ মরে, প্রথমতঃ দক্ষিণ লুসাইর শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি পদোন্নতি চট্টগ্রামের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার পদে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, ১৮৯১ খ্রীঃ, ১লা মে তারিখে, কাপ্তান সেক্সপিয়র সাহেবের স্থলে দক্ষিণ লুসাইতে প্রেরিত হইলেন। কাপ্তান ব্রাউন ১৮৯০ খ্রীঃ ১৮ই মে তারিখে উত্তর লুসাইর পলিটিকাল অফিসাররূপে আজিয়াল দুর্গে গমন করিলেন। এই সময়েও লুসাইগণ আপনাদের তেজ ও বিক্রম সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিয়াছিল না। ৯ই সেপ্টেম্বর প্রাতে কাপ্তান ব্রাউন সৈরং হইতে চাংশীলে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ক্লার্ক বাবু কামিনী কুমার সেন, ১জন দফাদার, ১জন পুলিশ সৈন্য ও কতকগুলি কুলি ছিল। পথিমধ্যে তাঁহারা কুকিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। মৃত রাজা সুকপই লালের আত্মীয়বর্গ দ্বারা এই ঘটনা সংঘটিত হয়। অতঃপর অপরাধীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন কৌশলে কুকিগণের হিংস্র স্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লেউইন সাহেব, যে প্রণালীতে পার্ব্বত্য জাতিকে শাসন করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন, ঠিক সেই প্রণালীতে কুকিগণ শাসিত হইলে, তাহারা কালে উন্নত জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। মিঃ লে উইনের সারগর্ভ উদার বাক্যের স্থূল মর্ম্ম এই :—

"স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে পার্ব্বত্য প্রদেশ শাসন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পার্ব্বত্য জাতির সুখ শান্তি ও উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসন করাই সঙ্গত। দেশের মধ্যে সভ্যতার ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে, সেই দেশ সহজেই উন্নত হইয়া থাকে। লোকদিগকে সভ্য ও শিক্ষিত না করিয়া, অগ্রে দেশের উন্নতি পক্ষে যত্ন করিলে, সে যত্ন কখনও ফলবতী হইতে পারে না। সুতরাং পার্ব্বত্য প্রদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, অগ্রে পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে সভ্যতার আলোক বিস্তার করা আবশ্যক। এই কার্য্য সংসাধন পক্ষে উপায়ের অভাব নাই, উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব। কেবল শাসন দণ্ড পরিচালন করাই যাহার উদ্দেশ্য ও স্বভাব এরূপ শাসনকর্ত্তা দ্বারা এস্থলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে না। পার্ব্বত্য জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উগ্রতা এবং ত্রুটি ইত্যাদি নানাবিধ দোষের পক্ষে ক্ষমাশীল এবং তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম, এমন এক জন শাসন কর্ত্তা দ্বারা ইহাদের শাসনের ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। জাতীয় আচার ব্যবহার ও বিশ্বাস ইত্যাদি বজায় রাখিয়া, উন্নতির নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করাও তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য। এই প্রকারের শাসন কর্ত্তার অধীনে থাকিয়া, এবং জাতীয় ধর্ম্ম রীতি নীতি ও বিশ্বাস বজায় রাখিয়া, শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা পাইলে, পার্ব্বত্য জাতি, অনুকরণ প্রিয় অধম জাতিতে পরিণত না হইয়া উত্তরোত্তর ঈশ্বরের অনুগৃহীত একটি উন্নত জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।" *

* Lewin's Hill Tracts of Chittagong. P. 118.

আমরাও এই উদার বাণীর বিশেষ পক্ষপাতী। এবং কুকিগণের প্রতি এই নিয়মে শাসন দণ্ড পরিচালন করা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। শাসন কর্ত্তাগণ এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন কি না, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের দেখিবার বিষয়। এই বর্ব্বর জাতির ভবিষ্যৎ যাহাতে মঙ্গলজনক হইতে পারে, এবং এই পশুভাবাপন্ন জাতি যাহাতে মনুষ্য সমাজে দণ্ডায়মান হইতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

খেদা।

(২)

গতবারে আমরা বলিয়াছি, "প্রত্যেক ড্রাইভ পরস্পর বিভিন্ন" এখন তাহাই বিস্তৃতভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই হাতীধরা বা ড্রাইভ ইত্যাদি দেখিতে হইলে গাছের গায় লতা দিয়া ছোট ছোট ডালা বাঁধিয়া এক রকম মইএর মত প্রস্তুত করিতে হয়, এবং এই অদ্ভুদ সিঁড়ি অবলম্বনে গাছের উপরিস্থিত 'মাচানে' যাইয়া বসিতে হয়। আমাদের বর্ণনীয় ড্রাইব (drive) নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন হইতে শীকার পার্টির দু'চার জন ক্রমশঃ তাড়াইয়া কৌশল ক্রমে হস্তিযূথকে ড্রাইবের (drive) জন্য যথাস্থানে উপস্থিত করে। প্রভাতে সমস্ত প্রস্তুত হইলে পর একদল শীকারী অধ্যক্ষ সাহেবের সহিত বাহির হইয়াছিল; সাহেবের উপর এই সকল ব্যক্তির অবিচলিত বিশ্বাস দেখিলে মোহিত হইতে হয়। তাহাকে শীকারিদল দেবতার ন্যায় অভ্রান্ত মনে করিয়া থাকে; এবং তাহার আজ্ঞায় কাহারও জীবন যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিশ্বাসী সাহসিক শীকারিদল মৃত্যুমুখে যাইতেও প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক দল যাইবার সময় অধ্যক্ষ সাহেবকে 'সেলাম' করিয়া যাইতে লাগিল; অবশেষে প্রধান জমাদার "আনোয়ার আলী মস্তক নত করিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, এই দৃশ্য দেখিলে ছাত্রজীবনের বিস্মৃতপ্রায় রোমান গ্লাডিয়টরের (Roman gladiator) কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। যেন এক একটি গ্লাডিয়টর আসিতেছে আর বলিতেছে,—"Ave Cæsar Morituri te Salutant"!! প্রকৃত ড্রাইব (drive) এখন হইতে আরব্ধ হইল। যে বিস্তৃত স্থানের উপর দিয়া হাতী কৌশল

ক্রমে চালনা করিয়া আনিতে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে মনে হয় যে, ইহা কি ভয়ানক ব্যাপার! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছের উপরে মাচানে বসিয়া ড্রাইব (drive) দেখিতে হয়। আমাদের বর্ণনীয় মাচান অতি উচ্চ বৃক্ষের উপরে সংস্থাপিত হওয়ায় ফ্যানেল (funnel) ও খোঁয়াড়ের ভিতর পরিষ্কাররূপে দেখা গিয়াছিল। পরিষ্কার দেখিবার পক্ষে আরও একটি সুবিধা ঘটিয়াছিল, ঐ স্থানের ভূমি অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় "চড়াই উতরাই" ছিল না, ভূমির সমতলতাও এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। ড্রাইব (drive) যতই মাচানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই বৃক্ষশ্রেণীর ভজ্যমান শাখা প্রশাখার 'মড় মড়' শব্দ, শীকারিদল ও কুলী মজুরের হাটুরিয়া গোলমাল এবং উত্তেজিত হস্তিগণের ভীষণ বৃংহিত ও শুণ্ডাঘাতের শব্দ কাণ বধির করিতে লাগিল। 'হাতীধরা' হইয়া গেলে পর বহুদর্শী অধ্যক্ষ সাহেব এবং কর্ম্মপটু জমাদার বলিয়াছিলেন, আমরা ড্রাইব আরম্ভ হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, হাতীর সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব অনুমান অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছিল; আমাদের অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী হাতী এবার খেদায় পড়িয়াছে। যাউক্, যাহা বলিতেছিলাম;—ড্রাইবের (drive) সময় মদমত্ত হাতিযূথের ভীতি উৎপাদন বৃংহিত শব্দ ও অসংখ্যক লোকের যুগপৎ তুমুল কোলাহলে যে প্রাণোন্মাদক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। মদমত্ত ভীত হস্তী সকল যেরূপ বেগের সহিত গাছ পালা ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া যেরূপ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা না দেখিলে বর্ণনায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মোটের উপরে এইটুকু বলা যাইতে পারে, হাতীগুলির তাৎকালিক অবস্থা দেখিলে বোধ হয় ঐ স্থানের জঙ্গলগুলিই যেন সমুদায় অরণ্যচর পশুপক্ষী কোলে নিয়া অগ্রসর হইতেছে। সাঙ্কেত নিশানধারীগণের (signallers) সঙ্কেত সকল দৃষ্ট ও তীব্রবংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হওয়াতে বাহিরের লোকেরা এই বিরাট ব্যাপার বিশৃঙ্খল মনে করিতেছিল। কিন্তু বৃক্ষনিম্নে শীকার পাটি অধ্যক্ষের নিয়োগানুসারে সুচারুরূপে কার্য্য চালাইতেছিল। সহস্র আপাত বিশৃঙ্খলা ও গোলমালের মধ্যেও হস্তী সকল ক্রমশঃই ফ্যানেলের (funnel) মুখেরদিকে অগ্রসর হইতেছিল, অবশেষে বেলা প্রায় দুইটার সময় কিয়ৎপরিমাণে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। এই সময়ে বৃক্ষাদিভঙ্গের শব্দ, হস্তীর বৃংহিত ও শুণ্ডাঘাত ধ্বনি ফগ্‌হরণ (fog-horn) ও বাঁশীর শব্দ ক্রমশঃই নিকট হইতে নিকটতর বোধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সকল হস্তী দুই মাইলের অধিক ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল তাহারা অতি সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে আর কাহারও কষ্ট পাইতে হইল না। এই সময়ে সুচতুর কর্ম্মচারিগণ (drive) ঘুরিয়া ঘুরিয়া অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ফ্যানেল এর (funnel) মুখে হস্তী সকল বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হস্তীদিগকে ফ্যানেলে (funnel) প্রবেশ করাইবার জন্য যত প্রকারের উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে, অচিরে তাহাই করা হইল।

কিন্তু এই উদ্দাম চেষ্টাতে কোনই ফল ফলিল না। অবিলম্বে ভীষণ মেঘগর্জ্জন অথবা সহস্র কামান ধ্বনির ন্যায় চতুর্দ্দিকে "বোমের" শব্দ উত্থিত হইল; উহাতে বুঝা গেল, নিরাশ অধ্যক্ষ সাহেব তাহার লোকদিগকে নীরব হইতে আদেশ করিতেছেন। এই সময় অর্দ্ধবৃত্ত ফ্যানেলের মুখ হইতে যেমন দূরে যাইতেছিল, তেমনি জঙ্গল ভাঙ্গার 'মড় মড়' শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না, কেবল মাত্র বামে দক্ষিণে কাণে (Foghorn) ও বাঁশীর শব্দ শুনা যাইতেছিল। এইরূপ কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ বিস্তৃত জঙ্গল ভূমি একেবারে নীরব হওয়াতে প্রাণহীন বোধ হইতে লাগিল। এই সময় অনেকেই বিকলমনাঃ অধ্যক্ষ সাহেবের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন বাহিরের লোকেরা এইরূপ নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঘুরিয়া মাচান হইতে অবতরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় অধ্যক্ষ সাহেব তথায় আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে সকলকে জানাইলেন, আজিকার দিন বৃথায় যায় নাই। ইতিমধ্যে যে একটু আশঙ্কাজনক গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও আমাদের এক প্রকার কৌশল মাত্র, এইরূপে কৌশল করিয়া একটু বিলম্ব না করিলে রিজার্ভের (reserve) লোক সকল আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এই চতুরতাটুকু শীকারীদল সম্ভবতঃ প্রীতিজনক মনে করে নাই। অধ্যক্ষ সাহেব তাড়াতাড়ি দৌ

কটি করিয়া ড্রাইবার (driver) দের নিকটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার যাওয়ার পর দুই এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ নিস্তব্ধ বনভূমি হইতে কেবল দুই একটি করভক (হস্তিশিশু) ও মদমত্ত হস্তীর আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল মাত্র। ইহার পর ফ্যানেলের (Funnel) মুখ হইতে সমকোণ ভাবে বাম দিকে প্রায় দুই মাইলেরও অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ একেবারে কাঁশী ঘণ্টা কণ্‌হরণ (Foghorn), বাঁশী, ঢাক, ঢোল প্রভৃতির তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। পুনর্ব্বার বোধ হইল, যেন সমস্ত বনরাজি আবার মহাতেজে এদিক ওদিক নড়িয়া চড়িয়া ফ্যানেলের (Funnel) মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় আবার বৃক্ষাদির শাখা প্রশাখা ভঙ্গের একটা বিভীষিকার শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এই সময়ে সম্মুখের গাছপালা যেমন ভাঙ্গিতেছিল, তেমনি মাচানের উপরিস্থিত লোকেরা ভয়ে উৎসাহে ও উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল। কারণ, ইহা অবধারিত যে, ইহারা সম্মুখে যাহা কিছু পাইবে, তাহাই সজোরে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ঘটনা স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হইল।

ফ্যানেলের (Funnel) মধ্যভাগে সম্মুখে পশ্চাতে এবং বাম পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ করাতে ঐ প্রবিষ্ট হাতীগুলি "হাতে নোড়" দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; পর মুহূর্ত্তেই হাতীগুলি পরস্পর হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিল। এক ডান দিক ছাড়া সকল দিক হইতেই হস্তীদলকে চালনা করা হইয়াছিল; হুড়াহুড়ির ইহাই কারণ। একদিকার এই লোমহর্ষণ ও উত্তেজক কাণ্ড এত সতর্কতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল যে তাহা আমরা কিছুতেই বলিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না। চোখের নিমিষেই দেখা গেল ফ্যানেলের (Funnel) মুখে আর গোলমাল নাই, হস্তিযূথ একেবারেই ফ্যানেলের (funnel) মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য দলটি একবার মাত্র প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু শিকারীদল পূর্ব্বোক্তরূপ বন্দুকাদি দ্বারা তাড়া দেওয়াতে যূথটি একেবারে ফ্যানেলের (funnel) মধ্যে গিয়া পড়িল। এই বচনাতীত দৃশ্যটি বস্তুতঃই উল্লেখ যোগ্য।

আমরা গত বারেই বলিয়াছি, বন্য হস্তিদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ফ্যানেলটি (funnel) নানা প্রকার লতা পাতায় ঢাকিয়া রাখিতে হয়, এই ফ্যানেল নির্ম্মাণের সময়ও সেই রীতি উল্লঙ্ঘিত হইয়াছিল না; কিন্তু এখন ফ্যানেলের সেই লতা পাতার কৃত্রিম সাজ কোথায় যে ফুৎকারে উড়িয়া গেল, এখন তাহার খোঁজও পাওয়া যাইতেছে না। পশ্চাদ্বর্ত্তী শিকারী দলের তাড়নায় ভীত হস্তিযূথ হুড়াহুড়ি ও চীৎকার করিতে করিতে খেদার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখা গেল। অধ্যক্ষ সাহেব ও শীকারিদল প্রাণপণে "হাউই বাজী" ছাড়িতে ছাড়িতে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ঘণ্টা ঢক্কা প্রভৃতির শব্দের দ্বারা হট্টগোল করিতে করিতে হাতিদলের পেছনে পেছনে যাইতে লাগিল। খেদার দ্বারদেশে হস্তিযূথের মধ্যে এরূপ ভিড় পড়িয়াছিল যে, কতকগুলি হাতী ত্রস্তভাবে অপর কতকগুলি হাতীর পিঠের উপরে উঠিয়া পড়িয়াছিল; এই হুড়াহুড়ি মারামারি চাপাচাপিতে খেদা ও ফ্যানেলের (funnel) মধ্যবর্ত্তী দরজাটি দুলিয়া দুলিয়া কোনও রূপে ঠিক রহিল। এই সময়ে শীকারিদল বেশ একটু কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল। কয়েকজন সুদক্ষ সাহসিক শীকারী পূর্ব্বের ন্যায় হাতীর পেছনে পেছনে রহিল, অপর লোকেরা ফ্যানেলের (funnel) বেড়ার ধারে ধারে ও হাতীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দেখিতেছিল যে, হাতীগুলি কোনও রূপে ফ্যানেলের (funnel) বেড়াটি ভাঙ্গিয়া না দেয়, এবং এই উদ্দেশ্যেই ইহারা বেড়ার নিকটবর্ত্তী হাতীগুলিকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে তাড়াইয়া দিতেছিল। মানুষ সামান্য বল নিয়াও বুদ্ধি প্রভাবে কি দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে, এই বিপন্ন হস্তিদল যদি নিজেদের বলবত্তা ও উপস্থিত বিপদের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে কি ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হইত। এই কৌশলী অধ্যক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ শীকারীদলের শক্তি ছিল না যে, এই মদমত্ত বলশালী বন্য হস্তিদলের গতিরোধ করিতে পারে, কিন্তু ভগবান শারীরিক বলের সহিত মস্তিষ্কের বল হতভাগ্য হস্তিদিগকে প্রদান করেন নাই তাই আজ হস্তিদলের এই বিপদ ও শিকারীদলের সহিত অধ্যক্ষ সাহেবের এই উৎকট উল্লাস দেখিতে পাওয়া গেল।

ফ্যানেল মধ্যে প্রবিষ্ট ভীত ও নির্ব্বোধ হস্তিদল কিছুতেই আর পলায়ন করিতে পারিল না কারণ তখন ফ্যানেলের

মুখে প্রজ্জ্বালিত অনল দেবের সর্ব্বগ্রাসী লোল জিহ্বা গগন স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় পার্শ্বের বেড়াও দৃঢ়রূপে গঠিত ছিল। হাতীর দল একবার ফ্যানেলের মুখে প্রবিষ্ট হইলে, শীকারিগণের এইরূপ তাড়নায় শীঘ্রই ফ্যানেলের মধ্যে যাইতে বাধ্য হয়।

যেই অশ্রুত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব কোলাহলের মধ্যে সুনিপুণ শিকারীদল বিশাল হস্তিযূথকে প্রবেশ করাইয়া অসামান্য ধীরতা ও কার্য্য পটুতার পরিচয় দিল, অমনি একটী বৃক্ষচূড়াবলম্বী ঘণ্টা আনন্দোচ্ছ্বাসেই যেন বাজিয়া উঠিল, এই ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তিতরজ্জু সুবৃহৎ গেটটী সদর্পে সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হস্তীটীর নিতম্ব প্রদেশে আঘাত করিয়া পড়িয়া গেল। পরে এই হস্তীটী দ্রুতবেগে খেদার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে তুমুল "আল্লা আল্লা" শব্দ উত্থিত হইল, সেই শব্দে মনে হইয়াছিল, আবার বুঝি দিগ্বিজয়ী দুর্দ্দর্ষ্য মোগল পাঠানেরা অজেয়আক্রমণে চট্টগ্রামের আরণ্য ভূভাগ জয় করিয়া উন্মাদ আনন্দে এই স্বীয়াধিকারী জয় ঘোষণা করিতেছে।

সুদক্ষ অধ্যক্ষ সাহেব মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক রাইফলধারী লোক চতুষ্টয়ের সহিত গেট বাহিয়া উপরে উঠিলেন, এবং যাহারা হস্তী বন্ধনের জন্য অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

যখন এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল তখন কুপিত হাতীগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া খেদার বেড়ার সামর্থ্য পরীক্ষা করিতেছিল। মহাবল হস্তিসমূহের যুগপৎ ভীষণ আক্রমণে সুদৃঢ় বেড়া দুলিয়া দুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কোনরূপে টিকিয়া গেল। অবশেষে সফল মনোরথ অধ্যক্ষ সাহেব অধীন সহকারীগণের ভূয়সী প্রশংসা করিলে তাহারা—প্রভুকে সবিনয়ে অভিবাদন করিয়া আনন্দধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল।

গেট সুরক্ষিত হইলে পর খেদার চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালান হইল। এই সময় রাত্রি হইলেও কোনরূপে গণনা করিয়া অধ্যক্ষ সাহেব বলিলেন প্রায় ১৫০।২০০ হাতী খেদায় পড়িয়াছে, পরে দেখা গিয়াছিল তাহার অনুমান ঠিকই হইয়াছে, কারণ খেদায় ২০৩টী হাতী পড়িয়াছে। এখন এই আরণ্য উচ্ছৃঙ্খল হাতীগুলি কিরূপে মানবের বশীভূত হয়, তাহাই বর্ণনীয়। একটী বন্য হস্তীর বন্ধন কার্য্যে ২টী ফুন্‌কী হাতীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

শিক্ষিত ফুন্‌কী হাতীর উপরে উঠিয়া সাহসী শীকারিগণ খেদায় প্রবেশ করে এবং উহাদের সাহায্যে চতুরতার সহিত বন্য হস্তীর পায়ে শিকল বান্ধিয়া দেয়। ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ ও আমোদজনক ব্যাপার। বারান্তরে আমরা উহা যথাশক্তি বিবৃত করিব।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

সাগর।

পুরাণের মতে জল হইতে জগতের উদ্ভব ও কল্পান্তে প্রলয়-পয়োধিজলে জগতের পর্য্যবসান। প্রতীচ্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইহার কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের মতে জলে সৃষ্টি ও অগ্নিতে জগতের বিলোপ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—আমাদের জগৎ আদৌ বাষ্পময় (বর্ত্তমান সূর্য্যবৎ) ছিল। কারণ জল যৌগিক পদার্থ, এজন্য সৃষ্টির বহুপরে ইহার অস্তিত্ব সম্ভব। সমগ্র জগৎ যখন বাষ্পময় ছিল, তখন হয়ত কোন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াবশে অম্লজান ও উদজান বাষ্প মিশ্রিত হইয়া জলের উৎপত্তি হইয়াছে। বাষ্পময় অবস্থার পর জগতের জলীয় তরল অবস্থা, তদনন্তর কঠিন অবস্থা। ইহার বিরুদ্ধ মতও আছে। সে যাহাই হউক, জল হইতে যে জগতের উদ্ভব তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত। বৈজ্ঞানিক মতের পোষকগণ বলেন যে পৃথিবীর জলময় তনু ক্রমশ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এই জন্যই পৃথিবীতে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক, এবং কালক্রমে জল কমিয়া কমিয়া স্থলভাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; এবং এমনও হইতে পারে যে, কালে পৃথিবী জলশূন্য মরুতে পরিণত হইবে। আমাদের প্রতিবেসী চন্দ্রলোকে অতীতের সমুদ্র, হ্রদ ও নদী সকলের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তথায় জল বা তৎসম কোন পদার্থ আছে এরূপ কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। পৃথিবীরও অবস্থা হয় ত' তদ্রূপই হইবে। কিন্তু সেই জন্য পৃথিবীর বর্ত্তমান অধিবাসী বা

তাহাদের বংশপ্রদীপগণের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। তরল পৃথিবী কঠিন হইতে যে সময় লাগিয়াছে, বর্ত্তমান পৃথিবীর জলশূন্য হইতে যে তদপেক্ষা অধিক সময়ের আবশ্যক তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ এখনো স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অনেক অধিক। এবং ততদিন যে কি হইবে তাহা এক্ষণে কে অনুমান করিতে পারে?

জল জীব ও উদ্ভিদ জগতের জীবন স্বরূপ। এজন্য জলের অপর নাম জীবন। জল দুই প্রকার মিষ্ট ও লোণা। জগতে শেষোক্তের পরিমাণই অধিক এবং সাধারণত তাহাকে সাগর বলা হয়।

সাগর—সাগরই পৃথিবীর সমস্ত জলের সরবরাহকর্ত্তা পৃথিবীতে যত প্রকার জল আছে সকলেই সাগরের নিকট ঋণী বা সকলের মধ্যেই সাগর বিদ্যমান আছে। প্রোজ্জ্বল শিশির কণাও সাগর, বর্ষার প্রচুর বর্ষণও সাগর। সাগর হইতে সমস্ত জল উদ্ভূত এবং তাহাতেই তাহাদের পরিসমাপ্তি। সাগর আছে বলিয়া আমরা আছি। শ্যামল দূর্ব্বা, সুন্দর ফুল, ছায়াশীল বৃক্ষ, জীবনোপায় হরিৎ শস্য ক্ষেত্র, সকলই সেই সাগর আছে বলিয়া। হিমাচলের গৌরব-কিরীট তুষার রাশিও সাগরের কল্যাণে। সাগর হইতে যে পরিমাণ জল প্রত্যহ বাষ্পে পরিণত হয় তাহাই আমাদের ও নদী-নির্ঝরিণী প্রভৃতিকে প্রকৃতিস্থ রাখিয়াছে।

সাগর অনন্তের প্রতিকৃতি। যে ব্যক্তি তমাল-তাল-বনরাজি নীললবণাম্বুরাশি সমুদ্রবেলায় দাড়াইয়া প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আত্মহারা হইয়াছে, সেই অনন্তের একটু আভাস পাইয়াছে। দিগন্তবিসারী নীলজল, তাহাতেই সূর্য্যের উদয় ও বিলয়। সেই সৌম্য সুন্দর গম্ভীর শোভা বিশ্বনায়কের সৌন্দর্য্যের এক কণা। "তাহার শোভা বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে"। এ হেন সমুদ্রের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলিবার চেষ্টা করিব।

১৮৪৫ সালে লণ্ডনের royal Geographical Society সমুদ্রকে প্রধানত পাঁচভাগে বিভাগ করেন। তৎপূর্ব্বে সমুদ্রসকলের কোন একটা সীমা বা বিশেষ নাম ছিল না। এক্ষণে ঐ পঞ্চ সংজ্ঞা বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রেরও সুপরিচিত হইয়াছে।

সমুদ্র চিরকাল একরূপ অবস্থায় থাকে না। কোথাও বা গ্রাস করে, কোথাও স্থলের সৃষ্টি করে। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের মতে আধুনিক বঙ্গ দেশের নিম্নাংশ কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সাগর তরঙ্গিত ছিল, সমুদ্র সরিয়া যাওয়াতে ক্রমশ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া বাস যোগ্য হইতেছে। 'পলি' জমিয়া স্থল উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রবাল প্রভৃতির কীটের দেহাবশেষ হইতেও সমুদ্রে অনেক দ্বীপের উদ্ভব হইয়া থাকে। আবার অন্যপক্ষে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুমান এই যে আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী ম্যাডাগাস্কার ও ভারতোপকূল-সন্নিহিত লঙ্কাদ্বীপ কোনও সময়ে এক অখণ্ড ভূখণ্ড ছিল। Carl rither, Sir Emerson Tennant, Sclater, এবং Dr. Hooker প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভূবিদ্যাবিশারদগণ উক্ত উভয় দ্বীপ ও তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকলের একই প্রকার বানর ও পশুজাতি এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা নবাবিষ্কৃত "বৃক্ষ ফোসিল" সকল দেখিয়া অনুমান করেন যে ঐ মহাদেশে যে প্রকাণ্ড অরণ্যানী ছিল তাহাই প্রস্তরীভূত হইয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ আরো অনেক প্রদেশের যুক্তত্বের প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

সাগর সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে সাধারণ জল সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। এজন্য সংক্ষেপে সে গুলি বলিয়া ক্রমশ সাগর সমীপে উপনীত হইব।

জলে বায়ু—জলের মধ্যেও বায়ু আছে, এবং এই জন্যই জলাভ্যন্তরে প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণ ধারণ সম্ভব হইয়াছে। জল আগুনে ফুটাইলে তাহা হইতে বাতাস বাহির হইয়া যায়। সেই জল শীতল হইলে তাহাতে মাছ ছাড়িয়া দিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গতাসু হইয়া যায়। শৈত্য সংযোগে জল জমাইলেও জল বায়ু-হীন হইয়া পড়ে। বায়ু শূন্য জল সহজে জমিতে চাহে না। যে পরিমাণ শৈত্য সংযোগে জল জমে, তদপেক্ষা বায়ুহীন জলের তাপ ১৮° ডিগ্রি কমাইলেও তাহা তরল থাকে, কিন্তু কোনরূপে আলোড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ জমিয়া যায়। সাধারণত দেখা যায় স্বাদুজল ৩২° ও লোনা জল ২৮১/২° ডিগ্রিতে জমিয়া থাকে (Maury)।

জল ও আলোক—কোন অন্ধকার গৃহে কোন ছিদ্র পথে আলোক প্রবেশ করিলে, আমরা সে আলোক দেখিতে পাই না, পরন্তু বায়ুবাহিত ধূলি কণা সকল উক্ত আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া আলোকের পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। কোন উপায়ে গৃহস্থিত বায়ুকে ধূলিবিরহিত করিতে পারিলে সূর্য্যের কিরণ আমরা আর দেখিতে পাইব না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টিণ্ডালের মতে জলেরও বায়ু সদৃশ গুণ আছে। জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে আমরা আলোকের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি না। গভীর পরিশুদ্ধ জলাশয় সম্ভব হইলে তাহার তলদেশ সম্পূর্ণ অন্ধকার হইবে, কেবল জলের উপরিতল (surface) হইতে যে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। অধ্যাপক টিণ্ডাল জল-পূর্ণ বোতলের মধ্য দিয়া বিদ্যুতালোক প্রেরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে আমরা যাহাকে খুব পরিষ্কৃত জল বলিয়া সমাদর করিয়া থাকি তাহাও প্রকৃতপক্ষে পরিশুদ্ধ নহে; সকল জলেই অল্প বিস্তর আবিলতা থাকিবেই। এবং এই জন্যই জলাশয় যত গভীর হউক না কেন, তাহার তলদেশ একেবারে আলোকশূন্য হয় না। গভীর সমুদ্র তলেও পাটলবর্ণের অস্পষ্ট আলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ডুবারীগণ সাক্ষ্য দিয়াছে। অধ্যাপক টিণ্ডালের পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জলের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি চালিত হইলে কঠিন দ্রব্য কণা সকল (solid particles) প্রদীপ্ত হইয়া আলোকের পথ দৃষ্টিগোচর করায়, কিন্তু যে সকল দ্রব্য একেবারে গলিয়া জলে মিশিয়া যায় তাহা ঐ উপায়ে জ্ঞাত হওয়া যায় না। প্রাকৃতিক ঝরণা ও বৃষ্টির জল পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় জল অপেক্ষা অনেক গুণে পরিশুদ্ধ।

জলের বর্ণ—বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, জল বর্ণ-হীন। বুনসেনের মতে জলের বর্ণ খাঁটি নীল। Wittstein ও বুনসেনের (Bunsen) মতের পোষক হইয়া দেখাইয়াছেন যে, যে জলে বাহ্য পদার্থ (organic substances) যত অল্প থাকিবে সে জল ততই নীলবর্ণের হইবে। জৈব পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে গাঢ় নীলবর্ণের জল প্রথমতঃ হরিৎবর্ণ ধারণ করে, অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইলে পাটলবর্ণে পরিণত হয়। আকাশাগত জল জমিয়া যাইলেও নীল-বর্ণ ধারণ করে। আল্‌প্‌স্‌ ও আইসল্যাণ্ডের তুষার নদীর (glaciers) বর্ণ গাঢ় নীল, কিন্তু তথাকার অন্যান্য নদী, যাহা ঐ সকল তুষার নদী হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের জলের বর্ণ ঈষৎ হরিতাভ। তাহার কারণ নীলজলে বাহ্য জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ।

সাগর কেন নীল?—কবি ইহার উত্তরে হয়ত বলিবেন—"সে হইতে চাহে প্রিয়ার চোখের মত"। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এ রসপুষ্ট যুক্তিতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন, —জলের স্বাভাবিক বর্ণ নীল, সেই জলের অগাধ অনন্ত বিস্তৃতি, বক্ষে অনন্ত নীলিমার প্রতিচ্ছায়া, এই সকল কারণেই সাগর এত নীল হইয়াছে। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে সাগরে কি তবে জৈব পদার্থ নাই? কেন থাকিবে না। আছে বলিয়াই অনেক সময়

সাগরের রূপান্তর—সাগরের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় জীবাণু সকলের সমবায় হেতু সমুদ্র হরিৎবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। robert Brown, Captain cook, Captain Caste, Captain Kingman প্রভৃতি সমুদ্রযাত্রীগণ বহুবার পরীক্ষা করিয়া উক্ত সত্যের পোষকতা করিয়াছেন। ঐ সকল জীবাণুর জন্য সাগরকে কখন কখন শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেও দেখা যায়। ঐ সকল জীবাণুর শরীর হইতে একরূপ আলোক নির্গত হয়, তাহাতে সমুদ্র মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। ঐ কীটের আলোক এরূপ জ্যোতিষ্মান যে Von Bibra একটি কীটের আলোকে, ঐ কীটেরই বিষয় একটি জীববিদ্যা বিষয়ক পুস্তক হইতে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কীট বিষয়ে অনভিজ্ঞ সমুদ্র যাত্রীদিগের অনেক কৌতুকাবহ ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। অন্ধকার ঘরে সমুদ্রজল ধৌত দ্রব্য থাকিলে তাহা জ্বলিতে থাকে, অসভ্যযাত্রী ভৌতিককাণ্ড মনে করিয়া ভীত হয়। আমোদপ্রিয় নাবিকগণ ঐ জলে হাতমুখ ধুইয়া অন্ধকারে দাড়াইয়া অনভিজ্ঞকে ভয় দেখাইয়া আমোদ উপভোগ করে। অনেক সময় মেঘের বর্ণ প্রতিফলিত করিয়াও সমুদ্র রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।

জলের সমতলতা।—জলের একটি গুণ যে সর্ব্বত্রই সমতলভাবে (even surface) থাকিবার চেষ্টা করিবে, কখনও উচ্চনীচ হইবে না। কয়েকটা ভিন্নাকারের পাত্রে জল রাখিয়া নলদ্বারা সংযুক্ত করিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, সকল পাত্রের জলের উচ্চতা সমান হইয়া গিয়াছে। এক গামলা জল একটা উচ্চ স্থানে রাখিয়া তাহার তলদেশে নল সংযুক্ত করিয়া নলটিকে ইংরাজি U অক্ষরের মত করিয়া ধরিলে, উভয় দুই বাহুর জল সমান উচ্চতা পাইবার চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে একটি বাহু অপরটি অপেক্ষা ছোট করিয়া ধরিলে ছোটবাহু হইতে জল বড়বাহুর জলের সমান হইবার চেষ্টা করিয়া একটি ফোয়ারার সৃষ্টি করে।

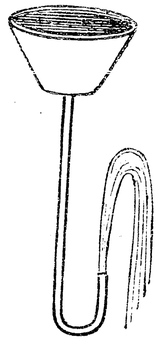

সময় সকলও বৃহৎ জলপাত্র, নানাপথে পরস্পর সংযুক্ত; অতএব তাহাদের মধ্যেও সমতা থাকা উচিত। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে কোন কোন সমুদ্রজলের পরস্পর উচ্চতার অষ্ট ফুট পর্য্যন্ত তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পানামা যোজকের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যোজক) উভয় পৃষ্ঠের সমুদ্রের জলতল ১৮২৮-২৯ সালে Bolivar এর আদেশক্রমে পরিমাপ করা হয়, এবং তাহাতে উভয় সমুদ্রজলের উচ্চতার পার্থক্য ১,৫ গজ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহাও স্থির হইয়াছে যে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশের অন্তর্গত Callas নগরের নিকটে তটসন্নিহিত সমুদ্র ৩০০ বা ৪০০ শত মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্র হইতে ১৫৫ গজ উচ্চ, অর্থাৎ সমুদ্র জল ঢালু হইয়া গিয়াছে। এ সকল অবশ্য জলের প্রকৃতি-বিরোধী। কিন্তু ইহার মধ্যে ঈশ্বরের গুপ্ত উদ্দেশ্য ও কৌশল নিহিত রহিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ৩০০ বা ৪০০ শত মাইল দূর সমুদ্রতল হইতে ১৫৫ গজ উচ্চ; সমুদ্র জল যদি তাহার প্রকৃতি রক্ষা করিত তবে সমুদ্রতল হইতে কূল ১৫৫ গজ উচ্চ হইয়া পড়িত। তাহাতে মানুষের ক্লেশ হইতে পারে, এজন্য ঐ মহাদেশের বিপুল আকর্ষণে সমুদ্রজল স্ফীত হইয়া এক বিরাট ঢালু সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্য্যের আকর্ষণ ভিন্ন বায়ুর চাপের ন্যূনাধিক্য বশে এবং পৃথিবীর গোলত্বের জন্যও সমুদ্র জলের সমতলত্বে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তাহা সেই বিশাল জলধির পক্ষে এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। জলের গোলত্ব প্রমাণ করিয়া অনেক সময় পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে জাহাজের তিরোধান ভিন্ন আর একটি সহজ প্রমাণ দেওয়া হয়। একটি বড় পুষ্করিণীর এক পাড়ে জলের ধারে একটি ছোট কাঠি পুঁতিয়া অপর পাড় হইতে জলতলের সহিত দৃষ্টি চালনা করিলে কাঠিটি দেখা যায় না। তাহার কারণ পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ জল পৃথিবীর সহিত গোল হইয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত

জন্মায়। কিন্তু ক্ষুদ্র পুষ্করিণী সম্বন্ধে উক্ত অনুমান ঠিক কিনা বিবেচনা সাপেক্ষ। আমার বোধ হয় দুই পার্শ্ব হইতে দুই পাড়ের চাপে মধ্যস্থল ফুলিয়া উঠে (resultant)।

সাগর জল—সাগর জলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাসায়ণিক দ্রব্য (chemical elements) বিদ্যমান আছে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময় ছিল, পরে জলময়, তৎপরে কঠিনতনু হইয়াছে। বাষ্পময় যত গুলি ভূত (element) ছিল, তন্মধ্যে অম্লজান ও উদজান মিশিয়া জল হয়, এবং সেই জলোদরে অন্যান্য যাবতীয় ভূতই বিদ্যমান ছিল, তৎপরে জল ও জলস্থ তাবৎ ভূতসকলের পরস্পর সংযোগ (permutation and combination) দ্বারা যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং সকল সৃষ্ট পদার্থকেই ত্বরায় বা বিলম্বে কোন না কোন উপায়ে সাগরে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। Forschammer বারংবার রাসায়ণিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্রজলে নিজস্ব অংশ ভিন্ন ২৭টি ভূত বিদ্যমান থাকিতে সচরাচর দেখা যায়। তন্মধ্যে রৌপ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া তাঁহার অনুমান। রৌপ্যের পরিমাণও একরূপ স্থির করা হইয়াছে। একখানি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরে বহুদিন নিমজ্জিত ছিল। যখন সেই জাহাজ

তোলা হইল তখন দেখা গেল যে জাহাজের তাম্রাবরণের উপর রৌপ্য লাগিয়া আছে। ইহা হইতে অনুপাত করিয়া সমগ্র সমুদ্রে প্রায় ৬০০০০০০০০০০ মণ রৌপ্য আছে স্থির করা হইয়াছে। যদি উক্ত অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে সমুদ্র "রত্নাকর" ভিন্ন বৃহৎ "রৌপ্যাকর" সংজ্ঞা পাইবার অধিকারী। তাহার রজতভাণ্ডারের নিকট পৃথিবীর বৃহৎ রজতখনি সকলও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমুদ্রগত স্বর্ণ রৌপ্য তাহার কুক্ষিগত মণি মুক্তার মত সহজলভ্য নহে। উহা লাভ করিবার ব্যয় লভ্য দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে, নচেৎ মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিত না।

সাগর জলে লবণ—লবণ সাগরের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী। লবণ তাহার বিশেষণ বা ভূষণ। সাগর জলে লবণ কেন এবং কোথা হইতে আইসে তাহার আজিও অকাট্য মীমাংসা হয় নাই। যাহা অনুমিত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি।

অনেকে অনুমান করেন যে নদীসকল স্থল হইতে লবণ বহন করিয়া আনিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে, এবং সমুদ্রের তলদেশ হইতেও লবণ উত্থিত হইতেছে; এবং ইহাতেই সমুদ্রজল লোণা হইয়াছে ও হইতেছে। উক্ত অনুমান সম্পূর্ণ সত্য নহে। সত্য বটে নদীসকল অবিরত সাগরোদ্দেশে লবণকণিকা সকল উপঢৌকন প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর নদীজল যে সাগর জলের তুলনায় কিছুই নহে। Halley ও Buffon এই মতের প্রধান পোষক। তাঁহারাই গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীর যাবতীয় নদীসকল বৎসরে ১০০০ ঘন মাইল জল সমুদ্রে আনিয়া ঢালিতেছে। সমস্ত সমুদ্রজলের পরিমাণ ৬০০০০০০০০ ছয় কোটি ঘন মাইল। তাঁহারা গণনার খাতিরে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে সমস্ত সমুদ্রগুলি জলহীন হইলে তাহাদিগকে নদীজলে পূর্ণ করিতে ৬০,০০০ হাজার বৎসর লাগে। তখনকার সেই অবস্থা হইতে সমুদ্রের বর্ত্তমান লবণাক্ত অবস্থায় আসিতে হইলে কত বৎসরের আবশ্যক। সমুদ্রের লবণের একটা পরিমাণ স্থির হইয়াছে। Maury বলেন সমুদ্রের লবণ একত্র করিলে আল্প্‌স্ পর্ব্বতের পাঁচগুণ বা হিমালয়ের এক তৃতীয়াংশ হয়। অর্থাৎ ৯০০ ঘন মাইল হইবে, এ বিরাট অনুমান সাধারণ নহে। বিবেচনা করিয়া অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে একশত ভাগ জলে ৩ ভাগ (Maury বলেন ৩॥০ ভাগ) লবণ আছে। এক্ষণে যদি নদীজলে লবণের পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায় তাহা হইলে সমুদ্র, এমন কি পৃথিবীরও একটা বয়সের হিসাব পাওয়া যাইবে। J. Munshul, Dr Herman, J. Klien এবং dr. Thome প্রভৃতি জর্ম্মন বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বোদ্ধৃত মতবাদীগণের ব্যাতুল চেষ্টা দেখিয়া বলিয়াছেন, সমুদ্রের ন্যায় নদীজলের লবণের পরিমাণ স্থির করা সাধারণ নহে। তাঁহাদের মতে নদীজলে লবণ আছে বলিয়া সমুদ্র লবণাক্ত হয় নাই, অপরন্তু সমুদ্র লবণ আছে বলিয়াই নদীজলে একটু লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী যখন বাষ্পময় ছিল তখন যখন ও লবণস্বাদ দ্রব্য সকলও বাষ্পীয়াকারে ছিল। পরে যে সকল (লবণ, muriate of potash প্রভৃতি) জলের সহিত মিশিয়া সাগরকে লোণা করিয়া রাখিয়াছে। জল হইতে স্থলের উৎপত্তি; এই জন্যই আমরা এখনও ভূগর্ভে ও শৈলসকলে লবণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। সমুদ্র হইতে বহু দূরবর্ত্তী লবণ হ্রদ সকলও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। সমুদ্র সরিয়া গিয়া স্থলের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু নিম্ন ভূমিতে যে সাগরজল জমিয়া রহিয়াছে তাহাই লবণ হ্রদরূপে আজিও বিদ্যমান আছে। নদীসকলও সমুদ্রের লবণত্বের কারণ নহে তৎসম্বন্ধে আরো কয়েকটী যুক্তি আমরা দিতে পারি। নদীমুখ সন্নিহিত সাগরজল অপেক্ষা দূর সমুদ্রের জল অধিক লোণা। উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদী এত জল বহন করিয়া সমুদ্রে ঢালিয়া দিতেছে যে উপকূল হইতে ১।৩ মাইলের সমুদ্রজল লোণা নহে। যে সকল সাগরে অধিক নদী যাইয়া পড়ে নাই, সে সকলের জল অত্যধিক লোণা হয়। লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের জলে হাজার ভাগে ৪৬ ভাগ লবণ এবং Dead sea তে শতকরা ২৪ ভাগ লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রজলের লবণত্বের আরো আরো দুইটি কারণ আছে—(১) শৈত্য সংযোগে সাগরের জল জমিয়া যাওয়া এবং (২) তাপ সংযোগে সমুদ্র জলের বাষ্প-পরিণতি। লবণাক্ত জল জমিবার সময় বা বাষ্প হইবার সময় লবণটুকুকে পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে বাধ্য

হয়। এই জন্য বৃষ্টিজল, নদীজল, তুষার প্রভৃতি সাগরজল সম্ভূত হইলেও তাহাতে লবণ পাওয়া যায় না। এবং ঐ জন্যই সমুদ্রজল উত্তরোত্তর অধিক লোণা হইতেছে,—নদীজল লবণ যোগ করিতেছে বলিয়া নহে। যে সকল প্রদেশে অধিক বাষ্প বা বরফ হয় সে সকল প্রদেশের সমুদ্রজল অধিক লোণা। কিন্তু মেরু ও বিষুবরেখা সন্নিহিত সাগর জল অধিক লোণা নহে। ইহার কারণ মেরুপ্রদেশে তুষারগলা স্বাদু জলের মিশ্রণ, ও বিষুবরেখায় প্রচুর বৃষ্টিপাত। মেরু ও বিষুবরেখায় সাগর জলের অধিক লোণা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানেও ঈশ্বরের কৌশলে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইতে হয়। ডারউইন বলেন, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ সমুদ্রে প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর সমুদ্রতল সম্পূর্ণ লবণহীন দেখিয়াছেন। আর্ক্টিক সমুদ্রেও স্থানে স্থানে লবণহীন জল পাওয়া যায়। সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে স্বাদুজলের উৎস উৎসারিত হইতেও দেখা যায়; বোধ হয় সমুদ্র জলের তলেই মাটি ফুঁড়িয়া উহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সকল গুলিই অনুমান। ইহাতে কবিস্বপ্নস্বপ্নই পাঠক হয় ত' সন্তুষ্ট নাও হইতে পারেন। তবে শেষে ইংরাজ কবির অনুকরণে বলিবেন—সাগর, প্রিয়ার অশ্রু জলের জ্ঞাতি হইবার স্পর্দ্ধা রাখে বলিয়া লবণাক্ত হইয়াছে।

সমুদ্রজল হইতে লবণ আহরণ—লবণাম্বু সাগরই প্রধানতঃ আমাদের আহার্য্য লবণের সরবরাহকর্ত্তা। সমুদ্র রত্নাকর বলিয়া 'অধিগম্য' হইলেও বিপদসঙ্কুল বলিয়া অগম্য। কিন্তু লবণ আহরণে কোন বিপৎপাতের ভয় নাই। লবণ সংগ্রহ প্রণালী অতি সহজ। একটি সমুদ্রকূলবর্ত্তী চাটালো জমি বাঁধ দ্বারা ঘিরিয়া একটু ফাঁক রাখা হয়; সেই ফাঁক দিয়া জোয়ারের জল বাঁধের মধ্যে প্রবেশ করিলে বাঁধের ফাঁকটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে সূর্য্যতাপে জল শুকাইয়া গেলে লবণের চাটা সকল খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া ব্যবহারযোগ্য করা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে স্পেন ও পোর্টুগাল হইতে অনেক পরিমাণ লবণ আমদানি করিতে হয়, কারণ ইংলণ্ডের সূর্য্যতাপ তত প্রখর নহে। কিন্তু প্রখর "সূর্য্যকরোজ্জ্বল" ভারতকে এক কণিকা লবণের জন্য পরমুখাপেক্ষী ইংলণ্ডেরই মুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ইহা অপেক্ষা বিধি বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে।

সাগরের গতি—সাগরের যে গতি আছে তাহা সকলেই জানেন। এই গতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) তরঙ্গ, (২) স্রোত (Surface drift), (৩) জোয়ার। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন সমুদ্র খুব শান্ত, স্তব্ধ ভাবে থাকে তখনও তাহাতে ছোট ছোট তরঙ্গের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। বাতাসের সহিত সমুদ্র জলের সংঘর্ষ হেতু তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাতাস প্রায় সর্ব্বদাই সঞ্চরমান; একবার আহত হইয়া ক্ষুব্ধ হইলে সমুদ্র শীঘ্র শান্ত হইতে চাহে না; তার পর যদি বাতাস একটু জোর বহিতে আরম্ভ করে তবে ত' আর কথাই নাই; উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিকে গ্রাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া বসে। ঐ সকল তরঙ্গাভিঘাত ছুটিয়া গিয়া নির্ব্বাত প্রদেশকেও সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গাকুল করিয়া তুলে। এই জন্যই আমরা সমুদ্রকে কদাচিৎ প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত ও তটাঘাতের শব্দই আমরা দূর হইতে গর্জ্জনবৎ শুনিয়া থাকি। নাবিকগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, প্রবল ঝটিকা কালেও ৩০।৩২ হাতের অধিক উচ্চ তরঙ্গ হয় না; পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গভঙ্গ কবি-কল্পনা মাত্র। Dumot d' Urville বলেন যে তিনি ৭০।৭২ হাত উচ্চ তরঙ্গও দেখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা কেহ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নাই। তরঙ্গ সকলের উচ্চতা ও পরস্পর দূরত্বের মধ্যে একটা বিশিষ্ট ক্রম আছে। অত্যুচ্চ তরঙ্গসকলের পরস্পরের মধ্যে উচ্চতার ১।১২ অংশ ব্যবধান থাকে। অতএব ৪।৫ হাত ব্যবধানের তরঙ্গ সকলের উচ্চতা হইবে ৫০।৬০ হাত। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, সাধারণতঃ তরঙ্গ সকল একের পর অন্য, অন্যের পর আর কত ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া তটভূমে আছাড়িয়া পড়ে। তাহাদের ক্ষিপ্রগতিরও একটা সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধারণ বাত্যাঘাতে তরঙ্গ ঘণ্টায় ১৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে, ঝটিকার বেগানুসারে তাহার গতিরও বৃদ্ধি হয়। প্রবল ঝটিকার সময় তরঙ্গ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল যাইয়া থাকে এরূপ অনুমিত হইয়াছে। Ross ৮৫ মাইল বলিতে

চাহেন, কিন্তু তাঁহার কথা সর্ব্বগ্রাহ্য হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঝটিকাতাড়িত-তরঙ্গ ২৩ দিনের মধ্যে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতে পারে। বায়ু ভিন্ন তরঙ্গের আর একটি কারণ ভূমিকম্প। প্রসিদ্ধ লিসবনের ভূমিকম্পের সময় (১৭৫৫ খ্রীঃ) সমুদ্র জল ৫০ ফুট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। (২) কিন্তু যখন সমুদ্রের উপরিভাগে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত ও স্রোত চলিতে থাকে, তখনও ৮০।৯০ ফুট নিম্নে সমুদ্রজল প্রশান্ত ও স্তব্ধ থাকে। এজন্য ডুবারিগণ প্রচণ্ড ঝটিকা কালেও সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে ভীত হন না। সমুদ্রের যত স্রোত, উপরে উপরেই চলে, গভীর জলে বড় একটা উদ্বেলতা দেখা যায় না; এজন্য ইংরাজিতে সাগর-স্রোতকে (Surface drift) বলে, এই স্রোত বায়ু তাড়না, তাপের ন্যূনাধিক্য, ও লবণাংশের তারতম্য হেতু ঘটিয়া থাকে। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে একটি উদাহরণ দিলাম। একটি পাত্রে গরম বা লোনা-জল ও অপর পাত্রে ঠাণ্ডা বা স্বাদুজল পূর্ণ করিয়া রাখ।

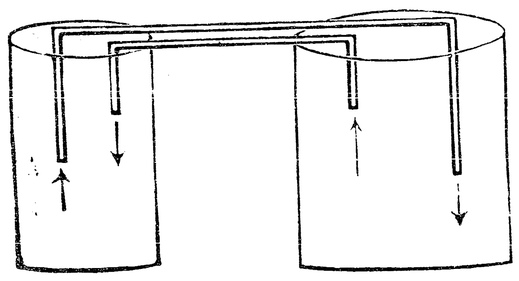

তৎপরে দুইটি বক্র নল (Syphon) জলপূর্ণ করিয়া উভয় পাত্রস্থ জলকে পরস্পর সংযুক্ত কর। একটি নলের বক্রভাগ অন্যটির অপেক্ষা ছোট হওয়া আবশ্যক। এবং বড় নলটিতে ভারিজল (ঠাণ্ডা বা লবণ মিশ্রিত) পূর্ণ করা আবশ্যক। এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে উভয় পাত্রের মধ্যে স্রোত চিহ্নিতরূপে চলিতে থাকিবে। এক পাত্রের জল যদি কোন বর্ণ রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ স্রোত সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে।

(৩) তরঙ্গ ও স্রোত ভিন্ন দিবসে দুইবার সমুদ্রের জলবৃদ্ধি বা জোয়ার হয়। সমুদ্র যে 'চন্দ্র দর্শনাকাঙ্ক্ষী' হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে তাহা সংস্কৃত ও গ্রীক পণ্ডিতগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু গালিলিও ও কেপ্‌লারের সময় হইতেই রীতিমত বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা আরম্ভ হয়।

একবার জোয়ার হইয়া ভাঁটা সম্পূর্ণ হইতে ১২ ঘণ্টা ২৪ মি ২২॥০ সেকেণ্ড সময় লাগে। দিনে দুইবার হইতে ২১ ঘ ৪৮ মি ৪৫ সে, সময় লাগিয়া থাকে। চন্দ্রের কোন স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতেও ঠিক ঐ সময়ের আবশ্যক। পরদিনে পূর্ব্বদিনের যাত্রাস্থানে আসিতে ৪৯ মিনিট অধিক সময় লাগে, এই জন্যই জোয়ার প্রত্যহ ৪৯ মিনিট করিয়া পিছাইয়া পড়ে। জোয়ারও সকল দিন সমান তেজে হয় না, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার পরদিন খুব তেজে জলোচ্ছ্বাস ঘটিয়া থাকে, চলিত ভাষায় তাহার নাম বান ডাকা; আবার ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে জোয়ারের তেজ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ হয়। ইহার মধ্যেও আবার পূর্ণিমার 'কোটাল' অপেক্ষা অমাবস্যার 'কোটাল' বেশী বলবান। এ সকলের কারণ নিউটনের পরে যথার্থরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। নিউটনোদ্ভাবিত নিয়ম—প্রত্যেক পদার্থ স্বাকার ও দূরত্বানুসারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে—জোয়ার ভাঁটার সহিত বিশিষ্টভাবে ঘনিষ্ঠ। এক্ষণে উহাদের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ক খ গ ঘ পৃথিবী ও প তাহার কেন্দ্র; পৃথিবী চ ছ জল সমুদ্রদ্বারা আবৃত (বোধ সৌকর্য্যার্থে ইহা অনুমিত হইল): ১ সূর্য্য ও ১ চন্দ্র পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত ঠিক সমসূত্রে অবস্থিত; ২ চন্দ্র ও ২ সূর্য্য পৃথক স্থানে অবস্থিত কিন্তু উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত সমসূত্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে কেবল ১ চন্দ্রকে লইয়া জোয়ারের কারণ বুঝা যাউক।

সমুদ্রের চ স্থান চন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, এবং ছ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। চন্দ্রের আকর্ষণে চ স্থানে ও ছ স্থানে (Antipodal tide) যুগপৎ জোয়ার হইয়া থাকে। নিউটনের নিয়মমতে দূরত্ব অনুসারে আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে; এ কারণে চ স্থানের জল আকৃষ্ট হইয়া ঙ স্থানে উঠিবে। এ দিকে আবার চন্দ্র পৃথিবীর গ

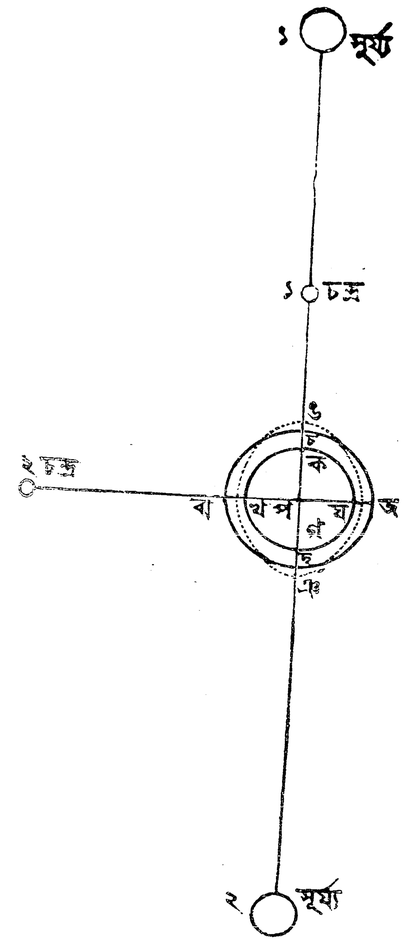

স্থানকে সমুদ্রের ছ স্থান অপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিতেছে, কারণ গ, ছ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। এজন্য গ স্থান সমস্ত পৃথিবীর সহিত চন্দ্রাভিমুখে সরিয়া যায় এবং তৎফলে ছ স্থানে জল ঞ পর্য্যন্ত স্ফীত হইয়া জোয়ার হয়। যখন ঙ ও ঞতে জল ফাঁপিয়া উঠিল তখন জ ও ঝ স্থানের জলকে বাধ্য হইয়া কমিয়া ভাঁটার সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং এই জলোচ্ছ্বাস চন্দ্রের গতির সহিত ১ হইতে ২ স্থান ইত্যাদি ক্রমে ঘুরিয়া পর্য্যায়ক্রমে সকল স্থানে জোয়ারের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সূর্য্য, চন্দ্র অপেক্ষা ১৮০ গুণ অধিক বলে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণে জলোচ্ছ্বাস ঘটিলে সমস্ত পৃথিবী একেবারে জলমগ্ন হইয়া যাইত। এজন্য জগদীশ্বর এখানেও এক অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে চন্দ্রের জলাকর্ষণীশক্তি দ্বিগুণ অধিক করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের উভয়ের শক্তির যে বিয়োগফল তাহা দ্বারাই পৃথিবীস্থ জল আকৃষ্ট হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র যখন পৃথিবীর এক পৃষ্ঠে সমসূত্রে অবস্থিত হয়। (যথা ১ সূর্য্য ও ১ চন্দ্র) তখন জোয়ারের তেজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু যখন পরস্পর বিপরীত ভাবে (১ চন্দ্র ও ২ সূর্য্য) সমসূত্রে থাকে তখন জোয়ারের তাদৃশ তেজ হয় না। অমাবস্যার সময় চন্দ্র সূর্য্য প্রথমাবস্থায় ও পূর্ণিমার সময় দ্বিতীয়াবস্থায় থাকে। জলকে চন্দ্রদেব আকর্ষণ করিলেই সে সুবুদ্ধি বঙ্গবাসীর মত বিনা ওজর আপত্তিতে অগ্রসর হয় না। প্রত্যেক বস্তুরই (বাঙ্গালিরও?) একটা ব্যক্তিত্ব (individuality) ও আত্মরক্ষার চেষ্টা আছে। সেই গুণ বশতঃ জল সহজে চন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না, অনেক পীড়াপীড়িতে বেচারাকে বাধ্য হইতে হয়। এজন্য সূর্য্য ও চন্দ্রের সমসূত্র হইবার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পরে (অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথিতে) সমুদ্রে জোয়ার হইয়া থাকে। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা সমস্ত ভূপৃষ্ঠটাই জলাবৃত বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম। বাস্তবিক ত আর তাহা নহে। স্থল বেষ্টন বদ্ধ বলিয়াও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে অনেক বাধা ঘটিয়া থাকে। এই সকল কারণের সমবায়ে এক স্থানে পরস্পর বিরোধী ২।৩টি স্রোতেরও অস্তিত্ব নাবিকগণ অনুভব করিয়া থাকেন। এবং তাহারই ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আবর্ত্ত—অনেকের ধারণা আছে যে স্রোত সমতলে প্রবাহিত হইতে হইতে যদি কোন নিম্ন প্রদেশে অবতীর্ণ হয়, তবেই আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী প্রভৃতিতে ইহা সত্য হইলেও জলধির পক্ষে ইহা প্রযুজ্য নহে। সমুদ্রতল প্রায়ই অসমতল অথচ সমুদ্রের সকল স্থানেই আবর্ত্ত দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমুদ্রের গভীর জলে স্রোত নাই, এজন্য স্রোত নিম্নস্থানে অবতরণ করিয়া আবর্ত্তেরও সৃষ্টি করে না। আবার যে স্থানে সমুদ্রতল অসমান নহে সে স্থানেও আবর্ত্ত দেখা গিয়া থাকে। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিপরীত গতিশীল দুই বা ততোধিক স্রোত (surface

drift) একত্রিত হইয়া তাহাদের ফলে (resultant) আবর্ত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবর্ত্ত সকলের শক্তিরও তিথি ও জোয়ার ভাঁটা অনুসারে তারতম্য ঘটে।

সমুদ্রের অগাধতা—অল্পদিন পূর্ব্বেও সমুদ্র অগাধ বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের জ্বালায় বরুণদেবের prestige কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে তিনি পার্থিব রাজাদের মত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন কিনা, ঠিক জানা যায় নাই। Lacaille সর্ব্ব প্রথম সমুদ্রের অগাধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করেন। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, সমুদ্রের গভীরতা গড়পড়তা ৫৪৬ গজ। Laplace তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। Humboidt গড়ে ২১৮৭ গজ বলিয়া অনুমান করেন; এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Young জোয়ারের তরঙ্গ প্রভৃতি হইতে গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে সমুদ্র কোনও স্থানে ৫৪৬০ গজের অধিক নহে। কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ পরিমাপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া উক্ত অনুমান সকল খণ্ডিত হইয়াছে। পরিমাপ যন্ত্র মধ্যে Brooke's Sounding Lead ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। উহা দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে সমুদ্রজল গড়ে ৩ মাইলের ন্যূন গভীর হইবে না, এবং ৫ মাইলের অধিক গভীরতা কোথাও নাই। কেবল সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের একস্থান ৯৩০৯ গজ গভীর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরই পৃথিবী পৃষ্ঠস্থ বৃহত্তম ও গভীরতম সাগর।

সমুদ্রতল—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে সমুদ্রতল আমাদের স্থল ভাগের মতই অসমান। সমুদ্র গর্ভেও পাহাড় পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, খানা ডোবার অভাব নাই। সেখানে জীব ও উদ্ভিদেরও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহারা স্থলচর অপেক্ষা যে ভিন্ন প্রকৃতির তাহাতে আর সন্দেহ নাই। Dredge নামক একরূপ টানা জাল প্রস্তুত করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ গভীরতম সমুদ্রের মৃত্তিকা, জীব ও উদ্ভিদ উপরে উত্তোলন করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা অভিনব তথ্য সকল সংগ্রহ করিতেছেন। সমুদ্রের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরেরই তলদেশ সর্ব্বাপেক্ষা সমতল।

বারিধি যেরূপ বিশাল, তাহার তথ্য সকলও তদ্রূপ জটিল ও অসাধ্যায়ত্ত। সমুদ্র সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও প্রবন্ধের অতিদীর্ঘত্বের ভয়ে প্রধানতঃ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাহার নিকট হইতে সসম্ভ্রমে বিদায় লইলাম।

শ্রীচারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মাষ্টমী।

(১)

"উঠ, উঠ, স্বর্গের দ্বার আর বন্ধ করিয়া রাখিয়া ফল কি? জীবের যাতনা দূর হউক; সংসার সুখের সোহাগে পূর্ণ হউক। সকলেই তোমার জয় ঘোষণা করুক।" অদ্য জন্মাষ্টমী। নিশীথ কাল। মেঘের উপর মেঘ চড়িয়া উল্‌টাইয়া—পাল্‌টাইয়া—পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া—হুড়্‌মুড়্‌, গুড়্‌গুড়্‌ শব্দে দলবদ্ধ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় আকাশে ছুটিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণাষ্টমীর সেই ঘন গভীর নিবিড় ছায়া ভাগীরথীর সুগভীর জলরাশির উপর পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন শত শত দৈত্যদানবের তাণ্ডব নর্ত্তন প্রকাশ করিতেছে। তাই বুঝি সুরতরঙ্গিণী অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া দুকূল ভাসাইবার ভয় দেখাইতেছেন। গঙ্গার ধারে ধারে দূরে—নিকটে তীরস্থ তরুরাজিকে আলোড়িত করিয়া প্রবল বাতাস বহিতেছে; মেঘমালার প্রচণ্ড নির্ঘোষকে প্রতিধ্বনিত করিয়া যেন তাহা নদীবক্ষে এক একটা ছোট খাট প্রলয়ের সূচনা করিবার উদ্যোগ করিতেছে। এ সময়ে কাহার সাধ্য ঘরের বাহিরে যায়! কিন্তু ওকি, সুখচরের ঐ বাঁধা ঘাটে, সোপান শ্রেণীর সলিলগ্রস্থ ধাপে বসিয়া ও কে বালিকা? ও কি দেবী, না মানবী? না কোন দেবযোনি? জলে সুন্দর পা দুখানি রাখিয়া ঘাটের ধাপে বসিয়া আছে এবং দুই হাতে একটী পুতুল ধরিয়া গঙ্গাজলে স্নান করাইতেছে। বালিকার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ছোট সাঝিতে কতকগুলি কৃষ্ণকলি ও মল্লিকা ফুল। বালিকা সেই ক্ষুদ্র পুত্তলিকে স্নাপিত করিয়া নিজের অঞ্চল দিয়া মুছাইল; তাহার পর সাঝির পাশে বসাইয়া এক একটী ফুল লইয়া তাহার মাথায় চাপাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উন্মত্ত জলদ দলের প্রচণ্ডতা বাড়িতে লাগিল; বজ্রনির্ঘোষ মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া বিশ্ব কাঁপাইয়া যোজন হইতে যোজনান্তরে ছুটিতে লাগিল। প্রকৃতি যেন ভীত ও চকিত। দৈত্যদানবের এই ভীষণ মহাসময়ের ভূভার হরণ করিবার জন্যই কি আজি ভগবান্ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন? কিন্তু বালিকার তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই!

ফুলের উপরে ফুল তদুপরি ফুল চাপাইয়া বালিকা পুতুলটীকে আকণ্ঠ আচ্ছাদিত করিল। সেটী একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি। কৃষ্ণের কেবল সেই ভ্রূবিলাস ললিত হাস্যোৎফুল্ল মুখটী বাহির হইয়া রহিল; তদুপরি শিখিপুচ্ছশোভিত চূড়াটী প্রবল পবন স্পর্শে ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। একটা বিকট ঝট্‌কা উঠিয়া বালিকার ফুলের সাঝিটী উড়াইয়া লইল; সাঝি নিঃমুখে ফুল উদ্‌গার করিতে করিতে কোন্নগরের দিকে উড়িয়া গেল। বালিকার সিক্ত পরিধেয় বসন চট পট শব্দে পতাকার মত উড়িতে লাগিল। তাহার সুন্দর মুখখানি মুহুর্মুহুঃ ঢাকা পড়িতে লাগিল; কিন্তু বালিকা তাহাতে কিছুমাত্রও বিপর্য্যস্ত হইল না। সে দুই হাতে সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি দৃঢ়রূপে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া ঘাট হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দিগন্ত কাঁপাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করিয়া চারি দিক হইতে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। শত শত বজ্রনিক্ষেপ যেন এক সঙ্গে হইল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল। ঘাটের উপরিস্থিত বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের একটী প্রকাণ্ড শাখা মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কৃষ্ণ পুত্তলি হঠাৎ বালিকার হস্তচ্যুত হইয়া গঙ্গাজলে পতিত হইল। বেগিমান লহরীমালা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! বালিকা সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় জলে পড়িল। প্রকৃতির বিকট হাস্য যেন তাহাতে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। স্বর্ণলতার ন্যায় বালিকার সেই সুন্দর ক্ষুদ্রদেহ মুহূর্ত্তের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া কে যেন উচ্চকণ্ঠে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সেই প্রকৃতির প্রলয় লীলায় কে তাহা শুনিতে আসিবে?

(২)

শ্রীরামপুরে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাস। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয়,—শূদ্রযাজক; কতকগুলি ধনকুবের তিলি ও তাম্বুলী তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। তাহাদের কল্যাণে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। দ্বিতল প্রকাণ্ড অট্টালিকা; বাহিরে পাঁচ পুকুরে পূজার দালান; নীচে উপরে বৈঠকখানা;—চক্‌মিলান। বেশ চুন্‌কাম করা,—চক্‌চকে—ঝক্‌ঝকে। শিষ্যালয় হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শালিয়ানা প্রায় দুই হাজার টাকা আয়। তাহার উপর নিজের একটী তেজারতী আছে। টাকায় আনা সুদ ধরিলে তাঁহার পক্ষে গালি হয়। এই কামধেনুর কারবারেও তাঁহার মন্দ আয় নহে। কলের যত কুলি ও তিয়র পাড়ার বিস্তর জেলে তাঁহার খাতক। সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভাব কি? তাঁহার একমাত্র পুত্র;—নাম জানকীনাথ। জানকীনাথ ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী;—তিনি মনোবিজ্ঞানে এম, এ পাশ করিয়াছেন। সোণায় সোহাগা। জানকীনাথের বড়ই কদর ও আদর। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে। কালমাহাত্ম্যে কৌলিন্য আজিকালি কালের কবলে কবলিত হইয়াছে। আজি কড়ির মায়ায় বুড়োর বিয়ে! এক সময়ে একটী কন্যা সংগ্রহ করিতে হইলে যাহাদিগকে অনেক সময় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত; আজি অর্থের কল্যাণে তাহারা কুলীন শ্রেষ্ঠ। অনেক বাড়ুরী, মুখুটী কন্যা লইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতে আইসে। তাহার উপর আবার ছেলে এম, এ, পাশকরা সুতরাং তাহার বিবাহের জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই। সুখচরের সয়ারাম মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুর সন্তান;—স্বয়ং, স্বকৃতভঙ্গের পুত্র। সর্ব্বসমেত ষোলটী সংসার। পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের এক একটীকে লইয়া ছয়মাস করিয়া ঘর করেন; তাহার পর তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া অপর সীমন্তিনীর সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ও সুলেখক। দায়ে পড়িয়া লোকের জাতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে এই ষোলকলায় পূর্ণ শশধর করিয়া গিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু সকলেরই সমান মান বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ষোল সংসারের মধ্যে কেবল সাতটী কন্যা। তাহাদের সকলের মধ্যে সরযূ সর্ব্ব কনিষ্ঠা। সরযূ সকলেরই বিশেষ আদরের পাত্রী। কি বিমাতা, কি বৈমাত্রেয় ভগিনীগণ সকলেই সরযূকে বড়ই ভালবাসে।

তাহার উপর সরযূ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গলায় গাথা। তিনি সরযূকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। সরযূও মাতার অপেক্ষা পিতার অনুগত। পিতার কাছে সর্ব্বদা থাকাতে সে পিতৃগত প্রাণা হইয়াছিল। মাকে ছমাস ছমাস না দেখিলে সে অনায়াসে থাকিতে পারিত; কিন্তু পিতার অদর্শনে একদিনও শ্বাস ছড়িতে পারিত না। সেই জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি নিকটেই সরযূর বিবাহ দিয়াছেন। শ্রীরামপুরের ঐ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তীর নাম শুনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার হস্তে সরযূকে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কুলধ্বংশ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু অপত্যস্নেহের ঐকান্তিক প্রাবল্য বশতঃ তিনি আত্মনাশে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। অপর ছয়টী কন্যাকে উপযুক্ত কুলিনের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সরযূ যে একটী ধনবানের পুত্র, এম, এ পাশকরা পাত্রের হাতে পড়িয়াছে,—বিশেষতঃ সরযূর যে খুব নিকটে বিবাহ হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার কৃতার্থতা পরিপূর্ণ হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর পর দিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় নীচের বৈঠকখানায় বসিয়া পরাণে জেলের সঙ্গে সুদের হিসাব করিতেছেনে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী বাড়ীর ভিতর হইতে ত্রস্তভাবে আসিয়া বিহ্বল স্বরে বলিলেন,—"খালি টাকা টাকা করিয়াই মরিবে আর ত কোন খবরই রাখ না।"

অকাল জলদোদয়ে—বিশেষতঃ অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘাড়ম্বর দর্শনে প্রমাদ গণিলেন;—জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, হয়েছে কি? তোমার মুখ আজ অমন কেন?"

"হয়েছে আর কি, সোণার প্রতিমা আমার জলে ডুবেছে", বলিয়া গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। "বউ মা কাল জলে ডুবে মরেছেন।" "বল কি? বল কি"? চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বেগতিক দেখিয়া পরাণে জেলে প্রস্থান করিল। তখন কর্ত্তাগিন্নি মুখোমুখী করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আহা অমন বউ কি আর হয়।

এমন সময়ে শ্রীমান্ জানকীনাথ বাউসাই ধূম্রপান করিতে করিতে অনঙ্গমোহন নবদুর্ব্বাদল শ্যামরূপে সেই রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। পিতামাতাকে একত্র রোদন করিতে দেখিয়া তিনি একটু চমকিত হইলেন। আজ দুই দিন তিনি বাটী হইতে অনুপস্থিত। কলিকাতায় কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া বারবিলাসিনী সহবাসে দুই রাত্রি যাপন করিয়া আসিয়াছেন। ভ্রমর-কৃষ্ণ মুখপদ্মে তখনও মকরন্দের অল্প অল্প গন্ধ বাহির হইতেছিল। জনক জননীকে একত্র রোদন করিতে দেখিয়া কি একটা গুরুতর ভাব তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল।

"What is life but bubbles on the ocean of Eternity!"

"Shake off! Shake off! Awake! Arise"—

জানকীনাথ গদ্‌গদভাবে বলিয়া রঙ্গভূমির অভিনেতার ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দণ্ডায়মান হইলেন।

"আমরা এখন লেখাপড়া শিখিয়াছি। ওসব egoistic feelings আমাদের আর নাই। কারণ আমরা contagion of feelingএর অনেক দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।"

পুত্রের ঐরূপ দার্শনিক গবেষণা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভ্যস্ত ছিল কেন না জানকীনাথ ego ও অহংজ্ঞান লইয়া পিতাকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই লেক্‌চার ঝাড়িয়া থাকেন। সুতরাং বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু জননী একটু সামর্ষে বলিলেন, "বাবা! কোন খবরই রাখ না;—বউমা কাল জলে ডুবে গেছেন।"

"Pity! Pity! কিন্তু আমরা reciprocity of sympathy দূর করিয়াছি। Now we are above the promptigs of pity commiseration." বলিতে বলিতে জানকীনাথ স্খলিতচরণে উপরের বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ দম্পতি শোক সভাভঙ্গ করিয়া অন্তপুরে চলিলেন।

(৩)

সরযূ কে? জন্মাষ্টমীর সেই কাল নিশায় যে জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা গঙ্গাজলে ডুবিয়াছিল, সয়ারাম মুখোপাধ্যায়ের স্নেহের পুত্তলি, সংসারের আলোক, সুখচরের আনন্দমন্দাকিনী সেই সরযূ কে, পাঠক এইবার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সরযূ জলে ডুবিয়াছিল, কিন্তু মরে নাই। সুখচরের সেই বাঁধা ঘাটে প্রায়ই আট দশখানি করিয়া জেলেদের নৌকা বাঁধা থাকে। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে

প্রকৃতির সেই প্রচণ্ড-প্রলয় লীলাভিনয় কালে সরযূ জলমগ্ন হইবামাত্র সেই যে কে একজন অস্ফুট হাহারব করিয়াছিল; সেই সরযূর উদ্ধার কর্ত্তা। তাহার নাম শিবদাস। লোকে তাহাকে 'শিবে শিবে' বলিয়া ডাকে। শিবদাস জাতিতে সদ্‌গোপ। সে সয়ারাম মুখোপাধ্যায়ের ভৃত্য। সরযূ তাহার কোলে খেলিত। সে সরযূকে মা ভিন্ন আর কিছুই বলিত না। কখনও নাম ধরিয়া ডাকে নাই। সরযূর জন্মকালে শিবদাস স্বপ্নে দেখিয়াছিল যেন লক্ষ্মী আসিয়া তাহার সাক্ষাতে বলিতেছেন,"শিবু! এই আমি এই বাড়ীতে আসিলাম। এইবার তোর দুঃখ দূর হইবে।" বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল, শিবদাসের একটী উৎকৃষ্ট শ্যামলা গাভী ছয়মাস অবধি নিরুদ্দেশ। সরযূর জন্মরাত্রে সেই গাভী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরযূর উপর শিবদাসের সেই জন্য বড়ই ভক্তি হইয়াছিল। সরযূ শৈশবাবধিই একটু দেবভক্ত। যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন হইতে সে প্রায় সর্ব্বদাই গঙ্গাতীরে আসিয়া ঘাটের উপর বসিয়া থাকিত। কি দেখিত, তাহা লোকে বুঝিতে পারিত না। সকলে মনে করিত, মেয়ে গঙ্গার লহরীলীলা দেখিতেছে। বাস্তবিক ভাগীরথীর অনন্ত তরঙ্গভঙ্গীর উপর সরযূর চক্ষু পড়িয়া থাকিত বটে, কিন্তু সে কেবল অনন্তেরই কথা ভাবিত। অনন্ত কি, তাহা সে কিছুই জানিত না; কিন্তু কি ভাবিত, অনেক সময় সে নিজেই বুঝিতে পারিত না। "এত জল কোথায় যায়? ইহার কি শেষ নাই।" এই অবিরাম কুলু কুলু ধ্বনি,—সরযূ ভাবিত কোথা হইতে আইসে? কেন আইসে। বৃষ্টি না হইলে পুকুর শুকাইয়া যায়, গঙ্গায় ভাঁটা পড়িলে তাহাদের পাতকুয়ার জল কমিয়া যায়, কিন্তু গঙ্গার জল কখনও শুকায় না কেন? কেবল ঐ অবিরাম কুলু কুলু, কুলু কুলু! সরযূ পিতাকে কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। পিতা বলিয়াছেন "পাহাড়ে অবিরত বরফ গলিয়া জল হইতেছে; তাই গঙ্গার জল কখনও শুকায় না।" সরযূ তাহাতে সন্তুষ্ট হইত না। সে বলিত, "বরফ শুকায় না কেন?" এইরূপে অনন্তের একটা অস্ফুট ধারণা মনোমধ্যে অতি শৈশব হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল আজি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণাও দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। পিতার নিকট অনন্তের ব্রত কথা শুনিয়া, অনন্তদেব সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বুঝিয়াছে অনন্ত দেব সেই বিষ্ণু। যিনি রামরূপে রাবণকে বধ করিয়াছেন, কৃষ্ণরূপে কংস জরাসন্ধ শিশুপালকে সংহার করিয়াছেন, তিনিই অনন্ত। তাঁহার আদি নাই অন্ত নাই, তাঁহার মধ্য নাই। তিনিই অনাদি অনন্ত বিভু। সেইজন্য বিষ্ণুর মূর্ত্তিমাত্রেই সরযূর পূজার সামগ্রী। সরযূ বৈশাখ মাসে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে ও তুলসীতলায় জল সেচন করে; আর প্রণাম করিয়া এই বর চায়, "যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থান পাই।" পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সরযূর অনন্ত সম্বন্ধে অস্ফুট ধারণা হইয়াছে; সাত বৎসর বয়স হইতে সে শিবপূজা করিয়া আসিতেছে। অষ্টম বর্ষে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বিবাহ দিয়া গৌরীদান করিয়াছেন। নবম বৎসর হইতে সরযূ জন্মাষ্টমী ও অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রত পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজি তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। এখন সরযূ যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু যৌবন সুলভ সে চাপল্য বা প্রগল্‌ভতা কিছুই তাহার নাই। সে যেন কৈশোরেই বর্ষীয়সী। মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লোকে বলে "আপনার সরযূ অল্প বয়সেই বেশ গিন্নি বান্নি হয়েছে।" মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তাহাতে আনন্দের সীমা থাকে না। সরযূর একটা স্বভাব—দিন নাই, রাত্র নাই, যখন মনে হইত, তখনই সেই বাধা ঘাটে আসিয়া বসিত। তাহার পিতা মাতা জানিত, শিবদাস ও জানিত। কিন্তু কেহ তাহাতে বাধা দিত না। সে দিন অষ্টমী রাত্রে সরযূ ফুলের সাঝি ও ঠাকুর লইয়া যখন ঘাটে আসিল, শিবদাসের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। সে যেন মাতৃহীন হইবে,—তাহার এইরূপ একটা ধারণা হইল। সেইজন্য শিবদাস সরযূর পেছু পেছু আসিয়া সেই অশ্বত্থতলায় দাঁড়াইল। তাহার পর সরযূ জলে পড়িবামাত্র সেইখানকার একখানি নৌকা নিমেষমধ্যে খুলিয়া দিয়া সরযূর অনুসরণ করিল এবং অল্প দূর যাইয়াই তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল। তুফানে সরযূর দেহ জলমগ্ন হয় নাই; একবার ডুবিয়াই আবার তখনই ভাসিয়া উঠিয়াছিল। শিবদাস ভাবিয়াছিল, এ কথা প্রকাশ করিব না, করিলে তাহার মায়ের নিন্দা হইবে। কিন্তু কি সূত্রে রজনী প্রভাত হইতে না হইতেই সুখচরের সর্ব্বত্র সেই কথার প্রচার হইয়া পড়িল শিবদাস তাহা বুঝিতে পারিল না

(৪)

সেই সেদিন সরযূর জলমগ্ন হইবার সংবাদ শ্রীরামপুরে পৌঁহুছিবামাত্র তাঁহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী সেইরূপে কিছুক্ষণ দুঃখখেদ করিয়া তখনই সুখচরে লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। গৃহিণী বলিলেন "লোক কেন? তুমি নিজে যাও; যদি সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। যদি না হইয়া থাকে, তবে কালই তুমি নিজে বউমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। যদি তাঁহারা ভাদ্রমাসে পাঠাইতে না চান, তবে আশ্বিন মাসের দোসরাই যেন পাঠাইয়া দেন। ইহার অন্যথা করিও না।"

গৃহিণীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেই দিনই সুখচরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সরযূ পিতার কাছে বসিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতেছে। বুদ্ধিমান চক্রবর্ত্তী সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে যত্ন করিয়া বসাইলেন। সরযূ ঘোমটা টানিয়া সেস্থান হইতে উঠিয়া গেল। শিবু আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল, পা ধুইবার জল আনিল। সরযূর মা আসিয়া জলখাবারের আয়োজন করিয়া দিলেন। পরস্পরের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে তামাকুর সোহাগ করিতে লাগিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "আর কিছুই নয়, তোমার বেহান্ একবার বৌমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। আজ আমার সঙ্গে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কি, এই ভাদ্রমাসে? যদি একান্তই লইয়া যান তবে দোসরা আশ্বিন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর কোন আপত্তি করিলেন না। সরযূ আশ্বিনমাসের দ্বিতীয় দিবস শ্বশুরালয়ে আসিলেন। শরৎকালে দেবীর আগমনে মর্ত্ত্যধাম যেমন আলোড়িত হয়, সরযূর আগমনে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তঃপুর যেন কি অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সকলেই আনন্দিত হইল, কিন্তু শ্রীমান্ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, বাবাজীবনের মনে আনন্দও নাই, বিষাদও নাই। একদিন দুইদিন করিয়া ক্রমে এক পক্ষ হইল সরযূ আসিয়াছে, কিন্তু আজিও তাহার স্বামিসন্দর্শন ঘটে নাই। জানকীনাথ সপ্তাহের মধ্যে পাঁচদিন এখানে ওখানে নানা ব্যপদেশে নিশাযাপন করিয়া বেড়ান, অবশিষ্ট দুই রাত্রি বাহিরের বৈঠকখানায় কতকগুলি নরপিশাচ লইয়া নৈশ বারুণী-বিলাসে অতিবাহিত করেন; সরযূর কথা একবার ভাবিয়াও দেখেন না। জানকীনাথের মা প্রত্যহ ছেলেকে বাটীতে থাকিতে বলেন; কিন্তু গুণধর পুত্র তাহাতে কোন উক্তি না করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়েন।

সরযূর এখানেও সেই শিবপূজা;—সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা। এইরূপ একমাস অতীত হইলে একদিন সরযূ স্বীয় শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিলেন একটী অদ্ভুত জীব খাটের উপর শয়ান রহিয়াছে। সরযূ তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল; অমনি তাহার পদধূলি লইবার উপক্রম করিল; কিন্তু তাহার বিলোল দৃষ্টি, বিভ্রান্ত ভাব ও বিকট অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া তাহার ভয় হইল। সরযূ ভাবিল বুঝি তাহার স্বামীর কোন পীড়া হইয়া থাকিবে। সরযূকে পাশে দেখিয়া জানকীনাথ ভাবিলেন বুঝি হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা আসিয়াছে, তাই তাহাকে পদাঘাত করিয়া প্লুত স্বরে বলিলেন,

"Angels and ministers of grace, Defendus—"

প্রচণ্ড পাদতাড়নে সরযূ শয্যা হইতে নিম্নে পতিত হইল। তাহার মাথায় দারুণ আঘাত লাগিল। কিন্তু সে ব্যথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া সে স্বামীর জন্য চিন্তিত হইল। স্বামীকে সে, কাল রোগে ধরিয়াছে, তাহা সরযূ তখন বুঝিতে পারিল না; কিন্তু কিছুদিন পরেই সমস্ত বুঝিল;—বুঝিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইল। সরযূ জানে স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা; সেই স্বামী কদর্য্য হইলেও তাঁহাকে অনিন্দ্য সুন্দর ভাবিতে হয়। দেবভক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা সরযূর হৃদয়ে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়াছে। সরযূ জানে স্বামিসেবার কাছে রমণীর আর কোন ধর্ম্ম নাই; কারণ স্বামী বিষ্ণুস্বরূপ। সেই প্রত্যক্ষ দেবতার চরণ সেবা করিবে, ইহা সরযূর একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু

ভাগ্য দোষে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিতেছে না; সেই জন্য সরযূ দিন দিন বড়ই বিষণ্ণ হইতে লাগিল। তিন চারি মাস পরে একদিন সরযূ শিবপূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে জানকীনাথ আসিয়া দেখা দিলেন। তাহার প্রাণের ভিতর তখন কোনরূপ বিভ্রম বিলাস ছিল কি না, তাহা প্রকাশ পাইল না। সরযূ ভাবিল আজি শিবপূজা শেষ না হইতেই শিবের দেখা পাইলাম; ইহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? সে তখন নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিল। ধ্যান সমাপ্ত হইলে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দেখিল পূজার উপকরণ সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; এবং শিবস্বরূপ স্বামী আঘাত করিবার ছলে স্বীয় দক্ষিণ চরণ উদ্যত করিতেছেন, সরযূ তখনই বুঝিতে পারিল যে, সেই পবিত্র চরণকমল-সংস্পর্শেই বিল্ব পুষ্পাদির সেই বিচিত্র সংস্কার হইয়াছে। এখনও ভগবানের লিঙ্গমূর্ত্তির দেখা ঘটে নাই; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কি হইবে, তাহা কে জানে? সরযূ কাতরভাবে সেই উদ্যত চরণ দুই হাতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "প্রাণাধিক! কি করিলে! ভগবানের মাথায় পদাঘাত! তাহা অপেক্ষা এই চরণ আমার মস্তকে দাও? আমার সদ্গতি হউক।" বলিতে বলিতে সরযূ স্বামীর সেই উদ্যত বঙ্কিম চরণ নিজের মাথায় ধরিল। কিন্তু সুসভ্য সুশিক্ষিত জানকীনাথ সরযূর হাত হইতে পা ছিনাইয়া লইয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "অসভ্য মূর্খ স্ত্রীলোক! তোমার মস্তকস্পর্শে এ চরণ কলঙ্কিত করিতে চাহি না। ইহা তোমার এই আরাধ্য দেবতারই উপযুক্ত।" তখনই সেই সুকুমার পদস্পর্শে মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি চূর্ণ হইল। সরযূ নীরবে রোদন করিতে লাগিল। স্বামীর এই কলঙ্কের কথা সে শ্বশুর শাশুড়ী কিম্বা অপর কাহাকেও জানিতে দিল না। সেদিন তাহার আর শিবপূজা হইল না। সমস্ত দিন কিছু আহার করিল না। সংসারের নিয়মিত কর্ত্তব্য সমূহের উপযুক্ত সংসাধন করিয়া "অসুখ হইয়াছে" বলিয়া শয়ন করিল। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহারা আসিয়া তাহাকে কিছু খাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সরযূ সেদিন কিছুই স্পর্শ করিল না। সেই মহনীয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের পর তাহার গুণধর স্বামী এক সপ্তাহ আর তাহাকে দেখা দিল না। সাত দিন পরে, একদা রাত্রিকালে সরযূ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী খাটের উপর বসিয়া আছেন; তাঁহার মুখমণ্ডল বড়ই বিষণ্ণ। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সরযূ স্বামীর পার্শ্বে যাইয়া বসিল;—বসিয়া ধীর মৃদু কণ্ঠে বলিল, আজ আমার একি সৌভাগ্য! আর যে তোমার দেখা পাইব, কখনও এমন ভাবি নাই। কিন্তু একি, আজ এত বিমর্ষ কেন?"

আজ আর অধিক উপাসনা করিতে হইল না; অল্পেই জানকীনাথের ফুল পড়িল। তিনি সাদরে সরযূর বাম হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "সরযূ! আমি বড় নরাধম; বিবাহ করিয়া অবধি একদিনের জন্যও আমি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করি নাই।—কিন্তু আমি আজি বড়ই বিপন্ন।"

ব্যাকুলভাবে সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বিপদ? আমার প্রাণ দিলেও যদি তাহা দূর করিতে পারি, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। কি হইয়াছে বল।"

জানকীনাথের যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি সপ্রেম সুকোমল ভাবে সরলা বনিতার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "আমি দেনার দায়ে জেলে যাইতেছি। তিন শত টাকার জন্য এই বিপদ।"

কিসের দেনা, কি জন্য দেনা, কাহার কাছে দেনা, সরযূ সে কথা ভাবিয়া দেখিল না। স্বামীর বিপদ; স্বামী জেলে যাইবেন—সামান্য টাকার জন্য; এই চিন্তাই তখন তাহার মনোমধ্যে অবিরত দংশন করিতে লাগিল। তখনই সরযূ হাতের দুইগাছি বালা ও দুইগাছি অনন্ত খুলিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "প্রাণাধিক! তোমার ধন, তুমি লইয়া যাও। এখনই বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ কর।" জানকীনাথ যেন কৃতার্থ হইলেন। অলঙ্কার লইয়া নিমেষ মধ্যে প্রস্থান করিলেন; কোথায় গেলেন—কি করিলেন, সরযূ তাহা জানিতে পারিল না। কিন্তু আমরা জানি তিনি কলিকাতায় কোন অভাগিনীর মনস্তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত তাহার পাদপদ্মে তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সরযূ ভাবিয়াছিল, অলঙ্কার পাইয়া স্বামী সেই রাত্রে ঘরে থাকিবেন; কিন্তু গহনা পাইতে যে বিলম্ব; পর

মুহূর্ত্তেই জানকীনাথ অদৃশ্য হইলেন। সরযূও তাহাকে কিছু বলিল না, বা কোনরূপ বাধা দিল না।

(৫)

বিপদের উপর বিপদ! তাহার উপর বিপদ। বিপদের উপর দারুণ মনস্তাপ! স্বামীর বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে অলঙ্কার দিবার সময় সরযূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কথা একবার ভাবিয়া দেখে নাই। পর দিন প্রত্যূষেই তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে বালা অনন্তের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন; তখন সরযূ কি উত্তর দিবে? কিন্তু তাহার মনে সে প্রশ্ন একবারও উদিত হয় নাই। সংসারের পাকচক্রের কথা সরযূ কিছুই বুঝিত না।

পরদিন প্রাতঃকালে সরযূ শয্যা ত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র শ্বাশুড়ী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বউ মা! বালা অনন্ত খুলিয়া রাখিয়াছ কেন?" সরযূ চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্রী তাহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "যাও, যাও, আগে পরিয়া আইস।" তথাপি সরযূ উত্তর করিল না। তখন কর্ত্রী স্বয়ং তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শয্যা আলোড়িত করিলেন, কিন্তু অলঙ্কার দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বিস্ময় বাড়িল। তিনি জানিতেন তাঁহার গুণধর পুত্র গত রাত্রে ঘরে ছিলেন; তবে কি তিনিই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছেন? কর্ত্রী আসিয়া সরযূকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও সরযূ নীরব রহিল। কর্ত্রী যাইয়া সেই কথা কর্ত্তাকে বলিলেন। উভয়ে বিস্তর গবেষণা হইল; অবশেষে স্থির হইল, বধূ অলঙ্কার গোপনে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছে; জানকীনাথ তেমন বদমায়েস নহেন। এইবার সকল দোষ সরযূর উপর পড়িল। কর্ত্তাগিন্নি বালিকাকে অবিরত বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তথাপি সরযূ স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথাই বলিল না।

এইরূপে ক্রমেই দিন যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সরযূর বিপদ ও যন্ত্রণা দিন দিন দ্বিগুণিত হইতে আরম্ভ করিল। জানকীনাথের পিতামাতা তাঁহাকে একবার বধূর অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যবাদী পুত্র কোন কথাই স্বীকার করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের সন্দেহ বাড়িল; তাঁহারা সরযূকে সর্ব্বদাই বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্য্যাতনের নানা যন্ত্রও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে সরলা বালিকার তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি?

(৬)

সব ফুরায়। ধন, জন, যৌবন কালে সকলই ফুরায়। ঐশ্বর্য্য, মর্য্যাদর, পদগৌরব সময়ে সমুদায়ই ফুরাইয়া যায়। সকলই ফুরায়; কিন্তু ফুরায় না কেবল—আশা। যাহার স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সকলই চলিয়া গিয়াছে, ধন সম্পত্তি সমস্তই ফুরাইয়াছে, জীবন দগ্ধ মরুশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার তখনও আশা থাকে। যে মুমূর্ষু, ভীষণ যমদণ্ড প্রতিমুহূর্ত্তে যাহার মস্তকোপরি উদ্যত, আত্মীয় স্বজন যাহার জীবনাশা ছাড়িয়া দিয়াছে; সে কিন্তু নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি, সবই ফুরায় কিন্তু আশা ফুরায় না। আজি সরযূর কি তাহাই হইল? সরযূর যাতনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। স্বামীর নিষ্ঠুরতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। শ্বশ্রূ অবশেষে প্রকৃত বাঘিনী হইয়া দাঁড়াইলেন: শ্বশুর কংশের প্রতিনিধি হইলেন। অনশনে—অনিদ্রায়—অত্যাচারের অশেষ মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহ্য করিয়াও সরযূ পিতাকে কোন কথা জানায় নাই;—পিতা যতবার লইতে আসিয়াছিলেন, শ্বশুর শ্বাশুড়ী পাঠাইতে সম্মত হইলেও সরযূ সুখচরে যায় নাই। তাহার সকল আশা ফুরাইয়াছে; কেবল এই একমাত্র ভরসা আছে যে, স্বামী একদিন তাহাকে সরযূ বলিয়া ডাকিবে, একবার তাহাকে যত্ন আদর সোহাগ করিবে। কিন্তু ক্রমে সে আশাও ফুরাইয়া আসিল। এ জীবনে সরযূ একবার ক্ষণকালের জন্যও স্বামীর ভালবাসা, যত্ন, আদর, আপ্যায়ন—কিছুই পাইল না। তবে আর কি সুখে এ পাপ সংসারে থাকিবে? তবে আর কাহার মুখ চাহিয়া সকল যাতনা সহ্য করিবে? জানকীনাথ প্রত্যহ বাটীতে আসেন, আহারাদি যথা নিয়মে সমস্তই করেন; কিন্তু সরযূর সহিত একবারও দেখা করেন না। এককালের আদরের পুত্রবধূ আজি যেন বাণের কুটা,—দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণীপাকে যেন আলোড়িত হইতেছে; কেহ তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখে না; কেহ তাহার কোন খোঁজ খবরই রাখে না। একদিনের গৃহলক্ষ্মী যেন আজি কালি অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেন বাটী

হইতে সে বিদায় হইলেই সকলে সুখী হয়। সরযূ তাহা বুঝিল। মানবের ভণ্ডতা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। এ পাপ পৃথিবীতে আর তাহার থাকিবার ইচ্ছা হইল না। কাহার কাছে থাকিবে? সংসারে তাহার সকলই আছে; পতি আছে, পিতা আছে, মাতা আছে, শ্বশুর আছে, শ্বাশুড়ী আছে, পিতার ধন আছে, শ্বশুরের ঐশ্বর্য্য আছে। কিন্তু তাহার এমনই দুর্ভাগ্য যে, সব থাকিয়াও কিছুই নাই। সেই জন্য সরযূ এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। এখন মনে হইতেছে, একবার স্বামীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইবে। একবার তাঁহার চরণে মুখ রাখিয়া জনমের শেষ বিদায় লইবে। তিন বৎসর হইল সরযূ শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। এই তিন বৎসরে সে ত্রিশ বৎসরের বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে; এই তিন বৎসরে সে ত্রিশটী দুঃখময় জীবনের যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। আজি দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে; বিষের বাটী উথলাইবার উপক্রম করিতেছে। তবে আর কেন?

বৎসরান্তে আবার সেই জন্মাষ্টমী আসিয়া দেখা দিল। আজি জীবের যাতনা দূর হইবে; পৃথিবী হইতে দুঃখ শোক বিদায় গ্রহণ করিবে। লোকে সুখী হইবে। কিন্তু সরযূর সুখ কোথায়? ইহ সংসারে সরযূর সুখ নাই,—পরলোকে তাহার সুখ, অনন্ত দেবের অনন্ত সংসারে তাহার অনন্ত সুখ, ভগবানের গোলকধামে তাহার অনন্ত সুখ। সরযূ আজি সেই সুখের জন্য পাপ সংসার ত্যাগ করিবে। জন্মাষ্টমীর গভীর নিশীথে বহির্দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া বাটীর বাহিরে আসিল। ধীরে—ধীরে—ধীরে, পা আর সরে না; মন তীব্র তুরঙ্গের ন্যায় তরস্বী, কিন্তু পা আর সরে না। তখনও আশা একবার প্রাণপতিকে দেখিয়া লয়। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। জানকীনাথ কোথায়?—দূরে কলিকাতায়—কদর্য্য কুস্থানে। কে দেখা দিবে? ধীরে—ধীরে—ধীরে, বন্দী যেমন শৃঙ্খলবদ্ধ পদদ্বয় অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া যায়; স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় হতোদ্যম হইয়া সরযূ সেইরূপ ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটে অবতরণ করিল। সেই নিবিড় জলদ দল সেই ভীম গর্জ্জনে উন্মত্ত ভৈরব বেগে শত শত মদমত্ত মাতঙ্গযূথের ন্যায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। জানি না জগতের কোন্ দিকে কোন্ প্রান্তে কোথায় এক সুখের সংসার আছে, তাহারই অন্বেষণে বুঝি মেঘগণ ধাবমান হইতেছে। মেঘের সে সন্দেহ থাকিতে পারে, সংসার বিরাগী যোগীর সে সন্দেহ থাকিতে পারে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও বরং সে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু সরযূর সে সন্দেহ নাই। সরযূ আশৈশব গঙ্গাকূলে থাকিত; আজীবন গঙ্গা মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিতা, গঙ্গা পতিতপাবনী; গঙ্গা স্বর্গের সোপান। গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভবা—শম্ভুর জটাবিহারিণী। সেই গঙ্গায় স্নান করিতে সকলে জানে না; কিন্তু সরযূ জানে। তাই সরযূ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মন দৃঢ় রাখিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে সেই সুর-তরঙ্গিনীর পবিত্র জলে ডুব দিল;—ডুব দিল, কিন্তু আর উঠিল না!

* * * *

এক বৎসর পরে সেই জন্মাষ্টমীর দিন অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীরামপুরের সেই ঘাটে একটা পুরুষ আসিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল:—

Howl, howl, howl!—O! you
are men of stones:
Had I your tongues and eyes, I'd
mention so
that heaven's vault should
crack."

অনেকে পাগল বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল; অনেকে তাহাকে চিনিতে পারিল। সে—শ্রীযুক্ত জানকী নাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ। অনুতাপের দারুণ দাবদাহে সে পাগল হইয়া গিয়াছে। সেই দিন,—সেই দুর্দ্দিন হইতে সাত বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু সেই বিকট কণ্ঠে সেই বিকট "Howl, howl!" বাক্য আজিও গঙ্গাতীরস্থ অনেক শ্মশানে অনেকে শুনিতে পায়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিতা-গুচ্ছ।

দক্ষিণা।

যবে মহাপ্রেমদান সমাপন করি
হাসিমুখে সুধাইনু "অয়ি হৃদিরাণি,
আরো কিবা চাও? সব দিয়াছিত তুলে
একে একে ওই তব চারু পাদ-মূলে
ভক্ত ভৃত্য মত।" তুমি রোষ নেত্র ভরে
দানের দক্ষিণা কিছু চাহিয়া আমারে
করিলে বিব্রত সখি! বিশ্বামিত্র সম
নির্ম্মম নিষ্ঠুর। বিতরিয়া মন মম
তোমারে দক্ষিণা দিনু মোর 'তৃষা'খানি
পাত হাত, লও তুলে অয়ি মনোরাণি!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ভক্তিবিনোদ।

* * *

প্রদীপ-হস্তা।

বাম করে দীপ ল'য়ে কে তুমি ললনা!
চলিয়াছ আঁধার এ বন-পথ বাহি'?
তব পদ অনুশরি', তোমা পানে চাহি'
চলিয়াছি, আঁখি তব আলোক-লগনা!
জানিনা যেতেছি কোথা কোন্ পথ দিয়া
বিদিত বা অবিদিত। শুধু ওগো প্রিয়া!
রুণু রুণু রুণু রুণু নূপুরের ধ্বনি
মরমের মাঝে মম চলিয়াছি গণি';
নয়নের 'পরে শুধু দীপ-শিখা তব
জ্বলিছে আলোক-তনু আশার মতন।
কোথা মোরে নিতে চাও কোন্ অভিনব
আলোকের দেশে? কণ্টকিত দু'চরণ
চলিতে পারে না আর লতার বাঁধনে,—
কোথা শেষ কোথা শেষ বল গো ললনে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

* * *

দুঃখ।

(১)

চিরসঙ্গী নহ তুমি জানিয়াছি মনে
ছায়া ওগো জীবনের পথে!
আঁধার-বসন পরি' আরোহি' এসেছ
মায়া ওগো অশ্রু-মনোরথে।
মেঘে বজ্রে হুড়াহুড়ি দু'দণ্ডের তরে
দেখিয়াছি কত শত বার
জীবন-গগন-তলে কেন কাঁপে প্রাণ
নেহারিয়া উদয় তোমার?

(২)

গগনে গো ঘন মেঘ অন্তরালে লয়
শুচি শশিরুচি মনোহর
তোমার ও ছায়া কিগো কেবলি আঁধার
পিছে কিছু নাহি কি সুন্দর?
মেঘে বজ্রে আস্ফালন ক্ষণকের তরে
তার পরে বিপুল বর্ষণ
তোমার মেঘের মন্দ্রে শুধু হাহারব
পাছে তার কোথায় মিলন?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

* * *

সৌন্দর্য্য।

কোথা' তুমি ওগো, চিরবাঞ্ছিত, চিরসুন্দর মূরতি!
ক্ষুব্ধ হৃদয়, চির অশান্ত, নাহিক নিমেষ বিরতি।
এনেছি পুষ্প গন্ধমোদিত,
বক্ষ রক্ত চন্দন চিত,
লহ দেবি! লহ অর্ঘ্য চরণে করিগো বারেক আরতি।
(ওগো) চিরসুন্দর মূরতি!

ফুটিলে ইন্দু শারদ-গগনে,
তুমি কিগো দেবি! শুভ্র বসনে,
জ্যোৎস্না মূরতি ধরি' আনমনে খেলাও স্বরগে ভুবনে?
(ওগো) চির চঞ্চল চরণে!

যবে বসন্ত শ্রান্ত গমনে,
নেমে আসে ধীরে মর্ত্ত্য ভবনে,
পাই কিগো তব বসন গন্ধ অন্ধ মলয় পবনে?
(ওগো) স্বপ্ন মোদিত বসনে!

মৃদু মঞ্জুল কুঞ্জ ভবনে,
গুঞ্জন রত ভৃঙ্গবদনে,
শিঞ্জিত তব মঞ্জরী গীতি পশে কিগো দেবি শ্রবণে?
(ওগো) চির অনুমেয় বচনে!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রদীপ।

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায়চৌধুরী।

MOHILA PRESS 56, Parshibagan

৫ম ভাগ। | শ্রাবণ—অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। | ৮—১২ সংখ্যা।

রোমে রাজ-তন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র।

(১)

রোম একদিনে গঠিত হয় নাই। রোমের প্রতিষ্ঠাতা রমিউলস্, কিন্তু সংগঠন ও বিস্তার-কর্ত্তা অনেক, বোধ হয় অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক রোম্যান্। সে যাহা হউক, সেই সকল বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ কিংবা তত্ত্ব অনুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্যের বাহিরে। রোমের আদিম অবস্থার দুই চারিটি কিম্বদন্তির ব্যাখ্যান করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট রহিব।

এস্কালঙ্গার রাজা প্রোকারের দুই পুত্র, নিউমিটর্ ও এমিউলিয়স্। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ নিউমিটর রাজ্যভার গ্রহণ করিলে কনিষ্ঠ এমিউলিয়সের পাত্রদাহের আর অবধি রহিল না। দুর্য্যোগ বুঝিয়া অগ্রজ নিশ্চেষ্ট হইলেন; পিতৃ-সিংহাসনে অনুজ অধিষ্ঠিত হইলেন। এই নশ্বর জীবলোক নিউমিটরের পুত্রপৌত্রাদির বাসস্থানের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা রাজ-প্রসাদেই দিব্যধামে প্রেরিত হইলেন; মর্ত্ত্যভূমে অবস্থানের অবসর পাইলেন কেবল কন্যা রিয়া। তিনিও চিরকৌমার্য্য ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই পিতৃব্যের কুটিল দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তবুও আপদ ঘুচিল না; আবার নিউমিটরের বংশলোপের পথে কণ্টক উপস্থিত, কুমারী রিয়া অন্তঃসত্ত্বা! যথাসময়ে দুইটী জমজ সন্তান প্রসূত হইল। এমিউলিয়সের আদেশ "কুলটা রিয়ার কলঙ্ক-চিহ্ন টাইবার-বক্ষে নিক্ষিপ্ত হউক।" কার শক্তি রাজ-আজ্ঞা প্রতিরোধ করে।

সৌভাগ্যবশতঃ জোয়ারের জলে কূল প্লাবিত থাকিলেও তখন নদে ভাঁটার আরম্ভ হইয়াছিল; শিশু দু'টি এক বৃক্ষতলে ডাঙ্গায় রহিয়া গেল; জল নিম্নে সরিয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে মৃতবৎসা এক ব্যাঘ্রী তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া স্বীয় স্তন-ক্লেশ দূর করিল। তদবধি ব্যাঘ্রী প্রত্যহই তাহাদিগকে স্তনদান করিত। অবশেষে এক মেষপালক সন্তান দুইটাকে কুড়াইয়া লইয়া নিরপত্যা গৃহিণীকে উপহার প্রদান করিল। সেই স্নেহশীলার অবিশ্রান্ত যত্নে রমিউলস্ এবং রিমস্ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বয়োপ্রাপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিপালকের মেষচারণের ভার গ্রহণ করিয়া চারকবৃন্দের নেতৃত্বে ব্রত হইলেন। পালে কখন বাঘ পড়িলে তাঁহারাই রক্ষাকর্ত্তা, গ্রামে কখন ডাকাত আসিলে তাঁহারা দুজনই সকলের অগ্রগামী। বীরত্বে তাঁদের সুযশ গ্রামে গ্রামে প্রসিদ্ধ; দলে দলে ডাকাত ভয়ে ত্রস্ত। ভ্রাতৃযুগলের দেশখ্যাত পৌরষ ও জন্মবৃত্তান্ত রাজসমীপে পৌঁছিতে আর কালবিলম্ব ঘটিল

না। রাজা এমিউলিয়স্ অঙ্কুরেই বিষবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে অচিরে চেষ্টিত হইলেন; চেষ্টা ব্যর্থ হইল। জয়ী রমিউলস্ ও রিস্ মাতামহ নিউমিটরকে এল্বালঙ্গা রাজ্য পুনঃপ্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এখন আর এই রাজ্যমধ্যে অবস্থান অধীনতায় অনভ্যস্ত দৌহিত্রদের মনঃপূত নহে; ভিন্ন একটী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনই ইঁহাদের সঙ্কল্প। সমুদ্রতীর হইতে নয় ক্রোশ দূরে, টাইবার নদের বাম পার্শ্বে, বাল্য-লীলা ক্ষেত্র পেলেটাইন্ পর্ব্বতে সপ্ত-শৃঙ্গ ব্যাপিয়া এক সহর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই ভূমধ্যসাগরতটস্থ সভ্যজগতের ভূতপূর্ব্ব-রাজধানী ইতিহার-প্রসিদ্ধ রোম। রোমের নামকরণ সম্বন্ধে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার নিমিত্ত রমিউলস্ আজও জগতের সমক্ষে ভ্রাতৃহত্যার অপবাদগ্রস্ত। সে যাহা হউক, তাঁহার বাল্যসখা মেষপালকগণ ও এল্বালঙ্গার উদ্বৃত্ত জনসমূহ রোমের অধিবাসী হইলেন, এবং অন্যান্য স্থান হইতেও যথেষ্ট নাগরিক জুটিয়াছিল। পুরুষের সঙ্খ্যা যথেষ্ট হইলেও নারীজাতির অভাবে রোম শীঘ্রই জনহীন হইয়া পড়িবে এই ভাবনায় অস্থির রমিউলস্ পার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহে বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। সেই প্রস্তাব সকলেই সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিল।

আজ রোমে বরুণোৎসব। চতুর্দিকস্থ রাজ্যাদির প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সপরিবারে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; সকলেই স্বীয় স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও দুহিতা কিংবা ভগিনী-দিগকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। বলা বাহুল্য, আহুতগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী, এবং স্ত্রীদলে বৃদ্ধা অথবা বালিকা অপেক্ষা যুবতীর সংখ্যাই প্রবল। মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে আমোদ প্রমোদ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে; সকলেই আহ্লাদে আত্মহারা। অকস্মাৎ সঙ্কেতে আদিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রোম্যান্ যুবক এক একটী কিশোরীকে বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিল। অবস্থায় পড়িয়া বাক্যে প্রতিবাদ ভিন্ন তৎক্ষণাৎ কার্য্যে প্রবল বাধা প্রদান করিতে নিমন্ত্রিতগণ সম্পূর্ণ অক্ষম। যাহা ঘটিবার ঘটিল; কিন্তু সেবাইন্ জাতি প্রতিহিংসা ভুলিল না। আয়োজন উদ্যোগ বাহুল্যরূপে সম্পূর্ণ হইলে রাজা টাইটস্ টেটিয়সের পরিচালনে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত; রমিউলসের সহচরগণ কখনই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অপ্রস্তুত ছিল না। উভয় দলে অস্ত্র-বিনিময় আরম্ভ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে রণ ঘোরতর রূপ ধারণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে বিঘ্নের আশঙ্কিতা, আলু-লায়িত-কেশা, ছিন্নবসনা সেবাইন্ দুহিতা ও ভগিনীগণ,—সম্প্রতি যাহারা রোম্যান্ গৃহিণী ও জননী,—যুদ্ধোন্মত্ত স্বামী এবং পিতা ও ভ্রাতৃগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সকলকেই এই অস্বাভাবিক যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইলেন। উপস্থিত স্থলে বৈরভাবে সম্মিলিত দুই জাতি পরস্পরে মিলিয়া সখ্য-সূত্রে এক হইয়া গেল।

দীর্ঘকাল রাজত্বের পর একদা রমিউলস্ তাঁহার সুসজ্জিত অনুচরদিগকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যরাহুগ্রস্ত এবং বসুন্ধরা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে রমিউলসের জন্মদাতা দেবতামঙ্গল, একখানা জ্যোতির্ম্ময় রথে আবির্ভূত হইয়া—তাঁহাকে সালিঙ্গনে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। রাহুমুক্ত দিবালোকে আর কেহ কখনও তাঁহাকে ভূতলে দেখিতে পায় নাই।

রমিউলসের অন্তর্ধানে দুঃস্থ প্রজাগণ ধর্ম্মপ্রকৃতি নিউমাকে রাজপদে বরণ করিলে এই রাজর্ষির সুশাসনে রাজ্যের দেবক্রিয়াদির সুব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্য প্রভাবে দেবমন্দিরের অচেতন প্রস্তর মূর্ত্তিগুলিও নাকি নিউমার সহিত কথোপকথন করিত!

নিউমার মৃত্যুর পর প্রজাকুলের মনোনয়নে টিউলস্ হষ্টিলিয়স্ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহার শাসন-সময়ে এল্বালঙ্গা বিনষ্ট ও রোমরাজ্যে ভুক্ত হয়। বিবাদের প্রথম সূত্রপাত উভয় রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে। এতাবৎকাল দুই নগরে অত্যন্ত সদ্ভাব ও প্রীতি থাকা সত্বেও বল পরীক্ষা ভিন্ন আর সীমা নির্দ্ধারণের কোনই উপায় রহিল না। দুই পক্ষেই যুদ্ধার্থীগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত; পরস্পরের শত্রুপক্ষে নিজেদের অনেকানেক বন্ধুবান্ধব দেখিয়া সকলেই একটু অর্জ্জুনত্ব প্রাপ্ত হইলেও তখন শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের আর প্রয়োজন হয় নাই। তাহারা নিজেরাই স্থির করিলেন, "মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত রাজা যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা আমরা করিতে বাধ্য; তাহাতে যদি দোষ থাকে, সে দোষ,রাজার ও মন্ত্রীসভার।" এখন সকলেই সংগ্রামে উদ্যত। ইতিমধ্যে দুই দলের

সেনানীগণ সুস্থির করিয়াছেন বৃথা জ্ঞাতিবধের প্রয়োজন নাই, প্রতিপক্ষ হইতে তিন জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, ইহাতে যে পক্ষ পরাভূত, হইবেন তাহারা নিরাপত্যে জেতৃদলের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিবেন। রোমের পক্ষ হইতে হরেসিয়স্ উপাধিক তিন ভাই ও অপর পক্ষ হইতে কিউরেসিয়স্ নামধেয় তিন ভাই সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দূরে দুই পক্ষের সেনা সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। এমন সময়ে এক জন হরেসিয়স্ হত হইলেন, তখনও রোম্যন্‌গণ আশায় বুক বাঁধিয়া আছে। এখন আর একটী হরেসিয়সের লীলা সাঙ্গ হইল; তৃতীয়টীও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে ভুলিলেন না। বিজয়োন্মত্ত তিন ভাই কিউরেসিয়স্ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। রোম্যান্ সৈনিকপুরুষগণ ক্ষোভে জর্জ্জরিত; অবশেষে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। ইত্যবসরে হরে-সিয়সের অনুবর্ত্তী তিন ভাই কিউরেসিয়স্ গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুযোগ পাইয়া আবার হরেসিয়স্ বীর্য্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কিউরেসিয়স্‌গণ তিন সহোদরই একে একে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এল্বালঙ্গা বাহিনীর অধিনায়ক মেটিয়স্ বিনা বাক্যব্যয়ে সসৈন্যে রোম্যান্‌দিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

রোমের বিবাদের আর শেষ নাই! কয়েকদিন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে না হইতেই আবার অন্য এক শত্রু উপস্থিত। এখন রোমের আদেশ অনুসারে মেটিয়স্ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থলে রোমের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কার্য্যকালে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া দৃশ্যপটে অঙ্কিতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অবশেষে রোম্যান্ পক্ষে বিজয়লক্ষ্মীর আবির্ভাব দেখিয়া রোমের যশোগানে তাহার স্বর পঞ্চমে চড়িল। কিন্তু রোম্যান্ জাতি শুদ্ধ মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট হইবার পাত্র নহে। রোমের কোপানলে এল্বালঙ্গার রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্র-কুটীর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। কেবল তাহাই নহে। মেটিয়সের দুই দুইখানা রথের চক্রে সুদৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইলে, রথ দুইখানা বিপরীত দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল; তাহার পুরুষোচিত দেহ দ্বিধা হইয়া গেল। ইহাও তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড কি না, বর্ত্তমান যুগে কে তাহার সদুত্তর প্রদানে সমর্থ।

আর একটী কথা বলা হয় নাই। জেতা হরেসিয়স্ বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ জিত কিউরেসিয়স্‌দের দেহাভরণাদি লুণ্ঠন করিয়া আনন্দ কোলাহলে রোমনগরে প্রবেশ করিলে, পথিমধ্যে তাঁহার ভগিনী লুণ্ঠিত দ্রব্যাভ্যন্তরে একটী আঙ্গরাখা চিনিতে পারিলেন। ইহা তাহারই স্বহস্তে প্রস্তুত এবং বাগ্‌দত্তস্বামী কিউরেসিসকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। জীবনের সকল আশারই শেষ দেখিয়া ভগিনী আর বিলাপ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু দিগ্ব্যাপি আনন্দোৎসবে এই ক্ষীণ বিলাপস্বর বীর হরে-সিয়সের সম্পূর্ণ অসহ্য। বিজয়ীপুরুষের যে অসি উত্তপ্ত বীরশোণিতে পুষ্ট তাহা আর অবশেষে এই অবলার জল-শীতল রক্তপানে সঙ্কুচিত হইল না।

পরবর্ত্তী রাণা এঙ্কাস্ মার্সিয়সের সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার অভাব। ইঁহার রাজত্বকালে টার-কুইনিয়স্ প্রিস্কাস্ নামে এক ক্রোরপতি বণিক রোমে আগমন করেন। তিনি জেনিকিউলম্ পাহাড়ে উপস্থিত হইলে একটী ঈগল পাখী আকাশ হইতে তাহার মস্তকাভরণ কাড়িয়া লইল এবং ক্ষণেক অস্ফুট চিৎকার করিয়া আবার যথাস্থানে স্থাপন করিল। এতদ্‌সম্বন্ধে আবহবিদ্যালঙ্কৃতা সহধর্ম্মিণীর ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্ভর করিয়া তিনি রোমে সর্ব্বোচ্চ সম্মানলাভে সচেষ্ট হইলেন। মনস্কামনা অপূর্ণ থাকিল না। এঙ্কাসের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিয়া তিনিই সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এঙ্কাসের পুত্রগণ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিশোধের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাহাদের উপদেশক্রমে দুইটী রাখাল বালক রাজার দৃষ্টিমধ্যে ঘোরতর কলহের ভান করিল এবং তৎপর রাজা প্রিস্কাসের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলে যখন তিনি নিবিষ্টমনে এক জনের অভিযোগ শ্রবণ করিতেছিলেন তখন অপর জন পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার মস্তকে সাংঘাতিক কুঠারাঘাত করিল। তেজস্বিনী রাণী টেনাকীল্ স্বামীকে অন্দরাভ্যন্তরে অপসারণ করিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং লোকসমাগম নিষেধ করিয়া প্রাসাদ ফটক বন্ধ করিয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরে রাণী

বহির্দ্বারে সমাগত নগরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্বামী ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন; সম্প্রতি তাঁহার আদেশ, যতদিন না তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবেন ততদিন আপনারা সকলে রাজ-জামাতা সার্‌ভিয়সের আজ্ঞাক্রমে নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য সমাধা করিতে থাকুন।" সার্‌ভিয়স্ টিউলিয়স্ দাসীর সন্তান হইলেও যে গুণে তিনি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহারই প্রভাবে রাজ্যে স্বীয় শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিলে প্রকাশ করা হইল, 'রাজা প্রিস্কাস্ আর জীবিত নাই।' এখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্ব্বিয়স্ টিউলিয়স্ই রাজমুকুট পরিধান করিলেন।

কালক্রমে বয়োপ্রাপ্ত লিউসিয়স্ ও এরান্স নামে প্রিস্কাসের দুই পুত্র সার্‌ভিয়সের দুই কন্যার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। লিউসিয়স্ অত্যন্ত উদ্ধত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী; শান্তপ্রকৃতি স্ত্রী তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর দুর্ব্বল স্বভাব এরান্স ও বিলাসা-ভিলাসিনী গর্ব্বিতা স্ত্রী টিউলিয়ার প্রণয়লাভে হতাশ। কিন্তু টিউলিয়া লিউসিয়সের এবং লিউসিয়স্ টিউলিয়ার স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। শীঘ্রই তীক্ষ্ণধার ক্ষুর উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জঞ্জাল অপসারিত করিলে প্রণয়ী-যুগল হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া আপনাদিগের রূপ ও গুণ ধন্য করিলেন। এখন মনোমত স্বামী পাইয়া উৎসাহে টিউলিয়ার আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহারই নিয়ত উত্তেজনায় উত্তেজিত লিউসিয়স্, পিতার সিংহাসনে নিজের দাবী স্থাপনপূর্ব্বক সিনেট্ সমক্ষে দাসীর পুত্র সার্‌ভিয়সের নির্ব্বাসন-প্রার্থী হইয়া, কক্ষে প্রবেশ ও বিতণ্ডায় উদ্যত শ্বশুরকে পদাঘাতে সিনেট গৃহের নিম্নতলে নিক্ষেপ এবং স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তখনই টিউলিয়া আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে রাজোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন অভিবাদন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ইত্যবসরে ভগ্নপদ সার্ব্বিয়স্ হামাগুরি দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে-ছিলেন দেখিয়া লিউসিয়সের জনৈক অনুচর এই অকর্ম্মণ্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ হইতে তাঁর অবিনশ্বর আত্মা মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাগমন কালে টিউলিয়ার রথ তথায় উপস্থিত হইলে সারথি রথের গতি সম্বরণ করায় তিনি তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া আদেশ করিলেন, "দাসীর সন্তানের মৃতদেহ রাণীর রথচক্রে দলিত ও নিষ্পেশিত হউক।"

লিউসিয়স্ এইরূপে রাজ্যধন লাভ করিয়া গর্ব্বিত টারকুইন্ নামে পরিচিত হইলেন! নিরন্তর প্রজা উৎপীড়নে ব্যস্ত থাকিলেও বিদেশে তাহার বিক্রম প্রকাশ করার ইচ্ছা এবং অবসর ছিল। তিনি এখন আর্ডিয়া আক্রমণ এবং অবরোধ করিয়াছেন। একদা সূর্য্যাস্তের পর তাঁহার দুই পুত্র সেক্সটস্ ও কলেটিনস্ শিবিরে বয়স্যপরিবেষ্টিত হইয়া মদ্যপানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁহাদের উভয়ের স্ত্রীর গুণাগুণের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল তাঁহারা তখনই রোমে ফিরিয়া যাইয়া দেখিবেন কাহার স্ত্রী কোন্ কার্য্যে ব্যাপৃতা। উভয়েই নিশিথে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেক্সটসের স্ত্রী সখীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ এবং হাস্য পরিহাসে মত্ত, আর কলেটিনসের স্ত্রী লুক্রেসিয়া স্বামীর নিমিত্ত একটী অঙ্গরাখা বয়নে ব্যস্ত। তাঁহারা আবার আর্ডিয়াতে ফিরিয়া আসিলে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিল লুক্রেসিয়া অধিক গুণবতী। কিন্তু সেক্সটসের ইহা অসহ্য হইল।

আবার আজ সেক্সটস্ কোন কার্য্যের ভান করিয়া আর্ডিয়া পরিত্যাগ করিলেন এবং আসিয়া গুপ্ত ভাবে লুক্রেসিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন নিষ্কলঙ্কচরিত্রা লুক্রে-সিয়া দেবরকে সসম্মানে গ্রহণ করিলে নিবিড় অন্ধকারজনীতে সেই পাপিষ্ঠ সাধ্বীর উপর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইল। সতীর সবল হৃদয় কিছুতেই অভিভূত করিতে না পারিয়া দুষ্টাত্মা ভয় প্রদর্শন করিল যে এখনই তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া এবং আর একটা কৃতদাস তাহার শয্যায় ছিন্নমুণ্ড রাখিয়া পরদিন তাহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ এবং স্বকৃত হত্যা স্বীকার করিবে। ভীতা লুক্রেসিয়া এতক্ষণে আর তাহার অমূল্য রত্ন লুণ্ঠিত হইতে বিশেষ বাধা প্রদান করিতে পারিলেন না। মণিহারা ফণিনী পরদিন প্রত্যূষে স্বামী এবং পিতাকে ডাকিয়া তাঁহাদের কাছে গত রজনীর সকল অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্বামীর পদতলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িলেন।

যখন এই দুর্ঘটনা নগরময় রাষ্ট্র হইল তখন প্রত্যেক রোম্যান্ অসিহস্তে প্রতিজ্ঞা করিল, "অত্যাচারী, ব্যভিচারী টারকুইনবংশের আর এই পবিত্র রোমরাজ্যে স্থান হইবে না।

(২)

রাজা ও রাজপদ এখন রোমের পদদলিত। ৫০৯ পূঃ খৃঃ অব্দে গর্ব্বিত টারকুইন সিংহাসনচ্যুত ও সবংশে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। রাজার রাজ্য এখন প্রজাসাধারণের নিজস্ব। সতীর সতীত্ব হরণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী প্রচণ্ড রাজবংশ আজ দেশে বিদেশে সাহায্যের ভিখারী।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। স্বদেশপ্রীতির লীলাক্ষেত্র রোম নগরেও স্বদেশদ্রোহীর অভাব হইল না। আবার টারকুইন্‌বংশ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চক্রান্তের সুরু হইল। চক্রান্ত পরিপক্কপ্রায়, এমতাবস্থায় সকল দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, দুষ্ট দল ধৃত হইল, তাহাদের নেতা স্বয়ং কন্সাল্ ব্রুটসের দুই পুত্র।

বিচারালয় আজ জনতায় পূর্ণ। বিচারাসনে পিতা, আর অভিযুক্ত লৌহদণ্ডবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ দুই পুত্র। সমগ্র জনতা স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। অপরাধীদ্বয় গর্ব্বিত দৃষ্টিতে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। বিচারপতি নয়ন উন্মিলন করিলেন ও আসামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:—"এখানে আর পিতাপুত্র সম্বন্ধ নাই, আমি বিচারপতি তোমরা অভিযুক্ত, আমিও রোম্যান্ তোমরাও রোম্যান্; বল তোমরা স্বদেশদ্রোহী কি না; বল তোমরা নরপিশাচ টারকুইন্‌কে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছ কি না।"—"আমরা স্বদেশদ্রোহী নহি। আমরাও রোম্যান্, আমরাও তোমারই পুত্র, আমরাও তোমারই মত স্বদেশপ্রেমিক। আমরা জানি রাজার অভাবে রোমরাজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না, আমরা জানি এই রাষ্ট্রবিপ্লবে রোম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই শত্রুর আক্রমণে এই মহানগর, স্বর্গাদপি গরিয়ান্ আমাদের এই জন্মস্থান বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। রাজদণ্ড টারকুইন্‌দের হাতে পুনরার্পণ করা ব্যতীত রোমের আর রক্ষার উপায় নাই। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন আমাদের এই অভ্রান্ত বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে পূর্ব্ববৎ প্রয়াস পাইব।" প্রথম জন নিরস্ত হইলে দ্বিতীয় জন আরম্ভ করিল:—পুত্র পিতারই সদ্‌গুণের অধিকারী। তুমি যাহা দেশের মঙ্গলকর বুঝ তাহা করিতে বিরত হও না; আমরাও যদি মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতাম তবে আমরা রোম্যান্ নামের গর্ব্ব উপভোগ করিতে পারিতাম না, তোমার পুত্রত্বের অনুপযুক্ত হইতাম। কিন্তু পিতা পুত্র উভয়ে একই বিষয় দেশের হিতকর বলিয়া মনে করিবে এবং একই উপায়ে তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিবে কে বলিল? সকলেরই চিন্তাশক্তি স্বাধীন। পিতার বাৎসল্য অপেক্ষা জননী জন্ম-ভূমির প্রসন্নদৃষ্টি অত্যন্ত অধিক মূল্যবান্।"

একটা অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিচারপতি আদেশ করিলেন, "কোতোয়াল, মশান ভূমিতে লইয়া চল। জল্লাদ, প্রস্তুত হও আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিব।"

অনতিবিলম্বে সকলই শেষ হইল। পুত্রহারা ব্রুটাস্ বধ্যগৃহ হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে জনতার মধ্য দিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

একে একে টারকুইন্‌দের অনেক অভিসন্ধিই ব্যর্থ হইল, তবুও চেষ্টার শৈথিল্য নাই। এবার রাজ্যচ্যুত রাজা টারকুইন্ রোমের পুরাতন শত্রু ইট্রাস্ক্যান্ জাতির পদলেহনে প্রবৃত্ত হইলে ক্লুসিয়ম্ রাজ লার্ পর্সেনা তাহার বিপত্তিতে বিগলিত হইলেন। রোমবিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান আরম্ভ হইল। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লার্ পার্সেনা জ্যানিকিউলম্ পাহাড় অধিকার করিলেন, রোম্যান সৈন্য হটিয়া পড়িল। জ্যানি কিউলমের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে ইট্রাস্ক্যান্ জয়পতাকা সগর্ব্বে বাতাসের সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া রোম্যান্‌দিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

পর্সেনা এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার বিজয়োন্মত্ত সেনা পলায়নপরপ্রায় রোম্যান্‌দের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। টাইবার নদ পারাপারের একমাত্র সেতুর পার্শ্বে সৈন্যে সৈন্যে সম্মুখীন হইল, সংগ্রাম তুমুল বাঁধিল। এক দিকে স্বাধীনতা-ধন, অপর দিকে বিজয়স্পর্দ্ধা; উভয়েরই উত্তেজনা তুল্য প্রবল। দলে দলে ইট্রাস্ক্যান্ সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল; তলোয়ার তীর বল্লম, পদ অশ্ব রথ, দলের পর দল আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু রোম্যান্ বীর হটিল না। বুকে ভিন্ন একটী রোম্যান্‌ও পৃষ্ঠদেশে আহত হইল

না। রোম্যান্ স্বাধীনতার গৌরব বুঝে, রোম্যান্ স্বাধীনতার মূল্য জানে যতই উচ্চদরে হউক আজ রোম্যান্ স্বাধীনতা ক্রয় করিবেই করিবে। আজ মূল্যদানে রোম্যান্ কৃপণতা করিল না, বীরহৃদয়ের তপ্তশোণিতে টাইবারের শীতল জল উষ্ণ হইয়া উঠিল; তবুও বুঝি স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইল না!

আর না! আর কতক্ষণ এই ক্ষুদ্র রোম্যান্ সেনা ঐ বিশাল ইট্রাস্ক্যান্ সেনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে! তূর্য্যধ্বনি হইল, "রোম্যান্, পশ্চাতে সেতু অতিক্রম কর, টাইবার নদ পার হইয়া যাও।" তাহাই হইল। কিন্তু যতক্ষণ সেতুটা বর্ত্তমান ততক্ষণ রোমের আশঙ্কার অবসান নাই। তিন জন রোম্যান্ বীর অগ্রসর হইলেন, যতক্ষণ না সেতুর অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় ততক্ষণ তাঁরা একটী বৈরীকেও সেতুর উপর পা ফেলিতে দিবেন না; ক্ষিপ্রহস্তে সেতুর ধ্বংশ আরম্ভ হইল। প্রবল বেগে ইট্রাস্কান্‌গণ তাহা রক্ষার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু সেই তিনটী বীর হৃদয় তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। তাঁদের হস্তে শত্রুগণ কদলিবৃক্ষের ন্যায় দ্বিখণ্ডিত হইতে লাগিল। কোন পক্ষেই বীরত্বের অভাব নাই। স্বদেশ বাৎসল্য ও বিজয়লিপ্সা কেহই কাহার কাছে হার মানিল না।

কুঠারের আর কয়েকটী আঘাতে টাইবার বক্ষে সেতুর চিহ্নও থাকিবে না, তিনজনকেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুমতি করা হইল, কিন্তু হরেসিয়স্ আশঙ্কার ক্ষীণাদপি ক্ষীণ চিহ্ন রাখিয়াও নিরস্ত হইতে পারেন না। অন্য দুই জন নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে পৌছিলেন। এ দিকে পর্সেনা ও হরেসিয়স্ দ্বন্দ্বযুদ্ধে মাতিয়া উঠিলেন. পর্সেনার অভ্রান্ত লক্ষে হরেসিয়স্ দক্ষিণ নেত্র হারাইলেন, তাহার উগ্র যন্ত্রণা অদম্য উৎসাহী রোম্যান্ বীরের অনুভূতিতেও তখন প্রবেশ লাভ পাইল না। ইত্যবসরে আর একটীমাত্র আঘাতে সকল বিঘ্ন দূর হইল, আজিকার মত রোম রক্ষা পাইল, হরেসিয়সের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। তিনি টাইবার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তাঁর পিছু পিছু একটী ইট্রাস্ক্যান্ বল্লম্, লার পর্সেনার নিজ হস্তের বল্লম, ধাবিত হইল, তার বাম পদটা কাড়িয়া লইল। পঙ্গু বীর হরেসিয়স্ শীঘ্রই মাতৃক্রোড়ে, রোমনগরে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

অমিতবিক্রমী পর্সেনা রোম অবরোধ করিলেন। তাহার সেনা দলে দলে বাহির হইয়া দেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নগরাভ্যন্তরে রসদ ফুরাইয়া গেল, রোম অনাহারে মুমূর্ষু। তখনও রোম মস্তক অবনত করিল না, পর্সেনার সন্ধির প্রস্তাবে কান পাতিল না, অত্যাচারী টার্‌কুইন্‌কে আবার রাজপদে বরণ করিতে স্বীকৃত হইল না। অনাহারে মরিবে তাও ভাল তবুও রোম স্বাধীনতা বিকাইবে না।

ইট্রাস্ক্যান্ শিবিরে উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া রক্তবস্ত্র পরিহিত এক কবাটরক্ষা পুরুষ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত। অকস্মাৎ ছুরিকাঘাতে তাহার বপু নমিয়া পড়িল, নিমেষ মধ্যে দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। হন্তা রোম্যান্ যুবক কেইয়স্ মিউকিয়স্ ধৃত এবং পর্সেনার আসন সমীপে নীত হইলেন। তখন রাজ আদেশে এক প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কেইয়স্ মিউসিয়সকে ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে পর্সেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কেন তুমি ইহাকে হত্যা করিয়াছ, কে বা তোমার সঙ্গী, আর কি করিয়াই বা তুমি ইট্রাস্ক্যান্ শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ। সকল দুরভিসন্ধি সকল চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে এখন তোমার রক্ষা নতুবা এইক্ষণই জীবিতাবস্থায় তোমাকে দগ্ধ করা হইবে।" রোম্যান্ যুবক গর্ব্ববিকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "পর্সেনাকে হত্যা করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প ছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার ভুল হইয়াছে। আর এই দেখ পর্সেনা-বধে প্রতিজ্ঞারূঢ় রোম্যান্ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে সব ভস্ম হইয়া গেল। তবুও একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দুর্দ্দান্ত পর্সেনা আমি একা নই, আরও তিন শত রোম্যান্ যুবক অষ্টপ্রহর তোমারই মৃত্যুচিন্তায় চিন্তিত, তোমারই মৃত্যুচেষ্টায় চেষ্টিত।" কথা শেষ হইতে না হইতে যুবকদ্বয় এক লম্ফে অনল মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। রোমের স্বাধীনতা-সূর্য্য যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইল।

মানুষের যাহা সাধ্যায়ত্ত রোম তাহা করিল। মানুষ মানুষকে যুঝিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ স্বতঃই দুর্ব্বল। রোম্যান্ সম্মুখ সমরে মরিতে জানে কিন্তু

অনাহারে সবংশে ধ্বংশ হইতে চায় না। সন্ধি সিদ্ধ হইল। টাইবার নদের পরপারে সমস্ত রোম্যান্ অধিকার ইট্রাস্ক্যান্ রাজ্যে ভুক্ত হইল; সদ্ব্যবহারের প্রতিভূস্বরূপ সম্ভ্রান্তজাত কুড়িজন রোম্যান যুবক যুবতী পর্সেনার হস্তে প্রদত্ত হইল। কৃষিকার্য্যে ব্যতীত লৌহধাতু ব্যবহারের বহির্ভূত রাখিতে রোম প্রতিশ্রুত হইল তবুও টার্‌কুইন্ বংশ ফিরাইয়া গ্রহণ করিল না।

রোম্যান্ যুবতী ক্লোয়েলিয়া ও অপর নয় জন কিশোরী প্রতিভূ রক্ষকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিলেন। এক গাঢ় অমানিশিথে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া টাইবার নদীতে ভাসিয়া ভাসিয়া রোমনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু রোম বাক্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে ঘৃণা করিল, ক্লোয়েলিয়া সদলে পর্সেনার হস্তে পুনঃ প্রেরিত হইলেন। রোম্যানের দেবব্যবহার নিজের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় ভাবিয়া টার্‌কুইন্ পথেই ইহাদিগকে বিনাশ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই অপরাধে ইট্রাস্ক্যান শিবিরে বিশ্বাসঘাতক টার্‌কুইনের আর স্থান হইল না। তাহার শেষ আশা, রোম্যান্ সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের ভরসা চিরকালের নিমিত্ত শুকাইয়া গেল। রোমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পর্সেনা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন; কেবল তাঁহার পুত্র অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া জ্যানিকিউলম অধিকার করিয়া রহিলেন। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, "রোমের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং এরিসিয়া জয় করিও।'

পিতৃ আদেশ অনুসারে এরিসিয়া আক্রান্ত হইলে পর্সেনা-তনয় যুদ্ধের প্রারম্ভেই হত হইলেন। আসন্ন ধ্বংশের ভয়ে ভীত নেতাহীন ইট্রাস্ক্যান্ বাহিনী আজ দলিত শত্রু রোমের দ্বারে আশ্রয় ভিখারী। রোম আতিথ্যধর্ম্ম ভুলিল না। নগরতোরণ উন্মুক্ত হইল, শাণিত এরিসিয়্যান্ খড়্গধার হইতে ইট্রাস্ক্যানগণ ত্রাণ পাইল। পর্সেনাও অকৃতজ্ঞ নহেন। রোম পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ব্বরাজ্য সকলই পুনর্লাভ করিল। এখন হইতে রোম সুপ্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের অধীনে অপ্রতিহত গতিতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইল।

শ্রীমনোমোহন রায়।

গুল-বাহারের উদ্দেশে।*

কে তোরা বাজাতি বীণা, গভীর নিশায়
তুলিতি কেমন তান? হেলায় খেলায়
সুরে সুরে কোন্ মায়া করিয়া সৃজন
ভুলাইতি রাজ্যহারা ভূপতির মন?
ভাই বোন্ তোরা দুটি রাজার সন্তান,
পিতার দুলাল, কবে শুকাইল প্রাণ,
চকিতে মিলায়ে গেলি যুগ্ম স্বপ্নপ্রায়,
পাশাপাশি দোঁহে! না জানি সে দিন, হায়,
কি দারুণ বেজেছিল করুণার বুকে,
হতভাগ্য পিতা যবে অশ্রুশূন্য দুখে
চেয়েছিল ঊর্দ্ধে! কি অজ্ঞাত মোহভরে
এ কা'র অন্তর মাঝে, কত বর্ষ পরে
উঠিছে তোদের পানে সে স্মৃতি উছাসি;
স্বদেশী কবির অশ্রু নিস্ ভালবাসি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

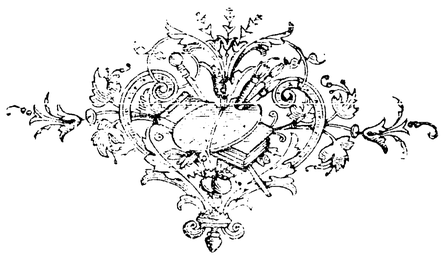

* নবাব মিরকাসিমের কন্যা গুল, ও পুত্র বাহার ভাগ্যচ্যুত পিতার সহিত গুপ্তাবাসে আশ্রয় লইয়াছিল। কথিত আছে, উহারা প্রতিদিন বীণাবাদন করিয়া চিন্তাপ্রপীড়িত নবাবের চিত্ত বিনোদন করিত। এক দিন মিরকাসিম কার্য্যব্যপদেশে বহুক্ষণ বাহিরে ছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, পুত্র কন্যার মৃত দেহ পাশাপাশি শায়িত রহিয়াছে।

যক্ষ-পত্নী।

প্রভুশাপে ফিরে পতি বিরহে বিজনে।
প্রাণসমা প্রিয়তমা চক্রবাকী প্রায়
সুদীর্ঘ যামিনী দিবা কাটে বা কেমনে—
ক্ষুণ্ণ মনে দিন গনে শূন্য অলকায়!
রুখু-কেশ-মেঘে আছে চাঁদমুখ ঢাকি',
শিশির-বিশীর্ণ কিবা বিবর্ণ নলিনী;
জানালায় জ্যোৎস্না হেরি' মুদি' আসে আঁখি—
বারি-সিক্ত আধ-সুপ্ত স্থল-কমলিনী!
বিরহ-সুতনু অঙ্গ গৃহকোণে লীন,
পেতেছে হৃদয় খানি করিয়া বিস্তার—
লুপ্ত অন্তরাল নদী নগেন্দ্র গহিন।
স্বপ্নে আলিঙ্গন, জাগি' অশ্রু উপহার!
একি দুঃখ যক্ষবালা অয়ি বিরহিণী,
জাগ্রত স্বপনে প্রিয়-উৎসঙ্গ-সঙ্গিনী!

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেন,

শিবপুর।

একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ভারতবর্ষের শাসনভার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানির কর্ম্মচারীবৃন্দের মধ্যে অনেক ধন-সম্পদ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঐ সকল ধনীগণের মধ্যে যাহারা কলিকাতায় থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহরের বাহিরে এক একটি উদ্যান-ভবন থাকিত। ঐ সকল বাগান-বাটি কলিকাতার অনতিদূরে সাধারণতঃ ভাগীরথীর তটদেশেই নির্ম্মিত হইত। বাটির সংলগ্ন বাগানগুলি নানাবিধ বৃক্ষলতাদিপূর্ণ ও বৃহদায়তনের ছিল। প্রতি সপ্তাহের শেষেই ঐ উদ্যানসমূহের অধিকারীগণ, বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিমল শান্তিলাভের আশায় তথায় আসিয়া দুই এক দিন করিয়া বাস করিতেন।

কলিকাতার দক্ষিণাংশস্থিত বর্ত্তমান খিদিরপুরের, পরপারে যে স্থানে ভাগীরথী বক্রভাব ধারণ করিয়াছেন, সেই স্থানের নাম শালীমার। পূর্ব্বকালে ঐ স্থানে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারের সৈনিক-সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কীডের একটি গ্রাম্য-আবাস ছিল। কীড বিবিধ বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন, সাধারণতঃ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ও শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের স্থাপয়িতা বলিয়াই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। শালীমার পয়েণ্ট হইতে পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ যে স্থানে স্থাপিত আছে, ঐ সমুদয় ভূমিই কর্ণেল কীডের উদ্যানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি নানা দেশ হইতে বহুবিধ মূল্যবান বৃক্ষের চারা আনাইয়া নিজ উদ্যানে রোপণ করিয়াছিলেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কীড বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের নিকট সেগুন কাষ্ঠ, চা, তামাক, কাফি, তুলা ও নানাবিধ মসলাদির চাষবাসের পরীক্ষার্থে কলিকাতার অনতিদূরে কোন স্থানে একটি উদ্যান স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তৎকালীন বড়লাট বাহাদুর আহ্লাদের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলাতে কোর্ট-অব-ডিরেক্টরগণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা ইহা অনুমোদন করেন।

কীডের নিজ উদ্যানের পশ্চিমে প্রায় তিনশত একার জমি উক্ত উদ্যানের জন্য লওয়া হয় এবং কর্ণেল কীডকেই তথাকার অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তিনি, সেগুন কাষ্ঠ কোম্পানির জাহাজাদি নির্ম্মানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া, প্রথমে ঐ বৃক্ষ রোপণ করিয়া উদ্যানের কার্য্য আরম্ভ করেন। চতুস্ত্রিংশ বৎসরের চেষ্টার পর তিনি সেগুনের আবাদে সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ হন। তৎপরে ঐ স্থানের কিয়দংশ বিশপ মিডল্‌টন্‌কে বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থ প্রদান করা হয়। তিনি যে বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উহাই এক্ষণে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বিশপকে উক্ত ভূমি প্রদান করিয়া যে দুইশত একার জমি অবশিষ্ট রহিল, উহাতেই বর্ত্তমান বোটানিক্যাল গার্ডেন নির্ম্মিত হইয়াছে।

কীড্ সেগুন কাষ্ঠের আবাদে অকৃতকার্য্য হইয়া দারুচিনি ও অন্যান্য মসলার চাষে ব্যাপৃত হন। ইহাতে তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। তৎপরে তিনি পরীক্ষার্থে চা ও সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাষ করেন, ইহাতেও তিনি সন্তোষজনক ফল লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দের ২৬এ মে তারিখে কর্ণেল কীড কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। যদিও তিনি তাঁহার উইলে নিজ উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। সাউথপার্ক ষ্ট্রীটের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি হয়। তাঁহার সমাধি স্তম্ভ এক্ষণে আর চিনিতে পারা যায় না। কীডের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মেজর এলেক্‌জেণ্ডার কীড (Major Alexandar Kyd R. E.) বোটানিক্যাল গার্ডেনে তাঁহার একটি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মনোরম স্তম্ভ স্থাপন করেন; সেটি অদ্যাপিও উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। পর পৃষ্ঠায় তাহার ফটোগ্রাফিক চিত্র প্রদত্ত হইল। কর্ণেল কীডের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পদে আর কাহাকেও অবৈতনিক ভাবে না রাখিয়া, ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস্ হইতে একজন উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ্ উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করাই স্থির করিলেন। ডাক্তার রক্সবর্গকে (Dr. Roxburgh) কীডের পদে নিযুক্ত করা হইল। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে উদ্যানের ভিতর গঙ্গার

ধারে অধ্যক্ষদিগের বাসের নিমিত্ত একটি সুরম্য বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া ডাঃ রক্সবার্গ তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে অবস্থিতি কালে 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' (Flora Indica) নামক একখানি ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকখানি তাহার মৃত্যুর পর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রক্সবার্গ ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন।

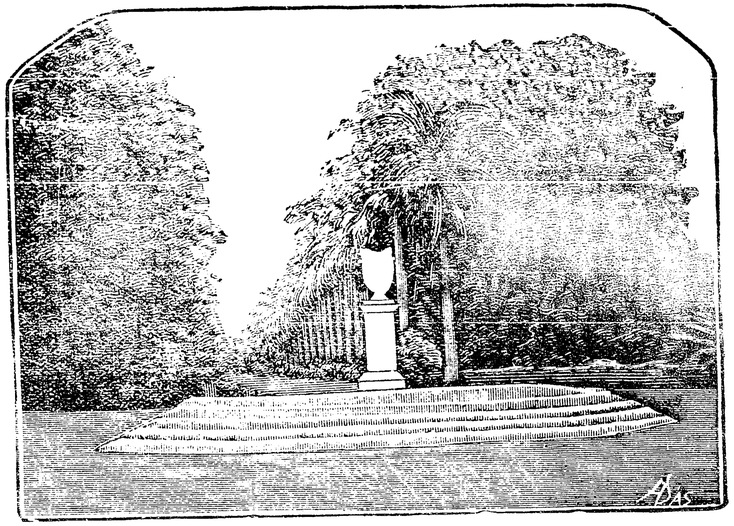

কর্ণেল কীডের স্মৃতিস্তম্ভ।

রক্সবর্গের পর ওয়ালিচ্, (Wallich) ফ্যাকোনার (Falconer) গ্রিফিথ (Griffith) টম্‌সন, (Thomson) এবং এণ্ডারসন (Anderson) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একে একে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে সার জি, কিং (Sir G. King, M. D., K. C. I. E., F. R. S.) ইহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার নাম চিরদিন গ্রথিত থাকিবে। বোটানিক্যাল গার্ডেন পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। এতাবৎকাল উদ্যানের অনেক উন্নতি সাধিত হইলেও কিং সাহেবের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য বৈজ্ঞানিক বৃক্ষলতাদি সংগৃহীত হওয়াতে উদ্যানের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইঁহারই সময়ে উদ্যানের স্থানে স্থানে নূতন বৃক্ষ শ্রেণীকৃত ক্ষুদ্র পথ, মনোরম সরোবর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভিক্টোরিয়া রিজিয়া (Victoria Regia) নামক বৃহৎ জলপদ্ম ও অন্যান্য বিবিধ জাতীয় পদ্ম এবং নানা প্রকার বিলাতি পুষ্প বৃক্ষ সকল তাঁহারই যত্নে আনীত হইয়া প্রথমে এই উদ্যানে স্থান পায়।

ডাক্তার কিং কেবলমাত্র বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াই নিরস্ত হন নাই; তিনি ইহার আভ্যন্তরিণ উন্নতি সাধন করিতেও যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য তরুলতা দূরদেশ হইতে আনাইয়া তিনি এই উদ্যানে রোপন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে উদ্ভিদতত্ত্ব বিজ্ঞানের ছাত্র মণ্ডলীর নিকট এই উদ্যানের উপকারিতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কিং 'শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ইতিহাস' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। অদ্যাবধি এই পুস্তকের সাত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট এই পুস্তক অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ব্রিটিশ-সিকিমে সিনকোনার প্রচলন দ্বারা ভারতবর্ষে উক্ত ঔষধের মূল্য হ্রাস করার মূল ডাক্তার কিং। এদেশে যখন কুইনাইনের প্রচলন প্রথম আরম্ভ হয়, তখনকার তুলনায় ইহার বর্ত্তমান মূল্য অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার কিংএর সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, তিনি যে পূর্ব্ব অধ্যক্ষগণের অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তাহা বোধ হয় আর পুনরায় বলিতে হইবে না।

অতি সংক্ষেপে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের উৎপত্তি ও পূর্ব্ব ইতিহাস বলা হইল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার মধ্যে যে সকল মূল্যবান ও মনোরম বৃক্ষলতাদি এবং রমণীয় দির্ঘিকা, বৃক্ষশ্রেণীকৃত রম্যপথ ও কুঞ্জ সকল শোভা উৎপাদন করিতেছে তাহাদের বর্ণনা করা অসম্ভব।

সূর্য্যোদয়কাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই সরকারি বাগান

সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ইহার মধ্যে রক্সবার্গ এভেনিউ, ওরিওডক্সা এভেনিউ প্রভৃতি পথ গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওরিওডক্সা এভেনিউয়ের এক প্রান্তে কয়েকটী প্রশস্ত শ্বেত সোপানোপরি কর্ণেল কীডের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে। অপর তিন দিক হইতে তিনটি পথ আসিয়া এই স্তম্ভের নিকট শেষ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কি সমস্ত উদ্যানের মধ্যেও ওরিওডক্সার সমতুল্য একটিও পথ নাই। ইহার উভয় পার্শ্বে মর্ম্মর স্তম্ভ সদৃশ কিউবা দেশীয় একপ্রকার বৃহদাকারের তালবৃক্ষ আছে, তাহার পরই গাঢ়বর্ণের মেহগিনী তরু বিরাজিত। জ্যোৎস্নালোকে এই তালবৃক্ষগুলি মেহগিনীর কৃষ্ণছায়ার পার্শ্বে রজত স্তম্ভবৎ দেখায় এবং অদূরে কীডের স্মৃতিস্তম্ভটি এক অনুপম শোভায় শোভিত রহিয়াছে।

ওরিওডক্সা এভেনিউ হইতে কিছু দূরে গমন করিলেই উচ্চতরুশ্রেণী পরিবৃত একটি সুন্দর সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার নাম হংস সরোবর। ইহাতে হংস ও নানা জাতীয় জলচর পক্ষী সকল বাস করিয়া থাকে। ইহার নিকটে বিদেশীয় লতা, গুল্ম রক্ষণাবেক্ষণযোগী তৃণাচ্ছাদিত লৌহ নির্ম্মিত একটি বৃহৎ বৃক্ষবাটিকা আছে। উহার মধ্যে উষ্ণপ্রধান দেশের বিবিধ প্রকারের উদ্ভিদ সকল যত্নের সহিত সুসজ্জিত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ তিনটি বৃক্ষবাটির মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই সকল বৃক্ষবাটিগুলি পুষ্পপল্লবাদিতে বড়ই মনোহর শোভা ধারণ করে। এই বাটির কিঞ্চিৎ উত্তরে অষ্টকোন বিশিষ্ট এইরূপ আর একটি লৌহ নির্ম্মিত 'পাম্‌হাউস' আছে। ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবিধ প্রকার ছোট ছোট তাল জাতীয় বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে।

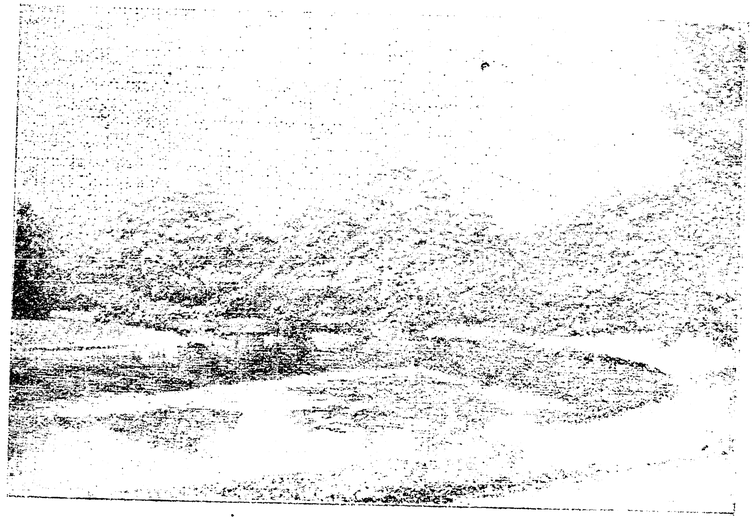

হংস সরোবর।

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার রক্সবার্গের নাম স্মরণীয় রাখিবার জন্য 'রক্সবার্গ এভেনিউ' নামে অশোকশ্রেণী শোভিত একটি রাস্তা আছে, উহার এক প্রান্তে রক্সবার্গের একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপিত আছে। এই পথ অতিক্রম করিয়াই উদ্যানের গৌরব স্বরূপ, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুদ দৃশ্য মহান্ বটবৃক্ষ দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার হুকার তাঁহার 'হিমালয়া জরনেল'এ এই বিশাল তরুর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, তখন উহা উচ্চে ৮০ ফিট্ ছিল। ডাক্তার ফ্যাকোনার যখন প্রথম আইসেন, তখন ইহার কেবলমাত্র উননব্বইটি লম্বমান শিকড় শাখা হইতে ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহার সংখ্যা চারি শতেরও অধিক। প্রবল ঝটিকায় এই বিশাল বটবৃক্ষের সামান্য অংশ নষ্ট হইয়াছে। পরপৃষ্ঠায় ইহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।

উদ্যানের উত্তর-পূর্ব্ব কোনে আর একটি বটবৃক্ষ আছে সেটির আকারও নিতান্ত ছোট নহে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বৃক্ষের উপরও বিশেষ যত্ন রাখিয়াছেন, যাহাতে ইহাও ভবিষ্যতে উদ্যানের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই বট ভিন্ন শিশু, সেগুন ও কতকগুলি শত বৎসরের মেহগিনী বৃক্ষ আছে; ঐ সকল বৃক্ষের অধিকাংশ ডাক্তার রক্সবর্গের সময় রোপিত হইয়াছিল। এদেশে আমরা সচরাচর পাঁচ, সাত জাতীয় বংশ দেখিতে পাই, কিন্তু এই উদ্যানে যেরূপ বহুজাতীয় বংশের সংগ্রহ আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের ওলন্দাজ পামহাউস্।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের মহানবটবৃক্ষ।

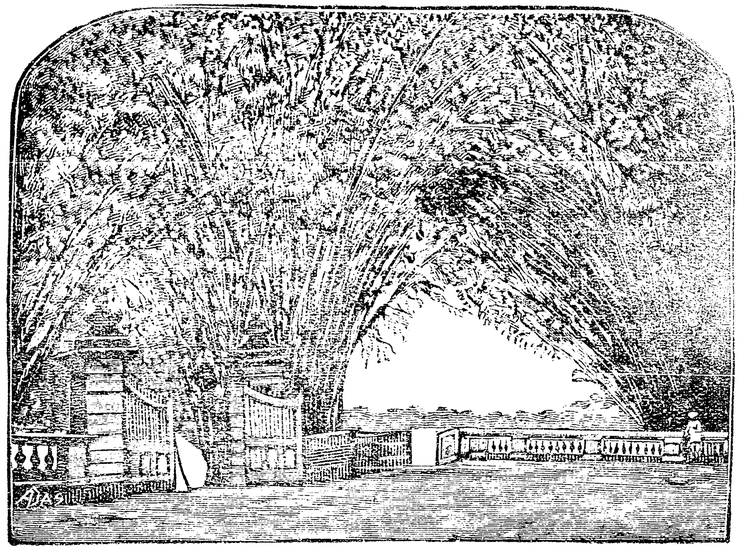

বাশবর্ত্ম।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝটিকায় বাগানের যে ক্ষতি হইয়াছিল, এই কয়েক বৎসরে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এই ঝড়ের পঞ্চদশ বৎসর পরে শিবপুরের পরপারে অযোধ্যার নবাবের চিড়িয়াখনা হইতে কোনরূপে পিঞ্জরমুক্ত হইয়া একটা ব্যাঘ্র সন্তরণ দ্বারা বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে প্রবেশ করে এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ মিঃ বিয়ারম্যানকে নিকটে পাইয়া আক্রমণ করে; তিনি দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সে যাত্রায় রক্ষা পান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক বৎসর পরেই বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

এই উদ্যানের অনুপম শোভা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। আমরা সকলকে একবার শিবপুরে যাইয়া ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীহরিহর সেঠ।

খেদা।

—০:*:০—

(৩)

বন্য-হস্তিযূথকে কিরূপে খেদামধ্যে আবদ্ধ করিতে হয়, তাহা আমরা গত বারে সংক্ষেপে বলিয়াছি; এখন কি প্রণালীতে এই দুর্দ্দান্ত হাতীগুলিকে বন্ধন করিয়া বশীভূত করিতে হয়, তাহাই বলিব। হাতীর দল খেদায় প্রবিষ্ট হইলে প্রথমতঃ কুন্‌কী হাতী খেদার মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিয়া যে হাতীগুলিকে প্রথমে বন্ধন করিতে হইবে তাহা নির্ব্বাচন করে, পরে দুইটি কুন্‌কী হাতী এক একটি খেদা-প্রবিষ্ট বন্যহস্তীর পাশে গিয়া এরূপভাবে তাহাদের শরীরে হেলিয়া পড়ে যেন এই হাতীটা কিছুতেই নড়িতে চড়িতে না পারে। তার পর শিক্ষিত কুন্‌কী হাতী দুইটি উহাকে মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া চাপ দিতে দিতে খেদার বেড়ার নিকটে লইয়া যায়; শেষে বেড়ার নিকটে গিয়া আরও একটুকু জোরে চাপ দিলেই গরীব জঙ্গলী হাতী বেচারি নীচে গড়িয়া যায়; তখন চতুর শিকারী ক্ষিপ্রহস্তে বেড়ার সহিত বন্য হস্তীর পিছনের পা দুটি খুব শক্ত দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া দেয়। এই প্রকারে উপযুক্ত সংখ্যক হস্তী

বদ্ধ হইলে ধৃত ও কুন্‌কী হস্তীর গলায় গলায় বাঁধা হয়, তখন বেড়ার বাঁধও খুলিয়া দিতে হয়। এই স্থলে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আরও একটুকু কাজ করিতে হয়। বন্য হাতীর পিছনের পায়ে পায়েও বাঁধিয়া দেওয়া উচিত; এই কার্য্যগুলি সুসম্পাদিত হইলে ধৃত হাতীগুলিকে খেদার বাহিরে আনিয়া বহিঃস্থিত বড় বড় গাছে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। গাছের নিকট গেলে আবার দুইটি কুন্‌কী হাতী আসিয়া প্রত্যেক বন্য হস্তীর দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের ন্যায় চাপিয়া ধরে। ইহাতে বিপন্ন হাতীটি নড়িতে চড়িতে না পারায় শিকারী আসিয়া সেই গাছের সহিত শক্ত দড়ি দ্বারা হাতীটিকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। এই বন্ধনকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই সম্পন্ন করার নিয়ম অর্থাৎ শিকারীর বুদ্ধি প্রভাবে গাছের সহিত হাতীর পিছনের পা ও গলা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ হয়।

এইরূপ বন্ধন-দশায় কিয়ৎকাল রাখিলেই ধৃতহস্তীর শক্তি সামর্থ্য বা মদোন্মাদ সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হয়। বন্ধন সময়ে বিপন্ন হাতীটি যে প্রকার ভীষণ ধস্তাধস্তি হুড়াহুড়ী করে তাহা না দেখিলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। যখনই এই বদ্ধ হস্তী ছাড়িয়া দেওয়া হয় অমনি সে ভূমিতে পড়িয়া নিজের শক্তি-প্রভাবে পুনরায় স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, এই বৃথা চেষ্টা বা ধস্তাধস্তির ফলে উহার চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি বেশ কর্ষিত হইয়া হয়। এই ব্যাপারের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বুদ্ধিহীন হস্তী জাতীর অযথা-শক্তি প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। এই আবদ্ধ ক্রোধান্ধ হস্তি-যূথ ভূমিতল আহত করে এবং শুণ্ড প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ বিকট শব্দ করে যে, তাহা শুনিলে রণপ্রিয় সাহসিক সৈনিক পুরুষেরও মুহূর্ত্তের জন্য হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হাতীর দল শুধু ভূমি কর্ষণ বা বৃথা গর্জ্জন করিয়াই নিশ্চেষ্ট রহে না। ইহারা তখন যাহা কিছু সম্মুখে পায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই শুড় দ্বারা আছড়াইয়া ফেলে। তখন হাতীর ঐ ভীষণ শুণ্ড-অস্ত্রের নিকটে যিনি যাবেন, তাহারই ভবের খেলা সমাপ্ত হইল মনে করিতে হইবে। অনেক সময়ে দূরে অবস্থিত থাকিলেও বিপন্ন হইতে হয়। ইহারা শুড় দিয়া ঢিল লাঠী ইত্যাদি ছুড়িয়া মারিতে বেশ কৃতবিদ্য। যে হাতী ধরার বিষয় বর্ণনা করিতেছি, তাহার আর একটি ভীষণ দৃশ্য এই স্থলে চিত্রিত করিয়া প্রদীপের পাঠকদিগকে উপহার প্রদানের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই খেদায় ২০৩টী হাতী আবদ্ধ হইয়াছিল। এই দ্বিশতাধিক হস্তী ভিন্ন ভিন্ন রূপে শৃঙ্খলিত, হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বন্ধন মুক্তির চেষ্টা করিতেছে, প্রত্যেকে হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ করিতেছে। সকলেই ক্লেশের সহিত শরীর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতেছে, এক গভীর দুঃখে প্রত্যেকেরই চক্ষু দিয়া উষ্ণ অশ্রু পতিত হইতেছে। ইহাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে এক বচনাতীত ভাবের উদয় হয়। উল্লিখিত প্রক্রিয়াতেই হাতীগুলি ক্রমশঃ শীকারীগণের অধিনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। যখন দেখা যায়,হাতীর দল সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে, তখনই উহারা যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বশীভূত হস্তীযূথ যখন স্থানান্তরে নীত হয়, তখন ইহাদের বাচ্চা গুলি বড়ই আমোদ প্রদান করিয়া থাকে। বদ্ধ হস্তী তাহার বাচ্চাটিকে এরূপে টানিয়া নিয়া যায় যে, দেখিলে মনে হয় যেন একটি ধাত্রী অবাধ্য ছেলেকে বলপূর্ব্বক টানিয়া নিয়া যাইতেছে। ঐ হস্তী শাবকটীও বাস্তবিক ধাত্রী-আকৃষ্ট ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ক্রোধে চীৎকার করিতে থাকে। উপমাটী একটু হাস্য জনক হইল। কিন্তু কি করিব, ঘটনাতে এইরূপেই মনে হয়। হাতীগুলি বশীভূত হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অতি সন্তর্পণে চালনা করিতে হয়। কোনও একটি বন্য ধৃত হস্তীকে স্নান করাইতে হইলে দুইটি কুন্‌কী হাতীর সাহায্যে উহা নির্ব্বাহ করিতে হয়। প্রাণী জগতে হস্তী দেহ ও বল বিভবে যেরূপ সৌভাগ্যবান্ আয়ুষ্কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ। হাতী বিশাল দেহশালী হইলেও সামান্য প্রাণীর ন্যায় সন্তরণপটু। বড় বড় নদী হাতী বেশ সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে। হাতী যে অতি মূল্যবান জন্তু তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে কি? হাতী কিরূপে ধরিতে হয় তাহাই সাধারণের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র গুপ্ত।

সম্পূর্ণ।

কবীর।

কবীর রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই বিষ্ণু ভজে সেই সর্ব্বপূজ্য হয়॥

হীনবংশোদ্ভব হইলেও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কবীর সকলের পূজ্য। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান আছে যে, স্বীয় বিধবা কন্যাকে সঙ্গে হইয়া তাঁহার মাতামহ একদিন রামানন্দের নিকট গমন করেন। কন্যাটিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। "পুত্রবতী হও" বলিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই অব্যর্থ আশীর্ব্বাদের ফলে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল। যথাসময়ে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

একে যুবতী, তায় পতিহীনা, সুতরাং প্রচ্ছন্ন-প্রসূতা মাতা বিষম শঙ্কটে পড়িলেন। পুত্র লইয়া কি করিবেন, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অপযশ ভয়ে তাঁহাকে পুত্রের মায়া ত্যাগ করিতে হইল। পথের ধারে সদ্যপ্রসূত পুত্রটীকে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহে আসিলেন।

কথায় আছে, "রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?" একটী জোলা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। পথপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত শিশুটীকে দেখিয়া তাঁহার মায়া জন্মিল। তিনি তাহাকে গৃহে আনিয়া পত্নির হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং অপত্যনির্ব্বিশেষে কবীর তাঁহাদিগের গৃহে প্রতিপালিত হইলেন।

কবীর নীচজাতীয়, সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষাগ্রহণে অধিকার নাই। তবে তিনি রামানন্দের শিষ্য হইলেন কিরূপে? কথিত আছে যে, একদিন তিনি কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়া আছেন, ভোর হয় হয়, সূর্য্যোদয় তখনও হয় নাই, আলো আঁধারে মিশিয়া কোলাকুলি করিতেছে, এমন সময়ে রামানন্দ স্নানার্থী হইয়া যেমন ঘাটে নামিবেন, কবীরের গাত্রে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। তিনি সশব্যস্তে রাম রাম বলিয়া উঠিলেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, "মনই গুরু।" মনই কবীরের গুরু হইলেন; মনই তাঁহার উপদেষ্টা হইলেন। সেইদিন হইতে কবীর রাম নামই ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং মনোমন্দিরে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

কাপড় বুনিয়া কবীর জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। কাপড় বুনিবার সময়ে, নলী চালাইতে চালাইতে তিনি "সীতারাম সীতারাম" ভজন করিতেন। কাম ও নাম, এক সঙ্গে তাঁর দুইই চলিত। একদিন তিনি একখানি কাপড় বুনিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে গেলেন। তাঁহার হাতে কাপড়খানি দেখিয়া একজন বৈষ্ণব সেখানি চাহিলেন। বস্ত্র প্রার্থীকে বস্ত্রখানি দিয়া মাতার ভয়ে তিনি এক স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া রাম নাম জপ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র কবীরের মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বলদের পৃষ্ঠে অনেক দ্রব্য চাপিয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন।

ফুলের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িলে মধুমক্ষিকারা সেখানে আসিয়া আপনিই যুটে; তাহাদিগকে আর খবর দিতে হয় না। তাঁহার হৃদয়ে যেই ভক্তির ফুল ফুটিল, অমনি তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি-পিপাসু অনেক লোক তাঁহার নিকট আগমন করিল। স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহার গৃহে ভক্তের হাট বসিল।

এক ঈশ্বরের সন্তান জ্ঞানে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমানচক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিতেন, "আলি ও রামের সন্তানেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার ভগবান, তিনিই আমার পীর," তাঁহার পবিত্র জীবন দর্শনে ও মধুর উপদেশ শ্রবণে অনেক হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে লাগিল। ধর্ম্ম মত লইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ জন্মিতে পারে, সেই আশঙ্কায় তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন, "সকলের সহিত আলাপ করিবে, সকলের সহিত মিশিবে, হাঁজী হাঁজী সকলকে বলিবে, কিন্তু আপনার স্থানে অবস্থান করিবে।" আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানে কোন ফলোদয় হয় না। গঙ্গায় স্নান, একাদশী পালন,

মস্তক মুণ্ডন, তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন এবং নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যদি ভগবৎ প্রেমে শির সমর্পিত না হয়, মনের ময়লা না যায়, হৃদয়ের ঘোর দূর না হয়, তবে এ সব বৃথা শ্রম মাত্র। হাড়ের মন্দির মাংসের দ্বারা বাঁধা আছে ইহাতে ভগবান আছেন। ভগবদ্দর্শনের জন্য কাশী গয়ায় যাইতে হইবে না; শান্ত, দান্ত ও সমাহিত হইয়া আত্ম-পুরীতে প্রবেশ করিলে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে। সত্য, দয়া, ক্ষমা, ধীর ও বিচার, এই কয়টী নীতি পালন করিলে জগতের সুখ বৃদ্ধি হয় ও নিজের মঙ্গল সাধিত হয়। কবীরের উপদেশের ইহাই সার মর্ম্ম।

তাঁহার তিরোভাবে দেহ সংকার লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে দৈববাণী হইল "শবাবরণ উন্মোচন কর।" অনন্তর শবাবরণ উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল যে, কয়েকটী মাত্র ফুল পড়িয়া আছে; শব নাই। বিবাদ মিটিল। অর্দ্ধেক ফুল লইয়া হিন্দুরা দাহ করিল অপরার্দ্ধ লইয়া মুসলমানেরা সমাধিস্থ করিল।

গীতায় আছে, ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ধর্ম্মই সুখ ও শান্তির পথজ্ঞানে জীবন্মৃত ভারতে মহাপ্রভু কবীর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক জগাই মাধাইর উদ্ধার হইল, উদ্ধত প্রকৃতি শান্ত প্রকৃতি ধারণ করিল, সংসার শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, পাহাড় ও জঙ্গলে অবস্থান করিয়া জীবন্মুক্ত কবীরদেবের ধ্যান ধারণায় কতলোক তাঁহার দেব প্রকৃতি লাভ করিল। পাতঞ্জল ঋষি যথার্থই বলিয়াছেন যে, মহাপুরুষের চিন্তায় মানুষ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করে। হায়! মানবীয় চরিত্রের মহাপুরুষদিগের এরূপ প্রভাব দর্শন করিয়াও লোকে মহাপুরুষের চিন্তা ছাড়িয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মার্গের অনুসরণ না করিয়া, স্বেচ্ছাচরণ পূর্ব্বক সংসারকে দুঃখ ও কষ্টের রঙ্গভূমিতে পরিণত করিতেছে!!!

শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী।

আবাহন।

—ঃ০ঃ—

(আজি) শারদ নিশিতে, এস প্রাণ সখা
আমার কুটীর পানে,
আমি তোমার লাগিয়া, রয়েছি জাগিয়া,
একাকী তোমারি ধ্যানে।
পূত জ্যোছনায় ধোয়া, সুরভি কুসুম
দলে, দলে, আছে ফুটি,
হের আনন্দ যেন বা পড়েছে ছড়ায়ে
দুঃখের বাঁধন টুটি।
কিম্বা ত্রিদিব নিবাসী দেব শিশুগণ
করিতেছে সুধা কেলি,
তা'রা আপনা পাশরি, সুধা সাগরের
দিয়াছে প্রণালী খুলি।
আজ, বিষাদ আঁধার গিয়াছে সরিয়ে
সব (ই) শান্তি হাসি মাখা,
তুমি বিষাদ সরায়ে এ হৃদয় মাঝে,
ধীরে ধীরে দেও দেখা।
আজি পূজিব তোমারে, অভিষেক করি'
নয়নের শত ধারে,
মোর, পরাণের যত গূঢ় অভিলাষ
অরপিব উপহারে।
শুধু বিমল সোহাগ, নব অনুরাগ—
খেলিবে অসীম ভাবে,
তারা নিতি নব ভাবে উঠিবে ফুটিয়া,
কত মত শোভা পাবে।
কভু, আমি, তুমি হব, তুমি, হবে আমি
অপরূপ নব সাজে,
পুনঃ, দু'জনে মিলিয়া, খেলিব হরষে
প্রেমের সাগর মাঝে।
তবে, এস প্রাণ সখা, ত্রিদিব হইতে,
তুমিতো দেবতা এবে,
আমি তো মানব, মোর আবাহন
তুমি কি চরণে নেবে?

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন গুপ্তা।

ভূষণ।

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মের বশেই আরব্ধ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মোসলমান-শাসিত ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল। পরপদানত অবসন্নপ্রায় হিন্দু জাতির মধ্যে বহুদিনের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তেজস্বিতার সঞ্চার হইতেছিল।

আত্মশক্তির প্রতি প্রণষ্ট বিশ্বাসের পুনরুদ্রেক, বোধ হয়, এই প্রতিক্রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অসাধারণ বোধশক্তিগুণে প্রাচীন হিন্দুগণ নবোৎসাহসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী আরব-পাঠানদিগের বীর্য্যকৌশল ব্যর্থ করিয়া বহুদিন আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেও সঙ্ঘশক্তির অভাবে পরিশেষে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক বিজেতার বশ্যতা-স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের চিরঘৃণিত জাতির তেজোদর্পের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হওয়ায় আত্মশক্তির পর্য্যাপ্ততা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে সন্দেহাশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহাই এদেশে মোসলমান শাসন বদ্ধমূল হইবার পক্ষে এক প্রধান কারণস্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু নরপতিগণ স্বাভাবিক তেজস্বিতা বশতঃ মধ্যে মধ্যে মস্তকোত্তলন-পূর্ব্বক মোসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনে সচেষ্ট হইতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের পূর্ব্বপরাজয়ফলে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে যে নৈরাশ্য ও অবসাদের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহাতে তাঁহাদিগের উদ্যম সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। মোসলমানগণের নিয়োগ-ক্রমে উচ্চ রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু সর্দ্দারগণ শাসন-সংক্রান্ত সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় তাঁহাদিগের ভাগ্যে জেতৃজাতির নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা-লাভ ঘটিতে লাগিল। যে হিন্দুগণ "কাফের" বলিয়া পদে পদে বিজেতার নিকট অবজ্ঞাত হইতেন, যাঁহাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ধর্ম্ম ও শুদ্ধান্তচারিণীদিগের মর্য্যাদা প্রবলপরাক্রম বিধর্ম্মীদিগের ঔদ্ধত্যে পুনঃ পুনঃ উপহত হইত, তাঁহারা এক্ষণে নানা বিষয়ে জেতৃসমাজের সমকক্ষতা-লাভ-পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের প্রধান রক্ষক বা আধারস্তম্ভ বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। তখন হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে আত্মশক্তির অভাব সম্বন্ধে অমূলক আশঙ্কা স্বতঃই অপনোদিত হইল। ক্রমশঃ নৈরাশ্যের স্থানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পদলেহনপরতার স্থানে তেজস্বিতা ও আত্মগ্লানির স্থানে জাতীয় গৌরবগর্ব্বের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র হিন্দুজাতির অন্তস্তলে যে নূতন ভাবপ্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা শাসক-সম্প্রদায়ের সামান্য দুর্ব্ব্যবহারে বা ঈষৎ অবজ্ঞায় সহসা সংক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষেত্র-ভেদে কোথাও ধর্ম্ম-অবলম্বনে, কোথাও হৃদয়-অবলম্বনে এবং কোনও স্থানে বা ব্যক্তিগত ও জাতিগত মর্য্যাদা-রক্ষার সূত্র-অবলম্বনে উচ্ছ্রিত হইয়া ভারতবর্ষের শাসন-বিভাগে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

এই প্রতিক্রিয়ার স্রোতকে যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা ও অপরিমেয় ক্ষমতাবলে প্রবল প্রবাহে পরিণত করিয়া মোসলমানদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগের নাম বিশদ অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদিগের ভাগ্যে সেরূপে স্বীয় প্রতিভা-পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটে নাই, অথচ যাঁহারা সেই নবীন ভাবস্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মহত্ত্বও হিন্দুজাতির চক্ষে কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে। তাই বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় কাব্যেতিহাসের জীর্ণ মলিন পৃষ্ঠা হইতে তাঁহাদিগের নাম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। পুরুষ-পরম্পরাগত কিংবদন্তী এখনও ঐ সকল মহত্ত্ব-পূর্ণ নামের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কোন শ্বেতাঙ্গের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে এতদিনে হয়ত তাঁহাদিগের অনেকেই সুবর্ণমণ্ডিত দেহে আমাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন! কিন্তু তাঁহাদিগের ভাগ্য এখনও ততদূর সুপ্রসন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে এদেশে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি রক্ষার্থ যত্নের পরিমাণ যেরূপ হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় বিদ্যমান এবং বর্ত্তমান কালে উহা যেরূপ মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের স্বদেশের মহৎ ব্যক্তিগণ যে স্বল্প দিনের মধ্যে পুরাতন গ্রন্থের ধূলিসমাচ্ছন্ন সমাধি ও প্রাচীন জনপ্রবাদের কুহেলিকাবরণ ভেদ করিয়া নবোজ্জ্বল পরিচ্ছদে সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সে আশা সুদূর-পরাহত।

কিন্তু যাঁহার চরিতকথা উপলক্ষ্য করিয়া এই সুদীর্ঘ ভূমিকা রচিত হইল, সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার ঐতিহাসিক অদৃষ্ট নিতান্ত অপ্রসন্ন নহে। তিনি উত্তর ভারতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও মহারাষ্ট্রবাসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসপ্রিয় মারাঠাগণ আপনাদিগের বখর গ্রন্থে তাঁহার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিয়াছেন। উত্তর ভারতের বিবিধ গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল জন-শ্রুতির উল্লেখ আছে, কয়েক বৎসর হইল, তাহার কতক-গুলি বোম্বাইয়ের জনৈক গ্রন্থ-প্রকাশকের যত্নে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র "কাব্যেতিহাস সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রেও এতৎ-সংক্রান্ত বহুল উপকরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ফলতঃ মহারাষ্ট্রভূমির অনুগ্রহে কবিবর ভূষণ ঐতিহাসিক দুর্দ্দশার হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছেন।

ভূষণ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে নবোৎসাহ ও অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষার যে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার একটী হিল্লোল এই ব্রাহ্মণ যুবকের তরুণ হৃদয়ে উন্মাদ সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার অলোকসাধারণী তেজস্বিতা সন্দর্শনে দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা-পাঠে কাপুরুষের হৃদয়ও বীরোন্মাদে উন্মত্ত হয়। তদানীন্তন হিন্দু নরপতি-গণ তাঁহাকে গজবাজী সহ সুবর্ণরাশি দান করিয়া তাঁহার গুণে সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার শিবিকা স্কন্ধে বহন করিয়াও তাঁহাকে সম্মানিত ও আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সেকালের গুণগ্রাহী নৃপতিসমাজে তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি ও সমাদর ছিল, ইহা হইতেই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

ভূষণ যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতার নাম রত্নাকর ত্রিপাঠী ছিল। তিনি কালিন্দীর তীরবর্ত্তী ত্রিবিক্রমপুর নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। (১) কানপুরের সন্নিহিত বর্ত্ত-মান "টিকমাপুর" নামক পল্লীই প্রাচীন ত্রিবিক্রমপুর বলিয়া প্রত্নসন্ধিগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। কথিত আছে, রত্না-কর ত্রিপাঠী বহুদিন অপুত্রক ছিলেন; পরে "বনভূমিকা" নাম্নী দেবীর উপাসনা করিয়া কাব্যকলাধর চারিটি পুত্র লাভ করেন। তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে ভূষণ দ্বিতীয়। রত্নাকর দরিদ্র হইলেও তাঁহার প্রতি বাগ্দেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ ছিল। ভূষণ ও তাঁহার সহোদরগণ পিতৃগুণে নৈসর্গিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা সকলেই হিন্দী সাহিত্যকে নানা অমূল্য রত্নাভরণে ভূষিত করিয়া তাঁহাদিগের পিতৃনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ভূষণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিন্তামণি কবিত্বগুণে তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ শাহ্জাহাঁর দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি হিন্দী ভাষায় "ছন্দোবিচার", "কাব্যবিবেক", "কবিকুল-কল্পতরু", "কাব্যপ্রকাশ", রামায়ণ ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলন ও বিবিধ কবিতার রচনা করিয়া হিন্দি-সাহিত্যের আচার্য্য-সমাজে আসন লাভ করিয়াছেন।

মতিরাম ভূষণের অনুজ। তিনি নানা স্থানের দেশীয় ভূপতিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া হিন্দী সাহিত্যের সেবা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে "ললিত-ললাম" "ছন্দসার" ও "রসরাজ" এই তিনখানি অতি প্রসিদ্ধ। "অলঙ্কার পঞ্চা-শিকা" নামক তাঁহার আর একখানি গ্রন্থের বিষয়ও অধুনা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র রাজ্য-সংস্থাপক ছত্র-পতি শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজীর রাজসভায় থাকিয়া তিনি বহুদিন তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, "শিবসিংহ-সরোজ" নামক হিন্দী গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

ভূষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম জটাশঙ্কর। স্থানে স্থানে তিনি নীলকণ্ঠ ত্রিপাঠী নামেও অভিহিত হইয়াছেন। কতি-পয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ভিন্ন তাঁহার রচিত কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

কবিবর ভূষণও তাঁহার সহোদরদিগের ন্যায় কতিপয় উৎকৃষ্ট কাব্য গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কবিতার গতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিল। বোধ হয় এই কারণেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিকাশেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ভূষণের ভ্রাতৃবর্গ যখন পিতৃদত্ত শক্তির বিকাশ দেখাইয়া ধনবান্ ব্যক্তিদিগের চিত্তবিনোদন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভূষণের হৃদয়ে তখনও কবিতার অঙ্কুর উদ্গত হয় নাই। তিনি তখনও

(১) তিনমৈ আয়ো এক কবি, ভূষণ কহিয়ত্ জাহি॥
দ্বিজ কনৌজ কুল কশ্যপি, রত্নাকর-সুত ধীর।
বসতি ত্রিবিক্রমপুর সদা তরণী-তনুজা-তীর॥ শিবরাজ-ভূষণ।

সহোদরগণের সৌহার্দ্দ্য-গুণে উদ্বেগশূন্য চিত্তে সংসারের সুখতপ্ত ক্রোড়ে লালিত হইতেছিলেন। কিন্তু গৃহে মুখরা ভ্রাতৃজায়া থাকিলে অনেকের পক্ষেই বহুদিন নির্ব্বিবাদে ভ্রাতার অন্নধ্বংস করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভূষণেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। ভ্রাতৃ-জায়ার বিদ্রূপবক্র তিরস্কারে ভূষণ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিলেন।

কবির পক্ষে রাজাশ্রয়-গ্রহণ ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের অন্য সুগম পন্থা সেকালে ছিল না। এই কারণে গৃহত্যাগের পর কুমায়ু নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের নরপতি উদ্যৎচন্দ্রের সভায় ভূষণের উদয় হইল। তাঁহার কথালাপ-চাতুর্য্যে ও কবিত্ব-গৌরবে মুগ্ধ হইয়া কুমায়ু-নরেশ তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন। ভূষণ রাজার সন্নিধানে থাকিয়া নিত্য নূতন কবিতা-প্রসঙ্গে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল তথায় অবস্থানের পর কবি স্বদেশগমনের বাসনা প্রকাশ করিলে ভূপতি বহুমান পুরঃসর তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক-প্রদানে সন্তুষ্ট করিলেন। অতঃপর কবির সহিত বিদায়-সম্ভাষণ-প্রসঙ্গে তাঁহার কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসার পর রাজা বলিলেন,—"ভূষণ! পৃথিবীতে এরূপ প্রভূত পুরস্কার-দাতা তুমি আর কোথাও পাইবে না!" ব্রাহ্মণ সন্তান ভূষণ অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরচিত্তানুরঞ্জনব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও কুমায়ুপতির এই গর্ব্বোক্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! এরূপ দাতা জগতে শত সহস্র বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু যিনি লক্ষ মুদ্রাকেও, অহঙ্কারপূর্ব্বক প্রদত্ত বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞানে স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করেন, এরূপ যাচক কখনও আপনার দৃষ্টিগোচর হইবে না!" এই কথা বলিয়া কবিবর ভূষণ ভূপতির প্রদত্ত ধনরাশির প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ-পূর্ব্বক রাজসভা ত্যাগ করিলেন। ভূষণের হৃদয় যে তেজোময় অনলরাশির আধারস্বরূপ ছিল, এই প্রকারে তাহার প্রথম স্ফুলিঙ্গ কুমায়ুবাসীর নয়নগোচর হইল!

যাঁহার হৃদয় এরূপ তেজস্বিতার আধার ছিল, তিনি যে স্বদেশের পরাধীনতা ও শাসককুলের অত্যাচার দর্শন করিয়া মূকভাবে অবস্থান করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে; তাই ভূষণের কবিতায় আমরা স্বাধীনতার তন্ত্রীরব শুনিতে পাই। কথিত আছে, বাল্যাবধি যবন-সেবার প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে বিরাগ যবন-বিদ্বেষে পরিণত হয়। বিধর্ম্মী শাসকের হস্তে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র-সমূহের দুর্দ্দশা, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নির্য্যাতন প্রভৃতি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে মোসলমান শাসনের উচ্ছেদ-কামনা বলবতী হইয়াছিল। ওজস্বিনী ভাষায় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ভূষণের অসা-ধারণ ছিল। উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা-রচনায় তিনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসের সমাবেশে তাঁহার কবিতা শ্রোতৃবর্গকে উত্তেজিত করিত, দুর্ব্বল ব্যক্তির হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিত, হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রাণে স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিত! স্বদেশ-বাসীকে আত্মশক্তি-বিষয়ে আস্থাবান্ করিবার জন্য তিনি হিন্দুবীরত্বের গৌরবগাথা রচনা করিয়া দেশে দেশে ও গ্রামে গ্রামে গান করিয়া বেড়াইতেন। তিনি যেখানে কোনও হিন্দুনরপতিকে যবনশাসনের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে দেখিতেন, সেইখানেই উপস্থিত হইয়া স্বীয় উন্মাদনী কবিতা দ্বারা তত্রত্য হিন্দুদিগের হৃদয়ে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে যত্নশীল হইতেন। হিন্দু সমাজকে জাতীয়ত্ব-রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁহার কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ভূষণ স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। যে সকল ভার-তীয় রাজন্য দিল্লীশ্বরের চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়া মোগল-দিগের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতেন, ভূষণ কখনও জীবিকার জন্য তাঁহাদিগের ছায়া স্পর্শ করেন নাই। এই কারণে আমরা তাঁহাকে মহারাষ্ট্র-রাজ্য-সংস্থাপক মহাত্মা শিবাজী ও বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের স্বাধীনতা-সম্পাদনকারী রাজা "ছত্রশাল" ভিন্ন আর কাহারও সভায় আসন গ্রহণ করিতে দেখি না। মহারাষ্ট্রীয় চরিতাখ্যায়কগণ বলেন,—কুমায়ু-রাজের সভা পরিত্যাগের পর মোগল শাসনের উচ্ছেদ-প্রয়াসী হিন্দু ভূপতির অনুসন্ধান করিতে করিতে ভূষণ দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন। সেই সময়ে প্রাতঃ-স্মরণীয় ছত্রপতি শিবাজী মহারাষ্ট্র ভূমিকে যবনদিগের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছিলেন। হিন্দু স্বাধীনতাপ্রয়াসী শিবাজীর অধ্যবসায়াদি সন্দর্শন করিয়া ভূষণের বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হইল। শিবাজী তাঁহার স্বদেশানুরাগপূর্ণ বীর-রস-প্লুত কবিতাবলী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলে। শিবাজীর সহিত

ভূষণের মিলনে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল। স্বাধীন মহারাষ্ট্রপতির আশ্রয়লাভ করিয়া ভূষণের কবিতার উৎস খুলিয়া গেল। নিত্য নূতন কবিতা-রচনা দ্বারা তিনি জাতীয় সাহিত্যকে বীরশ্রীতে বিভূষিত ও যবন-দলনে শিবাজির উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, শিবাজীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারকালে ভূষণ গাহিয়াছিলেন—

ইন্দ্র জিমি জম্ভপর, বাড়ব সুঅম্ভপর,
রাবণ সুদম্ভ পর রঘুকুল রাজ হ্যায়।
পৌন বারি-বাহ পর শম্ভু রতিনাহ পর,
ত্যোঁ সহস্রবাহ পর রাম দ্বিজরাজ হ্যায়।
দাবা দ্রুমদণ্ড পর চিতা মৃগঝুণ্ড পর,
ভূষণ, বিতুণ্ড পর জৈসে মৃগরাজ হ্যায়।
তেজ তিমিরংশ পর কাহু জিমি কংস পর,
ত্যোঁ ম্লেচ্ছবংশ পর শের শিবরাজ হ্যায়॥

জম্ভাসুরের পক্ষে যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র, সমুদ্রের পক্ষে বাড়বাগ্নি, দাম্ভিক রাবণের পক্ষে রঘুকুলরাজ রামচন্দ্র, মেঘের পক্ষে পবন, রতিপতির পক্ষে মহাদেব, সেইরূপ সহস্র বাহু অর্জ্জুনের পক্ষে দ্বিজরাজ পরশুরাম (অন্তক সদৃশ ছিলেন)। আর দ্রুমরাজির পক্ষে যেরূপ দাবাগ্নি, মৃগযূথের পক্ষে যেরূপ চিত্রক (চিতা বাঘ), হস্তীর পক্ষে যেরূপ মৃগরাজ, তিমিরের পক্ষে যেরূপ কিরণ-জাল, কংসের পক্ষে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ভূষণের মতে, ম্লেচ্ছকুলের পক্ষে সিংহবিক্রম শিবরাজও সেইরূপ (যমতুল্য)।

এই কবিতার আবৃত্তি করিয়া ভূষণ পঞ্চ হস্তী সহ পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি মহারাষ্ট্রপতির রাজকবির পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ভূষণের উন্মাদনা-পূর্ণ কবিতায় অনেক সময় শিবাজীর অবসন্ন প্রাণে তাড়িত শক্তির সঞ্চার হইত, তাঁহার উদ্দীপনা শিবাজীকে নৈরাশ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিত। শিবাজীর সৈন্যনির্য্যাণ-সময়ে ভূষণ যখন গাহিতেন,—

প্রেতনী পিশাচর নিশাচর নিশাচরীন,
মিলি মিলি আপস্‌মে গাওত বধাই হ্যায়;
ভৈঁরো ভূত প্রেত, ভূতী ভূয়র ভয়ঙ্করসে,
যুথ যুথ যোগিনী জমাত জুরি আই হ্যায়।
কিলক কিলক কৈ কুতূহল করত কালী,
ডিমক ডিমক ডৌরু দিগম্বর বজাই হ্যায়;
শিবা পুছে শিবসো সমাজ আজ কহাঁ চলে?
কাহুপৈঁ শিবনরেন্দ্র ভ্রূকুটী চঢ়াই হ্যায়॥

পিশাচী ও পিশাচ ও নিশাচর ও নিশাচরী দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পরকে অভিনন্দিত করিতেছে! বহু-সংখ্যক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ভৈরব, ভূত, প্রেত, ভূত-পেত্নী ও যোগিনীকুল যূথবদ্ধ হইয়া দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে। অট্টহাস্যচ্ছটায় কালিকাদেবী কৌতুক প্রকাশ করিতেছেন। দিগম্বর ডিমিকি ডিমিকি শব্দে ডমরু বাজাইতেছেন, এই সকল দেখিয়া শিবানী শিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "আজ এই সমাজ লইয়া কোথায় যাওয়া হইতেছে?" (উত্তরে মহাদেব বলিতেছেন)—"শিব-নরেন্দ্র আজ কোনও শত্রুর প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়াছেন।"

তখন হিন্দুসৈনিকদিগের ধমনীতে শোণিতবেগ কিরূপ বর্দ্ধিত হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার যখন তিনি গাহিতেন,—

কুম্ভকরণ অসুর অবতারী অওরঙ্গজেব,
কীন্হী মথুরা কতল দুহাই ফেরি রবকি।
খোদ ডারি দেবীদেব সহর মহল্লা বাঁকে,
লাখোঁ কিয়ে মুসল্লা মালা ছুট গই তবকী।
ভূষণ ভণত, ভাগ্যো কাশীপতি বিশ্বনাথ,
অওর কৌন গিন্‌তি মৈ ভুলি গত ভবকী;
চারো বরণ ধর্ম্মছোড় কল্‌মা নিওয়াজ পঢ়ে,
শিবাজী ন হোতা তো সুন্নত হোতী সব্‌কি॥

অওরঙ্গজেব অসুরাবতার কুম্ভকর্ণের ন্যায় সর্ব্বসংহারক। সে মথুরাক্ষেত্রের দেব দেবী, উৎকৃষ্ট সহর মহল্লা প্রভৃতি খুঁড়িয়া ফেলিয়া ও বহুব্যক্তির নিধন সাধন করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব ঘোষণা করিয়াছে। তত্রত্য লক্ষ লক্ষ লোককে তিলকমালাদি ত্যাগ করাইয়া মোসলমান করিয়াছে। ভূষণ বলে, আর অপরের কথা কি বলিব, স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বনাথ তাহার ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। চারি বর্ণের লোকই এখন স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া কল্‌মা নমাজ পড়িতেছে। শিবাজী না থাকিলে এতদিন সকলেরই সুন্নত হইত, সন্দেহ নাই।

বেদ রাখে বিদিত, পুরাণ রাখে, সারসুত!
রামনাম রাখ্যো অতি রসনা সুঘরমে,
হিন্দুন্‌কি চোটী রোটী রাখি হ্যায় সিপাহিন্‌কি,
কাঁধেমে জনেউ রাখ্যো মালা রাখি গরমে।

মীড় রাখে মুগল, মরোড় রাখে বাদশাহ,
বৈরী পীস রাখে বরদান রাখে করমে,
রাজনকি হদ্দ রাখি তেগ-বল শিবরাজ,
দেব রাখ্যো দেবল, স্বধর্ম্ম রাখ্যো ঘরমে।

হে সার-সুত (সুপুত্র)! তুমি বেদকে বিদিত রাখিয়াছ, পুরাণসমূহের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছ, তুমি সকলের সুন্দর রসনায় রামনাম রাখিয়াছ। তুমি হিন্দুদিগের শিখা, শিপাহীদিগের অন্ন, (ব্রাহ্মণের) স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ও (ভক্তের) গলায় মালা রক্ষা করিয়াছ। তোমার প্রতাপে মোগলগণের হৃদয়ে দুঃখ-শল্য রোপিত হইয়াছে, বাদশাহ হৃদয়ে দুশ্চিন্তা পোষণ করিতেছেন। তুমি বৈরীদিগকে নিষ্পেষিত অবস্থায় রাখিয়াছ, এবং হস্তে অভয় দান করিতেছ। হে শিবরাজ! অসিবলে তুমি সকল রাজার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি মন্দিরে দেবতা ও সকলের গৃহে গৃহে স্বধর্ম্মরক্ষা করিয়াছ!

গরুড়কো দাবা জৈসে নাগকে সমূহ পর,
দাবা নাগযূথ পর সিংহ সিরতাজকো;
দাবা পুরুহূতকো পহারন্‌কে কুলপর,
পক্ষিণকে গণপর দাবা জৈসে বাজকো
ভূষণ অখণ্ড নবখণ্ড মহীমণ্ডলমে,
তম পর দাবা রবিকিরণ সমাজকো;
পূরব পঁছাহ দেশ উত্তরতে দখিন লৌঁ,
জহাঁ বাদশাহী তহাঁ দাবা শিবরাজকো॥

সর্পকুলের উপর গরুড়ের, হস্তিযূথের উপর পশুরাজের, পর্ব্বতনিচয়ের উপর পুরুহূত ইন্দ্রের, পক্ষিকুলের উপর শ্যেনের, এই নবখণ্ডময় সমগ্র মহীমণ্ডলের তমোরাশির উপর রবি-কিরণমালার যেরূপ অধিকার বা দাবী, সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত (ভারতের) যেখানেই যবনশাসন (বাদশাহী) আছে, সেইখানেই শিব-রাজের আক্রমণাধিকার বিদ্যমান, অর্থাৎ মোসলমান-শাশিত প্রদেশ মাত্রের উদ্ধারে শিবাজী যত্নশীল।

মার কর বাদশাহী খাকশাহী কিন্হী জিন,
জের কিন্হী জোরসো লেই হদ্দ সব মারেকি;
খিসগই সেখী ফিসগই শূরতাই সব,
হিসগই হিম্মত হজারো লোগ প্যারেকি।
বাজত দমামে লাখোঁ ধৌসা আগে ধুর জাত,
গরজত মেঘ জ্যোঁ বরাত চঢ়ে ভারেকি;
ভুল্লো শিবরাজ ভয়ো দচ্ছনী দমামেওয়ালে,
দিল্লী ভুলহিন ভয়ো শহর সিতারেকি॥

যিনি সমরানলে বাদশাহীকে খাকশাহীতে (ভস্মরাশিতে) পরিণত করিয়াছেন, বলপূর্ব্বক তাহার সমস্ত সীমা অধিকার করিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়াছেন, যাঁহার প্রতাপে সহস্র সহস্র বাদশাহী সৈন্যের দর্প চূর্ণ, বীরত্ব নিঃশেষিত ও সাহস বিলুপ্ত হইয়াছে, যাঁহার লক্ষ লক্ষ দামামা ও ঢক্কানিনাদ দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শ্রুত হইয়া বরযাত্রীর সমারোহের অনুকরণ করিতেছে, সেই শিবরাজ এখন বর বা বিবাহের পাত্র হইয়াছেন, তাঁহার দক্ষিণী সৈন্য দামামা-বাদক হইয়াছে, এবং দিল্লী নগরী সেতারা সহরের (অধিপতি শিবজীর) বধূ হইয়াছে!

তখন শিবজীর ন্যায় প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে নবোৎসাহের সঞ্চার হইত, স্বধর্ম্ম-রক্ষা ও হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন বিষয়ে যত্নশীল হইবার বাসনা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইত। এরূপ উৎসাহবর্দ্ধনী কবিতাবলী হিন্দী সাহিত্যে দুর্ল্লভ। হিন্দী সাহিত্য-কোবিদ্‌গণের মতে, ভূষণ আদিরস-বহুল হিন্দীসাহিত্যে অদ্ভুত স্বদেশানুরাগপূর্ণ বীররসের অবতারণা করিয়াছিলেন; অন্য কোনও হিন্দীকবি তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। অর্থগৌরব, পদলালিত্য ও উপমা-লঙ্কারাদির বিন্যাসগুণেও তিনি স্বদেশীয় কবীন্দ্রসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থানলাভ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শিবাজীর ন্যায় শৌর্য্যশালী স্বাধীন ভূপতির আশ্রয় ও উৎসাহ পাইয়াই ভূষণের কবিত্ব-শক্তি এরূপ প্রগল্‌ভতা লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং ভূষণও একথা নিম্ন-লিখিত কবিতায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

"শিব-চরিত্র লিখি রোঁ ভয়োঁ কবি ভূষণকো চিত্ত।
ভাঁতি ভাঁতি ভূষণনিসৌ ভূষিত করোঁ কবিত্ত॥"

অর্থাৎ শিবাজীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া কবিবর ভূষণের চিত্তে কবিতাসুন্দরীকে নানালঙ্কারে বিভূষিত করিবার বাসনা উদ্দীপিত হইল। সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা "শিবরাজ-ভূষণ কাব্য" নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত "ভূষণ-হাজরা" "ভূষণ-উল্লাস" "দূষণ-উল্লাস" "শিবা-বাওনী" "ছত্রশালদশক" প্রভৃতি ক্ষুদ্র

বৃহৎ কয়েকখানি গ্রন্থও এই কবির লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে "শিবরাজ-ভূষণ কাব্য" খানি ১৭৩০ বিক্রমাব্দে বা ১৬৭৩ অব্দে রচিত হয় বলিয়া ঐ গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে।

চারি পাঁচ বৎসরকাল মহারাষ্ট্রদেশে অবস্থানের পর আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভূষণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। বিদায়কালে মহারাজ শিবাজী তাঁহাকে গজবাজী রত্নাদিসহ লক্ষাধিক মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াও কবি সময়ে সময়ে মহারাজের নিকট অনেক বহুমানসূচক উপঢৌকনাদি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভূষণ বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীন নরপতি ছত্রশালের সভায় গমন করেন। ছত্রপতি শিবাজীর উদ্দীপনায় রাজা ছত্রশাল বুন্দেলখণ্ডকে মোগল সম্রাটের শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে স্বাধীনতার উপাসক ভূষণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় বীররসবর্দ্ধিনী কবিতাদ্বারা তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য বুন্দেলখণ্ডে পদার্পণ করেন। রাজা ছত্রশাল প্রথিত-যশা কবির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন কবি তাঁহার অতুল শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া গাহিলেন,—

নিকসত ম্যানতেঁ ময়ূখেঁ প্রলৈ ভান কৈসী,
ফারৈ তম তোমর গয়ন্দনকে জালকো ;
লাগত লপট কণ্ঠ বিরিনকে নাগিন্সী,
রুদ্র হি রিঝাবৈ দৈ দৈ মুণ্ডনকী মালকো।
লাল ছিতিপাল ছত্রশাল মহাবাহুবলী,
কহাঁলো বখান করোঁ তেরী করবালকো ;
প্রতিভট-কটত কটালে কেতে কাটি কাটি,
কালিকাসী কিলকী কলেউ দেত কালকো।"

প্রলয়কালীন ভানুর প্রচণ্ড ময়ূখমালার ন্যায় যাঁহার অসি নিষ্কোষিত হইবা মাত্র তমোরাশিকে বিনষ্ট করে, যাঁহার অসি বৈরিকণ্ঠে "নাগিনীর" ন্যায় সংলগ্ন হয়, ও মুণ্ডমালা দানপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে নিত্য সন্তুষ্ট করে, সেই মহাবাহুবলসম্পন্ন প্রিয় ক্ষিতিপাল ছত্রশাল! তোমার করবালের প্রশংসা আমি আর কত করিব! তোমার অসিধারা শত্রুপক্ষীয় কটকের শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক কালিকাদেবীর ন্যায় কালকে প্রাতরাশ প্রদান করে।

কীবেকে সমান প্রভু ঢুণ্ঢ দেখ্যো আন পৈ,
নিদান দান যুদ্ধমে ন কোউ ঠহরাত হ্যায় ;
পঞ্চম প্রচণ্ড ভুজদণ্ডকো বখান শুনি,
ভাজিবেকোঁ পক্ষীলোঁ পঠান থহরাত হ্যায়।
শঙ্কামান সুখত আমীর দিল্লীবারে জব,
চম্পতকে নন্দকে নগারে ঘহরাত হ্যায় ;
চহু ওর তকিত চকত্তাকে দলন পর,
ছত্তাকে প্রতাপকে পতাকে ফহরাত হ্যায়॥

ভাবার্থ এই যে—আপনার সহিত যুদ্ধে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। পঞ্চমবংশীয়ের (ছত্রশালের) ভুজদণ্ডের প্রতাপ শ্রবণ করিয়া পাঠানেরা শ্যেনবিতাড়িত পক্ষীর ন্যায় থরথর কম্পমান হয়। চম্পৎরায়ের পুত্রের রণভেরী যখন গম্ভীর ধ্বনি করে, তখন দিল্লী অঞ্চলের লোকের শঙ্কাকুল হৃদয় শুষ্ক হইতে থাকে। ফলতঃ চারিদিকে চাকতাইদিগের (মোগলদিগের) দলের উপর ছত্রশালের প্রতাপসূচক জয়পতাকা পত পত শব্দে উড়িতেছে।

কথিত আছে, রাজা ছত্রশাল এ সকল অমূল্য কবিতার উপযুক্ত মূল্য প্রদানে অসমর্থ হইয়া ভূষণের শিবিকা বহনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সহৃদয় কবি নরবরকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার বহুল প্রশংসাপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি দ্বারা প্রতিসম্মানিত করিলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

ছোট বৌ।

(গল্প)

(১)

"মরণও ত নেই—ম'লে হাড় জুড়'ত।" এই বলিয়া জনৈক বর্ষিয়সী রান্নাঘরে ত্রস্তে প্রবেশ করিলেন।

"কেন—কি হ'য়েছে মা? অমন ক'রে কা'কে গাল দিচ্ছ?" কোন নবীনা বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই কথা বলিয়া রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল।

"কি আর হ'বে—আমার শ্রাদ্ধ আর পিণ্ডি। এক কড়া দুধ সব উৎলে প'ড়ে গেছে, আহা বাছারা আমার সারাদিন না খেয়ে মারা যাবে। সর্ব্বনাশী ম'লে ত বাঁচতুম্, ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তুম্।"

মেয়ে দেখিল কটাহের দুগ্ধ উথলিয়া রান্নাঘরের মেজে তরঙ্গায়িত; বৃদ্ধা কটাহের অবশিষ্ট দুগ্ধটুকু সন্তাড়নে তৎপর হইয়া তাঁহার পুত্রবধূর উদ্দেশে উক্ত প্রকার শুভ চিন্তায় উত্তেজিত হইয়াছেন।

কন্যা বলিল—"ছি মা! অমন ক'রে গাল দিলে ছোট বৌদিদি মনে বড়ই কষ্ট পাবে।"

"গাল্ দেব না পূজো ক'রবো।" বৃদ্ধা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুই বাছা আর জ্বালাস্‌নি। ওতেই ত যত আস্পদ্ধা পায়। সব দুধ খানি ফেলে দিলে আর আমার বাছারা আজ যে না খেয়ে মারা যাবে?"

"তুমি মা বড় অন্যায় ক'রে বল কিন্তু। কড়া থেকে দুধ উৎলে পড়েছে, সে ফেল্‌লে কেমন ক'রে?"

বৃদ্ধা আরও রাগান্বিতা হইয়া বলিলেন,—"আমি ত সবই অন্যায় ক'রে বলি—আমার কাজই ঐ। তোরা সব যা বলিস্ করিস্ সবই ন্যায়। এখন সবাই তোর ছোট বৌদিদির পা ধুয়ে খাবে এখন।" এই বলিয়া ক্রোধান্বিতা জননী সবলে দুধের কাটি দূরে ফেলিয়া গণ গণ করিতে করিতে উঠিয়া গৃহান্তরে গেলেন।

"ও ঘরে গোল কিসের গা?" এই বলিয়া জনৈক যুবতী বাহির হইলেন। তাঁহার তাম্বুল রাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিস্ফারিত, তন্মধ্য হইতে শুভ্র দন্তপংক্তি অল্প পরিদৃশ্যমান হইতেছিল। যুবতী বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, দেহ যষ্টিকে ধনুকের ন্যায় বাঁকাইয়া নাতিদীর্ঘ একটী হাই তুলিলেন, পরে চূর্ণকুন্তলগুলিকে সযত্নে গুচ্ছ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্তা যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনু, কিসের গোল লা? মায়ের গলার আওয়াজ শুন্‌লুম না?"

"আর বাছা শুন্‌বে কি রান্না ঘরে এসে দেখে যাও আর তোমরা বল, আমি মিছে ক'রে লোকের নামে নাগা নাগি করি কি মিছে ক'রে বকি।"

যুবতী ততটা কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মতা হইলেন না। গ্রীবা হেলাইয়া অর্দ্ধ মুদিত চক্ষু দুটিকে ঈষৎ বাঁকাইয়া বিরক্তির ভাব জ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন,—"কি হ'য়েছে ব'ললেই ত হয়। আমি বাপু অত শত বায়নাক্কা বুঝি নি।"

বৃদ্ধা ত্রস্তে বলিলেন,—"তা মা আমি ত তখনই বলেছিলুম অমন বাপ-মা-খেকী মেয়ে ঘরে এন না—সংসার উচ্ছিনি যাবে। তখন তোমরা আমার কথা শুন্‌লে না।"

যুবতী এইবার রাগত হইলেন। সুবঙ্কিম ভ্রূদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া লাল ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া বলিলেন,—"তুমি ত যখন তখন ঐ খোঁটা দাও। আমি ত কোমর বেঁধে আর তোমার ছেলের বে দিতে যাই নি। যারা মোড়লী ক'রে বে দে'ছেল তাদের বল গে।" এই বলিয়া যুবতী 'তাদের' উদ্দেশে নানাপ্রকার মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা প্রমাদ গণিলেন। ইতিমধ্যে একটী অষ্টম বৎসরের বালিকা তথায় উপস্থিত হইয়া যুবতীর অঞ্চল ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—"ওমা দেখ্‌বি আয় রান্না ঘরের মেজেয় দুধের ঢেউ খেল্‌ছে। ছোট কাকীমা সব দুধটুকুন ফেলে দিয়েছে। কড়ায় আর একটুও দুধ নেইকো।"

বৃদ্ধা তখন বিনাইয়া বিনাইয়া আদ্যোপান্ত দুগ্ধবিষয়ক ইতিহাস ব্যাখা করিলেন। বলা বাহুল্য আবেগের বেটীর যে সবই দোষ, তাহা বিশেষ করিয়া বড় বৌমাকে বুঝাইবার জন্য তাহাতে রংফলাইতেও ভুলিলেন না। একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ—আর রক্ষা আছে? তার পর যাহা হইল তাহা আর লিখিলাম না—পাঠকগণ বুঝুন। অবশেষে যুবতী মেয়েটীকে "ছাই খাও" বলিয়া সজোরে একটী চপেটাঘাত করিয়া নিজ ঘরের অর্গল বদ্ধ করিলেন। মেয়ে এই আকস্মিক চপেটাঘাতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনু ওরফে বিনোদিনী তাহাকে কোলে লইয়া "মা লক্ষ্মী কেঁদনা," "খাবার দেব" প্রভৃতি প্রলোভনে সান্ত্বনা করিতে করিতে বলিলেন,—"মা! এই ভরা দুপুর বেলা, তুমিই এই গোলটা বাধালে। ছোট বোয়েরও বাপু কোন দোষ নাই—সে ব'সে দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। বড় বৌদিদি বল্‌লেন, ও রেখে এসে খোকাকে ধর। আমাকে ডেকে রান্না ঘরে যেতে বল্‌লে—এতে আর বাপু কতই দোষ হ'য়েছিল! এইজন্যই বড় বৌদিদি কত বক্‌তে লাগ্‌লেন।"

"মিছে ক'রে কি আর বকেছে। এক কথা লক্ষ্মী-বার না বল্‌লে যে কাণে সেঁদোয় না। এত বল, নচ্ছার বেটীর কিছুতেই ত লজ্জা হয় না; আমাকে বাড়ীর বাঁদী মনে করে,—কথা বল্‌লে গ্রাহ্যি করে না। আমি নয় ব্যাটার বৌ ব'লে সইলুম, কিন্তু বড় বৌ পরের মেয়ে সে সইতে যাবে কেন?"

বিনোদিনী মনে মনে বলিল 'তুমি যা সও তা' ঈশ্বরই জানেন। প্রকাশ্যে বলিল,—"মা তুমি সইবে না ত কে সইবে। দেখ ওর মা-বাপ নাই—একটু যত্ন আইত্তি ক'রবার কেউ নাই। তুমি যদি যত্ন না কর—অমন ক'রে রাত দিন গাল দেও, আর খিট খিট কর তাহ'লে ও মনে বড়ই কষ্ট পা'বে। আহা ওর মুখখানি সদাই মলিন; ছেলে মানুষ, দুবেলা রেঁধে, আর এই সংসারের সব কাজ ক'রে এক তিলও জিরুতে পায় না। মা তোর দু'খানি পায়ে ধরি ছোটবৌকে আর অমন ক'রে বকিস্‌নি।"

মেয়ে মাকে বিস্তর অনুনয় করিল। বৃদ্ধা তখন শুইয়া নাতনীকে পাকা চুল তুলিতে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার অনুরোধে 'রাজপুত্র' 'রাজকন্যা' 'বিহঙ্গমী' প্রভৃতির রূপ কথা আরম্ভ করিলেন। বিনোদিনী ছোট বৌয়ের নিকট গেল।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী কলিকাতার নিকট কোন পল্লীগ্রামে। তিনি কলিকাতার কোন আপিসে এক শত টাকা বেতনে কেরাণীগিরি করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ বি, এ, পড়েন। উভয়ে প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়ত করেন। দেবেন্দ্র পূর্ব্বে নিস্ব ছিলেন, নিজ চেষ্টায় এখন একঘর গৃহস্থ হইয়াছেন। মাতা, ভ্রাতা ও একটী ভগিনী ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। দেবেন্দ্রের স্ত্রীর, তাঁহাদের গ্রামের মধ্যে, সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। দেবেন্দ্রের যখন ৩০৲ টাকা বেতন, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। দেবেন্দ্রের শ্বশুর নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন—বিবাহ একরূপ শাঁখা শাড়ী দ্বারাই হইয়াছিল। কন্যার পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দেবেন্দ্র এই বিবাহে সম্মত হন। আসল কথাটা কিন্তু বালিকার রূপ। দেবেন্দ্র মনে মনে বড়ই সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, মুখে কিন্তু বিপরীত।

বড় বৌয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই একটু দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার রূপ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার গর্ব্বে দেশে লোক থাকিত না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীর 'ধাত' মারিয়া দিলেন। তৎপরে ক্রমেই দেবেন্দ্রের বেতন বৃদ্ধি—'স্ত্রীভাগ্যে ধন' এই কথাটা তাঁহার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। বড় বৌ সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—মা কলের পুতুল—সর্ব্বদা ভীত। শ্লূষায় অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিলেন। বড় বৌয়ের একটী মেয়ে এবং দুটী ছেলে হইয়াছে। তিনি কোন কর্ম্মই করিতে পারেন না, সর্ব্বদা শরীরটা কেমন কেমন করে—তাহাতে আবার মাঝে মাঝে 'হিষ্টিরিয়া' হয়, সেইজন্য ডাক্তারে তাঁহাকে রান্না ঘরে যাইতে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। সংসারের খরচ পত্র বড় বৌই সব করেন, বাবু কিছুই দেখিতে পারেন না। তিনি সকালে আহার করিয়া আপিসে যান আর রাত্রে ফিরিয়া দুটি মুখে দিয়াই শয্যা অধিকার করেন। বড় বৌ সকালে সকালে আহারাদি সারিয়া বেলা ১টা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া থাকেন, পরে একে একে পাড়ার দু একজন প্রতিবেশিনী একত্র হইলে, তাহাদের সহিত তাস খেলেন, গল্প করেন, পরের কুৎসা করেন, অথবা 'বই শুনেন'। তিনি নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। তৎপরে গা ধুইয়া চুল বাঁধিতে প্রায় সন্ধ্যা হইত। দেবেন্দ্র বাবু আপিস হইতে আসিলে তাঁহার সহিত একথা সে কথা কহিয়াই বাকী সময়টা অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং তাঁহার অবসর মোটেই ছিল না—ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত কোলে নিবার সময় পাইতেন না। শাশুড়ীই সে কার্য্য করিতেন। ছোট বৌ একাকী সব কাজই করিত। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে বড় বৌকে তাঁহার ঘরে খাবার দিয়া আসিতে হইত, কারণ ঐরূপই ডাক্তারের আদেশ। সব কাজ সারিয়া ছোট বৌ প্রায় ২টার সময় আহার করিত। ইহার পর একটু বিশ্রাম করিবারও অবসর ছিল না, ছেলেকে দুধ খাওয়ান এবং তাহাকে শান্ত করিয়া রাখা আবশ্যক হইত, কারণ শ্বাশুড়ী একা ত আর তিনটী রাখিতে পারেন না। এত করিয়াও তাহার নিস্তার ছিল না, প্রায় প্রতি কাজেই তাহাকে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত। সামান্য ত্রুটিতে আর রক্ষা থাকিত না—যা মুখে আসিত, বড় বৌ তাই বলিয়া কটূক্তি করিতেন। শাশুড়ীও সেই সঙ্গে

যোগ দিতেন, কারণ তাঁহার পক্ষ হইয়া দু'চার কথা না বলিলে তিনি শাশুড়ীর উপর বিরক্ত হইতেন। এই জন্য বৃদ্ধা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ছোট বৌকে তিরস্কার করিতেন। দেবেন্দ্র ইহা না জানিতেন এমন নয়—তিনি প্রথম প্রথম স্ত্রীকে দু'এক কথা বলিতেন কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইত দেখিয়া তিনি ইদানীং আর কোন কথাই বলিতেন না। সত্য বলিতে গেলে, তিনি এখন স্ত্রীকে একটু একটু ভয়ও করিতেন।

(২)

বিনোদিনী ছোট বৌয়ের ঘরে গিয়া দেখিল ছোট বৌ নিদ্রিতা, কিন্তু বিনোদিনী নিঃশব্দে শয্যার নিকট গিয়া দেখিল, সে বাস্তবিক ঘুমায় নাই—কাঁদিতেছে। বিনোদিনী তখন ব্যথিত হৃদয়ে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে ছোট বৌয়ের হাত ধরিয়া কোমল স্বরে বলিল,—"ছিঃ বোন, এমন ক'রে শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছ বুঝি। এখন উঠে খাবে দাবে চল।" এই বলিয়া সে জোর করিয়া ছোট বৌয়ের হাত ধরিয়া শয্যা হইতে উঠাইয়া বসাইল। অনন্তর বিনোদিনী তাহার প্রতি সমবেদনা জানাইয়া নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সে যতই তাহাকে প্রবোধ দেয়, ততই চোখের জলে তাহার গণ্ডস্থল ভাসিয়া যায়। বিনোদিনীর চোখের কোণেও মুক্তার মত অশ্রু-বিন্দু দেখা না দিয়াছিল এমন নয়। সংসারের নিয়মই এই—ব্যথিতের অশ্রু তোমার অশ্রুকে টানিয়া বাহির করিবে।

বিনোদিনী জানিত ছোট বৌ এখনও অভুক্ত। সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় ছোট বৌ আহার করিবে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-পরম্পরা হইয়া গিয়াছে।

বি। এস ভাই খাবে এস। ভাতের উপর রাগ কেন?

ছো। আমি ভাই রাগ করিনি।

বি। তবে না খেয়ে পিত্তি প'ড়লে যে অসুখ ক'রবে।

ছো। অসুখ হ'লে লোকের কষ্ট হয়—আমার ভাই তার উল্‌টো। আমি অসুখ হবার জন্যে কত চেষ্টা করি, কিন্তু পোড়া অসুখ আমার হয় না ত।"

এই বলিয়া ছোট বৌ একটু হাসিল। বিনোদিনীও হাসিয়া ভাবিল বড়ই মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহার এই কথা কয়টী বাহির হইয়াছে।

বি। এমন ক'রে ক'দিন শরীর বইবে?

ছো। যে কয়দিন বয়। তুমি ত ভাই জাননা এমন আমার মাঝে মাঝে হয়—আমার অভ্যাস আছে।

বি। সাবাস বলি তোকে, তুই তাই এতটা সয়ে থাকিস। আমি হ'লে যে কি কত্তুম বল্‌তে পারি না; বোধ হয়—

ছোট বৌ যেন বিনোদিনীর মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"বোধ হয় বিষ খেয়ে সকল জ্বালার শেষ কত্তুম।"

কথাটা শুনিয়া বিনোদিনী শিহরিয়া উঠিল। ছোট বৌ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল—"ঠাকুরঝি অনেক আগে থেকে সেই মতলবেই ছিলুম, কিন্তু বোন, একটা কারণে এতদিন তা পারি নি।"

বিনোদিনী বুঝিল সেই 'একটা কারণ' কি। ছোট বৌয়ের দু'খানি হাত স্নেহভরে ধরিয়া কাতরতার সহিত বলিল—"ভাই, আমি জানি তুই নিতান্ত অবুঝ না। আমার মাথা খাস বল অমন অশুভ চিন্তাকে আর মনে ঠাঁই দিবি নি—আমার মাথায় হাত দিয়ে বল, নইলে আমি তোকে কিছুতেই ছাড়ব না।"

"এর আগে আর একজনের কাছে কড়ার করেছি, জানি নি ঈশ্বর তা রাখ্‌তে দেবেন কি না। তাঁর মুখ দেখে আর কথা শুনে আমার প্রতিজ্ঞা কোথায় ভেসে যায়—সব কষ্ট ভুলে যাই; তবে আর নতুন ক'রে দিব্যি করে কি হবে?" দুই বিন্দু অশ্রু বালিকার কপোল বাহিয়া পড়িল।

বিনোদিনী তাহার চক্ষু মুছাইয়া বলিল,—"ভাই তোর যে কি কষ্ট তা আমি সবই বুঝি। এই ক'দিন এসে অবধি বড়বৌ ও মায়ের অন্যায় দেখে মনে বড়ই কষ্ট হ'য়েছে। বড় বৌকে বল্লে তিনি রেগে বলেন, 'নে ছুঁড়ি তোর আর জ্যাঠামি ক'র্‌তে হবে না'। আর মাকে কত বুঝাই, কত হাতে পায়ে ধরি—নির্ব্বংশের বেটী তবুও ত বুঝবে না। বড় বৌয়ের ভয়েই মরেন। অত যদি ভয়, তবে এ সংসারে না থাক্‌লেই পারেন। দাদাকে ব'লে কাশী গেলেও ত পরকালের কাজ হয়। আচ্ছা

ভাই, দাদা এ সব কেমন ক'রে দেখেন। তিনি কি বড়বৌকে একটু ধম্‌কে বারন কর্‌তে পারেন না?"

ছোটবৌ এবার একটু মধুর হাসিয়া বলিল—"তিনি কি আর বল্‌তে কসুর ক'রেছেন। তিনি ব'লেই ত আরও বাড়াবাড়ি হ'য়েছে। উপর হ'তে কত্তা গিন্নিতে ঝগড়া হ'য়ে তিনি মাঝে মাঝে না খেয়ে আপিস গিয়েছিলেন।" এই বলিয়া ছোটবৌ আবার হাসিল।

বিনোদিনী এবার একটু চটিয়া কহিল—"নে ভাই তোর ও হাসি আমার ভাল লাগে না। যে পুরুষ নিজের মাগকে শাসন ক'রতে না পারে, তার সংসারে থাকা কেন?"

"তাহ'লে আমিও ঠাকুর জামাইকে ব'লে দেব যে, যখন ঠাকুরঝি দুষ্টুমি ক'রবে, তখন তিনি যেন তোমাকে খুব মতে শাসন করেন।"

বিনোদিনী সাদরে ছোটবৌয়ের গালে একটী ঠোনা মারিয়া সহাস্যে বলিল—"সেটা আর তোকে শিখিয়ে দিতে হবে না। আচ্ছা ছোট দাদা কি কোন কথাই বলেন না?"

"বলে 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর'। তাহ'লে কি আর রক্ষে আছে। একদিন বুঝি কি ব'লেছিল, তাই বড়গিন্নি চারদিন ঘরের বার হন নি—কেবল কেঁদে কেঁদে কর্ত্তাকে ব'লেছিলেন—'শেষে তোমার ছোট ভায়ের কাছে অপমানিত হলুম। আজই আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেবে, নইলে আমি আফিং খেয়ে ম'রব'। শেষে ঠাকুর বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্‌লেন 'আজই তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাব—সেখানে গিয়ে দিন কতক সুখভোগ কর'। সেইদিন থেকে সব সেরে গেল।"

বিনোদিনী মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—"সুখ ত কত—সেখেনে তিন দিন অন্তর একদিন চুলো জ্বলে। আরও যদি বাপের অবস্থা ভাল হ'ত, তবে বুঝি বা ঠ্যাকারে মাটীতে পা দিত না। দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু দেন ব'লেই তারা খেয়ে বাঁচে। আমার কাছে বাপের বাড়ীর বড়াই ক'রলে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতুম।"

"থাক অত বীরত্বে কাজ কি! তোর দাদা বড় দু'কথা শুনুতে পার্‌লেন তা তুই!" আবার সেই হাসি।

বিনোদিনী উত্তেজিত হইয়া বলিল—"দাদা যে মেগের গোলাম, তাই সাহসে কুলোয় না। ধিক্ অমন পুরুষ—মেয়েমানুষ হ'তে পারে নি। আমি আজই ছোটদাদাকে সব ব'লব—আরও তাঁর হাতে পায় ধরে ব'লব, তুমি আর এ সংসারে থেক না—আজই চাকুরীর চেষ্টা দেখ। চাকুরী হ'লে ছোটবৌকে নিয়ে আলাদা হও।"

"ভাই তোর পায়ে ধরে ব'ল্‌ছি, তুই তাঁকে কিছু বলিস্‌নি—আমার মাথা খাস্ বলিস্‌নি। শুন্‌লে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। এখন পরীক্ষার সময় তাঁর মন খারাপ হ'লে পড়া শুনোর ক্ষতি হবে। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সব কষ্ট সয়ে আছি।"

বিনোদিনী সাদরে ছোটবৌয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার অধরে একটী চুম্বন করিয়া বলিল,—"ভাই যদি কখন পুরুষ হ'য়ে জন্ম হয়, তবে যেন তোর মত স্ত্রী পাই!"

ছোটবৌ মুখ সরাইয়া লইয়া সহাস্যে বলিল—"দূর মড়া—তুই যে না ফলতেই এক কাঁদি চা'স্। র'স্ তোর দাদা এলে ব'ল্‌ছি, ঠাকুরঝি পুরুষ হ'য়ে আমায় বে ক'রতে চায়। তা'হলে আর কি ক'রবে, শাড়ী পরে ঘোমটা দিয়ে তুমিও ঠাকুর জামায়ের কাছে যাও!"

এবার দু'জনে গলা ধরিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময় বিনোদিনী মায়ের কর্কশ স্বর শুনিতে পাইল—"বিনু—অ-বিনু—বলি ছোটগিন্নিকে বল—ছেলে মেয়ের খাবার তোয়ের ক'রে দিন্। বেলা কি আর আছে। ঘাট ক'রেছিলেন, তাই দু'কথা হয়েছিল, তাই বলে কি সংসার ধর্ম্ম ছাড়তে হবে। ছেলে মেয়ে না খেয়ে যে খুন হ'লো—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ত আর তাদের পেট ভোরবে না।" ইত্যাদি।

শুনিয়া উভয়েই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছোট বৌ যে অভুক্তা ছিল, বিনোদিনী তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল।

[৩]

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। বসন্তের বাতাস ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে এবং জানালার মধ্য দিয়া চাঁদের কিরণ ঘরের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। জোৎস্নার আলো এক একবার মেঘে ঢাকা পড়িয়া বোধ হইতেছে যেন কোন সুন্দরী এক একবার ঘোমটা সরাইয়া নায়কের পানে তাকাইতেছে।

রাত্রি বারটা বাজিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া আহার করিতেছেন—স্ত্রী সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। বালিকার মুখখানি আজ যেন একটু বিষাদ মলিন বলিয়া বোধ হইতেছে। বাটীস্থ অপরাপর সকলেই নিদ্রিত—এমন কি সমস্ত গ্রামও সুপ্ত—নিস্তব্ধ; কেবল মাঝে মাঝে দূরে দু'একটী গ্রাম্য কুকুরের অস্পষ্ট রব শুনা যাইতেছিল।

নরেন্দ্র একমনেই আহার করিতেছিলেন—হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখেন বড় বড় মুক্তার মত দু' ফোঁটা জল তাঁহার স্ত্রীর চক্ষুকোণ হইতে গড়াইল। প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়া বালিকার অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইল। নরেন্দ্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—

"সেকি, তুমি কাঁদছ যে। কি হ'য়েছে সরোজ? আজ বুঝি নূতন একটা কিছু হ'য়েছিল।"

সরোজ কথা কহিল না, যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া ত্বরিত অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া স্বামীর দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু হাসিল।

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন—"এ যে দেখছি নন্দ নয়। শরৎকালের আকাশ, মেঘ দেখতে না দেখতেই জল—আবার তৎক্ষণাৎ মেঘ সরিয়া গেলে চাঁদের কিরণ ফুটিয়া বাহির হয়।"

বালিকার দৃষ্টি আরও কোমল হইল, হাসিটুকু অধিকতর মধুর বলিয়া বোধ হইল। নরেন্দ্র সমস্ত দিনের পরিশ্রম ভুলিয়া গেলেন।

নরেন্দ্র স্নেহভরে বলিলেন—"সরোজ তুমি আমার সহিত সমস্ত রাত মিছে ভোগ কেন? আমি রোজই তোমাকে বলি, সকালে সকালে খেয়ে দেয়ে ঘুমুবে। আমি পড়া শেষ ক'রে যখন ইচ্ছে খেয়ে শোব।"

সরোজ বলিল—"তা আমি পারবো না—তুমি না খেয়ে থাক্‌বে, আর আমি খেয়ে দেয়ে সুখে ঘুমুবো! মা ব'ল্‌তেন স্বামার পাতে খেলে বিধবা হয় না।"

"তোমার ঐ কেমন একটা গোঁ। কেন সবাই ত খেয়ে থাকে। বড় বৌদিদি প্রায়ই দাদার আগে খান!"

"তার যে অসুখ—তাই ডাক্তার বাবু সকাল সকাল খেতে বলেছেন। খেতে দেরি হ'লে তাঁর অসুখ আরও বাড়ে।" এই বলিয়া সরোজ আবার একটু হাসিল।

নরেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন—"অসুখ ত কিছুই দেখি না—বেশ শরীর, আহারে বিলক্ষণ রুচি, কোঁদলে ঝড়ের আগে যান; তবে অসুখটা বুঝি কেবল কাজ ক'রবার বেলায়। প'ড়ত আমার মত লোকের পাল্লায় ত দু'দিনে ঢিট্ হ'ত—অসুখ ফসুখ এদ্দিনে কোথায় পালাত!"

সরোজ দাঁতে অধর টিপিয়া বলিল—"ইস্! তোমরা দু'ভাই বোনেই যে দিদির উপর হাড়ে চটা।"

"হাড়ে চটা! আর তুমি ফুল চন্নন দিয়ে পূজা ক'রে থাক নয়? যা কর সেটা কেবল ভয়ে।"

নরেন্দ্র আহার করিয়া বাহিরে গেলেন। ছোট বৌ ইত্যবসরে তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া স্বামীর জন্য ডিবেয় করিয়া পান লইয়া শয়ন করিতে গেল! নরেন্দ্র পূর্ব্বেই শয্যা অধিকার করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র বলিলেন—"আজকার ব্যাপারটা বোধ হয় কিছু গুরুতর হ'য়েছিল, কেমন?"

"না।"

"না বই কি। কি হ'য়েছিল শুন্‌তে পাইনা কি? দেখ সরোজ, আজ কাল তুমি কেমন কেমন হ'য়েছ যেন। আগেকার মত আর এখন তুমি আমাকে কোন কথাই খুলে বল না; জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল ক'রে উত্তর দেও না। কারণ কি বল দেখি?"

"কারণ আবার কি। সব কথাই কি তোমার শুন্‌তে হবে; আর বলেই বা লাভ কি। শুনলে তুমি কেবল কষ্ট পাবে বইত না।"

"তবুও যে যাকে ভালবাসে, নিজের দুঃখের কথা তার কাছে ব'ল্‌লে কষ্টের লাঘব হয়—মন অনেকটা শান্ত হয়। তবে তুমি আমাকে ভালবাস না।"

সরোজ আর স্থির থাকিতে পারিল না—স্বামী প্রণয়ে সন্দেহ করিয়াছেন, ইহা বালিকার অসহ্য হইল। সে স্বামীর বুকে নিজের ক্ষুদ্র মস্তকটা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। নরেন্দ্র যত সান্ত্বনা করেন, তাহার আবেগ তত বৃদ্ধি হয়। পরে বালিকা কতকটা শান্ত হইয়া সেদিনকার ঘটনাগুলি একে একে সমস্ত বলিল। শুনিয়া নরেন্দ্র

হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন—কেবল স্ত্রীকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিকার অশ্রুসিক্ত অধরে চুম্বন করিয়া বলিলেন—

"এই জন্য তুমি এত দুঃখিত হ'য়েছ। এটা ত আজ নূতন না—তবে দুঃখ কিসের সরোজ! আমি ত কত দিন বলেছি, সহ্য করার চেয়ে গুণ আর নাই। সয়ে থাক! যিনি সকলের বিচার করেন, তাঁর কাছে কখন অবিচার হবে না। এমন দিন আস্‌বে যখন ভগবান তোমার দুঃখ বুঝবেন।"

সরোজ মনে মনে বলিল—সে আর আমি ম'লে। নরেন্দ্র স্নেহভরে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"যে যাই বলুক না কেন, আমি ত সবই নিজের চক্ষে দেখেছি। সংসারের সকলে তোমাকে যতই ঘৃণা করে, আমি ততই ভালবাসি, তবে আর দুঃখ কিসের?" উভয়ের ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিশিল।

সরোজ মনে মনে বলিল, তা না হ'লে এত দিন কোন কালে মরিতাম। অন্তর্যামী জানেন, তোমার মুখ দেখ্‌লে আমি মরার কথা ভুলে যাই।

[৪]

দেবেন্দ্র বাবু সংসারের কোন খবরই বড় একটা রাখেন না। এ দিকে সংসারে কলহ অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকল কলহের মূল ঐ ছোট বৌ। ছোট বৌয়ের দোষ অনেক; সে বড় বৌ ও তাঁহার ছেলে মেয়েদিগকে দু'চক্ষের বিষ দেখে। না করিলে নয় বলিয়া সংসারের কাজ করে, সে ত কেবল বেগার দেওয়া। দুবেলা দু'মুঠো রাঁধে—তাও কি ছাই রাঁধা, না সে ছাই খাওয়া যায়? তবে না খেলে নয় তাই বড় বৌ দুটী খান! 'বাবু' ও তাঁহার ছেলে মেয়ে না খেয়ে মরিবার হাল হইয়াছে। এই ত কাজ, এর জন্য ছোট বৌ কত গুমোর না করে; পাড়ার সকলের কাছে কত বাখান করে—তাঁহার নিন্দা করে। বড় বৌয়ের যদি শরীর ভাল থাকিত তাহা হইলে তিনি ৫ মিনিটে অমন দশটা সংসারের কাজ একাই করিতে পারিতেন! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইদানীং বড় বৌয়ের সুর ফিরিয়াছে। এখন তিনি কথায় কথায় বলেন—"কেন সংসারে না থাকিলে ত কেউ কাউকে ক'রতে বলে না। এত অসহ্য হয় নিজেদের দেখে শুনে নিলেই ত হয়। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কথাই আছে। এতকাল মানুষ ক'রেছে, লেখা পড়া শিখিয়েছে, বে থা দিয়েছে এখন রোজগার ক'রে মাগ নিয়ে আলাদা হ'লেই ত পারে। এক ঘোলে আর কত জল সয়।" পাড়ার গিন্নিদের কাছে বড় বৌ বলেন—আর দিদি কি বা শুন্‌বে—এমন কলিকালই পড়েছে। ছোট গিন্নির আমাদের ইচ্ছে তিনি আলাদা হ'য়ে সুখ ভোগ করেন। এ সংসারে থাক্‌লে খাট্‌তে হয় আমার ছেলে পুলের মুখ পানে চাইতে হয়, আমি খেতে দি নি, মাখ্‌তে দি নি, কথায় কথায় বকি আরও কত কি বলেন। তোমরা ত দেখ্‌ছ দিদি আমি সংসার ছেড়ে দিয়েছি। নিজে ক'র্‌ছেন কম্মাচ্ছেন, খাচ্ছেন, মাখ্‌ছেন—তা এত ক'রেও যদি তাঁর মন না পেলুম, তখন আলাদা হ'য়ে রাজরাণী হ'লেই ত হয়। সোয়ামীর এখন চোক কাণ ফুটেছে, আর ভেয়ের তাঁবে থাক্‌বেন কেন? তা আমি তাঁর পিত্তেশ করি নি। তোমাদের কাছে দু'মুঠো ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু ওঁদের কাছে যাব না। রাত দিন কর্ত্তা গিন্নিতে মৎলব আঁটছেন। আমি এত ক'রে মিন্‌সেকে বলি, তা মিন্‌সে কিছুতেই শুন্‌বে না—বলে তুমি ওসব কথা আমাকে বলো না। এখন ভাইকে এত ক'চ্ছেন, শেষে পস্তাবেন। কাঙ্গালের কথা বাশি হ'লে খাটে।

ফলতঃ দেবেন্দ্র ভাই ও বোনটীকে প্রাণের মত ভাল বাসিতেন। বড় বৌয়ের আচরণে তিনি মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রী অকারণে ছোট বৌকে নির্য্যাতন করিতেন এবং মাতাও সেই সঙ্গে যোগ দিতেন, ইহাতে তাঁহার আরও মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হইত। কিন্তু তিনি ইহা জানিয়াও প্রতিকার করিতে পারিতেন না। পিতৃমাতৃহীনা বলিয়া 'ছোট বৌমাকে' তিনি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে তিনি ভাল মন্দ কোন কথাই বলিতেন না। প্রথম বয়সে তিনি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছেন, এখন যদিও নদীতে ভাঁটা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি ভরা নদীর জোয়ারের বেগে কতকটা জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্র নিজের দুর্ব্বলতা বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত উৎসাহ হ্রাস হওয়ায় এখন তিনি গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছেন। কলহ

অশান্তি হইলেও তিনি এখন চাহিয়া দেখেন না। যে দিন নিতান্ত অসহ্য হয়, সে দিন তাঁহার বাল্যসুহৃদ ডাক্তার ভোলানাথ বাবুর নিকট গমন করেন।

অদ্য দ্বিপ্রহরের সময় বড় বৌয়ের ঘরে মজ্‌লিস্ বসিয়াছে। পাড়ার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তথায় উপস্থিত আছেন। কেহ পড়িতেছেন, কেহ গল্প করিতেছেন এবং স্বয়ং বড়বৌ তাঁহার সমবয়স্কাদের সহিত তাস খেলিতেছেন। বিনোদিনীও সেখানে ছিল, ছিল না কেবল ছোট বৌ। বিনোদিনীর ভাল লাগিল না, সে নিঃশব্দে উঠিয়া ছোট বৌয়ের ঘরে গেল। ছোট বৌ তখন খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। ছোট বৌ বলিল—"তুমি যে মজ্‌লিস্ থেকে চলে এলে?"

বি। আমার ভাই ও সব ভাল লাগে না, তাই তোর কাছে এলুম।

ছো। তুই ভাই আর মায়ের কাছে আমার কথা কিছু বলিস নি।

বি। কেন কিছু হয়েছে নাকি?

ছো। দিদি বলেন, ও কি বিনু বলে? ছোট বৌ আমার নামে সাতখানা ক'রে তার কাছে নাগায়—ও ছেলে মানুষ যা শোনে তাই বলে, ওর দোষ কি?

বিনোদিনী মুখভঙ্গি করিয়া কহিল—"ছেলে মানুষ যা শোনে তাই বলে বই কি। কেন আমি কি চোখের মাথা খেয়ে ব'সেছি যে কিছু দেখ্‌তে পাই নি। আমি ছেলে মানুষ কিছু বুঝি নি, আর উনি পাকা গিন্নি সবই বোঝেন।"

ছেলে মানুষ বলিলে বিনোদিনীর বড়ই রাগ হয়। তাহার বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক হইবে না। স্ত্রীকে চটাইবার ইচ্ছা হইলে বিনুর স্বামী তাহাকে ছেলে মানুষ বলিলেই সে রাগিত, তাহা দেখিয়া তিনি হাসিতেন।

বিনোদিনী ক্রোধভরে বলিল—"মাকে বলা না বলা সমান, তিনি যে ঐ একই গুরুর ছাত্র। এবার দাদাকে ব'লব—না হয় রাগ ক'রে আমাকে আর নাই আনবে। আমিও আর আস্‌তে চাই নি।"

ছোট বৌ মৃদু হাসিয়া বলিল—"তিনিও ত ঐ গুরুর ছাত্র।"

বি। ঠিক ব'লেছিস্। তিনি যে গুরুর চোক রাঙানির ভয়ে জুজু! হাসিও পায় আর কান্নাও আসে—বলে 'এক ভস্ম আর ছার'। ধন্যি মেয়ে যা হোক্!

এমন সময়ে অষ্টম বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা তথায় আসিয়া বলিল—"এই যে ছোট পিসিমা হেথায় ব'সে র'য়েছেন। আমি তোমাকে কত খুঁজে বেড়ালুম। মা যে তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

বি। কেন আমি ত আর আপিসে বেরুই নি যে তুই খুঁজে পাস্ নি। তুই যা আমি যাচ্ছি।

শীগ্‌গির এসো। ছোট কাকীমা, মা বোল্‌লেন, খোকা ঘুমুলে ও ঘরে গিয়ে পান সেজে দেবে এসো।" এই বলিয়া বালিকা প্রস্থান করিল।

বিনোদিনী বলিল—"মা ডাক্‌ছে বই কি! আমি কি আর কিছু বুঝি নি—'কুলোয়' শুয়ে তুলোয় ক'রে দুধ খাই কি না! আমি এসেছি দেখে মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, আমরা কি বলি না বলি তাই শুনবার জন্যে। মাগীর বজ্জাতি হাড়ে হাড়ে।"

ছোটবৌ। দেখ ভাই আমার আরও এক যন্ত্রণা হ'য়েছে ঐ মেয়েটার জন্যে। যে কথাটা হবে, ফুলি তখনই তা সাতখানা ক'রে মায়ের কাছে ব'লবে, আর আমাকে মিছে বকুনি খাওয়াবে।"

বি। যেমন গর্ভে জন্মেছে, তেমনি রীত প্রকৃতি হবে; তার উপর মায়ের দেখে ছায়ে শেখে। দেখ আমি বল্‌ছি ফুলিটে পাহাড়ে কারওয়ান হবে। যার ঘরে যাবে তার হাত তেতো ক'রবে।

ছোট বৌ। দেখ ঠাক্‌রঝি আজ ক'দিন থেকে আমার মনটা এমন খারাপ হ'য়েছে তা ব'লতে পারি নি।

বি। কেন ছোড়দাদা ব'কেছে বুঝি?

ছোট বৌ। দূর তা কেন।

বি। তবে কি?

ছোট বৌ। তা বল্‌তে পারি নি। আমার বোধ হয় শীগ্‌গিরই কোন একটা অমঙ্গল হবে।

বি। তোর যে আর কথা।

ছোট বৌ। কালরাত্রে তাঁকে বলেছিলুম—তিনিও আমাকে কত বুঝুলেন; কিন্তু তাঁরও মনটা তত ভাল না।

বি। তুই অমঙ্গলের কথা বলেছিলি, তাই ত তাঁর মনটা খ'রাপ হয়েছিল। আমি জানি, ছোড়দাদা তোকে

প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। নারীজন্মের সার জিনিষ—স্বামীর ভালবাসা তুই যথেষ্ট পেয়েছিস। ভাই তবে তোর আর দুঃখ কিসের?

ছোট বৌ একটু লজ্জিত হইল। কথাটা ঢাকা দিবার জন্য বলিল—"এই যে খোকা ঘুমিয়েছে। যাই ও ঘরে। আবার পান দিতে দেরি হ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।"

"ব'ক্‌লেই হ'ল—বকে ত আজ আমার কাছে শুন্‌তে পাবে। পরের শরীর বুঝি আর শরীর নয়—পাথর। সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু জিরুতে এলে ছেলে রাখ, পান দেও, জল দেও, যেন কেনা গোলাম পেয়েছে। নিজের শরীরটে ত খুব বোঝেন।" এই বলিয়া উভয়ে বড় বৌয়ের ঘরের দিকে গেল।

[৫]

বড় বৌয়ের ঘরে তাস খেলার খুব ধুম উঠিতেছে; 'ছক্কা' 'পঞ্জা'র ছড়াছড়ি। বড় বৌয়ের আজ বড়ই 'বে-পড়তা' হইয়াছে, খেলিতে বসিয়া অবধি হার হইতেছে। বড় বৌ তাঁহার নিজের খেলুড়েকে মাঝে মাঝে বাকতেছেন এবং তাহার খেলার দোষেই যে এত হারিতেছেন, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বারম্বার সকলকে সেই কথা শুনাইতেছেন। ছোট বৌ পান সাজিয়া সকলকে দিল, এমন সময় ফুলি তথায় উপস্থিত হইল। ছোট বৌ তাহাকে আদর করিয়া বলিল—

"ফুলি মা, একটা বার ওঘরে যা; খোকা সেখানে একা রয়েছে; ঘুমন্ত ছেলে যদি বিছানা থেকে পড়ে যায়, তবে খুন হ'য়ে যাবে।"

ফুলীমুখ ঘুরাইয়া বলিল—"আমি পারবো নাকো। আমার কাজ আছে।"

"একটীবার যাও মা; আমি এখনই যাচ্ছি। তখন তুমি যেখেনে ইচ্ছে যেও এখন।"

"তুই যদি আমাকে ঐটে পেড়ে দিস্, তা'হলে আমি এখনিই যাব।' এই বলিয়া বালিকা আলনার উপরস্থিত একটী কাচের খেলানা দেখাইয়া দিল। বড় বৌ একজন ফিরিওয়ালার নিকট হইতে ঐ খেলানাটী কিনিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা ঐটা লইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করে; কিন্তু তিনি তাহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহা ঐ উচ্চ স্থানে রাখিয়াছিলেন। বড় বৌ বেলওয়ারী খেলানা পুতুল বড় পছন্দ করিতেন। ছোট বৌ বলিল,

"তা আমি পারবো না বাছা—দেখলে তোমার মা আমায় খেয়ে ফেলবেন।"

বালিকা আরও আগ্রহের সহিত বলিল—"ছোট কাকীমা, তোর পায়ে পড়ি, একটীবার আমার হাতে দে, আমি দেখে আবার তোকে দোব, তুই তখন রেখে দিস্। মা ওদিকে ফিরে তাস খেল্‌ছে, দেখতে পাবে না।"

ইহাতে আপত্তির কোন কারণ না দেখিয়া ছোট বৌ খেলানাটী পাড়িলেন। বালিকা আগ্রহের সহিত তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, কিন্তু অসাবধানতা বশত উহা বালিকার হাত হইতে সানের মেজেয় পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল! বালিকা ভোঁ দৌড়!—আর ছোট বৌ একেবারে জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ!

ঝন্-ঝন্-ঝন্-ঝন্—বড় বৌ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার বড় যত্নের বেলওয়ারি খেলানা চুরমার! ঠিক তার একটু আগে বড় বৌ আর এক পঞ্জা হারিয়াছেন। ফুটন্ত তৈলে জল পড়িলে যেমন হয়, বড় বৌয়ের অবস্থা তাহাই হইল। আলু থালু বেশে দৌড়িয়া মেয়েকে ধরিতে গেলেন, মেয়ে সময় বুঝিয়া আগেই চম্পট দিয়াছিল। লাভের মধ্যে কাচভাঙ্গায় বড় বৌয়ের পা কাটিয়া রক্ত বাহির হইল! "উহুঃ গেলুম" পা টিপিয়া বড় বৌ সেখানে বসিয়া পড়িলেন। ব্যস্ত হইয়া ছোট বৌ জলের কুঁজো লইয়া তাঁহার আহত স্থানে ঠাণ্ডা জলের ধারা দিতে গেল। বড় বৌ কুঁজোয় পদাঘাত করত চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তোর আর গিন্নিপনায় কাজ নেই, তুই আমার সামনে থেকে যা।"

কুঁজোটা ভাঙ্গিয়া মেজেয় জলের ঢেউ খেলিল; ছোট বৌও সেই পদসঞ্চালনে পড়িয়া গেল। পিঠ ও বাঁ হাত কাচে কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ঘরের আর সকলেই অবাক হইয়া দেখিতেছিল। একজন ব্যস্ত হইয়া ছোট বৌয়ের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "ওমা, বড় বৌ কর্‌লি কি! বৌটা যে কেটে খুন হ'ল।"

বড় বৌ সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কড়া সুরে বলিলেন, "এমন নচ্ছার নোক আমি ভূ-ভারতে দেখিনি। আরও তোমরা যে বল, আমি মিছেমিছি বাক, ঝগড়া

করি, মানুষের চামড়া যার গায়ে সে এসব দেখে কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাক্‌বে।"

একজন সমবয়সী বলিল—"তা ভাই মিছে ওর দোষ দিলে চ'লবে কেন; আমি নিজের চোক্ষেই দেখলুম, তোমার মেয়েই ত খেলনাটা ভাঙ্গলে।"

"মেয়ের দোষ কি, সে চেয়েছিল, ও গিন্নিপনা ক'রে তাকে দিতে গেল কেন? আমার কাছে চেয়েছিল, আমি দি নি। আমার চেয়ে ওর দরদ বেশি হ'ল? বলে "মার চেয়ে যে ভালবাসে তাকে বলি ডান্'।"

"তা ছেলেমানুষ, এক কাজ ক'রে ফেলেছে—"

"ছেলেমানুষ—থুব্‌ড়ী ক'রে বিয়ে দিয়েছে, নইলে এত দিনে সাত ছেলের মা হ'ত! একটু আক্কেল হয় না! ঐ ত আমার মেয়েটাকে খারাপ ক'রলে। যে জিনিষে হাত দেবে, তাই ভেঙ্গে চুরমার ক'রবে। ঐ জন্যেই ত আমি ওকে এ ঘরে আসতে দি নি।"

একজন বর্ষিয়সী বলিলেন—"নে বড় বৌ যা হবার হয়েছে, ওকে আর বকিস্ নি। আহা বাছার গা দিয়ে রক্ত পোড়ছে। আর মা, ঘাট করেছিস, বড় 'যা' এক কথা বলেছে, তাতে কাঁদতে আছে? উঠে ঘর দোর পরিস্কার কর, কাচগুলো বেশ ক'রে খুঁটে ফেলে দিস্।" এই বলিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলেন।

"ঢং দেখে আর বাঁচি নি! একজনকে খুন ক'রে কান্না হচ্ছে। থাক তুই সুখে ঘরকন্না কর। পোড়ারমুখো মিন্‌সে এলে আজ ব'লবো তোমার সোহাগী ভাদ্দর বৌকে নিয়ে সুখে থাক, আমি আর তোমার সংসারের জঞ্জাল হ'য়ে থাক্‌তে চাই নি।"

এমন সময়ে শাশুড়ীর গলার স্বর এবং সেই সঙ্গে খোকার ক্রন্দন শ্রুত হইল। বৃদ্ধা ছেলে কোলে লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে আসিয়া বলিলেন—"বাছা এমন ডাইনীর হাতেও ছেলেটাকে দিয়েছিলে। ঘুমন্ত বাছা আমার বিছানা থেকে প'ড়ে—আহা মাথাটা দুভাগ হ'য়ে গেছে। ভাগ্যি আমি টের পেয়েছিলুম, নইলে আজ আমার যে কপালে কি হ'ত—" বৃদ্ধা চোখে কাপড় দিলেন।

খোকার মাথা কাটিয়া একটু একটু রক্ত পড়িতেছিল। বড় বৌ উন্মাদিনীর ন্যায় বলিলেন, "ওগো তোমরা দেখ, আমার খোকা বুঝি নাই—ও সর্ব্বনাশি, এতদিনে তোর মনস্কামনা সিদ্ধি হ'ল—" আর বলিতে পারিলেন না, ঢিপ্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো তোমরা শীগ্‌গির দেখ, আবার বুঝি আমার কি সর্ব্বনাশ হয়।"

জনৈক প্রতিবেশিনী বলিল, "ম', তোমার কোন ভয় নেই। এখুনি সেরে যাবে। বড় বৌয়ের হিষ্টিরিয়া হ'য়েছে। আর ওর ত মাঝে মাঝে 'ফিট্' হয়, তবে আর ভয় কচ্ছ কেন?"

তখন সকলেই বড় বৌয়ের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইল। আর ছোট বৌ? সে মৃতবৎ এক পার্শ্বে বসিয়া আছে, চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভিজিয়া গিয়াছে। বিনোদিনী তাহার হাতখানি ধরিয়া উঠাইবার জন্য নিকটে গেল—ছোট বৌ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

[৬]

মধুমাস ফাল্গুনের রাত্রি। পূর্ণিমার চাঁদ রাত্রি দ্বিপ্রহরে আকাশের মাঝখানে বসিয়া সমস্ত জগৎকে হাসাইতেছেন। গাছের শিশিরস্নাত পাতাগুলিতে চাঁদের কিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন পৃথিবীর উপরে সমস্ত রূপার গিল্টি করা। রাত বারটা বাজিয়াছে; ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। কোকিলের 'কু-উ' এবং পাপিয়ার 'বউ কথা কও' রব ছাড়া জড়জগৎ সুপ্ত, নিস্তব্ধ।

দেবেন্দ্রের শয়নকক্ষের একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত ভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ডাকিল, "দাদা!"

দেবেন্দ্র বাবু এইমাত্র নিদ্রিত হইয়াছেন। আপিস হইতে সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ। ভাবিলেন, আজ একটা কিছু গুরুতর রকমের হইয়াছে। তখন আপিসের কাপড় ও জামা বারান্দায় রাখিয়া 'বিনু' বলিয়া ডাকিলেন। বিনোদিনী আসিলে দেবেন্দ্র বাবু গোপনে সেদিনকার ঘটনা সমস্ত শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিলেন। অনন্তর তিনি বড় বৌকে দ্বার খুলিতে অনুরোধ না করিয়া বন্ধু ভোলানাথ বাবুর বাড়ীতে গেলেন। পরে অনেক ডাকাডাকির পর বাড়ী আসিলেন এবং আহারাদি করিয়া শুইতে প্রায় ১১টা

বাজিল। আপিস হইতে আসিয়া স্বামী তাঁহার সাধ্য সাধনা করিল না দেখিয়া বড় বৌয়ের আরও রাগ হইল, আঁচল পাতিয়া ঘরের সিমেণ্টের উপর শুইয়া দেবেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র আহারান্তে ঘরে আসিয়া নিজের বিছানায় শয়ন করিলেন; স্ত্রীর সহিত কোন কথাই কহিলেন না।

নরেন্দ্রনাথ আবার ডাকিল—"দাদা!"

দেবেন্দ্র শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেও নরেন নাকি? এত রাত্রে কেন, কি হয়েছে?"

হাঁ আমিই দাদা। শীগ্‌গির একবার উঠে আসুন।"

"ব্যাপার কি? কি হ'য়েছে নরেন?"

"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দাদা! ছোট বৌ কেমন ক'রছে, বোধ হয় আফিং খেয়েছে!" নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিল।

"আ—ফিং—খেয়েছে" এই কয়টী কথা বলিয়া দেবেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বড় বৌ জাগ্রত ছিলেন। নাকি সুরে বলিলেন -"তুমি যেমন বুদ্ধিমান, তেম্‌নি বুঝলে। আফিং টাফিং সবই মিছে, কেবল একটা সোরগোল ক'রে আমাকে জব্দ ক'রবার চেষ্টা!"

দেবেন্দ্র সে কথায় কাণ না দিয়া নিজের জামার পকেট খুঁজিলেন, হরি! হরি! আফিংয়ের কৌটা ত নাই! আজ যে তিনি এক ভরি আফিং কিনিয়া কৌটা ভরিয়া রাখিয়াছেন। দেবেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে আসিলেন। নরেন্দ্রের চক্ষে জল দেখিয়া বলিলেন। "কেঁদো না ভাই। বিপদের সময় ধৈর্য্য চাই। তুমি শীঘ্র ভোলানাথ বাবুকে ডেকে আন—আচ্ছা থাক তোমার গিয়ে কাজ নাই, তুমি ওঘরের দিকে যাও, আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এখনই আস্‌ছি।"

নরেন্দ্র দেখিলেন সরোজের মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে। সে অতি কষ্টে কহিল—"কোথায় গিয়েছিলে? আর আমার বেশী সময় নাই—এখন একটু আমার কাছে ব'স—আমি তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি।"

নরেন্দ্র কাঁদিয়া কহিল—"সরোজ! কি দোষে তুমি আমাকে ছেড়ে চল্লে—তুমি কেন এমন কাজ কর্‌লে।"

"তুমি কেঁদ না—তোমার চখে জল দেখ্‌লে মরণেও আমার সুখ হবে না।" বালিকা স্বামীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল, এক বিন্দু অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া পড়িল।

দেবেন্দ্র ডাক্তার ভোলানাথ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন; পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার মাতা ও ভগিনীও আসিল। ছোট বৌ ঘোমটা দিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া বসিল। ভোলানাথ বাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন; তাহাতে কোন ফল না পাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে উদরস্থ অহিফেন তুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তখন তিনি ইংরাজিতে বলিলেন—

"রোগীর আর জীবনের আশা নাই। বোধ হয় অনেকটা আফিং খাওয়া হইয়াছিল। উহা এখন পাক যন্ত্র ত্যাগ করিয়া রক্তের সহিত সমস্ত শরীরে মিশিয়াছে।"

দে। ঔষধে কোন উপকার হয় না?

ভো। কেমন করিয়া হবে। যে পরিমাণ আফিং ঔষধে নষ্ট করিতে পারে তাহার চেয়ে খুব অধিক পরিমাণে খাওয়া হ'য়েছে। আশা করা যেত, যদি কতকটা পেট থেকে উঠত।

দে। তবে কি হবে?

ভো। এই শেষ ঔষধটা দিয়ে দেখি, এতে না হ'লে আমার অসাধ্য। আচ্ছা কতটা পরিমাণ আফিং ছিল?

দে। আজ সবে এক ভরি কিনে এনেছিলুম।

"Then quite hopeless. (তবে আর কোন আশাই নাই) চল আমরা একটু বাইরে বসি। নরেন দে'খ যেন রোগী ঘুমোয় না।" এই বলিয়া তিনি দেবেন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া বাহিরে গেলেন।

বিনোদিনী বলিল—"দাদা, ডাক্তার বাবু কি ব'ললেন? নরেন্দ্র কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বিনু আর কোন আশা নাই। বিষ রক্তের সঙ্গে মিশেছে—আর এখানে এখন ভাল ডাক্তারই বা কোথায় পাব?"

মা বলিলেন—"ছিঃ বাবা কাঁদে কি! কালই তোকে আবার বে দিয়ে লক্ষ্মীর মত বৌ ঘরে আন্‌ব।"

বিনোদিনী কাঁদিয়া বলিল—"এর চেয়ে 'লক্ষ্মীর মত বৌ' আর কোথাও পাবে না মা! দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না।"

ছোট বৌ অতি কষ্টে বলিল—"ঠাকুরঝি এ সময়ে

মাকে কিছু ব'লো না। আমার কপাল মন্দ তাই এক দিনের জন্যও মাকে সুখী ক'র্‌তে পারিনি। মা, এই মরণের সময়ে আমার সব দোষ ভুলে যাও।" এই বলিয়া মায়ের পদধূলি মাথায় দিল। "আর ঠাকুরঝি! তোমার কাছে যদি দোষ ক'রে থাকি, ভুলে যাও—এই অভাগিনীর কথা মনে করো—আর বল্‌তে পারি না—আমার আর বেশী সময় নাই—চোখে আঁধার দেখ্‌ছি।"—

বিনোদিনীউচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সে ঘর হইতে বাহির হইল; মাও মুখে কাপড় দিয়া উঠিয়া গেলেন।

সরোজ নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—"আমি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—তুমি আরও নিকটে এস। তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেও।"

সরোজ স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় দিল। নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রোদন করিতেছিল। সরোজ বলিল—"তুমি কেঁদ না, তোমার চ'খে জল দেখ্‌লে আমার বড় কষ্ট হয়! বড় দুঃখ রইল যে সাধ মিটিয়ে এক দিনও তোমার সেবা ক'র্‌তে পেলুম না। তুমি আমার জন্যে এক দিনের তরেও সুখী হও নি। আমার মাথা খাও, আমার মৃত্যু কালের অনুরোধ, আবার বে ক'রে সুখী হ'য়ো।"

নরেন্দ্র ধীরে ধীরে স্ত্রীর নত-মস্তক নিজের উরুদেশে রাখিল। সেই মৃত্যু-ছায়াগ্রস্ত মুখখানি মুক্ত বাতায়নের চন্দ্রিকারশ্মি মাখিয়া বড়ই সুন্দর হইল। নরেন্দ্র সেই ওষ্ঠে নিজ ওষ্ঠ সংস্পর্শ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই মৃত্যুক্লিষ্ট অধরে একটু হাসি ফুটিল। নরেন্দ্র ভাবিল নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা উজ্জ্বলতর হইল।

সরোজ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ—ঐখানে"। নরেন্দ্র দেখিল সরোজ পূর্ণিমার শশধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। নরেন্দ্র স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐখানে কি সরোজ?"

"এক দিন—ঠিক এমনি চাঁদনি রেতে তুমি ব'লেছিলে 'সরোজ, আমরা আবার ওইখানে গিয়ে মিলব।' তা আমার মনে আছে। তুমি যত দিন না এস, আমি ওখানে তোমার জন্য বসে থা'কব।"

সরোজ এক দৃষ্টে স্বামীর মুখ পানে তাকাইয়া আছে। অল্প অল্প বাতাসে তাহার চূর্ণ কুন্তলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; পূর্ণচন্দ্রের সুবিমল রশ্মি সেই মুখের উপর ক্রীড়া করিতেছে এবং অধরে ক্ষীণ হাসির জ্যোতিটুকু তখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্র নিমেষশূন্য হইয়া তাহাই দেখিতেছে।

সমাপ্ত।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ব্যবস্থায় অবস্থা।

কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাসী।

আফরিকার কৃষ্ণ নর নারী, কৃষ্ণ বালক বালিকা, যে, কতকাল ইউরোপ এশিয়ার দাস্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে; কবে যে উহাদিগকে প্রথম দাস্য বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা যায় না।

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরা পুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা।"

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজ্যের কবে ধ্বংস হইয়াছে! রোমকের জন্য উত্তর আফ্রিকায় যে কার্থেজকে চিরন্তন স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, সে কার্থেজ রাজ্য কবে ভূগোল বিবরণ হইতে অপসৃত হইয়াছে! কার্থেজের স্বতন্ত্র ইতিহাস পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে! এখন চিরশত্রু রোমকের ইতিহাসেই কার্থেজের ইতিহাস স্থান পাইতেছে। কার্থেজের মহাবীর হেমিলকার এবং তাঁহার পুত্র জগতের অদ্বিতীয় বীর হেনিবলকে রোমক বীর সিপিয়োদিগের পার্শ্বচর হইয়া পূর্ব্বস্মৃতির উদ্দীপনা করিতে হইতেছে। বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াও, যে হেনিবল ভবিষ্যৎ দিগ্বিজয়ী নেপোলীয়ানের শিক্ষকরূপে এবং আদর্শভাবে পরিচিত হইয়াছেন, যাঁহার যান অভিযান এবং সমরকৌশল ও সৈন্য চালনার পরিচয় ইতিহাসে পাইয়াই, নেপোলীয়ন স্বীয় যান অভিযান আক্রমণ ও সৈন্যচালনার রীতি প্রকৃতি এবং পন্থা পদ্ধতি স্থির করিয়াছিলেন; যে হেনিবল খৃষ্টজন্মের ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে স্পেন হইতে রোমে আসিবার জন্য সসৈন্যে পিরিনীশ ও আলপ্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া, নেপোলীয়ানকে

পথ দেখাইয়া রাখিয়াছিলেন; দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যিনি নেপোলীয়ানের ভবিষ্যৎ পর্ব্বত-লঙ্ঘন বিদ্যায় শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, সেই হেনিবলকেও—কার্থেজের সেই অদ্বিতীয় সেনাপতিকেও এখন রোমের ইতিহাসে নাম রাখিতে হইতেছে। আবার সেই প্রাচীন রোমকেও—তৎকালদৃষ্টা সসাগরা ধরার অধিপতি রোমকেও এখন কেবল প্রাচীন ইতিহাসেই পূর্ব্বতন অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে। রোমক বীর মেরীয়সকেই নির্ব্বাসিত হইয়া, সিলার ভয়ে পলাইয়া, কার্থেজের ধ্বংসাবশেষে বসিয়া গাহিতে হইয়াছিল;—

"নাহি সে কার্থেজ নাহি সে গ্রীশ।
থাকিবেনা রোম জানে জগদীশ॥"

জগদীশের সবই জানা ছিল সবই জানা আছে, তাঁহার লীলা খেলা, কীটানুকীট মানুষ বুঝিবে কিরূপে?

যে কার্থেজের সন্তানদিগকে পরে রোমকদিগের দাসত্ব করিতে হইয়াছিল, সেই কার্থেজের সেই সন্তানেরাই উত্তর আফরিকায় বসিয়া, আফরিকার যত কৃষ্ণ কৃষ্ণাকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া, বিরাট দাস-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পুষ্টি করিয়াছিলেন। উত্তর আফরিকার যে সকল প্রদেশ এখন মরক্কো অলজিরীয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত, অল্পদিন পূর্ব্বেই যে প্রদেশপুঞ্জের ভিতর বর্ব্বরি প্রদেশ মুসলমান, আরব ও মূরদিগের দাস-বাণিজ্যের বাণিজ্যশালা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল, সেই সকল প্রদেশেই কার্থেজের জন্য দাস-দাসী সংগৃহীত হইত। যে সুদন সে দিনও দাস-মৃগয়ার প্রধান নর-বন বলিয়াই পরিচিত ছিল, যে সুদনের দাস-মৃগয়া রহিত করিবার জন্য বৃটিশবীর বেকার, গর্ডন প্রভৃতিকে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, যে সুদনক্ষেত্র আরবীয় মুসলমানদিগের দাস সংগ্রহের জন্য একপ্রকার জনশূন্যই হইয়া পড়িয়াছিল, যে বিশাল সুদন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—অস্থে পৃষ্ঠে বহু দাসদাসী-পূর্ণ দাস গুদামে আছন্ন হইয়াছিল, কার্থেজের জন্য সেই সুদনেও দাস দাসী সংগ্রহ হইত।

কার্থেজের ধনপতিরা দাস বাণিজ্যে ধনবৃদ্ধি করিতেন। কার্থেজের দাস আড়তে দাস দাসী ধরিত না; কার্থেজের হাটে দাস দাসীর ছড়াছড়ি হইত। কার্থেজে কিনিয়া যত লোকে এশিয়া ইউরোপে দাস দাসী রপ্তানী করিত। তখনকার গ্রীস ও রোমেও আফরিকার দাস দাসীরা দরে বিকাইত। যুবতী কৃষ্ণদাসীদিগের চারিদিকেই আদর ছিল। ইউরোপের তৎকালীন শ্বেতপুরুষেরা কৃষ্ণ কামিনীর কালো বরণে মুগ্ধ হইতেন। আফরিকার কৃষ্ণ যুবকেরা যে, ইউরোপের শ্বেতরমণীদিগকে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন, তাহা পাঠক, শেক্সপীয়রের ওথেলো তোমাকে এখনও দেখাইয়া দিতেছেন। সদরে স্বয়ং সেক্সপীয়র যাহা করিয়া আসিতেছেন, এতদিনের পর তাহার অনুবাদক হারাণচন্দ্র রক্ষিত অন্দরেও সেই কাজ করিতে বসিলেন। এক ওথেলোর জন্য একটী দেস্‌দেমোনাকে আত্মহারা হইতে দেখিয়া পাঠক বিস্মিত হও, এমন কত শত ওথেলো কত সহস্র দেস্‌দেমোনাকে হতচৈতন্য করিয়াছিলেন। রোমের অদ্বিতীয় মনস্বী ঋষিকল্প কেটোর কন্যা পোর্শিয়াকে যে যুবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছিল, সেই যুবকও তোমার এক কৃষ্ণবর্ণ আফরিক রাজার কালাচাঁদ পুত্র ছিলেন। যে হাব্‌সীকে কলিকাতার পথে ঘাটে দেখিলে এখনও অবাক্ হও, যে হাব্‌সীর জন্য কলিকাতায় হাব্‌সিপাড়া এখনও প্রসিদ্ধ, বিলাতের বিখ্যাত লেখক এডিসন্ ত নিজের "কেটো" নাটকের নায়ক যুবাকে সেই আবলুশ-বরণ হাব্‌সীর রূপেই রূপিত করিয়াছেন, হাব্‌সীর সাজেই সজ্জিত করিয়াছেন।

কালো ভালো। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কালো, দ্রৌপদী কালো, কোকিল কালো, শ্যামা কালো; বুলবুল বোঁস্তা কালো; কালো জগতের আলো। আফরিকার কৃষ্ণ নর নারীদিগের তাই ত সেকালে সর্ব্বত্র সমাদর ছিল। তাই ত নবাব সুবা সাহ সুলতানদিগের অন্তঃপুরে কৃষ্ণ দাসীর আদর ছিল। তাই ত কালামুখী বাঁদীরাও বেগম হইতেন, তাই ত যুবক কৃষ্ণ দাসেরাও অনেক সময়ে শাজাদী নবাবজাদীগণের মনচোরা হইয়া জল্লাদ হস্তে শির দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাই ত ইউরোপ এশিয়ার মত রাজ্যের ন্যায় আমাদের ভারতেও বৌদ্ধযুগে কার্কর-তনয়াদিগের প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

কিন্তু নবযুগে।

প্রাচীন যুগের ন্যায় নবযুগেও কৃষ্ণ দাসদাসীদিগের আদর বাড়িয়াছিল, কিন্তু তখনকার আদরে আর এখন-

কার আদরে অনেক প্রভেদ ছিল, উৎপীড়নের তারতম্য নিবন্ধনই প্রভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পাঠক, নবাবিষ্কৃত আমেরিকার জন্যই যে, আফরিকার কৃষ্ণ নর নারীদিগকে গোমেষাদির মত পণ্যমধ্যে পরিগণিত হইতে হইয়াছিল, আমেরিকার আবাদ ও খনির জন্যই যে আফরিকার নিগ্রোজাতীয় কৃষ্ণ নর নারীকে জননী জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইত, তাহা এখন আর কাহারই অবিদিত নহে। কিন্তু নিষ্ঠুরতার সূত্রপাত হইয়াছিল এক করুণাময় খৃষ্টান পাদরির দয়াশীলতার জন্য, ইহা বোধ হয় সকলের বিদিত নহে! অসীম দয়াশীলতার জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার সূত্রপাত হইয়াছিল, পুণ্যের জন্য পাপের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, ধর্ম্মের জন্য অধর্ম্মের ঝড় উঠিয়াছিল, পরার্থপরতার জন্য পরপীড়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল, লোকরক্ষার জন্য লোকধ্বংসের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এই বিরোধালঙ্কার বোধ হয় সকলে জ্ঞাত নহে। অগ্রে এই বিরোধ পরম্পরার আভাস দিয়া, আমাদিগকে পরে অন্য কথা কহিতে হইবে। প্রথমেই আমাদিগকে সেই করুণাময় পাদরি পুঙ্গবের কথা কহিতে হইবে।

বিশপ লা কাসা।

আমেরিকা আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত হইবার কিছুদিন পরেই, ইউরোপের পর্ত্তুগাল ও স্পেন সেখানে রীতিমত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; পর্ত্তুগাল ও স্পেনের অনেক লোকই সে দেশে গিয়া খনি খুলিয়া সোনারূপা প্রভৃতি ধাতু বাহির করিতে থাকেন, অনেকে নানারূপ কৃষি কার্য্যেও প্রবৃত্ত হন। পর্ত্তুগাল ও স্পেনের লোকেই আমেরিকাধিকারে অগ্রণী, পরে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজও অগ্রসর হন, সেখানে খনি ও কৃষির কার্য্যেও পর্ত্তুগালের লোকেই প্রথমে পথ দেখান, পরে আর সকলেও সেই পথের পথিক হন।

খনি ও ক্ষেত্রের কার্য্যে পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে আমেরিকারই আদিম অধিবাসীদিগকে নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু সে কঠোর কার্য্যে তাহাদিগের কষ্টের অবধি থাকিত না, অতিশ্রমে কাতর হইয়া অনেককেই প্রাণ দিতে হইত। ধর্ম্মপ্রাণ করুণাময় ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মরক্ষক লা কাসা সেই সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য, আদিম মার্কিণদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য, স্বদেশ স্বজন ছাড়িয়া আমেরিকায় বসবাস করিতেছিলেন, চিয়াপা প্রদেশের বিশপপদে বৃত হইয়া, যীশু খৃষ্টের শিষ্যত্ব করিতেছিলেন, আদিম মার্কিণদিগের প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। তাহাদিগকে অতিশ্রমে কষ্ট পাইতে হইতেছে—প্রাণ দিতেও হইতেছে, দেখিয়া বিশপই প্রথমে আফরিকা হইতে নিগ্রো লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন, পর্ত্তুগালের তৎকালীন রাজা চার্লস্‌কে বলিয়া দাস ব্যবসায়েরই ব্যবস্থা করিয়া দেন। বিশপ দেখিয়াছিলেন, আফরিকার নিগ্রোজাতি যেমন সবল, তেমনই দৃঢ়কায়; যেমন পরিশ্রমী, তেমনই সহিষ্ণু। তাই তিনি আদিম মার্কিণদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই আফরিকদিগের আশ্রয় লন, আফরিক দাসদাসীদিগকে যে, শেষে যাবজ্জীবন মৃত্যু যন্ত্রণা ভুগিতে ভুগিতে শ্বেতপুরুষদিগের নির্দ্দিষ্ট নরকে বাস করিতে হইবে, মেষ মহিষাদি অপেক্ষাও যে, তাহাদিগকে, নিষ্ঠুর মানবের হস্তে অধিক নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে হইবে, কসাইখানার গরু বাছুর অপেক্ষাও যে, তাহাদিগকে অধিক ছট্‌ফট্ করিতে হইবে, তাহা করুণাময় বিশপ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তিনি হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়া বসিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য তাঁহার পুণ্যময় ছিল, সাধন কিন্তু পাপপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই করুণাময় ধর্ম্মপ্রাণ পাদরিপ্রবরকেও তাই শেষে আশীর্ব্বাদভাজন না হইয়া ঘোর অভিসম্পাতেরই অধীন হইতে হইয়াছিল, দেবদূতকে শয়তান-শিষ্যের আসনে অভিষিক্ত হইতে হইয়াছিল। সংসার শয়তানের রাজ্য। ইংলণ্ডের কবিবর শেলি নিজের "ইস্‌লাম রিভোল্ট" মহাকাব্যে বলিয়াছেন, "জগতের দুই রাজা। এক রাজা পরমেশ্বর, আর এক শয়তান। কলিযুগে শয়তানই অধিক প্রবল। শয়তান সসৈন্যে পরমেশ্বরকে পরাস্ত করিয়াছে, তাই এখন জগতে শয়তানের লীলা খেলাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তাই সংসারে পাপের স্রোতই সর্ব্বত্র অধিক প্রবল।"

কবির কথা মিথ্যা নহে। সংসারের অনেক সদনুষ্ঠানের ফল বিষময় হইয়া থাকে, পুণ্যের সরিতে পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়, অমৃত বীজে গরল গাছ উৎপন্ন হয়, আমেরিকায় চিয়াপার বিশপ লা কাসা পুণ্যের পুকুর কাটিয়া-

ছিলেন, তাহা কিন্তু পূর্ণ হইয়াছিল পাপজলে, পাপজলে পাপের কূর্ম্ম কর্কটাদিই গিজ গিজ করিয়াছিল!

দাস বাণিজ্য।

আমেরিকার কারীব সাগরীয় দ্বীপমালার মধ্যে হেটি বা সান ডমিঙ্গো দ্বীপই আয়তনে দ্বিতীয়, এই দ্বীপই কলম্বস কর্ত্তৃক হিস্পানোলীয়া নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই হেটিদ্বীপেই প্রথমে আফরিকা হইতে কৃষ্ণ দাস ও কৃষ্ণ দাসীদিগের আমদানী হয়——আমদানী প্রচুর পরিমাণেই হইতে থাকে। পর্ত্তুগালের রাজা চার্লস, বিশপ লা কাসার পরামর্শে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে আদেশ করেন, "আফরিকায় আমার গিনিরাজ্যে প্রভূত নিগ্রো নরনারী দাস্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে, অতঃপর ঐ প্রদেশের যত দাস দাসীই আমার মার্কিণ রাজ্যে প্রেরিত হইবে।" দাস দাসী প্রথমেই হেটিদ্বীপে প্রেরিত হইতে থাকে।

পর্ত্তুগীজ প্রথমে আসর লইলেন, ক্রমে ইউরোপের আর আর অবতারও আসরে নামিতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ডের নামজাদা নাবিক সার জন হকিন্সই ইংরেজ অবতারদিগের মধ্যে প্রথম। পরে বিলাতের অনেকেই দাস ব্যবসায়ে বদ্ধপরিকর হইয়া অনেক অর্থ ন্যস্ত করেন। আমেরিকায় ইংলণ্ডেরও অনেক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারীব সাগরের জামেকা প্রভৃতি দ্বীপও আদিতেই ইংরেজ হস্তে পড়িয়া ইংরেজ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

বিলাতের ব্যবসায়।

সার জন হকিন্সের দেখা দেখি, অনেক ইংরেজ ও ডচ দাস-বাণিজ্যে রত হইয়া উঠিলেন। যে বাণিজ্যে বিলাতের লোকে হাত দেন, সেই বাণিজ্যেরই হঠাৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দাস বাণিজ্যেরও হু হু করিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। নিগ্রো দাস দাসীদিগকে বিলাতের দাস ব্যবসায়ীরা আপনাদের যত মার্কিণ রাজ্যে পাঠাইতে লাগিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে ইংলণ্ডের দাস ব্যবসায়ীরাই ৩ লক্ষ নিগ্রো দাস দাসী আমেরিকায় চালান দেন। ১৭০০ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এক জামেকা দ্বীপেই, বিলাতী দাস-গুদাম হইতে ৬ লক্ষ ১০ হাজার দাস দাসী প্রেরিত হয়। কিন্তু দাস দাসী প্রেরিত হইয়াছিল। অনেক দ্বীপে অনেক স্থানে। দাস দাসীর সংখ্যা করাও তখনই দুঃসাধ্য হইয়াছিল; এখন ত কথাই নাই!

দাস বাণিজ্যে যৌথ করিবার।

যৌথ কারবারে বিলাতের লোকে অদ্বিতীয়। সমুদ্রের ঢেউ গণা কার্য্যেও ইহারা যৌথ কোম্পানি করিয়া থাকেন। দাস ব্যবসায়ের জন্যও বিলাতের লোকে যৌথ কোম্পানি বসাইয়া ছিলেন। কোন কোন পুরাতন কোম্পানিতেও দাস দাসীর কাজ চলিতে লাগিল। ভারতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও যে দাস ব্যবসায়ে ঔদাসীন্য করেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কোম্পানির দাস ব্যবসায় দেখাইবার জন্য পূর্ব্বতন ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের দাসী পক্ষপাতেরও পরিচয় দিয়াছি।

ব্রিষ্টল ও লিবারপুল।

বাণিজ্য ও বাণিজ্যপোতের জন্য ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল এবং লিবারপুল চিরপ্রসিদ্ধ, তখন আরও প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রিষ্টলের দাস-হাট জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। নিগ্রো বাণিজ্যে প্রথমে ব্রিষ্টলই অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন, ব্রিষ্টলের যত বাণিজ্য-পোতই দাস-বাণিজ্য মত্ত হইয়া উঠে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ, কৃষ্ণ দাসদাসীর বাণিজ্যে অনুমতি পান, অনুমতি ক্রমে ক্রমে অনেককেই দেওয়া হয়। পর্ত্তুগালের ন্যায় স্পেনেও দাস্ ব্যবসায়ের পথ রাজবিধি দ্বারা মুক্ত হয়। স্পেন নিজেও যত ব্যবসায়ীকে দাসদাসী যোগাইবার ভার লন। আফরিকায় যে, স্পেনেরও তখন আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, দাসদাসী যোগাইবার পক্ষেও তাহার সুতরাং সুবিধা ছিল। বিলাতের ব্রিষ্টল প্রথমে আরম্ভ করিয়া বিলাতী দাস-বাণিজ্য বরাবরই এক প্রকার এক চেটিয়া করিয়া রাখেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিষ্টলেরই এক চেটিয়া বজায় থাকে, তাহার পর লিবারপুল আসরে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৩০ অব্দ হইতে লিবারপুলের জাহাজেই দাস-মালের অধিক রপ্তানী হইতে থাকে।

দাস ব্যবসায়ে নিষ্ঠুরতা।

প্রথম প্রথম নিষ্ঠুরতার এক শেষ হইতে লাগিল। লোকে গোমেষাদিকেও যে কষ্ট দেয় না, দাস ব্যবসায়ীরা—বিলাতের দাস ব্যবসায়ীরাও দাস দাসীকে সে কষ্ট দিতে লাগিলেন, জাহাজ পূরিয়া দাস দাসী পাঠাইতে লাগিলেন, স্থানাভাবে—খাদ্যাভাবে—রোগে—শত শত দাস দাসীকে

জাহাজেই প্রাণ দিতে হইতে লাগিল, অনেকে রুগ্ন ভগ্ন হইয়া আমেরিকায় পৌছিতে লাগিল, সেখানকার শ্বেত-পুরুষেরা নিষ্ঠুরতার অবতার ছিলেন। রুগ্ন ভগ্ন দাস দাসীদিগকে প্রায়ই অপঘাতে মরিতে হইত, আর সুস্থ সবলদিগকেও আবাদ ও খনির নিষ্ঠুরতায় এবং অতিশ্রমে অল্পদিনেই জীবন লীলার শেষ করিতে হইত।

বিলাতে বাধা।

বিলাতের গৌরব, সেখানে মহাশয় লোক চিরদিনই বিরাজমান। ইংলণ্ডের যত মার্কিণ রাজ্যেই দাস রক্ষার আসন বহাল হইল, দাস রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল, ইংলণ্ডের দেখাদেখি ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের রাজপুরুষেরাও দাস রক্ষায় মন দিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল কুত্রাপি হয় নাই, প্রভুদের হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব না হইলে, কেবল আইন আদালতে, দাস রক্ষা হয় না। আমরাও ত দেখিয়াছি, করুণাময় মহাশয় নীলকরদিগের হস্তে রায়েত জনের কোন কালে পীড়ন হইত না। এখনও আসাম কাছাড়ের করুণাময় চা-কর সাহেবদিগের হস্তে কুলি পীড়ন হয় না। যেখানে প্রভুর নিষ্ঠুরতা, সেই খানেই দাস দাসীর পীড়ন।

যাহাই হউক, ইংলণ্ডের রাজবিধানে কিঞ্চিৎ ফল ফলিল। পূর্ব্বে দাস দাসী—নর নারী দুই জনকেই, সামান্য অপরাধেও, প্রভু হস্তের নিদারুণ বেত্রাঘাতে জর জর হইতে হইত। ইংলণ্ডের রাজবিধানে দাসীর বেত্রদণ্ড রহিত হইয়া গেল। প্রকাশ্যভাবে তখন আর কোন প্রভুরই বেত্রদণ্ডযোগে দাসী পীড়ন করিবার অধিকার রহিল না। গুপ্ত পীড়ন নানারূপে রহিল বটে, কিন্তু ব্যক্ত পীড়ন সংযত হওয়ায়, পীড়নও মোটের উপর কিঞ্চিৎ কমিল। ইংলণ্ডের রাজবিধানে দাসীদিগের অন্যান্য কষ্ট কতক কতক দূর হইল। দাসদিগেরও না হইল এরূপ নহে।

জজ ম্যান্সফীল্ড।

ইংলণ্ডের সর্ব্বজন প্রশংসিত বিচারপতি ম্যান্সফীল্ড বাহাদুরও ঐ সময়েই একটা বিচারে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন;—

"বিলাত স্বাধীনতার চিরন্তন লীলাক্ষেত্র। এখানে ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ সকলেই—স্বদেশী বিদেশী যত লোকেই—স্বাধীন, যে দাস দাসী কোনরূপে বিলাতে আসিয়া পদার্পণ করিবে, সেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিবে।"

জজ ম্যান্সফীল্ডের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য জজেরও শিরোধার্য্য হইল। নিজ বিলাতের কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণ দাসীরা স্বাধীন হইল, দাস দাসীও ত বিলাতে কম ছিল না! ১৭৬৪ অব্দে নিজ লণ্ডনেই ত কত হাজার দাস দাসী অবস্থিতি করিতেছিল, লণ্ডনেও দাস দাসীর রীতিমত ব্যবসায় চলিত। সংবাদপত্রে "কৃষ্ণ পুরুষ, কৃষ্ণ নারী, কৃষ্ণ বালক, কৃষ্ণ বালিকার জন্য বিজ্ঞাপন বাহির হইত।" পলায়িত দাস দাসীদিগের অনুসন্ধান ও পুনরাবন্ধনের জন্য সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষিত হইত। ১৭৭১ অব্দে বর্ম্মিংহাম গেজেট পত্রেই ত দাস বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। জজ ম্যান্সফীল্ডের সিদ্ধান্ত বাহির হয় ১৭৭২ অব্দে, সেই অবধি দাস দাসীরা বিলাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, কিন্তু বিলাতী জজের নজীর বিলাতেই গ্রাহ্য হইয়াছিল, বিলাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে করিতে যাই কোন দাস বা দাসী বিলাত ছাড়িয়া অন্য দেশে আসিয়াছিল, অমনই আবার দারুণ দাস্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, অন্য রাজ্যে ত আর বিলাতের নজীর খাটিত না। বিলাতেরই অন্য দেশীয় রাজ্যে বিলাতী নজীর গ্রাহ্য হইত না।

দাস ব্যবসায়ে বাদ প্রতিবাদ।

বিলাতের পাদরি সম্প্রদায়কে প্রশংসা করিতে হয়। ধনশালী ও বাণিজ্য মন্দিরে দাস ব্যবসায়ের অনুরাগ থাকিলেও, বিলাতের ধর্ম্মশালা ও ভজনা মন্দিরে দাস ব্যবসায়ের বরাবরই বিরাগই দেখা গিয়াছিল, পাদরি মিশনরি মহাশয়েরা দাস ব্যবসায়ের বরাবরই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ অব্দে লণ্ডনে যে, দাস ব্যবসায়নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতেও পাদরি মিশনরিদিগেরই প্রাধান্য ছিল।

দাস ব্যবসায় রহিত হওয়ায় যাঁহারা জগতের প্রশংসা ভাজন হইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে টমাস ক্লার্কসন্ এবং সার্প সর্ব্ব প্রথমেই ঐ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। এই সভাসূত্রেই উইলিয়ম উইলবার ফোর্স এবং জ্যাকেরিয়া মেকলে

দাস ব্যবসায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্যই বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখান; পার্লেমেণ্টে যে, উইলবারফোর্সই দাস ব্যবসায়ের প্রধান প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, তাহা সকল পাঠকেরই বিদিত আছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে কোয়েকর সম্প্রদায় স্বতপরত অর্থে সামর্থ্যে দাস ব্যবসায়ে যেরূপ প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন, অন্য কোন সম্প্রদায়ই সেরূপ প্রতিকূলতা করিতে পারেন নাই, কিন্তু কিছু কিছু প্রতিকূলতা অনেকেই করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত লোকেও আবার দাস ব্যবসায়ের ঘোরতর অনুকূলতাও করিয়াছিলেন। গুরু জনসনকে প্রতিকূল দেখিয়া অনুগত ভক্ত শিষ্য শ্রীমান বসোয়েল লিখিয়াছিলেন ঃ—

"দাস দাসী জগতে আছে চিরদিন, ভগবান নিজে এই দলের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা পরমেশ্বরের অনুমোদিত, যাহা চিরকাল মানব সমাজের অনুমোদিত, তাহা রহিত করিয়া, যত দাস-প্রভুকে বঞ্চিত করা নিতান্তই দস্যু তস্করের কার্য্য। দাস প্রথা বর্ত্তমান থাকায় আফরিকার কত উপকারই না হইতেছে। যে সকল নিগ্রো নর নারী দাস দাসী হইয়া সুখের রাজ্য আমেরিকায় গিয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদিগকে যে অসভ্য বর্ব্বর প্রতিবেশীদিগের হস্তে প্রাণ দিতে হইতেছে না, ইহা কি অল্প সৌভাগ্য! আফরিকায় নিগ্রোদিগকে এই সৌভাগ্যে বঞ্চিত করিলে—অর্থাৎ দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিলে—কিরূপ অধর্ম্ম হইবে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।"

এরূপ বসোয়েলও বিলাতে অনেক ছিলেন! চা-বাগিচার কুলি ব্যবসায় উপলক্ষে, যাঁহারা সেই বসোয়েলের শিষ্যত্ব করেন, এরূপ অবতার ভারতে এখনও আছেন!

প্রতিকারের সূত্রপাত।

দাস ব্যবসায়ের প্রতিকূলতা প্রবল হইতেছে দেখিয়া ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ ১৭৮৮ অব্দে এক কমিটির প্রতিষ্ঠা করেন, দাস ব্যবসায়ের অবস্থাদি বিষয়ে আলোচনা অনুসন্ধান করিবার ভার ঐ কমিটির হস্তে ন্যস্ত হয়, আর ঐ সময়েই দাসবাহী জাহাজের উপর দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যবসায়ীরা জাহাজ পূরিয়া দাস দাসী লইয়া যাইতেন, জাহাজে দাস দাসীদিগকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। নূতন আইনে দাস দাসীর বোঝা নির্দ্দিষ্ট হয়। "এত টনের জাহাজ এত দাস দাসীর অধিক লইয়া যাইতে পারিবে না।" এইরূপই ব্যবস্থা হয়।

১৭৯১ অব্দে উইলবারফোর্স পার্লেমেণ্টে দাস ব্যবসায় রহিত করিবার আইন পেশ করেন। পাণ্ডুলিপিতে ব্যবস্থা হয় ঃ—"আমেরিকায় কোন ব্রিটিশরাজ্যে আর-কেহই দাস দাসী লইয়া যাইতে পারিবে না।" এ পাণ্ডুলিপি অগ্রাহ্য হয়, পর বৎসর ১৭৯২ অব্দে উইলবারফোর্স, মন্ত্রী প্রবর পিটের মত লইয়া, আর এক পাণ্ডুলিপি দাখিল করেন। তাহাতে "ক্রমে ক্রমে" দাস ব্যবসায় রহিত করিবার ব্যবস্থা থাকে, এ পাণ্ডুলিপি পাস হইয়া আইনে পরিণত হয়। দাস ব্যবসায় রহিত করিবার ব্যবস্থার বিলাতে এইরূপেই সূত্রপাত হয়।

ফরাসীর প্রতিবিধান।

ইংলণ্ডের পাদরি মিশনরিদিগের চেষ্টায় যে ফল বিলম্বে ঘটে, অখৃষ্টান রুশোর শিষ্যদিগের অখৃষ্টান সভায় সেই ফল শীঘ্র সহজেই ফলিয়া উঠে। ১৭৯৪ অব্দের অখৃষ্টান ফরাসি সভার এক অধিবেশনে ব্যবস্থা হয়, "ফরাসিরাজ্যে—ফরাসির কোন উপনিবেশেও দাসত্ব থাকিবে না, যে কোন ফরাসিরাজ্যের দাস দাসীই (১৭৯৪ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হইতে) স্বাধীন ফরাসীর মত স্বাধীনতা ভোগ করিবে।"

দাস ব্যবসায়ে নিষেধ।

বিলাতের রাজা ও রাজমন্ত্রীরা আইনে দাস ব্যবসায় সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সময়েই ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি ইংরেজের হস্তগত হওয়ায়, সেখানকার দাস সরবরাহের জন্য, বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীদিগের দাস ব্যবসায় বাড়িয়া উঠিল, সুতরাং ১৮০৫ অব্দে বিলাতের পার্লেমেণ্টে ব্যবস্থা হইল।

"বিজিত নবাধিকৃত উপনিবেশ রাজ্যেও দাস ব্যবসায় অবাধে চলিবে না।"

পর বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে, "বিলাতের কোন ব্যক্তিই নূতন পুরাতন স্বদেশী বিদেশী

কোন রাজ্যেই দাস দাসীর সরবরাহ করিতে পাইবে না।" তৎপর বৎসর নিষেধের বেড়া আরও একটু বিস্তৃত হইল। ১৮০৮ অব্দে বিলাতী পার্লেমেণ্টের এক আইনে যত বৃটিশ রাজ্যের দাস ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল। কিন্তু বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীদিগের ধনলোভ ত রহিত হইল না। সুতরাং এইবার শঠতার ধূম লাগিল।

দাস ব্যবসায়ে শঠতা।

ফরাসী আইনে ফরাসী রাজ্যসমূহের দাস ব্যবসায় রহিত হইল। বৃটিশ আইনে বৃটিশ রাজ্যসমূহের দাস ব্যবসায় রহিত হইল, কিন্তু স্পেন পর্ত্তুগালের দাস ব্যবসায় ত বজায় থাকিল। বিলাতের ব্যবসায়ীরাও স্পেন ও পর্ত্তুগালের জাহাজে করিয়া, অথবা আপনাদের জাহাজে স্পেন পর্ত্তুগালের পতাকা উড়াইয়া দাস ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। বিলাতের লোকেই আমেরিকার স্পেনীয় ও পর্ত্তুগাল অধিকারে দাস দাসী যোগাইতে লাগিলেন। সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জাহাজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীরাও ধরা পড়িবার ভয়ে নিষ্ঠুরতার এক শেষ করিতে লাগিলেন!

ধনলোভে রাক্ষস।

ইতিহাসে—বিলাতের ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে—প্রকাশ "যখনই কোন বৃটিশ দাস ব্যবসায়ীর জাহাজ ধরা পড়িবার উপক্রম করিত, তখনই বৃটিশ দাসপতিরা যত দাস দাসীকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নিষ্কৃতিলাভের উপায় করিতেন। শত শত কেন হাজার হাজার কৃষ্ণ নর নারীকে এইরূপে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে!"

শুনিলেও হৃৎকম্পে অবসন্ন হইতে হয়; বৃটিশ দাসপতিদিগের পৈশাচিক প্রকৃতির কথা মনে করিয়া হতচৈতন্য হইতে হয়। যে দেশের উইলবারফোর্স ক্লার্কসন মেকলে শার্প প্রভৃতি দাস দাসীর কষ্ট দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন, সেই দেশের ধনপতিরাই শত শত দাস দাসীকে বিনা অপরাধে ডুবাইয়া মারিতেন; লোকে ইঁদুর ছুঁচাকেও সেরূপে মারিতে পারে না, নিরীহ নর নারীকে সেইরূপে মারিতেন! মনে হয়, এক দেশেই স্বর্গ নরক, যেখানে দেব সেখানেই দানব।

দাসমুক্তির চেষ্টা।

বিলাতের পার্লেমেণ্টে দাসত্ব নিষেধের আইন ক্রমেই কঠোর হইতে লাগিল। অর্থদণ্ড কারাদণ্ডে পরিণত হইল, কারাদণ্ড নির্ব্বাসন দণ্ডে পরিণত হইল। একবার প্রাণদণ্ডেরও প্রস্তাব হইল, কিন্তু নির্ব্বাসন দণ্ডই বাহাল থাকিল। "বিলাতের যে ব্যক্তি নিষেধ না মানিয়া দাস ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, সেই নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইবে" এইরূপ বিধানে সুফল ফলিতে লাগিল, ওদিকে বিলাতের দাসত্বনিবারণী সভা অর্থে সামর্থ্যেও দাসমুক্তির নানাবিধ উপায় করিতে লাগিলেন। দাসত্ব নিষেধের পুস্তক পত্রিকায় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। দাসত্বনিষেধের বক্তৃতায় জগৎ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিলাতের দাসত্বনিবারণী সভা, উত্তর পশ্চিম আফরিকায় সীরালীয়োঁ প্রদেশে মুক্ত দাস দাসীদিগর জন্য একটা উপনিবেশ স্থাপিত করিলেন। শত শত মুক্ত দাস দাসী সেইখানে বসবাস করিতে পাইল। মার্কিন লাইবিরীয়ার পথ সীরালিয়োঁর জন্য প্রশস্ত হইল। দুই প্রদেশেই এখন মুক্ত দাসবংশজে পূর্ণ। ইংরেজের সীরালিয়োঁ ইংরেজের অধীন; মার্কিনের লাইবিরীয়া এখন সম্পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন। কিন্তু সে কথা শেষে কহিব বলিয়াই এত কথা কহিতেছি, লাইবেরিয়ার কথা কহিয়াই আমরা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিব।

সর্ব্বত্র।

বিলাতের ন্যায় ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যও দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিবার আইন বাহাল করিলেন। ইংলণ্ডে প্রথম আইন বাহাল হইবার পরই মার্কিন গবর্ণমেণ্টও ১৮০৮ অব্দে আইনের জোরে দাস ব্যবসায় রহিত করিয়া দিলেন। ক্রমে আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যেও দাস ব্যবসায় রহিত হইল। ইউরোপের সুইডেন, হলন্দ, ডেন্মার্ক প্রভৃতিও ব্যবসায় নিষেধ করিলেন। স্পেন ও পর্ত্তুগাল সর্ব্বশেষে মহত্ত্ব দেখাইলেন। ক্রমে ১৮৪৫ অব্দের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকার সকলেই দাস ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দাস ব্যবসায় গোপনে চলিতে লাগিল দেখিয়া, সকলেই মহাসাগরে পুলীশ-পোত রাখিয়া দিলেন। দাসপোতের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দাসপোতে ও পুলীশপোতে যুদ্ধেরও অভিনয়

চলিতে লাগিল। ফলতঃ কিন্তু ১৮৪৫ অব্দের পর প্রকাশ্য দাস ব্যবসায় রহিতই হইয়া গেল। কিন্তু দাসত্ব রহিত হইল না। আমেরিকার পুরাতন দাস দাসী ও দাসবংশজদিগকে ১৮৪৫ অব্দের পরও দাস্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হইল। দাস ব্যবসায় রহিত হওয়ায় দাস সরবরাহ রহিত হইয়া গেল। উপস্থিত দাস দাসীদিগের দর ও আদর বাড়িল। কিন্তু পূর্ণমুক্তির এখনও আবশ্যকতা রহিল। এইবার কহিব মুক্তির কথা।

এইবার মুক্তি।

দাস ব্যবসায় রহিত করিবার চেষ্টা প্রথমে ইংলণ্ডে হইয়াছিল, ইংলণ্ডের পথেই আর সকলে পথিক হইয়াছিলেন। দাস মুক্তির চেষ্টাও প্রথমে ইংলণ্ডে হয়, অনন্তর আর সকলে অনুসরণ করেন। ইংলণ্ডের গৌরব চিরবিরাজমান থাকিবে! যে সময়ে দাস-ব্যবসায় দমনের চূড়ান্ত অনুষ্ঠান হইতেছিল, ইংলণ্ডে সেই সময়েই দাস মুক্তিরও চেষ্টা চলিতেছিল। দাস-ব্যবসায়বারণী সমিতি সভার সভ্যেরাই দাস মুক্তিরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ অব্দে বিলাতের উপনিবেশমন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বি উপনিবেসের দাস দাসীদিগকে মুক্তি দিয়া স্বাধীন করিবার জন্য এক আইনের প্রণয়ন করেন। পাণ্ডুলিপি পাস হইয়া ঐ আইন ২৮শে আগষ্ট বাহাল হয়। এই আইনই যত বৃটিশ উপনিবেশের যত দাস দাসী ও দাসবংশজকেই মুক্তি দেয়। কিন্তু বিলাতের দাসাধিকারী শ্বেতপুরুষদিগকেও তুষ্ট করিতে হয়। তাঁহারা দাস সম্পত্তির জন্য প্রভূত খেসারত পান। এদতর্থে বিলাতের গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয় কম নহে—৩০ কোটি টাকা! দুই এক মহাত্মা ছাড়া আর যত বৃটিশ দাস প্রভুও খেসারত লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৪ অব্দের ১লা আগষ্ট যত বৃটিশ উপনিবেশেই দাসত্বমুক্তি হইল বটে, কিন্তু আপনাদের কাজ কর্ম্মের জন্য শ্বেত প্রভুরা কিছুদিন মুক্ত দাস দাসীদিগকেও ভৃত্যত্ব ব্যপদেশে আপনাদের অধিকারে রাখিয়া দিবার অধিকার পাইলেন। এই ভৃত্যত্বেও মুক্তি পক্ষপাতী মহাশয়েরা ঘোর আপত্তি করিতে বাধ্য হইলেন; সুতরাং ঐ ভৃত্যত্বও ঘুচিল ১৮৩৮ অব্দে। ফরাসী উপনিবেশের দাসমুক্তি হইল ১৮৪৮ অব্দে; দক্ষিণ আমেরিকার দাসমুক্তি প্রায় ঐ সময়েই হইল। ওলন্দাজদিগের দাসমুক্তি হইল ১৮৬৩ অব্দে, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজীলের দাসদিগকে অনেকদিন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়াছে ১৮৮৮ অব্দে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের দাসমুক্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহা পাঠকের বোধ হয় অবিদিত নহে। দাসমুক্তির জন্য যে দাক্ষিণাত্যে আর উত্তরাত্যে ঘোর যুদ্ধ হয়; সেই গৃহযুদ্ধে যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ছয় লক্ষ লোকের অপমৃত্যু হয় এবং তিন হাজার কোটি টাকা (৩০০০,০০০০০০০ টাকা) খরচ হইয়া যায়, তাহাও পাঠকের অবিদিত নহে। উত্তরাত্য বা মার্কিন আর্য্যাবর্ত্তের দাসমুক্তি পূর্ব্বেই হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যেরও যুদ্ধে হইল। যুদ্ধের অনতিপূর্ব্বে ১৮৬০ অব্দে দাক্ষিণাত্যের দাসবংশে ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ লোক! এখন সকলেই মুক্ত।

দাসত্বের ফল।

আফরিকার দাস ব্যবসায়ে প্রথমে ইউরোপের প্রায় সকলেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান আরবেরাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত ছিল। আফরিকার আরবেরাই চারিদিকে দাস দাসীর সংগ্রহ করিত। ইহাদের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া রাক্ষস পিশাচেরাও লজ্জা পাইয়াছে। আফরিকার নরমাংসভুক্ রাক্ষসেরাও ত ইহাদিগের হস্তে পরিত্রাণ পায় নাই। আরবের খোক্ষসেরা আফরিকার রাক্ষস রাক্ষসীদিগকেও দাস্য বন্ধনে আবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, নরাধমদিগের অসাধ্য কার্য্য ছিল না। সুদন, নীলনদের উপত্যকা, পূর্ব্ব আফরিকা এবং সোমালি প্রদেশ দাস সংগ্রহের জন্য জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এশিয়ার দাস পোষণ এবং দাস ব্যবসায়ও সংযত হইয়াছে। কিন্তু এশিয়ার দাসপোষণ একেবারে এখনও রহিত হয় নাই। গুপ্ত দাস ব্যবসায় এখনও চলিতেছে। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতির রণপোত চারিদিকে ঘুরিতেছে। স্থলেও পুলীস পল্টন দাস সংগ্রহে ও দাসত্ব ব্যবসায়ে বাধা দিতেছে, দাস ব্যবসায়ীদিগকে, ধরা পড়িলে যথেষ্ট কষ্টভোগ করিতে হয়। তথাপি ব্যবসায় এখনও একেবারে রহিত হয় নাই। পূর্ব্বতন নিষ্ঠুরতা পৈশাচিকতার তিরোভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন প্রথা এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই।

ব্যবস্থায় অবস্থা।

আমেরিকায় মুক্ত দাস-বংশের অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু ব্যবস্থার মত অবস্থা এখনও হয় নাই। এখনও অনেক প্রদেশে দাসবংশজ ও দাসবংশজাদিগের প্রতি শ্বেত পুরুষ ও শ্বেত মহিলাদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও তাহা অনেক প্রদেশের দাসবংশজের রাজনীতি ও সামাজিক সকল অধিকারেই ব্যক্ত আছে। এখনও অনেক স্থানে অনেক সময়েই দাসবংশের নরনারীদিগকে শ্বেত হস্তে ভয়ঙ্কর নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, এখনও কোন কোন স্থানে আইন আদালতেও দাসবংশজেরা সুবিচারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। উত্তর প্রদেশের দাসবন্ধুরা বহুকাল যাবৎ দাসবংশের প্রতি সদ্ব্যবহারই করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রভু ও প্রভুবংশের মহাশয়েরা এখনও দাসবংশের নরনারীদিগকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এ ভাবের ব্যতিক্রম হইতে অনেক দিন লাগিবে। আইনে মানুষের মন সংযত হয় না, কার্য্য সংযত হইতে পারে।

উদীচ্য প্রদেশের দাসবন্ধুরা অনেক দিন পূর্ব্বেই দাসবংশজদিগকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছেন। আপনাদের সকল অধিকারেই ইঁহারা দাসবংশজদিগকে অধিকার দিতেছেন। ইঁহাদেরই চেষ্টায় উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায়, ইংরেজাধিকৃত সীরালিয়োঁ প্রদেশের পার্শ্বে, মুক্তদাসদিগের স্বতন্ত্র স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাইবিরীয়া রাজ্যের কথা কহিবার জন্যই আমাদিগকে দাস-কথার অলোচনা করিতে হইল। অবস্থায় ব্যবস্থা এবং ব্যবস্থায় অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমাদিগকে প্রবন্ধ একটু দীর্ঘ করিতে হইল। কিন্তু লাইবিরিয়ার কথা এইবার কহিব।

আমেরিকায় দাসরাজ্য।

অনেক সাধু অনুষ্ঠানের ন্যায় দাসমুক্তির সাধু অনুষ্ঠানেও যে, ইংলণ্ডই সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; ইংলণ্ডের মহাপুরুষেরাই যে, সর্ব্বাগ্রে এই সাধু অনুষ্ঠানের সিদ্ধিপক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। ইংলণ্ডের "এণ্টিস্লেভারি" বা দাসত্ববিরোধিনী সভাই যে, ১৭৮৭ অব্দে, পশ্চিমোত্তর আফরিকার সীরালিয়োঁ প্রদেশে মুক্ত দাস-দাসীদিগকে উপনিবিষ্ট করিয়া সুখ স্বাধীনতার ভোগে সমর্থ করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মন্ত্রীরা উপনিবেশের দাস-ব্যবসায়ে বাধা দিবার জন্য আইন করেন, ইংরেজের স্বজাতি স্ববংশ মার্কিণও ১৮০৮ অব্দেই ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ রাজ্যে ঐরূপ আইন বাহাল করেন। কিন্তু দাসব্যবসায় রহিত হইলেও যে, দাস-মুক্তি হয় নাই; দাস-মুক্তি হয় নাই বলিয়াই যে, গুপ্ত ব্যক্ত দাস-বাণিজ্য ১৮৮৮ পর্য্যন্ত বেশ চলিয়াছিল; তাহাও পাঠক না দেখিয়াছেন, এরূপ নহে। দাসবন্ধুদিগকে সুতরাং নানা উপায়ে দাসমুক্তির চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, অর্থে সামর্থ্যে দাস রক্ষার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। দাস দাসীর মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সকল পণ্য দ্রব্যের ন্যায় এই দাস-পণ্যেরও দর চড়িত পড়িত। দয় যখন পড়িত, তখন দাস বন্ধুরা মূল্য দিয়া অনেক দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া দিতেন। কোন কোন দাস দাসী স্বীয় মূল্য আপনারা দিয়াও মুক্তিলাভ করিত। অন্যান্য উপায়েও অনেক দাস দাসী মুক্তিলাভ করিত। কিন্তু যে দেশে দাস পোষণ রহিত হয় নাই, সে দেশে গিয়া পড়িলে, আবার অনেককেই পুনর্দাসভূত হইতে হইত। এক জনের দাসকে আশ্রয় দিলে, অন্য জনকে বিপন্ন হইতে হইত। মার্কিণ রাজ্যে এরূপ দুর্ব্যবসা অনেক দিন ছিল। তথাপি কিন্তু মহাশয় দাসবন্ধুরা দাসমুক্তিপক্ষে কুণ্ঠিত হইতেন না। মুক্ত দাস দাসীদিগকে আফরিকায় আশ্রয় দিবার জন্যই অনেক দাস-বন্ধু ব্যস্ত হইয়াছিলেন; ১৭৮৭ অব্দে ইংলণ্ডের দাসত্ব-নিবারণী সভা সীরালিয়োঁ প্রদেশে দাসোপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, মার্কিণও সেইরূপ আয়োজনে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিণের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দেই পশ্চিমোত্তর আফরিকা মহাদেশের সাম্যোপকূলে সীরালিয়োঁরই সন্নিহিত স্থানে মার্কিণের চেষ্টায় মুক্ত দাসের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই রাজ্যই এখন "লাইবিরীয়া" রূপে নিজের সার্থক নামের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। সুন্দর সুশাসিত রাজ্যের একটু পরিচয় দিয়া দেখাইব, ব্যবস্থার গুণে অবস্থা ভাল হয়। দেখাইব, পরাজিত বা অধিকৃত রাজ্যের সভ্য মানবের ত কথাই নাই; ব্যবস্থার গুণে, অসভ্য বর্ব্বর কাফরি ক্রীত-দাসেরাও

সভ্য হইয়া, আপনাদের রাজ্য আপনারা চালাইতে পারে, সুশাসনে সভ্য ইউরোপীয় এবং মার্কিণের সহিতও সমকক্ষতা করিতে পারে।

লাইবিরীয়া।

পশ্চিমোত্তর আফরিকার সমুদ্রকূলবর্ত্তী সাম্যোপকূলের লাইবিরীয়া রাজ্য আয়তনে বিশাল নহে, তাহার পরিমাণ এখন ১৪ হাজার ৫০০বর্গ মাইল মাত্র। ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যে লোক ছিল—তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৫ লক্ষ, এখন ১৬ লক্ষের কম নহে। ১৮৯৯ অব্দে দেখা গিয়াছিল, সভ্য মুক্ত দাসবংশজ কৃষ্ণ নিগ্রো ১৮ হাজার মাত্র, অবশিষ্ট আফরিকারই অধিবাসী। কিন্তু এখন সকলেই স্বাধীন। রাজ্যের রাজধানী মন্‌রোভিয়া, মার্কিণের কল্যাণেই এই সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মার্কিণরাজ্যের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট জেম্‌স মন্‌রো ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মার্কিণ সাধারণ তন্ত্রে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার উৎসাহ এবং সাহায্যে মার্কিণ দাসবন্ধুরা এই লাইবিরীয়া বা মুক্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন লাইবিরীয়ার রাজধানীর নাম হইয়াছিল, "মন্‌রোভিয়া" বা "মন্‌রোনগরী"। সেই সার্থক নাম এখনও বিরাজমান। এখন তাহার সর্ব্বত্র মান।

মুক্তদাসরাজ্য লাইবিরীয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২২ অব্দে। ২৫ বৎসর মার্কিণের তত্ত্বাবধানে ও কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া ১৮৪৭ অব্দে রীতিমত স্বাধীনতা লাভ করিয়া, স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮৪৮ অব্দেই দাসবন্ধু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই মুক্তদাস রাজ্যকে প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া, এই রাজ্যের সহিত বন্ধুভাবেই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। আর আর স্বাধীন রাজ্যের যেরূপ মান-সম্ভ্রম, ইংলণ্ডে এই দাস-রাজ্যেরও সেইরূপ মান-সম্ভ্রমই হইতে থাকে। ইংরেজের মাহাত্ম্য মার্কিণের অপেক্ষাও অধিক। পরার্থপর দয়াল মার্কিণদিগের চেষ্টায় এই মুক্তদাস-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় সত্য, কিন্তু মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে ইহার স্বাধীনতা গ্রাহ্য করিতে সাহসী হন না, ১৮২২ অব্দে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৪৮ অব্দে ইহাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মানিয়া লন; মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ১৮৬২ অব্দের পূর্ব্বে লাইবিরীয়াকে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তাই বলিতেছি, ইংরাজেরই মাহাত্ম্য অধিক।

মুক্ত মার্কিণ দাসের রাজ্যে—মার্কিণ প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মার্কিণ শাসন-প্রণালীর মতই শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে। এটীও আফরিকায় একটী ক্ষুদ্র ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্। ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের সমস্তই ক্ষুদ্র আকারের। মার্কিণের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ কংগ্রেস বা মহাসভা আছে, আফরিকায় লাইবিরীয়ারও কংগ্রেস আছে; কিন্তু মার্কিণ রাজ্যে ৮ কোটি লোকের বসবাস বলিয়া, সেখানকার মহাসভার আছেন ৪৪৭ জন সভ্য, আর ক্ষুদ্র লাইবিরীয়ায় ১৬ লক্ষ লোকেরও বসবাস নাই, তাহারও ৮ হাজার মাত্র সভ্য ভব্য, তাই এখানকার কংগ্রেসে ২১টী মাত্র সভ্য; ৮ কোটিতে ৪৪৭ হইলে, ১৬ লক্ষে ২১ কম হইল না।

মার্কিণ মহাসভা দুই ভাগে বিভক্ত, সেনেট বা উচ্চসভায় ৯০ জন সভ্য, হাউস অব রেপ্রেসেণ্টেটিভ বা প্রতিনিধি সভায় ৩৫৭ জন সভ্য। লাইবিরীয়ার সেনেটে ৮ জন সভ্য, প্রতিনিধিসভায় ১৩ জন। মার্কিণ রাজ্যের ন্যায় এ রাজ্যেও প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তা। দুই রাজ্যেরই প্রেসিডেণ্টকে নির্ব্বাচিত হইতে হয়, কিন্তু মার্কিণ রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ৪ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন, লাইবিরীয়ার প্রেসিডেণ্ট ২ বৎসর অন্তর। মার্কিণরাজ্যে ১৭৮৭ অব্দের প্রথাই বাহাল আছে, লাইবিরীয়ায় ১৮৪৭ অব্দে ব্যবস্থা হইয়াছে। মার্কিণ রাজ্যের অনেকেই এখন স্বরাজ্যেও দুই বৎসর অন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিতে চাহেন, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সেনেটে সভ্য নির্ব্বাচন হয় ৬ বৎসর অন্তর, লাইবিরীয়ায় ৪ বৎসর অন্তর। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে প্রতিনিধি সভার সভ্য নির্ব্বাচন হয় ২ বৎসর অন্তর। লাইবিরীয়ায়ও দুই বৎসর অন্তর।

লাইবিরীয়ায় বিদ্যা বিস্তার হইতেছে, আইনের প্রণয়ন ও প্রচলন হইতেছে, আদালতে ভাল ভাল বিচারপতিরাই সুবিচার করিতেছেন, পুলিশ শান্তি রক্ষা করিতেছেন, কল স্থাপন এবং রাজস্বসংগ্রহ রীতিমতই হইতেছে। ফলতঃ সভ্য রাজ্যে যাহা হয়, এখানে তাহাই হইতেছে। পার্শ্বেই ইংরেজ ফরাসীর রাজত্ব, ইংরেজ ফরাসীর সহিত সন্ধি চুক্তি আছে, মধ্যে মধ্যে সন্ধিসর্ত্তের পোষণ পরিবর্ত্তন হইতেছে।

ইউরোপ আমেরিকার যত মহাসভায় যেরূপ বক্তৃতা

এবং তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে, লাইবিরীয়ায় মহাসভায়ও সেইরূপ হইতেছে। অন্যত্র উকিল কৌঁসুলিরা যেরূপ আদালতে আইনের তর্ক করেন, এখানকার উকিল কৌঁসুলিরাও সেইরূপ করিতেছেন। সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞানাদির অন্যত্র যেরূপ চর্চ্চা হয়। এখানেও সেইরূপ হইতেছে।

ক্ষুদ্র নূতন রাজ্যের রাজস্ব অল্প; ১৮৯৮ অব্দে রাজ্যের আয় হইয়াছিল ৬ লক্ষ টাকা মাত্র, ব্যয়ও হইয়াছিল ৬ লক্ষ টাকা। ইংলণ্ডের কাছে লাইবিরীয়ায় গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৪ অব্দে ১৫ লক্ষ টাকা দেনা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত এক পয়সা সুদও দিতে পারে নাই, সুদে আসলে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছে। রবারের বাণিজ্যে আয়-বৃদ্ধি হইতেছে, এইবার সুবিধা হইবে। রাজ্যের আমদানী-বাণিজ্য ৪০ লক্ষ টাকার অধিক নহে, রপ্তানী ৩৪।৩৫ লক্ষ টাকার; নূতন ক্ষুদ্র দাস-রাজ্যের পক্ষে ইহা নিতান্ত মন্দ নহে।

রাজ্যের আয় অল্প বলিয়া প্রেসিডেণ্টও বেতন লন অল্প। তাহার এক জন সেক্রেটারি অব ষ্টেট বা রাজ্য সম্বন্ধীয় মন্ত্রী আছেন, স্বরাজ্যের এক জন স্বতন্ত্র মন্ত্রী আছেন, এক জন রাজস্ব-মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ আছেন, পলটন ও রণপোতের একজন মন্ত্রী আছেন, একজন এটর্ণি জেনারল বা আইন-মন্ত্রী আছেন, ডাক-বিভাগের একজন পোষ্টমাষ্টার জেনেরল আছেন। মার্কিণ রাজ্যের ন্যায় লাইবিরীয়া রাজ্যেও প্রেসিডেণ্টের একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট আছেন। রাজ্যে সমর-সচিব আছেন, কিন্তু শান্ত শিষ্ট রাজ্যে তাঁহার কাজ কর্ম্ম নাই। রাজ্যের যত সমর্থ পুরুষই যুদ্ধের সময়ে অস্ত্র ধরিতে বাধ্য। দুই খানি রণপোত আছে; বৈদেশিক বাণিজ্যে যাহাতে কেহ মাশুল ফাকি দিতে না পারেন, তাহার দিকেই রণপোতযুগলের প্রধান দৃষ্টি।

লাইবিরীয়া রাজ্যে ইংলণ্ডের একজন কন্‌সল্ বা বাণিজ্যদূত ও একজন সহকারী কন্‌সল্ আছে। লাইবিরীয়ার বাণিজ্য-দূতও বিলাতের লণ্ডন, বকিংহাম, কার্ডিফ, গ্লাস্‌গো, হল, লিভারপুল, মেঞ্চেষ্টার, নিউকাসেল, প্লিমথ, পোর্টস্‌মথ, সাউথাম্‌টন এবং সোয়ান্‌সী নগরে বিরাজ করিতেছেন। একজন প্রধান কন্‌সলই সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।

ফলতঃ সভ্য বা স্বাধীন রাজ্যে যাহা চলিতেছে, লাইবিরীয়া রাজ্যেও তাহাই চলিতেছে। দাসবংশজ মহাপুরুষেরাই রাজ্যের সকল বিভাগে—সকল কার্য্যে—কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, প্রেসিডেণ্ট হইতে পুলিস-কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলেই কৃষ্ণদাসবংশজ!

লাইবিরিয়ার দাস-কর্ত্তা।

পাঠক এই চিত্রখানি দেখ, অনরেবল এল্‌ফ্রেড কিং প্রেসিডেণ্ট, রবারটস্ হইতেছেন চীফ জষ্টিস্—বড় আদালতের বড় জজ; আর অনরেবল আর্থর বার্কলে ষ্টেট-সেক্রেটারি বা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। প্রেসিডেণ্ট কিন্তু জন্মিয়াছিলেন—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এক দাসীর গর্ভে, বাল্যেই লাইবিরীয়ায় আনীত হইয়াছিলেন, লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছেন। লাইবিরীয়ায় কলেজ আছে; কিন্তু শিক্ষাবিভাগের কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সেনেটে বসিয়াছিলেন, তিনি তিন বার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

চীফ জষ্টিস রবাটস্ ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের জর্জ্জিয়া প্রদেশ হইতে, ১৫বৎসর বয়সে, ১৮৪৯ অব্দে, লাইবিরীয়ায় আসিয়াছেন, ইনিও লাইবিরীয়ার প্রতিনিধি সভায় যথেষ্ট

প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আদিম আফরিকদিগকেও স্বাধীনতার সুখে সুখী করিয়া, শেষে বড় আদালতের বড় জজ হইয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি বার্কলেও পণ্ডিত লোক।

বিদ্যা ও পদের একটা উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক চিত্রে দেখ! তিন দাসপুত্রই, নিগ্রোসুলভ বল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়াও, শ্বেত কৃষ্ণ কোঁকড়া চুলে কেমন শোভা পাইতেছেন! দেখিলে ভক্তি হয়। মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হয়।

১৯০১ অব্দে এই তিন মহাপুরুষই ইংলণ্ডে গিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। সীরালিয়োঁ এবং লাইবিরীয়ার সীমান্তস্থ একটা নদের বাণিজ্যাদি ঘটিত অধিকার লইয়া দুই রাজ্যে একটু গোলযোগ হইয়াছিল, বিবাদেরও সম্ভাবনা হইয়াছিল। লাইবিরীয়ার তিন প্রধান রাজপুরুষ সেই গোলযোগ মিটাইবার জন্যই বিলাতে গিয়াছিলেন, দাসীপুত্র হইয়াও তাঁহারা বৃটিশ রাজমন্ত্রীদিগের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতা রাজনীতিজ্ঞান অর্থনীতিবিদ্যা প্রভৃতি দেখিয়া, বিলাতের বড় বড় লোককেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। ব্যবস্থায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; দাসী-পুত্রও রাজ-পুত্রকে লজ্জা দিতে পারেন। স্বাধীনতা লাভ হইলে, ক্রীতদাসীর পুত্রও রাজ্য চালাইতে পারেন, অন্যে না পারিবেন কেন? কিন্তু স্বার্থপরতা এবং আত্মগরিমা মানুষকে সহজে ন্যায়পরায়ণ হইতে দেয় না। বিলাতের অনেক মহাপুরুষ আফরিকার যত কৃষ্ণমানবকেই চিরপদানত করিয়া রাখিতে চাহেন। "ফোরম" প্রভৃতি পত্রেও ইঁহারা এই অসম নীতির ঘোষণা করেন। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ মনুষ্য স্বভাবতই শ্বেত মনুষ্য অপেক্ষা হীন; শ্বেত প্রভু, কৃষ্ণ তাহার ভৃত্য। লাইবিরীয়ার ইতিহাসে কিন্তু পাঠক শিখিবেন অনেক। আমাদের দাসবৃত্তেও অনেক দেখিতে শুনিতে পাইবেন। এই প্রবন্ধ আমাদের অপাঠ্য নহে। প্রবন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রলাপ নহে; প্রবন্ধ বৃদ্ধের চাপল্য নহে। অতএব এইখানেই উপসংহার।

শ্রীক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

মাধুরী।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

(কুটীর।)

কুমার ও মাধুরী।

কু। এই সেই শান্তির কুটীর যার কথা
বলেছিনু—নিরাপদে থাক এ নিশায়।
প্রভাতে না হয় যেও যেথা ইচ্ছা তব।

মা। কাহার বসতি হেথা কেবা সে রমণী?

কু। দয়াবতী তিনি; হল না সাক্ষাৎ তাঁর
সনে—কি করি সময় নাই—দস্যুদল
না ফিরিতে ফিরে যাব তথা। রাখিব না
সন্দেহের পথ। বিদায়—হবে না দেখা
আর তব সনে—তবু মনে কোরো মোরে।

মা। ভুলিব না এ জীবনে—

কু। বিদায়, বিদায়।

[প্রস্থান।

মা। গর্ব্বোন্নত দুর্গ হ'তে পিতার আমার,
বৃক্ষলতাশূন্য এই নির্জ্জন প্রান্তর
হেরিয়াছি কত দিন। শুনেছিনু বটে,
থাকে হেথা অভাগিনী নারী একজন,
ফলমূল তরুলতা পত্রাদির গুণ
জানে সে বিশেষরূপে। আর নানা মন্ত্র-
তন্ত্রে বড় সুনিপুণ। গ্রামবাসী জনে,
তাহারে ডাইনী ভাবি পলায় সুদূরে।
এ কুটীর নিশ্চয় তাহার। জীর্ণশীর্ণ
অরক্ষিত জনশূন্য গেহ, আর কার
আশ্রয়ের স্থল?

(দ্বারে আঘাত)

২ অ। (বাহির হইতে) দরজা খোল।

মা। (স্বগত) চুপ, কে এল হেথায়?

২ অ। (বাহির হইতে) শীঘ্র খোল।

মা। পরিচিত কণ্ঠস্বর। এযে মম পিতৃ-
অনুচর। পারে যদি চিনিতে আমায়?

২ অ। (বাহির হইতে) এখনও ইতস্ততঃ কর্‌চ?

মা। স্বতন্ত্র প্রকৃতি আর ভিন্ন কণ্ঠস্বরে
রাখিয়া গোপন মোরে করিব প্রকাশ।
কি ভীষণ সর্ব্বনাশ ঘটিবে আজিকে!

(দ্বারোদ্ঘাটন ও তিন জন অনুচরের প্রবেশ।)

২ অ। তুমি যে দরজা খুলে দিলে, তাতে ভালই হ'ল। নহিলে তোমার কাণের কাছে এ ঘরখানা ভেঙ্গে চুরমার করতুম।

মা। প্রবলের পদানত দুর্ব্বলের যম,
দেখিতেছি তোমরা সকলে। এ পীড়ন
কোন প্রয়োজনে? প্রাসাদ তোরণ হ'তে
পবিত্র সহস্র গুণে পর্ণের দুয়ার।
প্রজার রক্ষক যেবা—সে রক্ষক হ'য়ে,
যদি অত্যাচারে রত, দীনহীন জনে
রক্ষা করিবে কে আর?

২ অ। আমাদের প্রভুর আদেশ, এ কুটীরে যাকে পাব, তাকেই আমাদের দুর্গে নিয়ে যাব।

মা। তোমাদের
প্রভুর আদেশ করিও না কলুষিত
দয়া বিসর্জ্জিয়া। চল, যাইতেছি আমি।

[সকলের প্রস্থান।

২য় দৃশ্য।

দুর্গের বাহ্যদৃশ্য।

কুমারের প্রবেশ।

কু। পুনরায় ভাবিবার লভেছি সময়,
নরপিশাচের দলে যাব কি ফিরিয়া?
সেই বটে নিরাপদ মোর। কিন্তু আজ
সাধিব কি কায়? উহু কি ভীষণ! সাধ
করে নির্দোষ এ দুর্গবাসী জনে হবে
করিতে বিনাশ—অজ্ঞাতে তাদের। না, না,
আমি হব অন্তরায়। শত ধন্যবাদ
মা তোমায়—শিক্ষা দিয়েছিলে বলি'—সেই
ঘোর অভিসন্ধি যত লিখেছি সংক্ষেপে
(শর-মুখে পত্রবদ্ধ করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে শরক্ষেপ)
যাক্—শর গেল দ্রুতবেগে—হলেম কি
বিশ্বাসঘাতক? নাহিক উপায় আর!
অকৃতজ্ঞ বটে আমি সঙ্গীদের কাছে
মনুষ্যত্ব সর্ব্বোপরি শ্রেয়ঃ শতগুণে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তরের গৃহ।

দুর্গাধিপতি ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

দু। অর্পিলে তাহারে শেষে দস্যু-করতলে?
কাপুরুষ নিতান্ত তোমরা।

অ। প্রভু, তাদের সংখ্যা বড় বেশী ছিল, আমাদের একটা তা'দের পাঁচ পাঁচটা; তার উপর আবার হাতিয়ার।

দু। যেতে দাও
ঘটিয়াছে যাহা। যুবক বীরেন্দ্র কোথা?
লয়ে এস তারে।

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ)

মহৎ উদ্দেশ্য তব
হইল নিষ্ফল। বংশের মর্য্যাদা মোর
হ'ল না বর্দ্ধিত হায় তোমার কল্যাণে।

বী। এ ঘোর বিপদে প্রভু হৃদয় তোমার
হ'ল না ব্যথিত? এ কি কথা তব মুখে?

দু। হারাইতে হ'ত দুহিতায়—দীনহীন
অধীন প্রজার চেয়ে নিকৃষ্টের করে
পড়েনি দুহিতা মোর—

বী। তোমার অধীন
প্রজা আমি—কিণাঙ্কিত এ দেহ আমার
বীরত্বের দিতেছে প্রমাণ। কিন্তু প্রভু
পড়ে কি স্মরণে তব, সে কাল সমরে
যে চিহ্ন ধরেছি বুকে—পড়েছিলে যবে
অশ্বচ্যুত হ'য়ে তুমি ভূমি শয্যা'পরে
অর্দ্ধ-নীমিলিত নেত্র নিষ্পন্দ শরীর—
তখন কি এই প্রজা তব দাঁড়াইয়া
মৃত্যুমুখে, বক্ষ দিয়া অসীম সাহসে
শকুনির ভক্ষ্য হতে রক্ষেনি তোমায়?

দু। সে যে কর্ত্তব্য তোমার।

বী। কিন্তু সে সময়
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রাণদাতা বলি,
করেছিলে সম্ভাষণ মোরে। তব মুখে
অসীম প্রশংসা শুনি সাহসের মম,
দীন রাজপুত আমি ভুলি একেবারে
উচ্চ আশাবীজ হৃদে রোপিণু যতনে—
সলিল-সেচনে তুমি বাঁচালে তাহারে।
হইলাম সুখে তাই ফুটন্ত মাধুরী-
সম মাধুরীর তব প্রিয় সহচর।
সেইদিন হতে যত পণের ক্রীড়ায়
হইয়া বিজয়ী লভিতাম পুরস্কার
পদতলে আনি তার রাখিতাম সুখে।
বিস্ময়-স্ফুরিত নেত্রে শুনিত মাধুরী
মৃত্যুমুখ হতে আমি ফিরিনু কেমনে!
ফেলিত সে দীর্ঘশ্বাস অপার আনন্দে!
ধরিত না স্তুতি মোর রসনায় তব।
একসাথে মোরা দোঁহে হয়েছি বর্দ্ধিত
সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, কিবা বিদ্যাভ্যাসে
এক-আত্মা ছিলাম দু'জনে—সে প্রণয়
সুমধুর প্রেমে শেষে হ'ল পরিণত।
তুমিও উৎসাহ দিলে অকপট চিতে।

দু। নিষেধও করেছিনু।

বী। কি কারণ!

দু। নীচ
বংশোদ্ভব তুমি।

বী। ছিলনা উপায় কোন
সে সময়ে আর। পিতৃপুরুষের কথা
কি ফল তুলিয়া তবে? হীন বংশে জন্ম
বলি' করিব কি বিষপান? শব্দময়ী
ধরা'পরে কেন যে এসেছি অবিদিত
আমি। যতক্ষণ আছি হেথা কর্ম্ম মোর
দিবে পরিচয়। কর্ম্মগুণে রাজপূজা
লভে নর। কর্ম্মদোষে যায় অধঃপাতে—
আভিজাত্য রক্ষিতে পারে না তারে। জাতি,
কুল, শীল, মান, সর্ব্বোপরি আধিপত্য
করিতে বিস্তার কর্ম্মফল। কি সমাধি
কীর্ত্তিস্তম্ভ, প্রতিমূর্ত্তি কিবা সবকার হতে
কর্ম্মফল করে স্থায়ী খ্যাতি বা অখ্যাতি।

দু। গুরুতর করি ইহা বলিতেছ তুমি।

বী। নহে প্রভু নহে। এত অবহেলা ভরে
হেরিতেছ ইহা—সহজে শীতল রক্ত
হয় উত্তেজিত। আরো গুরুতর কিছু
শুন এইবার—দস্যুকরে কন্যা তব।
দাও বলি অনুচর বিংশতি আমার
সনে। সম্মত কি নহ? ভাল, দশ জন
দাও তবে। একান্ত না হয়, পাঁচ জন!
ইহাও যদ্যপি বহুমূল্য গণ্য কর
উদ্ধারের তুলনায় তব দুহিতার,
দাও প্রভু শীঘ্র মোরে অব্যাহতি তবে;
ত্যজিয়া আহার-নিদ্রা উদ্ধারিব আগে
মাধুরীরে—হারাইব অথবা আমায়।

দু। তোমার সাহসে আমি করি না নির্ভর।

(১ম অনুচরের প্রবেশ।)

১ম অ। মুক্তিমঠ হ'তে একজন সন্ন্যাসী দেখা করতে এসেছেন।

দু। তাঁর সনে সদালাপ করিতে বাসনা।
হেথা হ'তে লয়ে যাও এ উন্মত্তটাকে।
রেখ রুদ্ধ করি যেন পলাতে না পারে।

বী। বিপদবারণ প্রভু রক্ষ মাধুরীরে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দু। স্থির হও অন্তর আমার। তাঁর কাছে
খুলিব প্রাণের ব্যথা। বিকম্পিত স্নায়ু
যত দৃঢ় হও এবে। সাধু পুরুষের
করুণা প্রভাবে শান্তি লভিবে এখনি।

(দয়ানন্দ বেশে রাঘব ও প্রহরীর প্রবেশ।)

দু। (প্রহরীর প্রতি)
দেখ যেন কেহ হেথা করে না প্রবেশ।

(প্রহরীর প্রস্থান।)

এস প্রভু, দয়ানন্দ নাম কি তোমার?

রা। ওই নামে পরিচিত আমি।

দু। হর্ষ ভরে
করিছে ঘোষণা তব অসীম করুণা
দয়ানন্দ নাম। উচ্ছ্বসিত যশপ্রভা
বিদিত করেছে মোরে—স্বর্গীয় প্রভাব
তব, বিশৃঙ্খল মস্তিষ্ক হইতে লুপ্ত
করি দেয় পাপস্মৃতি। দুষ্কৃতির চিন্তা
আসি যে বিকট মূরতি দেখায়—সেও
হয় বিদূরিত তব সাধনার গুণে।

রা। সামান্য ক্ষমতা মম, কেন তার এত
গুণগান? অনিপুণ নহি বটে আমি
এ মঙ্গল কার্য্য সম্পাদনে।

দু। প্রার্থনীয়
তাই মম; উপদেশ তব করিতেছি
প্রতীক্ষা এখন।

রা। মুক্তকণ্ঠে বল তবে
অন্তরের গুপ্ত কথা—অশান্তির হেতু।
দেহব্যাধি যথা গরব বা লজ্জাবশে
করে না প্রকাশ যারা বৈদ্য-সন্নিধানে,
রোগমুক্ত তারা কভু হয় না জীবনে।
উপহাসাস্পদ করে বৈদ্যেরে কেবল।
মনোব্যাধি জেন সেইরূপ।

দু। অকপটে
বলিব সকল কথা না রাখি সঙ্কোচ
অন্তর্যামী-সন্নিধানে বলিতেছি যেন।

রা। বল তবে।

দু। লভেছিনু সর্ব্বগুণবতী
রমণী-রতনে আমি শুভ পরিণয়ে।

রা। সুখী ছিলে তবে—

দু। মনে করেছিনু বটে
হ'ব চিরসুখী। মানব-মনের গতি
বিদিত তোমার—করিয়াছ অধ্যয়ন
আজীবন যাহা। প্রকৃতির বশে কেহ
উচ্চতম আনন্দ সম্ভোগে থাকি, আনে
তবু অসুস্থতা মনে;—পিশাচের নৃত্যে
শেষে স্বর্গকে নরক করি তুলে।

রা। সত্য
বটে।

দু। আমিও তেমতি ছিনু। বিশ্বাস কি
হয় তব? গুণবতী রমণীরে লয়ে
ছিনু সুখে প্রণয়ের সর্ব্বোচ্চ সোপানে।
তাঁহার অসীম গুণ ধরিতে অক্ষম
হইল হৃদয় মোর। সন্দিগ্ধতা আসি
সে প্রেম-স্বরগ হ'তে বিচ্যুত করিয়া
মোরে ফেলিল আঁধারে—পাইলাম লিপি
এক-লেখা ছিল তাহে সতর্ক নয়নে
রেখ সহধর্ম্মিণীরে।

রা। কোন দুরাচার—

দু। অবধান কর আগে। যাহা হয় নিষ্পত্তি
পরে করিও সাধন। আবার পাইনু
লিপি একখানি—লজ্জিত হইনু বড়
সে লিপি পঠনে। বুঝিনু হেরিব মম
শয়ন-মন্দিরে—অপর প্রণয়ীসহ
রভস আলাপে রত প্রেয়সী আমার
রহিবে নিশায়। নির্দ্ধারিত ছিল তাহে
সে অশুভক্ষণ। ভীষণ যাতনা ভরে
সে সময় করিনু প্রতীক্ষা—অকস্মাৎ
হেরিনু প্রেয়সী মম রহিয়াছে গুপ্ত
ভাবে পর পুরুষের সনে

রা। তোমারই
গৃহে?

দু। প্রেয়সীরে করিনু ছুরিকাঘাত।
সঙ্গী তার গেল পলাইয়া। মোর হস্ত
হতে পাইল সে পরিত্রাণ, আঁধারের
কোলে কোথা গেল মিলাইয়া। সন্ধান না
পাইনু তাহার। হেরিলাম ফিরে এসে
প্রেয়সীও মোর—গভীর আঘাতে যারে
করে নাই বিপন্ন তেমন—আমাদের
একমাত্র শিশুপুত্রলয়ে, আশঙ্কায়,
করিয়াছে পলায়ন জলপথে; কিন্তু
সে তরণীখানি সমস্ত আরোহী সহ

ডুবিল অকূলে—প্রবল ঝটিকা-বশে
কেহ বাঁচিল না আর।

রা। বড় শোচনীয়
বটে পরিণাম তার। কিন্তু অপরাধ
কিবা তব? সে কি নহে দোষী?

দু। কখনই
নহে। সেই দুরাচার—দুরাচার বলি
যারে জানিলাম পরে—লিখেছিল শেষ-
লিপি দৃঢ়তার সহ—যে কথা বলিতে
কাঁপে হৃদয় আমার—অন্তরেতে চির
মুদ্রাঙ্কিত যাহা—নিষ্কলঙ্ক পত্নী তব
জানিও নিশ্চয়। সাধিয়াছি প্রতিহিংসা
অর্দ্ধেক কেবল।

রা। (স্বগত) এখনো অর্দ্ধেক বাকী
(প্রকাশ্যে) তুমি কি সেধেছ কোন অনিষ্ট
কাহারো?

দু। হ'তে পারে। কিন্তু অদ্যাবধি পারি নাই
জানিতে কিছুই হিংসাবশে কে আমার
সাধিল এমন সর্ব্বনাশ?

রা। অপূর্ব্ব এ
কথা বটে। পারিলে না করিতে ইহার
কিছু স্থির?

দু। কই, কিছুই পড়ে না মনে।

রা। অতীব বিস্ময়! কেহ নয়? অপমান
করেছিলে কা'রো, উত্তেজিত হইল যে
এ কার্য্যের তরে?

দু। কখনই নহে।

রা। (স্বগত) আজি
ভাঙ্গিব বিস্মৃতি তব।

দু। শুধু একজনে
দিয়েছিনু মনোকষ্ট। কিন্তু করেছিনু
তারে পুরস্কৃত পরে। বৈরীভাব তার
বিদূরিত করি তারে শান্ত করেছিনু।

রা। (স্বগত) সত্য বটে।

দু। লভিয়াছে মৃত্যু সে এখন।

রা। (স্বগত) নিশ্চিন্ত তাহলে তুমি।

দু। যদি বা সে বেঁচে
থাকে, তার ভাবনায়, এ অমূল্য কাল-
ক্ষয়ে কিবা প্রয়োজন? শুন মোর কথা—
আমিই নায়ক সেই শোণিতপাতের।
ভূতের তাণ্ডবনৃত্যপূর্ণ জনশূন্য
গৃহে প্রবেশিতে যথা পারে না মানব,
মর্ম্মে মর্ম্মে নৃত্য করি তেমতি এ স্মৃতি
দেয় না পশিতে আর শান্তি ক্ষণতরে।

রা। বিষম যাতনা অহো ভুঞ্জিছ যে তুমি

দু। আছে তব
মোহিনী শকতি—সে পবিত্র
ত্রিদিব শক্তির বশে মনের ভাবনা
যত করি দাও দূর। শান্তির জীবন
ফিরে আসুক আবার। অভয় অন্তরে
যেন আগেকার মত ডাকিতে সক্ষম
হই নিত্য পরমেশে। সেই স্বাস্থ্য এনে
দাও মনে, যার বলে মানুষের মত
পারি হাসিতে কাঁদিতে। সেই নিদ্রা চাই
পুনঃ, শান্তিনাশ করি যেবা নিত্য আনে
নবস্ফূর্ত্তি প্রাণে, দেহ করিয়া সবল—
শ্রান্ত কলি পুষ্ট করে শিশির যেমতি।
সংক্ষেপ—

(তীর লইয়া অনুচরের প্রবেশ।)

পশিলে হেথা কি সাহসে তুমি?

অ। প্রভু ক্ষমা করুন। এই তীর উত্তর তোরণের পাশে এখন এসে পড়ল্, এর মুখে এই চিঠিখানা বাঁধা ছিল। ইহা অত্যন্ত দরকারী ভেবেই আপনাকে দিতে এসেছি।

(জানু পাতিয়া তীর প্রদান।)

দু। কি আছে ইহাতে? দেখিতেছি লেখা কিছু।
বুঝিতে নারিনু। আপনি দেখুন প্রভু
কি অর্থ ইহার? (পত্র প্রদান।)

অ। প্রভু, আমার কোন দোষ লইবেন না।

দু। যাও, এসো না এখানে
আর না ডাকিলে তোমাদের।

রা। (স্বগত) বিশৃঙ্খল
এ যে!

দু। সাধু পুরুষের একি ভাবান্তর।
প্রভুকেও ভাবাইয়া তুলিল এ লিপি।

রা। ধাঁধায় পড়েছি বটে—দেখি পুনরায়।
এতক্ষণে পেরেছি বুঝিতে—তুচ্ছ এক
প্রেম-গীত যাহা গায়ক ভিখারী যায়
পথে পথে গেয়ে—উচ্চারণ-যোগ্য নহে
সাধু পুরুষের—শ্রবণেরো যোগ্য নহে
অভিজাত যাঁরা। ইচ্ছা যদি হয় তব
শুনাইব পরে। গভীর চিন্তার কালে
নহে উপযুক্ত। এক মনে শুনিলাম
অপরাধ তব—বড় গুরুতর ইহা।

দু। ঠিক বলিয়াছ প্রভু—

রা। কিন্তু ঈশ্বরের
অনুগ্রহ অপার অনন্ত। অনুতপ্ত
হয় যারা তাদের উপর, করুণার
লীলা তাঁর বড়ই অদ্ভুত। ক্ষণকাল
দাও মোরে নিভৃতে থাকিতে। সমাহিত
হ'য়ে, বিভুপদে সমর্পিয়া প্রাণমন
তোমার শান্তির পথ জানিব এখনি।

দু। বাহিরে রহিব তবে ওই স্তম্ভপার্শ্বে।

রা। সেই ভাল, ধর এ আশ্বাস-বাণী—ক্ষণ
পরে পারিবে জানিতে কেমনে লভিবে
চিরশান্তি তুমি।

দু। শান্তি পাব চিরতরে?
উদিবে না শোণিতাক্ত সে ভীষণ ছবি
কভু আর স্মৃতিপথে?

রা। স্বপনেও
নহে। (স্বগত) কারণ লভিবে মৃত্যু।

দু। এ মঙ্গল
সাধনে তোমার, হউন সহায় বিভু।

(প্রস্থান)

রা। (পত্র পাঠ)
"আপনার দুর্গ অদ্য রাত্রিতে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। আর দুর্গের সকলকেই নিশীথ সময়ে হত্যা করা হবে। উত্তর তোরণের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।"
সুন্দর এ প্রেম-গীত। দয়ানন্দ বুঝি
লিখেছে এ লিপি। না, না, তা'হ'লে লিখিত
সে যে আমার এ ছদ্মবেশ-কথা। তবে
কার পত্র? কুমারের 'পরে হইতেছে
সন্দেহ আমার। আমাদের মাঝে সেই
সদয় প্রকৃতি; অভ্যাস আজিও তারে
রক্তপাত শিখাইতে হয়নি সক্ষম।
কৌশলী সে বটে। কিন্তু উদ্দেশ্য বিফল
হল তার। ঘুচিল সকল ধাঁধা এবে।
দুর্গাধিপে ফিরাইব কটাক্ষে আমার,
করতলগত সে এখন। আরো উচ্চে
উঠিব এবার শ্যেনপক্ষী উঠে যথা
তাহার শিকার লাভ করিবার আগে।
নর চক্ষু অন্তরালে লইয়া তাহারে
সাধিব পরমসুখে শিকার আপন।

৪র্থ দৃশ্য।

দস্যুদেবের আবাস।

কুমারের প্রবেশ।

কু। (স্বগত।) সব দিকেই হল ভাল। আমিই এই রক্ত-প্রিয় কুকুরদের আগে এসে পৌছিচি। তারাও এখনি এল বলে। আমি ত আগেই একটা হিংস্র নেকড়েকে মেরেছি। তার রক্ত আমার গল্পটাকে রঙ্গিন করে তুল্‌বে। (বাঁশীর শব্দ) শোন ঐ তারা খুব কাছে এসেছে। আসুক, আমিও প্রস্তুত আছি।

(অনন্ত ভৈরব ও অন্যান্য দস্যুগণের প্রবেশ।)

অ। সব শেষ হ'য়েছে ত?

(কুমারের হস্ত প্রদর্শন।)

ভৈ। বেশ হয়েছে।

অ। দেহটা কোথায়?

ভৈ। আগা-গোড়াই বল না।

কু। আমি তার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঐ পাহা-

ড়ের উপর নিয়ে গিয়েছিলাম। পাহাড়টাই ত সমুদ্রের উপর ঝুঁক্‌বে—

ভৈ। আমি যেখানে নেড়া বৈরাগীটাকে—যে 'গোবিন্দ হে' বলে চেঁচাচ্ছিল—ঠেলে ফেলে দিয়ে বলেছিলুম যে, এইবার ইষ্ট স্মরণ কর্।

কু। হাঁ, ঠিক তাই; সে যেমন সাগরের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল, আমিও তার পিঠে এক ছোরা বসিয়ে দিলাম। আর তার পরেই তাকে সমুদ্রের তরঙ্গে পড়্‌তে শুন্‌লাম, তার পর সব নিশ্চিন্ত।

ভৈ। হারিৎ কোথায়?

অ। আমরা যখন চলে যাই, তখন কেহ কি তাকে দেখে ছিলে?

১ম দ। আমি ত দেখিনি।

২য় দ। আমি ও না।

৩য় দ। আমি ও না।

অ। আমার বোধ হয় সে ঝোপে ঝাপে কোথাও গিয়ে বেড়াচ্চে। সে সদাই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে, পাছে দয়া তাকে একটুও ছোঁয়। হিংস্র জন্তুর মতন সে নিজেই চেঁচিয়ে মরে। দলে থাক্‌তে বড় চায় না। সে যে রকম নেক্‌ড়ে, এক দিন একটা শিকারীর হাতে পড়ে বসে দেখ না।

ভৈ। ভূভারতে এমন দস্যু শিকারী নাই যে, তাকে শিকার কর্‌বে। তবে আছে কেবল ফাঁসি কাঠ।

অ। তাই বটে। ফাঁসি-কাঠই তার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত। ফাঁসি-কাঠের মান তার দ্বারা যেমন বাড়্‌বে, এমন আর কারোর দ্বারা নয়।

ভৈ। আমি তার জন্ম থেকে সব জানি। ছেলে বেলা যখন সে দোলায় দুল্‌ত, তখন মাছি মারাই তার প্রধান খেলা ছিল। তার মাও তাতে খুব উৎসাহ দিত। ক্রমে যখন বড় হল, একদিন কল্লে কি জান;—তার একটা পাখী খুব গলা ছেড়ে গান গাচ্ছিল, সেই গান শুন্‌তে শুন্‌তে সে উঠে গিয়ে পাখীটার ঘাড় মচকে দিলে। তার মা বেটীও তেমনি হারিতের দাড়ী ধরে চুমো খেয়ে বল্লে 'বেশ করেছ বাবা গান তুমি বোঝ বেশ!' তার পর থেকেই রাস্তায় রাস্তায় কুকুর বেড়াল ঠেঙ্গাবার কায আরম্ভ করে দিলে। যখন পাঠশালায় পড়ত। গুরুমশায় যে পিঠের চামড়া তুলবে—সে ভয় না করে, কা'র ফাঁসি হবে তাই পালিয়ে পালিয়ে দেখ্‌তে যেত। ক্রমে যত বড় হল, ততই সে রক্তলোলুপ হয়ে উঠ্‌ল। আর সেই গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্তু জানোয়ার ছেড়ে এখন মানুষ ধরেছে। যাক, আমরা এখন আমাদের অস্ত্রশালায় যাই।

অ। আজ সকলেই ভাল করে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হও। আজ রাত্রের কায বড়ই গুরুতর।

ভৈ। যদি ধরা পড়ি, তাহলে ত ইঁদুর-বেড়ালের মত আমাদের মার্‌বে। যাক্, ভায়ারা এখন তোমাদের কর্ত্তব্য কর। যা' অদৃষ্টে আছে, তাত ঘটবেই; হয় ত বা ফাঁসি-কাঠ থেকে পালাতেই পারব না। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ কি! ফাঁসি যাবার উপযুক্ত আমরা অনেক দিনই হয়েছি। এখনও যে যাইনি, এইটীই আমাদের শাস্তি। চল, অস্ত্রশালায় চল।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

দুর্গের একটী গৃহ।

রাঘব ও তৎপশ্চাৎ দুর্গাধিপের প্রবেশ।

রা। এই কি নিভৃত স্থান?

দু। নীশিথ যেমন।

রা। পশে না কি কোলাহল হেথা? বাহিরের দৃশ্য কোন পড়ে না লোচনে?

দু। নহে প্রভু, বড়ই নির্জ্জন গেহ। ভেবেছিনু মনে

ভাবী বংশাবলী তরে সাধনার স্থান
ইহা করিব নির্দ্দেশ।

রা। দেখিতেছি
এই তব উপযুক্ত বটে।

দু। আমার অদৃষ্টে
হায় আসিবে কি সে শান্তির শুভদিন!
রাজ্যভার সমর্পিয়া বংশধর' পরে
একমনে ঈশ্বরের করিব সাধনা—
নিশ্চিন্ত হইয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে?

রা। (স্বগত) মোর হস্তে শীঘ্র তুমি হইবে নিশ্চিন্ত।

দু। নিরুপম কারুকার্য্যে সুগঠিত করি
স্থাপিয়াছি স্মৃতি-স্তম্ভ সহধর্ম্মিণীর
মম—যে দিব্য প্রতিমাখানি ডুবিয়াছে
—আমারই কর্ম্মদোষে—ঘোর অন্ধ আমি—
অতল সলিলতলে হায় রে অকালে
তাহারি হিরণ-মূর্ত্তি করিব স্থাপন
রতন-খচিত দীপ্ত স্মৃতিস্তম্ভ পরি।
দোঁহার জীবন-গাথা সুবর্ণ অক্ষরে
জ্বলিবে সতত ওই ঘোর অন্ধকারে।

রা। প্রহর-দামামা তবে বাজিবার পর
পশিব আমরা দোঁহে ওই গুপ্তস্থানে
ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি যেখানে কেবল
রহিবে জাগিয়া। সাধনার কার্য্য শেষে
পুনর্জ্জন্ম লাভ তব হইবে অমনি।

দু। সেই ভাল— প্রভু তব পরিতুষ্টি তরে
যত অর্থ প্রয়োজন বল অকাতরে
করিব প্রদান আমি।

রা। ছি, ছি, সরমের
কথা এ যে, সিদ্ধ হয় ধর্ম্মের সাধনা
যবে, সন্তোষ আপনি জাগে চিতে-যাহা
বহির্ভূত সাধারণ মানব-শক্তির।

দু। আসিতেছে কিসের এ ধ্বনি—

রা। গায়কের
দল বুঝি।

(অনুচরের প্রবেশ।)

অ। আসিয়াছে বহুদূর ভ্রমি
তিনটি চারণ কবি; ক্লান্ত, উপবাসী
তারা, বিরামের তরে আজি নিশাকালে
চায় থাকিতে এখানে। কি আদেশ প্রভু তব?

দু। ব্যস্ত বড় আমি—তাহাদের পাদ্য-অর্ঘ
দিয়ে আহারান্তে পাঠাইয়া দিও অন্যস্থানে।

রা। না, না, সে নহে কর্ত্তব্য কভু তব
যদিও নিবিষ্ট তুমি গভীর বিষয়ে
অতিথির মনোবাঞ্ছা ভুলিওনা তবু
করিতে পূরণ।

দু। ভাল তবে তাই হোক
আন তাহাদের।

(অনুচরের প্রস্থান)

রা। বিশেষ চারণ কবি,
যতনে রচিয়া যারা পুরাবৃত্ত-কথা
প্রাতঃস্মরণীয় যত রাজ-যশোগানে
মহৎ প্রকৃতিলাভ শিক্ষা দেয় সুখে
রাজবংশধরগণে। তাদেরি যতনে
রক্ষিত হইবে ভাবী রাজকীর্ত্তি যত।
সুখদুঃখবিজড়িত তাহাদের গানে
তন্ময় করিয়া তোলে অধীর পরাণ।

(তিন জন দস্যুর চারণ-কবির বেশে প্রবেশ।)

রা। কোথা হতে আসিছ তোমরা প্রিয়বর?

১ম দস্যু। আসিতেছি প্রভু মোরা উত্তর হইতে।

রা। কোন দিকে যাবে পুনঃ?

১ম দ। অদৃষ্ট লইয়া
যাবে যেদিকে আবার? দিবা অবসান
হেরি এসেছি হেথায় আশ্রয়ের আশে
রহিব এ নিশাকালে করেছি মানস।
শুনাইয়া আমাদের গীত তুষ্ট করি,
জানাব আশীস্।

দু। ভাল শুনাও তাহলে।

গীত।

প্রহর-দামামা ওই বুঝি বাজে,
তিমির বসনে ধরণী যে সাজে।
কি ভীষণ রাতি;
হৃদে জাগে ভীতি,
গভীর মূরতি প্রকৃতি বিরাজে।

ঘুমে অচেতন
ধরাবাসী জন,
বিরত এখন নিজ নিজ কাজে।
এ নিশায় স্থান,
অতিথিরে দান,
করে পুণ্যবান্ মানবের মাঝে।

দু। সুমধুর ভাবময় এ সঙ্গীত বটে,
নহে সাধারণ গীত সম।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

আবার কি?

প্র। আদেশ প্রতীক্ষা তব করিছে সে নারী
প্রহরীরা গিয়েছিল যারে আনিবারে।

দু। লয়ে এস তারে। (চারণ কবিদের প্রতি)
যাও ক্ষণতরে এ কার্য্য সমাধা হলে
আহ্বানিব পুনঃ।

(গায়কগণ ও প্রতিহারীর প্রস্থান)

সেই গুনিন্ রমণী
শুনেছ যাহার কথা নিঃসন্দেহ প্রভু।

রা। আমাদের মাঠে বড় পায় না পশিতে
জনরব। এ নারীর আশ্চর্য্য-কাহিনী
তবু করেছি শ্রবণ।

(কৌশল্যার প্রবেশ)

দু। এই সেই নারী।
দেখুন ইহারে। রমণী দাঁড়াও তুমি
গুরুতর অভিযোগ করিয়াছে মম
প্রজাগণ বিপক্ষে তোমার। দিন দিন
সর্ব্বনাশ সাধিছ সবার।

কৌ। একি কথা!

রা। শুন আগে, পরে বল বক্তব্য তোমার।

দু। অনাবৃষ্টি, মহামারী, গবাদি বিনাশ,
যাহা কিছু ঘটিতেছে দৈব দুর্ব্বিপাকে,
সে বিপাক পৈশাচিক শক্তি বলে তব
ঘটাও নিয়ত। তুমি জান বিষপ্রদ
তরু লতা ফল মূল যত, যার গুণে
জরা জীর্ণ করে ফেলে প্রফুল্ল যুবারে
ব্যাধি আনে সুস্থ দেহে, শস্য ভরা ক্ষেত্র
যায় ছারে খারে ব্যর্থ করি কৃষকের
পরিশ্রম যত। অপোগণ্ড শিশুরাও
তীব্রদৃষ্টি প্রভাবে তোমার মাতৃবক্ষে
থাকি যায় শুখাইয়া। নিশীথেও নিদ্রা
নাই তব, সে সময় বিচর নিয়ত
তুমি ভীষণ শ্মশানে, পিশাচগণের
সনে। প্রখর তিথিতে তাণ্ডব নর্ত্তনে
ব্যক্ত কর ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা যত।
সদুত্তর আছে তব বিপক্ষে ইহার?

কৌ। মিথ্যা এ সকল।

রা। নির্ভীক উত্তর এবে
রমণী তোমার।

কৌ। শুন প্রভু মোর কথা
দিবসের কোলাহল হতে ভালবাসি
রজনীর নির্জ্জনতা। প্রখর তপন
তাপ পরিহরি তাই একাকিনী করি
বিচরণ মনোরম চাঁদের কিরণে।
নক্ষত্র-খচিত চারু চন্দ্রাতপ সম
দিগন্ত ব্যাপিয়া নীল অনন্ত আকাশ
উর্দ্ধে করে অবস্থান। সম্মুখে সুনীল
সিন্ধু অনন্ত উদার, উদ্গারিয়া ফেণপুঞ্জ
ধাবিত হরষে। পদতলে বিরাজিতা
শ্যামাঙ্গিনী ধরা---তরুলতা কিশলয়
ফলপুষ্পভারে সুশোভিত তনুখানি।
আহা কি সুন্দর হেরি যবে শিখরীর
কোলে শাদ্বলশোভিত শান্ত সানু দেশে
পশি, কি এক উদারভাবে মগ্ন হয়
হৃদয় আমার দরদর আনন্দাশ্রু
বহে অলক্ষেতে। বিভুর আশীস্ সম
দিব্য শান্তি আনে চিতে উদার সুষমা।

দু। শান্তি নাই শুধু বুঝি মোর।

কৌ। কিন্তু হায়,
উষার বিমল বায়ু সেবন মানসে
প্রভাতে বাহির হ'লে, ঘৃণাভরে চলি
যায় যে হেরে আমায়। এখনো ফুটেনি
বাণী যে শিশুর মুখে—অঙ্গুলি নির্দ্দেশে

সবে দেখায় তাহারে—আমি যেন পাপ
ধরণীর। পল্লীবালদলে করতালি
দিয়ে ফিরে পিছনে আমার, থাকি তাই
বিজন কুটীরে আমি দিনের বেলায়।

দু। নাহি সত্য তবে কি এ অভিযোগ-মূলে?

কৌ। বৃথা অভিযুক্ত আমি—সে মোহিনী শক্তি
কোথা মোর! যার বলে ঘটে মহামারী
ব্যাধিগ্রস্ত হয় নর—পিশাচের সনে
করে আলাপন? নহে কি এ অসম্বন্ধ
প্রলাপ কেবল? নির্ব্বোধের স্বপ্নভীতি?
তাহলে পারে কি মোরে দুর্দ্দান্ত প্রহরী
আনিতে সম্মুখে তব বিচারের তরে?
অলৌকিক সে শক্তি থাকিলে কেন হব
তবে আমি মানবের বিচার অধীন?

রা। যুক্তিপূর্ণ বাণী বটে। সামান্যা এ নারী
নহে কভু।

(অনুচরগণের সহিত বালকবেশী মাধুরীর প্রবেশ)।

দু। কে তোমরা?

অ। এ বালক ছিল
সেই কুটীর মাঝারে।

রা। (স্বগত) যত গোলযোগ।

দু। বলহে বালক কেন পশেছিলে তুমি
ওই নারীর কুটীরে?

মা। শুনেছিনু ইনি
বলিতে নিপুণ অতি ভবিষ্য ঘটনা।
পরীক্ষিতে গিয়েছিনু তাই প্রভু আমি।
আমিও ভবিষ্যবক্তা—আজ্ঞা কর তুমি
যে যেমন আছে হেথা থাকে যেন স্থির'
না হয় বক্তব্য মোর শেষ যতক্ষণ।

রা। (স্বগত) কি অর্থ ইহার? (প্রকাশ্যে)
শুনিও না কথা এর।

মা। স্থির হও মুহূর্ত্তের তরে। ফিরে যাবে
শোণিত হৃদয়ে পুনঃ শুনিলে আমার
কথা। বিস্ময়ে নিমগ্ন হবে মন। তনু
হবে রোমাঞ্চিত। আজি নিশাকালে, আজি
নিশাকালে—

দু। কি ঘটিবে আজি নিশাকালে?

মা। ভীষণ চক্রান্ত এক এ মুহূর্ত্ত পরে
প্রসবিবে এমন ঘটনা যার কার্য্যে
হারাইবে আচম্বিতে দুর্গবাসী জন
নিজ নিজ প্রাণ। দুর্গের প্রাচীর চূর্ণ
হইবে নিমেষে—হত্যা আর অত্যাচার
মূর্ত্তিমান হয়ে সারা বিভাবরী হেথা
করিবে গর্জ্জন। এই সে সময়—দস্যুগণ
আক্রমিবে, প্রহর-দামামা বেজে
উঠিবে যেমতি উত্তর তোরণ-পথে
প্রবেশিবে তারা। নিশ্চেষ্ট থেকনা আর।

রা। ক্ষান্ত দাও নাবালক ভবিষ্য-কথক।
পবিত্র কার্য্যের তুমি ঘোর অন্তরায়।
এ শুভ মুহূর্ত্ত বৃথা করিব না ক্ষয়
আর তব কথা শুনি। ধর্ম্মের বিরুদ্ধ
এ যে ঘোর অপমান। বাচাল বালক
বাতুলের বাণীসম গণি তব কথা
কি ফল শুনিয়া তবে?

মা। কেন প্রভু, কেন?
আমি ত বলিনি সাধুবেশ-আবরিত
দস্যুমূর্ত্তি তব? কত ভণ্ড আছে হেন
সাধুবেশে থাকে লুক্কায়িত। হের ওই
চারণ কবিরা—নহে চারণ কখন,
এ দুর্গের সর্ব্বনাশ সাধিতে এসেছে
এরা চারণের বেশে।

দু। সত্বর পরীক্ষা
তবে কর উহাদের।

রা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এক
দৃষ্টে দেখিতেছে গুণীন্ মাগীটা মোরে।
মরণ কি নাই ওর?

কৌ। (স্বগত) নিশ্চয় হইবে
কোন দস্যু এ সন্ন্যাসী।

মা। কি বল এখন
প্রভু!

রা। অবাক্ হয়েছি।

কে। (স্বগত) দোষী বলে তুমি।

দু। কে তোরা দুর্ভাগাগণ, বল শীঘ্র করি,
নহিলে যন্ত্রণা দিয়ে করিব বাহির
সকল রহস্য।

১ম দ। ভবিষ্যৎ-বক্তা তব
বলুক সকল! আপন বিপক্ষে দেয়
নির্ব্বোধে প্রমাণ। দস্যুদের নহে রীতি
আত্মপ্রকাশের।

২য় দ। আসি নাই সদুদ্দেশ্যে
এখানে আমরা। বর্ত্তমান মূর্ত্তি তার
বিশিষ্ট প্রমাণ। আর কিছু নাহি বলিবার।

৩য় দ। আমারো কিছুই আর নাহি বলিবার।

দু। লয়ে যাও ইহাদের—রাখ অবরোধে।
(চারণ-বেশী দস্যুদের লইয়া অনুচরের প্রস্থান)
আর কিছু বলিবে কি ভবিষ্য-কথক?

মা। কিছু নহে প্রভু।

দু। সে কি?

মা। যথেষ্ট বলেছি
তব নিরাপদ তরে! পীড়াপীড়ি আর
করোনা আমায়। যা' বলেছি, জেন তাহা
ঘটিবে আজিকে। হইয়াছি ক্লান্ত বড়,
চাই আমি বিরাম এখন।

দু। লয়ে যাও
ইহারে তোমরা; করিবে পূরণ যাহা
বাসনা ইহার।

মা। কেবল একটী কথা
ভুলেছি বলিতে। আক্রমিবে দুর্গ যারা,
তাহাদের মাঝে সুন্দর যুবক এক
হেরিবে, কুঞ্চিত কেশ উন্নত শরীর
তিলাঙ্কিত রামেতর কপোল তাহার
যাহা হেরি স্পষ্ট তা'রে পারিবে বুঝিতে।

কৌ। (স্বগত) সে যে আমারি কুমার।

মা। ভুলে কেশ-স্পর্শ
তার করিও না যেন। অন্যথা ঘটিলে,
ঘোর অনুশোচনায় দগ্ধ হবে পরে।
দয়া করি' নিরাপদে রাখিও তাহারে।
জানিতে পারিবে পরে বৃত্তান্ত সকল।

(প্রস্থান)

দু। নহে কি আশ্চর্য্য ইহা?

রা। বড়ই আশ্চর্য্য।
(স্বগত) এ বিপদে অতিক্রম করিব কৌশলে।

দু। দেখিতেছি আছে কিছু রহস্য আজিকে।
এ রমণী নিরপরাধিনী—মুক্তিদান দিনু
তব।

কৌ। (স্বগত) কে যে এ সন্যাসী একবার হবে
আজ জানিতে আমায়।
(প্রস্থান)

দু। বিপদের এ যে
বিষম সূচনা।

রা। আমারো হাতছে শঙ্কা।

দু। ছদ্মবেশী দস্যুগণে কঠোর যন্ত্রণা
দিয়ে বাহিরিবে সকল রহস্য এবে—
সত্য কথা যত।

রা। হও নিরস্ত তাহাতে—
কঠোর বিচার-যোগ্য নিশ্চয় তাহারা।
দস্যুদেহ লৌহসম বিষম কঠিন।
হাসিয়া উপেক্ষা করে সকল যন্ত্রণা।
দেহের যাতনা পেয়ে সত্য যে বলিবে
তারা, কে করে প্রত্যয়? অন্তরের ধন
সত্য—অন্তরের পরীক্ষক জানে তার
পরীক্ষা-কৌশল। আছে দুষ্ট শত শত
পশুর মতন অম্লান বদনে সহে
দেহের যাতনা—ছাড়ে প্রাণ-আশা, তবু
করে না প্রকাশ কোন কথা। কিন্তু তারা
মন হ'তে পারে না ত্যজিতে হিতাহিত
জ্ঞান কভু। তাদেরো মানস-পথে পশে
অনুতাপ। অনুতপ্ত হ'লে করে সব
সহজে প্রকাশ।

দু। দেখিতেছি উহারাও সেই প্রকৃতির।

রা। আমার বিচারে তবে রাখ
উহাদের। শীঘ্রই জানিয়া উহাদের
অভিসন্ধি বলিব তোমারে। না পারিলে
জেন মোর সাধনের ফল—দৈব শক্তি—
যার যশে মানবের চিরপূজ্য আমি,

কোন ভিত্তি নাই তার—নিষ্ফল সকলি।

দু। তবে প্রভু কর তুমি তাদের বিচার।

রা। একেবারে তাহাদের হিতাহিত জ্ঞানে
করিব আঘাত আমি। দিব্য বস্তু আছে
কিছু এ দেহের মাঝে—জানিতেছি যার
বলে ভাবী মঙ্গল-সূচনা।

দু। সেই ভাল
করিগে আদেশ তবে অনুচরগণে,
হেথা আসি তব আজ্ঞা করিবে পালন।

রা। আমারো দর্শন তুমি লভিবে সত্বরে!
[দুর্গাধিপের প্রস্থান]
এইরূপে ধীর মানবেরা বিপদের
মধ্য হ'তে লভে নিরাপদে।
(কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ)
এ মাগীটা
এখানো এখানে! (প্রকাশ্যে) কিবা প্রয়োজন
হেথা? বড় ব্যস্ত আমি।

কৌ। সাধু তুমি নহ কভু।

রা। না হই যদ্যপি তাহে তোমার কি কায?

কৌ। করিয়াছ নির্ব্বাচন যে নিভৃত স্থান
গূঢ় অভিসন্ধি কিছু রয়েছে তোমার।

রা। উদ্দেশ্যের যোগ্য মোর এ নিভৃত স্থান।

কৌ। এ নিশাও যোগ্য বটে দুষ্কার্য্যের তব।
কি শুভ উদ্দেশ্য হেন করিবে সাধন
দিবসের চক্ষু যেথা রবে নিমীলিত?

রা। এ উদ্দেশ্য সাধনের নিশাই প্রশস্ত।

কৌ। দস্যুদের ছদ্মবেশ-বিমোচন কালে
দেখিয়াছি দৃষ্টি তব কি কালিমাময়!
বিস্ময়ে কেবল তুমি হওনি কম্পিত
উদ্বেগে কাঁপিয়াছিলে ঘোর পাপী সম
নিস্পন্দ রহিলে তাই বিরস বদনে।

রা। দস্যুদলপতি আমি, চিন না আমায়?
কিন্তু এ ভিত্তির পরে করিও না আশা।
পুত্র তব করতলে—

কৌ। কি হয়েছে তায়?

রা। সহজ শিকার সে যে এখন আমার।
হয়েছে সে আমাদের বিশ্বাসঘাতক
পেয়েছি প্রমাণ তার—আজিকার কার্য্যে।
যদি না হইল ফল—অথচ বিপদ
যদি না ঘটে আমার—নিশ্চয় জানিও
তারে করিব নিধন।

কৌ। রক্ষিবেন তারে
ভগবান্।

রা। আর ভগবান্! সাবধান
হও তুমি। অতীত এ মোহিনী শক্তির
তব। নির্ব্বোধ এ দুর্গেশের পরিণাম
আজ মোর করতলে। অব্যাহতি-আশা
তার রেখ না অন্তরে। বিষম বিপদে
কেন হবে জড়ীভূত? কুটীরে তোমার
ফিরে যাও। বাজে ব'লে প্রহর-দামামা।
থেক না হেথায় আর। এ বিপদ কর
পরিহার। তাহলে রাখিব প্রাণ
পুত্রের তোমার—যতক্ষণ রব আমি
অক্ষত শরীরে—যাও যাও এই বেলা।
[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

(বনের অন্ধকার অংশ। দূরে প্রহর-দামামার বাদ্যধ্বনি।)
অনন্ত, ভৈরব ও এক জন দস্যু।

অ। কি গাঢ় অন্ধকার।

দ। আর তেমনি নিশাড়া—যেন মড়ার মত।
গাছের পাতা পড়্‌বার শব্দ অবধি শুন্‌তে পাওয়া
যাচ্চে। সে লোকটা এখনো গাছে ঝুল্‌ছে, আর
এমন একটা শোঁ শোঁ শব্দ তুল্‌ছে—যেন এখনি
আমাদের উপর সে প্রতিশোধ নেবে বল্‌চে।

অ। দূর পাগলা, ও কথা ভাবিস্ নে। চৌকিদারেরা
মনে করে, আমাদের ধরিয়ে দিয়ে রাজার কাছে

মস্ত নাম কিন্‌বে। বেটারা জানে না যে, তাদের প্রাণ আমাদের হাতে।

ভৈ। আমি দেখ্‌তে পাই ওদের মধ্যে রাধুটা বোঝে বেশ—সেদিন আমরা মাঝের গাঁ লুট্‌ কর্‌চি দেখে, রাধু সরে গেল। বল্‌লে তোমরা যদি কিছু পাও, আমার তাতে বাধা দিবার দরকার কি? আমরাও কোন্‌ না তাকে বক্‌সিস কর্‌লুম। আর সব বেটারা, কুকুর-মারাদের মতন মনে করে, আমাদের এক একটার মুণ্ড নিয়ে গিয়ে রাজার বক্‌সিস্‌ নেবে। পোড়া কপাল আর কি?

অ। শোন, কারা আসছে?

২য় দ। (বাহির হইতে) আমরা।

অ। কে—অশ্বিনী?

(দুর্গ হইতে তিনজন দস্যুর প্রবেশ)

১ম দ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল—হ'ল ভাল।

অ। কেন--তোমাদের কি জান্‌তে পেরেছিল?

১ম দ। জান্‌তে পেরেছিল বটে, কিন্তু সর্দ্দার ঠিক আছেন—আর তিনিই আমাদের রাস্তা পরিস্কার করে দিলেন। প্রহর-দামামা ত বেজেছে। সমস্ত গ্রাম ত ঘুমে আচ্ছন্ন। আজ্‌কে আমাদের জিতের খেলা। আর দেরী কোরনা; আমাদের সঙ্গে এস। পরে সব জান্‌তে পারবে।

অ। তবে এস, সকলে যাই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নির্জ্জন গৃহ-মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ।

দুর্গাধিপ ও রাঘবের প্রবেশ।

দু। এই সেই স্থান।

রা। কেহ বাধা দিবে না হেথায়?

দু। থাকিতে জীবন-আশা করিবে না কেহ
প্রবেশ এখানে।

রা। বেশ! গভীর এ স্থান
শান্ত নিরজন—উপযুক্ত আমাদের
ধর্ম্মানুষ্ঠানের।

দু। হের, মেঘাচ্ছন্ন শশী
হ'য়েছে নিষ্প্রভ—এখনি সে মেঘজাল
ভেদি' লভিয়া সম্পদ পুনঃ বিতরিবে
শান্ত জ্যোতিঃ এ পবিত্র কর্ম্মে।

রা। সে প্রতীক্ষা
রাখিব না আর।

দু। বলুন তা'হলে প্রভু
এ বিরলে অন্ধকারে আমরা দু'জনে
কি গুপ্ত কার্য্যের তরে আসিয়াছি এবে?

রা। সন্দেহ কি কর? হত্যা অপরাধী তুমি।
শোণিতের প্রায়শ্চিত্ত শোণিত-তর্পণ।

দু। অর্থ কি ইহায়?

রা। যে পাপ করেছ তুমি
প্রায়শ্চিত্ত তার নহে সামান্য কখন।
অনুতাপ, স্বার্থত্যাগ, যজ্ঞ, অনশন,
জীবনে সর্ব্বস্ব দান, তীর্থ পর্য্যটন,
মন্দির, অতিথিশালা, বিগ্রহ স্থাপন,
এ সকল পাপ মুক্তি হ'বে না তোমার।

দু। তবে প্রভু, এ পাপের কিসে হ'বে ক্ষয়?

রা। মৃত্যু—(বস্ত্রত্যাগে আত্মপ্রকাশ)

দু। অহো! কে তুমি! কে তুমি! দস্যু! দস্যু!

রা। নড়িও না এক পদ কোরনা চীৎকার,
তা হ'লে এখনি শেষ করিব তোমার।
কালের করাল করে এত কি আমার
ঘটিয়াছে রূপান্তর—তুমিও ভুলেছ
মোরে?

দু। কে তুমি? কে তুমি?

রা। (বাহুপরি চিহ্ন দেখাইয়া) চিনেছ এখন?

দু। রাঘব? জীবিত তুমি?

রা। নহিক প্রেতাত্মা
হের পুনরায়—এখনো যদ্যপি থাকে
চক্ষের সন্দেহ তব—হৃদয়ের মাঝে
শীঘ্র বুঝিবে আমারে।

দু। বৈরী ভাবে কেন?

রা। কেন? মনে নাই, ছিলে যবে সেনাপতি
সাহসী সৈনিক দলে—উদ্দাম বাসনা
বশে উন্মত্তের মত দিয়েছিনু যোগ
যাহে—শত কষ্ট সামান্য সৈনিক সম
সহি অকাতরে। করেছিলে একদিন
তীব্র তিরস্কার—আমিও উত্তর তার
দিয়েছিনু তীব্রতর করি। সেই দোষে
গুরুতর দণ্ড তুমি প্রদানিলে মোরে
অপরাধী সৈনিকের নিতান্ত অযোগ্য—
শুধু তাহা নহে—প্রতিহিংসা যত কেন
হোক্‌ না প্রখর—মানুষ পারে না দিতে
মানুষের প্রতি সে জঘন্য দণ্ড কভু।
মধ্যাহ্ন তপনালোকে হাটের মাঝারে
সাধ করে আহ্বানিয়া যত নীচ জনে
—যাদের শ্লেষোক্তি বিষে জরজর তনু—
ঘোর অপমান করি তাদের সম্মুখে
এ চিহ্ন মুদ্রিত করি দিলে এ বাহুতে
জন্মশোধ।

দু। হয়েছিল গুরুতর দোষ
বটে মোর—কিন্তু তুমি করেছিলে ক্ষমা।

রা। মুখে ক্ষমা করেছিনু—অন্তরেতে নহে।
তুমিও বিশ্বাস করি বেঁধেছিলে মোরে
বক্ষে তব। তখনো বলিনি কিছু। দোঁহে
মিলি একসাথে আহারে বিহারে রত
হইতাম সুখে। তবু বিষদান করি
নাই খাদ্যে তব। দোঁহে মিলি ঘোর রাত্রে
ভ্রমিয়াছি ভীষণ প্রান্তর কত। কত
দিন সিন্ধুকূলে বিজন ভূধরে দোঁহে
করেছিনু আরোহণ। তথাপি নিরস্ত
ছিনু। আরো কত তোমার ধ্বংসের তরে
আশ্চর্য্য উপায়—উপেক্ষায় পদভরে
করেছি দলিত। নহে দয়াবশে তাহা।
সৈনিক যুবার সেই বলিষ্ঠ বাহুতে
যে কলঙ্ক করেছ মুদ্রিত—মৃত্যু এসে
পারিবে না ঢাকিতে তাহারে--ভস্মীভূত
না হ'লে এ দেহ। তুমি ভেবেছিলে আমি
লভেছি মরণ। মৃত বটে আমি আজ
সকলের কাছে—প্রতিহিংসা রাখিয়াছে
জীবিত কেবল। শয়ন-মন্দিরে তব
দয়িতার পাশে হেরেছিলে আমারেই—
আমি দিয়েছিনু সেই লিপি। যন্ত্রণায়
অভিভূত হয়ে, অনুতাপে মগ্ন হ'লে
তুমি, এ কলঙ্ক অশনির সম বেগে
পড়ে না হৃদয়ে তব?

দু। সন্তুষ্ট নহ কি
তবে এখনও তুমি?

রা। এক তিল নহে—
প্রজ্বলিত প্রতিশোধ পিপাসা মিটাতে
নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে সংহারি তোমায়
উত্তপ্ত শোণিত যদি পান করি সুখে
কম্পিত ও দেহ যদি ছিন্ন ভিন্ন করি
ফুৎকারিয়া দিই উড়াইয়া—ধূলি যথা
ঘূর্ণিবায়ু-মুখে—তবু জেন জয়োন্মত্ত
হৃদিমাঝে মোর—তোমার যন্ত্রণা যত
ক্ষণস্থায়ী ভাবি'—প্রতিহিংসা অরুন্তুদ
তুলিবে ক্রন্দন। মনে করিও না তুমি
তোমার জীবন—এখনি ফুরাবে যাহা—
আমার এ ক্ষতি পূর্ণ করিতে সক্ষম।

দু। তা হ'লে জীবন মম রক্ষা কর তুমি।

রা। কোন্‌ যুক্তি বলে তুমি করুণাভাজন?
কিছুতেই নহে—জান না আমার পক্ষ
হইতে যখন আবেদন পত্র শত
পেয়েছিলে করে—হাসিয়া ঘৃণার হাসি
বলেছিলে তুমি—ন্যায় দণ্ডে দণ্ড দিব
তার—করিব না দয়া কভু। ন্যায় দণ্ড
পড়ুক এখন তবে তোমার উপর।

দু। কে আছ? কে আছ? খুন! খুন! দস্যু! দস্যু!

(দুর্গাধিপের পশ্চাতে রাঘবের অনুসরণ—স্মৃতিস্তম্ভ পার্শ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কৌশল্যার উভয়ের মধ্যে অবস্থিতি।)

রা। কে তুমি? কে তুমি? কথা কও—একি, একি,

জীবন্ত নারীর একি সত্য আবির্ভাব ?
কথা কও, কথা কও, তবে কি এমনি,
মানসিক বিকারের কল্পিত মূরতি ?
অথবা এ ঘোর নিশা—ভীষণ ঘটনা
অটল প্রতিজ্ঞা হ'তে করিতে আমায়
বিচলিত—আহ্বানিয়া এনেছ ইহারে।
বাক্‌শক্তিহীন এবে অচল মূরতি !
এ কি তবে দৈব বিপর্য্যয় ?

(ভূমিতলে কৌশল্যার সজোরে পদক্ষেপ ও কতকগুলি প্রহরীর প্রবেশ।)

সব নষ্ট
হ'ল শেষ এক নারী হ'তে !

কৌ। হেথা হতে
লয়ে যাও দস্যুটাকে ধরি।

রা। দেখা যাবে,
নিশাশেষ হয়নি এখনো।

(রাঘবকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।)

কৌ। বিমোহিত
এখনো যে তুমি।

দু। শিথিল এ দেহ বটে
গাঢ় নহে এখনো শোণিত। ধমনীর
মাঝে বহিতেছে ধীরে ! জানি না কে তুমি—
শরীরী অথবা তুমি সুখী অশরীরী ?
কণ্ঠস্বরে শরীরীর দিতেছে প্রমাণ—
অদ্ভুত প্রকাশ তব হেরি অকস্মাৎ
অশরীরী হতেছে প্রতীতি। যার স্মৃতি-
স্তম্ভ ওই রয়েছে গঠিত—অদৃষ্টের
ঘোর এই দুর্য্যোগ-সময়ে—তার বেশে
আবির্ভূত হ'য়ে অনিবার্য্য হত্যা আজি
ব্যর্থ করে দিলে। মৃত্যুপথে পাঠাইলে
আসন্ন মৃত্যুরে।

কৌ। নহি প্রেতমূর্ত্তি আমি
তাহারি শরীরী—যে রমণী সনে তুমি
হবে না মিলিত আর ভাবিয়াছ মনে
প্রাণভরে ভাল যারে বাসিতে সতত
রয়েছ গভীর শোকে যাহার বিরহে
যাহারে লভিতে তব আকাঙ্ক্ষা প্রবল—
অথচ যে আশার অতীত—হের সেই
অভাগিনী সম্মুখে তোমার—

দু। সম্ভব কি ?

কৌ। নিমজ্জিত তরি হ'তে একের উদ্ধার !

দু। জাগিতেছে ধীরে ধীরে স্মৃতি—বটে, বটে,
তুমিই প্রেয়সী মম। উন্মত্ত লহরী
কৃপা করেছিল—

কৌ। আমারে বলিতে দাও।
আনন্দ—প্রবাহ বহি' নয়ন হইতে
ভাসিতেছে স্থির বক্ষে। এ বাহু লতিকা
ধাবিতা তোমারে হৃদে বাঁধিতে সোহাগে
ততোধিক সুখে—যে সুখে বাঁধিয়াছিল
গরজিত সিন্ধুমাঝে কুমার আমার।

(আলিঙ্গন)

দু। নবীন জীবন পুনঃ লভিনু আমরা।
কুমার জীবিত তবে ?

কৌ। জীবিত সে কিন্তু—

দু। বল, বল,—

(প্রহরীর প্রবেশ।)

কি সংবাদ ?

প্র। প্রভু,
আক্রান্ত হয়েছে দুর্গ।

কৌ। ভয় নাই, সৈন্য-
গণে তব রেখেছি প্রস্তুত—বিপক্ষের
অভ্যর্থনা তরে।

দু। আমিও রহিব তবে
সৈন্যগণ সনে। স্মৃতিস্তম্ভ অন্তরালে
থাক নিরাপদে তুমি এবে—যতক্ষণ
এ দুর্য্যোগ নাহি হয় শেষ !

কৌ। আমি যাব
তোমার সহিত—এখনো আমার কাজ
আছে সেইখানে।

দু। এস তবে যাই দোঁহে !

(সকলের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য।

দুর্গের কক্ষ।

(দস্যু ও সৈনিকদিগের যুদ্ধ—দস্যুদিগের পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে সৈনিকদিগের প্রস্থান।)

(কুমারের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ দুর্গাধিপের প্রবেশ।)

দু। আত্মসমর্পণ কর পামর এখন।

(উভয়ের যুদ্ধ—পরাজিত কুমারের পতন ও দুর্গাধিপের তাহাকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর—কৌশল্যার প্রবেশ।)

কৌ। ক্ষান্ত হও, এবে তনয় তোমার।

কু। পিতা !

দু। কি আশ্চর্য্য—দৈবের ঘটনা।

কৌ। করিও না
পরিহার কুমারে তোমার, সঙ্গ-দোষে
দুষ্ট বটে—কিন্তু প্রকৃতি এখনো এর
দস্যুভাবে হয়নি গঠিত।

দু। এস বৎস।

(আলিঙ্গন)

কু। বিধাতার অদ্ভুত বিধান ! না হতেম
লিপ্ত যদি এ ঘোর কলঙ্কে—মৃত্যু আসি
গ্রাসিত অবাধে যত দুর্গবাসী জনে।
উত্তর তোরণ ভেদি' যে তীর বিক্ষেপ
করি আমি—

দু। ভাল কি হয়েছে তায় ?

কু। লেখা
ছিল তাহে—মন্তব্য এ পাপ উদ্যমের।

দু। বাস্তবিক ?

কু। যথার্থই যেন।

দু। (স্বগত) বুঝিয়াছি
সন্ন্যাসীর ধাঁধার কারণ ! চতুর, চাতুরী-
বলে লিপির উদ্দেশ্য করিল বিফল
ওই আসিতেছে হেথা বন্দী আমাদের।

(বীরেন্দ্রের প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ প্রহরী সহ বন্দী দস্যুগণের প্রবেশ।)

দু। (রাঘবের প্রতি)
হতভাগ্য জীব তুমি—দিয়েছ তোমার
পরিচয়—প্রতিহিংসা। কি বলিতে চাও
এবে ধর্ম্মের সমক্ষে ?

রা। কিছু নয় ; ব্যর্থ
হল উদ্দেশ্য আমার -অনুতপ্ত তাই
আমি।

দু। তবে কি জীবিত রবে বন্ধু হয়ে
মম ?

রা। কখনই নহে—শত্রু আমি তব
চিরশত্রু করেছ যখন মোরে—শত্রু-
রূপে মরিব তোমার—এ বাসনা মম।
পদচ্যুত করিয়াছে মোরে, কলঙ্ক-মুদ্রিত
দেহে মানব-সমাজ হ'তে চিরতরে
নির্ব্বাসিত আমি—একাকী গহন বনে
প্রতিহিংসা শুধু মোরে দিয়েছে সান্ত্বনা।
দিবায়, নিশায়, কিবা আলোকে, আঁধারে,
প্রতিহিংসা সাথী মোর—সেই নিদ্রাসুখ,
সেই খেলা, সেই অধ্যয়ন, সেই মোর
হৃদয় স্পন্দন ; না পার সাধিতে যদি
দেহ হ'তে প্রাণের বিচ্ছেদ—অথবা, এ
দেহে স্থাপিতে বিভিন্ন আত্মা—জেন স্থির
ঘটিবে না কভু পরিবর্ত্তন আমার।
সম্ভব হইতে পারে কক্ষচ্যুত ধরা
কিম্বা গ্রহগতি রোধ তবু এ হৃদয়
করিবে না স্পর্শ যেন প্রণয় তোমার।

দু। সখা বলি' গণ্য তুমি হইলে আমার
হবে না কি তাহে তব মানের গৌরব ?

রা। তৃণতুল্য তুচ্ছ ভাবি তোমার ক্ষমতা।
মূল্যহীন বলে গণি' এ জীবন মম—
তুমি করিয়াছ যশ বিক্ষত আমার ;
মহতেরা প্রাণাধিক ভাবে যে কীর্ত্তিরে
সে কীর্ত্তি বিনষ্ট মোর তব আচরণে।
যশঃ - সে যে নব উচ্চ অভিলাষ বিভা—

জীবনের মহিমা—কেতন। যশ ;—সে যে
অমর গৌরব নিধি মর জগতের।
সখ্য ?—সে যে সারল্যের শুভ্র হাসিমাখা
বিকচ আত্মার দিব্য পুলক মিলন।
এ সৌজন্য চাহি না তোমার। লয়ে যাও
বিজন কারার স্তব্ধ আঁধারে আমায়
সেথা বসি প্রাণ খুলে দিব অভিশাপ।

(রাঘবের প্রস্থান।)

কৌ। অটল অচ্যুত হয়ে করিছে বিরাজ
শত্রুতা হৃদয় মাঝে—

দু। এখনো হৃদয়
তার নম্র হ'তে পারে। বন্দীদের লয়ে
যাও, শুনিব আবার কাল উহাদের
কথা।

(বন্দীদের লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান)

দাও কর বীরেন্দ্র তোমার—ধর
মোর ধন্যবাদ দুর্গরক্ষা তরে। তব
যোগ্য পুরস্কারে হবে না বঞ্চিত।

(মাধুরীর প্রবেশ)

এস
উদ্ধারিণী মা আমার—

মা। আমি কি এখন
সেই বাচাল গণক ? নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে
স্থান বসতির তরে যার ক্লেদময়
জলাভূমি পারে ?

দু। এ বিস্তৃত রাজ্যে মম
উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখ ভাল করি
মাধুরী আমার। বহুমূল্য রত্ন বলি
যাহা হবে জ্ঞান—নির্দ্দেশ করিয়া দাও
এখনি তোমার করে অর্পিব উল্লাসে।

মা। পিতঃ, করিও না আশান্বিত মোরে—
ঘোর অর্থলোলুপের স্বপ্নাশা হতেও
উন্মত্ত বাসনা মোহে মোহিত যে আমি।
এ রাজ্যসম্পদ—

দু। যাহা ইচ্ছা চাও তুমি।
দয়াময় জানেন অন্তর—সম্প্রদান
করিব এখনি তোমার বাঞ্ছিত ধন।

মা। বাঞ্ছিত আমার, এই বীর প্রজা তব।
বসিলাম জানু পাতি দাও পিতঃ—আর
এই মাত্র সকরুণ অদ্ভুত কাহিনী
শুনি' চিনিয়াছি—জননী আমার
কর আশীর্ব্বাদ—

দু। মা আমার

মা। এই মনোবাঞ্ছা মোর—আর কিছু নয়।

দু। মা আমার উঠ উঠ দুহিতার তব
উদ্ধারিণী মম, এস স্নেহ আলিঙ্গনে।

মা। পুত্র তব পরিত্রাতা মোর। সমর্পিতা
হয়েছিনু নিধনের তরে ভ্রাতৃকরে
আমি। কিন্তু অবগাহি করুণা-সলিলে
সরল প্রকৃতি তার করে ধরি মোর
বিভীষণ দস্যুবাস হ'তে, অতিক্রমি'
বিপদসঙ্কুল বন—রেখেছিলা
নিরাপদ নিকেতনে—ভবিষ্য-কথক
হ'য়ে এসেছিনু যথা হ'তে।

দু। মুক্ত হল'
আর এক বিস্ময়ের দ্বার। কি আশ্চর্য্য
সহোদরা সহোদর করে পরিত্রাণ
লভিল অজ্ঞাতে। পতিও পাইল প্রাণ
সতী রমণীর তরে। আছে কি জানিতে
আর কিছু ? অথবা আমরা হইয়াছি
উপনীত—বিস্ময়-সীমান্তে। বিচিত্র এ
গভীর নিশায় চল—ভিতরে এখন
আমাদের জীবনের অদ্ভুত কাহিনী
মহাসুখে পরস্পরে করিগে শ্রবণ।

যবনিকা পতন।

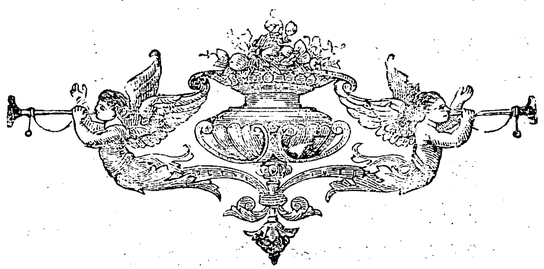

সুখ দুঃখ।

হেতুবাদ।

"গহনাঃ কর্ম্মণোগতিঃ"

"A just interpretation of nature is sound and orthodox philosophy, whatever we add of our own is apocryphal and of no authority."

জীব মাত্রেই সুখী হইবার জন্য নিয়ত লালায়িত। অথচ স্বল্পাধিক পরিমাণে দুঃখ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। আবার কেহ বা স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে বিস্তর সুখ লাভের অধিকারী, কেহ বা বিস্তর আয়াসেও সামান্য সুখ লাভে অসমর্থ, কিন্তু কেহই নিত্যদুঃখী বা নিত্যসুখী নহে। এই সুখ দুঃখের তারতম্য কেন হয় ? ইহার কারণ নির্ণয় ব্যতীত প্রতীকার অসম্ভব। এই কারণ এতই জটিল ও দুর্জ্ঞেয় যে, তাহার নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন।

এক শ্রেণীর লোক বলেন, নিজ কর্ম্মফলই সুখ-দুঃখের হেতু। এই কর্ম্মফল ভোগ যেমন ব্যক্তিগত হয়, তদ্রূপ দেশগত বা জাতিগতও হয়। অর্থাৎ একদেশ বা একজাতি কর্ম্মবশে অল্পাধিক সুখ-দুঃখের অধিকারী। তৎপ্রতিবাদে কেহ কেহ বলেন যে, যদি কর্ম্মবশেই সুখ-দুঃখ-ভোগ হয়, তবে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয় কেন ? কেহ বা জন্মান্ধ, কেহ বা আজন্ম দুঃখী, কেহ বা চিরসুখী হয় কেন ? তদুত্তরে কর্ম্মফলবাদীরা পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতি-ফল বলেন। জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, কর্ম্মফলবাদীর গতি নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যাঁহারা ভগবান্ মানেন, যাঁহারা তাঁহাকে দয়াময় অপক্ষপাতী জ্ঞানময় বলেন, তাঁহাদিগের জন্মান্তর স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ একের দোষে অপরের কষ্ট, অজ্ঞানাবস্থায় কৃতাপরাধে কঠোর শাস্তিভোগ হওয়াকে দয়াময়ের বিধান বলিতে পারা যায় না। তবে যাঁহারা ভগবান্ মানেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার নাই। এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট যে, যাঁহার সৃষ্টির বিষয় সমগ্র অবগত হওয়া মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত, তিনি আমাদের গোচর নহেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব লোপ করিতে যাওয়া নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সৃষ্ট বস্তুর অতি সামান্য অংশমাত্রও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি, ইহাতে কত কোটী কোটী মনুষ্য কত প্রকারের কত জীব জন্তু বৃক্ষ লতা জড় পদার্থ আছে, তাহার কয়টি জানি বা কয় জনকে চিনি ? ইহার মধ্যে আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব কোথায় বালুকা-কণাবৎ পড়িয়া আছি, আর কত স্বল্প সময়ের জন্যই বা আছি ! কত কাল এই পৃথিবী রহিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর কতই বা ঘটিবে, কত জন্মিয়াছে, আর কতই বা জন্মিবে, তাহার মীমাংসা করাই এক প্রকার মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। তাহার পর সৌরজগতের তুলনায় এই পৃথিবীই কত ক্ষুদ্র। কোথায় কোন্ গ্রহে কি আছে বা কি হইতেছে, কে জানে ? আর এই সূর্য্য যাহা পৃথিবী অপেক্ষা কত কোটী গুণে বৃহৎ, তাহাই ত একটী চতুর্থ শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। আকাশে যে অপরিসীম নক্ষত্র-রাজি ঢালা রহিয়াছে দেখা যায়, আকৃতির তারতম্যানুসারে তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহারা এক একটি সম্ভবতঃ এক একটী সৌর জগৎ লইয়া আছে। সূর্য্য তাহাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে তুমি আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব ! তাহা যে কল্পনাতেও আসে না। আবার স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মের দিকে দেখ, কত কীটাণু আমাদের দেহেই আছে, তাহাদিগকে যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না, সুতরাং তাহারাই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাহাদেরও দেহে শিরা-ধমনী প্রভৃতি আছে, হয় ত তাহাদের দেহেও অনুরূপ সূক্ষ্মতম জীবপুঞ্জ বাস করে। সে সকলের নিকট আমাদের দেহই এক এক প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। তাহাদের জীবনের সীমার সহিত তুলনায় এক এক দিনই অনন্ত কাল স্বরূপ। এই চক্ষু-বিষয়াতীত স্থূল-সূক্ষ্মের কর্ত্তাকে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি না বলিয়া তিনি নাই বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

পক্ষান্তরে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কাছে তিনি প্রত্যক্ষস্বরূপ। কেবল স্রষ্টা বলিয়া

তাঁহারা তাঁহাকে জানেন না। পরন্তু, দয়াময়, বিপদভঞ্জন, শান্তিদাতা, রক্ষক বলিয়াই জানেন। কেবল দেখিতে জানিলেই দেখা যায়, জানিবার চেষ্টা করিলেই জানা যায়। ভক্ত পদে পদেই তাঁহার দয়া দেখিতে পান। যাহা আমার নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অনেক সময় তাহা দুর্ল্লভ হইলেও অযাচিত অতর্কিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখনই ভক্ত দেখেন যে, তাহা দয়াময়ের দয়া মাত্র। কত বার কত বিপদে পড়িয়া কাতর স্বরে দয়াময় বলিয়া ডাকিয়া সহজে সে বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া গিয়াছে। হয় ত বিস্তর চেষ্টাতেও তাহা হইত না। তখন তাহা দয়াময়ের কার্য্য বলিয়াই জানা যায়। যদি বল, সকল সময়ে ত তাহা হয় না! আমি বলি, সেখানে গুরুতর কর্ম্মদোষ আছে, তাহা আমরা পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তীব্রতর আবেগের সহিত নিতান্ত কাতর ভাবে ডাকিলে যে বিপদের লাঘব হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন চিত্ত কিছুতেই শান্ত হয় না, নিতান্ত বিমর্ষ ও অবসন্ন হয়, তখন একমাত্র তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শান্তিদাতা ভিন্ন কেহই সে শান্তি দিতে পারে না। যদি বল যে, উহা সংস্কার-বশে হয়, সকলের হয় না; তাহা হইলে আমি বলি যে,যাহার সে সংস্কার নাই, সে নিতান্ত হতভাগা। আমি সকল সংস্কার ছাড়িতে পারি, কিন্তু এমন সংস্কার ছাড়িতে চাহি না। অনেক সময়ে অনেকে ভক্ত সাধুর অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারে না, তাহার উদাহরণ বিস্তর আছে। কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করে? অনেক সময় নিজে কত অন্যায় কার্য্য করিবার জন্য ইচ্ছা এবং বিশেষ চেষ্টাও করিয়া তাহা করিতে পারি নাই, কোথা হইতে অভাবনীয় প্রতিবন্ধক আসিয়া বাধা দিয়াছে। তখন তাহা কাহার কার্য্য বলিব? আমি বলি, সেই হরি আমায় রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপ পদে পদে যখন তাঁহার কার্য্য ও দয়া দেখিতে পাই, তখন সহস্র পণ্ডিত আসিয়া অন্যরূপ বলিলেও আমি তাঁহাদের কথায় অণুমাত্র আস্থা করি না।

এ বিষয়ে এ স্থানে অধিক বলিবার স্থান নয়। যাহা বলিতেছিলাম, তাহা এই যে, কোনও ভাগবত ব্যক্তি তাঁহাকে দয়াময় জনিয়া আজন্ম দুঃখের হেতু কি নির্ণয় করেন? এক জনের দোষে অপরকে কষ্টভোগ করিতে হয় বলা সঙ্গত মনে করেন কি? তাহা মনে করাও যত দূর সঙ্গত, আর অজ্ঞান মানব কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্যক্ না জানিয়া একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলার জন্য অনন্ত নরকভোগ করিবে বলাও ততদূর সঙ্গত। ভগবান্ এমনই অবিচারক যে একজন সাধুপুরুষ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা না মানিয়া অপর সহস্র মহাপুরুষের আদেশ বহন করিয়া সৎপথে থাকিলেও অনন্ত নরক! কি ভয়ঙ্কর কথা! মানবের মুখে এ কথা শোভা পায় না।

আর এক কথা। যে শিশু হাসিতে শিখে নাই, জাগ্রদবস্থায় হাসে না, সে স্বপ্নে হাসে, কাঁদে, জ্ঞানী লোকের মত দেখে কোথা হইতে? শিশুর দেয়লা দেখিলে তাহা অকারণ মুখভঙ্গি বিশেষ বলিয়া অনুভব করা যায় কি? তাহা অপেক্ষা ইহাকে জন্মান্তরীণ সংস্কার বলিলে পরিষ্কার কথা হয় না কি? যে শিশু পড়িয়া গেলে কি হয় তাহার কিছুই জানে না, তাহাকে হঠাৎ উচ্চস্থান হইতে ফেলিয়া দিবার মত করিলে সে চমকিয়া নিকটস্থ বস্তু ধরিতে চাহে। দুই সহোদরের বুদ্ধির এবং শিক্ষা-গ্রহণ-শক্তির বিস্তর তারতম্যও সময়ে সময়ে দেখা যায়। তাহারা এক পিতামাতার একই অবস্থার সন্তান হইলেও, একই প্রণালীতে একত্র শিক্ষিত হইলে, এরূপ প্রকৃতি-ভেদ কেন হয়? এক জন্মান্তরীণ সংস্কার বলিলে এ সকল কথায় যত সহজ মীমাংসা হয়, অন্য কোনও কষ্টকল্পিত কারণ প্রদর্শনে কখনই তত সহজ মীমাংসা হয় না। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করিতে না চাহেন, তাঁহারা স্বাধীন চিন্তাশীল বলিয়া বোধ হয় না, বরং কুসংস্কারাবদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ সুখদুঃখের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে জন্মান্তর ও জন্মান্তর-কৃত সুকৃতি দুষ্কৃতিকে ইহজন্মেও ফলপ্রসবিনী স্বীকার করাই সহজ উপায়। জন্মান্তর স্বীকার করিলে ডারুইন প্রভৃতি আধুনিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের জ্ঞানগর্ভ মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচারের পক্ষেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

এক্ষণে আমরা সদসৎ কর্ম্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। অপরের প্রতি কোনরূপ ব্যবহার করিবার সময় আপনাকে ঠিক তদবস্থ মনে করিয়া লইলে যদি সেই ব্যবহার কষ্টকর বোধ হয়, তবে তাহা কায়মনোবাক্যে করাই পাপ, দুষ্কৃতি বা অন্যায় কার্য্য। এবং তাহা সুখকর বোধ হইলে তাহা

পুণ্য, সুকৃতি বা ন্যায্য। নিজের সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। স্থূল কথা, নিজের বা অপরের প্রতি কোনও অন্যায় কার্য্য করাই দুষ্কৃতি, ও সুকৃতি তদ্বিপরীত। এই কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝান আবশ্যক।

ভগবান্ বিশ্বময়। বিশ্বপ্রেমই ভগবানে প্রেম। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ তাঁহাতেই বিদ্বেষ করা মাত্র। কাহারও ইষ্টসাধনে তাহার প্রীতি ভগবৎ প্রীতিস্বরূপ, এবং সেই প্রীতির প্রতিঘাত ইষ্টকর্ত্তাতে আসিয়া তাহারও যেমন আনন্দ জন্মায়, কাহারও অনিষ্ট-সাধনে তাহার ক্লেশেও তদ্রূপ প্রতিঘাত আসিয়া অনিষ্টকারীর ক্লেশের কারণ হয়। এই ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়ম (action and its reaction) নিত্য, এবং উক্ত সুখ-দুঃখ-তত্ত্বও অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রত্যক্ষ পরিদর্শন দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

ইহার মধ্যে আর এক তত্ত্ব আছে; কায়মনোবাক্য দ্বারা যে কোনও শুভাশুভ কার্য্য আচরিত হয়, তাহার ফল কায়মনোবাক্য দ্বারাই ভোগ হয়। অর্থাৎ আমি কাহারও দেহে ক্লেশ দিলে আমাকে দেহেই ক্লেশ পাইতে হইবে, মনে মনে কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা করিলে মনেই ক্লেশ পাইব, এবং কাহাকেও বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া ক্লেশ দিলে তৎপরিবর্ত্তে বাক্যযন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য মন যে সমস্ত দুঃখেরই ভোক্তা তাহার কোনও সন্দেহ নাই বটে, তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, কাহারও দেহ পীড়িত করিয়া মনঃকষ্ট এবং দেহকষ্ট প্রদান করিলে সেই পথেই তাহার প্রতিশোধ হইবে; কিন্তু কেবল মনে মনে মন্দ চিন্তা করিলে মনে মনে কষ্ট পাইব মাত্র, দেহে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি কথা বলি, যদি কাহারও মৃত্যুকামনা করি, কিন্তু মারি না, তাহা হইলে আমার প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত ক্লেশ মনে মনে পাইতে পারি, কিন্তু নিজ দেহে ক্লেশ পাইব না, বা দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে না। যদি বলেন যে, আমার দুশ্চিন্তার জন্য প্রিয়জনের মৃত্যু হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, সে তাহার কর্ম্মফলে জন্ম জরা মৃত্যু ভোগ করিবে, তাহার সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব না থাকিলেও উহাতে আমার যে কষ্ট হইবে, তাহাই আমার কর্ম্মফল ভোগ। ইহাই সংসারের নিগূঢ় তত্ত্ব। ইহা না জানাতেই লোকে ভ্রান্ত হয়, এবং ক্লেশাদি ভোগ করে। আমি ট্রেণে যাইতে যাইতে পার্শ্ববর্ত্তী অপর ট্রেণ হইতে কোনও দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে আহত হইলাম। লোকে দেখিল, আমি অকারণ কষ্ট পাইলাম, হয় ত আমিও মনে মনে তাহাই ভাবিলাম; কিন্তু প্রায়ই অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে,আমিও একদিন ঐরূপ অতর্কিত ভাবে কাহাকেও কষ্ট দিয়াছি। হইতে পারে বালস্বভাব-সুলভ চপলতাবশতঃ আমি ঐ কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু করিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। কেহ বলিবেন যে, রাজা কত লোকের প্রাণদণ্ড করিতেছেন, কত ধনী লোক কত লোককে দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন, কৈ তাহার প্রতিশোধ কোথায়? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন সকল সুখদুঃখের ভোক্তা। রাজা স্বহস্তে কাহারও দেহপীড়া দেন না, কিন্তু তাঁহার কার্য্য দ্বারা অন্যের যে কষ্ট হইল তাহার ফলে তাঁহার মনঃকষ্ট হইবেই হইবে। তবে রাজ্যরক্ষার জন্য অর্থাৎ অপর বিস্তর লোকের রক্ষার্থ সদভিপ্রায়ে যে দণ্ড প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য মানসিক কষ্ট কখনই অন্যায়কৃত প্রাণদণ্ডের সমান হইতে পারে না। কর্ত্তব্যানুরোধে নির্লিপ্তভাবে কৃতকার্য্য ভগবানের কার্য্য করা মাত্র। আর ধনী লোকে কাহাকেও অযথা বাক্যযন্ত্রণা দিলে যে, শ্রুতিকটু কথার দ্বারা তাহার মনঃকষ্ট হইতে পারে না, তাহা কখনই নহে। মনঃকষ্টের পরিমাণ অবশ্যই সমান হইবে। তবে কাহার কোন্ কথায় কত দূর মনঃকষ্ট হয়, তাহাই বিবেচ্য। আমি এক জনকে দারুণ দুর্ব্বাক্য বলিলে তাহার যে পরিমাণে মনঃকষ্ট না হয়,হয় ত আমাকে একটি সামান্য কথা বলিলে তাহার সহস্র গুণ যন্ত্রণা হয়। কথার পরিমাণে মনঃকষ্টের পরিমাণ স্থির করা যায় না। মনে প্রাপ্ত আঘাতের পরিমাণ সমান হইলেই হইল। এই সামঞ্জস্য এইভাবে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

তবে এইখানে পূর্ব্বজন্মের কথা পাড়িতে হইল। অধিকাংশ স্থলে ইহজন্মকৃত দুষ্কৃতির ভোগ হইলেও কোনও স্থলে ইহজন্মপ্রাপ্ত সুখদুঃখের কারণ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। যথা, জন্মায়ু প্রভৃতি আজন্ম ক্লেশাদি। পাতঞ্জল বলেন—"ক্লেশঃ কর্ম্মবিপাকঃ দৃষ্টাদৃষ্ট জন্মবেদনীয়ঃ।" অর্থাৎ ইহজন্ম অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলে ক্লেশাদি

হয়। যাঁহারা বলেন যে, যখন ইহজন্মে কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না, তখনই পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়া জন্মান্তর স্বীকার করি কেন? তাঁহাদের কথার উত্তর এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা অপেক্ষা সঙ্গত কারণান্তর নির্দ্দেশ করিলে ভাল হয়। আমরা বলি, আমাদের শাস্ত্রও বলে, অদৃষ্ট জন্মে যাহারা ঘোরতর দুষ্কৃতি করেন, তাঁহাদের অশুভ ফল তজ্জন্মে ভোগ হওয়া অসম্ভব হইলে কোথায় ভোগ হইবে! প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, একজন ভয়ানক অত্যাচারী উৎপীড়ক অনেককে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া হয়ত নিষ্ঠুররূপে বিস্তর লোকের প্রাণ, ধন, ধর্ম্মাদি হরণ করিয়া অন্যহত্যা দ্বারা অথবা অন্য কর্ত্তৃক হত হইয়া হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করিল; হয় ত কোন দুর্ব্বৃত্ত, আজন্ম লোক-পীড়া দিয়া অর্থাদি বলে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, এবং তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ বলিল যে "লোকটা যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ভোগ হইল কৈ?" তাহার উত্তরে 'জন্মান্তরে দারুণ কষ্টভোগ করিবে বলা ভিন্ন সদুত্তর কই? যেমন কতকগুলি দুষ্কৃতির ফল দেখান যায় না, তেমনই কতকগুলি ভোগেরও কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহাই জন্মান্তর স্বীকারের পক্ষে একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। নচেৎ দয়াময়ের রাজ্যে অবিচারের সংশয় হয়। তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদি কায়মনোবাক্যের কৃত শুভাশুভ কার্য্য সুখদুঃখ রূপ ফল প্রসব করে, তবে দুঃখ পরিহারের উপায় সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টাচরণ না করিলে কখনই দুঃখ পাইতে হইবে না, পরন্তু শুভক্রিয়া-চিন্তাদি সুখময় ফলপ্রসবিনীই হইবে। অবশ্য জন্মান্তর কৃত কার্য্যের ফল-ভোগ পরিহার করা যাইবে না। তবে অধিকাংশ স্থলেই সে ফল অল্পই ভোগ করিতে বাকী থাকে। ইহা সকলেই, অন্ততঃ যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

এক্ষণে গুরুতর কথা এই যে, এই কায়মনোবাক্য সংযম শুনিতে যত সহজ, কার্য্যকালে তত সহজ হওয়া দূরে থাকুক বিষম কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কারাদি বশে মানব-স্বভাব এতই বিকৃত হইয়াছে যে, আপনাকে পবিত্র করা বড়ই কষ্টকর হইল বোধ হয়, বিশেষতঃ মনকে ভাল করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। এইজন্যই অর্জ্জুনের মন শাসন দুরূহ সম্বন্ধে যে উক্তি আছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া বোধ হয়।

অতঃপর আমরা চিত্তশুদ্ধির উপায়াদি সম্বন্ধে সময়ান্তরে বলেব। এই বিজ্ঞানই আমাদের দেশের গৌরব। ইহা অন্য অপর সকল দেশেই অবিদিত। পাশ্চাত্য বিদ্যার পক্ষপাতিগণ তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক না বুঝিতে পারায় অথবা অজ্ঞতাবশতঃ এই বিজ্ঞান উপেক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই এমত শ্রেষ্ঠতম দেশীয় বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই বিলুপ্তপ্রায় পরম তত্ত্বের পুনরুদ্ধার বা সংস্কার-কল্পের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষা এবং ঘৃণা করিয়াই আসিয়াছেন। অবশিষ্ট লোকের অধিকাংশই অপণ্ডিত, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারাও কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিক্ষিত লোকেরও একটু একটু চট্‌কা ভাঙ্গিতেছে। আশা করি, কালে এদেশের কুসংস্কার অপধর্ম্মাদি দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোকে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ।

নিতান্ত বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে যে সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার পথ অপ্রশস্ত ছিল—যখন দিগ্বিজয়ী বৃটিশ বীরকেশরীর বিশিষ্ট বিক্রম পরিদর্শন করিয়াও এদেশে প্রজা-সাধারণের চিত্ত ইংরাজি ভাষার দিকে সম্যকরূপে আকৃষ্ট হয় নাই—বঙ্গভূমির সেই দূরবর্ত্তী অন্ধকার সময়ে এমন এক একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, এমন এক একজন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী পুরুষ-

ধুরন্ধর জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যে, অধুনাতন কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সত্যের সুস্পষ্ট আলোকে তেমন একজন লোককেও আর জন্মগ্রহণ করিতে দেখি না। যখন রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস, ইলেক্‌ট্রিক কারখানা প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল না; যখন সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, বক্তৃতা, কংগ্রেস, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির সহিত বঙ্গদেশবাসী অত্যুচ্চ শ্রেণীর ভাগ্যবান্ পুরুষদিগেরও ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল না; তখন যে সকল অসামান্য ব্যক্তির অমিত অধ্যাবসায়, অপ্রতিহত যত্ন, দেবোপম সাধুতা, পরমহংসোচিত সরলতা, জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ, অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষিতা-গুণে হতভাগ্য বঙ্গের কালোমুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল—যাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালীজাতি সমগ্র ভারতে এবং সুদূর ইউরোপে প্রখ্যাতি-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—প্রস্তাবশীর্ষোক্ত জাঁজ্‌রেল কাশীপ্রসাদ তাঁহাদের অন্যতম। এই মহাপুরুষের অন্তর্দ্ধানের পরে আমরা ইঁহার সমতুল্য আর দ্বিতীয় মহাপুরুষ দেখি নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজশ্রী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অনরেবল বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বদেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র, অনরেবল প্যারীচাঁদ, রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন, বিচারপতি দ্বারকানাথ, অথবা জাঁজ্‌রেল কাশীপ্রসাদ প্রভৃতি বঙ্গের পুণ্যচেতা পুরুষপুঙ্গবগণ আর নাই; তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সমাধা করিয়া স্বর্গের অক্ষয়ানন্দ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের শূন্যস্থান পরিপূরণ করিতে আর কাহাকেও দেখিলাম না। যেমনটি যায় তেমনটি আর আসে না; আসে না বলিয়াই এত কাতরতা; সেই জন্যই গতাসুবর্গের জীবনচরিত্রের আদর ও মূল্য অত্যন্ত অধিক, সেই জন্যই মহাপুরুষদিগের পবিত্র জীবনচরিত লিখিয়া লেখনীকে সার্থক করিতে ইচ্ছা হয়। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ গৃহযোগী বলেন,—"A great man is the product of a great age," অর্থাৎ মহাসময়েই মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালায় যে সময়ে কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে কাশীপ্রসাদের মত লোকের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ—"A great man is not born without a great mission," অর্থাৎ মহৎ লোকেরা মহৎ উদ্দেশ্য ভিন্ন—মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ভিন্ন—ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন না। জাঁজ্‌রেল কাশীপ্রসাদ যেমন আদর্শ সংসারী পুরুষ ছিলেন, তেমনি আদর্শ সাধিক ও আধ্যাত্মিক বাঙ্গালী ছিলেন—মনুষ্যত্ব (Humanity) এবং দেবত্ব (Divinity) তাঁহাতে একাধারে সম্মিলিত হইয়াছিল। আমরা এই পবিত্র জীবনচরিতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

আনুমানিক সার্দ্ধৈক শত বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ১১৬০ সালে, পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মানদী তটে, ঢাকা নগরীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের একটি প্রশস্ত লবণ-কারখানা (Salt factory) ছিল। প্রজাসাধারণ ইহাকে "নীমকের কুঠি" বলিয়া সম্বোধন করিত। মুন্সী তুলসীরাম ঘোষ নামে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কুলীন কায়স্থ এই কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। ১২০৫ সালে কোম্পানী কর্ত্তৃক ঢাকার কুঠির কার্য্য বন্ধ হইবার আদেশ প্রচারিত হওয়ায়, তুলসীরাম কলিকাতায় আগমন করিয়া খিদিরপুর গ্রামে তাঁহার শ্বশুর রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী (বসু) মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হয়েন এবং সেই বৎসর হইতেই ঢাকানগরীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়। তুলসীরামের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শিবপ্রসাদ, ইঁহারই কুলপাবন পুত্রের নাম বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার দিবসে, জাঁজ্‌রেল কাশীপ্রসাদ খিদিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ঐ দিবসে কলিকাতায় ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটিয়াছিল।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বঙ্গদেশে বি-এ, এম-এ পরীক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না। সে সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষ মধ্যে একটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একমাত্র সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেমন নিশির শোভা শশী এবং শশীর শোভা তারা, সেই প্রাচীন সময়ে তেমনি গৌড়ের শোভা কলিকাতা এবং কলিকাতার শোভা হিন্দুকলেজ ছিল। মাতামহ রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী, প্রিয়তম দৌহিত্র কাশীপ্রসাদকে গৃহমধ্যে কিঞ্চিৎ বাঙ্গালা, পারস্য ও ইংরাজি শিক্ষা দিয়া, হিন্দুকলেজে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। অসাধারণ মেধাবী কাশী-প্রসাদ অষ্ট বর্ষ কাল ব্যাপিয়া হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষা

করতঃ একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কলেজ-জীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন; অষ্ট বর্ষ কাল মধ্যে ৫টী রৌপ্যপদক, তিনটি সুবর্ণপদক, তিন শত পঞ্চাশ খানি পুস্তক এবং নগদ ছয় শত টাকা পুরস্কার হস্তগত করিয়াছিলেন। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য এচ্ এচ্ উইলসন, অধ্যাপক হেনীংটন, চিফজষ্টিশ ফেবার, লর্ড বিশপ আর্কডে, মিষ্টর ডেবিড্ হেয়ার প্রভৃতি, তরুণবয়স্ক কাশীপ্রসাদের আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, স্মরণশক্তি, ইংরাজি ভাষায় অধিকার, চরিত্র এবং পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি "The Young Poet's First Attempt" এবং "A short Review of games Mill's History of British India" নামক দুইটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। জেম্স্ মিল, ভুবনবিখ্যাত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা ছিলেন; ইনি তাঁহার ইংরাজি ভারতেতিহাসে অকারণে ভারতবাসীদিগকে অতীব অন্যায়রূপে গালি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অজাতশ্মশ্রু কাশীপ্রসাদ, এই সুবিখ্যাত ইউরোপীয় লেখক-ধুরন্ধরের যুক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিয়া, লেখককে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন। কাশীপ্রসাদের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা Asiatic Journalএ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে খৃষ্টীয় ১৮২৮ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইহা আদ্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বালক কাশীপ্রসাদের পক্ষে ইহা কম সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় নহে!

কাশীপ্রসাদ এক দিন কলেজ হইতে মাতামহের বাটীতে আসিয়া নির্জ্জনে কি চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার মাতামহী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাশী, তুমি কলেজে যাইতেছ, সাহেব মাষ্টারেরা তোমাকে ভালবাসিতেছে ত?" বালক কাশীপ্রসাদ মৃদুমধুর হাস্য করিয়া উত্তর দিল,—"মাষ্টারেরা এখনও আমাকে ভালবাসিতে শিখে নাই। কিন্তু কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা আমি সত্বরে তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।" প্রবৃদ্ধা মাতামহী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি বালক, তুমি কেমন করিয়া সেই প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ বৃদ্ধদিগকে শিক্ষা দিবে?" বালক কিছুই উত্তর দিল না। কিছুকাল পরে মেধাবী কাশীপ্রসাদ যখন কলেজের সমুদয় বালককে পরাস্ত করিয়া উঠিল, যখন সাহেব মাষ্টারেরা বুঝিতে পারিলেন কাশীপ্রসাদ একজন সামান্য বালক নহে, তখন একদিন কাশীপ্রসাদের সুকোমল শরীর স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"কাশী! আমরা তোমার শিক্ষক (গুরু), তুমি আমাদের ছাত্র (শিষ্য), অদ্য হইতে তোমার সহিত আমাদের গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ঘনীভূত হইল। আমরা ভালবাসি না বলিয়া তুমি আক্ষেপ করিয়াছ শুনিয়াছি, কিন্তু আজিকার দিবস হইতে তদ্রূপ আক্ষেপের আর কোনও কারণ রহিল না।" কাশী কহিলেন,—"গুরু শিষ্যের সম্পর্ক খুব গুরুতর হইলেও তাহা উচ্চ অঙ্গের স্নেহের পরিচায়ক নহে; উচ্চ অঙ্গের স্নেহের পরিচায়ক হইলেও তাহা প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক নহে। স্নেহ হইতে প্রেম অনেক প্রভেদ।" সাহেব মাষ্টারেরা এই গুরুতর দার্শনিক (Philosophical) কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নীরবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে, এক দিবস মধ্যাহ্নে কাশীপ্রসাদ কলেজে যাইতেছেন। পথিমধ্যে শুনিলেন,—"অদ্য কলেজ বন্ধ! প্রিন্সিপাল সাহেব ভয়ানক বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায়বৎ শয্যাশায়ী হইয়া আছেন, দুই চারি জন ইউরোপীয় অধ্যাপক তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে গিয়া কলেরা রোগে ধরাশায়ী হইয়াছেন।" অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রিন্সিপালের বাসা বাটীতে কাশীপ্রসাদ গমন করিলেন। তথায় সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের নিষ্ঠীবন, পুরীষ, নক্কার, মূত্রাদি প্রভৃতি স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপকেরা রোগমুক্ত হইয়া যখন জানিতে পারিলেন, ছাত্র কাশীপ্রসাদের অনবরত চেষ্টায় এবং সেবা ও সুশ্রূষায় তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে, তাঁহারা কাশীর মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত কহিলেন,—"কাশী! অদ্য হইতে আমাদের সহিত তোমার পিতাপুত্রের সম্পর্ক আরম্ভ হইল। ধরাধামে আমরা যত দিবস জীবিত থাকিব, তত দিবস পর্য্যন্ত তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতে থাকিব এবং তোমার কল্যাণার্থ সমস্ত প্রাণের সহিত যত্ন করিব।" কাশীপ্রসাদ এই বলিয়া

উত্তর দিলেন,—"মহাশয়গণ! পিতা-পুত্রের সম্পর্ক খুব পবিত্র, কিন্তু এরূপ পবিত্র সম্পর্কেও যথার্থ প্রেম ঘনীভূত হয় না।" কাশীর কথায় তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; কিন্তু সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কলেজ পরিত্যাগের সময়, কাশীপ্রসাদ যখন তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সাহেবেরা বলিয়াছিলেন,—"কাশী বাবু! এখন তুমি আমাদের আর ছাত্র নহ, এখন তুমি আমাদের সখা, আমাদের পারস্পরিক বন্ধুতা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে।" মৃদু-মধুর হাসিয়া কাশীপ্রসাদ কহিলেন,—"প্রভো! বুঝিলাম, এতদিনে আমাদের প্রেম প্রকৃতরূপে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সখ্যভাবই প্রকৃত প্রেমের ভাব; মনুষ্যের পারস্পরিক সখ্যতা পরিণামে ঐশ্বরিক সখ্যতার কারণ হইয়া উঠে।" কথা শুনিয়া অধ্যাপকদিগকে প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন,—"কাশীপ্রসাদের এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।" সুপ্রসিদ্ধ ডেবিড হেয়ার বলিয়াছিলেন,—

"The spiritual sermon which Babu Kashi Pershad preached on that day appealed to my heart. I do not remember to have heard any such thrillingly eloquent and soul-stirring sermon from any Hindoo, not even from any Christian preacher of Calcutta." পাঠক মহাশয়! কাশীপ্রসাদ ঘোষ পরম পবিত্র বৈষ্ণব বংশে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, বাল্যকাল হইতেই সখ্যভাব তাঁহার মেদ ও মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছিল। জগতে সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিল।

বৈষ্ণবের দয়াভাব কাশীপ্রসাদের বাল্য জীবনেই প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। সমপাঠীদিগের অভাবমোচনে, দুঃখীর দুঃখমোচনে, পথের বিবস্ত্র কাঙ্গলীদিগকে বস্ত্রদানে, পীড়িত প্রতিবাসীদিগের সেবায় এবং ভগবানের অর্চ্চনায় তাঁহার বাল্যজীবন অতি পবিত্র ও মধুরভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি মিথ্যার কখনও প্রশ্রয় দেন নাই এবং অকারণে কাহারও শরীরে বা মনে কষ্ট দিয়া ভগবানের নিকটে অপরাধী হয়েন নাই। এরূপ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বালক সচরাচর দেখিতেই পাওয়া যায় না, এরূপ নিরপরাধ কলেজ-ছাত্র আজিকালিকার দিনে প্রায়ই মিলে না।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কাশীপ্রসাদ বহুসংখ্যক ইংরাজি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "The Minstrel"; "The Shair," "The Hindu Festivals," "The Poems," "The Motherland," "India, the Ancient land of glory" প্রভৃতি কাব্য শিক্ষিত সমাজে খুব প্রসিদ্ধ। সে সময়কার Calcutta Literary Gazette, Mookherjee's Magazine প্রভৃতি ইংরাজি পত্রের ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। "Memoirs of Indian Dynasties" নামক তাঁহার ইংরাজি গদ্য-পুস্তক এখনও ইংরাজি সাহিত্যের অন্যতম অলঙ্কার বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইয়াছে। "The Hindu Intelligencer" নাম দিয়া তিনি একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। বিলাত, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বড় বড় লেখকেরা এই ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে শত শত প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসারথী কাপ্তেন ডি, এস, রিচার্ডশন সাহেব কাশীপ্রসাদের কবিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Let some of those narrow-minded persons, who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt, read Baboo Kashi Pershad's poems with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own."*

আচার্য্য অর্ম্ম ও ইলিয়ট সাহেব কাশীপ্রসাদের ইংরাজি ভাষায় অধিকার-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— †

"In English, in which Baboo Kashi Pershad expressd himself with so much strength grace and facility, as fastly to be encountered

* "Selections from the poets" Nov. I., 1834.

† "Views from India and China."

in composing poetry in a foreign language. His works established the reputation of his in India and fovourably noted in England."

কাশীপ্রসাদ কেবল ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজি সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বহুসংখ্যক বাঙ্গালা কবিতা ও বাঙ্গালা গীতের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ খানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই। তিনি ইংরাজি ভাষায় "Bengalee works and writers" নামক পুস্তক লিখিয়া, নিধিবাবু, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। কাশীপ্রসাদের স্বরচিত দুইটি বাঙ্গালা গীত এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

১। তুমি জান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে শাস্ত্র অদর্শন।
উৎপত্তি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়,
কভু খণ্ডিবার নয় যতেক করি যতন।

২। শ্বেত শতদলোপরে, শ্বেতাম্বর কলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেতবরণী।
বেদ বেদাঙ্গ তন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্যযন্ত্র,
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা, মধুলোভে মধুলোভা,
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভ বরদা, অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা,
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমাতা নারায়ণী।

কাশীপ্রসাদের মাতামহকুল পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পিতামহকুল পরম শাক্ত ছিলেন। তিনি উভয়কুল হইতেই বৈষ্ণব ও শাক্তের উপাসনা-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। কাশীবাবু অতি উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। আমি অনেকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে গান শুনাইয়া বিমুগ্ধ করিতেন।

কাশীপ্রসাদ অতীব দয়ার্দ্রচিত্ত এবং বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। অসত্য এবং অন্যায়কে তিনি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি যে বিষয়কে সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতেন না। Fiat Justitia ruet caelum অর্থাৎ Let Justice reign though Heaven should fall এই তাঁহার নীতি ছিল; স্বর্গের রাজ্য চূর্ণ হইয়া গেলেও তিনি ন্যায়ের রাজ্যকে উপেক্ষা করিতেন না। যাহাকে তিনি সত্য বলিয়া স্থির করিয়া লইতেন, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য তাঁহার প্রচুর জিদের উৎপত্তি হইত; যাহাতে হাত দিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই তাঁহার মন্ত্র ছিল। এই জন্য কলিকাতা অঞ্চলে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ "জাঁজরেল কাশীপ্রসাদ" নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন একটা নীচজাতীয় অথচ প্রভূত বলশালী পালোয়ানের মত বাঙ্গালী যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যোড়হাতে বলিয়াছিল,—"হুজুর! আমি অমুক সাহেবের কুঠিতে চাকুরী করিতাম, সাহের আমাকে তিন মাস বেতন দেয় নাই, বেতন চাহিলেই আমাকে মারিতে আইসে। একদিন আমার স্ত্রী বেতন চাহিতে গিয়াছিল, সাহেব আমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। সাহেবকে আমি, ভাল মানুষের মত ব্যবহার কর, একথা বলায় সাহেব অদ্য আমাকে বেত ও জুতা দ্বারা প্রহার করিয়াছে। হুজুর আমাকে রক্ষা করুন, হুজুর আমাকে অভয় দিউন।" কাশী বাবু তাহার কথা শুনিয়া এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে,—"ওরে মূর্খ! ওরে নির্ব্বোধ! তোকে দেখলে যেন ঠিক ভীমাবতার বোলে বোধ হয়, এই যৌবন বয়সে—এই বিপুল বপু বহন করিতে করিতে তুই অকারণে একটা ফিরিঙ্গির হাতে বেত ও জুতার দ্বারা প্রহারিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন প্ররিতে লজ্জা বোধ করিতেছিস্ না? যদি তুই সেই দুষ্ট ফিরিঙ্গিটাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া বীরের ন্যায় বুক ফুলাইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিতিস্ 'হুজুর! আমি ফিরিঙ্গিটাকে মারিয়া আসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন' তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোর সহায়তা কর্‌তাম, কিন্তু তোর মত নির্লজ্জ ও কাপুরুষকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেওয়া আমার নীতি নহে।" কথা শুনিয়া লোকটা আশ্চর্য্য হইয়া চলিয়া গেল।

সাধারণ হিতকর কার্য্যে কাশীপ্রসাদেরসম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সে সময়ে এদেশে যতগুলি ভালকার্য্য হইয়াছে তাহার প্রায় সমুদয়ের সহিত কাশী বাবু সম্মিলিত ছিলেন। কলিকাতার শ্যামবাজারে কাশীপ্রসাদ আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশ কাশীপ্রসাদেরই বংশ। কাশীবাবু অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া, ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া গিয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপাল কমিশনর এবং জষ্টিশ অব্ দি পিশ্ ছিলেন। বহু শত ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ বিধবার দুঃখ মোচন করিয়া, সহস্র সহস্র কাঙ্গালীর অন্ন বস্ত্রের অভাব অপনোদন করিয়া, নানা বিদ্যা ও নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে, অতি পবিত্রভাবে মহাত্মা কাশীপ্রসাদ বাঙ্গালা ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতা নগরীতে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

হতভাগিনী।

(১)

রামহরি রায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যা সরলার যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সুভাসিনীর বয়স ৭ সাত বৎসর। সরলার স্বামী নিকুঞ্জবিহারী বিংশ বর্ষীয় যুবক। দেখিতে খুব সুন্দর না হইলেও কুশ্রী নহেন; তাহার উপর এদিকে য়ুনিভার্সিটীর প্রদত্ত বি, এ, পুষ্পে শোভিত হওয়ায় তাঁহার বর্ণগৌরব বৃদ্ধিই হইয়াছিল। ফুটফুটে গৌরবর্ণ না হইলেও তিনি পাথুরে কাল নহেন, আর মেয়ে মহলে তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি এবং ওষ্ঠ দ্বয়ের হাস্যভঙ্গীর একটু বিশেষ বিশেষত্ব থাকার কথা ভালরূপই রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তিনি নাকি কেমন এক মদালসভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চাহিতে পারিতেন, আর দন্তপংক্তিও আবৃত রাখিয়া কেমন করিয়া হাসিতে পারিতেন তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধেও কেহ কখন একটি কথা পর্য্যন্ত বলিতে সাহস করে নাই। চুরী করিয়াই চাহেন, আর মিষ্টি করিয়াই হাসুন তাহার মধ্যে কোন লালসা বিলাসের উত্তাপ গোপনে কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিত না; সদা প্রসন্ন হাস্যময় মুখমণ্ডল বাক্য বিতরণে কৃপণ ছিল না। রসনা হৃদয়যন্ত্র হইতে ভাবরাশি উত্তোলন পূর্ব্বক সর্ব্বদা ওষ্ঠপ্রদেশে রপ্তানি করিতেছে, ওষ্ঠদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাহা বুভুক্ষু বা শুশ্রূষুগণকে বিতরণ করিয়া স্বীয় দানশৌণ্ডতা প্রতিপাদন করিতেছে। এরূপ প্রায়ই দেখা যাইত কিন্তু সমাগতা রমণীবৃন্দের গণ্ডস্থলে লাজরক্তিমা উৎপাদনকারী কোন ভাবের আবেশ মাত্রও সে সব বাক্যে সে সব রসালাপে থাকিত না। এই সমস্ত কারণে গ্রামের সমস্ত জামাই অপেক্ষা নিকুঞ্জবিহারীর অধিক প্রশংসা ছিল এবং রমণীকুল অসঙ্কোচে তাঁহার নিকট আসিতেন, বসিতেন, কথাবার্ত্তা বলিতেন, রঙ্গরহস্যও করিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে রমণীজনোচিত শিক্ষার বিষয় উপদেশ পরামর্শও লাভ করিতেন। বালিকা সুভাসিনীও 'বসু মহাশয়' আসিলে প্রায় তাঁহার কাছেই থাকিত, আর তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দেওয়া, পান দেওয়া, মুখ হাত ধুইবার জল দেওয়া, পা টিপিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য তাহার একচেটিয়া ছিল, কারণ রামহরিবাবু গরীব ভদ্রলোক, বাটীতে একজন মাত্র চাকর সে গো-সেবায় ও সংসারের নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, জামাই বাবুর তত্ত্বাবধানের জন্য সর্ব্বদা সে থাকিতে পারিত না সুতরাং সুভাসিনীই একান্ত আনন্দের সহিত সে কার্য্যাবলী নির্ব্বাহ করিত—এ সব কাজে তাহার বিরক্তি মাত্রও ছিল না। বরং না করিতে পারিলেই সে দুঃখিত হইত।

দ্বাদশ বর্ষীয়া সরলাকে তাহার স্বামীর বিষয়ে যেন একটু গৌরবান্বিতা বলিয়াই বোধ হইত। কি জানি কেন এই বিবাহের প্রস্তাবের সময় হইতেই সে মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত যে যেন এই বিবাহই তার হয়—অথচ বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ে সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও ছিল না। তারপর বিবাহ হইল। স্বামীর নিকট সে প্রথম রাত্রি হইতেই এমন সস্নেহ সুমিষ্ট ব্যবহার পাইল, এমন ভালবাসা লাভ করিল যে দুই এক মাসের মধ্যেই সে স্বামীকে ভালবাসিয়া ফেলিল অর্থাৎ একান্তই তাঁহার অনুগত ও বাধ্য হইয়া পড়িল। তার উপর সকলের মুখেই

স্বামীর প্রশংসা, পিতা মাতা কথায় কথায় তাঁহার স্বভাবের, বুদ্ধির, বিবেচনার প্রশংসা করেন সুতরাং সরলা গর্ব্বিতা না হইবে কেন? সে সেই বয়সেই বলিত "পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকিলে এমন স্বামী মিলে না।" ছোট বোন সুভাসিনী সরলার বড়ই প্রিয়া ভগ্নী। দুই বোনে; কখন মারামারি কাটাকাটি করে না। যেন দুই দেহে একই প্রাণ বিভিন্নভাবে খেলা করিতেছে। দিদির স্বামী বোস্ মহাশয়কে সুভাসিনীও বড় ভালবাসিত। লোকে তাহা বুঝিতে পারিয়া বালিকাকে রাগাইবার জন্য তাহার সাক্ষাতে মিছা করিয়া নিকুঞ্জের নিন্দা করিত, আর সুভাসিনী রাগে জ্বলিয়া উঠিত। একদিন কোনও রমণী বলিলেন "আরে ছিঃ! ফুটফুটে সুন্দর রং যার নাই সে আবার কি সুন্দর? কালোর সবই কালো!" সুভাসিনী "ওয়াক্, ওয়াক্" করিয়া বমনের উদ্যোগ করিতে করিতে কহিল "ফুটফুটে রংটা আমার দু চোকের বিষ ফুটফুটে লোকের পাতে খেতে পর্য্যন্ত আমার ঘেন্না করে ঃ—ছিঃ! কালো জগতের আলো।" সকলে হাসিয়া খুন। কোনও রমণী সুভাসের মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "সুভার মা, একটা পাথুরে কাল বর তোমার সুভাকে দিও! কেমন লো সুভা! বোসের সঙ্গেই তোর বে দেওয়া যাবে!" "বেশত" বলিয়া সুভাসিনী হাসিয়া উঠিল।

এক যুবতী একদিন বলিলেন "গোঁপ না থাক্‌লেই পুরুষ লোককে ভাল দেখায়। গোঁপওয়ালা পুরুষগুলো কি বিশ্রী।"

সুভাসিনী অমনি কহিল "আহা! মাগীমুখো পুরুষেরই গোঁপ থাকে না। গোঁপে বেমন মানায়!" অন্যা হাসিয়া কহিলেন "তা বটে কিন্তু দাড়ীটা না থাক্‌লে মানায় না।"

সুভাসিনী জবাব দিয়া দিল "দাড়ী আমি দুচোকে দেখ্‌তে পারিনে, এক রাশ চুলে মুখটা একেবারে বিশ্রী করে দেয়।" নিকুঞ্জের দাড়ী ছিল না। এইরূপে সুভাসকে লইয়া রমণীগণ রহস্য করিতেন। নিকুঞ্জের প্রতি সুভাসের এই অহেতুকী প্রীতি দেখিয়া যাহারা সরলাকে ঠাট্টা করিতে পারে তাহারা তাহাকে বলিত "সরি! দেখিস্, সাবধান করে রাখিস্! তোর ঘরের ঢেঁকি শেষে কুমীর না হয়।" সুভাসিনী তাহাদিগকে তাড়া করিয়া যাইত।

অনেকদিন পর যখন নিকুঞ্জ প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিতেন তখন সুভাসিনীর সঙ্গে আলাপ করা প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হইত। কারণ নিকুঞ্জ আসিলেই সুভাসিনী ঘরের মধ্যে লুকাইত, যতই নিকুঞ্জ সাধাসাধি করিতেন সুভাশিনীর গৌরব ততই বাড়িত, কিছুতেই ধরা দিত না, কি কাছে আসিত না; নিকুঞ্জ তখন চুপ করিয়া সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকিতেন, অথবা নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। এক পায় দুই পায় সুভাসিনী শয্যার নিকটস্থ হইত, এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া শব্দ করিয়া, মল বাজাইয়া চুড়ী নাড়িয়া নিকুঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিত, নিকুঞ্জ তাকাইলেই আবার বিশ হাত দূরে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া হাসিত। এইরূপে দুচার বার ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া শেষে কোনক্রমে একবার গ্রেপ্‌তার করিতে পারিলে আর কিছু আবশ্যক হইত না। সুভাস তখন যে কয়দিন তাহার বোস মহাশয় থাকিতেন সে কয়দিনই অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার সেবা করিত আর দিদির কাছে গিয়া বোস মহাশয় কি বলিয়া তাহাকে হাসাইয়াছেন তাই সব গল্প করিত আর শতমুখে বোস মহাশয়ের প্রশংসা করিত। বোস মহাশয় বিদেশে থাকিলে দিদি যখন তাঁহাকে পত্র দিতেন, তার মধ্যে সুভাসিনীও নিজের বড় বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে "আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন" ইত্যাদিরূপে পত্র না দিয়া ছাড়িত না, তাহার উত্তর না পাইলে আবার বড়ই অভিমান করিত কিন্তু সেটা তাহাকে বড় একটা করিতে হইত না কারণ বোস মহাশয় পত্রদানে কৃপণ ছিলেন না। তিনিও স্নেহের সম্বন্ধিনীকে নানারূপ মিষ্ট রহস্যের সহিত অসংযুক্তাক্ষরে বড় বড় করিয়া পত্র দিতেন। সুভাস তাহা পড়িয়া হাসিয়া খুন হইত, এবং দিদি, মা, পিসিমা, খুড়ীমা প্রভৃতিকে বিশ বার তাহা পড়িয়া শুনাইত আর বলিত "বোস মহাশয় না হলে এত কথাইবা কে জানে, এমন লিখ্‌তেই বা কে পারে।"

বোস মহাশয়ের ছুটী কবে হইবে, ছুটী হইলে তাঁহাকে বেজগাঁয়ে কবে আনিতে হইবে, কতদিন রাখিতে হইবে, কি কি খাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে বাটীর সকলের চেয়ে সুভাসের ব্যস্ততা বেশী। সে সর্ব্বদা দিদির কাছে নিজের পরামর্শ আঁটিতেছে আর ভাঙ্গিতেছে। দিদির কাছে তার মনের কবাট খুলিয়া সরলা বালিকা

সব দেখাইতেছে। স্নেহময়ী সরলা দিদিও ভগিনীর ঈদৃশ আগ্রহ ও যতনে পরম প্রীতিলাভ করিতেছে, স্বামীর নিকটও জানাইতে ভুলিতেছে না। এইরূপ বেজগাঁয়ে দিন, মাস, বৎসর কাটিতে লাগিল।

(২)

সরলার বিবাহের পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরলা এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া নবযৌবনভারদর্পিতা যুবতী স্বামীপ্রেমে সদা প্রফুল্লাননা। সুভাসিনীরও বয়স এগারতে পড়িয়াছে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই; সব বিষয়েই সে সেই ৭ বৎসরের সুভাসিনীই আছে। বোস্ মহাশয়ের উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সুভাসিনী আর সকলের নিকট কিছু উদ্ধত-প্রকৃতি, 'খাতির নাদারৎ' রকমের কিন্তু সরলা দিদি আর বোস মহাশয়ের কাছে সে সর্ব্বদা নতশির, কেহ যে কাজ তাহার দ্বারা করাইয়া লইতে পরিতেছে না বোস মহাশয় দুই এক কথাতেই তাহা করাইতে পারেন; বোস মহাশয়ের মাথা ধরিলে সে আর পাঁচটি বালিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া বোস্ মশায়ের সুশ্রূষা করে, যতক্ষণ না তিনি সুস্থ হন ততক্ষণ এক পা নড়ে না আহার নিদ্রাতেও তার ইচ্ছা থাকে না। সকলে বলিত 'বোস মহাশয় তোকে যাদু করেছে।' সে অমনি দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করিত "যাদু কাকে বলে দিদি!"

নিকুঞ্জ সুভাসিনীর ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। এবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া দেখিলেন সুভাস তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতে জল, তামাক, পান, ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; বসিবামাত্র সুভাস পাখা হাতে করিয়া বোস মশায়কে বাতাস দিতে আরম্ভ করিল; নিকুঞ্জ ডাকিলেন "সুভা, ভাল আছিস্ তো?" নীরবপুত্তলিকার ন্যায় সুভাস বাতাস দিতে লাগিল। নিকুঞ্জ জানেন প্রথম প্রথম সুভাসের মুখ খোলা শক্ত, তিনিও কেমন করিয়া মুখ খোলাইতে হয় তাহা জানেন, বলিতে লাগিলেন "একেবারেই ভুলে গেছিস্, তাও যাক্, আবার মান্‌সের কাছে আমার নিন্দে করতে আরম্ভ কোরেছিস্? এ জানলে কখন আস্‌তাম না, আমরা না হয় খারাপই আছি তা মান্‌ষের কাছে অমন নিন্দে করে কাজ কি? একটা গুণবান্ দেখে বোনকে আবার বে দাও না কেন?" নিকুঞ্জ মুখখানি গভীর দুঃখাবনত করিয়া মাটীর দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন; চোক দুটি ছল ছল করিতে লাগিল, আর কি সুভাস থাকিতে পারে এত বড় একটা মিথ্যা কথার প্রতিবাদ না করিলে বোস মহাশয়তো সব বিশ্বাস করিবেন, সুতরাং কথা ফুটিল -একটু জোরেই ফুটিল—"কার কাছে আমি নিন্দে করেছি! আমি আপনার নিন্দে কর্‌বো! আপনার পায়ে পড়ি বলুন কে বলেছে এ কথা!"

নিকুঞ্জ পূর্ব্ববৎ ভারি গলায় বলিলেন "হ্যাঁ তাই বলি আর তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া কর আর কি।" "তা সে এমন মিছে কথা বলে কেন? বলুন আপনি কে বলেছে।" ঔৎসুক্যের সহিত সুভাসিনী বলিল। "তোমার দিদিই বলেছে" নিকুঞ্জ হাসিয়া বলিলেন। সুভাস তখন বুঝিতে পারিল নিকুঞ্জ রহস্য করিতেছেন, হাসিয়া বলিল "এত রঙ্গও জানেন আপনি।"

এইরূপ নানা কথাপ্রসঙ্গে নিকুঞ্জবিহারী বাবু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন সুভাসিনী অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ভালবাসে। যতক্ষণ তাঁহার কাছে সে থাকে ততক্ষণ তিনি অন্য দিকে তাকাইলেই এক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, সে সরল প্রশান্ত দৃষ্টি কেবল স্নেহমাখা কেবল প্রীতিপূর্ণ তাহাতে বিলাসের চিহ্ন নাই, বিভ্রমের উত্তাপ নাই চপলার চাঞ্চল্য নাই কেবল বালিকার তুষার ধবল সারল্য জ্যোৎস্নায় তাহা সদা উদ্ভাসিত। নিকুঞ্জ নিদ্রার ভাণ করিয়া দেখিয়াছেন সুভাস এক দৃষ্টিতে তাঁহার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া আছে, সময় সময় দেখিতে দেখিতে সে এত আত্মবিস্মৃত হয় যে কাহারও ডাক শুনিতে পায় না, কি জানি সে কি দেখে, কি ভাবে! তাহার কাছে থেকে সে ভাব উদ্ধার করা নিকুঞ্জের ক্ষমতার অতীত।

নিকুঞ্জ এইবার এই সব ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ যেন কি ভাবিলেন—ভাবিতে ভাবিতে কিছু গম্ভীর হইয়া গেলেন, সুভাসিনীর শত চেষ্টা পরাস্ত হইল, তিনি প্রফুল্ল হইলেন না। মুখখানি ভার করিয়া অগত্যা সুভাস দিদির কাছে গিয়া নালিশ করিল "বোস মহাশয় মিছামিছি আমার উপর রাগ কোরেছেন।" বালিকার স্বরে সরলা বুঝিল সে আন্তরিক আঘাত পাইয়াছে। "না, না, তোর ওপর কি তিনি রাগ কর্ত্তে পারেন, আর যেন কি মনে

হয়ে অমন ভাব্‌ছেন, তুই কিছু মনে করিস্ না" বলিয়া ভগিনীকে প্রবোধ দিল।

(৩)

"তুমি নাকি সুভাসের উপর রাগ কোরেছ" রজনীতে স্বামীগৃহে আগমন করিয়া প্রণাম পুরঃসর সরলা স্বামীর প্রতি প্রশ্ন করিল।

নিকুঞ্জ হাসিয়া উত্তর দিলেন "এরি মধ্যে নালিশ হয়েছে। তা আসামী হাজির যে শাস্তি হুজুরের খুসী হয়, বিধান কর্ত্তে আজ্ঞা হয়।"

সরলা উপবেশন করিয়া বলিল "কথার ছিরি দেখ। বলি সত্যি নাকি তাই বল! ছেলে মানুষ, সে তো কেঁদেই খুন।"

ঠাট্টার সুরে নিকুঞ্জ বলিলেন "বটে, এতদূর বল কি?"

সরলা হাসিয়া কহিল "ঠাট্টা নয়, সে তোমাকে যে ভালবাসে।"

"সেই জন্যেই ত আমি রাগ করেছি। সে আমাকে ভালবাসবে কেন? তা পারবে না। তার একটা ভাল বাসার লোক যোগাড় করে দাও না কেন? তোমার উপর ভাগ বসাতে দিচ্ছ কেন!"

সরলা। বাঃ! ভালবাসা বল্লেই বুঝি তাই বুঝ্‌তে হবে। অমনি অমনি বুঝি ভালবাসা যায় না। ভাই বোনে বুঝি ভালবাসা থাকে না, কেমন?

নিকুঞ্জ। থাকবে না কেন? তবে রকম ফেরও ত হতে পারে। যাক্ ঠাট্টায় কাজ নাই, বলি সুভার বিয়ের চেষ্টা কিছু হচ্ছে কি?

সরলা। হ্যাঁ, হচ্ছে একরকম ঠিকও হয়েছে, সে সব বাবা তোমাকে বলবেন।

নিকুঞ্জ ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন "বটে! বেশ, বেশ কোথায় হচ্ছে? ছেলেটি কি করে?"

সরলা। এই শোভারামপুরের মজুমদারদের ঘরে। বেশ জোতজমা আছে, বাড়ীতে চকমিলান দোতালা কোঠা, ছেলেটিও বি, এ,পড়ছে, দেখতেও বেশ! সে মেয়ে দেখে খুব পছন্দ কোরে গেছে, বাবা গরীব কিছু দিতে পারবেন না কিন্তু তারা খুব ভদ্রলোক, বাবাকে কিছুই চাপ দেয় নি! এখন ভগবানের ইচ্ছেয় হয়ে গেলেই হয়।

নিকুঞ্জ। বেশ হয় কিন্তু একটু খট্‌কা লাগ্‌ছে যে!

সরলা। কি?

নিকুঞ্জ। এমন অবস্থা, এমন ঘর, এমন ছেলে, আর এমন বাজার, এতে যে একেবারে খালি হাতে তারা রাজি হোল ছেলেটার স্বভাব টভাব ভাল তো?

সরলা। হ্যাঁ, সে সব বেশ ভাল! আমরা দেখেছি তাকে, বাবাও খোঁজ নিয়েছেন, কোন বদনাম কিছু শুন্‌তে পাননি। খালি হাতে তোমরা রাজি হয়েছিলে না?

নিকুঞ্জ। তা না হলেই ভাল! সুভার বে'টা শীগ্‌গীর দিয়ে ফেলাই ভাল।

সরলা। কেন? কেন বল দেখি!

নিকুঞ্জ বলিলেন বোকার ডিম, বুঝতে পারলে না? শেষে তোমার বাড়া ভাতে চাই পড়তে পারে।

সরলা। ওসব ঠাট্টা রাখ আমার ভাতের এমন তেজ যে ছাইএর বাবার সাধ্যিও নেই যে কাছে ঘেঁসে।

নিকুঞ্জ হাসিয়া কহিলেন "বেশ, বেশ, কিন্তু আমি ঠাট্টা কচ্ছি না আমি বেশ বুঝেছি সুভা আমাকে খুব ভালবাসে; কি জানি বেশীদিন এমন থাক্‌লে শেষে তার মনে কি দাঁড়ায়, কিছুই তো বলা যায় না এখন থেকে বিয়ে দিয়ে দিলে সে আশস্কাটা থাক্‌বে না অথচ আমার প্রতি স্নেহ ভালবাসা ঠিকই থাক্‌বে।

সরলা একটু কাছে ঘেঁসিয়া মৃদুস্বরে বলিল ঠিক বলেছ, কথাটা আমি তলিয়ে বুঝি নাই, ঠিক ঠিক! তোমার প্রতি ভালবাসাটা তার অন্য রকমেরই বটে, দেখ তোমার চেহারা, ব্যভার, চাল চলন যেমন যেমন তাই তার কাছে সব ভাল, আর সব ভাল নয়। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা হচ্ছে তার গায়ের রং কাল, মুখেও গোপ আছে দাড়ী নাই তাই ঠান্‌দিদি সুভাকে বল্লেন, "নে, তুই যেমন কাল চাস্, তাই হয়েছে,খুব মনে ধরবে;" সুভা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল "অমন কাল আমি পছন্দ করি না।" গোঁপের কথায় বলিল "গোঁপ অনেকেরই আছে, কিন্তু বোস মশায়ের যেমন গোঁপে মুখের শোভা এমন আর কারও নয়।"

সকলে শুনে তো হেসে খুন, কেউ কেউ কালামুখী বলে গালও দিল। এই সেদিন কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বল দেখি সুভা কাকে তুই সকলের চেয়ে সুন্দর দেখিস;" তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল

"বোস মশায়কে।" তোমার চলন, শোয়া, বসা, হাসা, খাওয়া, সব সে এত খুঁটিয়া লক্ষ্য করে যে আমিও হার মানি। আমার তো ভয় হয় তার মনে বুঝিবা একটা ছাপই পড়ে গেছে।

নিকুঞ্জও হাসিয়া বল্লেন "এই যে বল্লে সে ভয় নাই!" সরলাও হাসিয়া বলিল "বা! তোমার জন্যে বুঝি! তার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ভাবিয়া। এখনও সে বালিকা কিন্তু মনে মনে যদি এত স্নেহ ভালবাসা অমন করে পোষে তবে ভবিষ্যতে কি হবে ভাব দেখি! আমিও যেমন জগতে তোমাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখি, সেও তেমনি!" নিকুঞ্জ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তাহলে সে প্রকৃতই হতভাগিনী!"

পার্শ্বের দেওয়াল হইতে ভবিষ্যৎবাদী টিক্‌টিকি ডাকিয়া উঠিল "ঠিক, ঠিক, ঠিক্।" দম্পতি একটু চকিত হইলেন। আর কোন কথা হইল না। টিক্‌টিকি কি ভবিষ্যৎ বলিতে পারে?

(৪)

সুভাসিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সময় সুভাসিনীর বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। বিবাহে নিকুঞ্জ বাবু উপস্থিত ছিলেন এবং বিবাহের আলেপনা দেওয়া হইতে সুভাসের শাঁখা পরাণের কাজ পর্য্যন্ত সবই তিনি করিয়াছিলেন। সকলেই উৎসাহিত, সকলেই আনন্দিত কিন্তু 'যার বিয়ে তার মনে নাই।' সুভাসিনী বিবাহে আনন্দিতাও নহে, বিষাদিতাও নহে, যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, সে অন্য সকলকে ছাড়িয়া বিবাহ কাল পর্য্যন্ত প্রায়ই নিকুঞ্জের কাছেই ছিল। নিকুঞ্জ সুভাসিনীর এই উদাসীন ভাব যে লক্ষ্য করেন নাই তাহা নহে। কতবার নির্জ্জনে সুভাসকে বর পছন্দ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, স্নেহ করে তাহার আনতানন উন্নমিত করিয়া তাহার সম্মুখে বরের সৎগুণাবলীর অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তথাপি সুভাসের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরেই সুভাসিনী তাহার বড় বড় চোক দুটি নিকুঞ্জের মুখে স্থাপন করিয়া একটু মলিন হাসি হাসিয়াছে, অমনি আবার মুখ নমিত করিয়াছে। বিশেষ কারণবশতঃ সরলা এ বিবাহে পিত্রালয়ে আসিতে পারে নাই; সে জন্য নিকুঞ্জের মন পূর্ণ আমোদ উপভোগ করিতে পারিতেছে না, তার উপর সুভাসের এই ভাব দেখিয়া তাঁহার মন আরও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

বিবাহ শেষ হইবার পরে বাসর ঘরে থাকিবার সময় সুভাস কত কাকুতি করিয়া নিকুঞ্জকে তাহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল নতুবা তার ভয় করিবে। নিকুঞ্জ নানারূপে বুঝাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সুভাস অগত্যা বাসর শয্যায় ঠান্‌দিদির কোলের মধ্যে কোনরূপে নিশি যাপন করিয়াছিল। সুভাসের বর সেই বিবাহের রাত্রিতেই নিকুঞ্জের সম্মুখেই সুভাসকে অনেক প্রেমের কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের 'দম্পতীর প্রেমালাপের' এক অংশের অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন এমন কি স্বীয় প্রণয় রহস্যের গভীরতা জ্ঞাপন করিবার জন্য সুভাসের অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিলেন এবং যদৃচ্ছাগতা একটী মার্জ্জারীকে ধরিয়া সুভাসের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এদিকে নিকুঞ্জ বিশ্বস্তসূত্রে সেই রাত্রিতেই শুনিয়াছিলেন 'বর অতিশয় ভ্রষ্ট চরিত্র এবং তজ্জন্য কুৎসিত পীড়াগ্রস্থ।' শুনিয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্ব সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল এবং সুভাসের অদৃষ্ট ভাবিয়া তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর নিকুঞ্জ বেজগাঁ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং সরলাকে গিয়া সব বৃত্তান্ত বলিলেন। সরলার স্নেহপ্রবণ মন যে কিরূপ হইল তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন।

দ্বিরাগমনের সময় বাটীর সকলে মিলিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও সুভাসকে তাহার স্বামীর গৃহে লইতে পারে নাই; নিকুঞ্জ সেখানে ছিলেন না; অন্য সকলে প্রথমে খোসামোদ ও স্নেহবাক্য এবং তৎপরে মুষ্টিযোগ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে বরের গৃহে লইতে পারে নাই। সুভাসিনীর যেন দৃঢ়সঙ্কল্প যে সে বরের ছায়াও মাড়াইবে না। ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া সকলে তাহাকে কত গালাগালি দিয়াছে তাহাতে অভাগিনী কোনও কথা বলে নাই, নীরবে সব সহ্য করিয়াছে। সুভাসের প্রেমিক বর নিরাশ হইয়া রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার সমস্ত রাগ বেচারা নিকুঞ্জের উপর চাপাইয়াছে। তার জন্যও সুভাসকে কম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। নিকুঞ্জকে লইয়া সুভাসকে

সবাই ঠাট্টা করে, গালি দেয় এজন্য সুভাস আজকাল নিকুঞ্জের বিষয় লইয়া বেশী কথা বলে না কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ের স্নেহ যে দিকে ধাবমান, সেদিক হইতে তাহাকে কেমন করিয়া ফিরাইবে? নিকুঞ্জের পত্রখানি আসিলে সুভাস কত আগ্রহে ছুটিয়া গিয়া তাহা পাঠ করে, তৎক্ষণাৎ তার উত্তর লিখিবার জন্য উদ্যোগী হয় কিন্তু স্বামীর কোন পত্র আসিলে সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না, দশ জনের অনুরোধে, গালাগালি প্রভৃতিতে বাধ্য হইয়া অন্যের ভনিতা অনুযায়ী জবাব দেয় মাত্র।

বিবাহের কয়েকমাস পরে সরলা আসিয়া সুভাসিনীকে কত বুঝাইয়াছে, সুভাস কোনও উত্তর করে নাই। সুভাস বড় চাপা, মনের ভাব কাহাকেও বলে না। বাহিরে তাহার কোনই পরিবর্ত্তন নাই, সেই উচ্চ হাসি, ছুটাছুটী, ঝগড়া বিবাদ সবই একই ভাবে রহিয়াছে যেন কোথাও কিছু নাই। যদি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে কোনও বেদনা থাকে, সে তাহা আরও গভীর প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছে, বাহিরে কাহাকেও সে তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিবে না, অন্তরে শত বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা সে হাসিয়া সহ্য করিবে, অসম্ভব কল্পনায় তাহার চির জীবন অবসান করিয়া দিবে তথাপি বাহিরের কাহাকেও তাহা বুঝিতে দিবে না, বাস্তবিক কেহই তাহার বাহ্যভাবে একটু বিমর্ষতা, একটু চিন্তা দেখিতে পায় না। একদিন সুভাস কি এক প্রসঙ্গে তেলের বাটীতে জল দিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িতে নাড়িতে দিদিকে কহিল "জলে তেলে মিশ খায় না, দিদি! দুধে জলে তো মিশালে মিশে! কেন এমন হয়, দিদি? নিশ্বাস ছাড়িয়া সরলা কহিল—স্বভাব।

(৫)

অদৃষ্ট-লিপি অখণ্ডনীয়। মানবের শত চেষ্টা তাহার নিকট ব্যর্থ! সুভাসিনীর অদৃষ্টও সেই অমোঘ নিয়মাধীন। তাহার ফলে বিবাহের পর দুই বৎসর গত না হইতেই সে চতুর্দ্দশ বর্ষে দাঁড়াইয়া বিধবার সাজ পড়িয়াছে। কাল ক্যান্সার রোগ তাহার স্বামীকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিয়াছে; সুভাস-মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহার কোন অঙ্গেই যৌবনের কোন লক্ষণ স্ফুটিত হয় নাই, আজও সে পুতুল খেলা লইয়া মত্ত, আজও সে কুকুর বিড়ালের শাবক লইয়া সন্তান বাৎসল্যের অভিনয় করে, আজও তার সরল মন ভাব গোপন করিতে শিখে নাই কিন্তু ধাতার কঠোর বিধানে আজ সে কৈশোরে যোগিনী, ইহলোকের দৈহিক সুখ বিলাস আস্বাদ না পাইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছিল বটে কিন্তু সম্প্রদানের সময় ব্যতীত সে স্বামী-অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, সধবাবস্থাতেও সে সম্বন্ধে সে বিধবারই ভাবে রহিয়াছে কিন্তু স্বামীর পীড়ার সময় তাঁহার শুশ্রূষা সে স্ব ইচ্ছায় যথাসাধ্য করিয়াছে, স্বামীর মল মূত্র পরিষ্কার করা, তাঁহাকে বাতাস করা, আবশ্যকীয় ঔষধ পথ্যাদি দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে তাহার শৈথিল্য ছিল না। স্বামীকে যখন বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ পশ্চিমে লইয়া যাওয়া হয় তখনও সে সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু তাহাকে সঙ্গে লওয়া হয় নাই, পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতেও সে বিমর্ষ হয় নাই। যখন এই সাংঘাতিক সংবাদ বেজগাঁয়ে পৌছিল, যখন সুভাসের মা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, যখন বৃদ্ধ রামহরি বাবু বালকের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বাটীর আর দশ জন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন সুভাসিনী একটা কাপড় মুড়ি দিয়া খাটে শুইয়া আছে, চক্ষে অশ্রু নাই, মুখখানি একটু মলিন মাত্র, আর কোনও ভাবান্তর নাই। সরলা তখন পিত্রালয়ে, সে নিজ অশ্রু মুছিতে মুছিতে জোর করিয়া হৃদয়ের বেদনা দমনপূর্ব্বক ভগিনীকে প্রবোধ দিতে গেল কিন্তু প্রবোধ দিবে কাহাকে? সুভাস কহিল "মাকে সান্ত্বনা কর গিয়ে দিদি, আমার কিছু দরকার নাই।'

সরলা বিস্মিত হইয়া গেল 'বল্ তো সুভাস তোর কিছু কষ্ট হচ্ছে না? মন কেমন কচ্ছে না?' জিজ্ঞাসা করিল।

ধীরভাবে সুভাস উত্তর করিল "সকলে যখন চেঁচামেচি ক'রে কাঁদে তখন মনটা কেমন করে, তা না হলে বেশ আছি, কোন কষ্ট নাই।"

সরলা অতি স্নেহের সহিত কাছে বসিয়া ভগিনীর মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল "আচ্ছা, তোর কি তার উপর একটুও টান, সামান্য ভালবাসাও হয় নাই?"

ধীরভাবে সুভাস উত্তর করিল 'না দিদি।"

সরলা তাহা বুঝিতে পারিল না। সরলা নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখিল বিবাহের ২।৩ মাসের মধ্যেই স্বামীর প্রতি তাহার কেমন আকর্ষণ হইয়াছিল, এক বৎসর পরে স্বামী যখন বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া একমাস থাকিয়া বিদেশে যান তখন সে কেমন ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া পাগলের মত অস্থির হইয়াছিল। স্বামীর যাওয়ার পরই কেমন ব্যাকুলভাবে দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিল, দুদিন স্বামীর সংবাদ না পাইলেই সে কত দুর্ভাবনাগ্রস্থ হয় এই সব সে স্মরণ করিয়া দেখিল; এরূপ ভাব সে বেশ বুঝিতে পারে কিন্তু স্বামীর জন্য স্ত্রী ব্যাকুল হয় না, তাঁহার প্রতি স্ত্রীর আকর্ষণ হয় না, মন কাঁদে না, এ ভাব তাহার নিকট নূতন—সে তাহা বুঝিতে পারে না, তাই সুভাসের ভাবও সে বুঝিতে পারিল না। সরলা ভগিনীকে আদর করিয়া উঠাইল, বসাইল, সুভাসের কোনও ভাবান্তর নাই, হয় সুভাস তাহার জীবনের উপর এই ভয়ানক অশনি-ক্ষেপের ভবিষ্যৎ ফল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহার তাহা বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্তও নাই নয় সে বুকের ব্যাথার উপর নীরবতার পাষাণ চাপাইয়া দিয়া বাহিরে সহজভাব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সফল-কাম কিন্তু এতটুকু বালিকার পক্ষে সে কি সম্ভব? সরলা এ রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। সে স্বামীকে এক পত্র লিখিয়া সব অবস্থা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে একবার আসিতে লিখিল। নিকুঞ্জ পত্র পাইয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া অনতিবিলম্বে আসিয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন; কান্নাকাটির ব্যাপার থামিয়া গেলে পর শ্বাশুড়ী অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলেন "বাবা, পাগলটাকে লইয়া কি উপায় হইবে? কিছু বোঝে না, বদ্ধ পাগল। কপাল তো পুড়িয়াছে এখন জাতি কুল যাতে বজায় থাকে তার উপায় কর। তুমি একটু বুঝাইয়া সুঝাইয়া দিয়া যাও বাবা! তুমি ভিন্ন আর কেহ তাহা পারিবে না।"

নিকুঞ্জ সন্ধ্যাকালে সুভাসকে কাছে ডাকিলেন, বিষাদ প্রতিমা পূর্ব্ববৎ সহজভাবে নিকুঞ্জের কাছে আসিল, নিকুঞ্জ অশ্রুজল রাখিতে পারিলেন না, তাহার সহিত কথা কহিবেন কি, তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া নীরবে তাহার হস্তখানি নিজ হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর বহু কষ্টে ডাকিলেন "সুভা।"

সুভাস উত্তর করিল 'আজ্ঞা।'

আবার নিকুঞ্জ নীরব হইলেন। পরে বলিলেন "তোমার অবস্থা বেশ বুঝিতেছ। এ অবস্থায় চালচলন একটু পরিবর্ত্তন করা দরকার তাও বোধ হয় বুঝিতে পার?" বিধবা হওয়ার কথাটা স্পষ্টভাবে নিকুঞ্জ বলিতেই পারিলেন না।

সুভাস উত্তর করিল "হাঁ, চুড়ী বালা খুলে রাখা, সাদা কাপড় পরা ইত্যাদি তো? তা আমি কর্ত্তে রাজি আছি তো!" সুভাসের স্বরে বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর নাই।

নিকুঞ্জ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "না, না, তা বল্‌ছি না, এই বেশী লোকজনের সামনে যাওয়া কি বেশী বাচালতা করা এই সব।"

"আপনি আমাকে যে ভাবে চলিতে বলিবেন আমি সেই ভাবেই চলিব অন্ততঃ চলিতে চেষ্টা করিব। যাতে লোক নিন্দা না হয়, বাবা মার মুখ ছোট না হয় সে সব ব্যভার আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যান, আমি তাই কোরবো।" পূর্ব্ববৎ সুভা উত্তর করিল। নিকুঞ্জ স্নেহের সহিত সুভাসের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "আমার কাছেও কি তুই মনের কবাট খুলবি না সুভাস? সব কথা বল্‌বি না?"

হাসিয়া সুভাস বলিল "সে আবার কি? আমি কি কিছু গোপন করি নাকি? কবাট খোলাখুলি আমি বুঝি না।"

নি। আমি যা জিজ্ঞাসা কোরবো তার ঠিক জবাব দিবি।

সু। হাঁ, তা দিব; কবে দেই নাই?

নি। ঠিক জবাব দিস্ বলেইত সাহস কচ্ছি! আচ্ছা তার উপর তোর একটুও ভালবাসা ছিল না?

সু। 'না।'

নি। কেন বল দেখি, তার কারণ কি?

সু। তা আমি জানি না, বলিতেও পারি না।

নি। তোর পূর্ব্ব ব্যবহার জন্য একটুও কষ্ট হয় না?

সু। না।

নি। বর্ত্তমান অবস্থার জন্যও কষ্ট হয় না? ভবিষ্যতের কি ভাবনা হয় না?

সু। দুয়েএ কোন তফাৎ আছে তাই আমি বুঝি না!

তখনও যেমন ছিলাম, এখনও তেমন আছি, খাওয়া দাওয়ার মধ্যে যা বদল, তাতে আমার বিশেষ কিছু অসুবিধা নাই। ভবিষ্যতেও হবে না, চিরকাল একই ভাবে কাটিবে।

নি। আচ্ছা দেখ্, এখনও তুই সম্পূর্ণ বালিকা, বয়স চৌদ্দ হইলেও দেখিতে ও কাজে তুই অতি বালিকা, তোকে আবার যদি বিবাহ দেই?

সুভাস এবার হাসিয়া বলিল "ছি! তাও কি হয়?"

নিকুঞ্জ কহিলেন, "যদি হয়; সমাজে যদি চলে, আমি যদি পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা নিতে পারি, আর কেউ যদি তোকে বিয়ে কর্ত্তে প্রস্তুত থাকে?"

সুভাস একটু বালা-সুলভ ঔৎসুক্য দেখাইয়া বলিল 'কে?'

নিকুঞ্জ। যদি কেউ থাকে? ধর কেশব বাবু! ইনি একজন এম্, এ, পাশ, সুদর্শন, বড় চাকুরে, মৃতদার।

সুভা। 'না।'

নিকুঞ্জ আরও ২।৪ জনের নাম করিলেন, সুভাসের একই উত্তর। শেষে নিকুঞ্জ বলিলেন "আচ্ছা আমিই যদি তোকে বিয়ে করতে চাই।" চমকিয়া ডবডবে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাল এক দৃষ্টিতে বালিকা নিকুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিল—সে ছল ছল নেত্রের সে ভাব নিকুঞ্জের হৃদয়পটে চিরকাল আঁকা থাকিবে—চক্ষুর সে নীরব ভাষা নিকুঞ্জের হৃদয়কে যেন তিরস্কারের আঘাত করিল—সে চক্ষু যেন তাঁহাকে দৃঢ়স্বরে ভৎর্সনা করিয়া কহিল "তুমি! তুমিও আমার সহিত রহস্য করিবে, তুমিও আমাকে লইয়া—আমার প্রাণটাকে লইয়া খেলা করিবে! যাহা অসম্ভব, তুমিও জান, আমিও জানি যাহা অসম্ভব সেই কথা লইয়া তুমি আজ আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ—জগতের মধ্যে কেবল যাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি সেই তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে বেদনা দিতে আসিয়াছ—বেশ, যাহা ইচ্ছা কর, আমি সব সহিতে পারিব।" সুভাসের মনে এত কথা ছিল কিনা আমরা জানি না তবে নিকুঞ্জের এইরূপই মনে হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সুভাস চোক ফিরিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে জবাব দিল "না।'

নিকুঞ্জ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। তিনি বাস্তবিকই পরীক্ষাস্থলেই বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তার মধ্যে নিজকে জড়ান যে ভাল হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

সুভাস বাহিরে গিয়া একটা বিড়ালের ছানা ধরিয়া তাহাকে লইয়া মহা গণ্ডগোল আর হাসি তামাসার সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

নিকুঞ্জের শাশুড়ী নিকুঞ্জের ঘরে আসিয়া বলিলেন "দেখ্‌লে পাগলের পাগলামী!"

নিকুঞ্জ "হ্যাঁ," বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

(৬)

সুভাসের কপাল ভাঙ্গিবার পর আরও দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন সুভাসিনী বয়সের হিসাবে ষোড়শী কিন্তু দেখিতে ঠিক একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষীয়ার ন্যায়। আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে সে রীতিমত বিধবার আচার পালন করিতেছে তাহার এক চুলও ব্যতিক্রম করে না, কিন্তু অন্যান্য ব্যবহারে সে এখনও বালিকা! এখনও সেইরূপ সরল, উচ্চ হাসি, উচ্চ চীৎকার, ঝগড়া দ্বন্দ, স্নেহ ভালবাসা সবই তার ঠিক পূর্ব্ববৎ আছে। বাটীর কেহ কেহ তাহাকে অন্তরে আঘাত দিলে সে সুদ সমেত তাহা ফিরাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করে না সে পিতাই কি মাতাই কি? কিন্তু সংসারের কাজ কর্ম্ম, সকলের প্রতি স্নেহ মমতা সে সবও তার ঠিক সমভাবেই আছে বরং তাহা বাড়িয়াছে। নিকুঞ্জের প্রতি তাহার ভাব বাহিরে একরূপই রহিয়াছে; নিকুঞ্জ তাহাদের বাড়ী গেলে এখনও তাঁহার কাছে থাকিতে, কথা বলিতে, তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতে তাহার আগ্রহ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। কিন্তু তাহা অতি পবিত্র, অতি সরল।

নিকুঞ্জ এই বৃন্তচ্যুত কুসুমকলিকাটির দিকে যখন তাকান তখনই তাঁর মনে একটা কষ্টের তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। এক সরলা ব্যতীত বাটীর সকলেই তাহাকে হতভাগিনী বলিয়াই বলে, আমরাও তাহাকে তাই বলি কিন্তু সে নিজে যেন তাহা স্বীকার করে না, একদিন কি কথায় সে বলিয়াছিল "আমি যে কিসে এত হতভাগিনী তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না, অন্যের চেয়ে আমার অসুখ্‌টা কি—যে আমি হতভাগিনী!"

নিকুঞ্জ সরলা একত্রে প্রার্থনা করিলেন, 'হে ভগবান্, উহার মন যেন এমনই থাকে, দাম্পত্য সুখের আস্বাদ ও কিছুই পায় নাই, ও যেন চিরদিনই এইরূপ অনাঘ্রাত পুষ্পই থাকে, কখনো যেন না বুঝে যে সে হতভাগিনী।"

জানি না ভগবান্ দম্পতীর এ কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন কিনা।

সুভাসিনী আজ ১৬।১৭ বৎসরের যুবতী কিন্তু সে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোরমার মত আমাদের নিকট এখনও একটা প্রহেলিকা, একটা রহস্যের মত। আমরা তাহাকে এ পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারি নাই। সে হাসে, খেলে, বেড়ায়, কোন্ সময় তার কি ভাব তাহা যেন আমরা বুঝি না কিন্তু কখনও স্বীয় দুর্ভাগ্যের জন্য তাহাকে নির্জ্জনেও দুঃখিত হইতে আমরা দেখি নাই। বয়সের উপযোগী বুদ্ধি ক্ষমতা তাহার হইয়াছে ইহা যদি স্বীকার করিতে হয় তবে প্রহেলিকা আরও জটিল আকার ধারণ করে। ইহা কল্পনা নহে, বাস্তব ঘটনা!

সে মানবী, কি দেবী কি পশু তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

তাহার হৃদয়ের কোনও স্থান কি শূন্য নাই? সে শূন্য স্থান কি সময় সময় পূর্ণ হইবার জন্য ব্যাকুল হয় না? অথবা তাহা কি কোন অদ্ভুত উপায়ে সুভাসিনী পূরণ করিয়াছে?

শত্রুরও তাহার স্বভাবের প্রতি বিন্দুমাত্র কলঙ্কলেপনের ক্ষমতা নাই এমন নির্ম্মল স্বভাব তাহার।

জানি না সে যোগিনী কি না, জানি না তাহার মনঃসংযম ক্ষমতা কতদূর, জানি না তাহার হৃদয়ের কখন কি খেলা—তাহার ইতিহাস সে নিজে না বলিলে এ জগৎ কিছুই জানিতে পারিবে না—জগৎ কেবল জানিবে সে হতভাগিনী।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইংরাজের বঙ্গাধিকার।*

প্রথম প্রস্তাব।

পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন—প্রবন্ধের শিরোলিপি দর্শনে হয়ত অনেকেই বলিবেন মিল, মার্শমান, ইলিয়ট্ প্রমুখ ঐতিহাসিকদিগের লেখনী বহুকাল পূর্ব্বে শীর্ষোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশ্রাম লইয়াছে, গ্রাম্য পাঠশালার বালক বালিকা হইতে কালেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরের অঙ্গনা কেহই "ইংরেজের বঙ্গাধিকারের" কথা জানিতে বাকী নাই—অনেক দিন হইল একথা পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তবে আর "চর্ব্বিত চর্ব্বণের" প্রয়োজন কি—কথা সত্য, বিষয়টীও যে বহু পুরাতন তাহাও মিথ্যা নহে, দেশের বালক বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই একথা শুনিয়াছেন, ছোট, বড়, মাঝারি নানা রকমের দেশী বিলাতী ভাষার ইতিহাসে ইহার বিস্তর বর্ণনা আছে। যিনি যখন এ দেশের ইতিহাস লিখিয়া লেখনী কণ্ডূতি নিবারণ করিয়াছেন, তিনিই এতৎসম্বন্ধে দুই এক কথা না কহিয়া নিরস্ত হয়েন নাই, কেন না বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলেই এ কথা লিখিতে হয়, না লিখিলে চলে না, সে পক্ষে ত্রুটী করিলে ইতিহাসই হইবে না, বিষয়টী এতই প্রয়োজনীয়। সাময়িক পত্রিকার লেখকগণও ক্ষান্ত নহেন, তাহারাও যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া ইংরেজের সংগৃহীত ইতিহাসের পুরাণ কাহিনীর পুনঃপুনঃ অনুবাদ করিয়া শোথরগ্না রমনীর ন্যায় মাতৃভাষার অসঙ্গত পুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ নহেন। আমিও প্রায় ইহাদেরই মধ্যে একজন, তবে আমার উদ্দেশ্য পৃথগ্বিধ। অধুনা এই পুরাণ ঘটনা লইয়া অনেক নূতন কথা শুনা যাইতেছে, অনেক নূতন তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইতেছে। তাই আজি পুরাণ ঘটনা,

* শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবুর "সিরাজউদ্দৌলা," নিখিল বাবুর "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" এবং বিহারী বাবুর "ইংরাজের জয়" গ্রন্থে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের সহিত অনেক স্থলে আমাদের মতানৈক্য থাকিলেও প্রাচীন, ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতিকূল ও অনুকূল সমালোচনায় প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের পক্ষোদ্ধার হইতে পারে বলিয়া এই প্রবন্ধ পত্রস্থ করা হইল। প্রঃ সং

পুরাণ কথা নূতন করিয়া তুলিতে হইতেছে। নূতন কথার নূতন তত্ত্বের আলোচনারই জন্য নূতন প্রবন্ধের প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা বড়ই গুরুতর ব্যাপার,—চক্ষে দেখা নাই, হয়ত কর্ণেও শুনা নাই, কোন্ কালে কে কোথায়, কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়, যিনি লিখিয়া গিয়াছেন কথিত বিষয়ের সহিত তাঁহার কোনরূপ সংশ্রব ছিল কি না, তিনি তৎকালে আপনার স্বাধীন মত প্রচারে কতদূর সমর্থ ছিলেন; এই সকল বিষয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। বিশেষতঃ সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, প্রকাশ্যরূপে স্বাধীনভাবে কোন শাসনকর্ত্তার শাসন-নীতির বিরুদ্ধে মত প্রচার করিবারও কাহার কোন অধিকার বা শক্তি সামর্থ্য ছিল না, কেহ তাহাতে প্রস্তুত হইলে তাহাকে শূলে চাপিতে হইত। এহেন দুঃসময়ের রাজনৈতিক ঘটনাগুলির স্মৃতি যে একবারে বিলুপ্ত হইবার ব্যবস্থা হয় নাই ইহাই যথেষ্ট উপকারের কথা বলিতে হইবে। সেই সকল ঘটনার পরিচয় মাত্র আমাদের সমালোচনার একমাত্র অবলম্বন। তদানীন্তন মীমাংসার উপর ততটা নির্ভর করা যায় না। আজি কালি আমরা যাহাকে আমাদের স্বদেশের বা স্বজাতির ইতিহাস বলি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাস নহে। প্রাচীনকালের শাসন কর্ত্তাগণের আশ্রিত ও উপজীবিত ব্যক্তিগণের লিখিত বিবরণ মাত্র একথা সহস্রবার মানিয়া লইতে হইবে। তবে তাহাদের সঙ্গতি অসঙ্গতি সম্বন্ধে বিবেচনা করা চাই।

"ইংরেজের বঙ্গাধিকার" সম্বন্ধে যে কয়েকটী নূতন কথা উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী কথা—সেরাজ উদ্দৌলাকে যেরূপ দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার বলিয়া ইংরেজের ইতিহাসে বর্ণনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক তিনি সেরূপ ছিলেন না। ইংরেজ আপন শত্রুর দোষ বর্ণনায় মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। এ কথার মীমাংসা করিতে হইলে সেরাজ-চরিত্র আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে হয়।

সেরাজ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র। যখন আলিবর্দ্দি বিহারের শাসন কর্ত্তা ছিলেন তখন আনুমানিক ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে সেরাজের জন্ম হয়। আলিবর্দ্দির তিনটী কন্যা ব্যতীত আর অপত্য ছিল না। সেই তিনটী কন্যা তিনি আপন অগ্রজ হাজি মহম্মদের তিনটী পুত্রকে অর্পণ করেন। সেরাজ আলিবর্দ্দির সর্ব্বকনিষ্ঠ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র জৈন উদ্দিনের পুত্র। আলিবর্দ্দি খাঁ সেরাজকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন, ইহা বাক্যতঃ নহে কার্য্যতঃ। পাঠক, অপেক্ষা করুন, তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাইবেন। সেরাজকে তিনি যার পর নাই ভাল বাসিতেন। অতিমাত্রায় মাতামহের আদর পাইয়া বাল্য কাল হইতেই সেরাজের মনে যথেচ্ছাচারিতার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। নবাব বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন হইবার পর হইতেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারে বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেনাপতিগণের বিদ্রোহিতারও বিরাম ছিল না, মুস্তফা খাঁ যখন তাঁহার অবাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া বিহারে উৎপাত করিতে থাকে, তৎকালে জৈন উদ্দিন বিহারের শাসন কর্ত্তা। পিতৃব্যের আদেশানুসারে তিনি মুস্তফা খাঁকে প্রদমিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন, পরিশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিলে এবং নবাবের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিয়া কাটোয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কিয়দ্দিনের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশে প্রস্থান করিলে নবাব মহা আড়ম্বরে দৌহিত্রের পরিণয়োৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। * বলা বাহুল্য যে অতঃপর সেরাজ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েন, এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করে নাই। একে অপুত্রক নবাবের নাতি, তাহাতে বাল্য বিবাহ ইহাতেও সেরাজের শিক্ষার প্রত্যাশা বিড়ম্বনা বই কি বলিব!

মুসলমান আভিজাতকদিগের আত্মদ্রোহিতায় ঐতিহাসিকের লেখনী অতি বড় কলঙ্কিত। ভারতের মুসলমান সম্রাট ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের সুষুপ্তিতেও

* In the short interval which he (Ali Vardi Khan) now enjoyed, the viceroy celebrated with great pomp the nuptials of his two grandsons, the children of Zyn-ooddeen.

Marshman's "History of Bengal."

শান্তি ছিল না,—মানুষ যাহাদিগকে লইয়া সংসারী হয়, যাহাদের জন্য সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ, যাহাদের সুখ দুঃখে আপনাদের সুখদুঃখ জ্ঞান করে, সেই সকল পরমাত্মীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র ভ্রাতা অস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের জন্য পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ, মাতামহাদির জীবন হিংসায় প্রবৃত্ত। শ্বশুরের বধসাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া জৈন উদ্দিন নবাবের পদচ্যুত সেনাপতি সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ নামক দুইজন পাঠানকে আপনার অধীনে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে তাহাদিগকে পাটনায় আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদেরই হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন। জৈন উদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা সঞ্চিত অর্থ বাহির করিয়া না দেওয়ায় বিশ্বাসঘাতক পাঠান তাঁহার যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করে, তাহাতেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। সেরাজ এই সময়ে মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত শত্রুহস্তে বন্দী হয়েন। আলিবর্দ্দি খাঁ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নিধন, বিহার প্রদেশ স্বাধিকারচ্যুত এবং দুহিতা ও দৌহিত্রাদি আত্মীয়গণের শত্রুহস্তে পতন এতগুলি দুঃসংবাদ পাইয়া অবিলম্বে বিহার যাত্রা করেন এবং শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আত্মীয়গণের উদ্ধার সাধন করেন।

বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বই আলিবর্দ্দির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী, বিহারে অবস্থিতি করিয়াই তিনি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবেদারী প্রাপ্তির সুবিধা করিতে পারিয়াছিলেন; বিহার সমধিক উর্ব্বরা ভূমি, বিহারের রাজস্বও প্রচুর অতএব তিনি বিহারের শাসন কর্ত্তৃত্ব অপরকে দিতে ইচ্ছা করিলেন না; সিরাজকেই তাহাতে নিযুক্ত করিয়া প্রীতিলাভ করিলে, রাজা জানকীরাম তাঁহার নায়েবী পদ পাইলেন। আলিবর্দ্দি নিতান্ত স্বার্থান্ধ হইয়াই এরূপ অপরিণামদর্শীর কাজ করিয়াছিলেন। এই অপ্রাপ্তব্যবহার বালকের হস্তে বিহারের ন্যায় প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান যে তাঁহার ভাবী জীবনের কিরূপ কল্যাণকর হইয়াছিল, তৎকালে বৃদ্ধ নবাব তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই তাহার শিক্ষার এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মতিগতি ও চরিত্রগঠনের উপযুক্ত সময়। এ সময় সৎসঙ্গ ও সৎশিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে সৎপথ দেখাইতে পারিলে তবে তাঁহার জীবন সুখসম্পদে শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিত। অল্প বয়সে আধিপত্য লাভ করিয়া মোগল কুলতিলক আকবর সাহের ন্যায় চরিত্র ভাল হওয়া কয় জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে—আকবর প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। প্রতিভা প্রথম হইতেই ফুটিতে থাকে। বাল্যে অভিভাবক-বিহীন কিন্তু সেরাজ শৈশবাবধি পিতা ও মাতামহের অধীন। ইহাতেও আকবর ও সেরাজের চরিত্র স্বর্গ ও নরকের ন্যায় বিভিন্ন কেন? তিনি বাল্যাবধিই দুঃশীল ও দুরাচার। এরূপ বলিবার কারণ এই যে ইহার দুই বৎসর পরেই মাতামহের মৃত্যুর বিলম্ব তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি তাঁহার সিংহাসন-লোলুপ হইয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন। অবিলম্বেই পাটনার প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সানুচর তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা জানকী রামকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার আদেশ দিলেন। রাজা জানকী রাম জানিতেন সেরাজ মাতামহের আদরের দৌহিত্র, তাঁহার মার্জ্জনা হইবে কিন্তু তাঁহাকে বশীভূত করিতে গিয়া যদি তাঁহার কোনরূপে পীড়া জন্মে তাহা হইলে নবাবের নিকট তাহার মার্জ্জনা নাই। অতএব অতি সাবধানে তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া তাঁহাকে স্ববশে আয়ত্ত করিলেন।

দৌহিত্রের বিদ্রোহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই আলিবর্দ্দি অবিলম্বে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ভয় এই পাছে যুদ্ধে সেরাজের কোন শারীরিক ক্ষতি হয়। দৌহিত্র যে তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত তাহা ভ্রমেও ভাবিলেন না। তিনি পাটনায় উপস্থিত হইয়া যখন সেরাজকে অক্ষতাঙ্গে দেখিলেন, তখনও আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন। সেরাজের শাসন হইল না—প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ইন্ধন পাইলে যেরূপ হয় সেরাজ সেইরূপ হইয়া উঠিলেন। কু-সঙ্গী ও কুসহচরে সেরাজকে শ্বাপদ অপেক্ষাও শঙ্কার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিল।

খৃঃ ১৭৫১ অব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্দ্দান্ত দৌহিত্র তাঁহাকে তাহা ভোগ করিতে দেন নাই। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আর কোন উপদ্রবই ছিলনা, কিন্তু এই বৎসর আলিবর্দ্দি খাঁর বড়ই দুর্ব্বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের পোষ্যপুত্র একরাম উদ্দৌলা এই বৎসর প্রাণত্যাগ করেন। প্রিয়তর দৌহিত্র সেরাজ উদ্দৌলা লম্পটতা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছারিতা দোষে সাধারণের যার-

পর-নাই অপ্রিয় হইয়া উঠেন তাঁহার উপদ্রবে মুর্শিদাবাদ নগরী অস্থির হইয়া পড়ে। প্রবাদ এইরূপ যে তিনি কোন কুলাঙ্গনার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিলে দিবা দ্বিপ্রহরেও তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহার সতীত্ব নাশে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না। গর্ভমধ্যে ভ্রূণ কি অবস্থায় থাকে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য গর্ভিনীর গর্ভ বিদারণ করিতেন,—জনপূর্ণ পোত নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হইলে আরোহিরা কিরূপ ভাব প্রকাশ করে দেখিবার জন্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি রাজ-পথে বাহির হইতেন তখন মুর্শিদাবাদবাসিরা ত্রাহি মধুসূদন!—ত্রাহি মধুসূদন" করিতেন। এই সকল কথা কি অতিরঞ্জিত? উহার ইংরেজ ঐতিহাসিকের অতিশয়োক্তি হইলে আজিও সাধারণে স্বেচ্ছাচারিকে নবাব সেরাজ উদ্দৌলার সহিত তুলনা করিত না—রাঢ়ে বঙ্গে স্বেচ্ছাচারী দেখিলে কে না বলে—যে "নবাব সেরাজ উদ্দৌলা"। সেরাজের রাজ কাজ এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল মাত্র এই অল্প সময়ে কখন সমগ্র বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় এ কলঙ্কের শাখা প্রচারিত হইতে পারে না। দীর্ঘকালের কুকার্য্যেই তিনি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

সেরাজের কোন্ কাজটী মার্জ্জনার যোগ্য, আমরাও তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিনা—মুসলমান নবাবের অল্পবয়স্ক আদুরে দৌহিত্র স্বভাবতঃই একটু উগ্র প্রকৃতির হওয়া সম্ভব। ইংরেজ-ইতিহাস লেখকগণের অনেকেই রাজ্য প্রাপ্তি কালে তাঁহার বয়স বিংশতি বর্ষ অপেক্ষা ন্যূন ছিল এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা কতদূর সম্ভবপর বলা যায় না—যদি তাহাই হয়, তবে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। ইতিহাসের সন তারিখের প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় যে, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে বিহারে মুস্তাফা খাঁর বিনাশসাধনের পর এবং ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মিরজাফরের মারহাট্টা দমনের মধ্যে আলিবর্দ্দি খাঁ সেরাজের বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন—দশ বৎসর বয়সের বালকের বিবাহ মুসলমান নবাবের সংসারে অসম্ভব না হইলেও এই বৎসরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্ব দিয়া প্রাণের পুত্তলি দৌহিত্রকে কেবলমাত্র রাজা জানকীরামের নিকট দূরবর্ত্তী স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মোহময় বৃদ্ধ মাতামহের পক্ষে কত দূর সঙ্গত! তৎস্থলে ইহাও সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিলে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার বুদ্ধি ও সামর্থ্যলাভ সেরাজের ন্যায় বালকের পক্ষে সম্ভবিতে পারে না। অধিকন্তু মার্শমান সাহেব লিখিয়াছেন, রাজ্যপ্রাপ্তি কালে সেরাজের বয়স চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল * তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। ইহাই বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত বয়স; এ বয়সে যদি কাহার বিবেক-বুদ্ধির সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালে তাহার আর হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব অল্প বয়স্ক বলিয়া যে একটা মার্জ্জনা তাহা তাঁহার প্রাপ্য নহে। সেরাজ-চরিত্রের কোন অংশে মহত্ত্বের লেশ মাত্র নাই। আর তিনি বড় ঘরের ছেলে হইয়া যে নিতান্ত অজ্ঞান, অব্যবস্থিত ও অধঃপতিত, ইহা ভিন্ন তাঁহার জন্য কিছুতেই মন কাঁদে না। এরূপ ব্যক্তির জন্য অকারণ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিবার আড়ম্বর অনুষ্ঠানই বা কেন?—যদিই কোন মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার চরিত্রের অসারতা সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন কেহই নাই যে তাঁহার দুষ্কৃত কার্য্যের উল্লেখে ক্ষান্ত আছেন।

এই বৎসরই সেরাজ আরও কয়েকটী দুষ্কার্য্য সম্পাদন করেন। তাহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, হোসেন কুলি খাঁ নামে তাহার একজন নায়েব ছিলেন, তাঁহার প্রতি সেরাজের ঘোরতর আক্রোশ ছিল, তিনি তাঁহাকে স্ববশে, বিনষ্ট করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঢাকায় দূত প্রেরণ করেন, সেই ব্যক্তি সুস্পষ্ট দিবালোকে হোসেনকুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করিয়া চলিয়া আইসে। অতঃপর সেরাজ হোসেনের প্রাণ-বধের জন্য মাতামহের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহাতে তিনি বলেন "—তাহার প্রভু নিবাইশের অনুমতি ব্যতীত তাহা হইতে পারে না।" আলিবর্দ্দি জানিতেন, সেরাজ যাহা ধরিয়াছে তাহা ছাড়িবার পাত্র নহে। তিনি এ দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়া রাজমহলে মৃগয়া যাত্রা করিলেন। বৃদ্ধা নবাব-মহিষী এবং নিবাইশের পত্নী উভয়ে হোসেন কুলির জীবন

* "His (Ali Vardi's) throne was now filled by a youth of twenty four: proud, cruel, weak and profligate who had no other object of life but his own pleasure."—

রক্ষার জন্য কতই অনুনয় বিনয় করিলেন, সেরাজ তাহাদের সমক্ষে সম্মত হইলেন, কিন্তু আসিবার সময় পথিমধ্যে হোসেন কুলি খাঁকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া ঘাতক দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে, তাঁহার অন্ধ ভ্রাতাও তৎসহ বিনষ্ট হইলেন। রাজা রাজবল্লভ নিবাইশের অন্যতর নায়েব—তাঁহার প্রতিও সেরাজের কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ এই সময়ে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন, সেরাজ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এই দুই ব্যক্তিই নবাব সরকারে চাকরী করিয়া অসদুপায়ে বহুল ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু জজ্জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। নবাবী আমলে কে না এরূপ বড় মানুষ হইয়াছেন? পিতার বন্দীত্বের সংবাদ পাইয়া রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস কলিকাতার গবর্ণরের নামে কাশিনবাজারস্থ ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবের পত্র লইয়া ধন সম্পত্তি ও পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে তথায় প্রস্থান করেন।

এই বৎসরেই নিবাইশ মহম্মদ এবং সৈয়দ আমেদ নামক ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় কাল-কবলিত হইলে শোকতাপে ও সেরাজের অত্যাচার জনিত মনোদুঃখে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলিবর্দ্দি খাঁ ইহলোকলীলা সম্বরণ করেন। পরদিনই সেরাজ মাতামহের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তিনি সদাচার ও সাধুশীল হইলে এতদুপপক্ষে কতই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন—কিন্তু করিলেন কি—স্বীয় পিতৃব্যপত্নী ও মাতৃস্বসা নিবাইশ-পত্নীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন—এবং অবিলম্বেই কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিবার জন্য কলিকাতাস্থ ইংরেজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। মেদিনীপুরের রাজা রামনারায়ণের ভ্রাতা তৎকালে নবাব সরকারে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই পত্র খানি লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার পদোচিত কোনই আড়ম্বর ছিল না, একখানি সামান্য নৌকারোহণে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উমিচাঁদের বাটীতে অবস্থান করেন।

উমিচাঁদ একজন উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী। তিনি কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর অধীনে ঠিকাদারী করিয়া প্রভূত অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন ক্রমে তাঁহার কার্য্যে শঠতা প্রকাশ পাইলে ইংরেজগবর্ণর তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এজন্য তিনি মনে করিলেন ইহাতে উমিচাঁদের কোনরূপ চাতুরী আছে, এই ভাবিয়া নবাবদূতকে প্রতারক বলিয়া অবজ্ঞা করিলেন, এবং পত্রেরও কোন উত্তর দিলেন না। এরূপ অবাধ্যতা ও অভদ্রতা প্রকাশ ইংরেজ গবর্ণর ড্রেকের পক্ষে উপযুক্ত হইলনা। প্রকৃত প্রস্তাবে সে ব্যক্তি যদি প্রতারকই হইত, তাহা হইলেও উত্তর দিবার কি প্রত্যবায় ছিল। ড্রেকের এইরূপ ও অন্যরূপ অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ইংরেজকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

অদ্য আমরা সেরাজদ্দৌলার চরিত্র বিষয়ক কয়েকটী কথা বলিয়া প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা যদিই তাহার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা বর্ণনা না করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া সেরাজকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক স্থির করা যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না। মুসলমান লেখকের লিখিত ইতিহাসে তাহার দুষ্কার্য্যের তালিকা পাওয়া যায়। সেরাজ ও ক্লাইভ উভয়ের সহিতই আমাদের সমান সম্বন্ধ। এখন সেরাজও বেখানে, ক্লাইভও সেখানে। উভয়েই আপনাপন সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের দোষগুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া একদেশদর্শিতা প্রদর্শনে আমাদের সেকেলী কলঙ্কিত করায় কোনই লাভ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের পক্ষপাতিতা দোষ প্রদর্শন করিতে পারিলে গৌরব আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের দোষ দেখাইতে গিয়া আমাদিগকে সেই দোষে দূষিত হইতে না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে "অন্ধকূপ হত্যার" সত্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

নবাবদূত কলিকাতা হইতে ফিরিয়া না যাইতে যাইতেই কলিকাতাস্থ ইংরেজ গবর্ণরের নিকট নবাবের আর এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে নবাবের আদেশ ছিল যে, ইংরেজেরা কলিকাতা দুর্গের সংস্কার করিতে

পারিবেন না, বরং পুরাতন যাহা আছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে এবং কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিতে হইবে। এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ফরাসীতে বিলক্ষণ মনোমালিন্য জন্মে তৎসূত্রে সত্বরেই উভয় জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ স্থলে এদেশেও যে বিবাদ উপস্থিত হইবে, তাহা সুনিশ্চিত জানিয়া কলিকাতার গবর্ণর দুর্গ সংস্কারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন না, বিশেষতঃ বহুদিন ধরিয়া ইংরেজ বণিকদিগের যুদ্ধবিগ্রহের শঙ্কা না থাকায় দুর্গের সংস্কার কার্য্য উপেক্ষিত হইয়াছিল।

ইতিহাসের উক্তি এই যে, এই সময়ে সেরাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজ্যের পদস্থ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁর অন্য দৌহিত্র, সৈয়দ আমেদের পুত্র সফৎজঙ্গকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পদে সংস্থাপিত করা স্থির করিয়াছিলেন। সেরাজ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া সফৎজঙ্গের উচ্ছেদ সাধনার্থ সসৈন্যে পূর্ণিয়া যাত্রা করিবার স্থির করিয়াছেন এমন সময় কলিকাতা হইতে ড্রেক সাহেবের অবাধ্যতাসূচক পত্র পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"নবাবের আজ্ঞা কোন মতেই প্রতিপালিত হইতে পারে না।" যত দিন মনুষ্যের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন থাকেন, তত দিন তিনি অন্যায় করিলেও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না। তদ্বিপরীতে তাঁহার ন্যায্য আদেশও অবজ্ঞাত। যৎকালে দীল্লির বাদসাহ ফেরেকসের ইংরেজদিগকে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী আটত্রিশ খানি গ্রাম প্রদান করেন, তৎকালে মুর্শিদকুলিখাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি সম্রাটের অনুমতির প্রতিকূলে আপন অধীন জমিদারগণকে আজ্ঞা দিলেন—"ইংরেজ কোম্পানী সূত্যগ্র ভূমি দখল করিতে না পারেন, তাঁহাদের যাহা আছে তাহাই থাকিবে।" কার্য্যতঃও তাহাই হইল, মুর্শিদকুলিখাঁ জীবিত থাকিতে দীল্লির বাদসাহের প্রদত্ত আটত্রিশ খানি গ্রাম ইংরেজ কোম্পানী দখল করিতে পারেন নাই। সেরাজের সে বল বিক্রম কিছুই ছিল না, তাই ড্রেক সাহেব অনায়াসে তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

কিন্তু সেরাজ নিরস্ত হইলেন না, তিনি এই অবজ্ঞাসূচক উত্তরে পেশিতপুচ্ছ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—আর পূর্ণিয়া যাওয়া হইল না, সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্পমাত্র বিলম্ব না করিয়া কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠি লুঠিয়া লইলেন এবং সেখানকার ইংরেজ কর্ম্মচারীগণকে বন্দী করিয়া কলিকাতাভিমুখী হইলেন। কলিকাতা-দুর্গে ইংরেজদিগের যুদ্ধের উপযোগী কোন উপকরণই ছিল না, সৈন্যসংখ্যাও ৫৪০, তন্মধ্যে ১৭৪ জন মাত্র ইংরেজ। তাহারাও বন্দুক ধরিতে জানিত না। সেরাজের সৈন্য ৫০ হাজার। ইংরেজ গবর্ণর বিষম বিপাকে পড়িলেন, অবিমৃষ্যকারিদিগের পরিণামে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও তাহাই ঘটিল। হিংসা দ্বেষের বশীভূত হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া যে সকল ব্যক্তি হঠকারিতার অনুবর্ত্তী হয়, পশ্চাৎ তাহাদিগকে আপনাদের কৃতকার্য্যের জন্য নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইয়া থাকে। ড্রেক সাহেবকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল। এখন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিরশত্রু হইলেও বিদেশের মিত্র অপেক্ষা স্বদেশের শত্রুর সহায়তা শ্লাঘনীয় বোধে তিনি চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজ এবং চন্দননগরস্থ ফরাসীদিগের সাহায্যার্থী হইয়া তাহাতেও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। ওলন্দাজেরা একবারেই এপ্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন, ফরাসীরা বলিলেন—"ফরাসডাঙ্গায় আড্ডা উঠাইয়া লইয়া যাইলে তাহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।" তখন নিরুপায় হইয়া ড্রেক নবাবের ক্রোধশান্তির জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, এবং কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ না করিলে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবাব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল ইংরেজদিগকে কলিকাতা হইতে একবারে উঠাইয়া দিবেন, ইংরেজ নামে পরিচয় দিতে কলিকাতায় এক জনকেও রাখিবেন না। উষ্ণ মস্তিষ্ক মুসলমান যুবক যদি—"মারা অপেক্ষা ধমকান ভাল" কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকাল, বোধ হয়, কিছু বৃদ্ধি পাইলেও পাইতে পারিত। তিনি ড্রেক অপেক্ষা সমধিক হঠকারী, সুতরাং তাঁহার নিকট এরূপ ব্যবহার একেবারেই প্রত্যাশা করা যায় না। সেরাজ সহিষ্ণুতার পাঠ কস্মিন কালেও অভ্যাস করেন নাই, বিনয়

ও শিষ্টাচারের অর্থও পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় নাই, বিবেকের আশ্রয় কেমন তাহা জানিতেই পারেন নাই। তাঁহার জেদ হইল কলিকাতা আক্রমণ করিবেন।

ক্রমে সেরাজ-সৈন্য কলিকাতার সমীপবর্ত্তী হইল। ১৭ই পৌষ নবাব কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বাগবাজারে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। মুসলমানের আগ্নেয়াস্ত্র ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। শত্রুসৈন্য কলিকাতা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পরদিন ১৮ই জুন কলিকাতা নবাব হস্তে পতিত হইল, দুই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নবাব অধিকার করিয়া বসিলেন। বহুল ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট এবং অনেকেই আহত হইল। ইংরেজেরা নগর ত্যাগ করিয়া সকলেই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ বড় বড় ঘরগুলি আগুনে জ্বলিতে লাগিল। দুর্গমধ্যে একটী সামরিক সমিতির বৈঠক হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিরা একবাক্যে সকলেই বলিলেন—পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দুর্গমধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় এতাধিক লোক সমাবেশ হইয়াছিল যে, অবরোধে অবস্থিত হইলে সঞ্চিত খাদ্যে এক সপ্তাহও চলিতে পারিত না। এজন্য স্থিরীকৃত হইল যে রাত্রি প্রভাত হইলেই সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে পরে অন্যান্য সকলকে সরাইতে হইবে। দুর্গসমীপে যে একখানি জাহাজ ছিল, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে তাহাতেই গিয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, কেহ কাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে প্রস্তুত নহে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে লাগিল, ড্রেক শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। কাজে কাজেই পলায়নেও শৃঙ্খলা রক্ষা হইল না, সকলে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে মানে মানে পলায়ন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। সম্রাট আরঙ্গজেবের আমলে তিনজন ইংরেজ সৈনিকের সহিত হুগলীর বাজারে নবাব সেনার সংঘর্ষ হইলে ক্রোধোদ্দীপ্ত সম্রাট যখন ইংরেজের দণ্ড বিধানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন সুচতুর জব চার্ণক সাহেব হুগলী কুঠির কর্ত্তৃত্ব করেন। তিনি আপনার আশ্রিত অনুগত সকলকে লইয়া প্রথমে সুতানুটীতে—সেখানে নিরাপদের সম্ভাবনা না দেখিয়া একবারে হিজলি কাঁথিতে পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করেন। এবার ড্রেকের কর্ত্তৃত্ব—তিনি একটুকু বুদ্ধি কৌশল দেখাইতে পারিলে সব দিক রক্ষা পাইত। কেহই ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ হইলেন না, মানিংহাম ও ফ্রাঙ্কোলও নামে দুইজন সিবিল কর্ম্মচারীর প্রাণে বড়ই ভয় জন্মিল, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিবার ব্যপদেশে গিয়া আর ফিরিলেন না। ইহাতে অপরাপর লোকও বড় ব্যস্ত হইল, কেহই আর দুর্গে রহিতে রাজি হইল না। সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে জাহাজের দিকে দৌড়িতে লাগিল, কেহ কাহার মুখ চাহিল না সকলেই "ব পলায়তি স জীবতি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনে ব্যাকুল। মার্শম্যান বলেন গবর্ণর ড্রেক এবং সেনাপতি মিঙ্কিন দুই জনে এই রাত্রেতেই প্রস্থান করেন, বস্তুত তাহা নহে। সেই ১৮ই জুনের রাত্রিতেই সেই জাহাজ খালি নঙ্গর তুলিয়া দুই ক্রোশ দক্ষিণে চলিয়া গিয়া ভাগীরথী বক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইংরেজের অন্যান্য জাহাজ ও নৌকা সমস্তই হাওড়া বালী প্রভৃতি স্থানে গিয়া নঙ্গর করিল।

১৯এ জুনের প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রায় অর্দ্ধেক ইংরেজ দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করা স্বত্বে তাঁহাদের রক্ষার ভার যাঁহাদের উপরে সেই ড্রেক ও মিঙ্কিন সাহেবও সরিয়া পড়িলেন। ইহাতে দুর্গস্থ সকলে অনন্যোপায় হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন একজনকে কর্ত্তৃত্ব দিবার প্রয়োজন হইল, যিনি প্রবীণ মেম্বর ছিলেন, তিনি আপন দাবি ত্যাগ করিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমে হলওয়েল সাহেবই কর্ত্তৃত্বের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন। কলঙ্কের পসরা মাথায় লইবার জন্যই হলওয়েলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ, কিন্তু উপায় কি—না হইলেও চলে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষার কোন আশাই ছিল না, আশা ছিল একমাত্র পলায়নের—যতক্ষণ তাহার সুবিধা না ঘটে, ততক্ষণ দুর্গ রক্ষা না করিয়াই কি করেন, অগত্যা বল না থাকিলেও তাহাতে ক্ষান্ত থাকা চলিল না। চিৎপুরে গঙ্গার উপর "রয়েল জর্জ্জ" নামে ইংরেজের আর একখানি জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, দুর্গস্থ সকলেই মনে করিতেছিল যে তাহার দ্বারাই পলায়নের উপায় হইবে। জাহাজ খানিকে দুর্গসমীপে আনিবার জন্য বারম্বার সংবাদ দেওয়া হইল, লোকও পাঠান হইল, জাহাজের কাপ্তেন সাহেবও তাহাতে প্রস্তুত হইলেন, নাবিক ভাবিল যখন যাবতীয় পদস্থ ব্যক্তি সকলেই প্রাণ লইয়া পলাইয়া

আসিয়াছেন তখন না জানি দুর্গের নিকটস্থ হইলে কোন না কোন বিপদ ঘটিবে, এই ভয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইয়া, জাহাজ চালাইতে গিয়া তাহা চড়ায় লাগাইয়া দিল। তখন আশার আলোক একবারে নিভিয়া গেল। তবে পলায়িত ব্যক্তিগণ এখন নিরাপদ হইয়া সুস্থির মনে যদি ভাবিয়া দেখে যে দুর্গস্থ সকলে নিষ্ঠুর নবাবের ক্রোধাগ্নিতে নিশ্চিতই ভস্মীভূত হইবে, তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না, তাহা হইলে যদি কোন উপায়াবলম্বন করে —কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবিল ভীরুর ন্যায় যখন তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে, তখন আর তাহারা শত্রুর সমীপস্থ হইতে সাহস করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া দুর্গস্থ সকলে বড়ই মুহ্যমান হইল। দুইদিন কাটিয়া গেল। দুর্গ হইতে পুনঃ পুনঃ বিপদের নিশান দেখান হইতে লাগিল—হাহাকার শব্দ উঠিল, শত্রু বেষ্টিত নগরে অগ্নিশিখা উঠিতে লাগিল। শত্রু সৈন্যের কামান ধ্বনিতে দূরস্থিত লোকে বিপদ বুঝিতে পারিল, তথাপি কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না, পলায়িত ইংরেজেরা যেন মন হইতে মনুষ্যত্বকে অপসারিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।* এই ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন—যদি পনর জন সাহসী পুরুষ একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া দুর্গ পার্শ্বে লাগাইতে পারিত তাহা হইলে শত্রুগণের সহস্র চেষ্টা স্বত্বেও দুর্গস্থ সকলেই পরিত্রাণ পাইতে পারিত, কিন্তু তাহারও অভাব হইল।

১৯শে জুন রাত্রিকালে দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ গৃহগুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। মার্শম্যান সাহেব বলেন—নবাব সৈন্য ঐ দিন দুর্গ আক্রমণ করিয়া কিছুই করিতে না পারিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, একথা পাগলের প্রলাপোক্তির ন্যায়—ক্লাইবের ন্যায় কৃতকর্ম্মা ব্যক্তির হস্তে দুর্গভার থাকিলেও একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া হলওয়েল যে ৫০ হাজার শিক্ষিত সৈন্যের পরাভব সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা মনেও করিতে পারা যায় না।

ইংরেজ ইতিহাস লেখকই বলিয়া গিয়াছেন—কামান মরিচা ধরা, বারুদ ভিজা, সৈনিক বলিয়া পরিচয় দিতে যাহারা ছিল তাহারা কেমন করিয়া বন্দুক ধরিতে হয় তাহাই জানিত না। † এরূপস্থলে দুই দিন বল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তবে ইংরেজ হস্তে কলিকাতা দুর্গস্থ সকলে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল ইহা কেবল তাহাদের জাতীয় গৌরব রক্ষার চেষ্টা মাত্র।

বোধ হয় ষ্টুয়ার্ট সাহেবই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া থাকিবেন, তখন এ দেশের লোকে ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা অতি অল্পই করিত, যৎকালে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারবাহুল্য ঘটিতেছিল, সেই সময়ে মার্শম্যান সাহেবের লিখিত ইতিহাসই স্কুল কলেজে পঠিত হইত। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা স্কুলগুলি সংস্থাপিত হইলে সর্ব্ব প্রথম পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ঐ দুই খানি গ্রন্থই মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত, তৎকালে ঐতিহাসিক তত্ত্বের গবেষণা আজি কালিকার মত সহজ-সাধ্য ছিল না—অস্মি, মিল প্রভৃতির ইতিহাসেরও এরূপ প্রচার বাহুল্য ছিল না, ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল পাঠ্য মার্শম্যানের ইতিহাসে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই অনুবাদ করিয়াছেন, এবং তাহাই স্কুলের বালকেরা অভ্রান্তজ্ঞানে অভ্যাস করিয়া গিয়াছে, কিন্তু মার্শম্যান সাহেব যে স্বকপোল কল্পিত অনেক কথা তাহার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বসিয়া আছেন, তাহা অনেকেই ভাল করিয়া দেখেন নাই। পাঠক পাঠিকাগণ ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।

* For two entire days did the fugitives look upon those signals, while the flames which burst from all parts of the town testified still more amply to the distress of their country men, and the continual firing of the enemy told of their increasing danger. Without making a single effort to answer the calls upon their humanity or to inter-pose the slightest assistance,—

Marshman's History of Bengal.

† There were scarcely any among them who knew the right from the wrong end of their muskets—

Thornton's History of British Empire in India.

২০এ জুন * নবাব সৈন্য পুনরায় কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ করিল। নবাবের সেনাপতি হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন—মিরজাফর, বীরভূমের রাজা আলি নাকি খাঁ, তদীয় সোদর আসদ জম্মা খাঁ, দেওয়ান মানিকচাঁদ ও মোহনলাল। মার্শম্যান সাহেব বলেন—হলওয়েল উপায়ান্তর না দেখিয়া নবাবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তদনুসারে নবাব-শিবির হইতে যুদ্ধ বিরতির নিশানা প্রদর্শিত হইলে, ইংরেজ সৈনিকেরা সুরাপানে উচ্ছৃঙ্খল ভাব অবলম্বন করে, এই সুযোগে বিশ্বাস-হননপূর্ব্বক নবাব সৈন্য দুর্গ দখল করিয়া লয়। ঐতিহাসিক মারেরও প্রায় এইরূপ কথা, কিন্তু থরণ্টন বা অন্য কেহ এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। তাহা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় নবাব সেরাজউদ্দৌলা ডুলিতে চাপিয়া বাগবাজারের শিবির হইতে কলিকাতা দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার সেনানী কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। তথায় তিনি দরবার করিয়া কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাঁহারা উভয়েই উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদাস নবাবের মনোভাব বেশ বুঝিতেন। তিনি তাঁহার ক্রোধোপশমনের সুকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহা না হইলে এত ক্রোধ, এত বিদ্বেষ একবারে কিসে গেল। উন্নতফণসর্প গর্জ্জিয়া দংশনোদ্যত হইয়াছিল, নতশির হইল কি উপায়ে। সেরাজ কৃষ্ণদাসকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দানে পরিতুষ্ট করিলেন। ইহাও সেরাজ চরিত্রের অব্যবস্থিতির পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! অজাযুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে যেমন বহু আড়ম্বর লঘুক্রিয়ায় পরিণত হয় ইহাও সেইরূপ হইল। কৃষ্ণদাসের প্রতি নবাবের ক্রোধশান্তি হইল, কিন্তু ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। যে কৃষ্ণদাসকে লইয়া ইংরেজ সেরাজের শত্রু, তাঁহাদের প্রতি পূর্ব্বভাবের অপচয় হইল না, ব্যাপার অত্যদ্ভুত সে পক্ষে সন্দেহ নাই। নবাবের বিশ্বাস কৃষ্ণদাসের পিতার সঞ্চিত অর্থ অসদুপায়ার্জ্জিত, সেই অর্থ বাজেয়াপ্তির জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আশ্রয় না দেওয়া হয়। তদর্থ গবর্ণরকে অনুরোধ—সেই অনুরোধ রক্ষা হয় নাই—একে মুসলমান নবাব তাহাতে সেরাজ উদ্দৌলা। কৃষ্ণদাস যে তাঁহার নিকট মাথা বাঁচাইয়া ফিরিতে পারিবেন, যতক্ষণ তাঁহার পারিতোষিক না হইয়াছিল ততক্ষণ কেহ কি তাহা মনেও করিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক কৃষ্ণদাসের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইংরেজ জাতিরও বটে, নয় কেবল সেদিনের কতকগুলি অল্পায়ুঃ ইংরেজ কয়েদীর।

হলওয়েলকে বাঁধিয়া নবাবসমীপে উপস্থিত করা হইল। সেরাজ তাঁহার বন্ধনোন্মচনের আজ্ঞা দিলেন। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে "দুষ্ট গৃহস্থের দংশনশীল কুকুর" নবাবকর্ম্মচারীগণ হলওয়েলের বন্ধনে তাহারই পরিচয় দিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে অভয় দিলেন, তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই তাহাও বলিলেন, কেবল অবাধ্যতা প্রদর্শন জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন মাত্র এবং সঞ্চিত টাকা যাহা কিছু আছে বাহির করিয়া দিবার জন্য ধমকাইতে লাগিলেন। রাত্রি সাতটার পর তিনি শিবিরে প্রস্থান করিলেন—সে রাত্রির জন্য দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর দুর্গ রক্ষার ভার রহিল।

অতঃপর অন্ধকূপ হত্যার ব্যাপার। আজি কালিকার কোন কোন নবীন লেখক বলেন—নবাবের কলিকাতার লীলা খেলা এই খানেই শেষ, অতঃপর আর কিছু হয় নাই, নবাব পিতার শিষ্টশান্ত সুপুত্রের ন্যায় দুর্গলুণ্ঠিত কিছু অর্থ লইয়া আপনার রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরে প্রত্যাগমন করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সেরাজ চরিত্র অতি ঘৃণ্য পতিপন্ন করিবার জন্যই "অন্ধকূপ ব্যাপার" অতি রঞ্জিত করিয়াছেন। নতুবা অন্ধকূপহত্যা আদৌ হয় নাই। সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক যাহা ইতিহাসে পাওয়া যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার আপত্তি নাই পশ্চাৎ তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বহুদিন পূর্ব্বে "অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ" নামে একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাও আজি কালি দুষ্প্রাপ্য,

* মার্শম্যান সাহেব আপনার ভারতেতিহাস লিখিবার সময় লিখিয়াছেন ইহা ২১এ জুনের ঘটনা, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন ২০এ জুনের। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই ২০এ জুনের কথা লিখিয়াছেন। এত বড় একটা ঘটনা সম্বন্ধে আরও গোলযোগ, পশ্চাৎ পাঠকগণকে সকলের কথা উদ্ধৃত করিয়া শুনাইব।

তাহাতেও সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। ভারতের বা বঙ্গদেশের যে সকল ইতিহাস অনুবাদিত বা সংকলিত হইয়াছে তাহাদের কোনটীতেই এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এ জন্য যত দূর সম্ভব তত দূর লিখিবার দোষ কি।

নবাব বাগবাজারে চলিয়া যাইলে ইংরেজ কয়েদীদিগকে রাখিবার জন্য স্থানান্বেষণ হইতে লাগিল। অনুসন্ধানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল উপযুক্ত স্থান মিলিল না। বন্দীগণকে কোথায় কিরূপে রাখিতে হইবে নবাব তাহার কোন কথাই কাহাকেও বলিয়া যান নাই—অন্ততঃ ইতিহাসে একথার কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি তাহাদিগকে যে অবরোধে রাখিতে হইবে ইহারও বিশ্বস্ত প্রমাণের অভাব। থরণ্টন বলেন—উপযুক্ত স্থান না পাইবার কথা প্রকৃত, কি ভান তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। (Difficulty was found, or pretended, in discovering a proper place of security) অতঃপর দুরন্ত ইংরেজ সৈনিকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাহাদিগকে কয়েদ করিবার একটী ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, তাহাতেই অদ্য রাত্রিতে সমস্ত কয়েদীদিগকে রাখাই স্থির হইল। ঘরটী অতি ক্ষুদ্র তাহাতে দুই চারি জন মাত্র সুবিধা মত থাকিতে পারে। কেহ বলে তাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২০ ফিট, কেহ বলে ১৮ × ১৪ ফিট মাত্র। সৈনিকেরা ইহাকে অন্ধকূপই বলিত। তাহার এক দিকে ছোট দুইটী মাত্র জানালা ছিল, তাহা দিয়া স্বাধীন ভাবে বায়ুর গতিবিধি হইত না। এই সংকীর্ণ গৃহে একটী স্ত্রীলোক এবং বারটী আহত সৈনিক সমেত ১৪৬ জনকে অবরুদ্ধ করা হইল। যে ব্যক্তি শেষে গৃহ প্রবিষ্ট হইল তাহাকে বল পূর্ব্বক প্রবিষ্ট করাইতে হইয়াছিল। সকলে সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারিল না, ঠাসা ঠাসি হইল। অনেকেই অনেক প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু সে কথা শোনে কে? যাঁহার উপর দুর্গের কর্ত্তৃত্ব ভার ছিল, তিনি হুকুম দিলেন "যে না যাইতে চাহে তাহার মাথা কাটিয়া ফেল।" যদিও মাথা কাটিয়া ফেলা এবং সেই দারুণ দুঃসহ আষাঢ় মাসের গ্রীষ্মে সেই ক্ষুদ্র গৃহে ১৪৬ জনের অবস্থিতি উভয়ই তুল্য তথাপি জীবন সম্বন্ধে তিল মাত্র সময়কে তাহার সহস্র গুণ বেশী বলিয়া বোধ হয়। জীবন যতক্ষণ থাকে ততই মঙ্গল এই ভাবিয়া সকলেই তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

আষাঢ় মাসের রাত্রি, বৃষ্টি নাই, থাকিলেও তজ্জনিত শৈত্যানুভূতি ক্ষণিক মাত্র। গাছের পাতা নড়ে না, দারুণ জলাশয়ের জলও কাঁপেনা, বায়ুর সঞ্চার একবারে বন্ধ। দারুণ দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্য, তাহাতে প্রাণবায়ু বিকল না হইয়া থাকে না। তাহাতে ক্ষুদ্র গৃহে বহুলোকের অবস্থান, প্রশ্বাস দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যেই গৃহস্থিত বায়ু বিষবৎ হইয়া উঠিল; সকলেরই তাহা অসহ্য হইল সকলে মিলিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিবার জন্য বল প্রকাশ করিতে লাগিল। কপাট ভিতর হইতে সহজে খুলিয়া ফেলিবার নহে; যেহেতু তাহার চৌকাট বাহিরের দিকে। সকলেই অশিষ্ট উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। হলওয়েল একটী জানালার নিকট দাঁড়াইতে পাইয়াছিলেন, তিনি সকলকেই অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজি রাত্রিতে জীবিত থাকিতে হইলে সকলকেই কায়মনে সংযত ও সুস্থির থাকিতে হইবে, তাহা হইতে যে সকলে রক্ষা পাইবে, তাহার নিশ্চয় নাই তবে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল, আর শশব্যস্ত ও অধীর হইলে অনেককেই প্রাণ হারাইতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত।" তাঁহার অনুরোধে কিয়ৎকালের জন্য রক্ষা পাইল, কিন্তু সে অবস্থায় সুস্থির থাকা অসাধারণ ধৈর্য্যশীলের কাজ, দুর্দ্দান্ত গোরারা সহজেই চঞ্চল, যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তাহারা সকলেই অশিষ্টতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। হলওয়েল জানালা দিয়া একজন বৃদ্ধ জমাদারকে দেখিতে পাইলেন, সেই তখন পাহারার কর্ত্তৃত্ব করিতেছিল। হলওয়েল অতি কাতরভাবে তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, যদি কোন উপায়ে তাঁহাদিগকে আর একটী ঘরে ভাল করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তিনি রাত্রি প্রভাতে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। জমাদারের প্রশান্ত মুখশ্রীতে হলওয়েলের আশার উদ্রেক হইয়াছিল, তাই তিনি এরূপ প্রস্তাবে সাহসী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ জমাদার তাঁহার কথা শুনিয়া কিয়ৎকালের জন্য কোথা চলিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল "নবাবের হুকুম ব্যতীত তাহা হইতে পারে না।" অনুমান হয় কয়েদীদিগের সম্বন্ধে যেন নবাবের কোন রকম হুকুম দেওয়া ছিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। হলওয়েল ভাবিলেন বুঝি জমাদারেয়

লোভ বেশী তিনি পুনরায় দুই হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিলেন। জমাদার আবার চলিয়া গেল, আবার আসিয়া বলিল "নবাব নিদ্রিত, কেহই তাঁহাকে জাগাইতে সাহসী নহে।"

অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হইবার পরক্ষণেই অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের অনবরত ঘর্ম্মোদ্গম হইতে থাকে, তৎপরেই প্রবল পিপাসা, বক্ষে বেদনা, শ্বাস-কষ্ট, আরম্ভ হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি, প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, বায়ুর জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই গাত্রবসন উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল আপনাপন টুপি গুলি দ্বারা বায়ুর উদ্বোধনে প্রয়াস পাইল। প্রতীকার পাওয়া গেলনা তখন সকলেই "গুলি করিয়া মারিয়া ফেল—গুলি করিয়া মারিয়া ফেল, তাও ভাল।" বারম্বার এইরূপে আর্ত্ততা জানাইতে লাগিল। শেষে পরামর্শ স্থির হইল—সকলে একই সময়ে বসিয়া, কিছু ক্ষণের পর সকলেই এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলে, হয়ত সুবিধা হইতে পারিবে। উপর্য্যুপরি তিনবার সেইরূপ করিতে করিতে কয়েক জন বসিয়া আর উঠিতে পারিল না, অন্যের পাদপিষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইল। অতঃপর আবার সকলেই জানালার নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। পুনরায় দ্বার ভঙ্গের চেষ্টা হইল, তাহাতে ব্যর্থ হইল। অতঃপর কেবল "জল, জল" এই শব্দ উঠিল; বৃদ্ধ জমাদারের প্রাণ কাঁদিল। সে দুই তিন ভিস্তি জল আনাইয়া জানালা দিয়া দিতে লাগিল,* কিন্তু তাহাতে যাতনার হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি পাইল। জল দেখিয়া সকলেই "আমি আগে আমি আগে" এইরূপে জল লইতে গিয়া, কেহ ভূমিতে পড়িয়া মারা গেল, কেহ শ্বাসাবরোধে ভূলুণ্ঠিত হইল, আর উঠিতে পারিল না। জলের জন্য এতই ব্যাকুলতা যে তিলার্দ্ধ কাল কেহই বিলম্ব সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। একে একে সকলকে দিতে পারিলে এরূপ ঘটিত না। জল আজি জীবনের বিনিময়ে বিকাইয়া জীবন নাম সার্থক করিয়া লইল। নবাব সেনার কেহ কেহ, বোধ হয়, জানালার ভিতর দিয়া আলো ধরিয়া গোরাদের জল কাড়াকাড়ি দেখিয়াছিল হয়ত কোন কোন নিষ্ঠুর কৌতুক বোধে হাস্যও করিয়া থাকিবে। তাই ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃদ্ধ জমাদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "দয়ার পরিবর্ত্তে তামাসা দেখিবারই জন্য অত্যল্প জল জানালার গরাদের ভিতর তাহারা দিয়া দিয়াছিল। পরিশেষে যাহারা জানালার কাছে ছিল তাহারা টুপিতে করিয়া জল লইয়া পশ্চাতের লোকদিগকে দিতে লাগিল। জলে পিপাসা শান্তি হইল না। বহির্বায়ুর অভাবে প্রাণ বায়ু বিকল হইয়া পড়িল।

রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে অন্ধকূপে অবরুদ্ধ অনেকেই প্রাণ হারাইল। দুইটার সময় পঞ্চাশ জন মাত্র রহিল। কি ভয়ানক দুর্ঘটনা। ইহা অপেক্ষা ফাঁসি বা শূলে চাপাইয়া মারিলেও তাহাদিগের এত যাতনা হইত না। এই সর্ব্বংসহা ধরিত্রী পৃষ্ঠে এরূপ অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে যাহাতে নরশোণিতের নদী বহিয়া গিয়াছে কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্করী প্রাণাপহা ঘটনা কোথাও ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। আষাঢ়ের হ্রস্ব তমস্বিনী অন্ধকূপাবরুদ্ধ কয়েদীগণের পক্ষে দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাত্রি যেন আর ফুরায় না। ক্রমে হলওয়েল হতচেতন হইয়া পড়িলেন, তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছিল; ঊষার ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে পূর্ব্বাশার পরিষ্কৃত হইতে না হইতেই কয়েদীগণ মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রহরীদিগের কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কৌন্সিলের সেক্রেটরী কুক সাহেব ভাবিলেন হলওয়েলের কথা বেশী ভার বোধ হইতে পারে—তিনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার আসন্ন মৃত্যু। তখনও নাসায় নিশ্বাস বহিতেছে। তাঁহাকে জানালার নিকট আনিবার চেষ্টা করিলে যাহারা সেখানে ছিল, তাহারা সরিতে চাহিল না; অবশেষে কাপ্তেন মিল্‌স আপনার জায়গা ছাড়িয়া জানালার নিকট হলওয়েলকে স্থান দিলেন। সুখ স্পর্শ সুমন্দ বায়ু সেবনে হলওয়েলের চেতনা সঞ্চার হইতেছিল, এমন সময় রাত্রি

* He applied to an old Jemadar, who bore some marks of humanity in his countenance * * * The good Jemadar immediately ordered some skins of water to be brought to the windows. Bengal obituary, Page 4.

The Jemantdars, or Indian guards, were walking before the window, and Mr. Holwell seeing one who bore on his face a more than usual expression of humanity * * * The humane Jemantdar pushed through the bars several skins of that liquid.

Murray's History of British India.

প্রভাত হইল। ধীরে ধীরে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। কি ভীষণ দৃশ্য, কারাগৃহ শ্মশানে পরিণত—শব-রাশিতে গৃহ পরিপূর্ণ—কাহার দন্ত বহির্গত কাহার নেত্র নির্গত—সেই শব স্তূপের উপর তেইশটী মাত্র অর্দ্ধমৃত মনুষ্য দণ্ডায়মান, তাঁহাদের মুখে দুঃখের চিহ্ন—গৌর-কান্তি ইংরেজের মুখশ্রী পাণ্ডুরোগীর ন্যায় প্রতিভাশূন্য—দ্বার উন্মুক্ত হইলে তাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের সুখানুভব করিল। হলওয়েল চলৎ শক্তি রহিত—নবাব সমীপে নীত হইলে নবাব তাঁহাকে বসিবার আসন ও পানীয় জল আনাইয়া দিলেন মাত্র, অন্য কোন সহানুভূতির কথা কহিলেন না।* অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা নবাবের এই মনুষ্যত্বের কথাটীও স্বীকার করিতে চাহেন না। ভারতে-তিহাসে মার্শম্যান বলেন—"নবাব বিন্দুমাত্র সহানুভূতি বা রাত্রির দুর্ঘটনার জন্য কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই বরং দুর্গস্থিত ধন অর্থ লুক্কায়িত রাখিবার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন।" কিন্তু বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তিনিই বলিয়াছেন—"এই দুর্ঘটনার কথা পৃথিবীর সকল দেশের লোকের মনে চিরদিন জাগরুক থাকিবে, কেবল ইহারই জন্য সেরাজউদ্দৌলা নিষ্ঠুরতার রাক্ষসাবতার বলিয়া গণনীয় হইবেন। কিন্তু তিনি পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। যত কিছু দোষ সমস্তই মাণিক চাঁদের তাঁহারই উপর সে রাত্রিতে দুর্গরক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল।"

ঐতিহাসিক মারে সাহেব বলেন—হলওয়েলের মনের ভাবে বোধ হয়, নবাবের এই ভয়ানক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটাইবার ইচ্ছা ছিল না, নবাবের নিম্নপদস্থ কোন কোন কর্ম্মচারী এই সুবিধা পাইয়া প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইয়া থাকিবে। আরও কয়েকজন ইংরেজ বন্দী এইরূপ কথা প্রকাশ করায় থরণ্টন সাহেব তাহাদের দেবত্ব প্রতি-পাদনের প্রয়াসী হইয়াছেন। অনেকেরই এই মত দেখিয়া ঐতিহাসিকগণের কেহ কেহ সেরাজকে অন্যান্য বিষয় লইয়া ঘোরতর অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে ত্রুটী করেন নাই। তাহাদের মধ্যে একজন লিখিয়া-ছেন—ভৃত্যের ব্যবহারেই প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। সেরাজ দুর্ব্বল ও দুর্ম্মতি না হইলে তাঁহার ভৃত্যেরা দুষ্ট ও দুরাশয় হইত না। তাঁহারা ইংরেজ কয়েদীদিগের অবরোধ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহা-দের প্রভুর অনুমোদিত হইবে না নিশ্চতই জানিতেন। সে যাহা হউক হলওয়েল যে অন্ধকূপ হইতে বহির্গত হইয়া সেরাজের নিকট এক গেলাস জল ও বসিবার আসন পাইয়াছিলেন ইহাই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি—ইংরেজ গবর্ণরের সহিত নবাবের চাক্ষুস ব্যবহার এই সর্ব্ব প্রথম।

সেরাজ দুর্গমধ্যে ৫০ হাজার টাকার বেশী পাইলেন না, মনে করিয়াছিলেন প্রভূত অর্থ লাভ হইবে কিন্তু তাহা ঘটিল না বলিয়া হলওয়েলের উপর কিছু ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবাব নয় দিন কাল কলিকাতার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিয়া দেওয়ান মাণিক চাঁদের উপর কলিকাতার সমস্ত ভারার্পণে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন, যাইবার পূর্ব্বে হলওয়েল ও আর তিন জন ইংরেজকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়া এবং অন্ধকূপ বন্দিনী সেই ইংরেজ মহিলাটীকেও তাঁহার অন্তঃপুর বাসের জন্য সঙ্গে লইয়া যান। চুঁচুড়াস্থ ওলন্দাজ ফরাসডাঙ্গার ফরাসীরাও অমনি যান নাই—নবাব তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

* Mr. Holwell being revived by the fresh air, was immediately supported into the presence of the Nabab, who in beginning the dismal tale, ordered for him a seat and a dr aught of water, but showed no other mark of sympathy.

Murray's History of British India.

When Mr. Holwell was borne into his presence, he manifested no compassion for his sufferings, nor the least remorse for the fate of the other prisoners, but reproached him a-new with the concealment of the public treasure, and ordered him to be placed in confinement.

Marshman's History of India.

Seraj-ood-dowla has passed as a monster of cruelty chiefly on this account. But he knew nothing of this deed of darkness, till the next morning. The whole blame rested on the Hindoo, manik chand, who had been left in charge of the fort for that night.

Marshman's History of Bengal.

Holwell seems of opinion that the Nabob had no actual intention of causing the dreadful catastophe, but that some inferior officers had seized this opportunity of gratifying their revenge.

Murray's History of British India.

But these apologetic suggestion, however creditable to the generosity of the sufferers, can do little to relieve the character of the man under whose authority this wholesale murder of prisoners took place. The character of the officers of government is in a great measure determined by that of those whom they serve, and if the servants of Seraj-od-dowla exercised any discretion in the choice of a prison, it may safely be concluded that their choice was made under a full impression that it would not be disagreeable to their master.

Thoronton's History, of British Empire in India.

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে কয়েকজন ইংরেজী ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থ হইতে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি এখন দেখা যাউক অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটী কতদূর প্রামাণিক, এবং তাহার প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই বা কত দূর সঙ্গত। ইংরেজ গবর্ণর হলয়েলকে অভয়দানের পর হইতে আরম্ভ করিয়া নবাবের আপন শিবিরে প্রত্যাগমন, নবাব কর্ম্মচারীর কারাগৃহ নির্ব্বাচন, ইংরেজ বন্দীগণের অন্ধকূপে প্রবেশ, দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে তাঁহাদের কাতরতা, উৎকট পিপাসার্ত্ততা দর্শনে প্রহরী জমাদারের কারুণ্য, ও তৎপ্রশমনের উপায় বিধান, অর্থলোভ বা পরদুঃখকাতরতা দর্শনে তৎপ্রতীকার চেষ্টা, পরদিন প্রাতঃকালে নবাব কর্ত্তৃক হলওয়েলের প্রতি কথঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ প্রভৃতি ঘটনা যেরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অন্ধকূপ হত্যা যে একবারে হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে কি প্রবৃত্তি হয়?—সত্য বটে অনেক ইংরেজী ঐতিহাসিক ও সমালোচক এই ঘটনাটীকে অতিরঞ্জিত করিয়া সেরাজ-চরিত্রকে অতিবড় ঘৃণিত ও কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তদুপলক্ষে অনেক অপ্রকৃত বিষয়ের সমাবেশও করিয়াছেন, সেরাজের আজ্ঞানুসারেই যে অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল এ কথা স্পষ্টতঃ বলিতে না পারিলেও ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তাহা তাঁহাদের স্ব কপোলকল্পিত। সেরাজের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাবের উত্তেজনার জন্যই যে তাঁহাদের এরূপ চেষ্টা যত্ন সে পক্ষে সন্দেহ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে সেরাজ-চরিত্রের কোন অংশই প্রশংসিত নহে, তবে অন্ধকূপহত্যা যে তাঁহার অনুমোদিত বা অনুজ্ঞাত তাহারও কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই।

শস্যবহুলা বঙ্গভূমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—স্বর্ণভূমি বলিয়া ইহা জগদ্বিখ্যাত। বঙ্গের মাটীতে সোণা ফলে একথা দিগ্দিগন্তরের লোকে জানে। পৃথিবী মধ্যে এরূপ উর্ব্বর ক্ষেত্র কুত্রাপি নাই। যে দিন হইতে ইহা পাশ্চাত্য জাতিগণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার অধিকার-লালসা তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রজ্জলিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা শৈত্যসঞ্জাত দেহ ধারণে এই কর্কট ক্রান্তির দারুণ দুঃসহ তাপে দগ্ধ হইতেও কুণ্ঠিত নহেন। বাণিজ্য উপলক্ষে এদেশে গতিবিধি করিতে করিতে তাঁহারা অসম্বৃত লোভে অস্থির হইয়া উঠেন। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ এডমিরাল নিকলসন্ ভারতাধিকারার্থ দ্বাদশ খানি রণপোত লইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেন,—"আদার ব্যাপারী" হইয়াও তাঁহারা জাহাজের সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎকালে এদেশে আরঙ্গজেবের আমল—মোগলের সৌভাগ্যসূর্য্য উগ্রমূর্ত্তিতে মৈদাগগণের উদ্ধতম বিন্দুতে বিরাজমান। "ঝোপ বুঝিয়া কোপটী" করা হয় নাই, তজ্জন্য ইংরেজকে এ যাত্রা ব্যর্থ হইতে হইয়াছিল, তথাপিও ভারতের প্রতি ইংরেজের অসম্বৃত লোভের ভ্রম পরিহার হয় নাই। তাঁহারা যে তখন হইতে ভারতের অধিকার লোলুপ ছিলেন তাহা আর কাহার কি বুঝিতে বাকী ছিল? কিছু দিন পরেই মোগলের প্রতি কমলার অকৃপা হইল, সিংহের বংশে শৃগালের উদ্ভব হইতে লাগিল। দীল্লীশ্বর হীনবল হইয়া পড়িলেন,—বঙ্গেশ্বরের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। সেরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইংরেজের নিকট হইতে রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, নবাব তাহার প্রতিকারার্থ সসৈন্যে কলিকাতায় আসিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন, পরিশেষে তাহা ভস্মীভূত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, ইহাতে শত শত ঋর্দ্ধিমান কলিকাতাবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, কত নরনারী, বালক বালিকা পুড়িয়া মরিল। অন্ধকূপ হত্যায় যে ১২৩জন ইংরেজ প্রাণ হারাইবার কথা শুনা যায়, যদি তাহা মিথ্যা হইত তাহা হইলে নবাবের অত্যাচারকে গুরু হইতেও গুরুতর করিবার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ঐ ১২৩ জনকে কলিকাতা দাহ দগ্ধ—অথবা দুর্গবেষ্টন করিয়া তাহারই মধ্যে পুড়াইয়া মারিবার কথা লিখিতে পারিতেন।

আবার অন্ধকূপের ন্যায় একটা নূতন নাটকের কি প্রয়োজন ছিল—সুচতুর চিত্রকরে রংটা একটু ভাল করিয়া ফলাইয়া কায়দার সহিত তুলিকা ধরিলে কলিকাতা দাহের চিত্রটীও বেশ উতরাইতে পারিত।

অন্ধকূপ হত্যার জন্যই ড্রেকের চরিত্র চিত্র অতিবড় বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকূপ হত্যা না হইলে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ড্রেকের কাপুরুষতা ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার জন্য তাঁহাকে এতাধিক লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করিতেন না। ড্রেকও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না। তিনি যে সকল স্বজাতীয়কে নিরাশ্রয় ফেলিয়া পলাইয়াছিলেন তাহারা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে নিন্দনীয়ও হইতে হইত না। অন্ধকূপ হত্যার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—অন্ধকূপ হত্যা সত্য হইলে ইংলণ্ডের তদানীন্তন ডিরেক্টর সভার সেরেস্তায় তৎসম্বন্ধীয় পত্রাদিও খুঁজিলে মিলিত। একথা কতদূর সঙ্গত একবার দেখা যাউক—ড্রেক সাহেব পলাইয়া যারপর নাই কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সংবাদ পাঠাইতে তিনিই এরূপ স্থলে তিনি কি লিখিতে পারেন যে—"শত্রুসৈন্যে নগর বেষ্টন করিলে আমি কমাণ্ডার মিঙ্কিনকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছি—আরও কতকগুলি লোক আমাদের পলাইয়াছিল, বাকী ১৪৬ জনকে অবরুদ্ধ দুর্গে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহাদের কি হইয়াছে কিছুই বলিতে পারি না অথবা শুনিয়াছি যে নিষ্ঠুর নবাব তাঁহাদিগকে অন্ধকূপ নামক সংকীর্ণ কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত করিয়া বিনষ্ট করিয়াছে, বাকী হলওয়েল সহ ২৩ জন বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাঁহারা কে কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছে তাহার কিছুই জানি না।" এ সংবাদ ড্রেকের লিখিয়া পাঠান কতদূর সম্ভব এবং সঙ্গতপর। হলওয়েল? তিনিত বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে—তবে আর অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ কে পাঠাইবে। মান্দ্রাজে যে সংবাদ গিয়াছিল তাহাও ম্যানিংহামের বাচনিক বলিয়াই বোধ হয়। তিনিও মান্দ্রাজ যাত্রার পূর্ব্বে অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই কিরূপে তাহা বিলাতে লিখিয়া পাঠাইবেন। এই জন্যই বিলাতের ডিরেক্টর সভার সেরেস্তার কাগজ পত্রে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সম্বন্ধে কাগজ পত্র না থাকিতেই পারে।

অতঃপর সৈর-ই-মুতাক্ষরীণ নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসের কথা—তাহাতেও অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই নাই। পাশ্চাত্য জাতির নিকটই ইহা একটা অতীব বিসদৃশ ঘটনা বলিয়া পরিগণিত, মহানুভব আকবর সাহ ব্যতীত শত্রুর প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন বা সমর্পিতাত্ম শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে মুসলমানদের অন্য কাহাকেও প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা জানিতেন যে,যে শত্রু সে শত্রুই—যে কোন প্রকারে তাহার নিধন সাধন করিতে পারিলেই প্রকৃত শত্রু-ধর্ম্ম পালন করা হয়, তাহা যেপ্রকারেই হউক,—নবাবের কলিকাতা বিজয়ে তাহাই হইয়াছিল ইহাতে আর অসাধারণত্বই বা কি আছে? যদিই সৈর-ই-মুতাক্ষরীণ লেখকের মনে অতি বড় অন্যায় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি ত মুসলমান তাঁহার কি স্বজাতি বাৎসল্য ছিল না যে, তিনি নবাবকে নিতান্ত নিষ্ঠুরাচারী প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে কিছুমাত্র যত্ন লয়েন নাই। তাঁহার একদেশদর্শিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন—'তৎকালিন মুসলমান ইতিহাস লেখক ঘূণাক্ষরেও এই নৃশংস অত্যাচারের উল্লেখও করেন নাই।"

হলওয়েলের প্রাণ নিতান্ত কষ্টসহ তাই তিনি অন্ধকূপে বাঁচিয়া মুর্শিদাবাদে বন্দীত্ব সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন॥ শুধু তাহাই নহে "ষষ্ঠীর দাস" হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বৎসরে নর জন্মের অনেক সাধ মিটাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি এদেশে থাকিতে থাকিতেই অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি রক্ষার্থ মহানগরী কলিকাতা মধ্যে একটী স্মৃতিস্তম্ভ উত্তোলন করিয়া তাহাতে একখণ্ড প্রস্তর সংলগ্ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে,—

To the Memories of :—Edward Eyre and Ballie Esqrs. The Rev. Jervas Bellamy; Messrs. Jenks, Reevely, Law, Coates, Nahcourt, Jebb, Torrians, E. Page, S. Page, Grub, Strut, Harod, P. Johnstone, Ballard, N. Drake, Carse, Knapton, Gosting, Dod and Dalrymple, Captains Clayton, Buchanan, and Witherington; Lieutenants Bishop, Hays, Blagg, Simpson and J. Bellamy; Ensigns Paccard, Scott, Hastings, C. Wedderburn, and Dumbleton; Sea-Captains Hunt, Osburn, and Parnell, Messrs Carey, Lecch, Steavenson, Gay, Porter, Parker, Canlkar, Bendal, and Atkinson, who with Sundry other inhabitants military and militia to the number of 123 persons, wore by the tyranic violence of Suraj-ud-Dowlah, Suba of Bengal, Suffocated in the Black Hole prison of Fort-William on the night of the 20th day of June 1756 and promiscously thrown the Succeeding morning into the ditch of the ravelin of this place. This monument is erected by their surviving Fellow Sufferer

J. E. Holwell.

This horrid act of violence was amply and deservedly revenged on Suraj-ud-Dowlah by His majesty's arms under the conduct of Admirel Watson and Colonel Clive amo 1757.

এই স্মৃতিস্তম্ভটী ট্যাঙ্ক স্কোয়ার নামক তৎকাল পরিচিত স্থানের ঈশান কোণে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ১৮১৯ অব্দে উহা ভগ্ন করা হয়। পাশ্চাত্য জাতি মাত্রেই প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির ও স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার বড়ই পক্ষপাতী। কোন কবির প্রিয় কুকুরের স্মরণার্থ তিনি তাহার সমাধির উপর একখানি প্রস্তরে একটী কবিতা খোদিত করাইয়া দিয়াছিলেন। অন্ধকূপ হত্যাকে ইংরেজের একটী জাতীয় দুর্ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হয়, তাহার স্মৃতিস্তম্ভের যে এরূপ অনাদর হইবে ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ইংরেজ আজি সমগ্র ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী। বণিকবৃত্তি অবলম্বনে এদেশে অবস্থিতি কালে অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য

দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবিধ দারুণ দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন ভারতে তাঁহাদের সেই এক দুর্দ্দিন, আর আজি কি সুখের দিন। যে ইংরেজ একদিন প্রনষ্ট গৌরব নামে মাত্র দীল্লির বাদসাহের কৃপা ভিক্ষার্থী ছিলেন আজি তাঁহারা সেই ভারতবর্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা, একছত্রীরাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী—মনুষ্যের দুঃখের অবস্থার পরে সুখের দশা এবং সুখের পর দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হইলে অতীত স্মৃতির সমাদর হয় অতীত কথা দশ জনকে শুনাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি উত্তেজনার চেষ্টা হয়, এই সুখ দুঃখের কাহিনী অন্যকে শুনাইবার জন্য স্বভাবতঃ একটা কেমন আগ্রহ হয়—তাহাতে যেন মনে অনেকটা আত্মপ্রসাদ জন্মে। ইংরেজ তাই অন্ধকূপ হত্যার প্রনষ্ট স্মৃতিচিহ্নের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসী। এতদিনের পর সেরাজের স্কন্ধ হইতে অন্ধকূপ হত্যার দোষ অপসারিত করিবার প্রয়াস যে কত দূর কার্য্যকরী হইবে তাহাও বলা যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই পূর্ব্ব হইতে তাহা সারিয়া রাখিয়াছেন—অন্ধকূপ হত্যায় সেরাজ যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী তাহা তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তিনি ঘূণাক্ষরেও জানিতেন না যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে। ইংরেজ বন্দীগণকে যথারীতি রক্ষা করা হইবে ইহাই তিনি জানিতেন, দৈবাৎ মাণিকচাঁদের দোষে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য, মনে যাহাই থাকুক, মনুষ্যত্বের খাতিরে হলওয়েলকে যেন তৃষ্ণায় জল, বসিবার আসন দেওয়া হইয়াছিল, তেমনি তাহার উপর একটু বাচনিক সৌজন্য দেখাইয়া মাণিকচাঁদকে দুকথা কড়াভাবে শুনাইয়া দিলেই হইত, যাহা হইয়া গিয়াছিল তাহাও আর শুধরাইবার উপায় ছিল না,—কিন্তু ইহা যে চতুরের কাজ, সেরাজ কি তাহা বুঝিতেন—ইহাই তো রাজনৈতিক চালাকী, সেটুকু সেরাজের ন্যায় শাসন কর্ত্তার নিকট প্রত্যাশা করা যায় না,—তিনি যে তাহা করেন নাই, ইহাই বলিবার কে আছে, ফলে তাঁহার অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া মনে হয় তাঁহার দ্বারা সে কাজ হয় নাই, এবং হইবারও নহে।

অন্ধকূপ হত্যার নিশাবসানে যখন হলওয়েল কোট ও ওয়ালিকট নামক তিন জন ইংরেজকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ স্থির হইল তখন বাকী কুড়ি জন যথা ইচ্ছা তথা

যাইবার অনুমতি পাইলেন, তাঁহারা ইংরেজদিগের জাহাজে যাইবারই চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে গঙ্গার ধারে নবাবের লোকেরা সশস্ত্র দাঁড়াইয়া আছে সে দিকে যাইলেই হত্যা করিবে। দুর্যুগে লোক সকল সময়, সকল স্থানেই থাকে—যদি তাহাই হইবে, তবে নবাব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া নবাব সেই খানেই ত হত্যা করিতে পারিতেন। সেই সকল অভয় প্রাপ্ত ইংরেজকে কয়েক জন বাঙ্গালী আপনাদের বাড়ীতে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করে—সেই সকল বাঙ্গালী ইংরেজদের কলিকাতার কুঠীতে কাজ করিত, বাঙ্গালী চির দিনই পর-দুঃখ-কাতর—পরের দুঃখ দেখিলে সকল সময়, সকল অবস্থাতেই তাহারা সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সেই পরোপকারপরায়ণ বাঙ্গালীকে মেকলে সাহেব জগতের চক্ষে কত দূর নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা পতনের সংবাদ লইয়া ম্যানিংহাম সাহেব ৫ই আগষ্ট মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়েন। তৎপূর্ব্বে ১৫ই জুলাই নবাব কর্ত্তৃক কাশিমবাজার লুণ্ঠনের সংবাদ তথায় পঁহুছিয়াছিল। তজ্জন্য ২৩০ জন সেনার অধ্যক্ষ করিয়া মেজর কিলপ্যাট্রিককে তথায় পাঠান হইয়াছিল। ইহা যুদ্ধের আয়োজন নহে, নবাবের ক্রোধ শান্তির জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া যাহাতে তত্রত্য কুঠির কাজ নিরুপদ্রবে চলে তাহারই ব্যবস্থা করিবার কথা উক্ত সেনাপতিকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চাৎ ম্যানিংহামের মুখে পতনবার্ত্তা অবগত হইয়া মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের সর্ব্বপ্রথমে "হা হতোঽস্মি" করিয়া পড়িয়াছিলেন। কোম্পানীর বহুল অর্থ ক্ষতি, অনেকগুলি স্বজাতীয়ের জীবনহানি, সর্ব্বোপরি তাঁহারা যে ইজ্জতের (Prestigeএর) জন্য প্রাণ দিতেও অকাতর, সেই প্রেষ্টিজ নষ্ট! নবাবের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইলে উপকূলস্থ অধিকার নিরাপদ থাকে না। মান্দ্রাজ কৌন্সিলের অনেকেই গায়ের রাগ গায়েই মারিবার চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অর্ম্মি এই সময়ে উক্ত কৌন্সিলের একজন মেম্বর ছিলেন, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না—তাঁহার মনে প্রতিহিংসাবৃত্তি বলবতী হইল, বিপুল বিক্রমের সহিত নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য তিনি জেদ ধরিলেন। ইহাতেই বোধ হয় অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ তৎকালে মান্দ্রাজে পঁহুছে নাই—তাহা হইলে কি যুদ্ধযাত্রায় কাহারও অমত হইত। ড্রেকের মত লোক ইংরেজের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা বলিয়া সকলেই যে তাঁহার মত, একথা কখন বিশ্বাস করা যায় না।

অনেক বাদ প্রতিবাদের পর অর্ম্মির মতই প্রবল হইল—নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাই স্থির হইল, আডমিরাল ওয়াটসনকে নৌসেনার অধিনায়কত্ব দিবার ব্যবস্থাই ঠিক হইল কিন্তু স্থলযুদ্ধের কর্ত্তৃত্ব কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা অনেক হইল। মান্দ্রাজের গবর্ণর পিগট সাহেব আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তিনি আপিশ আদালতের কাজেই মজবুৎ ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না বলিয়া সকলের তাহাতে মত হইল না। তাঁহার পরে অল্‌ভারক্রণ সাহেবের কথা উঠে, তিনি লোক উপযুক্ত বটে, কিন্তু এদেশে নূতন, কাজেই এদেশ সম্বন্ধে তাদৃশ অভিজ্ঞতা ছিল না কর্ণেল লরেন্স সকল বিষয়েই উপযুক্ত বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া তিনি অস্বীকার করিলেন। অবশেষে অর্ম্মিই অভ্যুদয়শীল ক্লাইবকে পাঠাইবার কথা তুলিলেন,—ক্লাইবের চিরবন্ধু লরেন্স সম্মতি প্রদান করিলে, কেহ আর অমত করিলেন না, ক্লাইবের আসা ঠিক হইয়া গেল। অতঃপর কথা উঠিল কলিকাতার গবর্ণর ও তত্রত্য মেম্বরগণের সহিত অভিনব সেনাপতির কিরূপ সম্পর্ক থাকিবে। তিনি অধীন ভাবে কাজ করিবেন কি, যেরূপ সুবিধা বিবেচনা করিবেন, সেইরূপে আপন বিবেচনা মত চলিবেন। নানা গোলযোগে দুই মাস কাল কাটিয়া গেল। শেষে স্থির হইল কলিকাতা কৌন্সিলের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎই থাকিবে, কিন্তু সৈনিক কার্য্যে ক্লাইব সর্ব্বে সর্ব্বা হইবেন। তাঁহাকে কাহার মুখাপেক্ষী হইয়া কাজ করিতে হইবে না পলায়নপটু ম্যানিংহামের তাহা সহ্য হইল না, তিনি প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা কে শোনে, আপত্তি টিকিল না।

ওয়াটসনের অধীনে পাঁচখানি রণপোতের অতিরিক্ত আর পাঁচ খানি জাহাজ ১৬ই অক্টোবর মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। এই দশ খানি জাহাজে সর্ব্বসমেত নয় শত গোরা এবং পনর শত দেশীয় সেনা

ছিল। কিন্তু অল্‌ভার ক্রণ জেদ ধরিলেন, তাঁহাকে আসিতে না দিলে তিনি রাজকীয় কামান ও যুদ্ধোপকরণ ছাড়িয়া দিবেন না। অগত্যা তাহা না লইয়া ইংরেজবাহিনী বঙ্গোপসাগরে পাড়ি মারিল। শরৎকালীন ঝড়-বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া ২০এ ডিসেম্বর তাঁহারা কলিকাতার দশ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী ফল্‌তা নামক স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন। "কাম্বেরলণ্ড ও মার্‌লবরো নামক দুইখানি জাহাজের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ঐ দুই খানি জাহাজেই অধিকাংশ যুদ্ধোপকরণ ছিল। বলা বাহুল্য যে কলিকাতা দুর্গ হইতে পলাতক ইংরেজেরা এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। মেজর কিল্‌প্যাট্রিকও ইতি পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া আড্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাহাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল—তাঁহার সেনাগণ এদেশের তৎকালিক জল বায়ুতে অসুস্থ হইয়া প্রায় অর্দ্ধেকগুলি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, বাকী অর্দ্ধেকের মধ্যে কেবল মাত্র ত্রিশ জন কার্য্যক্ষম ছিল, অবশিষ্ট সকলেই পীড়িত। এই সময়ে বোম্বাই হইতে দুই জাহাজ সৈন্য আসিয়া পঁহুছিবার কথা ছিল, কিন্তু ক্লাইব কাহার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার নবানুরাগ, আর্কটের উৎসাহে তাঁহার মন উৎফুল্ল। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বে চড়কের সন্ন্যাসীরা যেমন পৃষ্ঠে লোহার কাঁটা চালাইয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, ক্লাইবের ব্যগ্রতা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। তিনি কাহারও বা কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কলিকাতা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। ইহাঁরই বলবিক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের জয়শ্রী লাভ হয়, ইংরেজ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বেসর্ব্বা হয়েন এই ক্লাইবই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি। ইনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মান্দ্রাজস্থ কুঠির একজন সামান্য কেরাণী হইয়া এদেশে আইসেন, এদেশে আসিয়া তাঁহাকে কেরাণীর কাজ ভাল লাগিল না। তাঁহার জন্য কীর্ত্তিদেবী কোল বাড়াইয়া ছিলেন, খড়্গখর্পরধারিনী রণোন্মাদিনী মহাশক্তি তাঁহাকে বিপুল বলে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন ক্লাইবের দেহে এখন যেন তিনি শত হস্তীর বল হইয়াছিল।

ক্লাইব বাল্যকালে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই মসিজীবী হইবার যে বিদ্যা টুকুর প্রয়োজন তাহারই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও উচ্চ অঙ্গের নহে। হয়ত তিনি বাল্যকালে ভাল করিয়া বন্দুক ধরিতেও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাবান্ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রতিভা আপনা হইতেই প্রস্ফুরিত হয়, কিছুরই অপেক্ষা করে না। দৃষ্টান্তের জন্য দূরদেশে যাইবার প্রয়োজন কি? পশুপালক হাইদরআলিকে বাল্যকালে কে যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষা দিয়াছিল? মুর্শিদ কুলিখাঁ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি কিরূপে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবী করিলেন? ধর্ম্মানুষ্ঠানে ফুলচন্দন লইয়া যাঁহার পূর্ব্বপুরুষের জীবন পাত হইয়াছে, সেই মুর্শিদকুলিখাঁর সমর তৃষ্ণা কিসে জন্মিল, কে আনিয়াছিল, কোথা হইতে আসিল? ছত্রপতি শিবজীর কথাটাও তো একবার চিন্তা করিলে হয়। প্রতিভা জাতিকুল মানে না, অবস্থা মানে না, বিপদ আপদকে গণে না, বাধা বিঘ্ন মানে না, আপনার তেজে আপনিই বিকাশ পায়। ক্লাইবের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল।

এই সময় মধ্যে সেরাজউদ্দৌলার কথা যেন আমরা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সেরাজ অন্ধকূপে যে ইংরাজ রমণী-রত্নলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকে লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, কলিকাতা দুর্গে যদিও তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী পান নাই, কিন্তু উমিচাঁদের গৃহ লুণ্ঠনে চারি লক্ষ টাকা মিলিয়াছিল। তদতিরিক্ত কলিকাতার অন্যান্য ঋদ্ধিমান ব্যক্তির গৃহে যাহা কিছু ছিল তাহাতে তাঁহার সেনাপতিও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণেরই থলি ভারী করিয়াছিল। আসিবার সময় চন্দননগরের ফরাসিরা সাড়ে তিন লাখ এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজেরা সাড়ে চারিলক্ষ টাকা না দিয়া থাকিতে পারিল না। তাঁহাদের উপর বিলক্ষণ জোর জবরদস্তি করিবার ভয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। যদিও টাকার জন্য পীড়াপীড়ি কম হয় নাই, কিন্তু সেরাজ নানা রকমে প্রায় চৌদ্দ পনর লক্ষ টাকা পাইয়া যত না সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কলিকাতা বিজয়ে। তিনি মুর্শিদাবাদে পঁহুছিয়াই দীল্লির বাদসাহকে মহাড়ম্বরে আপনার বিজয়বার্ত্তা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন ইংরেজকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন। বাল্যাবধি তিনি যে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন এত দিনে তাহা সার্থক করিতে পারিয়া আনন্দে অষ্টধা হইয়াছিলেন, আপন ভুজ বল পরিচয়ে আপনিই অস্থির হইয়াছিলেন। একে নূতন নবাব নূতন উৎসাহ—যে শত্রুকে মাতামহ পর্য্যন্ত মানিয়া চলিতেন তাহাদিগকে নির্জ্জিত ও নিষ্পীড়িত করিয়া দেশত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন। আর যে তাঁহারা পুনরায় যুদ্ধার্থী হইতে পারিবেন, এ আশাকে তিনি একবারেই মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে দশ হাজারের বেশী লোক নাই! জয়দর্পিত সেরাজ কি আরও মাতৃষস্রেয়ের বিনাশ সাধনে ক্ষান্ত থাকেন—ঘেরিয়া নামক স্থানের যুদ্ধে সফৎজঙ্গের বিনাশ সাধন করিয়া আপনাকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ক্লাইব ফল্‌তা হইতে নবাবের কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারীকে অতি উৎকট ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দেন, কলিকাতার তদানিন্তন শাসন কর্ত্তা মাণিক চাঁদ তাহা নবাবকে পাঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না।

২৭এ ডিসেম্বর তারিখে ক্লাইব সসৈন্যে আয়াপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আপন সৈন্য স্থলপথে পরিচালনা করিলেন। পথিমধ্যে বজ্‌বজ নামক স্থানে নবাবের যে একটী দুর্গ ছিল তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। কিন্তু পথ বড়ই দুর্গম, তাহাতে সৈনিকদিগের এক একজনকে দুইটী করিয়া বন্দুক ও প্রচুর পরিমাণে গুলিবারুদ আপনাপন স্কন্ধে বহন করিতে হইয়াছিল। ফল্‌তার ইংরেজ কৌন্সিল নবাবের ক্রোধোদ্দীপ্তির আশঙ্কায় ক্লাইবকে তাঁহার যুদ্ধোপকরণ বা অন্যান্য জিনিষ পত্র লইয়া আসিবার কোন সাহায্যই করিতে পারেন নাই *। ঐতিহাসিক থরণ্টনের এই কথাটা কেমন কেমন লাগে। যাহাই হউক ক্লাইবকে অতি কষ্টেই ফল্‌তা হইতে বজবজের পথে আসিতে হইয়াছিল। পাঁচ ক্রোশ পথ আসিতে ষোল ঘণ্টা লাগিয়াছিল। দিবা অবসান হইল, অতঃপর সেনাগণ বিশ্রামের জন্য ব্যস্ত হইল, আর চলিতে পারিল না। নিদ্রাতুরের শয্যাজ্ঞান থাকে না, সকলেই আপনাকে লইয়া অধীর, সকলেই শয়ন করিল, কিন্তু পাহারার ব্যবস্থা হইল না। কলিকাতার শাসনকর্ত্তা মাণিক চাঁদ ইংরেজ সৈন্যের আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া—সসৈন্যে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে ইংরেজ সৈন্যকে নিদ্রিতাবস্থায় পাইয়া তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা চমকিতভাবে সকলেই জাগ্রত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল, ক্লাইব তৎক্ষণাৎ সাজিয়া দাঁড়াইলে—উভয় পক্ষেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। মাণিক চাঁদ হস্তী পৃষ্ঠে ছিলেন, ইংরেজের বিক্ষিপ্ত একটী গোলা তাঁহার উষ্ণীষ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, ভয়ে অস্থির হইয়া মাণিক চাঁদ কলিকাতায় ফিরিলেন, সৈন্যগণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে তাঁহার অনুগমন করিল। মাণিক চাঁদ কয়েক ঘণ্টামাত্র কলিকাতায় থাকিয়া মুর্শিদাবাদের পথে পলাইলেন, কলিকাতা রক্ষার জন্য পাঁচশত মাত্র সৈন্য রহিল, বাকী তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছিল।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে আর ভাল হয় না, যদিও মাণিক চাঁদ প্রাণ হারাইতে হারাইতে আপনাকে বাঁচাইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজ সৈন্য আর সে রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না, একটা মাতাল সৈনিক নেশার ঝোঁকে বজবজের কেল্লার পরিখায় পড়িয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে তাহা সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া দুর্গ প্রাচীরে উঠিয়া দেখে তন্মধ্যে কেহই নাই—মাতাল সৈনিক মাতলামি করিয়া বলিতে লাগিল—"আমি একাই কেল্লা ফতে করিয়াছি।" বারম্বার এই কথা বলিতে শুনিয়া অনেকেই গিয়া দেখিল প্রকৃতই তাহাতে কেহই নাই—সকলেই পলাইয়াছে। পরে তিনি স্থল পথেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন, তাঁহার পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রণপোত কয়েকখানি কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে পঁহুছিয়াছিল। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য কলিকাতাতেও কেহ ছিল না। ইংরেজ সৈন্য তীরে উঠিয়াই নিরাপত্তিতে দুর্গ প্রবেশ করিল। এ যাত্রা শোণিত পাত ব্যতিরেকে কলিকাতা পুনরধিকৃত হইল। ইহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারির কথা। ইহার পর কলিকাতা দুর্গের সিংহদ্বারে আর কাহাকেও শত্রুভাবে শিরঃপ্রবিষ্ট করিতে হয় নাই।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

* This arose from the continued apprehensions of the council at Fulta who, clinging to their first fear with more than martyrs steadfastness, did not ventur to frovide a single beast either of draughts or burden lest they should incur Soubadar's resentment.

Thorton's History of British Empire
In India page 47 Vol I.

সমুদ্রের প্রতি।

(১)

মন্দর-মন্থন-দণ্ডে ভীমরবে মহাশূন্য ভেদী
আলোড়িত যবে, হে বারিধি!
উঠেছিল যে নির্ঘোষ অন্তহীন বিশ্বকেন্দ্র হ'তে,
ভয়ত্রস্ত সুরাসুর কম্পমান ত্রিদিব মরতে,
সে প্রচণ্ড প্রলয়ের বুঝি শেষ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি
এ মহাকল্লোল তব! কিম্বা আজ ও চমকি' অবনী,
দিবস রজনী;
ফেলে শ্বাস নাগরাজ পূর্ব্বজ্বালা স্মরি',
বন্ধনে শিহরি'।

(২)

শতকোটী শোকাতুর হৃদয়ের ঘন দীর্ঘশ্বাস—
তোমার এ উন্মাদ উচ্ছ্বাস!
জগতের দ্বারে দ্বারে দেশে দেশে ফিরি' দিবানিশি
স্রোতস্বিনীকুল বহি' মানবের অশ্রুজলরাশি
তোমার অসীম অঙ্গে ঢালিয়াছে যুগযুগান্তর
প্রত্যেক কল্লোলে বুঝি শুনি তাই শোকার্ত্তের স্বর;
হেরি শশধর,
উথলে বিরহী শত আঁখি জলধার
তাই অনিবার।

(৩)

অথবা এ কলরোল বিশ্বলোক করিবারে ত্রাণ,
দেবতার আকুল আহ্বান!
বসিয়া তোমার তীরে কহেন কি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
উচ্চ বিচীরবে জগত জনের কি হইবে গতি?
নেহারি তোমারে অন্য পারাবারে ধায় সদা মন;
উত্তরি কেমনে তাহা করি নাই কিছু আয়োজন!
তরী শ্রীচরণ,
পাপীর ভরসা বল, তাই বাঁধা কিরে
সাগরের তীরে?

(৪)

নশ্বর ধরনীতলে অনন্তের ছায়া করিয়া বিস্তার
বহিছ কোথায় পারাবার?
উঠেছিল দিবাকর জগতের প্রথম প্রভাতে
যেরূপ উজলি বিশ্ব তোমার বিপুল বক্ষ হ'তে,
এখনো তেমনি তপন চরণ-পরশ-রঙ্গিমা
উষায় তোমার সুনীল সলিলে ঢালে মধুরিমা;
উদার নিঃসীমা
মাঝে পড়ে নাই কভু যুগান্তের রেখা—
কালচক্র লেখা।

(৫

এমনি তোমার কূলে সায়াহ্নের দিনপতি প্রায়।
আয়ু মোর যেন অস্ত যায়!
অতৃপ্ত নয়নে হেরি নিত্য তব রূপ অভিনব;
সমীর হিল্লোলে ভুঞ্জি বসন্তের অনন্ত উৎসব;
নিশিসমাগমে বৈতালিকসম মোহময় গান
পরশিবে ঘুমঘোর চিন্তাক্লিষ্ট বিনিদ্র নয়ান।
নাহি চাহে প্রাণ
ছাড়িয়া তোমারে যাই—দূরদেশে ঘর,
ধন্য রত্নাকর!

শ্রী ঃ—

দণ্ডের ইতিহাস।

—০ঃ*ঃ০—

আমার নাম—দণ্ড। আমার জন্মদাতার স্থির নাই। কেহ বলেন, আমার পিতার নাম—বংশ। কেহ বলেন, তাহা নয় দণ্ডের বাপের নাম—কাষ্ঠ। আবার কেহ বলেন তা' হ'ল না, উহার বাপে নাম—বেত্র। নিশ্চয় করিয়া কেহ আমার জন্মদাতার নাম বলিতে পারেন না, আমিও জানি না। সকলেরই গর্ভধারিণী আছে, আমার তাও নাই—আমি ভুঁইফোড়। মা থাকিলেও বা তাহার নিকট বাপের নামটা জানিয়া লইতাম। তাই বলিতেছি আমার মা বাপ নাই, থাকিলেও তাহারা কে বা তাহাদের নাম জানি না। জানি কেবল আমার নাম—দণ্ড। আমি রাজরাজেশ্বরের হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া জীর্ণ কান্থধারী খঞ্জ ভিক্ষুকের কর পর্য্যন্ত সকলের হাতে সমভাবে বিরাজ করি। আমার ভেদ জ্ঞান নাই, আমি ধর্ম্মাধিকরণেও থাকি, অবৈধজনতাকারিদিগের সঙ্গেও থাকি, আমি সাধুর সঙ্গেও থাকি, অধার্ম্মিকেরও সঙ্গী হই। আমি পৃথিবীর সকল স্থানে বিশেষতঃ বিদ্যালয়ে এবং বিচারালয়ে বিদ্যমান থাকিয়া কিয়ৎপরিমাণে স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করি। তুমি লেখক—তুমি যে আমার ইতিবৃত্ত লিখিতেছ,—সত্য করিয়া বল দেখি, পাঠশালায় গুরুমহাশয় কি তোমার মেরুদণ্ডের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুমধুর সুখ সম্পাদন করেন নাই? তুমি অস্বীকার করিলেও তোমরা যাহাকে গুরু বলিয়া ভক্তি কর সেই জন্‌সন্ সাহেব বলিয়াছেন,—"আমার শিক্ষক আমায় খুব চাবুক কষিতেন, না হলে আমি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতাম না।"

দেখ, আমার অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য দুষ্ট লোক ও ছেলেদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত। আমি না হলে তাহাদিগকে ঠিক করিতে আর কেহ পারে না। দুষ্ট লোকে আমার অখ্যাতি রটায় বটে কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য করি না,—"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আর এক কথা, তাহারা আমাকে ঘৃণা করিলেও আমিই কিন্তু তাহাদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক। জন্‌সন্ একদিন লিঙ্কনশায়ারে কয়েকটী ভদ্রমহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহাদের মধুর ব্যবহারে অতীব প্রীত হইয়াছিলেন এবং যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহাদের জননীদেবীর শাসন ও সংস্কার গুণে তাঁহারা এরূপ ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Rod! I will honour thee for this thy duty."

জনসনের এ কথাটির মূল্য কম নহে। প্রকৃত পক্ষেই আমি (দণ্ডদেব) সম্মানের পাত্র, কারণ আমিই তোমাদের (মানবজাতির) ভাগ্যনিয়ন্তা এবং ক্রমে জানিতে পারিবে, সভ্যতার ইতিহাসেও আমার অধিকার আছে।

সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর যখন পাপের বোঝা স্কন্ধে চাপাইয়া মানবজাতিকে সৃষ্টি করেন, তখন তিনি মানবহৃদয়ে এক জন উপদেষ্টাকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বিবেক। এই বিবেকের অনুরোধেই মানবজাতি পাপের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অস্ত্রচালনা করিয়া আজ এই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এই বিবেকের অনুরোধেই তাঁহারা তাঁহাদিগের আদিম অবস্থায় আমার সাহায্যে পাপীজনকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া দুষ্ট পাপের মনে একটা ত্রাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। শাস্তিপ্রদানের সেই সর্ব্বপ্রথমাবিষ্কৃত অস্ত্র—"দণ্ড" অর্থাৎ আমি স্বয়ং। কিন্তু কালক্রমে নানারূপ উপযোগী আকারে আমাকে পরিণত হইতে হইয়াছে এবং আমার প্রয়োগ-প্রণালীর নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

বিগত সার্দ্ধ শতাব্দীর পরিবর্ত্তের প্রবল বাত্যায় কোন্ দেশের কোন্ প্রথা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে বা রাখিয়া গিয়াছে তাহা বলা অতীব সুকঠিন। সুতরাং সন্দেহকে অতিক্রম করিবার মানসে আমি আমার তৎপূর্ব্বের ইতিহাসই বলিতেছি, শ্রবণ কর। সার্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বেও আমার রাজত্ব একপ্রকার জগৎ বিস্তৃত ছিল। রুষিয়া তখনও কথা বর্জ্জন করেন নাই, পোলাণ্ডের ভদ্রমহিলাগণ তখনও রুশ সৈনিককর্ত্তৃক সাধারণ সমক্ষে কষাহত হইতেন, চীনে তখনও বংশদণ্ডের প্রাদুর্ভাব ছিল, তুরস্ক তখন যষ্টির দ্বারা শাসন করিতেন আটবাঁধা লাঠিতে তখনও শ্যামবাসীদিগের শাস্তিবিধান হইত; আফ্রিকা হইতে তখনও "মাম্বো জাম্বো" (Mumbo Jumbo) অন্তর্হিত হয় নাই, আমেরিকার কতকগুলি বিদ্যালয়ে তখনও বয়স্কা ভদ্রমহিলাদিগের উপর চাবুকের ব্যবস্থা হইত! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে

যে "দণ্ড" শক্তি এরূপ দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহা যে ইতিমধ্যেই আমূল উৎপাটিত হইবে তাহা তোমরা মনেও স্থান দিও না। কিন্তু হেমচন্দ্রের "অসভ্য জাপান" আজ সভ্য, তাই বলিতে বাধ্য, তোমরা যাহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে কর ঘটনাচক্রে তাহাও সম্ভব হইয়া যায়; সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা বা অনুমানের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি নীরব হইলাম।

আমি দণ্ডদেব কোন্ দেশে কিরূপ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতাম এবং কোন্ দেশে কিরূপ 'জাগ্রত' ছিলাম, তাহার ইতিহাস এখন বলিব না, এবং প্রত্যেক দেশের উপর আমার প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলেও দুই এক দিনে কুলাইবে না। তজ্জন্য আমি তোমাদিগকে আমার স্থূল বিবরণ মাত্র বলিতেছি।

প্রাচীন ইউরোপে রোমরাজ্য শীর্ষস্থানীয় এবং সভ্যতার ইতিহাসেও রোমের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, তাই সর্ব্বত্রই আমি আমার রোমের রাজত্ব কাহিনী বলিব। দণ্ডবিদ্যায় রোমানগণ যে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তোমরা অনেকে জান না। এখানে আমরা তিনটী সহোদর ছিলাম। রোমকগণ সাধারণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে কশাদণ্ড ব্যবহার করিতেন; এবং এই কশাদণ্ডের শক্তির তারতম্যহেতু আমাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ হইয়াছিল, শক্তি বিষয়ে Flagellum সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, Scutica মধ্যম এবং Ferula সর্ব্ব কনিষ্ঠ। রোমের বিচারালয়-সমূহ এবং মহিলাগণের সজ্জাগৃহ সকল সর্ব্বদার জন্য এই প্রকার কশাদণ্ডে অলঙ্কৃত থাকিত। অপরাধীদিগের উপর বিচারকগণের অসীম ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় দয়াপরবশ (!) হইয়া প্রভু অথবা প্রভুপত্নী আমাদের সাহায্যে স্বকীয় কৃতদাসের দুঃখময় জীবনের অবসান করিতেন! নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের প্রীতি উৎপাদনার্থ ভোজের সময় অথবা ভোজান্তে কৃতদাসদিগকে কশাঘাত করিবার ব্যবস্থা ছিল! কোমলাঙ্গিগণই নাকি কঠোরতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন! রোমান মহিলাগণের বহুসংখ্যক দাসী থাকিত, এক একজনের প্রতি এক এক কার্য্যের ভার অর্পিত হইত। যাহারা তাঁহাদিগের সজ্জাগৃহে কার্য্য করিত তাহাদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল, তাহাদিগকে এক রকম উলঙ্গ অবস্থায় কর্ত্তৃঠাকুরাণীর সেবা করিতে হইত, পাছে কশাঘাতের ব্যাঘাত ঘটে এইজন্য তাহারা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে পারিত না। অতি সামান্য অপরাধ করিলেও, অপরাধ কেন, অতি সামান্য ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলেও, দয়াস্বরূপিনী রোমান অঙ্গনাগণ তাঁহাদের দাসীদিগকে এরূপ পুরস্কার হইতে বঞ্চিত রাখিতেন না। এই স্থানেই আমাদের প্রভাবের পরিসমাপ্তি নহে। তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত আরও এক ভীষণ উপায় অবলম্বিত হইত। কড়ি কাঠে সুদীর্ঘকেশ বাঁধিয়া তাহাদিগকে টাঙ্গান হইত, পাছে অপরাধকারী পদাঘাত করে এই কারণে তাহাদের পায়ে বিশেষ ভার জিনিষ বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং তৎপরে তাহাদের অঙ্গের কাঠিন্য পরীক্ষার নিমিত্ত আমাদিগকে নিয়োজিত করিতেন। এ সকল শুনিলেও বোধ হয় তোমাদের গা শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আমাদের তা'তে সুখ হয়! আরও শুন, কৃতদাসগণের উপরেও উক্তরূপ ব্যবস্থা হইত, কিন্তু প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে তাহাদের এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। পুরুষের চুল ছোট বলিয়া কড়িকাঠে তাহাদের হাত দুইখানি বাঁধা পড়িত! মহিলাদিগের নিকট আমরা এতদূর আদৃত হইয়াছিলাম যে, রোম সাম্রাজ্যের সূত্রপাত সময়েই এতৎ নিবারণার্থ অনেক বিধি লিপিবদ্ধ হয়; সম্রাট আদ্রিয়ানের রাজত্ব কালে উক্ত অপরাধে একটী মহিলা পাঁচবৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। অনেক সময়ে রোমান যুবকগণ অসদভিপ্রায়ে প্রতিবেশীর অন্তঃপুরে কৃতদাস বেশে * প্রবেশ করিতেন, এবং গৃহস্বামীগণও জানিতে পারিলে তাহাদের যথোচিত কষাঘাতের আয়োজনে ত্রুটি করিতেন না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সেলাষ্ট, টালিয়া-দুহিতা কষ্টিমার প্রণয় লাভ করিতে যাইয়া ধরা পড়েন, এবং কশাঘাতে বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

এখন আমি হোলাণ্ড, জর্ম্মণি, প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও পোলাণ্ডের কথা বলিব, তোমরা সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এ সকল দেশেও পরিবার মধ্যে, বিদ্যালয়ে এবং বিচারালয়ে আমি বিরাজ করিতাম। এতদ্ব্যতীত সংস্কার মন্দিরে (House of Correction) ও আমি পূজিত

* কৃতদাসের সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে তাহাদিগকে চিনিবার উপায় ছিলনা।

হইতাম। এই সকল সংস্কার মন্দিরে চরিত্র ও ব্যবহারগত দোষের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইত। অভিভাবকগণ অধীনস্থদিগের অবৈধ চরিত্র কি অন্যায় ব্যবহার দেখিলে তাহাদিগকে সংস্কার মন্দিরের শাসনাধীন করিতেন এবং সেখানে আমাদিগের সাহায্যে (দণ্ডাঘাতে) তাহাদিগকে সংস্কৃত করা হইত।

জর্ম্মন রাজ্যে আমি বহু মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলাম। যথা;—(১) কষাদণ্ড, (২) বেত্রদণ্ড, (৩) বার্চদণ্ড। কোতোয়ালও বিচারকদিগের কষাঘাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। সংস্কার মন্দিরে হতভাগিনীদিগের সংখ্যাই অধিক হইত অনেক সময় নিরপরাধিনী রমনীকে ক্রূরমতি নির্ম্মমহৃদয় প্রতিবেশী অথবা আত্মীয় স্বজনের পাকচক্রে পড়িয়া কষাঘাতের দারুণ যন্ত্রণা এবং অবমাননা সহ্য করিতে হইত। কখনো কখনো শ্লীলতার অনুরোধে অপরাধিনীগণকে অনাবৃতাঙ্গ করা হইত না, এবং রমণী হস্তেই দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা হইত; কিন্তু সাধারণত এরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইত না;—হতভাগিনীদিগকে বিবস্ত্রা হইয়া পুরুষের হস্তেই দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত! সময়ে সময়ে সাধারণের সমক্ষে এই সকল শাস্তি প্রদত্ত হইত, আবার কখনো কখনো বা অর্দ্ধ গুপ্ত অবস্থায় আত্মীয় বন্ধুর সমক্ষে কষাদণ্ড প্রযুক্ত হইত। জর্ম্মন সাহিত্যে এই সকল কষাঘাতের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবীণ ফরাসী লেখক ভল্টেয়ারের হংসপুচ্ছও ব্যঙ্গচ্ছলে ফ্রান্সে দণ্ডদেবর উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সও আমার কঠোর হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। তথাকার বিদ্যালয় সমূহে আমার প্রাদুর্ভাব ছিল। বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকেও আমার অনুগ্রহ (!) গ্রহণ করিয়া আমাকে চুম্বন করিতে এবং দণ্ডানুগ্রহবিধায়ককে অভিবাদন করিতে হইত। এ রাজ্যেও রমণীর সুকোমল করকমলে আমি শোভিত হইতাম। এস্থলে তাহার একটী মাত্র প্রীতিপ্রদ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। "রোমান ডি লা রোজ" নামক সর্ব্বজন সমাদৃত কাব্যগ্রন্থে কবিবর রুপিনেলে স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে চারি ছত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ, পোপের সেই—

"Every woman is at heart a rake."

ইহাতে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হন এবং একদিন সুযোগক্রমে কবিবরকে আয়ত্বে পাইয়া তাঁহাকে সংশোধিত করিবার জন্য আয়োজন করেন। পলায়ন করা অসম্ভব দেখিয়া, কবিবর বলিলেন,—"আমি অপরাধ করিয়াছি, শাস্তি পাইব। কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা আছে;—ঐ ছত্র ক'টীতে আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তিনিই আমায় সর্ব্বপ্রথমে শাস্তি প্রদান করুন।" এই কথা শুনিয়া কেহই আর অগ্রসর হইলেন না, কবি রুপিনেলে নিস্তার পাইলেন।

রুশ রাজ্যেও আমার আধিপত্য অতীব প্রখর ছিল। সকল প্রকার অপরাধেই সাধারণ দণ্ড অথবা কশাদণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদত্ত হইত। কি পুরুষ কি রমণী কি বালক কি বৃদ্ধ কি রাজকর্ম্মচারী কি সাধারণ লোক, অপরাধ করিলে সকলকেই আমার অনুপম অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে হইত। কৃষকদিগের অবস্থা যারপর নাই হীন ছিল; তাহারা সকারণে অথবা অকারণে যাহার তাহার দ্বারা কষাহত হইত, এবং কেবলমাত্র স্বীয় পত্নী ও অশ্বের উপর রাগ ঝাড়িয়া তাহারা আপন আপন অন্তর্জ্বালার উপশম করিতে যত্ন পাইত। রুশিয়ার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হস্তের সহিত আমার (যষ্টির) এরূপ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল যে তাহারা ত্রুটি ও দোষ দমনের নিমিত্ত অপর কোন উপায় মনে করিতেও পারিতেন না; তাঁহাদের মতে অপরাধিবৃন্দের উপর প্রযুক্ত হইবার জন্যই আমার সৃষ্টি হইয়াছিল। এ রাজ্যে আমি একটী প্রীতিপ্রদ কর্ত্তব্য পালন করিতাম। এদেশে দণ্ডাঘাতই নাকি ভালবাসার চিহ্ন! বিবাহিতা রমণী নাকি স্বামীর হস্তে আমাকেই পাইবার জন্য লালায়িত! স্বামী যদি স্ত্রীকে মাঝে মাঝে এরূপ আদর (!) না করেন, তাহা হইলে স্ত্রী মনে করেন স্বামীর ভালবাসা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে! শুধু সমাজের নিম্ন স্তরেই এরূপ প্রথা দৃষ্ট হইত না, উচ্চতর স্তরেও এরূপ প্রথার প্রসার ছিল—একাধিক ভ্রমণকারী কর্ত্তৃক ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। বারক্লে লিখিয়া গিয়াছেন যে দণ্ডাঘাতের সংখ্যা হইতেই স্বামীর ভালবাসা নিরূপিত হইত। এতদ্ব্যতীত স্নানাগারেও সপত্র বার্চ দণ্ডের প্রবলপ্রতাপ দেখিতে পাওয়া যাইত; স্নানকারীর সর্ব্বাঙ্গ উক্ত দণ্ড দ্বারা প্রহত;—ষ্টিফেন্স সাহেব * স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

* Mr. Stephens in "Incidents of Travel iu Greece Russia, Turkey and Poland."

আমেরিকাতেও আমার আধিপত্য কম ছিল না। বালক বালিকাদিগের গার্হস্থ্য জীবন সেখানেও আমার দ্বারা পরিচালিত হইত। পিউরিটানদিগের সময়ে কশাঘাত সাধারণ দণ্ড মধ্যে পরিগণিত ছিল। কোয়েকার সম্প্রদায়কে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত আমেরিকার যুক্ত রাজ্য আমার বিশেষ প্রকার সাহায্য গ্রহণ করে। আমার (দণ্ডের) প্রয়োগের বন্দোবস্তেও ত্রুটি ছিলনা। কাঠের এক রকম বাঁট ছিল, তাহাকে পিলোরী (pillory) বলিত, অপরাধিগণকে তাহাতেই সংযুক্ত করিয়া কষাঘাত করা হইত। আমেরিকার আদিম জাতিদের মধ্যে আমার কিরূপ গতিবিধি ছিল, তাহার ইতিহাস তোমাদিগকে বলিব না; তবে অপরাপর আদিম জাতির জাতীয় জীবনের সহিত তাহাদের জীবনের সাদৃশ্য দেখিয়া এই মাত্র আনুমান করিয়া লইতে পার যে, তাহারাও আমরই পূজা করিত। বর্ব্বরজননী আফ্রিকায়ও আমার যথেষ্ট সম্মান এবং যথেষ্ট আদর। আমি শৈশবেই শিক্ষার সহচর। সর্দ্দারতনয়গণ আমার প্রভাবাধীন থাকিয়া সমবয়স্ক সঙ্গী সমূহের সমভিব্যাহারে রাজনীতি, শাসনকার্য্য ও বিষয় কার্য্য শিক্ষা পাইত। "আমি (যষ্টি) স্বর্গাগত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ *" ইহা প্রাচ্য প্রবাদ। মিসরবাসীদিগের এ প্রবাদের উপর বিশেষ আস্থা ছিল এবং নরপতিগণও প্রজাবর্গকে এ আশীর্ব্বাদ (!) সম্যক্ উপভোগ করাইতেন। এ রাজ্যে আমার প্রভূত সাহায্য ব্যতীত রাজস্ব আদায় করা একরূপ অসম্ভব ছিল। অধিবাসীগণ কর প্রদান না করার চেষ্টা করিত সুতরাং আমার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইত না, এবং পৃষ্ঠদেশে ঐ সকল বীরত্ব চিহ্ন প্রদর্শন করাই তাহারা পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিত। প্রতি গ্রামে প্রধানকে রাজস্বের জন্য দায়ী থাকিতে হইত এবং তাহারাও কৃষকবিশেষের উদ্ধত স্বভাবের নিমিত্ত আমার দ্বারা লাঞ্ছিত হইত। মিসরের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বড়ই অদ্ভুত—মিসরের পিরামিডের ন্যায় অদ্ভুত! সুন্দর বলিতে তাহারা অপরিমিত স্থূলকায় বুঝিত এবং এই পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত রাজদুহিতাগণ আমার অধীন হইয়া স্বেচ্ছাবিরুদ্ধেও দুগ্ধ পান করিতে বাধ্য হইত! আফ্রিকার অসভ্যদিগের মধ্যে আমার প্রকোপ পত্নীর উপরও প্রসারিত ছিল। স্বামী, স্ত্রীকে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন দিতে দেখিলে, আমার যথাযুক্ত তৃপ্তি সাধন করিয়া কুলকলঙ্কিনীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিত। সপত্নীদিগের মধ্যে কলহ বাঁধিলে স্বামী স্বয়ং আমার সাহায্যে বিবাদ ভঞ্জন করিত, পত্নীগণও সকল সময় নিরীহ থাকিত না। মৎকর্ত্তৃক অযথা উপদ্রুত হইলে তাহারাও দলপতির নিকট অভিযোগ করিত, সাধারণ সমক্ষে তাহাদের বিচার হইত এবং আদালতের মীমাংসায় অসন্তোষ প্রকাশ করিলে 'মাম্বো জাম্বোর' অব্যাহত শক্তি তাহাদিগের উপর প্রযুক্ত হইয়া বিচার কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া দিত। ১৮২৭ খৃঃ অঃ সাইএয়ালিওনিতে কষাঘাত কাফ্রিদিগের সাধারণ শাস্তি মধ্যে গণ্য ছিল। আফ্রিকার পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে বালক বালিকা দিগের উপর আমার সমধিক প্রসার প্রতিপত্তি ছিলনা বটে, কিন্তু সেখানে কঠোরতর শাস্তির অভিনয় হইত। অবাধ্য সন্তানের চক্ষে মরিচ ঘসিয়া দেওয়া হইত, তাহারা জ্বালা যন্ত্রণায় চীৎকার করিত। বয়স্কদিগের উপর যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহা আরো ভীষণ;—তাহাদিকে শূন্যে ঝুলাইয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে মরিচ প্রয়োগ করা হইত।

তোমাদের এসিয়া খণ্ডও আমার বিস্তীর্ণ রাজ্য। এসিয়া মাইনরে য়ীহুদিদিগের মধ্যে আমার প্রবল প্রতাপ পরিলক্ষিত হইত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিতে যাইয়া সেণ্টপল কি কি অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তর উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"য়ীহুদিদিগের নিকট পাঁচবার আমি এক কম ছ'কুড়িবার কশাহত হইয়াছি; তিনবার আমি দণ্ডাহত হইয়াছি;……।" * নিউটেষ্টামেণ্টের লেখকগণ সকলেই এই প্রকার কষাঘাতের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কশাহত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইংরেজি অব্দ যীশুর জন্মকালের সাক্ষ্য, সুতরাং অনেক পরিমাণে আমার প্রাচীন প্রভাবের প্রমাণ। য়ীহুদিদিগের মত পারশীকগণও প্রাচীন জাতি এবং তাহাদের মধ্যেও আমার বিস্তৃত ব্যবহার দৃষ্ট হইত, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে

* "Tho stick came down from heaven a blessing from God."

* Of the jews five times received I forty stripes save one; "and Thrice was I beaten with rods."

সকলের উপরেই দণ্ডাঘাত বিহিত হইত ও দণ্ডাহত ব্যক্তি মাত্রকেই দণ্ডপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন করিতে হইত। কিছুদিন পরে ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার নিমিত্ত কুলীনদিগের (nobles) রক্তমাংসে রচিত শরীরে কশা প্রয়োগ না করিয়া তাহাদের গাত্র বস্ত্রে প্রয়োগ করা হইত, এবং সে অদ্ভুত পূর্ব্ব প্রথা হইতেই "রাজার হাল স্বর্গে বয়"এর মত একটা প্রবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল।

চীনরাজ্যে আমার (দণ্ডের) আধিপত্য সাধারণ এবং সর্ব্বজনীন। এমন কোন অপরাধী নাই যাহার শাস্তি বিধানে আমার আবশ্যক হইত না। সর্ব্বোচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী হইতে অতি হীন ভৃত্য পর্য্যন্ত, অপরাধ করিলে সকলকেই আমার প্রভাব প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে হইত। দণ্ডাঘাতের সহিত অবমাননার কোনরূপ জ্ঞান চীনবাসীদিগের মনে স্থান পাইত না; কেবলমাত্র যন্ত্রণাপ্রদ বলিয়াই দণ্ডাঘাত তাহাদের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইত। সৈন্যাধ্যক্ষও অম্লান বদনে আমার কঠোর অনুগ্রহ সহ্য করিয়া আপনার উচ্চপদেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। চীনে শুধু অপরাধীর উপরেই আমার প্রকোপ সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃত দোষীকে বাহির করিয়া না দিতে পারিলে অপরাপর ব্যক্তিরও সাজা হইত। তস্কর অথবা দস্যুকে ধরিয়া দিতে না পারিলে, জেলার কোতোয়াল ও প্রহরীবর্গ পুনঃ পুনঃ কশাদণ্ডে দণ্ডিত হইত। তোমাদের পুলিশ আদালতের মত চীনেও কতকগুলি বিচারালয় ছিল। প্রাতে এবং অপরাহ্নে তথায় প্রতারণা হাতাহাতি মারামারী মাতলামী প্রভৃতি সামান্য সামান্য অপরাধের বিচার হইত এবং উপস্থিত মত বিচারকের আদেশক্রমে অপরাধীগণকে দু' চারি দশ ঘা' দিয়া বিদায় করা হইত। সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য সন্তোষজনক না হইলে, অভিযুক্তের মত তাহারাও দণ্ডগ্রহণ করিত! চীনের প্রথা ছিল—দণ্ডগ্রহণের পর সকলকেই বিচারককে শিষ্ট সম্ভাষণ করিতে হইবে, কেন না তিনি তাহাদের নৈতিক শিক্ষার জন্য এরূপ যত্ন লয়েন।

চীনের আইন ইতিহাস একরূপ শাস্তি ও দায়িত্ব লইয়া। অপরাধের নিমিত্ত কেবলমাত্র অপরাধীই দায়ী নহে, সে অপরাধের সহিত যাহারা অতি দূরভাবেও সম্পর্কিত তাহারও দায়ী। এই দায়ীত্বের উল্লঙ্ঘনে পুরস্কার (!) আছে, দণ্ডদেব স্বয়ং আমিই তাহার বিধানকর্ত্তা। বিচারকের অন্যায় বিচারের জন্য বিচার সংশ্লিষ্ট ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকেও শাস্তিভোগ করিতে হইত, কিন্তু নিম্নতর সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে দায়িত্বের আধিপত্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিত, সুতরাং শাস্তিও ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া যাইত। চীনে শত পরিবারে যে একজন করিয়া মণ্ডল নির্ব্বাচিত হইত, তাহার দায়িত্ব কম নহে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অপরাধ ছিল, মণ্ডলের অধীনস্থ পরিবার সমূহের মধ্যে তাহার অভিনয় হইলে, তাহাকে দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত! পেকিনের জ্যোতিষ সভা (Astronomical Council of Pekin) প্রত্যেক ভ্রমের জন্য ষষ্ঠি সংখ্য বংশ দণ্ডাঘাতে তিরস্কৃত করিত। দেব-সেবায় নিয়োজিত শূকরশাবক অসুস্থ অথবা ক্ষীণতনু হইলে, তত্ত্বাবধায়কের উপর প্রতি শাবকের জন্য পঞ্চাশৎবার দণ্ডদেব অবতীর্ণ হইতেন!

চীনের বিবাহ বিধিতেও আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। পুত্র কন্যার অভিমত না লইয়া পিতামাতা প্রথম বার বিবাহ দিতে পারিতেন কিন্তু পুত্র পত্নীহীন হইলে দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত পুত্রকে বাধ্য করিতে পিতার অধিকার ছিল না, এরূপ অবৈধ কার্য্য করিলে তিনি অশীতিবার আমার দ্বারা প্রহত হইতেন। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর কন্যাকর্ত্তা যদি কোন ব্যক্তির সহিত সেই বালিকার বিবাহ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর সপ্ততি অথবা অশীতি সংখ্যক দণ্ডাঘাতের ব্যবস্থা হইত এবং যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও এরূপ বিবাহ করিতেন, তিনিও কার্য্যফলস্বরূপ অশীতি সংখ্যক দাণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হইতেন! তোমাদের দেশে যেরূপ জনকজননী অথবা স্বামীর অভাব হইলে কালাশৌচ পালন করিতে হয়, চীনেও সেইরূপ একটা নিয়ম ছিল। কালাশৌচের মধ্যে বিবাহ করিলে বিবাহ অসিদ্ধ হইত এবং এই দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত উভয় পক্ষই শত দণ্ডাঘাতে লাঞ্ছিত হইত! পিতামহ পিতামহী, পিতৃসহোদর বা পিতৃসহোদরা প্রভৃতির মৃত্যুজনিত অশৌচকাল মধ্যে বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হইত না সত্য কিন্তু অশীতিবার দণ্ডাঘাতে দণ্ডনীয় হইত। স্বামীর জীবিতকালে যে রমণী সম্রাট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইতেন, বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এতৎসম্বন্ধেও যদি তিনি

বিবাহ করিতেন তাহা হইলে তাহার উপর শত দণ্ডপাত হইত ও তিনি নবপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেন। স্ত্রী-পুরুষ একই গোত্র হইলে বিবাহ পণ্ড হইত ও তাহাদের দণ্ড হইত। নৈতিক চরিত্রকে ভল্টেয়ারের সেই Learned and virtuans people (বিদ্যান এবং সদ্‌গুণান্বিত জাতি) বড়ই মূল্যবান জ্ঞান করিত এবং তাহার অবমাননায় নরনারী মাত্রই বংশদণ্ডের নিগ্রহ লাভ করিতেন।

এত দেশের কথা বলিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ও তোমাদের দেশের (ভারতবর্ষের) কথা বলি নাই। সকলের পরে বলিব বলিয়াই বলি নাই। ইংলণ্ড এখন উন্নত, ইংরেজ এখন লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র, তাই তাঁহাদের নিকট এখন আমার (দণ্ডদেবের) বিশেষ আদর নাই। কিন্তু না থাকিলেও কশাদণ্ডের আধিপত্য বড় কম নহে। বিদ্যালয়ে আমার মূর্ত্তি পূজিত, অশ্বপৃষ্ঠে আমার প্রভাব প্রকটিত, সৈন্য বিভাগে আমার শক্তি সম্মানিত। আর ভারতে? ভারতে আমার একাধিপত্য, তোমাদের বাঙ্গলায় আমার আদিম ও অকৃত্রিম মূর্ত্তির পূর্ণবিকাশ! ভারত নিঃস্ব, তাই প্রকৃতসুলভ দণ্ডকেই তোমরা আপনার বুকের ধন করিয়া রাখিয়াছ, ধন মানের একমাত্র প্রহরী করিয়া রাখিয়াছ। ভারতবাসী এখন অনেক পরিমাণে সভ্য হইলেও, অর্থের অভাবে বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে নাই, তাই পিতা-পিতামহ-পূজিত দণ্ডদেবের আশ্রয়েই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়ের হস্তে বেত্রদণ্ড, গোচারণে গোপালের হস্তে পাঁচনী, পল্লীমধ্যে প্রজা-উৎপীড়ক তহসীলদারের হস্তে সুদীর্ঘ বংশদণ্ড, শান্তিরক্ষক পুলীশের হস্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত "বাটন্," অন্তঃপুর গৃহিণী-কর-কমলে সম্মার্জ্জনী, পাথার ডাঁট্, উনুনের খড়ি কত কি? এ সকলই আমার মূর্ত্তিভেদ, এ সকলই শাসনের জন্য, অত্যাচারের জন্য নিয়োজিত। তাই বলি যদি বর্ত্তমানে কোনস্থানে আমার প্রকৃত অধিষ্ঠান থাকে তবে তাহা ভারতে। আর এই বিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে যদি কোথাও আমার প্রকৃত আলোচনা হয় তবে তাহা তোমাদের এই দীন বাঙ্গলায়। জমীদারে জমীদারে বিবাদ বাধিলে এখনও আমার এক মূর্ত্তি লাঠির মধ্যবর্ত্তিতায় মীমাংসিত হয়, এখনও লাঠিয়াল সম্প্রদায় বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, হইবে কি না তাহাও সন্দেহের স্থল। গবর্ণমেণ্টের "অস্ত্রপাশ" বিধিতে আমার রাজ্যই ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই "পাশ" প্রথা কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে আমি চিরকাল আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিব তদ্বিষয়ে কি তোমাদের সন্দেহ হইতে পারে?

পাঠক! আমার কথা তোমাকে অনেক বলিলাম, আজ আর বলিব না। এক দিন সব কথা বলিলে ভুলিয়া যাইবে। তাই আজ আর দুই একটী কথা বলিয়া নীরব হইব। সময়ান্তরে আমার আর আর বৃত্তান্ত বলিব। আমি যে শুধু শাসন রাজ্যেই অধিষ্ঠিত ছিলাম এমত নহে, ধর্ম্ম জগতেও আমি একদিন আলোচিত আন্দোলিত হইয়াছিলাম,—রোমের লুপারকেলিয়া (Lupercalia) তাহার সাক্ষ্য। পাপের শাস্তি আছে, দূর ভবিষ্যতে ঈশ্বর তাহার প্রতিবিধান করেন। পূরাকালে রোমকগণ এই শাস্তি স্বহস্তে আমার সাহায্যে (দণ্ডাঘাতে) অগ্রিম গ্রহণ করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। এই প্রায়শ্চিত্ত প্রথায় একদিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি প্রভৃতি দেশ সমূহে একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের * উদ্ভব হইয়াছিল,—ইতিহাসবক্ষে তাহার সুস্পষ্ট ছায়া এখনো অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

প্রার্থনা।

যতদিন দীননাথ, সহিতে যাতনা
রাখিতে মরতে মোরে করেছ মনন,
তব প্রীতিপূর্ণ আঁখি করিয়া করুণা
মোর' পরে ততদিন করিও স্থাপন!
তব পুণ্য কার্য্যে যেন এ পাপ জীবন
ব্যয়িত করিতে পারি যতনে গোপনে,
এড়াইয়া জগতের পাপ প্রলোভন,
আর করি' ছিন্ন স্বতঃ মোহের বন্ধনে!
সদা-সর্ব্বক্ষণ যেন এ পাপ রসনা
তোমার মহিমা-গীতি করেহে কীর্ত্তন
বিনাশিয়া সযতনে বিষয় বাসনা
মাতাইয়া জগতের নর অগণন!
পাপ-প্রলোভনে যেন হে জগত-পতি!
আমার অন্তর কভু নাহি করে গতি!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

* The sect of the Flagellants.

প্রদীপ।

স্বর্গীয় ছোটলাট সারজন উড্‌বরণ।

জন্ম, ১৮৪২ খৃঃ] [মৃত্যু, ১৯০২ খৃঃ

কবিতা-গুচ্ছ।

শরতের শশী।

শরতের পূর্ণশশী বিমল আকাশে বসি'
তরল রজত স্রোতে প্লাবিয়া ধরণী
ঢালি শুভ্র সুধাধারা হাসিয়া হ'তেছ সারা
কোথা পেলে এত হাসি বল দেখি শুনি।

দূর মেঘ সিংহাসনে বসিয়া আপন মনে
ঢালিছ কিরণ ধারা উজ্জ্বল বিমল
পুলক বিহ্বল মনে সাগর ভূধর সনে
সেই জ্যোতিঃ সুধাস্রোতে আসে ধরাতল।

ও শুভ্র সুন্দর হাসি, কোথায় শিখিলে শশি
ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি হাসিতে তোমার,
দূরে যায় মলিনতা, পূর্ণ-প্রেম পবিত্রতা
ধরায় ফুটিয়া ওঠে শোভা অমরার।

মহান মহিমা ধায় পূর্ণ সুধা পারাবার
বিন্দুমাত্র পেয়ে যায় তুমি সুধাকর,
(তব) জ্যোৎস্না ভূষণে সাজি সে পদ রাজীবে আজি
প্রীতিভরে প্রণমিছে বিশ্ব চরাচর।

—০:*:০—

আগ্রার তাজমহল।

কি আছে ধরণীমাঝে তুলনা তোমার!
দেখিয়াছি কত শত হর্ম্ম্য মনোহর,
অনুপম দেবালয় প্রাসাদ নিকর—
সুসভ্য জাতির কত গর্ব্ব অহঙ্কার।

শ্যাম যমুনা জল প্রতিবিম্ব ঝরি
নীলাকাশে দেবেন্দ্রের স্বর্গ পুরী যত;
বসন্ত স্বপ্নের দেবী ছায়াবাস পরি
নন্দন কাননে যেন বিরাজে সতত।

অমর্ত্ত্য সুন্দরী হেরি মুকুর মাঝারে
অপ্সরী নিন্দিত মূর্ত্তি সহসা আপন
সেইরূপ মুগ্ধা রহে, তুমি আপনারে
যমুনা সলিলে হেরি নিশ্চল নয়ন।

নিশীথে জোছনা রাতে মাধুরী তোমার,
তুষার বিমল বিভা স্বপ্ন শোভা সার।

শ্রীনির্ম্মলমোহন বসু।

—০:*:০—

কি দিয়ে পূজিব তোমা।

(১)

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
আছে ফুল নানারূপ,
বিশ্ব বিমোহন রূপ,
ফুটন্ত সে ফুলদল তব প্রেম-হাসিময়,
কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়।

(২)

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
আছে যেই হৃদাসন,
তোমার সে চিরাসন,
বল তবে অন্যাসন অন্বেষণে কিবা হয়,
আসন পাইব কোথা বল ওহে দয়াময়।

(৩)

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
অমায়াদি পুষ্প যত,
আছে সদা মুকুলিত,
এ দেহেতে প্রকাশিত কভু তারা নাহি হয়,
কি দিয়ে পূজিব তবে বল ওহে দয়াময়।

(৪)

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
ষড়রিপু মহাবলী,
কেমনে দিব হে বলি,
যুঝিতে তাদের সনে হয় মোর পরাজয়,
কি দিয়ে পূজিব তবে বল ওহে দয়াময়।

(৫)

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
পূজোপকরণ যাহা,
সর্ব্বময় তুমি তাহা,
তোমার জিনিষ তোমাদানে কিবা ফল হয়,
কি দিয়ে পূজিব তবে বল ওহে দয়াময়।

(৬)

কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়,
অনাদি অনন্ত তুমি তুমিইত সর্ব্বময়।
ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু,
সকলি তোমার তনু,
পুজিবে কে তোমা প্রভু আমিইত আমি নয়,
কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ওহে দয়াময়।

শ্রীঅসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

—০ঃ*ঃ০—

কবি-স্মৃতি।

নিশীথে কবি মরণ তীরে
করিল শেষ রচনা,
জীবন-দীপ নিভিল ধীরে
থামিল সব যাতনা।
সরস শ্যামল নবীন তৃণ
বিছায়ে কায়া কোমল ক্ষীণ,
রচিল কবির সমাধি-দীন
মিশায়ে তায় আপনা,
নীরবে কবি মরণ-তীরে
করিল শেষ রচনা।

ধরার কেহ নয়ন-ধারা
বুকের দীর্ঘ শ্বাস,
ফেলিলনা হায় একটু সেথায়
সুরভি কুসুম-রাশ।
শুধু প্রভাতের শিশির দল।
ঢালিল দু'ফোটা অশ্রু-জল,
শুধু সাঁঝের শৃগাল-কুল
গুঞ্জে বিষাদ-ভাস্,
ফেলিলনা কেহ নয়ন-ধারা
বুকের দীর্ঘশ্বাস।

অনেক বর্ষ বহিয়া গেল
সময় সিন্ধু-সলিলে,
একদা রাজা 'হর্ষনাথ'
সেবন তরে অনিলে,
রচিল সেথা বাগান বাটী
উলটি পালটি সমাধি-মাটী,
করিল অতি পরিপাটী
কবির স্মৃতি দলিলে!—
হে রাজাধিরাজ হর্ষনাথ,
সেবন তরে অনিলে!

নানান্ মত কেয়ারি করি
যতনে সারি বাঁধিয়া,
রতন-ঝারি পূর্ণ বারি
ঢালিল কত সাধিয়া;
সূর্য্যমুখী, রক্তজবা
সন্ধ্যামনি অভিনবা,
চাঁপা, বেলী মনোলোভা
ফুটিল দিক্ মোহিয়া
রতন-ঝারি পূর্ণ বারি
ঢালিল যবে সাধিয়া!

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

বন্ধু বটে।

[ক্ষুদ্র গল্প।]

(১)

সুবোধচন্দ্র ঘোষ ও রামময় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস উত্তরপাড়া গ্রামে। একজন কায়স্থ ও অপরজন ব্রাহ্মণ হইলেও উভয়ের এক প্রাণ ও এক আত্মা—কেবল 'পাক পৈতা' ভেদ। বাল্যে উভয়ে এক বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন যৌবনে উভয়ে এক গবর্ণমেণ্ট আফিসের একই বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন। এরূপ স্থলে বন্ধুত্বটা যে কিরূপ গাঢ় হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুবোধচন্দ্রের বয়স প্রায় ছাব্বিশ বৎসর, আর রামময় বাবু সবে মাত্র চব্বিশ বৎসরে পড়িয়াছেন।

মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর নাম—অনঙ্গমোহিনী, নামটা কেমন বদখৎ গোছের। তা হইতে পারে, কারণ অনঙ্গমোহিনীর পিতৃবংশ বড় আধুনিক। আর সুবোধচন্দ্রের স্ত্রীর নাম—নবদুর্গা। নবদুর্গা গোবিন্দপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ জমীদার ৺ প্রসন্নকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। রামময় বাবুর যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন বারো বৎসর বয়স্কা বালিকা অনঙ্গমোহিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, সুতরাং অনঙ্গ মোহিনীর বয়স এখন কিছু কম কুড়ি বৎসর। আর গোবিন্দপুরের বসুজা মহাশয় অষ্টম বৎসরের নবদুর্গা আঠার বৎসরের সুবোধচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিয়া, গৌরীদানের ফল লাভ করেন। সুতরাং সে হিসাব ধরিতে গেলে, নবদুর্গার বয়ঃক্রম এখন ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তবে অনঙ্গ মোহিনী একে সুন্দরী তায় বন্ধ্যা, সুতরাং এই কুড়ি বৎসর বয়সেও তাহার রূপের ঢেউ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। আর নবদুর্গা সুশ্রী অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্না শ্যামবর্ণা, আবার এই ষোল বৎসর বয়সেই যেন যৌবন সীমা অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—এই বয়সেই নবদুর্গার আড়াই বৎসরের এক পুত্র, আর দুই মাসের এক শিশু কন্যা কোলে।

মুখোপাধ্যায়ের সংসারে আর অন্য কেহ ছিল না, অনঙ্গমোহিনী আর 'নফ্‌রার মা' নাম্নী এক দাসী। সুবোধচন্দ্রেরা চারি ভাই, তার মধ্যে তিনি তৃতীয়, অন্যান্য ভাইদিগের বিবাহ ও সন্তানাদিও হইয়াছিল, সুতরাং আরো নিকট আত্মীয় শাখা পল্লব ধরিলে সুবোধচন্দ্রের সংসারকে, একটা প্রকাণ্ড গৃহস্থ পরিবার বলা যাইতে পারে।

পরিচয়টা এখন এই পর্য্যন্তই বলা ভাল।

(২)

চৈত্র মাস। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনির শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন সময় বিষণ্ণ মনে আফিস হইতে রামময় বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি সচরাচর যে সময় আফিস হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা কিছু বিলম্ব দেখিয়া অনঙ্গ মোহিনী কহিল—"আজ যে তোমার এত দেরী হ'ল।

রামময় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"বড় বিপদ।"

অনঙ্গ আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি কহিল—"সে কি! কি বিপদ?"

রাম। বল্‌ছি—আগে ঠাণ্ডা হই। তারপর সব খুলে বল্‌ছি।

অনঙ্গ। ওগো, তোমার মুখ দেখে, আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে গো—কি বিপদ আমায় খুলে বল। কথাটা শুনেই আমার প্রাণটা বড় কেমন কর্‌ছে যে।

রাম। আমায় এ বৎসর সীমলায় যেতে হবে। সংসারে আর কেউ নাই, তোমায় একলা ফেলে কি ক'রে যাই, এই বিপদ।

অনঙ্গ মোহিনী কিন্তু এ কথার মধ্যে বিপদের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। তথাপি কহিল—"তা আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেই হবে।"

রাম। তাই বা কেমন করে হয়—একেত সেখানে ছয় মাসের জন্য যাওয়া, তারপর সেখানে পরিবার নিয়ে থাক্‌তে গেলে খরচ অনেক। আমি তা কেমন ক'রে পেরে উঠ্‌বো?

অনঙ্গ। তবে আমায় একলা ফেলে কি ক'রে যাবে?

রাম। তার একটা ব্যবস্থা কর্‌বার জন্যেই আমার আফিস থেকে আস্‌তে এত বিলম্ব হলো।

অনঙ্গ। কি ব্যবস্থা করেছ?

রাম। ঠন্‌ঠনেয় আমার এক মাসী আছে, জানত?

আমি তাঁকে এনে এখন সংসারে রাখ্‌বো। আর সুবোধ রইলো, সে তোমাদের সর্ব্বদাই দেখ্‌বে শুন্‌বে।

অনঙ্গ। সুবোধ বাবুকেত দেখ্‌তে শুন্‌তে হবেই, কিন্তু কোথা থেকে কে এক মাসী এসে যে আমার হাড় মাস জ্বালাতন কর্‌বে—তা কিন্তু আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না।

শেষে রামময় বাবু অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহার সেই ব্যবস্থাতেই পত্নীর মত করিলেন, তখন তাঁহার মন কতকটা সুস্থ হইল। নফ্‌রার মা এই সময় পা-ধুইবার জল দিয়া গেল. তিনি হাত-পা মুখ ধুইয়া, কিছু জলযোগের পর, নফ্‌রার মার সাজা তামাক টানিতে টানিতে আবার আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

(৩)

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার চারিদিবস পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় অনঙ্গমোহিণীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, পঞ্জাবমেলে রামময় বাবু সীমলা যাত্রা করিলেন। বন্ধু সুবোধচন্দ্র হাওড়ার ষ্টেশনে পৌছিয়া দিয়া, তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। যাইবার সময় রামময় বাবু বন্ধুকে কহিলেন,—"ভাই রামময়, আমি তোমারই ভরসায়, বিদেশে যাচ্ছি, তা নইলে আমার এ চাকুরী ছেড়ে দিতে হতো। তা ভাই, আমার টাকাকড়ি, আর স্ত্রীর গহনা প্রভৃতি সমস্ত মূল্যবান্ দ্রব্য যেমন তোমার কাছে রেখে গেলুম, সেই রকম তোমার কাছেই থাক। আর আমার মাইনে থেকে যা কিছু পার্‌বো মাসে মাসে আগামী মাস থেকে তোমার কাছেই পাঠাবো। সংসারের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র তুমি নিজে কিনে দেবে, কেবল রোজ রোজ বাজার খরচের হিসাবে কিছু নগদ টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দিও, তার পর যা কিছু থাক্‌বে, সে টাকা তোমার কাছেই রেখো।"

বিষণ্ণমনে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"সে জন্যে ভাই, তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি যথাসাধ্য তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌বো।"

গাড়ী সশব্দে ছাড়িয়া দিল। সুবোধচন্দ্র কিছু শূন্য মনে সেই ধাবিত গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে গাড়ী অদৃশ্য হইল, তখন তিনি বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন।

এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে, একদিন নফরার মা আসিয়া সুবোধ বাবুকে কহিল—"দাদা বাবু, মাসীমার সঙ্গে ত মা-ঠাক্‌রুণের এক তিল বনে না, তিনি আজ খুব ঝগড়া করে কল্‌কেতায় চলে গেছেন।"

সে সংবাদ শুনিয়া সুবোধ বাবু একটু বিস্মিত হইয়া, কহিলেন,—"সে কি? কাজটা ত ভাল হয় নাই, এখন উপায়? আচ্ছা, দোষটা কার?"

নফরার মা উত্তর করিল—"সত্যি কথা বল্‌তে কি দাদা বাবু,—মাসী-মা বড় খিট্‌খিটে। মা-ঠাক্‌রুণ চিরকাল একলা এক সংসারে খাটিয়েছেন, একজন শাশুড়ী ননদ পর্য্যন্ত কেউ নাই। সে কি এখন কনে বউটির মতন তাঁর কথায় উঠবস্ কর্‌তে পারেন? কাজেই ঝগড়া হয়। মা-ঠাক্‌রুণ একবারেই গিন্নী বউ হয়েছেন এখন কি আবার কনেবউ সাজতে পারেন?"

কথাটা সুবোধ বাবুর কতকটা মনোমত হইল বটে, কিন্তু তিনি এই ঘটনায় বড়ই বিব্রত হইলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সংসারের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। প্রথম প্রথম অনঙ্গমোহিণী ঘোম্‌টা দিয়া থাকিত, আর ঝির দ্বারা উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিত। ক্রমে ঘোম্‌টার ভিতর হইতেই দুই একটি করিয়া সুবোধ বাবুর সহিত অনঙ্গমোহিনীর কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। শেষে ঘোমটার সে মুখাবরণটা আর রহিল না, একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল। এইবার অনঙ্গমোহিনী খোলা মুখে কথা আরম্ভ করিল। যাইহোক কেবল কথা, কথার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি! আবার কেবল কি সেই হাসি? সে হাসির সঙ্গে কেমন একটা বিশ্রী চাহনি! আবার কেবল কি চাহনি? সে চাহনির সঙ্গে সঙ্গে কেমন গা-জ্বালানি সকল অঙ্গের ভাবভঙ্গী! কিন্তু এ সকল কিছুই সুবোধচন্দ্রের ভাল লাগিল না। এই সকল দেখিয়া তিনি বরং বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এইরূপে প্রায় দেড় মাস কাল কাটিয়া গেল।

(৪)

একদিন প্রাতে নফরার মা আসিয়া কহিল—"দাদা বাবু, আজ রাত্রে মা-ঠাক্‌রুণ আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। সন্ধ্যার পর গিয়া আজ আপনি সেখানে আহার কর্‌বেন।"

সুবোধ বাবু যেন একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"সন্ধ্যার পর কিসের আবার নিমন্ত্রণ?"

নফ্‌রার মা। সংক্রান্তির দিন, তাঁর কি ব্রত ছিল, সে দিন বামুন খাওয়ান হয় নাই, তাই আজ আপনাকে বামুন খাওয়াবেন।

সুবোধ। দিনের দিন যখন ব্রাহ্মণ খাওয়ান হয় নাই তখন রবিবার খাওয়ালেই চল্‌বে। তুই তোর মা-ঠাক্‌রুণকে বলিস্—"আজ সন্ধ্যার পর আমি খেতে যেতে পার্‌বো না, বরং রবিবার দুকুর বেলা গিয়ে খেয়ে আস্‌বো।

নফরার মা। তা হবে না, দাদা বাবু, মা ঠাক্‌রুণ যে সব উদ্‌যুগ করেছেন, আজই আপনাকে খেতে যেতে হবে।

তখন অগত্যা অনেক জেদাজেদির পর সুবোধ চন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, নফরার মা সে সংবাদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

আজ বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখ। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আর আপিশ হইতে সুবোধ বাবু গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বেই একটা ভয়ঙ্কর জলঝড় আরম্ভ হইল। বৈশাখ মাস বৈকালে এমন দুর্য্যোগ প্রায়ই ত হইয়া থাকে, কিন্তু আজ যে দুর্য্যোগটা যেন ক্রমেই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সুবোধ চন্দ্র নবদুর্গাকে ডাকিয়া কহিলেন "মেজবউ, আজ এ দুর্য্যোগে আমি রাম দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে যাব না, আমার খাবার তৈয়ার কর্‌তে হবে।"

সুবোধ বাবু কথা কয়েকটি পত্নীকে বলিতেছেন, এমন সময় একটা ছাতি মাথায় লণ্ঠন হস্তে নফরার মা সেই জলঝড়ে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া এইখানে উপস্থিত হইল। তখন সুবোধ বাবু সতৃষ্ণ নয়নে একবার পত্নীর মুখের প্রতি চাহিলেন। নবদুর্গা অমনি কহিল "এই দুর্য্যোগে, যখন নফরার মা এত কষ্ট করে তোমায় ডাক্‌তে এসেছে, তখন তোমার যেতেই হবে। বাড়ীতে আজ তোমার খাওয়া হতে পারে না।"

তখন কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুবোধ চন্দ্রকে এই দুর্য্যোগ রাত্রে রামময় বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে হইল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় ভিজিতে ভিজিতে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। নবদুর্গা তখনও নিদ্রা যায় নাই। স্বামীর পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি গৃহে আলো জ্বালিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু সেই আলোকে স্বামীর মুখ দেখিয়া নবদুর্গার প্রাণটা ছ্যাক্ করিয়া উঠিল। নবদুর্গা তাড়াতাড়ি কহিল—"তোমায় মুখ অমন শুক্‌নো কেন? কোন অসুখ করে নাই ত?"

সুবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন—"নবী, বড় ভয়ঙ্কর সংবাদ আছে।"

সুবোধচন্দ্র আদর করিয়া নবদুর্গাকে নবী বলিয়া ডাকিতেন। নবদুর্গা স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত কহিল—"কি সংবাদ আমায় শীঘ্র বল। তোমার কোন অসুখ করে নাই ত—সেই কথা আমায় আগে বল।"

সুবোধ। না আমার কোন অসুখ নাই।

নবদুর্গা। তবে তোমার মুখ অমন শুক্‌নো কেন—তোমার মুখ দেখে আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে।

সুবোধ। কিন্তু আমার কথা শুন্‌লে, তুমি একবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।

নব। কি কথা আমায় বল না।

সুবো। বল্‌বো আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। আজ থেকে নফরার মা হারামজাদীকে আমাদের বাড়ী আর আস্‌তে দিব না—মাগী বড় পাজী।

নব। হাঁ গা কি হয়েছে, আমায় বল না। তোমার দুটি পায় পড়ি—আমায় শীগ্‌গীর বল।

সুবো। আমায় যে আজ রামময়ের স্ত্রী নিমন্ত্রণ করে ছিল, সে কেবল নিমন্ত্রণ খাওয়ান নয়, তার ভিতর আর একটা ভয়ঙ্কর মৎলব ছিল।

নবদুর্গা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"কি মৎলব গো! আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে।"

সুবোধ। আমার আর সঙ্গে সঙ্গে তোমারও সর্ব্বনাশ করবার মৎলব আর কি।

নব। ওমা! সে কি গো? কথাটা ছাই, আমায় সব ভেঙ্গেই বল না।

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সে বড় ভয়ঙ্কর কথা—তোমায় বল্‌বো কি তাই একটু ইতস্তত কর্‌ছি। আচ্ছা বলি—কিন্তু দেখ, একথা যেন

কোন রকমে প্রকাশ হয়ে না পরে! আমি যতদূর দেখ্‌লুম, তাহাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, রামময় দাদার স্ত্রী অসতী, আর নফরার মা হারামজাদী তার পাপ পথের প্রদর্শক। মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখেছ—আমার মুখের উপর স্পষ্ট সে কথা বল্‌লে।"

স্বামীর কথা শুনিয়া নবদুর্গার বুকের ভিতর একটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। একটু সামলাইয়া নবদুর্গা আঙ্গুল মট্‌কাইয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল—"পোড়ার মুখী, উনুনমুখী, মরুকা—মরুকা—মরুক। এত বড় আস্পর্দ্ধা—বামন হয়ে চাঁদে হাত!"

কেবল মুখের গালি দেওয়া নয়, নবদুর্গা যেন একবারে অস্থির হইয়া বেড়াইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র নবদুর্গার রকম সকম দেখিয়া যেন একটু বিস্মিতভাবে কহিলেন—তোমার এত রাগ কেন নবদুর্গা?"

নবদুর্গ তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই। সুতরাং যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—"রাগ হবে না? আমার যে তোমার উপরও রাগ হচ্ছে।"

সুবোধ। কেন—আমার অপরাধ? তুমিইত জেদ করে আমায় সেখানে পাঠালে—আমিও যেতে রাজী ছিলুম না।

নব। আমি কি এর ভিতর এত কাণ্ড আছে জানি? তোমার উপর আমার রাগ হচ্ছে তুমি সেই কালামুখী নফরার মাকে ঝাঁটা মেরে এলে না কেন? আর রামময় বাবুর স্ত্রীর পেটে পেটে এমন বিদ্যা! তুমি বল্‌ছো—তাই আমার একথায় বিশ্বাস হলো। ভদ্রলোকের মেয়ের চরিত্র কি এত খারাপ হতে পারে? এই জন্যই বুঝি মাস-শাশুড়ীকে ঝগড়া করে তাড়িয়ে দিলে? তোমার উপর যখন তাকে দেখবার শুন্‌বার ভার, তার ব্যবস্থা এখন তুমি কি কর্‌বে? আমি কিন্তু তোমায় আর সেখানে যেতে দেবো না। সুবোধ চন্দ্র তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আমি শীঘ্রই তার ব্যবস্থা কর্‌ছি। আমায় কি বিশ্বাস হয় না—নবদুর্গা তখন একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইল।

(৫)

পাপের স্রোতে যখন কেহ একবার গা ভাসাইয়া দেয়, তখন তার আর রক্ষা থাকে না। ফল শেষে বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। অনঙ্গমোহিনীর দশাও তাহাই হইল। দুই সপ্তাহ পরে সুবোধ চন্দ্র শুনিলেন যে অনঙ্গমোহিনীর ভগনীপতি রাজমোহন বাবু তাহার বন্ধুর গৃহে যাওয়া আশা আরম্ভ করিয়াছেন। একদিন অধিক রাত্রে সেই বাবুটিকে বাহির হইতে দেখিলেন। তখন সন্দেহ হইল বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করা চলে না। শেষে গোপনে থাকিয়া সেই নরকের দৃশ্যই একদিন স্বচক্ষে দেখিলেন। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল।

এখন উপায়? অনেক চিন্তা করিয়া প্রথমে একদিন নফরার-মাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। সে সাবধানের কোন ফল হইল না। তখন বন্ধুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ তোমার ছুটি লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব, একবার বাড়ীতে আসিতে হইবে। আর দেশে আসিয়াই প্রথমে গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। কোন মতে অন্যথা করিও না, অন্যথা করিলে তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে।"

রামময় সেই পত্রের উত্তরে লিখিলেন—তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী তোমায় নানারূপ দোষারোপ করিয়া আমায় এক পত্র লিখিয়াছে। তোমার পত্র পাইয়া আমিত একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। যাহা হউক, আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে ছুটি লইয়া বাড়ী যাইতেছি। মন এতদূর অস্থির যে ছুটি না পাইলে আমি চাকুরীতে জবাব দিয়া যাব।"

দুই সপ্তাহ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে অনেক কানাঘুসি চলিতে লাগিল। কিন্তু যাক-সে পাপ কথায় এখন আমাদের কাজ নাই। কুড়ি দিনের দিন, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় রামময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুবোধ চন্দ্রের গৃহে প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"ভাই, ব্যাপার খানা কি—আমায় সব কথা খুলে বল। আমার অনঙ্গমোহিনী ভাল আছে ত?"

সুবোধ। ভাই, তোমার সে ভয় মনে স্থান দিও না। এই মাত্র আসিলে, একটু ঠাণ্ডা হও, তোমায় সে সকল কথা বল্‌বো বলেই ছুটি নিয়ে আনালুম।

রামময় অনেক জেদ করিলেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্র

কৌশলে তখন সে ভয়ঙ্কর কথাটা প্রকাশ করিলেন না। আহারাদির পর, অন্যান্য কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সময় কাটান হইল। ঠিক্‌ যখন রাত্রি দুপুর, তখন সুবোধ চন্দ্র বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুর গৃহের দিকে চলিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে কথায় কথায় সুবোধ চন্দ্র স্ত্রীলোকের চরিত্রের কথা তুলিলেন। স্ত্রীলোকের চরিত্র মন্দ হইলে, স্বামীর কর্ত্তব্য কি—এ পর্য্যন্ত কথাও উঠিল। এই সময় রামময় বাবুর প্রাণটা হঠাৎ কি জানি কেন ছ্যাঁক্‌ করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মুখ হইতে বাহির হইল—"আমার অনঙ্গমোহিনীর চরিত্রে সেরূপ কোন দোষ দেখেছ না কি?"

সুবোধ এবার অনেক কষ্টে কহিলেন—"তাতে বিচিত্র কি ভাই! মনে কর—যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তুমি সে স্ত্রীকে কি কর—আমি সেই কথাই তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। রামময় বাবু দাঁতে দাঁত দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। আমি তা হইলে স্বহস্তে সে স্ত্রীকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলি।"

অন্ধকারে বন্ধুর মুখ-ভঙ্গিমা সুবোধচন্দ্র দেখিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে মনে সে মুখভঙ্গিমা কল্পনা করিয়া লইতে পারিলেন। এ সময় উভয়ে রামময় বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন। রামময় সদর দরজার দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই সময় সুবোধচন্দ্র তাহাকে সেদিকে যাইতে বাধা দিয়া কহিলেন—"আমাদের সদর দরজা দিয়া যাওয়া হবে না, খিড়কীর দিকের ছোট পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে চুপি চুপি বাড়ীর মধ্যে যেতে হবে।"

তিনটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রামময় কহিলেন,—"বুঝিয়াছি কিন্তু সে পাপীয়সী যে তোমারই চরিত্রের উপর অন্যায় দোষারোপ করে আমায় পত্র লিখেছিল।"

"সেই জন্যই তোমায় স্বচক্ষে সমস্ত দেখাইব"—এই কথা বলিয়া কৌশলে সেই খিড়কীর দিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে নিঃশব্দে পড়িলেন। সেই রাত্রি দুইপ্রহরের সময় তখনও একটা ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট হাসির ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে দুইজন লোকের কথা বার্ত্তা সেই ঘর হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতে ছিল।

কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চালিত হইয়া সেই খোলা জানালার পার্শ্বে দুইজনে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল। মুহূর্ত্তপরেই ঘরের দরজায় সজোরে আঘাত হইতে লাগিল। গৃহের ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইয়া—"কেও নফরার মা?"

"নফরার মা নয়, তোর যম।" কি সর্ব্বনাশ! এ যে অনঙ্গমোহিনীর স্বামীর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠস্বর! গৃহের আলো নিবিয়া গেল।

তার পর সে অর্গলবদ্ধ দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ঘর অন্ধকার! আলো জ্বলিল! কেবল অনঙ্গমোহিনী পালঙ্গের উপর শুইয়া রহিয়াছে। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শিকার দেখিয়া যেমন তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে, ক্রোধান্ধ রামময় বাবু সেইরূপ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। তখন পশ্চাৎ হইতে সুবোধ চন্দ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন—"কর কি?"

উন্মত্তবৎ রামময় কহিলেন—"এ অবস্থায় মানুষ যা করে তাই, খুন! খুন! খুন!"

"পাগল হলে নাকি? এ দিকে কে একবার দেখ।"—এই কথা বলিয়া সেই পালঙ্গের নিম্নে ভয়ে থরথর কম্পমান আর এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিল। তখন রামময় তার শিকার ছাড়িয়া নূতন শিকারের দিকে ধাবিত হইল। দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া রামময় তাহাকে সজোরে বাহিরে টানিয়া আনিল! কি পাপ! এ যে রামময় বাবুরই বড় ভায়রা ভাই—রাজমোহন দাদা!

দাদা ত একবারে আধোবদন! দূর হক্‌—আর এ পাপ চিত্র দেখাইব না। এইখানে এই পাপ নাটকের যবনিকা পাত করাই ভাল। তবে একটা কথা বলি—সেই রাত্রে অনঙ্গমোহিনীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঘোল ঢালা হইল। আর রাজমোহন দাদার ডান কর্ণের দীর্ঘতাও কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করা হইয়াছিল। শেষে উভয়কে রামময় জন্মের মত সেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। খুন খরাপি কিছুই হইল না। তার মূল—রামময়ের বন্ধু সুবোধ চন্দ্র। আমরা সেই জন্যই বলি বন্ধু বটে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কোন রকমে
লুম, তাহাতে
রামময় দাদার
তার পাপ প
আমার মুখের
স্বামীর ব
ধড়াস্ ধড়াস
নবদুর্গা আঙ্গু
"পোড়ার
এত বড় আ
কেবল মু
বারে অস্থির
নবদুর্গার রব
কহিলেন—
নবদুর্গ
সুতরাং যেন
না? আমা
সুবোধ।
করে আমায়
ছিলুম না।
নব। ত
জানি? তে
কালামুখী
কেন? আ
বিদ্যা! তু
হলো। ভদ্র
পারে? এ
তাড়িয়ে দি
শুন্‌বার ভার
কিন্তু তোমা
চন্দ্র তখন ঈ
কর্‌ছি। অ
একটু অপ্রস্তু

পাপের
তখন তার

আরতি।*

—০ঃ*ঃ০—

আরতি—ভাবুক ভক্তের ভাব-মাতোয়ারা প্রাণে দিব্যদ্যুতি বিকাশ করে। আরতির আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া পথ উদ্ভাসিত হয়। আরতির বাদ্যোদ্যমে আগুয়ান হইবার জন্য প্রাণ উন্মত্ত করিয়া তোলে।

ভক্তের আরতি, ভাবুকের আরতি, কবির আরতি, সেই এক মহান্ ভাবের দ্যোতনা করে। কবি প্রমথ নাথ, ধন্য তুমি! তুমি এমনই ভাবে আরতি করিয়াছ যে,—

'জাগিয়া উঠিছে অযুত ভক্ত
করিতে তোমার আরতি।'

কবি প্রমথ নাথ—একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র। তিনি ঐশ্বর্য্যে যদ্রূপ গরীয়ান্, কবিত্ব-যশ-সিংহাসনে তদ্রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত। একাধারে এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিতে পাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হউন; এবং তাহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-সৌন্দর্য্য-সম্ভারে মাতৃভাষার মলিন মুখ উজ্জ্বল করুন।

আরতি—ছোট বড় ১৩টি কাব্য-গাথায় সমলঙ্কৃত। কোথাও ভাবের লহর ছুটিয়াছে, কোথাও কবিত্বের উৎস উৎসারিত হইয়াছে, কোথাও পর দুঃখ কাতরতার অমৃত স্রাবিনী মন্দাকিনী ধারা বহিয়াছে। ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরিয়া পান করি; ইচ্ছা হয়, স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া রাখি! সমবেদনার প্রক্ষেপে "আভীর দম্পতির" মর্ম্মভেদী চিত্র তিনি কি সুন্দর আঁকিয়াছেন,—

* * * * * *

এত বলি,' তেজে বেগে কিছুদূর চলে' যেতে,
কানে এল রোদনের স্বর;
দেখিনু পশ্চাতে চাহি,—লুটায়ে লুটায়ে ভূমে,
বক্ষে হানি কর
কাঁদিছে অভাগা রোগী। লাজে দুঃখে মর্ম্মাহত,
ফিরিয়া আসিনু কাছে তার;
দেখিলাম,—নারী তারে ক্রোড়ে লইয়াছে টানি,
মুছি' অশ্রুধার।
যত্নে প্রবোধিয়া দোঁহে কহিলাম সকাতরে,—
'অকারণে করেছি ভর্ৎসনা,
তোমাদের কাছে আমি গুরুতর দোষে দোষী,
করগো মার্জ্জনা!'
চকিতে মুছিয়া অশ্রু চাহিয়া রহিল দীন
ক্ষণকাল মোর মুখ পানে,
কহিল কম্পিত কণ্ঠে—
* * * 'চিরদিন এই ভাবে
কাটে নাই জীবন আমার;
আমারো আছিল গৃহ, কোলাহল মুখরিত
বৃহৎ সংসার,

* * * * * *

রুমালে মুছিয়া আঁখি কহিলাম,—'তার পর'?—
কাহিনী আবার
কহিতে লাগিল যুবা,—"কি আর বলিব? শেষে,
কাল-ব্যাধি ধরিল আমারে;
ঋণে গেল যথাসর্ব্ব, নিমেষে পড়িনু ছুটি'
অকুল পাথারে!

* * * * * *

কে যেন প্রাণের মাঝে বিঁধিতে লাগিল মোরে
কণ্টকের তীক্ষ্ণ কশা দিয়া;
ত্রস্তে দু'টি মুদ্রা রাখি ত্যজিলাম সেই স্থান
নীরবে কাঁদিয়া।
নিরুদ্দেশে ঘুরি ঘুরি ফিরিনু আলয়ে যবে,
মিলাইছে পঞ্চমীর শশী;
জ্বলে কক্ষে ম্লানালোক; ভৃত্য মোর প্রতীক্ষায়
রহিয়াছে বসি;
জানাইনু রুক্ষস্বরে বিস্মিত ভৃত্যেরে,—'মোর
আহারের নাহি প্রয়োজন!'
শয্যা লইলাম যবে, উচ্ছসি উঠিল বেগে
নিরুদ্ধ রোদন!

* * * * * *

"আরতি"র কবিতা প্রাণ-স্পর্শী প্রায় সকল গুলিই, কোনটি রাখিয়া কোন্‌টি দেখাইব। 'গৌরাঙ্গ' শীর্ষক ক্ষুদ্র

* শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কাব্যে 'চরিতকারগণের বর্ণিত প্রামাণ্য অপ্রামাণ্য ঘটনাবলীর যথাযথ অনুসরণ' না করিলেও 'বর্ণনীয় চরিত্রগুলির ক্রম-বিকাশ ও ঘটনা নিচয়ের যথাবিন্যাস ও সুসঙ্গতি সম্পাদনে' ত্রুটি করেন নাই। তবে,—'সমালোচনার সমালোচন' এরূপ অভিনব গ্রন্থমধ্যে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

আরতির আরও বিশেষত্ব, সুন্দর ছাপা মসৃণ রেশমী স্লেব স্বর্ণাক্ষর যুক্ত সুচারু বাঁধাই দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

'আরতি' দর্শনে আমরা সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

———

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্যারীচরন সরকার (জীবন বৃত্ত) শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, 'বিরচিত', সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত ও এল্‌ম প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই।

স্বর্গীয় মহাত্মা প্যারীচরণ সরকারের জীবন চরিতে জানিবার শুনিবার এবং শিখিবার অনেক বিষয় আছে। বারান্তরে আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

২। বাঙ্গালীর যশোগান। শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ ঘোষ প্রণীত। নব্য ভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵১০ ব্যঙ্গ কবিতা স্থলে বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অধঃপতনের চিত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার চিত্রিত হইয়াছে। ইহার সকল স্থান আমাদের ভাল না লাগিলেও মোটের উপর ইহা পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি বলিতে পারি। যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান সমাজের বিষয় চিন্তা করেন তাঁহারা একবার এই পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

৩। মোহ মুদ্গর। শ্রীখেলারাম নন্দী কর্ত্তৃক অনূদিত। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কৃত সুপ্রসিদ্ধ মোহমুদ্গর নামক ১৭টি শ্লোক নন্দী মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মন্দ হয় নাই।

৪। তত্ত্ব নির্ণয়। শ্রীখেলারাম নন্দী প্রণীত। হর সুন্দর প্রেসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে আরোপিত দোষ স্খালন মানসে মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত নন্দী মহাশয় এই 'তত্ত্বনির্ণয়' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং রাজভক্তির চিহ্ন স্বরূপ ইহা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের নামে উৎসর্গী কৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম ও উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। তাঁহার শ্রম সফল হইলেই আমরা সুখী হইব।

আমার কৈফিয়ৎ।

(গ্রাহকগণের নিকট)।

সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কোন কার্য্য করিলেই তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আমি পাঁচ মাসের কাগজ একত্রে বাহির করিতেছি সুতরাং গ্রাহকগণের নিকট ইহার একটা কৈফিয়ৎ না দিলে চলিবে কেন? ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে বাকীর বোঝা মস্তকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি; তাহার উপর আমারও কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে। ভাবিয়াছিলাম এই সংখ্যার প্রদীপ যথাকালে আমাদের সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণের হস্তে দিতে পারিব। কিন্তু কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। আশা করি আমাদের অনিচ্ছাকৃত এই অপরাধ গ্রাহক গ্রাহিকাগণ কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। এই সংখ্যার প্রদীপ বিলম্বে বাহির হইবার আরও একটা কারণ এই যে, আমাদের প্রেসে মেসিন ছিল না, সুচারুরূপে প্রদীপ মুদ্রণের জন্য আমরা বহু ব্যয়ে একটী উৎকৃষ্ট মেসিন প্রেস আনিয়াছি। উক্ত মেসিন খাটাইয়া কার্য্যক্ষম করিবার জন্যও কিছু কাল-বিলম্ব হইয়াছিল।

আমরা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা লাভবান হইব বলিয়া প্রদীপ পরিচালন ভার গ্রহণ করি নাই। প্রদীপের ন্যায় উচ্চ অঙ্গের একখানি মাসিক পত্র অকালে কালগ্রাসে

নিপতিত হইবে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ইহা ভাবিয়াও আমরা প্রদীপের পরিচালনে ব্রতী হইয়াছি। মাতৃভাষার সেবা ও দেশের অন্যবিধ হিতসাধনই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা প্রদীপের জন্য কি প্রকার অর্থব্যয় করিতেছি তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। এই ছয় মাস কাল গ্রাহকদিগকে বিনামূল্যে প্রদীপ প্রদান করা যে কিরূপ বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহাও গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন। বিনামূল্যে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী মহাশয়, সকল গ্রাহকের নিকট হইতেই পঞ্চমবর্ষের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে গ্রাহকগণের প্রাপ্য এই ছয় মাসের কাগজ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া ভূতপূর্ব্ব সত্বাধিকারী মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ করিলাম।

প্রদীপ সকলেরই—সকলেই যদি প্রদীপকে আপনার বলিয়া মনে করেন এবং মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে ইহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্নবান্ হয়েন তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হই। আমরা দেশের যাবতীয় সহৃদয় নর নারীর মুখাপেক্ষী হইয়াই প্রদীপ প্রচার ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাদিগের সাহায্য পাইব না কি? এইত প্রদীপ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল, এই সময়ে সকলেই লেখা দিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া প্রদীপ প্রচার কল্পে সুপরামর্শ দান করিয়া এবং আরোও অশেষ প্রকারে আমাদিগের সাহায্য করিতে পারেন।

আগামী মাস হইতে প্রদীপ পূর্ব্ববৎ নিয়মিতরূপে মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। প্রদীপের উন্নতির জন্য আমরা যে অধিকতর যত্নবান হইয়াছি ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই হয়ত সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ প্রদীপের ছবি, বিশেষতঃ—লেখা যাহাতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর হয়, তজ্জন্য আমরা সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছি। প্রদীপের বার্ষিক মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা অগ্রিম দেয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা এত সচ্ছল নহে যে, হাজার হাজার গ্রাহককে ধারে কাগজ যোগাই। সুতরাং আমাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি গ্রাহকগণ সকলেই ষষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেন, অথবা ভিঃ পিঃ পোষ্টে প্রদীপ পাঠাইয়া মূল্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা বড়ই উপকৃত ও বাধিত হই। আমরা জানি, ভিঃ পিঃ পোষ্টে কাগজ পাঠাইলে কোন কোন গ্রাহকের বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বাহ্নেই এ সম্বন্ধে গ্রাহকগণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আমরা কিন্তু ভিঃ পিঃ পোষ্টই গ্রাহকগণের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ করি। যেহেতু ইহা দ্বারা তাঁহারা মণিঅর্ডার করিবার পরিশ্রম হইতে রেহাই পান। ভিঃ পিঃ ও মণিঅর্ডার খরচা উভয়ই তুল্য।

এই সংখ্যায় পঞ্চমবর্ষের সম্পূর্ণ সূচী সন্নিবিষ্ট হইল। আমাদিগের বহুল চেষ্টা সত্বেও তিনটি প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মোটের উপর এই সংখ্যায় ৪ চারি ফর্ম্মা কম রহিল, অবথা কালবিলম্ব হেতু গ্রাহকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে আরও কালবিলম্ব করিয়া ঐ চারি ফর্ম্মা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল না। তবে আমরা এই বৎসরের অবশিষ্ট চারি ফর্ম্মা ষষ্ঠ বর্ষে পূরণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম। গ্রাহকদিগকে প্রতারিত করিয়া চারি ফর্ম্মা কম করা হইল ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ষষ্ঠ বর্ষে ৪৮ ফর্ম্মা স্থলে গ্রাহকগণ ৫২ ফর্ম্মা পাইবেন।

অনুগ্রহপ্রার্থী
শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।